

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.
শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.

অনুবাদক
অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও
হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী





রা
রাহনুমা
প্রকাশনী™



'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী

৩য় খণ্ড

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. (১২৬৮-১৩৩৯ হি.)

[সমস্ত কুরআনের তরজমা এবং সূরা ফাতিহা, বাকারা ও নিসা-এর তাফসীর]

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. (১৩০৫-১৩৬৯ হি.)

[সূরা আলে ইমরান ও মায়েদা থেকে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহের তাফসীর]

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর

আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ৩য় খণ্ড

অনুবাদ

অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ

খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ. ও

হযরত মাওলানা আব্দুল হক দামাত বারাকাতুহুম

সম্পাদনা

হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দা.বা.

শাইখুল হাদীস, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, ঢাকা।

তাকরীয্

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা.বা.

বিস্তারিত ভূমিকা

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা.বা.

আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষণ, শিরোনাম সংযোজন ও হাদীস-রেওয়ায়েতের তাখরীজ

মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ

উস্তায, উলূমুল হাদীস বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা।

প্রকাশনায়



রাহনুমা প্রকাশনী™

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী ৩য় খণ্ড

মূল	শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.
অনুবাদ	অধ্যাপক মাওলানা গিয়াসুদ্দীন আহমদ
সম্পাদনা	মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
তাকরীয	শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
বিস্তারিত ভূমিকা	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
বিস্তারিত নিরীক্ষণ	মাওলানা সাঈদ আহমদ বিন গিয়াসুদ্দীন আহমদ
দ্বিতীয় সংস্করণ	এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০২২
সর্বস্বত্ব	অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ ডিজাইন	মুহারেব মুহাম্মাদ
ইনার বিন্যাস	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।
বাঁধাই	আয়েশা বুক বাইন্ডিং ২৭ রূপচাঁদ দাস লেন, ঢাকা ১১০০, মোবাইল : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী শোরুম ১ : ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য ঃ ২৪০০.০০ (দুই হাজার চারশ টাকা মাত্র)

TAFSIRE USMANI

by Professor Mawlana Giasuddin Ahmad. Published & Marketed by : Rahnuma Prokashoni.
Price : MRP. 2400.00, US $ 25.00 only. E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com, www.rahnumabd.com

ISBN : 978-984-93859-7-7

সূচিপত্র

সূরা নং	পারা	নাম ও পৃষ্ঠা
(৩০)	২১	সূরা রোম—০৯
(৩১)	২১	সূরা লুকমান—৩৬
(৩২)	২১	সূরা সাজদাহ—৫৪
(৩৩)	২১-২২	সূরা আহযাব—৬৫
(৩৪)	২২	সূরা সাবা—১১৫
(৩৫)	২২	সূরা ফাতির—১৪২
(৩৬)	২২-২৩	সূরা ইয়াছিন—১৬১
(৩৭)	২৩	সূরা সাফফাত—১৮৯
(৩৮)	২৩	সূরা সোয়াদ—২২২
(৩৯)	২৩-২৪	সূরা যুমার—২৫০
(৪০)	২৪	সূরা মু'মিন—২৮২
(৪১)	২৪-২৫	সূরা হা মীম আস্‌সাজদা—৩১৬
(৪২)	২৫	সূরা শূরা—৩৪২
(৪৩)	২৫	সূরা যুখরুফ—৩৬৭
(৪৪)	২৫	সূরা দুখান—৩৯১
(৪৫)	২৫	সূরা জাছিয়া—৪০২
(৪৬)	২৬	সূরা আহকাফ—৪১৪
(৪৭)	২৬	সূরা মুহাম্মদ—৪৩২
(৪৮)	২৬	সূরা ফাত্‌হ—৪৫০
(৪৯)	২৬	সূরা হুজুরাত—৪৭২
(৫০)	২৬	সূরা ক্বাফ—৪৮৪
(৫১)	২৬-২৭	সূরা যারিয়াত—৪৯৬
(৫২)	২৭	সূরা তুর—৫০৭
(৫৩)	২৭	সূরা নজম—৫১৭
(৫৪)	২৭	সূরা ক্বামার—৫৩২
(৫৫)	২৭	সূরা রহমান—৫৪৪
(৫৬)	২৭	সূরা ওয়াকে'আ—৫৫৭
(৫৭)	২৭	সূরা হাদীদ—৫৭১
(৫৮)	২৮	সূরা মুজাদালাহ—৫৮৮
(৫৯)	২৮	সূরা হাশর—৬০১
(৬০)	২৮	সূরা মুমতাহিনা—৬১৫
(৬১)	২৮	সূরা সাফফ—৬২৫
(৬২)	২৮	সূরা জুমুআ—৬৩২
(৬৩)	২৮	সূরা মুনাফিকুন—৬৪০
(৬৪)	২৮	সূরা তাগাবুন—৬৪৬
(৬৫)	২৮	সূরা তালাক—৬৫৩
(৬৬)	২৮	সূরা তাহরীম—৬৬৩
(৬৭)	২৯	সূরা মুলক—৬৭২
(৬৮)	২৯	সূরা কলম—৬৮২
(৬৯)	২৯	সূরা হা-ক্কা—৬৯৪
(৭০)	২৯	সূরা মা'আরিজ—৭০৫
(৭১)	২৯	সূরা নূহ—৭১৩
(৭২)	২৯	সূরা জিন—৭২১
(৭৩)	২৯	সূরা মুয্‌যাম্মিল—৭৩০
(৭৪)	২৯	সূরা মুদ্দাছ্‌ছির—৭৩৮
(৭৫)	২৯	সূরা কিয়ামাহ—৭৪৯
(৭৬)	২৯	সূরা দাহ্‌র—৭৫৮
(৭৭)	২৯	সূরা মুরসালাত—৭৬৭
(৭৮)	৩০	সূরা নাবা—৭৭৬
(৭৯)	৩০	সূরা নাযিআ'ত—৭৮৩
(৮০)	৩০	সূরা আবাসা—৭৯০
(৮১)	৩০	সূরা তাকবীর—৭৯৭
(৮২)	৩০	সূরা ইনফিতার—৮০৪
(৮৩)	৩০	সূরা তাত্‌ফীফ—৮০৭
(৮৪)	৩০	সূরা ইনশিকাক—৮১৩
(৮৫)	৩০	সূরা বুরূজ—৮১৭
(৮৬)	৩০	সূরা তারিক—৮২৩
(৮৭)	৩০	সূরা আ'লা—৮২৬
(৮৮)	৩০	সূরা গাশিয়াহ—৮৩০
(৮৯)	৩০	সূরা ফাজ্‌র—৮৩৪
(৯০)	৩০	সূরা বালাদ—৮৪১
(৯১)	৩০	সূরা শাম্‌স—৮৪৫

সূচিপত্র

সূরা নং	পারা	নাম ও পৃষ্ঠা
(৯২)	৩০	সূরা লাইল--৮৪৯
(৯৩)	৩০	সূরা দুহা--৮৫২
(৯৪)	৩০	সূরা ইনশিরাহ--৮৫৭
(৯৫)	৩০	সূরা তীন--৮৬০
(৯৬)	৩০	সূরা আলাক--৮৬৩
(৯৭)	৩০	সূরা কদর--৮৬৭
(৯৮)	৩০	সূরা বায়্যেনাহ--৮৬৯
(৯৯)	৩০	সূরা যিলযাল--৮৭২
(১০০)	৩০	সূরা আদিয়াত--৮৭৪
(১০১)	৩০	সূরা কারিয়াহ--৮৭৭
(১০২)	৩০	সূরা তাকাছুর--৮৭৯
(১০৩)	৩০	সূরা আস্‌র--৮৮১
(১০৪)	৩০	সূরা হুমাযাহ--৮৮৩
(১০৫)	৩০	সূরা ফীল--৮৮৫
(১০৬)	৩০	সূরা কুরায়শ--৮৮৭
(১০৭)	৩০	সূরা মাউ'ন--৮৮৮
(১০৮)	৩০	সূরা কাওছার--৮৯০
(১০৯)	৩০	সূরা কাফিরূন--৮৯২
(১১০)	৩০	সূরা নাস্‌র--৮৯৫
(১১১)	৩০	সূরা লাহাব--৮৯৬
(১১২)	৩০	সূরা ইখলাস--৮৯৯
(১১৩)	৩০	সূরা ফালাক--৯০১
(১১৪)	৩০	সূরা নাস--৯০৩
		সূরা নাস পরিশিষ্ট--৯০৪

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী





সূরা রোম

সূরা ৩০ । ৬০ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٦٠، ركوعاتها ٦

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আলিফ– লাম–মীম।

الٓمّٓ ۞

২. রোমকরা পরাজিত হয়েছে,

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۞

৩. নিকটবর্তী ভূখণ্ডে[১]। তবে তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে—

فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۞

৪. কয়েক বছরের মধ্যে[২]। সকল বিষয়

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ

১. أدنى- বলতে 'আযরুআত' ও 'বুসরা' এর মধ্যবর্তী এলাকা উদ্দেশ্য, যা শামের সীমান্তে হিজায সংলগ্ন অঞ্চলে মক্কার (মোটামুটি) নিকটে অবস্থিত। অথবা রোম সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী 'ফিলিস্তীন', কিংবা পারস্যের নিকটবর্তী 'জাযিরা-ইবনে উমর' উদ্দেশ্য।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) প্রথমোক্ত মতকে অধিকতর সঠিক বলেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. অর্থাৎ নয় বছরের মধ্যে রোমকরা জয়ী হবে। কারণ, অভিধানে ও হাদীছে بضع শব্দটি ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

আলোচ্য আয়াতগুলির মধ্যে কুরআন এমন এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, যা কুরআনের সত্যতার এক অসাধারণ প্রমাণ।

ঘটনা এই যে, সেই কালের দুটি বিশাল সাম্রাজ্য 'পারস্য' (যাকে বর্তমানে ইরান বলা হয়) এবং 'রোম' দীর্ঘকাল থেকে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে আসছিল। ৬০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের পর পর্যন্ত ওদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধের ধারা জারি থাকে (যেমন ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিকার আলোচনা থেকে প্রকাশ পায়)। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয় এবং চল্লিশ বছর পর ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। মক্কাবাসীরা রোমীয় ও পারসিক যুদ্ধ-বিগ্রহের খবরাদি শুনতে পেত। সেই সময়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তি ঘটে এবং ইসলামী দাওয়াতের সূত্রপাত হয়। এ প্রেক্ষাপটে লোকেরা উক্ত যুদ্ধবিগ্রহের সংবাদে এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করত।

মক্কার মুশরিকরা ধর্মীয় দিক দিয়ে নিজেদেরকে পারস্যের অগ্নিপূজক পৌত্তলিকদের নিকটবর্তী মনে করত। আর রোমীয় খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে মুসলমানদের ভাই বা কমপক্ষে তাদের নিকটবর্তী বন্ধু বলে পরিগণিত হত। যখন পারসিকদের বিজয়ের সংবাদ আসত, তখন মুশরিকরা আনন্দিত হত এবং একে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের যুদ্ধজয়ের লক্ষণ মনে করত আর বুকে আনন্দকর আশা-ভরসা ধারণ করত। এতে স্বভাবতই মুসলমানদের কষ্ট হত। কারণ, একদিকে অগ্নিপূজক পৌত্তলিকদের মোকাবেলায় খ্রিস্টান কিতাবীরা পরাজিত হল, অন্যদিকে তাদেরকে মক্কার মুশরিকদের হাসি-বিদ্রূপের পাত্র হতে হল।

পারস্যের হাতে রোমের পরাজয়

অবশেষে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দের পর (যখন চাঁদের হিসাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স প্রায় ৪৫ বছর এবং নবুওয়াতের ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে) খসরুপারভেজ (দ্বিতীয় কায়খসরু) এর আমলে পারস্য রোমকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ফলে সিরিয়া, মিসর, এশিয়ামাইনর প্রভৃতি অঞ্চল রোমকদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ইরানী সৈন্যরা রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসকে কনষ্টানটিনোপোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে এবং রোম সাম্রাজ্যও আশঙ্কাজনক অবস্থায় পতিত হয়। বড় বড় পাদ্রি নিহত বা বন্দী হয়, ইরানী বিজয়ীরা বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে পবিত্র ক্রুশও তুলে নিয়ে যায়। মোটকথা রোমসম্রাটের আধিপত্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। পার্থিব উপায়-উপকরণের দিক থেকে রোম সাম্রাজ্যের আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর এবং পারস্যের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় অবশিষ্ট থাকেনি।

কুরআনের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী ও তার সত্যতা

এসব অবস্থা শুনে মক্কার মুশরিকরা খুব আনন্দ-উল্লাস করল, মুসলমানদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করল, বড় বড় রঙিন স্বপ্ন দেখতে লাগল। এমনকি, কোন কোন মুশরিক আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, আজ আমাদের ইরানী ভাইয়েরা তোমাদের ভাই রোমকদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, কাল আমরাও তোমাদের এভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেব। ঠিক সে সময় এমন প্রতিকূল অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতে কুরআন জোরালো ঘোষণা দিল যে, নিশ্চয় আপাতত রোমানরা পারসিকদের কাছে পরাস্ত হয়েছে; কিন্তু নয় বছরের মধ্যে তারা পুনরায় বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলেই হযরত আবু বকর (রা) কতিপয় মুশরিকের সাথে বাজি ধরলেন (সেই সময় পর্যন্ত এরূপ বাজি ধরা হারাম ছিল না) যে, এত বছরের ভেতর রোমকরা বিজয় লাভ না করলে আমি তোমাদের একশ' উট দেব, নতুবা তোমরা এত সংখ্যক উট আমাকে দেবে। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা) নিজ বিবেচনায় بضع سنين বলতে কিছু কম সময় ধরেছিলেন, পরবর্তীতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় بضع এর আভিধানিক অর্থ ৯ বছর সময়কাল ধরে চুক্তি সম্পাদিত হয়।

আল্লাহরই এখতিয়ারে* পূর্বে ও পরে[১]। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে[২]—

وَمِنْۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

৫. আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। এবং তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু[৩]।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

৬. এ আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ নিজ ওয়াদার খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[৪]।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

এদিকে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস হৃত রাজত্ব পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। সে মানত করল যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে পারসিকদের উপর বিজয় দান করলে 'হিমস' থেকে 'ইলয়া' (বাইতুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত পদব্রজে সফর করব। আল্লাহর কী কুদরত! কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঠিক ৯ বছরের ভিতর (অর্থাৎ হিজরতের এক বছর পর) বদরের জেহাদের দিন যখন মুসলিমগণ আল্লাহর ফযলে মুশরিকদের উপর ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করলেন, ঠিক সেইদিন তাঁরা এ সংবাদ শুনে অধিকতর আনন্দিত হলেন যে, রোমীয় কিতাবীদের আল্লাহ তাআলা ইরানের পৌত্তলিকদের উপর বিজয় দান করেছেন এবং এর ফলে মুশরিকরা অধিকতর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয়। কুরআনের এই বিরাট ও বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা দেখে অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আবু বকর (রা) মুশরিকদের থেকে একশত উট উসূল করেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সদকা করে দেন।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'সকল ক্ষমতা আল্লাহরই।

১. অর্থাৎ পূর্বে পারস্যকে বিজয় দান করা, রোমকে পরাজিত করা এবং পরবর্তীতে অবস্থা ও পরিস্থিতি উলটিয়ে দেওয়া— সবই আল্লাহর মুঠিতে। আর শুধু এতটুকু ব্যাপার (যুদ্ধে জয় বা পরাজায়) আল্লাহর নিকট কোন জাতির প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়া সাব্যস্ত করে না।

২. সেদিন একে তো নিজেদের বিজয়ের আনন্দ লাভ হল, অন্যদিকে এ আনন্দও যুক্ত হল যে, রোমীয় আহলে কিতাবরা (যারা তুলনামূলক মুসলমানদের নিকটবর্তী ছিল) পারস্যের পৌত্তলিকদের উপর বিজয়ী হয়েছে। এভাবে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা মানুষ প্রত্যক্ষ করল। মক্কার কাফেররা সকল দিক দিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পরাজিত করার ইচ্ছা করেন, কোন শক্তিই তার পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আর যার উপর মেহেরবানী করতে চান, তাকে কোন বাধা ছাড়া বিজয় দান করেন।

৪. অর্থাৎ বিজয়ী বা পরাজিত করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কী কী হেকমত থাকে, তা মানুষ জানে না এবং খোদায়ী কুদরত যখন কোন কাজ করতে চায় তখন যে বাহ্যিক বাধা-বিপত্তি সবই অপসারিত হয়ে যায়, তা অধিকাংশ লোকই বোঝে না। যাদের দৃষ্টি শুধু বাহ্যিক

৭. ওরা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিকটাই জানে, আর ওরা আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল[১]।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ۝

৮. ওরা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে, তা সৃষ্টি করেছেন যথার্থ উদ্দেশ্যেই এবং এক নির্ধারিত সময়ের জন্যই[২]? কিন্তু অধিকাংশ মানুষই স্বীয় রবের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে[৩]।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ۝

৯. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তা হলে দেখতে পেত—ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে?

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

উপায়-উপকরণের দিকে, তাদের অধিকাংশই সেসব উপায়-উপকরণ ছাড়া কিছু বোঝে না। আল্লাহর উপর তাদের ভরসা থাকে না। তারা কারো সাময়িক বিজয় দেখে মনে করে, এ ব্যক্তিই মনে হচ্ছে আল্লাহর নিকট প্রিয়।

১. অর্থাৎ এরা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটাকেই শুধু জানে। এখানকার সাজসজ্জা, আরাম-আয়েশ, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি— এ সবই হচ্ছে এদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-সাধনার চরম লক্ষ্যস্থল। এই জীবনের অন্তরালে যে আরেকটি জীবনের রহস্য লুক্কায়িত, এ খবরই এদের নেই। তারা চিন্তা করে না যে, সেখানে পৌঁছে এই পার্থিব জীবনের ভাল কিংবা মন্দ ফলাফলের সম্মুখীন হতে হবে। এখানে যাকে সুখী দেখা যায়, সেখানেও সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে– এটা জরুরী নয়। আখেরাতের ব্যাপার তো পরের কথা, এ দুনিয়াতেই দেখ না, এক ব্যক্তি বা একটি জাতি কখনো দুনিয়াতে অগ্রগতি লাভ করে, কিন্তু তার শেষ পরিণাম লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

২. অর্থাৎ এই বিশাল বিশ্বজগত আল্লাহ তাআলা অযথা সৃষ্টি করেননি, এর কিছু একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। তা আখেরাতে দৃষ্টিগোচর হবে। আর হাঁ, এই বিশ্বব্যবস্থা যদি সর্বদা একভাবে চলতে থাকত, তবুও একটা কথা ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তন ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এর কোন সীমা ও সমাপ্তি অবশ্যই আছে। সুতরাং একটি নির্ধারিত কাল শেষে এই বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এর ফলস্বরূপ আরেকটি জগত স্থাপিত হবে।

৩. ওরা মনে করে, আল্লাহর সামনে কখনো হাযির হতে হবে না। সুতরাং হিসাব-নিকাশ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

ওরা ছিল এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী; আর ওরা জমি চাষ করেছিল এবং তা আবাদ করেছিল এদের আবাদ করার চেয়ে বেশি। এবং ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আগমন করেছিলেন[১]। বস্তুত আল্লাহ আদৌ এমন ছিলেন না যে, ওদের প্রতি জুলুম করেন। বরং ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করত[২]।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

১০. অতঃপর, যারা মন্দ কাজ করেছিল ওদের পরিণামও মন্দ হয়েছে। কারণ, ওরা আল্লাহর আয়াতগুলি অস্বীকার করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত[৩]।

---

১. অর্থাৎ যেসব বড় বড় শক্তিশালী জাতি (যেমন আদ ও ছামূদ) পৃথিবীর বুকে চাষাবাদ করে উদ্যান-বাগান তৈরি করেছিল, তার বুক ফেরে প্রমোদকানন ও ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছিল, বর্তমান অবিশ্বাসীদের তুলনায় সভ্যতাকে বেশি উন্নতি দান করেছিল, দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল এবং যমীনকে এদের চেয়ে বেশি আবাদ করেছিল— ওরা আজ কোথায়? যখন আল্লাহর পয়গম্বরগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন ও জীবনবিধান নিয়ে আসলেন আর ওরা অস্বীকার করল, তখন পরিণাম কী হয়েছে, কীভাবে ওদের ধ্বংস ও বরবাদ করা হয়েছে, তা কি এরা শোনেনি? এরা আজও মাটির বুকে চলা-ফেরা করে ওদের বিজন ধ্বংসাবশেষ দেখতে পারে। এসবের মধ্যে কি এই উদাসীন লোকদের জন্য কোন শিক্ষার বিষয় নেই?

২. আল্লাহ তাআলার দরবারে অবিচারের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নিজেরা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছে এবং এমন কাজ করছে, যার ফলাফল শুধুই ধ্বংস। সুতরাং এটা নিজেদের জানের উপর নিজে জুলুম করা হল। নতুবা আল্লাহ তাআলার দয়া ও সুবিচারের অবস্থা তো এই যে, রাসূল পাঠানো এবং পূর্ণরূপে সতর্ক করা ছাড়া কাউকে পাকড়াও পর্যন্ত করেন না।

৩. সেই মন্দ পরিণাম (শাস্তি) তো ওরা দুনিয়াতে প্রত্যক্ষ করেছিল। আর অবিশ্বাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের যে পরকালীন শাস্তি, তা তো বাকি আছেই।

বর্তমান জাতিসমূহের কর্তব্য, অতীত জাতিনিচয়ের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা, এক জাতি যে কার্যকলাপের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হল, সেই কারণে অন্যরাও সেই শাস্তি পেতে পারে। একের ধ্বংস ও শাস্তি দেখে বোঝা উচিত, অন্যরাও এরূপ ধ্বংস ও শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে।

[রুকূ - ২]

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১১. আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তোমাদের তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢

১২. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝١٣

১৩. আর ওদের জন্য ওদের শরীকদের মধ্যে কোন সুপারিশকারী হবে না এবং ওরা নিজেদের শরীকদের অস্বীকার করবে[১]।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝١٤

১৪. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হবে[২]।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝١٥

১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে জান্নাতে সম্মানে ভূষিত করা হবে[*৩]।

---

১. অর্থাৎ মুশরিক্‌রা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাত, বিপদের সময় যখন তারা কোন কাজে আসবে না, তখন মুশরিক্‌রা তাদের অস্বীকার করে বসবে এবং বলা শুরু করবে– والله ربنا ما كنا مشركين (আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।)

২. অর্থাৎ নেককার ও বদকার— হরেক রকমের মানুষকে পৃথক করে দেওয়া হবে এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী আয়াতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তারা জান্নাতে আনন্দ-উল্লাস করবে'।

৩. অর্থাৎ পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করা হবে এবং সব রকমের ভোগবিলাস ও আনন্দ লাভে ধন্য হবে।

এ হল পুণ্যবানদের বাসস্থানের বিবরণ। সামনের আয়াতে দুষ্কর্মপরায়ণদের ঠিকানার বিবরণ রয়েছে। মোটকথা, উভয়ের মধ্যে এমন বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে, যার চেয়ে বেশি বিচ্ছেদ আর হতেই পারে না।

১৬. আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে, তারা আযাবে ধৃত হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর– যখন সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন উপনীত হও প্রভাতে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. আর প্রশংসা তাঁরই– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। এবং (পবিত্রতা বর্ণনা কর) বিকালে ও যখন দুপুরে উপনীত হও[১]।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾

---

১. অর্থাৎ যদি জান্নাত চাও তবে আল্লাহ পাককে স্মরণ কর, যা মুখ, অন্তর ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সাধিত হয়। নামাযের মধ্যে আল্লাহ-স্মরণের এই তিনো প্রকারের সমাহার ঘটানো হয়েছে। আর ফরয নামাযসমূহের ওয়াক্ত তাই, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ ভোরে ফজর, সন্ধ্যায় মাগরিব ও এশা, বিকালে আসর ও দুপুর বেলায় জোহরের নামায। এই সময়গুলিতে আল্লাহ তাআলার রহমত বা কুদরতের লক্ষণাদি খুব বেশি ফুটে ওঠে।

সৌরমণ্ডলে সর্বাপেক্ষা বড় জ্যোতিষ্ক হচ্ছে সূর্য। সম্ভবত জগতে এমন কোন সৃষ্টি নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে না। (যেমন أرض النجوم এর গ্রন্থকার বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন।) এ জন্যই নক্ষত্রপূজারীরা সূর্যকে নিজেদের সবচেয়ে বড় উপাস্য নির্ধারণ করেছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উক্তি– هذا ربي هذا أكبر এর মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

নামাযের পাঁচ ওয়াক্তের আরেকটি বৈশিষ্ট্য

এই সূর্যের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব এবং এর উপকার থেকে নক্ষত্রপূজারীদের বঞ্চিতির চিত্রও উল্লিখিত পাঁচ ওয়াক্তে ফুটে ওঠে— ফজরের সময়ে উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত, দুপুরে সূর্যের উত্থানে পতন শুরু হলে, আসরের সময় যখন এর উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতায় স্পষ্ট দুর্বলতা আসে, অস্তগমনের পর যখন এর কিরণমালার পরশ থেকে পূজারীরা বঞ্চিত হয়, তারপর এশার সময় যখন এর রক্তিম আভাও মুছে যায় এবং দিগন্তে আলোর সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না।

এ সময়গুলিতে একত্ববাদীদের প্রতি নির্দেশ হলো— মহান আল্লাহর ইবাদত করা এবং নামাযের শুরুতেই 'আল্লাহু আকবার' বলে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ একত্ববাদী (ইবরাহীম খলীলুল্লাহ)-এর অনুসরণ করতে থাকা, যিনি هذا ربي هذا أكبر ('এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়')– এর পরই বলেছিলেন— إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ('আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখ তাঁরই অভিমুখী করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' –আন'আম, আয়াত ৭৯)

১৯. তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে বের করেন মৃতকে এবং ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে[১]।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

[রুকূ - ৩]

২০. তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এখন তোমরা মানবরূপে (পৃথিবীময়) ছড়িয়ে আছ[২]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝

উপাসনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা

আলোচ্য আয়াতে وله الحمد في السموات والأرض দ্বারা সম্ভবত এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনার এবং স্মরণ করার যোগ্য কেবল সেই সত্তাই হতে পারেন, যাঁর মাহাত্ম্য-বড়ত্ব আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্টিরাজি নিজ নিজ অবস্থা ও জবানীতে বর্ণনা করছে। কোন অক্ষম ও অসহায় সৃষ্টি এর যোগ্য হতে পারে না, সে দেখায় যত বড়ই হোক।

সম্মুখে মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য, কিছু বড় বড় কুদরত ও মহান গুণাবলির বর্ণনা রয়েছে, যা দ্বারা তাঁর উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়ের উপরও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে এবং বীর্যকে মানুষ থেকে, প্রাণীকে ডিম থেকে এবং ডিমকে প্রাণী থেকে, মুমিনকে কাফের থেকে এবং কাফেরকে মুমিন থেকে তিনিই সৃষ্টি করেন। আর মাটি যখন শুষ্ক হয়ে মরে যায়, তখন রহমতের পানি দ্বারা তাকে পুনর্জীবিত করে সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা করে দেন। মোটকথা, সর্বপ্রকারের জীবন ও মৃত্যু– প্রাকৃতিক হোক বা অপ্রাকৃতিক, দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য– সবগুলোর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। অতএব তোমাদের পুনর্জীবিত করে কবর থেকে উঠিয়ে হাশরের মাঠে দাঁড় করিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে কেন?

২. অর্থাৎ আদমকে মাটি দ্বারা তৈরি করেছেন। অতঃপর লক্ষ কর– আল্লাহর কুদরত তাকে এমনি প্রসারিত করেছে যে, সমস্ত ভূপৃষ্ঠে তাঁর বংশ ছড়িয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর বুকে বিস্তার লাভ করে এই মাটির পুতুল কত ধরনের বিস্ময়কর ও অদ্বিতীয় বুদ্ধিমত্তার কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে চলেছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

২১. তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে আরেকটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের নিকট শান্তি লাভ কর এবং তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য[১]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ ۝

২২. এবং তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে[২]।

---

১. অর্থাৎ প্রথমে মাটি থেকে শুধু এক আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁরই ভিতর থেকে তাঁর জোড়া বের করলেন, যাতে হৃদ্যতা ও শান্তির সাথে তার নিকট বাস করে। আর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ রকমের মহব্বত ও আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন, যাতে দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। সে মত উভয়ের মিলনের ফলে মানব-বংশ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا (নিসা, আয়াত ১)

২. আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একই মাতা-পিতা থেকে পয়দা করেছেন, একসঙ্গে বসবাস করিয়েছেন, পরে (ক্রমান্বয়ে) সমস্ত পৃথিবীর বুকে তাদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের পৃথক পৃথক ভাষা দান করেছেন। এক দেশের মানুষ অন্য দেশে গিয়ে ভাষার দিক দিয়ে একেবারে পর হয়ে যায়।

আরো লক্ষ করার বিষয়– দুনিয়ার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কত অসংখ্য মানুষ পয়দা হয়েছে, কিন্তু কোন দুটি মানুষ এমন পাওয়া যাবে না, যাদের স্বর, সুর, উচ্চারণ, বাকভঙ্গি সম্পূর্ণ এক রকম। প্রত্যেকটি মানুষের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি যেমন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি তার আওয়াজ, বাকভঙ্গি ও সুরত সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো দুটি মানুষ এমন পাওয়া যাবে না, যাদের আওয়াজ ও রং-রূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে নতুন নতুন আকৃতি এবং কথা বলার নতুন নতুন ভঙ্গি সৃষ্টি হয়ে চলেছে, কিন্তু আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনো কমতি কখনো আসেনি। বস্তুত এটি আল্লাহ তাআলার মহান কুদরতের অতি বড় নিদর্শন!

২৩. এবং তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হল- রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের কর্তৃক তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ[১]। নিশ্চয় এতে সেই লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা (আল্লাহ-রাসূলের কথা) শোনে[২]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

২৪. তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে আরেকটি এই যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুৎ-চমক দেখান ভয় ও আশার জন্য[৩] এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন ও তার দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে সেই লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে[৪]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তাঁর আদেশে আসমান ও যমীন স্থিতিশীল রয়েছে[৫]। অতঃপর তিনি যখন তোমাদের মাটি

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মানুষের দুটি অবস্থা বিপরীতমুখী- সে ঘুমালে অচেতন পাথরের ন্যায়, আর জীবিকা অন্বেষণে যখন ব্যস্ত থাকে তখন তার ন্যায় সচেতন কেউ নেই। আর মৌলিকভাবে রাত ঘুমের জন্য এবং দিন জীবিকা অন্বেষণের জন্য, তবে উভয় সময়ে উভয় কাজও হয়ে থাকে'।

২. অর্থাৎ যারা শুনে ও সম্বরণ রাখে (তফসীরে ইবনে কাছীর)। হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'নিজের ঘুমের অবস্থা নিজের নজরে আসে না, সুতরাং মানুষের মুখে তা শুনে থাকে।' (মূযেহ)। এ হল يسمعون শব্দ অবলম্বনের তাৎপর্য।

৩. বিদ্যুতের চমক দেখে মানুষ ভয় পায়, কারো উপর পতিত হয় কিনা অথবা অতিবৃষ্টি হয়ে জানমালের ক্ষতি হয় কিনা। আর আশাও রাখে, বৃষ্টি হলে দুনিয়ার কাজকাম চলবে। তদ্রূপ ভ্রমণকারী কখনো অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ-চমককে কল্যাণকর মনে করে। কারণ, তাতে কিছু দূর পর্যন্ত রাস্তা দেখা যাবে। আবার কখনো ভয়ে ঘাবড়িয়ে যায়।

৪. অর্থাৎ এ থেকেই বুঝে নাও যে, মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করায় কোন বাধা নেই। এ আল্লাহর জন্য সহজ।

৫. ইতিপূর্বে আসমান ও যমীন সৃষ্টির আলোচনা হয়েছে। এখানে তাদের স্থিতি ও বিদ্যমানতা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে, এও তাঁরই হুকুমে। এদের কারো সাধ্য নেই, স্বীয় কক্ষপথ থেকে সরে যাওয়ার অথবা একে অন্যের উপর পতিত হয়ে বিশ্বব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খল করে ফেলার।

الْاَرْضِ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ۝

থেকে (ওঠার জন্য) একবারমাত্র ডাকবেন, তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে[১]।

وَلَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ۝

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই তাঁরই। সকলে তাঁরই অনুগত[২]।

وَهُوَ الَّذِیْ یَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۝

২৭. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটি তাঁর জন্য অতি সহজ[৩]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৪]।

---

১. অর্থাৎ যতদিন তাঁর হুকুম আছে, পৃথিবী ও আকাশ বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর যখন দুনিয়ার স্থায়িত্বকাল পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলার একটি ডাকে তোমরা সকলে কবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে চলে আসবে।

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দারা সবাই তাঁরই মালিকানাধীন বান্দা এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। কারো এ ক্ষমতা নেই যে, তাঁর তাকবীনি হুকুম (তথা ইচ্ছা ও ফয়সালা) এর বিরুদ্ধাচারণ করবে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের সামনে তো সবই সমান। কিন্তু নিছক তোমাদের হিসাবে যদি বলা হয়,তবে প্রথমবারের তুলনায় দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো অধিক সহজ। সুতরাং এটা অদ্ভুত বিষয় যে, প্রথম সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহকে সক্ষম বলে বিশ্বাস কর, কিন্তু দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে অসম্ভব মনে কর।

৪. অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম গুণাবলি এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর মান-মর্যাদা তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীর কোন বস্তুই নিজ গুণ ও সৌন্দর্যে তাঁর মহিমা ও গুণের সাথে তুলনীয়ই হতে পারে না, সমান হওয়া তো দূরে থাক। মানুষের পক্ষে তাঁর মহিমা ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতদূর কল্পনা করা সম্ভব, তিনি তো তারও উর্ধ্বে। বরং যেখানে যে সৌন্দর্য বর্তমান, তা তাঁরই গুণ-গরিমা ও মহিমা-মর্যাদার সামান্য প্রতিবিম্বমাত্র।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আকাশের ফেরেশতাগণ পানাহার করেন না, তাঁরা মানবীয় প্রয়োজনমুক্ত, বন্দেগী ছাড়া তাঁদের কোনো কাজ নেই। অপরদিকে পৃথিবীর বাসিন্দারা সব কিছুতে জড়িত। কিন্তু আল্লাহর শান এদের থেকেও ভিন্ন, ওদের থেকেও ভিন্ন। এক কথায় সকলের উর্ধ্বে তাঁর পবিত্র সত্তা।' (মুযেহ)

কবির ভাষায়-

[রুকূ - ৪]

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদের (অবস্থা) থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন— (বল তো), আমি তোমাদের যে রিযিক দান করেছি, তাতে কি তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের কতক তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা সকলে তাতে সমান, আর তোমরা তাদের ঐরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা (শরীকরা) পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনাদি সবিস্তারে বর্ণনা করি[১]।

اے برتر از خیال وقیاس وگمان ووہم ÷ وزہرچہ گفتہ اند شنیدیم وخواندہ ایم

'তিনি সমস্ত কল্পনা-কিয়াস ও ধারণা-অনুমানের উর্ধ্বে। উর্ধ্বে যা কিছু বলা হয়েছে, যা কিছু শুনেছি ও যা কিছু পড়েছি তারও।'

منزل تمام گشت وبپایاں رسید عمر ÷ ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

'সফরের মনজিল শেষ হয়ে গেছে, জীবনও শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছে, অথচ এখন পর্যন্ত তোমার প্রথম গুণটির বর্ণনা-বিবরণ দেওয়া শেষ হল না।'

আরেকজন কী চমৎকার বলেছেন—

اے بروں از وہم وقال وقیل من ÷ خاک بر فرق من وتمثیل من

'ওহে সেই সত্তা, যিনি সব ধারণা-কল্পনা ও বলা-কওয়ার অতীত, যা কিছুই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপমা-উদাহরণ দেই, তা কিছুই হয় না।'

১. অর্থাৎ শিরকের ঘৃণ্যতা ও অসারতা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তোমাদের হাল-অবস্থা থেকে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন। তা এই যে, তোমরা যাদের শুধু বাহ্যিক ও নকল মালিক, সেই দাস-দাসীদের কি তোমরা আল্লাহর দেওয়া জীবিকা ও ধন-সম্পদের মধ্যে সমান শরীক মনে কর? এজমালী ধন-সম্পত্তিতে নিজেদের ভাই-বেরাদার অংশীদার হয়ে থাকে এবং তোমরা সর্বদা আশঙ্কা করতে থাক যে, এই সম্পত্তি থেকে বেশি খরচ করে ফেললে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে যায় কিনা, অথবা সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে যায় কি-না, কিংবা কমপক্ষে এই প্রশ্ন করে বসে কিনা যে, আমাদের মত ও মর্যি ছাড়া অমুক কাজ করলেন কেন? প্রশ্ন হল, এরূপ আশঙ্কা কোন মনিবের নিজ দাস বা চাকরের বেলায় হয় কি?

২৯. কিন্তু অপরাধীরা মূর্খতাবশত নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে[১]। অতএব কে তাকে হেদায়েত দান করবে, যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আর ওদের কোন সাহায্যকারী নেই[২]।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজের চেহারা দীনের অভিমুখী রাখ*[৩]। (আর অনুসরণ কর) আল্লাহর 'ফিত্‌রতে'র, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[৪]। আল্লাহর সৃষ্টিতে

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ

যদি না হয় তবে বুঝতে হবে, যখন একজন নকল মালিকের এই অবস্থা এবং দাস-দাসী কোন কিছুতে তার শরীক নয়— তখন সামান্য বান্দারা সেই আসল মালিকের অংশীদার হয় কী করে, যাদের তোমরা নির্বুদ্ধিতার কারণে তাঁর সমকক্ষ মনে কর? একজন গোলাম যখন মনিবের মালিকানায় অংশীদার হতে পারল না— অথচ দুজনই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে— তখন একটি সৃষ্টি, বরং সৃষ্টির সৃষ্টি (মূর্তি) কী করে স্রষ্টার মালিকানায় অংশীদার হতে পারে? এমন নিরর্থক কথা কোন বুদ্ধিমান লোকই গ্রহণ করতে পারে না।

১. অর্থাৎ এই বে-ইনসাফ লোকেরা এমন পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট কথাগুলি কী করে বুঝবে? ওরা তো বুঝতেই চায় না। মূর্খতা ও প্রবৃত্তি-পূজার বশে ওরা শুধু কল্পনা ও রিপুরই দাসত্ব করছে।

২. অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার অন্যায়, মূর্খতা ও প্রবৃত্তি-পূজার কারণে সরলপথ অনুসরণ করার ও বোঝার তাওফীক দেননি, কোন শক্তিই তাকে বুঝিয়ে সত্য পথে আনতে অথবা সাহায্য করে গোমরাহী ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং এহেন লোকদের জন্য অনুতপ্ত ও মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার দরকার নেই। এদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আপনি কায়মনোবাক্যে নিজ রবের অভিমুখী হোন এবং স্বভাব-ধর্মের উপর অবিচল থাকুন।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–'নিজেকে দ্বীনের উপর অবিচল রাখ'।**

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোমরাহী থেকে কোন ক্রমেই বের হতে চায় না, তাকে শিরকের আবর্তে পড়ে থাকতে দিন এবং নিজে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ-অভিমুখী হয়ে থাকুন, আর তাঁর সত্য ধর্মকে পূর্ণ মনোযোগসহ একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে থাকুন।

৪. **'ফিতরাতুল্লাহ'- এর কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা**

আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব প্রথম থেকেই এমন বানিয়েছেন যে, যদি সে সত্যকে বুঝতে ও গ্রহণ করতে চায় তবে তা করতে পারে। সৃষ্টির আদি থেকে আল্লাহ নিজের এজমালী মা'রেফত ও পরিচয়ের একটি কিরণ মানবের অন্তরে হেদায়াতের বীজ হিসাবে নিক্ষেপ করেছেন। এরই ফল হল, যদি পারিপার্শ্বিক খারাপ প্রভাব-প্রতিবেশ

কোন পরিবর্তন নেই[১]। এ-ই সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[১]—	اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

দ্বারা সে প্রভাবিত না হয় এবং আসল স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সে নিশ্চিতরূপে সত্য ধর্মকে অবলম্বন করবে, অন্য কোন দিকে ধাবিত হবে না। "عهد ألستُ" এর ঘটনাতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

আর সহীহ হাদীছে (বুখারী : ১৩৮৫) সুস্পষ্টভাবে আছে যে, প্রত্যেক শিশু স্বভাবধর্ম (ইসলাম) এর উপর পয়দা হয়। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। একটি হাদীছে কুদসীতে (মুসলিম : ২৮৬৫) আছে, 'আমি আমার বান্দাদেরকে (তাওহীদে)'একনিষ্ঠ' করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তানেরা প্ররোচনা দিয়ে তাদের সরলপথ থেকে বিভ্রান্ত করেছে।

لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ

যা হোক, 'দীনে হক', 'দীনে হানীফ' ও 'দীনে কায়্যিম'-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, যদি মানুষকে তার উক্ত ফিতরতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে নিজ থেকে এর দিকেই ঝুঁকবে। আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের 'ফিতরত' এরূপই তৈরি করেছেন । এর মধ্যে কোন পার্থক্য ও পরিবর্তন নেই। মনে করুন, যদি ফেরাওন বা আবু জাহলের আসল ফিতরতের মধ্যে উক্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতাই না থাকত, তবে তাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্য আদেশ দান সহীহ হত না, যেমন ইট-পাথর বা জীবজন্তুর উপর শরী'য়তের বিধান আরোপ করা হয়নি। মানব-স্বভাবের এই একতারই প্রতিক্রিয়া এই যে, দীনের বহু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়কে কোন না কোন আকারে প্রায় সকল মানুষই স্বীকার করে, যদিও সেগুলির উপর তাদের অনেকে সঠিকভাবে কায়েম থাকে না।

শাহ সাহেবের ভাষায় 'ফিতরাত'- এর সরল ব্যাখ্যা

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা সকলের মালিক ও অধিপতি। তিনি সকল থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন। কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ নয়, কারো ক্ষমতা তাঁর উপর চলে না। এসব বিষয় সকলেই জানে। কাজেই সকলের এ অনুযায়ী চলা উচিত। এমনিভাবে কারো ধন ও প্রাণে হস্তক্ষেপ করাকে, মান-সম্মানে কালিমা লেপন করাকে প্রত্যেকে মন্দ জানে। তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ করা, গরীবের প্রতি দয়া করা, পাওনা পুরাপুরি আদায় করা, প্রতারণা না করা– এসবকে যে কেউ ভাল জানে। এ পথে চলাই সত্য ধর্ম। এ সমস্ত বিষয় স্বভাবজাত ছিল, তবে এগুলির বিধিবদ্ধ বিধান আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরদের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন।

১. অর্থাৎ মূল সৃষ্টির দিক থেকে কোন পার্থক্য ও পরিবর্তন নেই, প্রতিটি মানুষের (মূল স্বভাব ও) ফিতরাতকে আল্লাহ সত্য গ্রহণের যোগ্য বানিয়েছেন।

অথবা অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ফিতরাতের উপর তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমরা স্বেচ্ছায় তা পরিবর্তন করো না, নষ্ট করো না। তোমাদের মধ্যে তিনি তাওহীদ ও

৩১. ('ফিতরাতে'র অনুসরণ কর) তাঁর অভিমুখী হয়ে[২]। এবং তাঁকে ভয় করে চল ও নামায কায়েম কর। আর মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না—

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

৩২. যারা নিজেদের দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দলই নিজেদের নিকট যা রয়েছে তা নিয়ে আনন্দিত[৩]।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. যখন মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা আপন রবকে ডাকতে থাকে তাঁরই অভিমুখী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাঁর পক্ষ থেকে তাদের একটু মেহেরবানী আস্বাদন করান, তখনি তাদের একদল আপন রবের সাথে শিরকে লিপ্ত হয়—

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَاۤ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

হেদায়েতের বীজ রোপণ করেছেন, তোমরা অযত্নে বা অসাবধানতায় একে বিনষ্ট হতে দিয়ো না।

১. অর্থাৎ সরল দীনই উক্ত ফিতরাত বা স্বভাবের দাবি। (ফলে মানবের আসল ফিতরাত তাওহীদের এ দীনকেই কবুল করে)। কিন্তু বহু লোক এ সূক্ষ্ম সত্যটি বোঝে না।

২. অর্থাৎ তাঁর অভিমুখী হয়ে (ও ইখলাসের সাথে) আসল দীনকে ধারণ করে থাক, শুধু পার্থিব স্বার্থে এ কাজ করলে তা তাঁর কাছে গৃহীত হবে না।

অতঃপর (دين فطرت) স্বভাব-ধর্মের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, যাথা– তাক্ওয়া অবলম্বন করা, নামায কায়েম করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরক থেকে বেঁচে থাকা, মুশরিকদের থেকে দূরে থাকা, নিজেদের দীন-ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি না করা।

৩. অর্থাৎ স্বভাব-ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি বর্জন করে মানুষ নিজদের ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল, বহু ফের্কার সৃষ্টি হল। প্রত্যেকের আকীদা-বিশ্বাস ভিন্ন, মত ও পথ ভিন্ন। কেউ গোমরাহীর স্বীকার হয়ে বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোন আকীদা কায়েম করে দিল, অথবা কোন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে বসল, অমনি একদল তা গ্রহণ করল, কিছুদিন পর তা একটি ফের্কায় রূপ নিল (এভাবে বহু ফের্কার উদ্ভব হল)। তারপর প্রত্যেক ফের্কা নিজেদের তৈরি করা রীতিনীতি ও আকীদা-বিশ্বাসে– তা যতই অসার হোক না কেন– এমনভাবে লিপ্ত ও মত্ত হয়ে গেল যে, নিজেদের ভ্রান্তির সম্ভাবনাও কল্পনায় আসে না।

৩৪. যাতে আমি ওদের যা দিয়েছি তা অস্বীকার করে। অতএব (কিছুদিন) মজা লুটে নাও। শীঘ্রই জানতে পারবে[১]।

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۭ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

৩৫. আমি কি ওদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি? আর তা, ওরা আল্লাহর সাথে যে শিরক করে তার কথা বলছে*[২]?

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ۝

৩৬. আমি যখন মানুষকে একটু মেহেরবানী আস্বাদন করাই, তারা তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর যদি স্বয়ং ওদেরই কৃতকর্মের কারণে ওদের উপর কোন দুর্দশা আপতিত হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ হতাশ হয়ে পড়ে[৩]।

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۭ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের আসল ফিতরাত যেমন প্রকৃত ভাল বিষয়গুলিকে চেনে-জানে, তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার প্রতি যে রুজু হওয়া লাগে তাও প্রত্যেকের ফিতরাত জানে। তাই তো ভয়-ভীতি ও বিপদাপদের সময় এর প্রকাশ ঘটেই যায়। যত বড় অবাধ্য-দুরাচারীই হোক, মুসিবতে পরিবেষ্টিত হয়ে গেলে এক আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। তখন মিথ্যা ভরসাস্থলগুলো সবই মন থেকে উধাও হয়ে যায়! তখন সেই সত্য মালিকই স্মরণে থেকে যান, যাঁর দিকে মানব-স্বভাব পথপ্রদর্শন করে থাকে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এ অবস্থার উপর মানুষ বেশি সময় স্থির থাকে না। আল্লাহর রহমতে যখন মুসিবত দূর হয়, তখন তাঁকে ছেড়ে মিথ্যা দেবদেবীর মহিমাকীর্তন শুরু করে দেয়। মনে হয়, তার নিকট যা কিছু আছে, সবই ওই দেবদেবীর প্রদত্ত, আল্লাহ কিছুই দেননি।

فَتَمَتَّعُوا

আচ্ছা, কয়েক দিনের মজা উপভোগ করে নাও। অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে, এ কুফর ও নিমকহারামীর পরিণাম কী? যদি তার মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকত, তবে বুঝতে পারত, বিপদের সময় তার অন্তর যে আল্লাহকে ডাকল, তিনিই এর যোগ্য যে, সর্বদা তাঁকেই স্মরণ রাখা হবে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তা ওদেরকে আল্লাহর সাথে শিরক করতে বলছে?'

২. অর্থাৎ সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃত মানব-স্বভাব শিরককে আদৌ গ্রহণ করে না। তবে কি এর বিপরীতে ওদের নিকট এমন কোন দলীল-প্রমাণ আছে, যা এ কথা বলে যে, খোদার প্রভুত্বে অন্যরাও শরীক আছে? যদি কোনই প্রমাণ না থাকে, তবে তারা উপাস্য হওয়ার অধিকার কী করে লাভ করল?!

৩. অর্থাৎ তাদের অদ্ভুত অবস্থা। যখন আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তখন খুশীতে এমনই গদগদ হতে শুরু করে এবং এমনই আত্মহারা হয়ে যায় যে, প্রকৃত অনুগ্রহকারীকেও

৩৭. ওরা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করেন? নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্য[১]।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. অতএব তুমি আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এ-ই তাদের জন্য উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারাই সফলকাম[২]।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

স্মরণ রাখে না। আর কোন সময় আপন কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ বিপদ-আপদের চাবুক পড়লে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, হতাশ হয়ে পড়ে, যেন এখন আর এমন কেউই নেই যিনি বিপদ দূর করতে পারেন।

মুমিনের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত— সে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে স্মরণ রাখে, তাঁর দয়া ও রহমত পেয়ে খুশী হয়ে মুখে ও অন্তরে শোকর আদায় করে। আর মুসিবতে ফেঁসে গেলে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে এবং আশা রাখে যে, বিপদ যতই কঠিন হোক এবং বাহ্যিক আসবাব যতই প্রতিকূল হোক, তাঁর মেহেরবানীতে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

একটি সংশয় ও তার উত্তর

৩৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষ বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে শুরু করে।' বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে, 'বিপদ এলে নিরাশ হয়ে বসে যায়।' উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, বিপদ এলে শুরুতে খোদাকে ডাকে; তারপর যখন মুসিবত ও বিপদ দীর্ঘায়িত হয়, তখন ঘাবড়ে নিরাশ হয়ে যায় (তো, দুই আয়াতে দুই সময়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে)। অথবা কতকের সে অবস্থা, কতকের এ অবস্থা- والله تعالى أعلم

১. অর্থাৎ ঈমানদার ও বিশ্বাসীরা বোঝে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র্য সবই মহা শক্তিশালী আল্লাহরই হাতে। সুতরাং যে অবস্থাই আসুক, বান্দার কর্তব্য সবর ও শোকরের সাথে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা। মুমিন নে'য়ামতের সময় শোকরগুযারী করতে থাকবে এবং ছিনিয়ে নেওয়ারও ভয় করতে থাকবে। আর বিপদের সময় ধৈর্য ধরবে এবং আশা রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন।

২. অর্থাৎ যখন মানব-স্বভাবের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হল যে, প্রকৃত মালিক ও রব সেই আল্লাহই এবং দুনিয়ার যাবতীয় নে'য়ামত তাঁরই দান, অতএব যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর সাক্ষাৎ ও দীদাদের আকাজ্ক্ষা পোষণ করে, তাদের কর্তব্য– তাঁর দেওয়া নে'য়ামত থেকে ব্যয় করা এবং মুসাফির, অভাবী ও গরীব আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া, আত্মীয়-

৩৯. তোমরা যে সুদ প্রদান কর, যাতে তা মানুষের সম্পদে (যুক্ত হয়ে) বৃদ্ধি পায়— তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত প্রদান কর, তো এমন লোকেরাই (খোদার কাছ থেকে) বৃদ্ধি করে নেয়[*][১]।

وَمَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيَرۡبُوَاۡ فِىۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ‌ ۚ وَمَاۤ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ ۝

৪০. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের রিযিক দান করেছেন, তার পর তোমাদের মৃত্যু ঘটান, অতঃপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের কোন একটি করতে পারে? আল্লাহ পবিত্র এবং ওরা যে শিরক করে তা থেকে বহু উর্ধ্বে[২]।

اَللّٰهُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيۡتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيۡكُمۡ‌ ؕ هَلۡ مِنۡ شُرَكَآئِكُمۡ مَّنۡ يَّفۡعَلُ مِنۡ ذٰ لِكُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ‌ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ۝

স্বজনদের ঘনিষ্ঠতা অনুপাতে তাদের হক আদায় করতে থাকা। এরূপ বান্দারাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'এমন লোকেরাই দ্বিগুণ পায়'।

১. অর্থাৎ সুদ দ্বারা যদিও বাহ্যত ধন বাড়তে দেখা যায়, কিন্তু আসলে তা হ্রাস পেতে থাকে। যেমন কোন মানুষের শরীর যদি আঘাত ইত্যাদিতে ফুলে যায়, তবে তা স্বাস্থ্য বৃদ্ধি নয়; বরং রোগ বা মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি। পক্ষান্তরে যাকাত দানে মনে হয় ধন কমে যাবে, বস্তুত তা বৃদ্ধি পায়। যেমন কোন রোগীর শরীর জোলাপ দ্বারা পরিষ্কার করার ফলে শরীর কমতে দেখা যায়; কিন্তু পরিণামে তা সুস্থতা নিয়ে আসে। সুদ ও যাকাতের অবস্থাও পরিণামের দিক থেকে অনুরূপ। ইরশাদ হচ্ছে (বাক্বারা : ২৭৬)— يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِي الصَّدَقٰتِ ('আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন।') হাদীছে (বুখারী : ১৪১০) আছে, মুমিনের দানকৃত একটি খেজুর কিয়ামতের দিন বৃদ্ধি পেয়ে পাহাড়ের সমান হয়ে যাবে।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে ربا দ্বারা সুদ উদ্দেশ্য নয়; বরং আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাউকে এ উদ্দেশ্যে কিছু দেয় যে, দ্বিতীয়জন অনুগ্রহের বিনিময়ে এর চেয়ে বেশি দেবে, তার দান আল্লাহর কাছে বরকত ও ছওয়াবের কারণ হয় না, যদিও তা মুবাহ। আর পয়গম্বর আলাইহিস সালামের জন্য তা মুবাহও নয়, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- ولاتمنن تستكثر ('অধিক পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে অনুগ্রহ করবেন না।' –মুদ্দাচ্ছের, আয়াত ৬)। والله اعلم

২. অর্থাৎ মৃত্যু, জীবন ও জীবিকা দান— সবই যখন এককভাবে তাঁরই কাজ, তখন অন্য অংশীদাররা কোথা থেকে এসে উপাস্য হওয়ার অধিকারী হয়ে গেল?

[রুকূ - ৫]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٤١

৪১. মানুষ স্বহস্তে যা কামাই করেছে, তার কারণে জলে-স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (সৎপথে) ফিরে আসে[১]।

قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ؕ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ۝٤٢

৪২. আপনি বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে? তাদের অধিকাংশ ছিল মুশরিক[২]।'

---

১. অর্থাৎ মানুষ স্বভাব-ধর্মের উপর কায়েম থাকেনি। বরং দুনিয়াতে তাদের দ্বারা কুফর ও জুলুম প্রসার লাভ করেছে এবং এর ফলে দেশ-দেশান্তরে ও জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। স্থলভাগ ও জলভাগে কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। পৃথিবীকে ফেতনা-ফাসাদ ঘিরে ফেলেছে। সামুদ্রিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জাহাজসমূহে ডাকাতি-লুটপাটের ফলে সাগর-মহাসাগরেও বিপর্যয়ের ঝড়-তুফান চলছে।

এর কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা– মানুষ স্বীয় দুষ্কর্মের কিছুটা শাস্তি দুনিয়াতে ভোগ করুক। পূর্ণ শাস্তি তো আখেরাতে হবে; কিন্তু কিছুটা নমুনা এখানেও দেখুক। এতে কিছু লোক ভীত হয়ে সৎপথে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে।

নবীজির (স.) আবির্ভাবের পূর্বে ফেতনা-ফাসাদের ভয়াবহতা!

মানুষের দুষ্কর্মের কারণে জলে-স্থলে ফেতনা-ফাসাদের বিস্তার যদিও সর্বদা হচ্ছে এবং হতে থাকবে, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে এ অন্ধকারের ঘনঘটা যে ভয়ঙ্কর সর্বব্যাপী রূপ ধারণ করেছিল এবং পূর্ব-পশ্চিমের দিগদিগন্ত ও জল-স্থলকে তা যেভাবে গ্রাস করেছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর বিরল। ইউরোপের বিজ্ঞ ঐতিহাসিকরা তখনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা দেখে অনুমান করা যায় যে, অমুসলিম ঐতিহাসিকরাও এ সর্বজনবিদিত সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনি (دائرة المعارف فريد وجدي দ্রষ্টব্য)।

সম্ভবত উল্লিখিত সর্বব্যাপী ফেতনা-ফাসাদের প্রতি লক্ষ করত (প্রখ্যাত মুফাসসির) কাতাদাহ জাহিলিয়াতের যুগকে আয়াতের (مصداق) পাত্র বলে মন্তব্য করেছেন।

২. অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের শাস্তি শিরকের কারণে এসেছিল। তবে কিছু লোকের শাস্তি অপরাপর গোনাহর কারণে এসে থাকবে।

৪৩. অতএব আপনি আপনার চেহারা সরল পথের উপর অবিচল রাখুন[১]– সেই দিন আসার পূর্বে যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে টলানোর কোন সম্ভাবনা নেই[২]। সেদিন লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে[৩]।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَىِٕذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. যে কাফের হয়েছে, তার কুফর তার উপরই আপতিত হবে[৪]। আর যারা সৎকর্ম করে, তারা নিজেদের জন্যই (জান্নাতের পথ) সুগম করে[৫]—

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. যাতে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে বিনিময় দান করেন[৬]। নিশ্চয় তিনি কাফেরদের পছন্দ করেন না[৭]।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা دين قيم অর্থাৎ স্বভাব-ধর্মের উপর অবিচল থাক। সকল ধরনের বিপর্যয়ের এটাই একমাত্র প্রতিকার।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে সেই দিনের আগমন অনিবার্য। কোন শক্তিই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না, স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও তা মুলতবী করবেন না।

৩. অর্থাৎ নেককারদের জান্নাতে এবং বদকারদের দোযখে পাঠানো হবে। আল্লাহর ইরশাদ— فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ {'একদল যাবে জান্নাতে, আর একদল জ্বলন্ত আগুনে।' –শূরা : ৭}

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) একে দুনিয়ার হাল-অবস্থার উপর প্রয়োগ করেছেন। তিনি লেখেন, 'দীনের প্রভাব বাড়বে, ফলে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিরা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দারা পৃথক হয়ে যাবে।'

৪. অর্থাৎ অবিশ্বাসের শাস্তি তারই উপর বর্তাবে।

৫. অর্থাৎ তারা আরাম-আয়েশে জান্নাতে থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

৬. (من فضله) এর দ্বারা বোঝা যায়, যত বড় নেককারই হোক না কেন, সেও আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহেই জন্নাত লাভ করবে।

৭. আর যারা আল্লাহর পছন্দ নয়, তাদের ঠিকানা যে কোথায়, তা তো বলাই বাহুল্য।

৪৬. তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তিনি বায়ুমণ্ডলী প্রেরণ করেন সুসংবাদ-বাহীরূপে এবং যাতে তিনি তোমাদের তাঁর কিছু মেহেরবানী আস্বাদন করান[১], যাতে নৌযানগুলি তাঁর হুকুমে চলাচল করে[২], যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শোকর কর[৩]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝۴۶

৪৭. নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি, আর তাঁরা তাদের নিকট এসেছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে। অতঃপর আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। আর আমার দায়িত্ব ঈমানদারদের সাহায্য করা[৪]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ۝۴۷

---

১. অর্থাৎ বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ আনে, তারপর আল্লাহর মেহেরবানীতে বৃষ্টি হয়।

২. পালের জাহাজ ও নৌকা বাতাসের সাহায্যে চলে। আর বাষ্পীয় ইষ্টিমারের গতিতেও অনুকূল বাতাস সাহায্য করে।

৩. অর্থাৎ যেন জাহাজে করে বাণিজ্যিক মালামাল অন্যত্র নিয়ে যেতে পার এবং আল্লাহর ফযলে খুব লাভবান হও। তারপর এসব নে'য়ামতের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে থাক।

পূর্বা-পর সম্পর্ক ও একটি সূক্ষ্ম ইশারা

ইতিপূর্বে জলে ও স্থলে ফেতনা-ফাসাদের বিস্তারের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তার বিপরীতে এখানে আল্লাহর সুসংবাদ ও নে'য়ামতের আলোচনা করা হল। আয়াতে সম্ভবত এ ইঙ্গিতও আছে যে, বাতাস বইলে, ধুলি-বালি উড়লে আশা করবে যে, এক্ষুনি রহমত-বৃষ্টি এসে যাবে। কারণ, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে, যা আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ শোনায়। তদ্রূপ কাফেরদের উচিত, এ অবস্থায় দুষ্কৃতি ও নে'য়ামতের না-শোকরী থেকে ফিরে আসা এবং আল্লাহর মেহেরবানী দেখে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হওয়া।

৪. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, পরকালে আল্লাহর প্রিয় ও অপ্রিয় বান্দাদের পৃথক করে দেওয়া হবে এবং সত্যকে অস্বীকারকারীদের উপর অস্বীকৃতির শাস্তি পতিত হবে। এখন বলা হচ্ছে যে, এই শাস্তির প্রকাশ দুনিয়াতেই কিছুটা ঘটবে। কেননা, আল্লাহর নীতি ও ওয়াদা এই যে, তিনি অপরাধী ও অবিশ্বাসকারীদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন এবং কামেল মুমিনদের নিজ সাহায্য-সহযোগিতা দ্বারা শত্রুদের উপর বিজয়ী করবেন।

৪৮. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ুমণ্ডলী প্রেরণ করেন; এবং তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। আর তিনি যেভাবে চান মেঘমালাকে আকাশে ছড়িয়ে দেন[১] এবং তাকে কয়েক স্তরবিশিষ্ট বানিয়ে দেন*। তার পর তুমি তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হতে দেখ। অতঃপর তিনি যখন আপন বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা তা পৌছান, তখনি তারা আনন্দ করতে শুরু করে[২]।

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَیَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ۟

৪৯. অথচ তাদের উপর তা বর্ষিত হওয়ার পূর্বে তারা নিরাশ হচ্ছিল[৩]।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ ۟

৫০. তুমি আল্লাহর রহমতের ফলাফল দেখ যে, কীভাবে তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন[৪]। নিশ্চয় তিনিই মৃতদের জীবন-দানকারী।

فَانْظُرْ اِلٰۤی اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰی

মাঝখানে বায়ুর আলোচনা এজন্য এল যে, রহমত-বৃষ্টি পতিত হওয়ার পূর্বে যেমন বাতাস প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ দীনের বিজয়ের পূর্বে বিজয়ের নিদর্শনসমূহ সমুজ্জ্বল হতে থাকে।

১. অর্থাৎ প্রথমে একদিকে ছড়িয়ে দেন, পরে অন্যদিকে। এভাবেই তিনি দীনের বিস্তার সাধন করবেন। বস্তুত তিনি তা করেছেনও।

* দ্বিতীয় তরজমা–'এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন'।

২. ঠিক এভাবে, যারা ঈমানী ও রূহানী বৃষ্টি দ্বারা উপকৃত হবে, তারা আনন্দ উপভোগ করবে।

৩. অর্থাৎ ইতিপূর্বে লোকেরা নিরাশ হচ্ছিল। এমনকি বৃষ্টি আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও আশা ছিল না যে, বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে এমন স্থানও সিক্ত হয়ে যাবে। মানুষের অবস্থা অদ্ভুত, একটু দেরি হলেই নিরাশ হয়ে পড়ে, আবার একটু পরেই আনন্দে নেচে ওঠে।

৪. অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা আগে দিকে দিকে ধূলো উড়ছিল এবং মাটি শুষ্ক, নীরস ও নির্জীব হয়ে পড়েছিল। সহসা আল্লাহর মেহেরবানীতে মাটি জীবিত হয়ে স্পন্দিত হতে লাগল, বৃষ্টি তার গুপ্ত শক্তিগুলিকে কত শীঘ্র জীবন্ত করে তুলল।

আধ্যাত্মিক বৃষ্টি ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

একই অবস্থা আধ্যাত্মিক বৃষ্টিরও। এ দ্বারা মৃত অন্তরসমূহ জীবনীশক্তি ফিরে পাবে। আল্লাহর যমীন ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আয়াতে বর্ণিত মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। দিকে

আর তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান[১]।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿٥٠﴾

৫১. আর যদি আমি (ক্ষতিকর) বায়ু প্রেরণ করি, ফলে তারা শস্যকে হলদে দেখতে পায়— তবে নিশ্চয় এর পর তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে[২]।

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِیْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ یَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾

দিকে রহমতে এলাহীর নিদর্শন এবং দীন-ধর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাবে। যেসব প্রতিভা দীর্ঘদিন যাবৎ মাটিতে সুপ্ত ছিল, এই রহমত-বৃষ্টির এক ছিটা সেগুলিকে প্রস্ফুটিত করে তুলবে।— বস্তুত আল্লাহ তাআলা (সর্বাধিক কল্যাণকর আধ্যাত্মিক বৃষ্টি) রেসালাতে মুহাম্মদীর দ্বারা এ দীপ্তি দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের প্রদেশের এক প্রাজ্ঞ কবি কত সুন্দরই না বলেছেন-

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر ÷ ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر

ہے یہ وہ نام ارض کو کردے سما ابھار کر ÷ اکبر اسی کا وِرد تو صدق سے بے شمار کر

صل علی محمد صل علی محمد

'এ তো সেই নাম, যা মাটিকে পাক করে পরিষ্কার করে। এ তো সেই নাম, যা কাঁটাকে ফুল বানায় পরিশুদ্ধ করে।

এ তো সেই নাম, যা পাতালকে আকাশে পরিণত করে উত্থিত করে। আকবর, তুমি এই নামের বেশুমার ওযীফা পড় আন্তরিকভাবে, বলো—

আয় আল্লাহ! নবীজী মুহাম্মদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ কর।'

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে মৃত অন্তরগুলিকে আধ্যাত্মিক জীবন দান করবেন, আর কিয়ামতের দিন মৃত লাশগুলিতে পুনর্বার জীবন ঢেলে দেবেন। তাঁর অপার শক্তির সামনে কোন কিছুই কঠিন নয়।

২. অর্থাৎ পূর্বে তারা নিরাশ ছিল। বৃষ্টি এল, শুষ্ক ধরা জীবন্ত হয়ে উঠল। তারা আনন্দ উল্লাস করতে লাগল। অতঃপর আমি যদি এমন (আগ্নেয়) বাতাস প্রবাহিত করি, যাতে ফসল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়, তবে এই লোকেরা তখনি অন্য রকম হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলার সকল অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে।

মোটকথা, তাদের কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতা সবই পার্থিব স্বার্থ ও লাভের অনুগত। তাই আয়াতে সতর্ক করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে সফল হলে নির্ভয় হওয়া উচিত নয়। তাঁর কুদরত বিভিন্নমুখী। বলা যায় না, প্রদত্ত নে'য়ামত কখন তিনি ছিনিয়ে নেন। আর সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর দীন জীবন্ত ও শস্য-শ্যামল (বিজয়ী) হওয়ার পর প্রতিকূল দমকা বাতাসে যদি শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়ে যায়, তখন হতাশ হয়ে হিম্মতহারা হওয়া উচিত নয়।

৫২. আপনি তো মৃতদের শোনাতে পারবেন না এবং বধিরদেরও শোনাতে পারবেন না আহ্বান, যখন ওরা পিছন ফিরে চলে যায়।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর আপনি অন্ধদেরও ওদের ভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবেন না। আপনি তো কেবল তাদের শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। অতঃপর তারা অনুগত হয়ে যায়[১]।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন। আপনার এ শক্তি নেই যে, মৃতদের আপনার কথা মানাবেন বা বধিরকে শুনাবেন বা অন্ধকে দেখাবেন, বিশেষত যখন তারা শোনার ও দেখার ইচ্ছাই না করে। সুতরাং আপনি ওদের কুফর ও অকৃতজ্ঞতায় বিষণ্ন-দুঃখিত হবেন না। আপনি শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালন করুন। কোন হতভাগা না মানলে আপনার ক্ষতি কী? আপনার কথা তারাই শুনবে, যারা আমার বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে বশ্যতা ও আনুগত্য গ্রহণ করে নেয়।

এ ধরনেরই আয়াত সূরা 'নামল'এর শেষের দিকে (আয়াত ৮১) রয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

'মৃতরা শুনতে পায় কি না' বিষয়ে একটি মৌলিক আলোচনা

মুফাসসিরগণ এখানে 'মৃতরা শুনতে পায় কি না'– এ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন। বস্তুত এই বিষয়ে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সময় থেকে মতভেদ চলে এসেছে এবং উভয় পক্ষ থেকে কুরআন ও হাদীছের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় বুঝে নেওয়া উচিত— দুনিয়াতে যদিও কোন কাজই আল্লাহর ইচ্ছা ও এরাদা ছাড়া হতে পারে না, তবু মানুষ যে কাজ সাধারণ উপায়-উপকরণের সীমার ভিতরে থেকে নিজ ইচ্ছায় করে, তা সে করেছে বলে অভিহিত হয়। আর যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয়, তা সরাসরি আল্লাহ তাআলার কার্য বলে ব্যক্ত করা হয়। যেমন: কেউ বন্দুকের গুলিতে কাউকে হত্যা করল, তাহলে এ কাজটি হত্যাকারীর বলে ধরা হবে। আর ধরুন, এক মুষ্টি কাঁকর নিক্ষেপে একটি সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল– তখন বলা হবে যে, আল্লাহ নিজ কুদরতে ধ্বংস করেছেন। অথচ গুলিতে হত্যার ক্ষেত্রেও আল্লাহর কুদরতই কাজ করেছে, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গুলির কোনই কার্যকারিতা নেই। কুরআনে করীমের এক স্থানে বলা হয়েছে- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ رَمَىٰ ('বস্তুত তোমরা ওদের হত্যা করনি; বরং আল্লাহ ওদের হত্যা করেছেন এবং আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন; বরং আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছিলেন।' –আনফাল, আয়াত ১৭)। এখানে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে قتل ও رمى কে পয়গম্বর ও মুসলমানদের নয়, বরং সরাসরি আল্লাহর কার্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

[রুকূ - ৬]

৫৪. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, তারপর দুর্বলতার পরে শক্তি দান করেন, অনন্তর শক্তির পরে দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান[১]।

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾

ঠিক এর আলোকে إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى এর অর্থ বুঝে নিন। অর্থাৎ তোমরা কিছু বলবে এবং মৃতকে তোমাদের আওয়াজ শুনিয়ে ফেলবে— সাধারণভাবে এ সম্ভব নয়। কারণ, এটি সাধারণ নিয়ম ও বাহ্যিক উপকরণের ব্যতিক্রম। অবশ্য আল্লাহ তাআলার কুদরতে বাহ্যিক উপকরণের খেলাফ তোমাদের কোন কথা মৃত শুনতে পারে– এ কথা কোনো মুমিন অস্বীকার করতে পারে না। এখন কুরআন-হাদীছের দ্বারা যেসব ক্ষেত্রে এ অস্বাভাবিক নিয়মে মৃত ব্যক্তির শোনা প্রমাণিত হবে, সেসব ক্ষেত্রে আমরা মৃতদের শোনার কথা বলব। কিন্তু একে এসব ক্ষেত্রের সাথেই সীমাবদ্ধ রাখব। শুধু কিয়াস করে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা মানুষের কথা শুনে বলে দাবি করা যাবে না।

মোদ্দাকথা, আয়াতে 'তুমি মৃতদের শোনাতে পার না'— বলার দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কখনই শুনতে পারে না। বরং যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তখন তারা শোনে।

১. অর্থাৎ শিশু জন্মলগ্নে অত্যন্ত দুর্বল ও অক্ষম হয়। তারপর ধীরে ধীরে শক্তি আসে এবং যৌবনে পদার্পণ করলে তার শক্তি-সামর্থ্য পূর্ণতা লাভ করে। তখন সমস্ত শক্তি পরিণত অবস্থায় থাকে। তারপর বয়স পড়তে শুরু করে এবং শক্তি-সামর্থ্যের পরে আবার দুর্বলতার লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে। যার শেষ পর্যায় হচ্ছে বার্ধক্য, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ে এবং শক্তি-সামর্থ্য অকেজো হয়ে যায়।

শক্তি ও দুর্বলতার এসব উত্থান-পতন আল্লাহরই হাতে। তিনি যেভাবে চান, কোন কিছু সৃষ্টি করেন এবং তাকে শক্তি ও দুর্বলতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করান। তিনিই শক্তিশালী এবং তিনিই জানেন, কোন্ জিনিসকে কোন্ সময় পর্যন্ত কী কী অবস্থায় রাখা সমীচীন। সুতরাং আমাদের সেই আল্লাহর এবং তাঁর পয়গম্বরদের কথাই মানা উচিত।

সম্ভবত আয়াতে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, দুর্বলতার পরে তোমাদের যেমন বল ও শক্তি দিয়েছেন, তদ্রূপ মুসলমানদেরও দুর্বলতার পর শক্তি দান করবেন এবং যে দীন এখন বাহ্যত দুর্বল দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন পর তা শক্তি লাভ করবে এবং উন্নতি ও যৌবনে পদার্পণ করবে। অতঃপর হতে পারে, পুনরায় মুসলমানদের দুর্বলতার একটি সময় আসবে।

অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে, মহাশক্তিশালী ও সক্ষম আল্লাহ সর্বদা দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিবর্তিত করতে পারেন। হাঁ, এমনটি করার বিশেষ উপায় ও কারণ থাকে। والله أعلم

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খাবে যে, 'ওরা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি[১]।' এভাবেই ওরা (দুনিয়াতেও) মিথ্যা বলত[২]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যাদের ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, 'তোমরা তো আল্লাহর কিতাবের লেখা অনুযায়ী পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই তো পুনরুত্থানের দিন। কিন্তু তোমরা জানতে না[৩]।'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেদিন অপরাধীদের ওজর-আপত্তি ওদের কোন কাজে আসবে না এবং ওদের এও বলা হবে না যে, (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট কর[৪]।

---

১. অর্থাৎ তখন কবরের বা দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্পকালীন মনে হবে। যখন বিপদ শিয়রে দেখতে পাবে, তখন বলবে, আফসোস! অতি তাড়াতাড়ি দুনিয়ার ও বরযখের জীবন শেষ হয়ে গেল। এই মর্মন্তুদ আযাব থেকে আরো কিছু দিন বেঁচে থাকার অবকাশ পেলাম না। অথবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে যদি আরো অধিক সময় থাকার সুযোগ হত, তবে এ দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতাম। এখন তো দেখি, মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত এসে গেল আর বিপদের সম্মুখীন হয়ে গেলাম।

২. অর্থাৎ এখন যেমন মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা বলছে, দুনিয়াতেও তারা ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা পোষণ করত এবং উল্টা-পালটা কথা বলতে থাকত।

৩. অর্থাৎ মুমিনগণ ও ফেরেশতারা ওদের কথা খণ্ডন করে বলবে, তোমরা যে বলছ, কবরে বা দুনিয়াতে এক মুহূর্তের অধিক থাকনি– এটা তোমাদের মিথ্যা ধারণা বা প্রতারণামাত্র। তোমরা ঠিক আল্লাহর জ্ঞান, তাঁর সংবাদ ও লওহে মাহফূজের লেখা অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্ত থেকেছ, এক মিনিটও কম হয়নি। আজ ঠিক ওয়াদা অনুসারে সেই দিন এসে গেছে। এখন তা দেখে নাও, যা তোমরা জানতে না ও মানতে না। যদি আগে থেকে এ দিনকে বিশ্বাস করতে, তবে প্রস্তুত হয়ে আসতে এবং এখানকার আনন্দ-খুশী দেখে বলতে, এই দিন আসতে খুব দেরি হল, অনেক অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষার পর আসল, যেমন মুমিনরা বলে থাকে।

৪. অর্থাৎ কাজে আসার মত কোন যুক্তিসংগত ওযর-আপত্তি পেশ করতে পারবে না। ওদের এ কথাও বলা হবে না যে, আচ্ছা, এখন তওবা ও আনুগত্য দ্বারা নিজ রবকে রাজী করে নাও। কেননা, এর সময় চলে গেছে, এখন অনন্ত শাস্তি ভোগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

৫৮. নিশ্চয় আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু ওদের নিকট আপনি কোনো আয়াত নিয়ে আসলে কাফেররা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো মিথ্যা রচনাকারী[১]।'

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۭ وَلَىِٕنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝

৫৯. এভাবেই আল্লাহ যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না ওদের অন্তর মোহর করে দেন[২]।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬০. অতএব আপনি ধৈর্য ধরুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা বিশ্বাস করে না, তারা যেন আপনাকে কিছুতেই বিচলিত করতে না পারে[৩]।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ ওরা তখন (আখেরাতে) আক্ষেপ করবে, অথচ আজ আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার সুযোগ রয়েছে। পবিত্র কুরআন কীরূপ আশ্চর্য উপমা-উদাহরণ ও দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করে ওদের নানাভাবে বোঝাচ্ছে; কিন্তু কোন কথাই ওদের বুঝে আসছে না। ফলে, যতই চমকপ্রদ আয়াতসমূহ ওদের পড়ে শোনান অথবা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর অলৌকিকতা দেখান, ওরা শুনে ও দেখে এ কথাই বলে দেয় যে, তোমরা (পয়গম্বর ও মুসলমানরা) সকলে মিলে মিথ্যা রচনা করে এনেছ। একজন কতিপয় আয়াত রচনা করেছে, অন্যেরা সমর্থন দিয়েছে; একজন যাদু দেখিয়েছে, অন্যেরা তার প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে গেছ। এভাবে পরস্পর শলা-পরামর্শ করে তোমরা নিজেদের ধর্মকে প্রচার-প্রসার করতে চাচ্ছ।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না এবং অবাধ্যতা ও হঠকারিতা বশে প্রত্যেক কথাই অস্বীকার করতে থাকে— ক্রমান্বয়ে ওর অন্তরে মোহর লেগে যায় এবং শেষ পর্যন্ত হঠকারিতা ও শত্রুতার কারণে অন্তর এতটা শক্ত হয়ে যায় যে, সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতাই বিনষ্ট হয়ে যায়। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অর্থাৎ এ হতভাগাদের জিদ ও শত্রুতার অবস্থা যখন এতদূর পৌঁছে গেছে, সুতরাং আপনি এদের কার্যকলাপে দুঃখিত হবেন না, বরং পয়গম্বরসুলভ ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে নিজ দাওয়াত ও সংস্কারের কাজে ব্যাপৃত থাকুন। আল্লাহ আপনার সঙ্গে সাহায্য ও বিজয়ের যে ওয়াদা করেছেন, তা তিনি নিশ্চিত পূর্ণ করবেন, এতে বিন্দুমাত্রও বেশকম হতে পারে না। আপনি নিজ কাজে জমে থাকুন। এই ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসী লোকেরা আপনাকে আপনার স্থান থেকে একটুও বিচলিত করতে পারবে না।

সূরা লুকমান

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৩১ । ৩৪ আয়াত । ৪ রুকূ । মক্কী

آياتها ٣٤، ركوعاتها ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

২. এগুলি পরিপক্ক* কিতাবের আয়াত;

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ③

৩. যা হেদায়াত ও রহমত সৎকর্মশীলদের জন্য[১]—

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④

৪. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤

৫. তারাই আপন রবের পক্ষ থেকে (আগত) হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই সফলকাম[২]।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑥

৬. মানুষের মধ্যে কেউ এমন, যে খেল-তামাশার কথা ক্রয় করে, যাতে (মানুষকে) না জেনে-বুঝে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে এবং আল্লাহর পথকে হাসি-তামাশার বস্তু বানাতে পারে। এমন লোকদের জন্যই রয়েছে অপমানকর শাস্তি[৩]।

---

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'জ্ঞানগর্ভ

১. অর্থাৎ এ কিতাব বিশেষভাবে নেক মানুষদের জন্য রহমত ও হেদায়াতের ভাণ্ডার। কেননা, তারাই এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে। অন্যথায় ব্যাপকভাবে বললে, এ কিতাব তো সমগ্র মানব ও জিন জাতির জন্য হেদায়াত ও রহমতস্বরূপ এসেছে।

২. সূরা বাকারার শুরুতেও এ ধরনের আয়াত রয়েছে– সেখানকার তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৩. সফল ও সৌভাগ্যশালীদের বিপরীতে এখানে সেই হতভাগাদের আলোচনা হচ্ছে, যারা নিজেদের মূর্খতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে কুরআন কারীমকে ছেড়ে নাচগান, খেল-তামাশা বা অন্যান্য নিরর্থক বিষয় ও বেহুদা কাজকর্মে লিপ্ত এবং তারা অন্যদেরও এ ধরনের

রং-তামাশা ও আনন্দ-ফুর্তিতে মাতিয়ে রেখে আল্লাহর দীন ও তাঁর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেওয়ার চেষ্টায় রত। সেই সংগে তারা দীনের বিষয়াদি সম্পর্কে খুব হাসি-বিদ্রূপও করে।

হযরত হাসান বসরী (র) لهو الحديث এর ব্যাখ্যায় বলেন– كل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها (روح المعاني) (অর্থাৎ لهو الحديث প্রত্যেক ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যথাঃ নিরর্থক গল্প-সল্প, হাসি-ঠাট্টার কথাবার্তা, অহেতুক কাজকাম ও গানবাজনা প্রভৃতি)।

একটি বর্ণনা

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, কাফের-সর্দার নযর বিন হারিছ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে পারস্যে যেত এবং সেখান থেকে অনারব রাজা-বাদশাহর কাহিনী ও ইতিহাস সম্বলিত বই-পুস্তক কিনে আনত এবং কুরায়শদের বলত, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের 'আদ' ও 'ছামূদ' জাতির গল্প শোনান। আস! আমি তোমাদের রুস্তম, ইসফানদিয়ার ও পারস্য সম্রাটদের কাহিনী শোনাই। কতক লোক এগুলোতে আনন্দ পেয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হত। অধিকন্তু সে একটা গায়িকা দাসী খরিদ করেছিল, যাকে সে এমন ব্যক্তির নিকট নিয়ে যেত, যার মন নরম হয়ে ইসলামের প্রতি ঝুঁকেছে। তাকে সে আপ্যায়ন করাত ও গান শুনিয়ে আনন্দ দান করত। অতঃপর তাকে বলত– দেখ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেদিকে ডাকছে অর্থাৎ নামায পড়, রোযা রাখ এবং প্রাণ বিসর্জন দাও– এসব থেকে এটা কি শ্রেয় নয়? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়।

(তাফসীরে বাগাবী ৩/৪৮৯; আদ্ দুররুল মানসূর ৫/১৫৯– وفي الإسناد نظر)

খেলা-ধুলা ও গান-সামা'-এর হুকুম

আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনাকেন্দ্রিক হলেও তাতে বর্ণিত বিধান ব্যাপক এবং এ জাতীয় সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যে খেল-তামাশা দীনে ইসলাম থেকে সরে যাওয়ার বা সরিয়ে দেওয়ার কারণ, তা হারাম বরং কুফর। আর যা শরী'য়তের জরুরী আহকাম থেকে বিরত রাখে বা গোনাহর কারণ হয়, তা গোনাহ। হাঁ, যে খেলা-ধুলা কোন ওয়াজিব হুকুমের বিনষ্টকারী নয়, আবার কোন শরী'য়তসম্মত উদ্দেশ্য বা ফায়দাও তাতে লাভ হয় না, তা মুবাহ– কিন্তু অর্থহীন হওয়ার কারণে অনুত্তম।

তবে ঘোড় দৌড়, তীর ও বন্দুক চালনার অনুশীলন ও স্বামী-স্ত্রীর (শরী'য়তের সীমাধীন) আনন্দ-স্ফূর্তি– এসব শরী'য়তসম্মত বিভিন্ন স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও কল্যাণসংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে নাজায়েয খেলা-ধুলার অন্তর্ভূক্ত নয়। রইল গান ও (سماع) 'সামা'-এর মাসআলা, এর বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ প্রভৃতির কিতাবে দ্রষ্টব্য। বাদ্য ও বাজনা হারাম হওয়া সম্পর্কে বুখারী শরীফে হাদীস রয়েছে। অবশ্য শুধু গানকে (যা সর্বপ্রকার বাদ্য-বাজনা ও নাজায়েয কথা থেকে পাক) এক পর্যায় পর্যন্ত মুবাহ বলা হয়। তবে এর জন্য যে শর্তাবলী ও সীমা-রেখা রয়েছে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট কিতাবাদিতে দেখে নেওয়া উচিত। 'রূহুল মা'আনী'-এর লেখক আলোচ্য আয়াতের অধীনে গান ও 'সামা'র মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তা দ্রষ্টব্য।

৭. আর যখন ওকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন তা শুনেইনি, যেন ওর দুটা কানই বধির[১]। অতএব ওকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑦

৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে নে'য়ামতের উদ্যানরাজি,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ⑧

৯. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। এ আল্লাহর সত্য ওয়াদা। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨

১০. তিনি আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন– তোমরা দেখতে পাও এমন স্তম্ভ ছাড়াই।[৩] এবং পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে*[৪] এবং তাতে সব রকমের জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর পৃথিবীতে উৎপন্ন

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا

---

১. অর্থাৎ বড়াই ও অহংকারের কারণে আমার আয়াতসমূহ শুনতে চায় না, একেবারে বধির হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ কোন শক্তি তাঁকে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে বিরত করতে পারে না। আর তিনি কারো সঙ্গে অসংগত ওয়াদাও করেন না।

৩. এর তাফসীর সূরা 'রাদ' এর শুরুতে লেখা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আন্দোলিত না হয়'।

৪. অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গমালা, বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে পৃথিবী যেন আন্দোলিত না হয় এবং হেলে না পড়ে, সেজন্য তাতে বড় বড় পাহাড় স্থাপন করেছেন। সূরা 'নাহ্ল' এর শুরুর দিকে (আয়াত ১৫) এ বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

অবশ্য পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি-রহস্য এতেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ফায়দা ও হেকমতও থাকবে, যা আল্লাহর জানা আছে।

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

করেছি সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ[১]।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِيْ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১১. এসব আল্লাহর সৃষ্টি। এখন আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে[২]? (কিছুই না), বস্তুত জালেমরা স্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে[৩]।

[রুকূ - ২]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ

১২. নিশ্চয় আমি লুকমানকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা[৪] (এবং বলেছিলাম), 'আল্লাহর শোকর

---

১. অর্থাৎ সব রকমের সুন্দর, সুদৃশ্য ও উপকারী গাছপালা মাটি থেকে উৎপন্ন করেছেন। সূরা 'শু'আরা'-এর শুরুতে (আয়াত ৭) এ বিষয়ক আয়াত গত হয়েছে।

২. যখন দেখাতে পারবে না, তখন কোন্ যুক্তিতে ওদেরকে প্রভুত্বের অংশীদার ও উপাস্য হওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত করছ? উপাস্য তো তিনিই হতে পারেন, যাঁর ক্ষমতায় সৃষ্টি করা ও রিযিক দান করা সব কিছুই থাকবে। ওদের তো একটি তুচ্ছ পদার্থও সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই।

৩. অর্থাৎ চিন্তা করা ও বোঝার প্রতি এ জালেমদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, এরা অন্ধকারে পড়ে আছে।

সম্মুখে শিরক ও পাপাচারের কদর্যতা প্রকাশের জন্য হযরত লুকমানের নসীহত উল্লেখ করা হচ্ছে, যা তিনি আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানবত্তার আলোকে নিজ পুত্রকে করেছিলেন।

৪. **হযরত লুকমানের পরিচয় এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশমালা**

অধিকাংশ আলেমদের মত এই যে, হযরত লুকমান পয়গম্বর ছিলেন না। হাঁ, তিনি একজন পাক-পবিত্র, মুত্তাকী-পরহেজগার মানুষ ছিলেন, যাঁকে আল্লাহ তাআলা উচ্চমানের বোধ-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও জ্ঞানবত্তা দান করেছিলেন। তিনি আপন প্রজ্ঞাবলে এমনসব বিষয় পেশ করেন, যা পয়গম্বরদের আহকাম ও হেদায়াতের অনুকূল ছিল। তাঁর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও হেকমতের কথাবার্তা মানব সমাজে বিশেষভাবে খ্যাত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা সেগুলির একাংশ পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত করে তাঁর মর্তবা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এসব উপদেশ উদ্ধৃত করে সম্ভবত এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, শিরক প্রভৃতির ঘৃণ্যতা যেমন মানব-স্বভাবের সাক্ষ্য এবং নবীদের ওহী দ্বারা প্রমাণিত, তদ্রূপ দুনিয়ার সেরা জ্ঞানী-গুণীরাও নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এর সত্যায়ন ও সমর্থন করে এসেছেন। অতএব তাওহীদ ছেড়ে শিরক অবলম্বন করা সুস্পষ্ট গোমরাহী নয় তো আর কী?

لِلّٰهِ ؕ وَمَنۡ یَّشۡکُرۡ فَاِنَّمَا یَشۡکُرُ لِنَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ کَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیۡدٌ ﴿۱۲﴾

কর। যে শোকর করবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই শোকর করবে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে, আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার উপযুক্ত[১]।

وَاِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَهُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشۡرِکۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرۡکَ لَظُلۡمٌ عَظِیۡمٌ ﴿۱۳﴾

১৩. (স্মরণ কর), যখন লুকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দান করত বলেছিলেন, 'ওহে আমার বৎস! আল্লাহর সাথে শির্ক করো না[২]। নিশ্চয় শির্ক ভয়াবহ জুলুম[৩]।'

বি. দ্র. হযরত লুকমান কোথাকার বাসিন্দা এবং কোন কালের মানুষ, এর সঠিক তথ্য পূর্ণরূপে জানা যায়নি। অধিকাংশের মতে তিনি হাবশী ছিলেন এবং হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আমলের মানুষ ছিলেন। তাঁর বহু উক্তি ও কাহিনী তাফসীরের কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। فالله اعلم

১. অর্থাৎ এই বিরাট অনুগ্রহ (হিকমতপ্রাপ্তি) এবং অপরাপর অনুগ্রহের জন্য প্রকৃত অনুগ্রহকারী আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং তাঁর হক (অধিকার) স্বীকার করা উচিত। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, শোকর-গোযারী দ্বারা আল্লাহর কোন উপকার হয় না। যা কিছু উপকার, তা যে ব্যক্তি শোকর করে তারই হয়। কারণ, এর দ্বারা সে ব্যক্তি দুনিয়াতে আরো বেশি নে'য়ামত এবং আখেরাতে ছওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী সাব্যস্ত হয়। আর না-শোকরী করলে নিজেরই ক্ষতি, তার শুকরিয়ায় আল্লাহ তাআলার কী আসে যায়? সমগ্র সৃষ্টিজগত তো মৌন ভাষায় তাঁর প্রশংসা ও গুণগান করছেই। অসম্ভব হলেও ধরা হোক, যদি তাঁর প্রশংসাকারী কেউ না হয়, তবু সকল গুণাবলীর অধিকারী এবং সমস্ত পূর্ণতার উৎস হওয়ার কারণে তিনি নিজেই প্রশংসনীয়। কারো প্রশংসা ও শোকর করায় বা না করায় তাঁর মহান গুণাবলীতে বিন্দু পরিমাণ কম বা বেশি হয় না।

২. পুত্র মুশরিক হয়ে থাকলে তাকে বুঝিয়ে পথে আনতে চাচ্ছিলেন। আর তাওহীদবাদী হয়ে থাকলে তাকে তাওহীদের বিষয়ে খুব পরিপক্ক করতে এবং (তাওহীদের উপর) অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে এ নসীহত করেছিলেন। পুত্র মুশরিক ছিল, না তাওহীদবাদী– তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই।

৩. একজন অক্ষম সৃষ্টিকে একচ্ছত্র স্রষ্টার আসনে সমাসীন করার চেয়ে বড় অন্যায়-অবিচার কী হতে পারে? এমনিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিজীব হয়ে নিকৃষ্টতম বস্তুর সম্মুখে পূজার উদ্দেশ্যে মাথা নত করে দেওয়ার চেয়ে বড় বোকামী ও নিজ প্রাণের উপর বড় জুলুম আর কী হতে পারে?

১৪. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে জোর নির্দেশ দিয়েছি —তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে— এই নির্দেশ যে, 'তুমি আমার প্রতি ও নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে[১]।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝

১৫. 'আর যদি তারা তোমাকে চাপ দেয় এমন বস্তুকে আমার শরীক সাব্যস্ত করতে, যার সম্পর্কে তোমার জানা নেই, তাহলে তাদের কথা মানবে না[২]। তবে দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে থাকবে[৩]। আর ঐ ব্যক্তির পথ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ

১. বোঝা গেল, মায়ের হক বাপের চেয়েও বেশি। কেননা তিনি কয়েক মাস ধরে সন্তানের ভার পেটে বহন করেছেন। তারপর প্রসবের পর দুই বছর পর্যন্ত দুগ্ধ পান করিয়েছেন। এ সময়ের মধ্যে আরও কত রকম কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে শিশুকে লালন-পালন করেছেন। নিজ আরাম তার আরামের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন।

সেজন্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, সে যেন প্রথমত আল্লাহ তাআলার এবং দ্বিতীয়ত মাতাপিতার, বিশেষত মায়ের হক সম্বন্ধে সচেতন হয়। অর্থাৎ, সে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্যে যথাসম্ভব রত থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহর নাফরমানী হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলার হকই অগ্রগণ্য এবং তাঁরই সামনে সকলকে হাযির হতে হবে। মানুষের মনে মনে চিন্তা করা উচিত, কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর নিকট যাব।

বি. দ্র. দুগ্ধপানের বয়স যে এখানে দুই বছর বলা হয়েছে, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্র ও সাধারণ নিয়ম হিসাবে (কোন ক্ষেত্রে এর আগে দুধ ছাড়ানো হলে তারও অবকাশ আছে)। আর ইমাম আবু হানীফা (র) যে বেশির পক্ষে আড়াই বছর বলেন, তো তাঁর নিকট অন্য কোনো দলীল থেকে থাকবে। তবে অধিকাংশ ইমামদের নিকট দুগ্ধপানের সর্বোচ্চ সময় দু' বছরই। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব লেখেন, 'যার বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তাকে শরীক মেনো না– অর্থাৎ সন্দেহের ক্ষেত্রে মেনো না, আর নিশ্চিতরূপে সত্য জানা থাকলে শরীক মানার তো প্রশ্নই আসে না।'

৩. অর্থাৎ দীন–ধর্মের বিরুদ্ধে মাতাপিতার কথা মেনো না, তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে থাক।

এ ধরনের আয়াত সূরা 'আনকাবূতে' (আয়াত ৮) গত হয়েছে– সেখানকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

অনুসরণ করবে, যে আমার অভিমুখী হয়েছে[১]। অতঃপর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে তোমরা যা করতে তা জানিয়ে দেব[২]।'

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

১৬. 'আমার বৎস হে! যদি কোন বস্তু সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা থাকে কোন পাথরের মধ্যে অথবা আকাশমণ্ডলীতে বা পৃথিবীতে— আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবগত[৩]।

---

১. অর্থাৎ পয়গম্বরদের ও মুখলিস (খাঁটি) বান্দাদের পথে চল এবং দীনের খেলাফ পিতা-মাতার অনুসরণ বা আনুগত্য করো না।

২. সুতরাং আল্লাহর নিকট পৌছে পিতা-মাতা ও সন্তানসন্ততি সকলেরই জানা হয়ে যাবে, কার বাড়াবাড়ি বা অন্যায় ছিল।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

বি. দ্র. وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ থেকে এখান পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কথা। প্রথমে পুত্রের প্রতি লুকমানের নসীহত উল্লেখ করা হয়েছে এবং সম্মুখেও يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ الخ থেকে উক্ত নসীহতেরই ধারা চলেছে। মাঝে আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে একটি জরুরী সতর্কবাণী ইরশাদ ফরমালেন– অর্থাৎ শিরক এতই কদর্য বস্তু যে, মাতা-পিতা বাধ্য করলেও তা অবলম্বন করা যাবে না।

পিতা-মাতার হকের গুরুত্ব

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'লুকমান পুত্রকে পিতার হকের কথা বলেননি। কারণ, তাতে নিজ স্বার্থ বোঝা যেত। আল্লাহ তাআলা তাওহীদ সম্বন্ধে নসীহত করার পরে এবং অন্যান্য নসীহতের পূর্বে মাতাপিতার হকের কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহর হকের পরই মাতাপিতার হক। পিতা আল্লাহর হকের কথা বললেন, আর আল্লাহ পিতার হকের কথা বললেন। আর পয়গম্বর বা মুর্শিদ ও পথপ্রদর্শকের হকও আল্লাহর হকের অধীনে বুঝতে হবে। কেননা, তাঁরা আল্লাহরই প্রতিনিধি হয়ে থাকেন।

৩. অর্থাৎ কোন বস্তু বা কোন আমল, ভাল বা মন্দ, যদি সরিষাদানার বরাবর ছোটও হয় এবং মনে কর, তা যদি কোন কঠিন শিলার ভিতর অথবা আকাশের উচ্চতায় অথবা মাটির তলদেশের অন্ধকারেও পড়ে থাকে— তবু আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে তা গোপন থাকতে পারে না। যখন সময় আসবে, তখন সেখান থেকে এনে হাযির করবেন। অতএব আমল করার সময় মানুষের এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হাজার পর্দার অন্তরালেও যে কাজ করা

১৭. 'হে আমার বৎস! নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অসৎকাজ নিষেধ কর[১] এবং তোমার উপর যে আপদ পতিত হয় তা সহ্য কর। নিশ্চয় এসব বড় হিম্মতের কাজ[২]।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ⑰

১৮. 'আর অহংকারবশত মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না[৩] এবং পৃথিবীতে দম্ভ করে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে পছন্দ করেন না[৪]।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ⑱

১৯. 'আর চলাফেরায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু রাখ। নিশ্চয় সবচেয়ে অপ্রীতিকর আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ'[৫]।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ⑲

হবে, তাও আল্লাহর সামনে হাযির। এ কারণেই ভাল বা মন্দ আমল যতই গোপনে করা হোক না কেন, তার ফলাফল অবশ্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা চক্ষুষ্মানেরা অনায়াসে অনুভব করতে পারেন।

১. অর্থাৎ নিজে আল্লাহর একত্ববাদ ও বন্দেগীর উপর কায়েম থাক। সেই সাথে অন্যদেরও নসীহত কর, যেন সৎকর্ম করতে শেখে এবং মন্দকর্ম থেকে বিরত থাকে।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, তাতে সবর কর। বিশেষত সৎকর্মের আদেশ এবং মন্দকর্মে বাধাদানের পথে কষ্ট ও জুলুম-নিপীড়ন সহ্য কর এবং তা সৎসাহসের সাথে বরদাশত কর। কেননা, বিপদাপদে অধৈর্য হয়ে হিম্মতহারা হওয়া উন্নতমনা বাহাদুরদের কাজ নয়।

৩. অর্থাৎ আত্মগরিমা দেখিয়ো না এবং লোকদের হেয় মনে করে অহংকারীদের ন্যায় কথা বলো না, বরং হাসিমুখে কথা বল।

৪. দর্পভরে চলা ও বড়াই করায় মানুষের মর্যাদা কিছুই বাড়ে না, বরং সে হেয় ও নীচ হয়ে যায়। সামনে না হোক, পিছনে লোকে তাকে মন্দ বলে।

৫. অর্থাৎ বিনয়, গাম্ভীর্য ও ভারসাম্যপূর্ণ চলন অবলম্বন কর। বিনা প্রয়োজনে কথা বলো না, কথা বলার সময় সীমাতিরিক্ত জোরে কথা বলো না। জোরে কথা বলায় কৃতিত্ব থাকলে গাধার আওয়াজ সম্বন্ধে চিন্তা কর, সে কত জোরে শব্দ করে। অথচ তার আওয়াজ কত শ্রুতিকটু ও কর্কশ। অনেক জোরে বললে মানুষের আওয়াজও অনেক সময় শ্রুতিকটু ও বিকৃত হয়ে যায়।

[রুকূ - ৩]

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

২০. তোমরা কি লক্ষ করনি যে, আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ সবকিছুকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন[১] এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নে'য়ামতসমূহ পূর্ণ করে দিয়েছেন[২]? কিন্তু মানুষের মধ্যে কতক এমনো আছে, যারা আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে কোন ধরনের জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্তর্দৃষ্টি ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই[৩]।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

এখানে এসে হযরত লুকমানের কালাম সমাপ্ত হল। পরের আয়াত থেকে পুনরায় আসল বিষয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে– অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁর অনুগ্রহ ও নে'য়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে তাওহীদ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

১. অর্থাৎ তিনি আসমান ও যমীনের সবকিছুকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা আল্লাহর কাজে নিয়োজিত হও না কেন?

২. প্রকাশ্য নে'য়ামত হচ্ছে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা যা অনায়াসে বুঝে আসে। অপ্রকাশ্য নে'য়ামত হচ্ছে যা আকল-বুদ্ধি, চিন্তা-ফিকির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। অথবা জাহেরী নে'য়ামত দ্বারা বস্তুগত ও জাগতিক নে'য়ামত উদ্দেশ্য, আর বাতেনী নে'য়ামত দ্বারা আধ্যাত্মিক ও পরকালীন নে'য়ামত উদ্দেশ্য, যথা: পয়গম্বর প্রেরণ, কিতাব অবতারণ, সৎকর্মের তাওফীক প্রদান— এ সবই বাতেনী নে'য়ামতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. অর্থাৎ এরূপ প্রকাশ্য নে'য়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করেও কতক লোক চোখ বন্ধ করে আল্লাহর একত্ববাদ বা তাঁর মান-মর্যাদা ও গুণাবলি কিংবা তাঁর বিধিবিধান সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে, তাও আবার বিনা প্রমাণে। ওদের নিকট না আছে কোন জ্ঞানগত ও বুদ্ধিগত মূলনীতি, না আছে কোন প্রকৃত হেদায়াতকারীর হেদায়াত, আর না আছে কোন প্রামাণ্য ও উজ্জ্বল কিতাবের বরাত (বা Reference)– আছে শুধু বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ। পরবর্তী আয়াতে এরই উল্লেখ রয়েছে।

علم وهدى -এর ব্যাখ্যা

আয়াতের যে অনুবাদ বিজ্ঞ অনুবাদক হযরত শাইখুল হিন্দ (র) করেছেন, তা থেকে মনে হয়— খুব সম্ভব তিনি علم দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন 'সাধারণ জ্ঞান দ্বারা কিছু বোঝা' এবং "هدى" দ্বারা উদ্দেশ্য করছেন এক ধরনের 'অন্তর্দীপন' ও অন্তর্দৃষ্টি, যা সুস্থ রুচিবোধ ও ধীশক্তি এবং আকল ও ফিকিরকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। মর্ম এই

২১. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর,' তখন বলে, 'আমরা বরং তার অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। আচ্ছা, যদি শয়তান সেই পূর্বপুরুষদের দোযখের আযাবের দিকে ডেকে থাকে, তবুও কি (ওদেরই অনুসরণ করবে)[১]?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২২. যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ, নিশ্চয় সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে[২]। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর কাছেই[৩]।

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২৩. আর কেউ কাফের হলে ওর কুফর যেন আপনাকে দুঃখিত না করে। আমার কাছেই ওদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি ওদেরকে ওরা যা-কিছু করেছে তা জানিয়ে দেব। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধেও সম্যক অবগত[৪]।

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

যে, উক্ত লোকগুলির না আছে সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি, না আছে ধীশক্তিসম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি এবং না আছে ওদের নিকট কোন উজ্জ্বল কিতাব বা লিখিত প্রমাণ।

এ অর্থ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমরা আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রথমে উল্লেখ করেছি, তা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে করেছি।

১. অর্থাৎ যদি শয়তান তোমাদের বাপদাদাদের দোযখের দিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবুও কি তোমরা ওদের পিছনেই চলবে? এবং ওরা যেখানে পতিত হবে, তোমরাও সেখানে পতিত হবে?

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে নেকীর রাস্তা অবলম্বন করল এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিল, সে সত্যিই বড় শক্ত রজ্জু আঁকড়ে ধরেছে। যতদিন এ রজ্জু ধরে থাকবে, ততদিন তার পতনের বা হোঁচট খাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি শক্তভাবে উক্ত রজ্জু আঁকড়ে আছে, সে শেষ পর্যন্ত এর সাহায্যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং আল্লাহ তার পরিণাম শুভ ও কল্যাণকর করবেন।

৪. অর্থাৎ আপনি আপন সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জুড়ে রাখুন, কারো অবিশ্বাস ও অস্বীকারের ভয় করবেন না। অবিশ্বাসীদের শেষ পর্যন্ত আমার কাছে আসতে হবে। তখন

২৪. আমি ওদের কিছুকাল জীবনোপভোগের সুযোগ দেব। অতঃপর ওদের টেনে হেঁচড়ে কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাব[১]।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, কে 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[২]।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই। নিশ্চয় আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি অমুখাপেক্ষী, সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত[৩]।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾

ওদের সব কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত করা হবে, কোন অপরাধ আল্লাহর নিকট থেকে গোপন করতে পারবে না। তিনি তো দিলের ভেদ পর্যন্ত জানেন। সবই প্রকাশ করে দেবেন।

১. অর্থাৎ এ অল্প কয়েক দিনের আরাম-আয়েশ ও নিশ্চিন্ততা। সময় শেষ হয়ে গেলেই কঠোর শাস্তির জন্য ধৃত হয়ে আসবে। ওদের ভেগে যাওয়ার সাধ্য আছে কি?

২. অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ! এতটুকু তো তোমরাও স্বীকার কর যে, পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাজ নয়। এরপর আর কোন্ গুণটি এমন, যা তাঁর সত্তার মধ্যে নেই? সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইলম ও হেকমত এবং অপার শক্তি ও কুদরত ছাড়া এসব কিছু সৃষ্টি করা এবং এক বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে পরিচালনা করা কি সম্ভব? আদৌ না। সুতরাং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সমস্ত গুণ-গরিমার সমাবেশ হয়েছে— বাধ্য হয়েই এটি মানতে হবে।

আর এও তাঁরই কুদরতের নিদর্শন যে, তোমাদের ন্যায় অবিশ্বাসীদের মুখে তিনি স্বীয় মহিমা ও কুদরতের কথা স্বীকার করান। যার ফলে তোমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠে যে, যখন তোমাদের নিকট স্রষ্টা একমাত্র তিনিই, তখন অন্যরা উপাস্য কেমন করে হল?

কথা তো অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু অনেক মানুষ অনুধাবন করে না এবং এখানে পৌঁছে থেমে যায়। সামনে আর চিন্তা করে না।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যেমন আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তদ্রূপ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু বিরাজমান, সবই একমাত্র তাঁরই সৃষ্টি ও মালিকানাধীন এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কেননা, অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি অর্থাৎ সমস্ত গুণ-গরিমার আধার ও উৎস তাঁরই পবিত্র সত্তা, তাঁর কোন গুণই অন্যের কাছ থেকে ধার করা নয়। তিনি সত্তাগতভাবেই সকল মহত্ব-মর্যাদা ও গুণাবলীর মালিক। অতএব তাঁকে অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে কেন?

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۷﴾

২৭. আর পৃথিবীতে যত গাছপালা আছে, তা যদি কলম হয় এবং এই সমুদ্রের সাথে এ ছাড়া আরো সাত সমুদ্র যোগ হয়, (আর সব হয় কালি)— তবুও আল্লাহর (কুদরত, রহমত ও গুণাবলির) কথা শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[১]।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾

২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা একটি প্রাণীকে সৃষ্টি ও পুনর্জীবিত করার মতই[২]। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[৩]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

২৯. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে এবং তিনি সূর্য ও

---

১. অর্থাৎ যদি সমস্ত পৃথিবীর গাছপালা কেটে কলম বানানো হয় এবং বর্তমান সাগর-মহাসাগরসমূহ ও সেই সঙ্গে আরো সাত সমুদ্রের পানি নিয়ে কালি তৈরি করা হয় এবং ধরে নাও, সমস্ত সৃষ্টিকুল নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী লিখতে শুরু করে— তবুও আল্লাহ তাআলার গুণ-গরিমা ও মহিমা-মর্যাদা লিখে শেষ করতে পারবে না। লেখকদের জীবন খতম হয়ে যাবে, কলমসমূহ ঘর্ষণ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাবে, কালি নিঃশেষ হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী লেখা শেষ হবে না। আর সসীম ও নশ্বর শক্তিসমূহের দ্বারা এমন অসীম ও অনন্ত কাজ সমাপ্ত হবেই বা কেমন করে? اللّٰهُمَّ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

২. অর্থাৎ সমগ্র জগত সৃষ্টি করা এবং একটি মানুষ সৃষ্টি করা— আল্লাহ তাআলার পক্ষে উভয়ই সমান। এতে কোন কষ্টও নেই, কোন ক্লান্তিও নেই। একটি মাত্র كن দ্বারা তিনি যা ইচ্ছা করে ফেলতে পারেন। এমনকি, তা كن শব্দ বলার উপরও নির্ভরশীল নয়। এটা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য একটি কথামাত্র, নতুবা আল্লাহ তাআলা কোন কিছুর ইচ্ছা করামাত্রই তা অস্তিত্বে এসে যায়।

৩. অর্থাৎ একটি শব্দ শোনা এবং একই সঙ্গে সমগ্র জগতের সকল শব্দ শোনা, অথবা একটি জিনিস দেখা এবং একই সময় সমগ্র জগতের সকল বস্তু দেখা যেমন তাঁর পক্ষে সমান— ঠিক তদ্রূপ এক ব্যক্তিকে মৃত্যু প্রদান করা ও জীবিত করা এবং সমস্ত জগতের মানুষকে মৃত্যু দান করা ও জীবিত করা তাঁর কুদরতের সামনে এক রকম। অতএব, পুনরায় জীবিত করা এবং একই সঙ্গে পূর্বাপর সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সমস্ত আমলসমূহের পরিপূর্ণ হিসাব-কিতাব গ্রহণ করাও তাঁর জন্য সহজ, এতে কোন অসুবিধা হতে পারে না। কারণ, তিনি আমাদের সকল কথা শোনেন এবং সকল কাজ দেখেন। কোন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয় তাঁর নিকট গোপন নয়।

চন্দ্রকে (তোমাদের) কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে[১]। এবং (এ কথা জান না) যে, তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত[২]?

وَالْقَمَرَ ۡ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾

৩০. এসব এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য (মাবুদ) এবং তাঁর পরিবর্তে ওরা যা কিছুকে ডাকে, সব মিথ্যা[৩]। আর আল্লাহই সমুন্নত, মহান[৪]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾

[রুকূ - ৪]

৩১. তুমি কি দেখ না যে, নৌযানগুলো আল্লাহর নেয়ামত নিয়ে দরিয়ায় বিচরণ করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখান[৫]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ

---

১. 'নির্দিষ্ট কাল' বলতে হয় কিয়ামত উদ্দেশ্য, না হয় চন্দ্র-সূর্যের প্রত্যেকের আবর্তনকাল উদ্দেশ্য। কেননা, একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হওয়ার পর তারা যেন নতুনভাবে আবর্তন আরম্ভ করে।

২. অর্থাৎ যে শক্তি রাতকে দিন এবং দিনকে রাত বানায় এবং চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় বিরাট বিরাট জ্যোতিষ্ককে সামান্য মজুরের মত কাজে লাগিয়ে রেখেছে, সেই শক্তির পক্ষে তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করে দেওয়া কঠিন হবে কেন? আর যেহেতু তিনি ছোট-বড় প্রত্যেক আমল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত, অতএব হিসাব-কিতাবে তাঁর জন্য কোন অসুবিধা নেই।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এসব মহিমা-মর্যাদা ও অন্যান্য গুণাবলি এজন্য উল্লেখিত হয়েছে, যাতে শ্রোতারা বুঝে নেয় যে, এক আল্লাহকে মানা এবং একমাত্র তাঁর ইবাদত করাই সঠিক পথ। এর পরিপন্থী যা কিছু বলা হবে কিংবা করা হবে, তা সবই বাতিল ও মিথ্যা।

অথবা আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলার— واجب الوجود ও موجود بالذات (অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বে সদা অস্তিত্বমান) হওয়া এবং অন্যদের বাতিল ও নশ্বর হওয়াই প্রমাণ করে যে, উক্ত মহিমা-মর্যাদা ও গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর মাঝেই বিদ্যমান। আর যখন এই গুণাবলি শুধু আল্লাহর মাঝেই বিদ্যমান, অন্যদের মধ্যে নয়, তখন তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য, আর কেউ নয়।

৪. অতএব বান্দার নিতান্ত দীনতা ও হীনতার প্রকাশ (যার অপর নাম ইবাদত), একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।

৫. অর্থাৎ দেখ, ভারী মাল-সামান নিয়ে জাহাজগুলো আল্লাহর কুদরত ও রহমতে কী বিস্ময়করভাবে সমুদ্রের তরঙ্গমালা চিরে অগ্রসর হতে থাকে!

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য[১]।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

৩২. আর যখন তরঙ্গ তাদের মেঘমালার মত আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আল্লাহকে ডাকতে থাকে প্রার্থনাকে তাঁরই জন্য খাঁটি করে[২]। অতঃপর তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে স্থলে পৌছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যম পন্থার উপর থাকে✯[৩]। আর আমার নিদর্শনসমূহ কেবল তারাই অস্বীকার করে, যারা চরম বিশ্বাসঘাতক, অতিশয় অকৃতজ্ঞ[৪]।

---

১. অর্থাৎ সামুদ্রিক সফরের বিভিন্ন হালত ও তাতে যে সকল দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা আসে তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা মানুষকে সবর ও শোকর উভয়ের শিক্ষা দান করে। যখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে আর জাহাজ উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত হয়, তখন অত্যন্ত ধৈর্য ও সবর করতে হয়। আর যখন আল্লাহ তাআলা জীবন-মৃত্যুর এই ডামাডোল থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে তীরে পৌছে দেন, তখন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।

২. ইতিপূর্বে দলীল-প্রমাণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, এক আল্লাহকে মানাই সরল পথ, এর খেলাফ সব কিছুই ভ্রষ্টতা। এখন বলা হচ্ছে যে, উত্তাল-তরঙ্গ-বেষ্টিত হয়ে কট্টর থেকে কট্টর মুশরিকও অতি ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডাকা শুরু করে। বোঝা গেল, মানব-অন্তর ও মানব-স্বভাবের প্রকৃত ডাক এটিই, অন্য সবই কৃত্রিম, মিথ্যা ও প্রতারণা মাত্র।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**–'সরল পথে (অর্থাৎ তাওহীদের পথে) থাকে'।

৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা ঝড়-তুফান থেকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসলেন, তখন অল্প কিছু লোকই মধ্যম পন্থার উপর কায়েম থাকে, নতুবা অধিকাংশ লোক সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে পুনরায় দুষ্কর্ম শুরু করে।

বিজ্ঞ মুতারজিম (র) فمنهم مقتصد এর তরজমা করেছেন– کوئی ہوتا ہے ان میں بیچ کی چال پر
হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ভয়ের সময়ে যে অবস্থা ছিল, তা তো এখন (উদ্ধার পাওয়ার পর) কারো নেই, কিন্তু সেই চরম ভীতিকর অবস্থা একেবারে ভুলেও যায় না— এমন কিছু লোকও থাকে, আর অধিকাংশ লোক আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করে বসে। এবং নিজেদের রক্ষা পাওয়াকে আপন চেষ্টা-তদবীর কিংবা অন্য কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্য বলে মনে করে।

৪. অর্থাৎ একটু আগেই তুফানে বেষ্টিত হয়ে যেসব ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে করেছিল, তা সবই এখন মিথ্যা প্রমাণিত হল। কয়েক দিনও তাঁর ইহসান ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখল না, এত তাড়াতাড়ি তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে বসল।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٣٣

৩৩. হে মানুষ! আপন রবকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন কোন পিতা তার সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, আর কোন সন্তানও তার পিতার কিছুমাত্র উপকারে আসবে না[১]। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই বড় প্রতারক (শয়তান)ও যেন আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের ধোঁকা দিতে না পারে[২]।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا

৩৪. শুধু আল্লাহর কাছেই আছে কিয়ামতের ইলম। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন, মাতৃগর্ভে কী আছে। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী করবে এবং

---

১. তুফানের সময় জাহাজের আরোহীদের মধ্যে দারুণ আতঙ্ক হয়– প্রত্যেকে নিজ জান বাঁচানোর চিন্তায় থাকে। তা সত্ত্বেও এ বিপদে পিতামাতা সন্তানসন্ততিকে এবং সন্তানসন্ততি পিতামাতাকে একেবারে ভুলে যায় না– একে অপরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। বরং কোন সময় পিতামাতা স্নেহের আতিশয্যে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে সন্তানকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু এমনও ভয়ঙ্কর ও সংকটময় দিন সম্মুখে রয়েছে– যখন চতুর্দিকে 'নাফসী', 'নাফসী' রব উঠবে। সন্তানসন্ততি ও পিতামাতার মধ্যে কেউ নিজ প্রাণ বিপন্ন করে অন্যের বিপদ নিজ মাথায় নিতে প্রস্তুত হবে না। আর প্রস্তুত হলেও এ কথা সেখানে চলবে না। সুতরাং অন্তরে সেই দিনের ভয় রেখে আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত। আজ সমুদ্রের ঝড়-তুফান থেকে বেঁচে গেলেও কাল তা থেকে কী করে বাঁচবে?

২. অর্থাৎ সেই দিনটি নিশ্চিতরূপে আসবেই। এ আল্লাহ তাআলার ওয়াদা, যার অন্যথা হবে না। সুতরাং দুনিয়ার কয়েক দিনের বসন্ত ও আনন্দ-উৎসবে ধোঁকা খেয়ো না। এমন ভেবো না যে, জীবন সর্বদা এভাবেই কাটবে এবং এখানে আরাম-আয়েশে আছ বলে সেখানেও আরাম করবে।

অনুরূপ ওই দাগাবাজ শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক থেকো, যে আল্লাহর নামে ধোঁকা দিয়ে থাকে। সে বলে, মিয়া! আল্লাহ গাফূরুর রাহীম (ক্ষমাশীল, দয়াশীল)। যত খুশী- ইচ্ছা গোনাহ কর। মজা লুটে নাও। বুড়া হয়ে একসঙ্গে তাওবা করে নেবে। আল্লাহ তাআলা সবই মাফ করে দেবেন। তকদীরে তিনি জান্নাত লিখে থাকলে গোনাহ যতই কর না কেন, তাতে প্রবেশ করবেই। আর দোযখ লিখে থাকলে কোনক্রমেই রক্ষা পাবে না, সুতরাং কেন দুনিয়ার মজা বর্জন করবে?!

وَمَا تَدۡرِیۡ نَفۡسٌۢ بِاَیِّ اَرۡضٍ تَمُوۡتُ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌ خَبِیۡرٌ ﴿۳۴﴾	কেউ জানে না, কোন্ স্থানে সে মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত[১]।

১. অর্থাৎ কিয়ামত আসবেই আসবে। কবে আসবে? এর জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আমরা জানি না, কবে এ বিশ্ব-কারখানা ভেঙে-চুরে সমান করে দেওয়া হবে। মানুষ দুনিয়ার বাগ-বাগিচা, শোভা-সৌন্দর্য ও ক্ষণস্থায়ী বসন্ত-যৌবন দেখে মুগ্ধ হয়। সে কি জানে না যে, এই জিনিস ক্ষণস্থায়ী? তাছাড়া এটি এবং এর উপায়-উপকরণ সবই খোদার মুঠিতে?

وينزل الغيث

যমীনের সমস্ত সৌন্দর্য ও বস্তুগত বরকত আসমানী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। দুই এক বছর বৃষ্টি না হলে চতুর্দিকে ধূলো উড়বে। সুখ-সম্ভোগের উপকরণও থাকবে না, আরাম-আয়েশের উপায়ও রইবে না। অথচ কী আশ্চর্য, মানুষ দুনিয়ার জীবন-যৌবন ও ভোগ-বিলাসে মেতে সেই সত্তাকে ভুলে যায়, যিনি স্বীয় রহমত-বৃষ্টি দ্বারা ধরণীকে সবুজ-শ্যামলিমায় ও শোভা-সৌন্দর্যে ভরে রেখেছেন।

তাকদীরে বিশ্বাসের অর্থ তাদবীর বর্জন করা নয়

তদুপরি কে জানে, দুনিয়ার আরাম-আয়েশে তার কতটুকু অংশ রয়েছে? বহু লোক চেষ্টা সাধনা করে এবং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মরে যায়, কিন্তু সারা জীবন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সৌভাগ্য হয় না। অথচ এমনও অনেকে আছে, যারা বিনা-পরিশ্রমে ধন- দৌলতের মালিক হয়ে যায়। যারা দীনী ব্যাপারে তাকদীরের উপর ভরসা করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে, উল্লিখিত বিষয়টি দেখেও তাদের কেউ-ই কিন্তু (দুনিয়া বিষয়ক) তাকদীরের উপর ভরসা করে পার্থিব চেষ্টা-তাদবীরে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। সে বোঝে যে, তদবীর করাই উচিত। কারণ, ভাল তাকদীর সাধারণত যথোচিত তাদবীরের ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। বাস্তবে আমাদের তাকদীর কেমন এবং সঠিক তাদবীর ফলপ্রসূ হবে কি না– এর ইলম একমাত্র আল্লাহ তাআলার রয়েছে। ঠিক এ কথাটিই (অর্থাৎ তাকদীরের ভরসায় তাদবীর না ছাড়া) যদি আমরা দীনের ব্যাপারে বুঝে নিই, তবে শয়তানের ধোঁকায় অবশ্যই পতিত হব না।

এ নিশ্চিত যে, বেহেশত বা দোযখ যা কিছু লাভ হবে, তা তাকদীর অনুযায়ীই লাভ হবে, যার ইলম আল্লাহরই রয়েছে। তবুও সাধারণত ভাল বা মন্দ তাদবীরের আয়নায় ভাল বা মন্দ তাকদীরের চেহারা ভেসে ওঠে। এ জন্য তাকদীরের নাম করে আমরা তাদবীর ছাড়তে পারি না। কেননা, এ খবর কারো নেই যে, আল্লাহ তাআলার ইলমে সে ভাগ্যবান না হতভাগা, বেহেশতী না দোযখী, ধনী না দরিদ্র। সুতরাং জাহেরী আমলই ও তাদবীরই সেই জিনিস, যা দ্বারা আমরা সাধারণত তাকদীর কী রকম হবে তার কিছুট ধারণা করতে পারি। নতুবা এ ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আছে যে, নারীর গর্ভে ছেলে আছে না মেয়ে এবং জন্মের পর কত বছর বাঁচবে, কী পরিমাণ জীবিকা পাবে, ভাগ্যবান হবে না হতভাগা? وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ –এর মধ্যে এ সমস্ত দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

শয়তানী ধোঁকার খণ্ডন

তবে শয়তান যে ধোঁকা দেয়, এখন তুমি দুনিয়ার মজা লুটে নাও, পরে তওবা করে সৎ হয়ে যাবে– এর উত্তর وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا الخ এর মধ্যে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ জানে না, সে কাল কী করবে এবং কিছু করার জন্য জীবিতও থাকবে, না মৃত্যু এসে পড়বে? আসলে কখন এবং কোথায় আসবে? সুতরাং এ নিশ্চয়তা কোথায় যে, আজকের অসৎকর্মের প্রতিকার আগামীকাল সৎকর্মের দ্বারা অবশ্যই করতে পারবে এবং তওবার অবকাশ অবশ্যই পাবে? এসব বিষয়ের খবর তো একমাত্র عليم ও خبير ছাড়া আর কেউ জানে না।

مغيبات- এর ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি

স্মরণ রাখা উচিত যে, (مغيبات) গায়বী বিষয়াদি হয় আহকাম সংক্রান্ত হবে, না হয় সৃষ্টি জগত সংক্রান্ত। সৃষ্টিজগত বিষয়ক হলে তার সম্পর্ক কালের সঙ্গে বা স্থানের সঙ্গে। কালের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত হিসাবে তিন প্রকার।

এসব مغيبات-এর মধ্যে আহকামসংক্রান্ত গায়বী বিষয়াদির সামগ্রিক জ্ঞান প্রিয় নবীজি আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামকে দান করা হয়েছে— فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الخ ('আর তিনি তাঁর গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না, সেই ব্যক্তি ছাড়া, যাকে তিনি পছন্দ করেছেন, অর্থাৎ কোন রাসূল ...। -জিন, আয়াত ২৬-২৭)। উম্মতের তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন মনীষীবৃন্দ এই আহকাম ও তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুবিন্যস্ত আলোচনা করেছেন।

পক্ষান্তরে, সৃষ্টিজগতসংক্রান্ত গায়বী বিষয়সমূহের মৌলিক ও উসূলী জ্ঞান আল্লাহ তাআলা শুধু নিজের কাছেই রেখেছেন। তবে বিচ্ছিন্নভাবে শাখা-প্রাশাখাগতজ্ঞান অনেককে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী দান করেছেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত বিপুল ও পর্যাপ্ত পরিমাণে তার অংশ দান করা হয়েছে, যার কোন পরিমাপ করা যায় না। তা সত্ত্বেও সৃষ্টিজগতসংক্রান্ত গায়বী বিষয়াদির সামগ্রিক জ্ঞানের চাবিকাঠি মহান প্রভুর হাতেই রয়েছে।

مفاتيح الغيب

আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, হাদীসে (বুখারী, ৪৬২৭) এসবকে مفاتيح الغيب (গায়বের চাবি) বলা হয়েছে, যাদের ইলম (তথা সামগ্রিক জ্ঞান) আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। বস্তুত এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সৃষ্টিসংক্রান্ত সকল প্রকার গায়বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে– بأي أرض تموت এর মধ্যে স্থানসংক্রান্ত গায়ব, ماذا تكسب غدا এর মধ্যে ভবিষ্যত কালসংক্রান্ত, مافي الأرحام এর মধ্যে বর্তমান কালসংক্রান্ত এবং ينزل الغيث এর মধ্যে খুব সম্ভব অতীত কালসংক্রান্ত গায়বের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে—

অর্থাৎ বৃষ্টি আসছে বলে ধারণা করা যায়। কিন্তু কারো জানা নেই যে, পূর্বে এমন কী কার্যকারণ তৈরি হয়েছে, যার ফলে ঠিক এ সময়েই, এ স্থানেই, এ পরিমাণেই বৃষ্টি হল। মা পেটে বাচ্চা ধারণ করে চলাফেরা করে, কিন্তু সে জানে না, পেটে কী আছে— ছেলে না মেয়ে। মানুষ ভবিষ্যত ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কিন্তু সে জানে না— কাল সে নিজে কী কাজ করবে? কোথায় তার মৃত্যু সংঘটিত হবে? আশ্চর্যের বিষয়, এ অজ্ঞতা ও অক্ষমতা

সত্ত্বেও মানুষ পার্থিব জীবনে মেতে প্রকৃত স্রষ্টাকে এবং সেই দিনকে ভুলে যায়, যেদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে হাযির হতে হবে।

যা হোক, এ পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা এদিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টিজগত সম্পর্কে সকল গায়বের সামগ্রিক জ্ঞান আল্লাহর রয়েছে। তাঁর জ্ঞানকে এ পাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। আর খুব সম্ভব শুধু উক্ত পাঁচটির উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, জনৈক প্রশ্নকারী এ পাঁচটি বিষয়েই প্রশ্ন করেছিল, যার উত্তরে আয়াতটি নাযিল হয়। (كما في الحديث) [আদ দুররুল মানসূর ৫/১৬৯]

ইতিপূর্বে সূরা আনআম (আয়াত ৫৯) ও নামল (আয়াত ৬৫) এর মধ্যে আমরা গায়বের ইলম সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছি, তা একবার দেখে নিতে অনুরোধ

সূরা সাজদাহ

সূরা ৩২ । ৩০ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ٣٠، رُكُوعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

২. এ কিতাব -যাতে কোন সন্দেহ নেই- বিশ্বজগতের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত[১]।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ③

৩. ওরা কি বলে, 'তিনি এটি রচনা করেছেন? তা নয়, বরং এটি সত্য (কিতাব), আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ)— যাতে আপনি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা সৎপথে এসে যায়[২]।

---

১. অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ পবিত্র কিতাব বিশ্বজগতের প্রভু-পরওয়ারদেগার অবতীর্ণ করেছেন। এতে না আছে কোন মিথ্যা, না আছে কোন সন্দেহের অবকাশ।

২. অর্থাৎ যে কিতাব অলৌকিক এবং যার আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া এতই সুস্পষ্ট যে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই— তার সম্পর্কে কি কাফেররা বলে, পয়গম্বর নিজে তা রচনা করেছেন এবং আল্লাহর প্রতি (معاذ الله) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছেন? আসলে এমন সমুজ্জ্বল বিষয়েও সন্দেহ সৃষ্টি করাটা সীমাহীন ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। একটু চিন্তা ও সুবিচার করলেই বুঝতে পারত, এ কিতাব নিঃসন্দেহে বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে আপনি এর দ্বারা সেই জাতিকে জাগানোর ও সৎপথে আনার চেষ্টা করেন, যাদের নিকট যুগ যুগ ধরে কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আসেননি।

কুরআন মানবরচিত না হওয়ার একটি প্রমাণ

চিন্তা করার বিষয় যে, মানুষ নিজের পক্ষ থেকে সেই জিনিসই রচনা করে বা করতে পারে, যার কোন নজীর থাকে এবং যার প্রতি প্রবল আকর্ষণ তার সমাজের মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। কোনো দেশে হঠাৎ করে এমন কথা বলতে থাকা, যা তাদের হাজারো বছরের মানসিকতা ও রুচির একেবারে পরিপন্থী এবং যা গ্রহণ করার সামান্যতম সম্ভাবনা বাহ্যত তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না— এ কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। হাঁ, আল্লাহ

৪. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন[১]। তিনি ছাড়া তোমাদের না আছে কোন অভিভাবক, না কোন সুপারিশকারী। তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না[☆][২]?

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰی عَلَی الۡعَرۡشِ ؕ مَا لَکُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیۡعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوۡنَ ۝

৫. তিনি বিধি-ব্যবস্থা নির্ধারণ করে তা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর তা তাঁর দিকে এমন দিনে আরোহণ করে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর[☆☆][৩]।

یُدَبِّرُ الۡاَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الۡاَرۡضِ ثُمَّ یَعۡرُجُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ کَانَ مِقۡدَارُهٗۤ اَلۡفَ سَنَۃٍ مِّمَّا تَعُدُّوۡنَ ۝

তাআলার অসামান্য শক্তি দ্বারা কেউ নির্দেশিত হলে আলাদা কথা। অতএব যে উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অস্বীকারকারীরাও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তিনি যদি কোন কথা নিজের থেকে রচনা করে আনতেন, তবে নিশ্চয় এমন বিষয়ই রচনা করতেন, যা তদানীন্তন আরব পরিবেশের উপযোগী এবং সাধারণ মন-মানসিকতার অনুকূল হত এবং যার কোনো নমুনা ওদের আশেপাশে পাওয়া যেত। যুক্তিগ্রাহ্য এ বিষয়টিই একজন নিরপেক্ষ মানুষকে নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, তিনি নিজ অভিলাষে উঠে দাঁড়াননি এবং যে বাণী তিনি নিয়ে এসেছেন তা তাঁর রচিত নয়।

১. এ বিষয়ক আলোচনা সূরা আ'রাফে ৮ম পারার শেষের দিকে (আয়াত ৮) অতিবাহিত হয়েছে– তা দ্রষ্টব্য।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২. অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর না যে, আল্লাহর বাণী ও বাণীবাহককে মিথ্যা বলে কোথায় পালাবে? সমগ্র পৃথিবী ও আকাশে, আরশ থেকে যমীন পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ তাআলারই রাজত্ব। যদি তোমরা ধৃত হও তবে তাঁর অনুমতি ও মর্যি ছাড়া কোন সহায়ক ও সুপারিশকারীও পাবে না।

☆☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত (সব) বিষয়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করেন। অতঃপর সকল বিষয় তাঁর দিকে আরোহণ করবে (অর্থাৎ তাঁর কাছে ফিরে যাবে) এমন দিনে, যার পরিমাণ ...হাজার বছর (তথা কিয়ামতের দিনে)'।

৩. বড় বড় কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে আল্লাহর হুকুম তাঁর মহান দরবার থেকে সাব্যস্ত হয়ে নীচে অবতীর্ণ হয়। তখন আসমান-যমীনের সকল জাহেরী ও বাতেনী উপায়-উপকরণ তার সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করে। এবং সে কাজ ও ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছা ও হেকমত অনুযায়ী

৬. তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সকল বস্তুর পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু[১]—	ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ

যুগ যুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে তা ঊর্ধ্বলোকে উঠে যায়। তারপর আল্লাহর তরফ থেকে অন্য ব্যবস্থা অবতীর্ণ হয় । যেমন– বড় বড় পয়গম্বর, তাঁদের প্রভাব যুগ যুগ ধরে রয়ে যায়। অথবা কোন বিশেষ জাতির নেতৃত্ব, যা বংশ পরম্পরায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এই হাজার বছর আল্লাহর নিকট একদিন তূল্য। (মুযেহুল কুরআন)

অন্য আরো তাফসীর

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা হাজার বছরের পরিচালন-ব্যবস্থা ও কার্য-পদ্ধতি ফেরেশতাদের বলে দেন, আর এই এক হাজার বছর তাঁর নিকট একদিন তূল্য। অতঃপর ফেরেশতাগণ যখন এগুলি সম্পাদন করে ফারেগ হন, তখন পরবর্তী হাজার বছরের বিধি-ব্যবস্থা তাঁদের বলে দেন। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

কোন কোন তাফসীরকার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলার হুকুম আকাশের উপর থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আসে। অতঃপর হুকুম অনুসারে যেসব কাজ এখানে সম্পাদিত হয়, তা আমলের দপ্তরে লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্য উপরে উঠে যায়। দপ্তরটি পৃথিবীর আকাশের সীমার মধ্যেই রয়েছে, যার দূরত্ব পৃথিবী থেকে মানুষের (চলার) মাঝারি গতির হিসাবে এক হাজার বছর, যদিও তা আল্লাহর নিকট একদিন বলে পরিগণিত। তবে দূরত্ব হাজার বছরের হলেও ফেরেশতাদের তা এক ঘণ্টায় বা এর চেয়ে কম সময়ে অতিক্রম করা বিস্ময়ের কিছু নয়।

কোন কোন তাফসীরকার আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা একটি কাজ সম্পাদন করার হাজার বছর পূর্ব থেকে সে বিষয়ে প্রারম্ভিক কার্যক্রম ও তার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাপনা শুরু করে দেন। অতঃপর তা পরিপূর্ণ হেকমত অনুযায়ী, বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে, ক্রমান্বয়ে শেষ পরিণতিতে পৌঁছে। তখন তার যে ফলাফল ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য উপরে ওঠে।

কারো মতে এখানে يوم দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পুরো বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। অতঃপর এমন এক দিন আসবে, যখন সমস্ত জগতের অবসান ঘটবে এবং সবকিছু শেষ বিচারের জন্য আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। একেই কিয়ামত বলা হয়। আর কিয়ামতের দিনটি হাজার বছরের সমান।

فِي يوم – এর يوم কার সাথে সম্পর্কিত

যা হোক, يوم শব্দটিকে কেউ কেউ يدبر এর সাথে, আর কেউ কেউ يعرج এর সাথে সম্পর্কিত ধরেছেন। আবার কেউ কেউ শব্দটিকে উভয় (فعل) ক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছেন।

১. অর্থাৎ এরূপ মহান, বিরাট ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র সেই পবিত্র সত্তারই কাজ, যিনি প্রত্যেক দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ের খবর রাখেন, যিনি মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান।

ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ وَبَدَأَ خَلۡقَ ٱلۡإِنسَٰنِ مِن طِينٖ ۝٧	৭. যিনি নিজের প্রতিটি সৃষ্টিকে করেছেন সুন্দর আর তিনি মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি দিয়ে।
ثُمَّ جَعَلَ نَسۡلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن مَّآءٖ مَّهِينٖ ۝٨	৮. অতঃপর তার সন্তানসন্ততি সৃষ্টি করেছেন সারনির্যাস থেকে তথা এক তুচ্ছ পানি থেকে[১]।
ثُمَّ سَوَّىٰهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۖ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَۚ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ۝٩	৯. তারপর তাকে সঠিক অবয়ব দান করেছেন[২] এবং তার মধ্যে নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন[৩]। আর তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। (তবে) তোমরা খুব সামান্যই শোকর কর[৪]।

১. অর্থাৎ শুক্রকণা থেকে পয়দা করেছেন, যা বহু খাদ্য-পানীয়ের নির্যাস।

২. অর্থাৎ সঠিক ও সামঞ্জস্যশীল আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহের (র) লেখেন, 'সকল সৃষ্টি তাঁরই স্বত্ব, কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে যার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন, তাকে নিজের বলেছেন। যেমন এক আয়াতে বলেছেন– إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ('আমার বান্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব নেই। –বনী ইসরাঈল, আয়াত ৬৫) অথচ সকলেই তো আল্লাহর বান্দা। তাই তো অন্যত্র (মারয়াম : ৯৩) বলেছেন— إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا। যেহেতু মানুষের আত্মা আলমে গায়ব (অদৃশ্যের জগত) থেকে এসেছে, মাটি-পানি দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, সুতরাং তাকে নিজের বলেছেন— من روحه (তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন!) নতুবা 'আল্লাহ তাআলার রূহ' বলতে যদি সেই অর্থ ধরা হয়, যা মানুষের রূহ বলতে বোঝানো হয়, তবে তো এর জন্য দেহ লাগবে। দেহ মানেই বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজন, আর এরূপ সংযোজন হলেই حُدُوث (অনিত্যতা) অবধারিত। তবে আর পবিত্র সত্তা রইল কোথায়?' (মূযেহ, ঈষৎ পরিবর্তন করে)।

(মোট কথা, আদমের (আ:) মর্যাদা বৃদ্ধি এবং 'রূহ' এর বিশিষ্টতার জন্যই আল্লাহ তার রূহকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং বলেছেন– نفخ فيه من روحه)

৪. এ নেয়ামতগুলির শুকরিয়া এই ছিল যে, তোমরা চোখের দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টিজগতে বিরাজমান নিদর্শনাদি গভীর মনোযোগের সাথে নিরীক্ষণ করতে, কানের দ্বারা তাঁর অবতীর্ণ আয়াতসমূহ আগ্রহ ও মনোনিবেশ সহকারে শুনতে, অন্তরের দ্বারা এ উভয়কে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করতে এবং বুঝে সেই মত আমল করতে। কিন্তু তোমরা খুবই কম শোকর আদায় কর।

১০. ওরা বলে, 'আমরা যখন মাটিতে মিশে নাই হয়ে যাব, তখনো কি আমরা নতুন করে সৃজিত হব?' আসলে, ওরা আপন প্রভুর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে[১]।

وَقَالُوٓا ءَاِذَا ضَلَلۡنَا فِی الۡاَرۡضِ ءَاِنَّا لَفِیۡ خَلۡقٍ جَدِیۡدٍ ۬ؕ بَلۡ ہُمۡ بِلِقَآیِٔ رَبِّہِمۡ کٰفِرُوۡنَ ﴿۱۰﴾

১১. আপনি বলুন, 'মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ কব্জ করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে[২]।

قُلۡ یَتَوَفّٰىکُمۡ مَّلَکُ الۡمَوۡتِ الَّذِیۡ وُکِّلَ بِکُمۡ ثُمَّ اِلٰی رَبِّکُمۡ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۱۱﴾

[রুকূ - ২]

১২. হায়! তুমি যদি (সেই দৃশ্য) দেখতে যখন অপরাধীরা আপন রবের সামনে মাথা নত করে থাকবে[৩] (এবং বলবে,) 'হে আমাদের রব! আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদের পুনরায় (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা সৎকর্ম করতে পারি। আমাদের তো বিশ্বাস হয়ে গেছে[৪]।'

وَلَوۡ تَرٰۤی اِذِ الۡمُجۡرِمُوۡنَ نَاکِسُوۡا رُءُوۡسِہِمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ ؕ رَبَّنَاۤ اَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَارۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَالِحًا اِنَّا مُوۡقِنُوۡنَ ﴿۱۲﴾

---

১. অর্থাৎ ওরা এ কথা চিন্তা করল না যে, আল্লাহ ওদের প্রথমে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটা চিন্তা না করে উলটা ওরা সন্দেহ বের করছে যে, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আমরা পুনরায় কীভাবে সৃষ্টি হব? আর সন্দেহ করে বা একে দূরবর্তী বিষয় বলেই ক্ষান্ত রয়নি, বরং পরিষ্কারভাবে পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে বসেছে।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ তোমরা নিজেদের শুধু দেহসর্বস্ব মনে কর যে, মাটিতে পচে গলে মিশে যাবে, নাই হয়ে যাবে। আসলে এমন নয়; বরং আসলে তোমরা তো আত্মাধারী, যে আত্মা ফেরেশতা নিয়ে যান। তোমরা একেবারে বিনাশ হয়ে যাও না।'

৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে অপমান ও অনুশোচনার কারণে মাথা নত করে থাকবে।

৪. অর্থাৎ আমাদের কান ও চোখ খুলে গেছে। পয়গম্বর আলাইহিস সালাম যেসব কথা বলতেন, তাতে বিশ্বাস জন্মেছে। বরং স্বচক্ষে দেখে নিয়েছি যে, আল্লাহর নিকট ঈমান ও সৎকর্মই কাজে আসে। এখন একটিবার পুনরায় আমাদের দুনিয়াতে পাঠান, দেখবেন– কী রকম নেককাজ আমরা করি!

১৩. আমি যদি চাইতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হেদায়েত দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আমার এ কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভরে ফেলব জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা[১]।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

১৪. অতএব তোমরা (জাহান্নামের) মজা উপভোগ কর। কেননা, তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম[২]। আর তোমরা তোমাদের কার্যকলাপের কারণে চিরকালের শাস্তি ভোগ করতে থাক।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫. আমার আয়াতসমূহের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে, যাদের অবস্থা হল— তাদের যখন

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا

---

১. অন্যত্র (আনআম ২৮) আরো বলেছেন— وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ অর্থাৎ ওরা মিথ্যাবাদী, ওদের যদি দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তবে আবার সেই সব দুষ্কৃতিই করবে। ওদের প্রকৃতিই এমন যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করে নেবে এবং আল্লাহর রহমত থেকে দূরে পলাবে।

(আল্লাহ তাআলা বলেন-) অবশ্য আমার এ শক্তি ছিল যে, ইচ্ছা করলে সমগ্র মানুষকে জোরপূর্বক সেই হেদায়াতের পথে কায়েম রাখতে পারতাম, যে পথের দিকে মানবাত্মা স্বভাবগতভাবে স্বতঃই পরিচালিত হয়। কিন্তু এভাবে সকলকে একই পথ অবলম্বনে বাধ্য করা সেই হেকমতের পরিপন্থী ছিল, যার বিবরণ ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে গত হয়েছে। অতএব ইবলীসের দাবি- لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ ('আমি অবশ্যই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব, তবে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ছাড়া।' –সাদ, আয়াত ৮২-৮৩)— এর উত্তরে আল্লাহ পাক যে কথা বলেছিলেন- قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ('তো, সত্য কথা এই যে, আর আমি সত্য কথাই বলি- আমি অবশ্যই তোর দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।' –সাদ, আয়াত ৮৪-৮৫)— তা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।

منك ومن تبعك– দ্বারা বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য শয়তানেরা ও ওদের অনুসারীরা।

২. 'আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম', অর্থাৎ দয়া-মায়ার সঙ্গে তোমাদের স্মরণ করা হবে না। সামনে অপরাধীদের বিপরীতে মুমিনদের হাল-অবস্থা ও পরিণাম বর্ণিত হচ্ছে।

بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۩

সেগুলির দ্বারা নসীহত করা হয়, তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং আপন রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তারা অহংকার করে না[১]।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝

১৬. তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে[২]; তারা আপন রবকে ডাকে ভয় ও আশার সাথে[৩], আর আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

১৭. সুতরাং কেউ জানে না, তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কত কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে– তারা যেসব আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ[৪]।

---

১. অর্থাৎ তারা ভয়-ভীতি ও খুশূ-খুযূর সাথে সেজদায় পতিত হয়। মুখে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ ও প্রশংসা করে, আর দিলে গর্ব, অহংকার ও বড়াইয়ের ভাব রাখে না– যা আল্লাহর নিদর্শনের সামনে অবনত হওয়ায় বড় প্রতিবন্ধক।

২. অর্থাৎ মধুর নিদ্রা ও সুখশয্যা ত্যাগ করে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায পড়ে, যেমন: সহীহ হাদীসে (তিরমিযী, ২৬১৬) বর্ণিত আছে। আর কারো কারো মতে এ দ্বারা ফজরের বা এশার নামায অথবা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামায উদ্দেশ্য। আয়াতের শব্দাবলিতে এর অবকাশ থাকলেও প্রথমোক্ত তাফসীরই অগ্রগণ্য।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "দুনিয়ার বিষয়ে হোক বা আখেরাতের বিষয়ে, আল্লাহকে ভয় করা অথবা তাঁর কাছে লোভ করা নিন্দনীয় নয়। এবং এ উদ্দেশ্যে বন্দেগী করলে তাও কবূল। হাঁ, অন্য কারো ভয়ে বা লোভে বন্দেগী করলে তা রিয়া হবে, মোটেই কবুল হবে না।'

৪. তারা যেমন রাতের আঁধারে মানুষ থেকে গোপনে রিয়াহীন অবস্থায় ইবাদত করেছে, তদ্রূপ এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত নে'য়ামত গোপন রেখেছেন, সেগুলোর পূর্ণ অবস্থা কারো জানা নেই। যখন তা দেখবে, চোখ জুড়িয়ে যাবে।

হাদীসে কুদছীতে আছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন,) 'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য বেহেশতে সেসব জিনিস গোপন রেখেছি, যা চোখ (কখনো) দেখেনি, কান (কখনো) শোনেনি, কোনো মানুষের কল্পনায় (কোন দিন) আসেনি। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮২৪)

১৮. আচ্ছা, যে ব্যক্তি ঈমানদার সে কি ওই ব্যক্তির সমান, যে নাফরমান? তারা সমান হতে পারে না[১]।

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوٗنَ ۝

১৯. তো, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আতিথেয়তাস্বরূপ রয়েছে বসবাসের উদ্যানরাজি– তারা যেসব আমল করত তার বিনিময়ে[২]।

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

২০. আর যারা নাফরমানি করেছে, তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। যখনই ওরা তা থেকে বের হতে চাইবে, ওদের তাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ওদের বলা হবে, 'আগুনের ঐ আযাব আস্বাদন করতে থাক, যা তোমরা অস্বীকার করতে[৩]।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

২১. আমি অবশ্যই ওদেরকে গুরু শাস্তির আগে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, ওরা যাতে ফিরে আসে[৪]।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

বি. দ্র. স্যার সৈয়দ প্রমুখরা এই হাদীসকে ভিত্তি বানিয়ে বেহেশতের দৈহিক নে'য়ামতসমূহকে অস্বীকার করেছে। আমার প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এর যথাযথ উত্তর রয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

১. একজন ঈমানদার ও একটা বেঈমানের পরিণাম যদি সমান হয়ে যায়, তবে এ মস্ত বড় অবিচার। আল্লাহ তাআলার দরবারে এমন হতেই পারে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ফযলে তাদের আমলসমূহ বেহেশতের মেহমানীর তথা আপ্যায়ন, আতিথেয়তার কারণ হবে।

৩. কখনো কখনো অগ্নিশিখাগুলি জাহান্নামীদের জাহান্নামের দরজার দিকে নিক্ষেপ করবে। সম্ভবত তখন ওরা বের হওয়ার খেয়াল করবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ পুনরায় জাহান্নামের ভিতরে ঠেলে দিয়ে বলবেন, যাচ্ছ কোথায়? যে বস্তুকে অস্বীকার করতে, তার স্বাদ কিছুটা উপভোগ কর।

(اللّٰهُمَّ اعذني من النار وأجرني من غضبك)

৪. অর্থাৎ আখেরাতের কঠিন আযাবের পূর্বে দুনিয়াতে কিছুটা হালকা আযাব পাঠাব, যাতে যার তাওফীক হয়, সে ভীত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। হালকা আযাব বলতে—

২২. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহের দ্বারা নসীহত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে[১]? আমি অবশ্যই (এই) অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব[২]।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۝۲۲

[রুকূ - ৩]

২৩. নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সুতরাং এর প্রাপ্তির ব্যাপারে আপনি কোন সন্দেহে থাকবেন না*[৩]। এবং সেই কিতাবকে পথনির্দেশ বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۗىِٕهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ۝۲۳

দুনিয়ার বিপদাপদ, রোগ-শোক, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফসল-নাশ, সন্তান-বিয়োগ প্রভৃতি উদ্দেশ্য।

১. অর্থাৎ শোনার ও বোঝার পরও ফিরে গেল।

২. যখন সকল পাপী, জালেম, অপরাধী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ সুনিশ্চিত, তখন সবচেয়ে বড় জালেম কী করে রক্ষা পাবে?

সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, জালেমদের জুলুম ও অন্যায় এবং ওরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। ইতিপূর্বে মূসাকে আমি কিতাব দান করেছিলাম, যার দ্বারা বনী ইসরাঈল হেদায়াত পেয়েছিল। আর সে কিতাবের অনুসারীদের মধ্যে বড় বড় ধর্মীয় নেতা ও ইমামের জন্ম হয়। আপনাকেও আল্লাহর তরফ থেকে মহামর্যাদাশালী কিতাব প্রদান করা হয়েছে, যার দ্বারা বহু লোক হেদায়াত পাবে এবং আপনার উম্মতের মধ্যে বনী ইসরাঈলের চেয়ে বেশি সংখ্যায় জ্ঞানীগুণী ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করবে। রইল কাফের অবাধ্যরা– এদের বিচার আল্লাহ তাআলা নিজেই করবেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে সন্দেহে থাকবেন না'।

৩. فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۗىِٕهٖ– বক্তব্যের মাঝে معترضة (অন্তর্বর্তী বাক্য)– স্বরূপ এ কথাটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয় মূসাকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল। আপনাকেও তদ্রূপ কিতাব দেওয়া হয়েছে। এতে (অর্থাৎ মূসাকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে) কোন সন্দেহ নেই। অথবা মূসার উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শবে মেরাজে যে মূসার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তা বাস্তব সত্য। তাতে কোন ধোঁকা বা নজরবন্দী ছিল না।

২৪. আর আমি তাদের মধ্য থেকে কতককে –যখন তারা সবর করল[১]– 'ইমাম' (অনুসরণীয়) বানিয়েছিলাম, যারা আমার নির্দেশে পথপ্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমুহে পূর্ণ বিশ্বাস রাখত[২]।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝

২৫. আপনার রবই তাদের মাঝে কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যাতে তারা মতবিরোধ করত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

২৬. এ বিষয়টি কি ওদের সঠিক পথে আনল না যে, আমি ওদের আগে কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের আবাসভূমিতে ওরা চলাফেরা করে? নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। ওরা কি শোনে না[৩]?

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ۝

২৭. ওরা কি দেখে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি[৪] পৌঁছাই[৫]।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ

---

১. দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টে ও কাফেরদের জুলুম-নির্যাতনের মুখে সবর করেছে।

২. এমনিভাবে মুসলমানরাও যদি আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে নিজেদের কাজে দৃঢ়পদ থাকে, তবে তাদের সঙ্গেও আল্লাহ একই আচরণ করবেন। ইতিহাস সাক্ষী— মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহর ওয়াদা-অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং তা উত্তমরূপে হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ হকপন্থী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা ও তার বাস্তবায়ন কিয়ামতের দিন হবে। তবে দুনিয়াতেও কিছু উদাহরণ এমন দেখানো হয়েছে, যেগুলো দেখে মানুষ বুঝ ও শিক্ষা হাসিল করতে পারে। 'আদ ও ছামূদ জাতির বসতির ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন এ কাফেররা কি দেখেনি, শাম প্রভৃতির সফরে ওরা যা অতিক্রম করে থাকে? এবং এরা কি ওদের শোচনীয় পরিণামের কথা শোনেনি? আশ্চর্যের বিষয়, এসব দেখার ও শোনার পরও এরা সতর্ক হল না এবং মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখল না।

৪. অর্থাৎ নদী-নালা ও সাগর-সমুদ্রের পানি, অথবা বৃষ্টির পানি।

৫. أرض جرز প্রত্যেক সেই শুষ্ক যমীনকে বোঝায়, যা তরুলতাশূন্য।

الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ۝

অতঃপর তার দ্বারা শস্য উৎপন্ন করি, যা থেকে আহার করে ওদের গবাদি পশু এবং ওরা নিজেরাও? তবুও কি ওরা দেখে না[১]?

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

২৮. আর ওরা জিজ্ঞাসা করে, 'কবে হবে এই ফয়সালা? (বল), যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ۝

২৯. আপনি বলুন, 'ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান আনয়ন ওদের কোনো কাজে আসবে না এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হবে না[৩]।'

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ۝

৩০. অতএব আপনি ওদের অগ্রাহ্য করুন এবং প্রতীক্ষা করুন, ওরাও প্রতীক্ষা করছে[৪]।

কেউ কেউ এর দ্বারা মিসরের ভূমি এবং الماء দ্বারা নীলনদের পানি উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু শব্দদ্বয়কে এরূপ সীমিত বা বিশেষিত করার কোনো প্রয়োজন নেই, যেমন ইবনে কাছীর র. বলেছেন।

১. অর্থাৎ উল্লিখিত নিদর্শনাদি দেখে এদের উচিত ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরত, রহমত ও হেকমত স্বীকার করা এবং এ সত্য উপলব্ধি করা যে, ঠিক এভাবে মৃত লাশের মধ্যেও পুনর্বার জীবন দান করা তাঁর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আর সেই সাথে মনেপ্রাণে আল্লাহর নে'য়ামতসমূহের শোকর আদায় করা উচিত ছিল।

২. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, ওদের মীমাংসা কিয়ামতের দিন করা হবে। এতে কাফেররা বলত, তোমরা কিয়ামত কিয়ামত বলছ, যদি সত্যবাদী হও তবে বল, সেই দিন কবে আসবে? অর্থাৎ এ সবই কেবল ধমকির কথা, আসলে কিয়ামত ইত্যাদি কিছুই নেই।

৩. অর্থাৎ এখনো সুযোগ আছে। আল্লাহ ও রাসূলের কথায় বিশ্বাস কর এবং সেই দিনের আযাব থেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নাও। নতুবা সেদিন এসে পড়লে আর ঈমান আনয়নেও লাভ হবে না, শাস্তির মধ্যেও কোন ঢিল হবে না এবং এই অবকাশও পাবে না যে, আবার (দুনিয়ায় এসে) আমল-আখলাক দুরস্ত করে তারপর হাযির হবে। বরং বর্তমানের অবকাশকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ কর। হাসি-বিদ্রুপে সময়-সুযোগকে নষ্ট করো না। যে কিয়ামতের আসার তা আসবেই আসবে, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। সুতরাং তা কখন আসবে এবং কখন মীমাংসা হবে– এ কথা নিতান্তই অর্থহীন।

৪. অর্থাৎ যারা এতই নিশ্চিন্ত ও নির্বোধ যে, সীমাহীন অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বিচার ও শাস্তির দিন সম্বন্ধে উপহাস করে, তাদের পথে আসার কী আশা করা যায়? সুতরাং আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের যথাকর্তব্য পালন করার পর ওদের চিন্তা বাদ দিন এবং ওদের ধ্বংসের অপেক্ষা করুন, যেরূপ ওরা নিজেদের ধারণায় (العياذ بالله) আপনার ধ্বংসের অপেক্ষা করছে।

সূরা আহযাব

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৩৩ । ৭৩ আয়াত । ৯ রুকূ । মাদানী

آیاتہا ۷۳، رکوعاتہا ۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন, আর কাফের ও মুনাফিকদের কথা শুনবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾

২. এবং আপনার নিকট আপনার রবের পক্ষ থেকে যে ওহী প্রেরণ করা হয়, তার অনুসরণ করুন। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

৩. আর আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[১]।

---

১. অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আপনার যে নীতি রয়েছে, ভবিষ্যতেও সর্বদা সেই নীতিরই অনুসরণ করুন, অর্থাৎ এক আল্লাহকেই ভয় করতে থাকবেন এবং কাফের ও মুনাফিকদের কথা কখনো মানবেন না। এরা সকলে মিলে যত বড় দলই গঠন করুক, ষড়যন্ত্র করুক, মিথ্যা দাবি মানাতে চাক, প্রতারণামূলক পরামর্শ দিক, নিজেদের দিকে টানতে চাক— আপনি এদের কোন পরোয়া করবেন না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয় কাছেও ভিড়তে দেবেন না। একমাত্র প্রতিপালকের কথাই মেনে চলবেন, তাঁরই সামনে মাথা নত করবেন। সারা সৃষ্টিজগত একত্র হয়ে আসলেও আল্লাহর মোকাবেলায় কারো কথা শুনবেন না।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত হাল-অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবগত। সুতরাং তিনি যখন যে নির্দেশ দেবেন, তা একান্তই জ্ঞাতসারে ও হেকমতপূর্ণভাবে দেবেন। তাতেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ হবে। আর যখন তাঁর নির্দেশ মত চলতে থাকবেন এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখবেন, তখন তিনি নিজ কুদরতে আপনার সকল কাজ সমাধা করে দেবেন। সুতরাং একমাত্র তাঁরই সত্তা ভরসাস্থল হওয়ার যোগ্য। যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে তাঁরই হয়ে যাবে, সে অন্য দিকে মন দিতে পারবে না। দুটি অন্তর থাকলে না হয় একটি অন্যদিকে যেতে পারত।

কিন্তু কবির ভাষায়-

سینے میں کسی شخص کے دو دل نہیں ہوتے

অর্থাৎ, কোন মানুষের বক্ষে দুইটি অন্তর থাকে না।

৪. আল্লাহ কোন ব্যক্তির জন্য তার অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। এবং তোমাদের স্ত্রীদের -যাদের সাথে তোমরা 'জেহার' করেছ- তোমাদের সত্যিকারের মা বানাননি, আর তোমাদের পালক-পুত্রদের তোমাদের প্রকৃত পুত্রও বানাননি। এসব তোমাদের মুখের কথামাত্র। আর আল্লাহ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন[১]।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰـٓئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ۝

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেররা চাইত নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে, আর মুনাফিকরা চাইত নিজেদের মন-মতলব মত চালাতে, অথচ নবীজির ভরসা ছিল আল্লাহর উপর। (অতএব) তাঁর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান আর কে হবে?'

১. অর্থাৎ একজন মানুষের বক্ষে যেমন দুটি অন্তর থাকে না, তদ্রূপ এক ব্যক্তির দুই মাতা অথবা এক পুত্রের দুই পিতা থাকে না। ইসলামপূর্ব যুগে কেউ স্ত্রীকে মা বলে ফেললে অবশিষ্ট জীবন সেই স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক থাকত। এ শব্দ ব্যবহার দ্বারা স্ত্রী যেন তার সত্যিকারের মা হয়ে গেল। আর কাউকে যদি মুখ-ডাকা ছেলে বানিয়ে নিত, তবে তাকে সত্যি সত্যিই ছেলে মনে করা হত এবং তার ব্যাপারে ছেলের সকল বিধি-বিধান চালু হয়ে যেত।

কুরআন কারীম উল্লিখিত শাব্দিক ও কৃত্রিম সম্পর্ককে প্রকৃত ও সৃষ্টিগত সম্পর্ক থেকে ভিন্ন করার জন্য এসব ভ্রান্ত রীতি-নীতির কঠোর প্রতিবাদ করত ঘোষণা করছে— স্ত্রীকে মা বললেই যদি সত্যিকারের মা হয়ে যায়, তবে কি সে (স্বামী) দুই মায়ের পেট থেকে জন্মেছে? এক- তাকে গর্ভে ধারণকারী মা, আর দ্বিতীয়- যাকে সে মা বলেছে।

অনুরূপ, কেউ যায়েদকে পুত্র বানাল। এখন এক পিতা তো তার পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল, যার ঔরষে সে জন্ম নিয়েছে। এখন কি মানতে হবে যে, সে দুই বাপের দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে জন্ম নিয়েছে? যখন এমনটি নয়, তখন সত্যিকারের পিতা-মাতা ও সন্তানের বিধি-বিধান এদের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। বরং স্ত্রীকে মা ডাকার হুকুম তাই, যা সূরা তাহরীমে বর্ণিত হবে, আর পালকপুত্রের (মুখে ডাকা পুত্রের) হুকুম সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

ذلكم قولكم بافواهكم

উল্লিখিত বিষয় দুটির সাথে তৃতীয় একটি বিষয় (ভূমিকা ও ব্যাখ্যাস্বরূপ) বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুখে এমন অনেক কথা বলা হয়, যা মুখের কথাই থাকে, বাস্তব হয়ে যায় না। যেমনঃ অস্থিরচিত্ত মানুষ, দ্বিমুখী আচরণের মানুষ, অসাধারণ স্মরণশক্তি ও পরিপক্ক অন্তরবিশিষ্ট মানুষ এবং একই সময়ে দুটি ভিন্ন বিষয়ের প্রতি নজর দিতে পারে এমন মানুষ— এদের প্রত্যেকের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তার দুটি অন্তর রয়েছে। অথচ বুক ফেড়ে দেখা হলে একটি অন্তরই পাওয়া যাবে। অনুরূপ, মা ছাড়া অন্য কাউকে মা, বাপ ছাড়া অন্য কাউকে বাপ,

৫. তোমরা পালকপুত্রদের তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক। আল্লাহর নিকট এ-ই অধিক ন্যায়সংগত[১]। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে (তারা) তোমাদের দীনী ভাই ও বন্ধু[২]। তোমরা কোন ভুল করে ফেললে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। কিন্তু যা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, (তার কারণে গোনাহ হবে)। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৩]।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৬. নবী ঈমানদারদের তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ[৪]

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

কিংবা পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে পুত্র বলে ফেললে বাস্তবেই সে মা/বাবা/পুত্র হয়ে যায় না। অতএব কৃত্রিম সম্পর্ক ও প্রকৃত সম্পর্কের মধ্যে তালগোল পাকানো উচিত নয়।

১. অর্থাৎ সঠিক বিচার-বুদ্ধির কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রকৃত পিতার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হবে। কেউ পালক পুত্র বানালেই সে এর প্রকৃত পিতা হয়ে যায় না। তবে আদর-মহব্বতের সাথে কেউ কাউকে রূপকভাবে ছেলে বা বাবা বলে ডাকল–এটা ভিন্ন বিষয়। মোটকথা, বংশীয় সম্পর্কের হেফাজত জরুরি। যাতে তার ও তার বিধানের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না আসতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ বিন হারেছাকে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত করত পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। ফলে তখনকার সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী লোকেরা তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে ডাকতে লাগল। এ আয়াত নাযিল হলে সকলে যায়েদ বিন হারেছা বলা শুরু করল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০০০, ৪৭৮২)

২. অর্থাৎ পিতা কোন্ ব্যক্তি তা যদি জানা না থাকে, তবে অসুবিধা নেই। যা হোক, তারা তোমাদের দীনী ভাই ও বন্ধু। সুতরাং এসব শব্দ দ্বারাই তাদের স্মরণ করো। সে মত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ বিন হারেছাকে أنت أخونا ومولانا বলে সম্বোধন করলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬৯৯)

৩. অর্থাৎ ভুল করে বা না জেনে একজনের পুত্রকে আরেকজনের সাথে সম্পর্কিত করে ফেললে তা মার্জনীয়। কোন বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গেলে গোনাহ নেই। হাঁ, স্বেচ্ছায় বললে গোনাহ আছে। তবে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এও ক্ষমা করে দেবেন।

৪. **মুমিনদের জীবনে নবীজির (স.) গুরুত্ব-মাহাত্ম্য**

গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মুমিনের ঈমান হচ্ছে সেই মহান নূরের একটি শিখা, যা নবুওয়াত-সূর্য থেকে প্রসার লাভ করেছে। পয়গম্বর আলাইহিস সালামই হলেন সেই

وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ

এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা[১]। আর জন্মসূত্রের আত্মীয়স্বজন আল্লাহর বিধানে (অন্যান্য) ঈমানদার ও মুহাজিরের চেয়ে একে অন্যের বেশি ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা

নবুওয়াত-সূর্য। এ কারণে একজন মুমিন যদি নিজ হাকীকত ও স্বরূপ উপলব্ধি করার ইচ্ছা করে, তবে স্বীয় ঈমানী অস্তিত্বের পূর্বে পয়গম্বর আলাইহিস সালামের পরিচয় লাভ করতে হবে। (কারণ, নবীজির অস্তিত্বই তার ঈমানী উৎস ও ভিত্তি।) এ হিসাবে বিনা দ্বিধায় বলা যায়, নবীর বরকতময় অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্বের চেয়েও আমাদের বেশি ঘনিষ্ঠ। আর এই রূহানী সম্পর্কের কারণে এ কথা বলা যথার্থই হবে যে, নবী মুমিনদের নিকট পিতৃস্থানীয় বরং তা অপেক্ষাও অধিক ঘনিষ্ঠ । আবু দাউদ শরীফের হাদীস (৮) — إنما أنا بمنزلة الوالد الخ এবং উবাই বিন কা'ব প্রমুখের কিরাতে اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ এর পরে বিদ্যমান- وهو أب لهم বাক্যটি এই তাৎপর্যই প্রকাশ করে।

মুমিনদের প্রতি নবীজির এহসান-অনুগ্রহ

পিতা-পুত্রের সম্পর্ক নিয়ে চিন্তা করলে এ সত্যই প্রকাশ পাবে যে, পুত্রের শারীরিক অস্তিত্ব পিতার শরীর থেকে এবং পিতার স্বাভাবিক আদর-স্নেহ ও শিক্ষাদীক্ষা অন্যদের তুলনায় বেশি। কিন্তু নবী ও উম্মতের সম্পর্ক কি এর চেয়ে কম? না। বরং উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের ঈমানী ও রূহানী অস্তিত্ব বস্তুত নবীর মহান রুহানী অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব ও ছায়া। আর নবীর তরফ থেকে যে স্নেহ-মমতা ও শিক্ষাদীক্ষা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা মাতাপিতা কেন, সমস্ত সৃষ্টিজগতে এর তুলনা পাওয়া যেতে পারে না। পিতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ার অস্থায়ী জীবন দান করেছেন, কিন্তু নবীর ওসীলায় শাশ্বত ও চিরস্থায়ী জীবন লাভ হয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য এমন কল্যাণকামী শিক্ষাদীক্ষা এবং রুহানী পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন, যা আমরা নিজেরাও নিজেদের জন্য করতে পারি না। এসব কারণে আমাদের জান-মালে নবীর সেই অধিকার রয়েছে, যা দুনিয়াতে আর কারো নেই।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। সুতরাং কোন উম্মতীর নিজের ধন ও প্রাণে নিজ অধিকার ততটা চলে না, যতটা চলে নবীর। জ্বলন্ত আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করা জায়েয নয়; কিন্তু নবী হুকুম করলে তা ফরয হয়ে যাবে"।

এসব তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই হাদীছে বলা হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে কোন মানুষই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র ও সকল মানুষ বরং তার প্রাণ থেকেও বেশি প্রিয় হব।" (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৫,৬৬৩২)

১. অর্থাৎ ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং শরী'য়ত কর্তৃক প্রমাণিত কতক বিধানের দিক দিয়ে তাঁরা দীনী মাতা। সকল দিক দিয়ে নয়।

أَنْ تَفْعَلُوٓا إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُورًا ⑥

তোমাদের বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে (তা করতে পার)[১]। এ বিষয় কিতাবে লিখিত আছে[২]।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرٰهِيمَ وَمُوسٰى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ⑦

৭. (স্মরণ কর), যখন আমি নবীদের নিকট থেকে ও আপনার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারয়ামের নিকট থেকেও। আমি তাঁদের নিকট থেকে নিয়েছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার[৩]—

---

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যারা হিজরত করেছিলেন এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তাদের ও মদীনার আনসারদের থেকে দুই দুই জনের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুহাজিরদের আত্মীয়স্বজন মুসলমান হয়ে গেলে বিধান দেওয়া হল, জন্মগত আত্মীয়তা এই ভ্রাতৃত্ব থেকে অগ্রগণ্য। সুতরাং উত্তরাধিকার সম্পত্তি ইত্যাদি আত্মীয়দের মধ্যেই বণ্টিত হবে, তবে হৃদ্যতামূলক আচার-ব্যবহার ওই ভাইদের সঙ্গেও করে যেতে হবে।

২. অর্থাৎ এ কথা কুরআনে সর্বদার জন্য লিখে দেওয়া হল। অথবা তাওরাতের মধেও এ কথা থেকে থাকবে। অথবা হতে পারে, 'কিতাব' দ্বারা 'লওহে মাহফূজ' উদ্দেশ্য ।

৩. অর্থাৎ এ অঙ্গীকার নিয়েছি যে, তাঁদের একে অন্যকে সহযোগিতা ও সমর্থন করবেন এবং দীন প্রতিষ্ঠা করতে এবং আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌছাতে কোন ত্রুটি করবেন না। সূরা 'আলে-ইমরানে' (আয়াত ৮২) এই অঙ্গীকার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'ইতিপূর্বে নবীজি স. সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, মুমিনদের উপর তিনি তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি অধিকার রাখেন। এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, নবীগণ এ মর্যাদা এজন্য লাভ করেছেন যে, তাঁদের পরিশ্রম ও দায়িত্বও সবার চেয়ে বেশি। তাঁরা একাই সৃষ্টিকুলের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং কারো থেকে ভয় ও আশা রাখেন না। এটা পয়গম্বর ছাড়া আর কার দ্বারা সম্ভব হতে পারে?'

উল্লিখিত পাঁচজন পয়গম্বরের বিশিষ্টতা

এস্থলে বিশেষভাবে যে পাঁচজন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন 'উলুল আযম' অর্থাৎ অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত পয়গম্বর। তাঁদের দাওয়াত ও হেদায়াতের কার্যকারিতা হাজারো বছর ছিল এবং দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত থাকবে। তাঁদের মধ্যে প্রথমে আমাদের নবীজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও দুনিয়াতে তাঁর আবির্ভাব সর্বশেষে হয়েছে, কিন্তু মর্যাদায় তিনি সবার আগে। আর তাঁর অস্তিত্বও অদৃশ্য জগতে সবার আগে, যেমন হাদীসে প্রমাণিত আছে। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৬০৯)

৮. যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন[১]। আর তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যাতনাদায়ক শাস্তি ।

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۟

[রুকূ - ২]

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন (শত্রু) বাহিনীগুলো তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল। আমি তখন ওদের বিরুদ্ধে এক ঝঞ্ঝাবায়ু ও সেইসব বাহিনী পাঠিয়ে দিলাম, যাদের তোমরা দেখনি[২]। আর তোমরা যা করছিলে, আল্লাহ তা দেখছিলেন[৩]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۟

---

১. অর্থাৎ, যাতে অঙ্গীকার অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরদের যবানীতে নিজ বিধান মানবের কাছে পৌছান এবং দলীল-প্রমাণ পরিপূর্ণ করে দেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যাতে সত্যবাদীদের সত্যের উপর কায়েম থাকা প্রকাশ পায় এবং অস্বীকারকারীদের সত্য অস্বীকারের শাস্তি দেওয়া যায়।

সামনে 'আহযাব' যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যার অধীনে পয়গম্বর আলাইহিস সালাম ও মুমিনদের এবং তাঁদের বিপরীতে মিথ্যাবাদী মুনাফিক ও অবিশ্বাসীদের কিছু হাল-অবস্থা (পরিণামসহ) উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ ফেরেশতাদের ফৌজ, যাঁরা কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করছিলেন।

৩. **আহযাবের যুদ্ধের ঘটনা**

হিজরতের চতুর্থ বা পঞ্চম বছর মদীনা থেকে বহিষ্কৃত 'বনু নাযীর' গোত্রের ইহুদীরা (যাদের বহিষ্কারের ঘটনা সূরা হাশরে আসবে) আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে গিয়ে কুরায়শ, বনু ফাযারা ও গাতফান প্রভৃতি গোত্রকে (ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে) উত্তেজিত করে তোলে এবং এদের সম্মিলিত শক্তিকে এক্কাট্টা করতে সফল হয়। প্রায় বার হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে মদীনার উপর চড়াওয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

'বনু কুরায়জা'র-ইহুদীরা যাদের মদীনার পূর্ব দিকে এক মজবুত দূর্গ ছিল, পূর্ব থেকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বনু নাযীরের ইহুদীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় শেষ পর্যন্ত এরাও সন্ধি ভঙ্গ করত আক্রমণকারীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মুসলমানদের সম্মিলিত সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার, যাদের মধ্যে আবার দাগাবাজ

মুনাফিকদের এক বিরাট দল ছিল, যারা এ সংকট-সময়ে মিথ্যা হিলা-বাহানা করে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অবশেষে হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শক্রমে যেদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, শহরের সেদিকে পরিখা খনন করা হল।

প্রচণ্ড শীতের মৌসুম ছিল। সেই সঙ্গে খাদ্যাভাবে ক্ষুধার তাড়নায় সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং স্বয়ং সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রভুপ্রেমে মাতোয়ারা এই সৈন্যবাহিনী ও তাঁদের সেনাপতি কঙ্করময় ভূমি খননে বিস্ময়কর শক্তি-ক্ষমতা ও হিম্মতের এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মুজাহিদদের দল পাথুরে মাটিতে কোদাল মারতেন এবং সমস্বরে বলে উঠতেন-

نحن الذين بايعوا محمدا ~ على الجهاد ما بقينا أبدا

('আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়'আত করেছি, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জেহাদ করে যাব।')— অন্যদিকে দরবারে মুহাম্মদী থেকে উত্তর আসতে থাকত–

اللّٰهُمَّ لاعيش إلا عيش الآخرة ÷ فاغفر الأنصار والمهاجرة

('ইয়া আল্লাহ! আখেরাতের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। অতএব আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দিন।')

পরিখা খনন সমাপ্ত হলে ইসলামী বাহিনী শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যূহ রচনা করে রইলেন। প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়ে রইল, সম্মুখে পরিখা। বিপুল সংখ্যক সৈন্য সত্ত্বেও কাফেররা শহরের উপর আক্রমণের সাহস করতে পারল না। অবশ্য দূর থেকে তীর নিক্ষেপ হচ্ছিল এবং মাঝে-মধ্যে দুই পক্ষের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে লড়াই হত। একদিকে মুশরিকরা, অন্যদিকে 'বনু কুরাইজা'-র ইহুদীরা, মাঝে মুসলিমগণ অবরুদ্ধ অবস্থায়। তবুও তারা শিশু ও নারীদের সকলকে শহরের নিরাপদ স্থানসমূহে রেখে নিজেরা অসম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে শহরের হেফাজত ও প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে কাফেররা ফিরে গেল!

অবশেষে নাঈম বিন মাসউদ আশজাঈ (রা)-এর একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও সূক্ষ্ম কৌশলে মুশরিক ও বনু কুরায়জার ইহুদীদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য ফৌজ কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। তদুপরি একরাতে ভয়ঙ্কর ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হল। পূবালি বাতাসে বালু ও কঙ্কর উড়ে গিয়ে কাফেরদের চোখে-মুখে পড়ছিল। ওদের চুলাসমূহ নিভে গেল, ডেগ-ডেগচী উল্টে গিয়ে মাটিতে পড়ল। রান্নাবান্নার কোন ব্যবস্থাই অবশিষ্ট রইল না। বাতাসের দাপটে তাবুসমূহ উপড়ে গেল, ঘোড়াগুলি ছুটে পালাল। সৈন্যবাহিনী পেরেশান হয়ে গেল, প্রচণ্ডশীত ও অন্ধকার অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সেনাপতি আবু সুফিয়ান প্রত্যাবর্তনের বাঁশি বাজিয়ে দিল, অগত্যা সকলে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

১০. (স্মরণ কর), যখন ওরা তোমাদের উপরে চড়াও হয়েছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে ও নীচের দিক থেকে[১] এবং যখন (তোমাদের) চোখগুলি উদভ্রান্ত হয়েছিল[★২] প্রাণগুলি কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল[৩] এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে[৪]।

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۝

১১. সেখানে[★★] ঈমানদাররা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং হয়েছিল ভীষণভাবে প্রকম্পিত[৫]।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۝

এ যুদ্ধ 'আহযাবের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। একে 'খন্দকের যুদ্ধ'ও বলা হয়। প্রচণ্ড শীতকালে এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় খন্দক খনন করা এবং এত বিপুল সংখ্যক শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করা– এগুলো এমনই কঠিন অবস্থা ছিল যে, মুনাফিকরা দিলের কথা প্রকাশ করা শুরু করে এবং মুমিনরা অবিচলিত থাকে। এ যুদ্ধেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- এখন থেকে আমরা কাফেরদের আক্রমণ করব, ওরা আমাদের আক্রমণ করতে সাহস পাবে না। ইতিহাস সাক্ষী– তাই ঘটেছিল।

১. অর্থাৎ মদীনার পূর্বদিক থেকে, যা উঁচু এবং পশ্চিমদিক থেকে, যা নীচু।

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'দৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল উদভ্রান্ত'।

২. অর্থাৎ আতঙ্কে ও ভয়ে লোকদের চোখ উদভ্রান্ত হয়ে গেল এবং তাদের আচরণে পরিবর্তন শুরু হল, তথা বন্ধুত্ব প্রকাশকারীরা সাহায্য না করে এড়িয়ে যেতে লাগল।

৩. অর্থাৎ ভয়-বিহ্বলতায় অন্তর কাঁপছিল, তা যেন নিজ স্থান থেকে উঠে এসে গলায় আঁটকে গেছে।

৪. অর্থাৎ কেউ এক রকম ভাবছিল, অন্য কেউ আরেক রকম জল্পনাকল্পনা করছিল। মুসলিমগণ ভাবল, এবার আরো কঠিন পরীক্ষা এল। দেখা যাক, কী অবস্থা দাঁড়ায়। অপরিপক্ক ঈমানদাররা ধারণা করল যে, এবার আর রক্ষা নেই। মুনাফিকদের তো কথাই নেই। সামনে এদের উক্তি উল্লেখ করা হবে।

★★ দ্বিতীয় তরজমা– 'তখন'

৫. হযরত হুযাইফা (রা) কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনদের খবর আনতে পাঠিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত ঘটনা হাদীছের কিতাবে পড়লে তারা কেমন প্রকম্পিত হয়েছিলেন, তা কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। এখানে পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করার অবকাশ নেই। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৮৮)

১২. এবং (স্মরণ কর), যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলতে লাগল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়[১]।'

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲﴾

১৩. এবং যখন ওদের একদল বলতে লাগল, 'হে ইয়াছরিববাসী[২]! তোমাদের কোন ঠাঁই থাকবে না[★], সুতরাং ফিরে চল'। ওদের আরেকদল নবীর নিকট (যুদ্ধে না থাকার) অনুমতি প্রার্থনা করে বলতে লাগল, 'আমাদের ঘরগুলো অরক্ষিত পড়ে আছে', অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। ওরা কেবল ভেগে যেতে চাচ্ছিল[৩]।

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿۱۳﴾

---

১. কোন কোন মুনাফিক বলতে লাগল, পয়গম্বর সাহেব বলতেন, আমার দীন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রসার লাভ করবে, আর পারস্য-রোম ও সানআর মহল্লাসমূহ আমাকে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখন তো মুসলমানরা পেশাব-পায়খানার জন্যও বের হতে পারছে না। কোথায় সেসব প্রতিশ্রুতি?

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'নৈরাশ্যের সময়ও মুসলমানদের বে-ঈমানীর কথাবার্তা বলা উচিত নয়।'

২. পবিত্র মদীনার পুরাতন নাম ছিল 'ইয়াছরিব'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনার পর তার নাম 'মদীনাতুন নবী' হয়।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–**' তোমাদের থাকার জায়গা (এখানে অর্থাৎ মদীনার বাইরে এই যুদ্ধক্ষেত্রে) নয়'।

৩. অর্থাৎ সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে গেলে আমাদের ঠাঁই হবে কোথায়? সুতরাং সৈন্যদের থেকে আলাদা হয়ে সকলে ঘরে ফিরে চল। তখন হুজূর (স) সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে অবস্থান করছিলেন। তারা স্বীয় নারীদের শহরে সুরক্ষিত বাড়িতে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তাদের একদল (মুনাফিক) বাহানা করে বলতে লাগল, 'আমাদের ঘরগুলো উন্মুক্ত পড়ে রয়েছে, চোর ঢুকে লুট-পাট করে নিতে পারে।' এটা ছিল নিতান্ত বানানো কথা। কোন একটা বাহানায় রণাঙ্গন থেকে পলায়নই উদ্দেশ্য ছিল।

১৪. আর যদি মদীনায় তার বিভিন্ন দিক থেকে শত্রুরা ওদের নিকট উপস্থিত হয়, অতঃপর ওদের ফাসাদ করতে বলা হয়— তবে অবশ্যই তাতে লিপ্ত হবে, আর তখন ঘরে অবস্থান করবে না, তবে সামান্যই[১]।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝

১৫. ওরা তো ইতিপূর্বে আল্লাহর সঙ্গে এই অঙ্গীকার করেছিল যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে[২]।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝

১৬. আপনি বলুন, 'পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না, যদি তোমরা মৃত্যু থেকে বা নিহত হওয়া থেকে পলায়ন কর। আর সেক্ষেত্রেও তোমাদের অল্প দিনই জীবনোপভোগ করতে দেওয়া হবে[৩]।'

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

তাদের যে যে অনুমতি নিতে এল, সৈন্যসংখ্যার পরোয়া না করে নবীজি (স) অনুমতি দিতে থাকেন। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায়, শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনশত পবিত্রাত্মা সাহাবী হুযূরের সঙ্গে অবশিষ্ট রইলেন। (দালাইলুন নবুওয়াহ্ ৩/৪৫১)

১. অর্থাৎ এখন তো ওরা মিথ্যা বাহানা তৈরি করছে। কিন্তু মনে কর, ওরা যদি মদীনা শহরে থাকে এবং শত্রুপক্ষ বিভিন্ন দিক থেকে সেখানে ঢুকে পড়ে, অতঃপর ওদেরকে ইসলাম ধর্ম যা ওরা অবলম্বন করে আছে– ত্যাগ করতে বলে, অথবা মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করতে ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে বলে, তখন ওদের মুনাফেকি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পেয়ে যাবে। ওরা তৎক্ষণাৎ শত্রুদের কথা মেনে ওদের সহযোগিতায় বের হয়ে পড়বে। তখন ঘরদোর খোলা থাকার বা চুরিধারি হওয়ার ওযর করবে না। (الا يسيرا) কথাবার্তা বলতে এবং অস্ত্র নিয়ে আসতে যতটুকু সময় প্রয়োজন, তা ছাড়া এক মিনিটও দেরি করবে না, ইসলামের বাহ্যিক দাবি-দাওয়া ছুড়ে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফেতনা-ফাসাদের আগুনে লাফিয়ে পড়বে।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "উহুদ যুদ্ধের পর ওরা অঙ্গীকার করেছিল, 'আমরা আর কখনো এ রকম আচরণ করব না।' সেজন্য আল্লাহর তরফ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ হবে যে, এই ওয়াদা-অঙ্গীকার কোথায় গেল?"

৩. অর্থাৎ যার ভাগ্যে মৃত্যু রয়েছে, সে কোথাও পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর হুকুম সর্বত্র পৌঁছবেই পৌঁছবে। আর যদি ভাগ্যে এখন মৃত্যু না-ই থাকে, তবে রণাঙ্গন থেকে পালানো অর্থহীন। রণাঙ্গনে কি সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়?— আর ধরে নাও, পালিয়ে রক্ষা পেলেই, কিন্তু সেই রক্ষা কত দিনের? শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তো আসবেই। এখন না

১৭. আপনি বলুন, 'কে সে, যে আল্লাহ থেকে তোমাদের রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের ব্যাপারে কোন অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন? কিংবা (কে তাঁর দয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে, যদি তিনি) তোমাদের প্রতি দয়ার ইচ্ছা করেন[১]?' আর ওরা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া না কোনো অভিভাবক পাবে আর না কোন সাহায্যকারী[২]।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷﴾

১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সেই লোকদের ভাল করে জানেন, যারা বাধা দেয় এবং নিজেদের ভাইদের বলে, 'আমাদের নিকট চলে আস'। আর ওরা যুদ্ধে আসে না, তবে সামান্যই[৩];

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۸﴾

১৯. ওরা তোমাদের বিষয়ে সংকীর্ণমনা[৪]। যখন ভয়ের মুহূর্ত আসে, তখন আপনি ওদের

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ

এসে কয়েক দিন পরে আসবে। কিন্তু তখন কেমন কঠোরতা ও অপমানের সাথে আসবে তা জানা নেই।

১. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারে, এমন কোন শক্তি নেই। কোন হিলা-কৌশল তাঁর মোকাবেলায় কোন কাজে আসতে পারে না। অতএব মানুষের কর্তব্য, তাঁর উপর নির্ভর করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকা। দুনিয়ার ভাল-মন্দ বা সুখ-দুঃখ যতটুকু লেখা আছে, নিশ্চিতরূপে আসবেই আসবে। সুতরাং আল্লাহর পথে ভীরুতা প্রদর্শন করে এবং প্রয়োজনের সময় পিছিয়ে থেকে লাভ কী? এতে বরং পরকালও খারাপ হয় এবং দুনিয়ার কষ্টও এড়ানো যায় না।

২. অর্থাৎ তোমরা আরবের কাফের-মুশরিকদের শত্রতাকে ভয় করছ। অথচ যদি আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন, তবে মুসলমানরাই (মুনাফেকির কারণে) তোমাদের হত্যা করে ফেলতে পারে।

৩. অর্থাৎ বাহ্যিক ভদ্রতা দেখানোর জন্য ও নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। নতুবা সাধারণত ঘরে বসেই আয়েশ করতে থাকে এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা পাক্কা মুসলমান, তাদেরও জেহাদে যোগ দিতে বারণ করতে থাকে।

৪. অর্থাৎ ওরা মুসলমানদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকে এবং তাদের সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রেই ওদের যত কৃপণতা। হাঁ, গনীমতের মাল আসলে লোভের আতিশয্যে

رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ⑲

দেখবেন– আপনার দিকে ঘূর্ণায়মান চোখে সেই ব্যক্তির মত তাকাচ্ছে, যে মৃত্যুভয়ে মূর্ছা যাচ্ছে। অতঃপর যখন ভয় চলে যায়, তখন ধারালো যবান দিয়ে তোমাদের বড় বড় কথা শোনায়* সম্পদের প্রতি লালায়িত হয়ে[১]। ওরা ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ ওদের আমলগুলো বিফল করে দিয়েছেন। আর তা আল্লাহর জন্য সহজ[২]।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ

২০. ওরা মনে করছে যে, (কাফেরদের) বাহিনীগুলো চলে যায়নি। আর যদি সেসব বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে কামনা করবে, হায়! ওরা যদি গ্রামে গিয়ে গ্রাম্যদের সাথে থাকত, আর (সেখানে থেকেই) তোমাদের খবরাদি জিজ্ঞাসা করে নিত[৩]।

চায় যে, কেউ কিছু না পাক, সমস্তটা নিজেরাই নিয়ে নিক। এই আশায় কদাচিৎ যুদ্ধে যোগদানও করে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'তীব্র ভাষায় তোমাদের সমালোচনা করে'।

১. অর্থাৎ বিপদের সময় সহযোগিতা না করে কেটে পড়ে, ভয়ের চোটে প্রাণ বের হয়ে যায়। আর বিজয় হলে উপস্থিত হয়ে বড় বড় কথা বলে, নিজেদের বাহাদুরির কথা শোনায় এবং লোভের কারণে গনীমতের সম্পদের প্রতি উন্মুখ হয়ে পড়ে। অথবা (سلقوكم..)-এর অর্থ এই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে।

২. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের প্রতি ঈমান নেই, তাই কোন আমলই কবুল হতে পারে না।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আমল বরবাদ হওয়ার কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে বলা হয়েছে যে, এ আল্লাহর পক্ষে সহজ।' অর্থাৎ বাহ্যত আল্লাহ তাআলার ন্যায়-বিচার ও হেকমত দর্শনে এটা কঠিন মনে হয় যে, তিনি কারো মেহনত কী করে বিনষ্ট করতে পারেন? কিন্তু এ কারণে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, স্বয়ং আমলের মধ্যেই এমন ত্রুটি থাকে, যা কোনক্রমেই আমলটিকে দুরুস্ত হতে দেয় না– যথা বে-ঈমানের আমল। কারণ, ঈমান প্রত্যেক আমলের জন্য শর্ত ও প্রাণ, ঈমান ছাড়া তা মৃত। সুতরাং কবুল হবে কিভাবে? কাফের যতই আমল করুক না কেন, সমস্তই বরবাদ।

৩. অর্থাৎ কাফেরদের বাহিনী বিফল হয়ে ফিরে গেছে; কিন্তু এই ভীরু মুনাফিকরা বিশ্বাস করতে পারছে না যে, ওরা সত্যিই চলে গেছে। আর কাফের বাহিনী যদি ফিরে এসে আবার

وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ۝٢٠

আর যদি ওরা তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে অল্পই যুদ্ধ করবে[১]।

[রুকূ - ৩]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝٢١

২১. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ— তার জন্য, যে আল্লাহ ও কিয়ামত-দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে[২]।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝٢٢

২২. আর মুমিনগণ যখন সেই বাহিনীগুলো দেখল, তারা বলে উঠল, 'এ তো তা-ই, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন।' আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই আরো বৃদ্ধি পেল[৩]।

আক্রমণ করে, তবে তখন ওদের কামনা হবে— শহরে না থেকে যুদ্ধ চলাকালীন কোন গ্রামে গিয়ে বাস করা এবং সেখানে বসে বসেই যাতায়াতকারীদের জিজ্ঞাসা করা যে, মুসলমানদের অবস্থা কী, যুদ্ধের চিত্র কী রকম?

১. অর্থাৎ মুখে তো তোমাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা দেখাবে, কিন্তু যুদ্ধে তোমাদের তেমন কাজে আসবে না। নিতান্ত বাধ্য হলে নামকাওয়াস্তে যোগ দেবে।

২. অর্থাৎ নবীজির প্রতি লক্ষ কর—তিনি এই কঠিন ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কীরূপ দৃঢ় ও অবিচল রয়েছেন। অথচ সর্বাপেক্ষা শঙ্কা ও চিন্তা তাঁরই। কিন্তু তাঁর পাহাড়সম দৃঢ়তায় একটুও ছেদ পড়া অসম্ভব! বস্তুত, যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং আখেরাতের ছওয়াব পাওয়ার আশা রাখে এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সত্তার মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।

অতএব তাদের উচিত- প্রত্যেক ব্যাপারে ও কাজকর্মে, চিন্তা-ভাবনায় ও ওঠা-বসায়, এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা এবং বিশেষত তাঁর আদর্শ থেকে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার গুণ শিক্ষা করা।

৩. অর্থাৎ পাক্কা মুমিনগণ যখন দেখল, কাফের বাহিনীগুলো একত্র হয়ে চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন বিচলিত ও পেরেশান না হয়ে তাদের আনুগত্য এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতির উপর তাদের বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। তারা বলতে লাগল, এ তো সেই দৃশ্য, যার সংবাদ আল্লাহ ও রাসূল পূর্বেই দিয়েছিলেন এবং যার সম্পর্কে আগে থেকেই তাঁদের

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۝

২৩. ঈমানদারদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত নিজেদের প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কেউ তো নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে* এবং কেউ প্রতীক্ষা করছে। আর তারা (তাদের প্রতিশ্রুতি) সামান্যও পরিবর্তন করেনি১—

প্রতিশ্রুতি ও ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান ছিল। যথা: সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ ('তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ তোমাদের উপর দিয়ে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের অনুরূপ অবস্থা অতিবাহিত হয়নি? তাদের স্পর্শ করেছিল অভাব-অনটন ও রোগ-শোক এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বলতে শুরু করলেন, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য?' শুনে রাখ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই রয়েছে। –বাকারা, ২১৪)—এবং মক্কী সূরা 'সাদ'-এ বলেছিলেন– جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ {'এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাহিনীগুলোর মত এক তুচ্ছ বাহিনী, যারা ওখানে (অর্থাৎ মক্কায়) পরাজিত হবে।— আয়াত ১১}

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'তার মানত পূর্ণ করেছে (অর্থাৎ জেহাদে শহিদ হয়ে গেছে)'।

১. অর্থাৎ মুনাফিকরা যে অঙ্গীকার করেছিল এবং যার উল্লেখ ১৫নং আয়াতে রয়েছে, তা ভঙ্গ করে ওরা নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বহু সংখ্যক পাক্কা মুসলমান এমন আছেন, যারা নিজেদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন– অর্থাৎ বড় বড় সংকট-মুহূর্ত এবং কঠিন পরিস্থিতি দীনের সাহায্য ও পয়গম্বরের সহযোগিতা থেকে তাদের এক পা'ও পিছে হটাতে পারেনি। বরং আল্লাহ ও রাসূলকে তারা যে কথা দিয়েছিলেন,তা পালনে তারা পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থাকেন।

তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন, যারা তাদের কর্তব্য পূর্ণরূপে সেরেছেন, অর্থাৎ জেহাদের মধ্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন– যেমন: বদর ও উহুদের শহীদগণ, যাদের মধ্যে হযরত আনাস বিন নযর রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। আবার অনেকে এমন, যারা অধীর আগ্রহের সাথে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দেওয়ার অপেক্ষা করছেন যে, কবে কোন্ জিহাদের সুযোগ আসবে, যার মধ্যে তাদেরও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ হবে। এই উভয় প্রকার মুমিন নিজেদের অঙ্গীকারের পূর্ণ হেফাজত করেছেন, নিজেদের কথা থেকে এক বিন্দুও নড়েননি।

বি. দ্র. : হাদীসে (তিমরমিযী : ৪৬৭৫) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা (রা) সম্পর্কে বলেছেন- هذا من قضى نحبه (এ তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে)। এভাবে তাঁকে যেন এ জীবনেই শহীদ আখ্যায়িত করলেন। ইনি সেই

২৪. যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদের তাদের সত্যাবাদিতার প্রতিদান দেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দেন যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, অথবা ওদের তওবা করার তাওফীক দেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

لِّيَجْزِىَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

২৫. আল্লাহ কাফেরদের স্বীয় ক্রোধসহ এ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, ওরা কোন কল্যাণই লাভ করতে সক্ষম হয়নি[২]। আর মুমিনদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ তো শক্তিধর, পরাক্রমশালী[৩]।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۭ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ

২৬. আর কিতাবীদের মধ্যে যারা মুশরিকদের সাহায্য করেছিল, তিনি তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ

পবিত্রাত্মা, যিনি উহুদের যুদ্ধে নিজ প্রাণ বিপন্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্য হাত দিয়ে শত্রুদের তীর ঠেকাতে থাকেন, এমনকি তাঁর হাত অকেজো হয়ে যায়। رضي الله تعالى عنه وأرضاه

১. অর্থাৎ যারা প্রতিশ্রুতিতে পরিপক্ক এবং অঙ্গীকারে সত্য রইলেন, সত্যের উপর অবিচল থাকার জন্য তারা প্রতিফল লাভ করবেন। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী দাগাবাজ মুনাফিকদের হয় শাস্তি দিবেন, অথবা তওবার তাওফীক দিয়ে ক্ষমা করবেন। আল্লাহর দয়ার পক্ষে এও অসম্ভব নয়।

২. অর্থাৎ কাফের বাহিনী লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতা নিয়ে এবং আক্রোশে দাঁত কামড়াতে কামড়াতে রণাঙ্গন ত্যাগ করল— বিজয়ও পেল না, সম্পদও হস্তগত হল না। হাঁ, ওদের আমর বিন আবদে-উদ এর ন্যায় প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী, যাকে লোকেরা এক হাজার অশ্বারোহীর সমতুল্য মনে করত, এ যুদ্ধে হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু)-র হাতে নিহত হয়। মুশরিকরা (তদানীন্তন) দশ হাজার মুদ্রার বিনিময়ে ওর লাশ নিয়ে যাওয়ার আবদার করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– তোমরা ওটা এমনিই নিয়ে যাও, আমরা লাশ বেঁচে খাওয়ার মানুষ নই। (দালাইলুন নবুওয়াহ ৩/৪৩৮)

৩. অর্থাৎ আল্লাহ মুসলমানদের বড় ধরনের যুদ্ধের সম্মুখীন করেননি। তিনি নিজ কুদরতে ঝড়-তুফান ও ফেরেশতা-বাহিনী পাঠিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যে, কাফেররা আতঙ্কিত হয়ে নিজেরাই পলায়ন করল। আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির সম্মুখে কে টিকতে পারে?

ভীতি সঞ্চার করলেন— তোমরা কতককে হত্যা করতে লাগলে এবং কতককে বন্দী করতে লাগলে[১]।	قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

১. **বনু কুরায়জার কাহিনী**

এরা হচ্ছে 'বনু কুরায়জা' গোত্রের। মদীনার পূর্ব দিকে ওদের মজবুত দুর্গ ছিল এবং ওরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। আহযাব যুদ্ধের সময় হুয়াই ইবনে আখতাবের প্ররোচনায় ওরা সমস্ত ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুশরিকদের সাহায্যে এগিয়ে গেল। ওদের কেউ কেউ কাপুরুষের ন্যায় মুসলমান মহিলাদের উপর আক্রমণ করতে চাইলে হযরত সাফিয়্যাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বীরত্বের সাথে তা রুখে দেন। কুরায়শ প্রভৃতি কাফের বাহিনী বিজয়ী হতে না পেরে যখন মক্কায় চলে গেল, 'বনু কুরায়জা' নিজেদের মজবুত দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে গোসল ইত্যাদিতে ব্যস্ত হলেন, এমন সময় ধূলামাখা চেহারায় জিবরাঈল (আ) আগমন করে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! আপনি যুদ্ধাস্ত্র খুলে ফেলেছেন, অথচ ফেরেশতাগণ এখনো অস্ত্রসজ্জিত রয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ– বনু কুরায়জার উপর আক্রমণ করা হোক।'

তৎক্ষণাৎ ঘোষণা হল, এখনই বনু কুরায়জার বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে। কালবিলম্ব না করে মুজাহিদরা ওদের দূর্গ অবরোধ করে ফেলল। চব্বিশ দিন অবরোধ চলল। শেষে নিরুপায় হয়ে ইহুদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সন্ধির বিভিন্ন প্রস্তাব পাঠাতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত ওদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল যে, আমরা দূর্গের বাইরে এসে যাব, তবে 'আউস' গোত্রের প্রধান হযরত সা'দ বিন মুআযকে আমরা সালিশ মানছি (কারণ তিনি ওদের বন্ধু ছিলেন)– তিনি আমাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা দেবেন, আমরা তা মেনে নেব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এতে সম্মত হলেন। পরের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, হযরত সা'দ উপস্থিত হলেন এবং সর্বসম্মত বিচারক হিসাবে ফয়সালা করলেন— বনু কুরায়জার সকল যুবককে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুরা দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হবে, আর ওদের ধন-সম্পদ ও জমাজমির মালিক হবেন মুহাজিরগণ।

এ-ই ছিল আল্লাহ ও রাসূলেরও মর্যি এবং ওদের সন্ধি-ভঙ্গের সমুচিত শাস্তি। আর এই ফয়সালা ওদের সর্ববাদী আসমানী কিতাব তাওরাতেরও অনুকূল ছিল। তাওরাতে আছে— 'যখন তুমি কোন শহর আক্রমণ করতে যাবে, তখন প্রথমে সন্ধির আমন্ত্রণ জানাবে। যদি ওরা সন্ধির প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তোমার জন্য দ্বার খুলে দেয়, তবে সেখানকার সকল লোক তোমার দাসে পরিণত হবে। কিন্তু যদি সন্ধি না করে, তবে তুমি ওদের অবরোধ কর এবং যখন তোমার আল্লাহ ওদেরকে তোমার আয়ত্তাধীন করে দেবেন, তখন ওদের সকল পুরুষকে হত্যা করবে– অবশিষ্ট নারী ও শিশু, পশু ও শহরের আসবাবপত্র সবই তোমার গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে।' (দ্বিতীয় বিবরণ ২০ : ১০)।

২৭. আর আল্লাহ তোমাদের মালিক বানিয়ে দিলেন ওদের জমিজমা, বাড়ীঘর ও ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূমির, যে ভূমিতে তোমরা (এখনো) পদার্পণ করনি[১]। আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرًا ﴿۲۷﴾

[রুকূ - ৪]

২৮. হে নবী! আপন স্ত্রীদের বলে দিন, 'তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর জাঁক-জমক চাও, তবে এসো— আমি তোমাদের (কিছু) ভোগ্য-সামগ্রী দিয়ে দেই এবং তোমাদের উত্তমরূপে বিদায় দিয়ে দেই।

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا وَزِیْنَتَهَا فَتَعَالَیْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیْلًا ﴿۲۸﴾

২৯. 'আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের নিবাস কামনা কর, তবে আল্লাহ তো তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহা প্রতিদান[২]।'

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۲۹﴾

এই ফয়সালা অনুযায়ী কয়েকশ ইহুদী যুবক নিহত এবং কয়েকশ নারী ও শিশু বন্দী হল, আর ওদের জমাজমি ও মালামাল মুসলমানদের করায়ত্ত হল। (তবাকাতে ইবনে সাআ'দ ১/২৮৬-২৮৮)

১. মদীনার নিকটবর্তী (ইহুদীদের) এই জমিজমা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এতে তাঁদের জীবিকার উপায় হয় এবং আনসারদের উপর থেকে তাদের ব্যয়ভার হালকা হয়। আর দ্বিতীয় জমি (وارضا لم تطئوها) দ্বারা খায়বরের জমি উদ্দেশ্য, যা আরো দুই বছর পরে হাতে আসে। এতে সকল সাহাবী সচ্ছল হয়ে ওঠেন।

কেউ কেউ বলেন, এ দ্বিতীয় জমি দ্বারা মক্কার জমি উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে পারস্য ও রোমের জমি উদ্দেশ্য, যা হুযূরের পর খুলাফাদের হাতে বিজিত হয়। আবার কারো কারো মতে কিয়ামত পর্যন্ত যত জমি মুসলমানদের করায়ত্ত হবে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. **শানে নুযূল**

হুজূর (সা) এর স্ত্রীগণ লোকদের সচ্ছলতা দেখে নিজেরাও সচ্ছল হতে চাইলেন। তাঁদের কেউ কেউ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বললেন, আমাদের

আরো খোরপোশ ও আসবাব দেওয়া হোক, যাতে আরাম-আয়েশ ও সচ্ছলতার জীবন যাপন করতে পারি। এসব কথা নবীজির অপছন্দ হলে তিনি এক মাস ঘরে যাবেন না বলে শপথ করলেন এবং মসজিদসংলগ্ন একটি ঘরে পৃথক বাস করতে লাগলেন।

সাহাবীরা অস্থির ছিলেন, আবু বকর (রা) ও উমর (রা) চিন্তায় পড়লেন এবং ভাবলেন, কোনভাবে এ সমস্যার সমাধান হোক। নিজ নিজ কন্যা হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা)-এর কারণে তাঁদের উভয়ের দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি ছিল যে, পয়গম্বরকে কষ্ট দিয়ে নিজ পরিণাম খারাপ করে বসে কিনা। উভয়ে উভয়কে ধমকালেন এবং বোঝালেন। অতঃপর নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু মমতা ভরা ও অকৃত্রিম হৃদ্যতার কথাবার্তা বললে তিনি কিছুটা নরম হলেন।

অবশেষে ঘটনার এক মাস পর বর্তমান আয়াত অবতীর্ণ হল (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৭৮)। অর্থাৎ, আপনি নিজ স্ত্রীদের পরিষ্কার বলে দিন, যদি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনীদের মতো সচ্ছলতা চাও, তবে তোমাদের সঙ্গে আমার মিল হতে পারে না। অতএব আস, তোমাদের কিছু দিয়ে (অর্থাৎ একজোড়া কাপড়, যা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে দেওয়ার নিয়ম) ভদ্রভাবে বিদায় করি, অর্থাৎ শরী'য়তসম্মতভাবে তালাক দিয়ে দিই। আর যদি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের উচ্চতম মর্তবার কামনা থাকে, তবে পয়গম্বরের কাছে থাকতে কোন বাধা নেই। যিনি তাঁর খেদমতে যোগ্যতার সাথে থাকবেন, আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য অনেক বড় পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে যে, বেহেশতে সর্বোচ্চ মহলে পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সঙ্গ লাভ হবে।

পবিত্রাত্মা বিবিগণের সকলে আখেরাতকে অগ্রগণ্য করলেন

আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং প্রথমে হযরত আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর নির্দেশ শোনালেন। তিনি আল্লাহ ও রাসূলের মর্যিকে অগ্রগণ্য করলেন। অতঃপর সকল স্ত্রী এমনই করলেন। দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা অন্তর থেকে বের করে দিলেন। নবীজির ঘরে সর্বদা ইচ্ছাকৃত অভাব থাকত-ঘরে যাই আসত, শীঘ্রই ব্যয় করে ফেলতেন। অতঃপর ধার-কর্জ করতে হত। এ ধরনের জীবনের প্রতিই স্ত্রীগণ রাযী হলেন।

أعد للمحسنات منكن

আর এই যে বলা হল, 'তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে,' অথচ তাঁর স্ত্রীগণ সকলে এমনই ছিলেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সুনির্দিষ্ট সুসংবাদ কাউকেও দেন না, যাতে নির্ভয় না হয়ে যায়; বরং শেষ পরিণতির ভয় অন্তরে সর্বদা জাগ্রত থাকে। এ পন্থাই (মানুষের জন্য) উত্তম। (তাই 'তোমাদের জন্য প্রতিদান প্রস্তুত করেছেন'— না বলে এভাবে বলা হয়েছে,' তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলাদের জন্য..)।

৩০. হে নবীপত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। এ আল্লাহর জন্য সহজ[১]।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

পারা-২২

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে ও সৎকর্ম করবে, আমি তাকে তার ছওয়াব দ্বিগুণ দেব, আর আমি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক[২]।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝

৩২. হে নবীপত্নীগণ! তোমরা সাধারণ কোন নারীর মত নও[৩]।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ

উম্মাহাতুল মুমিনীনের মহান মর্যাদা ও যিম্মাদারি

সম্মুখে নবীর সঙ্গ অবলম্বনকারী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এ সম্পর্কের কারণে তাঁদের মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে। অতএব তাঁদের আদর্শিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যেন তেমন হয়, যা এই উচ্চ মর্তবার উপযুক্ত। কেননা, তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদা ছাড়াও তাঁরা 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' অর্থাৎ মুমিনদের মা। বলা বাহুল্য, মায়েরাই মৌলিকভাবে নিজ সন্তানসন্ততির যিম্মাদার হয়ে থাকেন, তাই তাঁদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ উম্মতের জন্য আদর্শ হতে হবে।

১. বড়দের ভুলও বড় করে দেখা হয়। তাই ধরে নেওয়া হোক, তাঁদের মধ্যে কারো দ্বারা যদি অশুভ কাজ হয়ে যায়, তবে এই একই কাজের জন্য অন্যদের যে শাস্তি, তার দ্বিগুণ শাস্তি তাঁদের হবে। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষে এ খুবই সহজ। তাঁদের মর্যাদা ও নবীর সঙ্গে সম্পর্ক আল্লাহকে শাস্তিদানে বাধা দিতে পারে না।

২. অর্থাৎ পুণ্য ও আনুগত্যের কারণে অন্যরা যে পরিমাণ প্রতিদান লাভ করবে, তাঁরা তার দ্বিগুণ লাভ করবেন। অধিকন্তু মর্যাদাপূর্ণ এক বিশেষ জীবিকা তাঁদের প্রদান করা হবে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পুণ্যের ছওয়াব দ্বিগুণ এবং পাপের শাস্তি দ্বিগুণ— এটি উচ্চ মর্যাদারই অনিবার্য ফল। স্বয়ং পয়গম্বর আলাইহিস সালামকে বলা হয়েছে- اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ {তখন অবশ্যই আমি আপনাকে আস্বাদন করাতাম এই জীবনেও দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ এবং মরণের পরেও দ্বিগুণ শাস্তির স্বাদ।' –ইস্‌রা : ৭৫}

৩. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থান ও মর্যাদা সাধারণ নারীদের মত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের মহীয়সী স্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন এবং মুমিনদের মা

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়ে থাক, তবে (পর-পুরুষের সাথে) কোমলভাবে কথা বলো না। অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালসায় পড়বে। আর তোমরা সংগত কথা বলো[১]।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

৩৩. এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং অতীতের জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজ সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না[২]। আর

হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং তোমাদের থেকে যে রকম কাম্য, সে রকম তাক্ওয়া ও পবিত্রতা অবলম্বন করলে এর মর্যাদাও আল্লাহর নিকট অনেক বেশি হবে। আর ধরে নাও, যদি কোন মন্দ আচরণ তোমাদের দ্বারা হয়ে যায়, তবে তাও খুব গুরুতর ও কঠিন বলে বিবেচিত হবে।

মোটকথা, ভালর দিক হোক অথবা মন্দের দিক– তোমাদের অবস্থান আর সব মুমিন মহিলা হতে ভিন্ন থাকবে।

১. অর্থাৎ যদি অন্তরে তাক্ওয়া ও আল্লাহর ভয় থাকে, তবে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হলে (যার প্রয়োজন মুমিন-মাতাদের প্রায়ই হতে থাকে) নম্রকণ্ঠে ও আকর্ষণীয় স্বরে বলো না। এটা ঠিক যে, নারীর কণ্ঠস্বরে স্বভাবতই এক ধরনের নম্রতা ও কোমলতা রয়েছে। কিন্তু পবিত্রাত্মা নারীদের উচিত, পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে যথাসম্ভব কৃত্রিমভাবে হলেও এমন সুর ও স্বর অবলম্বন করা, যার মধ্যে কিছুটা শুষ্কতা ও রুক্ষতা থাকে এবং কোন পঙ্কিলচিত্ত মানুষের মনকে সেদিকে আকৃষ্ট না করে। উম্মাহাতুল মুমিনীনের পক্ষে তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা হিসাবে এ বিষয়ে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে, যাতে কোন ব্যাধিগ্রস্ত ও অসুস্থ অন্তরের মানুষ নিজ পরিণাম একেবারে ধ্বংস না করে বসে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'এস্থলে এ আদব শেখানো হয়েছে যে, কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে হলে এভাবে বল, যেভাবে মা ছেলেকে বলে। আর কথাও যেন ভদ্র ও সঙ্গত হয়।'

২. অথাৎ ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগে নারীরা বেপর্দায় চলত এবং নিজেদের শরীর ও পোশাকের সৌন্দর্য প্রকাশ্যে প্রদর্শন করত। এ অসভ্য ও নির্লজ্জ চলনকে ইসলাম কখনই বরদাশত করতে পারে না। তাই ইসলাম নারীদের ঘরে অবস্থান করতে আদেশ দিয়েছে এবং অন্ধকার যুগের ন্যায় বের হয়ে রূপ-সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে বেড়াতে নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারেও উম্মাহাতুল মুমিনীনের কর্তব্য, অন্যদের চেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা, যেমন لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۗءِ এর ব্যাখ্যায় আলোচনা হয়েছে।

وَاَقِمۡنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيۡنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيُذۡهِبَ

নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক[১]। হে নবী-পরিবারবর্গ! আল্লাহ এ-ই চান যে,

নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার বিধান

অবশ্য কোন শরী'য়তসম্মত বা প্রাকৃতিক জরুরতের কারণে সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য ছাড়া মামুলি পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে কখনো কখনো বের হওয়ার অনুমতি কুরআন-হাদীছে পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, পরিবেশের বিবেচনায় ফেতনার আশঙ্কা না থাকতে হবে। আর এটা প্রমাণিত নয় যে, নবী–মহিয়সীদের জন্য এভাবে বের হওয়াও নিষেধ। বরং কতিপয় ঘটনা থেকে এভাবে বের হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু শরী'য়তদাতার বাণীসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, তাঁর নিকট এটাই পছন্দ যে, একজন মুসলিম রমণী যথাসম্ভব নিজ ঘরের সৌন্দর্য হয়ে থাকবে এবং ঘর থেকে বের হয়ে শয়তানকে ফেতনা সৃষ্টির সুযোগ দেবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ আমার (হযরত শাইখুল ইসলাম র. এর) حجاب شرعي শীর্ষক পুস্তিকায় রয়েছে।

বাকি থাকল 'সতর' এর বিষয়, অর্থাৎ নারীর জন্য কোন্ কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন্ কোন্ পুরুষের সামনে খোলা রাখা জায়েয– এর আলোচনা সূরা নূরে (আয়াত ৩১) গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

বি. দ্র.

বর্তমান আয়াতগুলিতে যেসব হুকুম বর্ণিত হয়েছে, তা সমগ্র নারীজাতির জন্য। যেহেতু হুজূরের পবিত্রাত্মা স্ত্রীদের জন্য এসব আহকামের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ছিল বেশি, সেজন্য শব্দাবলীতে বিশেষত্বের সাথে তাঁদের সম্বোধন করা হয়েছে।

আমার মতে يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ থেকে لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ পর্যন্ত ছিল উক্ত আহকামের ভূমিকা । ভূমিকায় দুটি দিকের উল্লেখ ছিল। **এক,** নির্লজ্জ বা অশ্লীল কাজ করা। এর প্রতিকারের বিধান দান করা হয়েছে- فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى পর্যন্ত আয়াতের মধ্যে। **দুই,** আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও সৎকর্ম করা। সামনে وأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ থেকে أجرا عظيما পর্যন্ত এর আলোচনা চলেছে।

সারকথা এই যে, সর্বপ্রকার মন্দকাজ ও তার উপলক্ষ–উপকরণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সৎকর্মের দিকে অগ্রসর হওয়া সবারই জন্য জরুরী। কিন্তু পবিত্রাত্মা নবী–পত্নীদের জন্য সকল নারী থেকে বেশি জরুরী। তাদের প্রত্যেকটি সৎকর্ম ও অসৎকর্ম মাপে দ্বিগুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যার আলোকে فاحشة مبينة এর তাফসীরও পরিষ্কার হয়েছে বলে আশা করি।

১. অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় তোমরা এই বিষয়গুলোর প্রতি অধিক যত্নবান হও। কেননা, তোমরা নবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং উম্মতের জন্য আদর্শ।

তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করবেন এবং তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করবেন[১]।	عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝

১. অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তিনি নবীর পরিবার-পরিজনকে উল্লিখিত বিধি-বিধানের উপর আমল করিয়ে খুব পাক-পবিত্র করে দিবেন এবং তাদের মর্যাদানুপাতে এমন আত্মিক পবিত্রতা ও নৈতিক পরিচ্ছন্নতা দান করবেন, যা অন্যদের থেকে অধিকতর উন্নত ও বিশিষ্ট। (এরই প্রতি يطهركم এর পর تطهيرا শব্দটি বাড়িয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

এখানে যে পবিত্রকরণ ও নাপাকি দূরকরণের কথা বলা হচ্ছে, তা সে রকমের নয়, যা ওযুর আয়াতে— وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ এর দ্বারা উদ্দেশ্য। তদ্রূপ বদরের ঘটনায়- ليطهركم به আয়াতাংশ দ্বারা যে পবিত্রকরণ বোঝানো হয়েছে, তাও এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে পবিত্রকরণ (تطهير) দ্বারা উদ্দেশ্য— নফসের সংশোধন (تهذيب نفس), কলবের পরিশুদ্ধি (تصفية قلب) ও অন্তর্গত পবিত্রকরণ (تزكية باطن)-এর সেই উচ্চতম পর্যায়, যা আল্লাহর কামেল ওলীগণ হাসিল করে থাকেন এবং যা হাসিলের পর তাঁরা নবীদের ন্যায় মা'সূম (নিষ্পাপ) হয়ে যান না বটে, তবে তাঁরা 'মাহফূজ' আখ্যায়িত হন (অর্থাৎ আল্লাহর বিশেষ হিফাজত লাভে ধন্য হন)। বস্তুত أراد الله না বলে يريد الله ليذهب বলার কারণেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আহলে বাইতের জন্য নিষ্পাপতা (عصمت) প্রমাণিত নয়।

নবী-বিবিগণ নিশ্চিতরূপে 'আহলে বাইত'-এর অন্তর্ভুক্ত

যে ব্যক্তিই কুরআনের বর্ণনা-ভঙ্গির প্রতি মনোনিবেশ করবে, তার এক মুহূর্তের জন্যও এ ব্যাপারে দ্বিধা হবে না যে, এস্থলে 'আহলে বাইত' (اهل بيت) বলতে যারা যারা উদ্দেশ্য, নবী-বিবিগণ অবশ্যই তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ আয়াতের পূর্বাপর সম্পূর্ণ রুকূ জুড়ে তাঁদেরকেই বার বার সম্বোধন করা হয়েছে। এবং بيوت শব্দটিকেও আগের আয়াত وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ -এ, এবং পরের আয়াত وَاذْكُرْنَ مَايُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ-এ তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

তদুপরি কুরআনে اهل بيت শব্দটি সাধারণত এ প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিবি হযরত সারাকে সম্বোধন করে ফেরেশতাগণ বলেছিলেন- أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ('আপনি কি আল্লাহর হুকুম সম্বন্ধে আশ্চর্যবোধ করছেন? হে (খলীলুল্লাহর) পরিবারবর্গ! আপনাদের উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত।' – হুদ, আয়াত ৭৩)। এমনিভাবে একজন তালাকপ্রাপ্ত নারী বিবাহ-বন্ধন থেকে বের হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইদ্দত খতম হওয়ার পূর্বে بيوت কে তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে- وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ ('তাদের ঘর থেকে তাদের বের করে দিয়ো না।' –তালাক, আয়াত ১)। এ ছাড়া হযরত ইউসুফের ঘটনায় بيت কে যুলায়খার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে- وراودته التي هو في بيتها ('তিনি যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিলেন, সে তাঁকে আত্মসংযম ত্যাগে প্ররোচিত করল।' –ইউসুফ, আয়াত ২৩)।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۟

৩৪. আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যেসব আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা পঠিত হয়, তা স্মরণ রাখ[১]। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন বিষয়াদির পরিজ্ঞাতা, সম্যক অবহিত[২]।

[রুকূ - ৫]

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ

৩৫. মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী

যা হোক, এস্থলে নবী-বিবিগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা সুনিশ্চিত; বরং আয়াতে সম্বোধন প্রথমত তাঁদের প্রতিই করা হয়েছে। আর যেহেতু সন্তানসন্ততি ও জামাতাও আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত, বরং কোন কোন দিক দিয়ে তারা এ শব্দের অধিকতর দাবিদার, যেমন 'মুসনাদে আহমদ' (১৬৯৮৮) কিতাবে এক বর্ণনায় أحق শব্দ থেকে প্রকাশ পায়— এ জন্য হযরত ফাতেমা (রা), হযরত আলী (রা) ও হাসান-হোসাইন (রা)-কে এক চাদরে আবৃত করত হুজুর (সা)- اللّٰهُمَّ هؤلاء أهل بيتي বলেছেন (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪২০৯)। তদ্রূপ হযরত ফাতেমার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে তিনি বলেছেন— الصلوة أهل البيت يريد الله ليذهب عنكم الرجس الخ (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪০৪০; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৪৮৪)। এসব হাদীস থেকে বোঝা যায়, যদিও আলোচ্য আয়াতের অবতরণ নবী-বিবিগণের ব্যাপারে ছিল এবং তাদেরই প্রতি আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এরাও (অর্থাৎ মেয়ে, জামাই ও নাতিগণ) 'আহলে বাইত' উপাধির দাবিদার এবং আয়াতে আল্লাহ তাআলার যে পবিত্রকরণের উল্লেখ আছে, তা এঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। আর পবিত্রাত্মা নবী-বিবিগণ যেহেতু কুরআনী সম্বোধনের প্রথম পাত্রী ছিলেন, সেহেতু তাদের সম্পর্কে (উক্ত হাদীসে) আলাদাভাবে এ কথা স্পষ্ট করার প্রয়োজন হয়নি যে, তারা اهل بيت এর অন্তর্ভুক্ত। والله تعالى أعلم بالصواب

১. অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যেসব বিধান ও হিকমতের (প্রজ্ঞার) কথা রয়েছে, তা তোমরা শিখ, ইয়াদ কর, অন্যদের শেখাও। এবং আল্লাহর এই মহা অনুগ্রহের শোকর আদায় কর যে, তিনি তোমাদের এমন ঘরে স্থান দিয়েছেন, যা হেকমতের ভাণ্ডার ও হেদায়াতের উৎস।

২. তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রহস্য ও প্রজ্ঞার কথা রয়েছে। আর তিনিই জানেন, কে এই আমানতের ভার বহন করার যোগ্য। তিনি নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর জন্য এবং তোমাদের তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য নির্বাচন করেছেন। কেননা, তিনি প্রত্যেকের অবস্থা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞাত। তাঁর কোন কাজ বেমানান হয় না।

وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী[১], বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী[২], দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী— আল্লাহ এদের সকলের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান[৩]।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ

৩৬. কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর ক্ষেত্রে এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয় চূড়ান্ত করে দেওয়ার পরও নিজেদের বিষয়ে তাদের ইখতিয়ার থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী

---

১. অর্থাৎ যারা দুঃখ-কষ্ট সয়ে এবং বিপদাপদের যাতনা ভোগ করেও শরী'য়তের বিধানের উপর কায়েম থাকে।

২. (وَالْقٰنِتِيْنَ) অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী, অথবা খুশূ-খুযূসহ নামায আদায়কারী।

৩. **অবতরণের প্রেক্ষাপট**

কোন কোন পবিত্রাত্মা নবী-বিবি বলেছিলেন, কুরআনের অধিকাংশ স্থানে পুরুষদের কথাই আছে, নারীদের উল্লেখ কোথাও নেই। আর কোন কোন পুণ্যবতী মহিলাদের মনে এ কথা আসে যে, পূর্বের আয়াতগুলিতে নবী-বিবিদের উল্লেখ তো হয়েছে, কিন্তু সাধারণ নারীদের কোন অবস্থা বর্ণিত হয়নি।

উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৬৫৭৫), যাতে এই সান্ত্বনা আছে যে, পুরুষ হোক বা নারী, কারো মেহনত ও কামাই আল্লাহর দরবারে বিনষ্ট হয় না এবং পুরুষদের জন্য যেমন রূহানী ও নৈতিক উন্নতি সাধনের সুযোগ ও উপায় রয়েছে, তদ্রূপ নারীদের জন্যও এ ময়দান খোলা আছে।

নারীজাতির খাতিরে আল্লাহ তাআলা কথাটি সুস্পষ্টভাবে বললেন। নতুবা কুরআনে যেসব হুকুম পুরুষদের জন্য এসেছে, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের জন্যও প্রযোজ্য, পৃথকভাবে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তবে যেখানে নারীদের বিশেষ আহকাম আছে, তা আলাদাভাবে বলে দেওয়া হয়েছে।

وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا۟ | করল, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল[১]।

১. **শানে নুযূল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

হযরত যায়নাব রাযিয়াল্লাহু আনহা আবদুল মুত্তালিবের মেয়ে উমাইমার কন্যা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন এবং কুরায়শ বংশীয় অভিজাত নারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ ইবনে হারেছার সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চাইলেন।

এই যায়েদ (রা) আসলে সম্ভ্রান্ত আরব বংশজাত ছিলেন, কিন্তু বাল্যকালে কোন জালিম তাঁকে দাস বানিয়ে মক্কার বাজারে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে খরিদ করেন এবং কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেবা করে দেন। বড় হওয়ার পর একবার বাণিজ্য-সফর উপলক্ষে তিনি নিজ বাড়ীর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে চিনে ফেলে। অবশেষে তাঁর পিতা, চাচা ও ভাই হুজূরের খেদমতে উপস্থিত হয়ে মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে চাইল। হযরত বললেন, বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। সে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাইলে সানন্দে নিয়ে যাও। তারা হযরত যায়েদকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি নবীজির কাছ থেকে যেতে চাই না। তিনি আমাকে সন্তানের চেয়ে বেশি স্নেহ করেন এবং পিতামাতার চেয়ে বেশি আদর করেন।

নবীজি তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং পালকপুত্র বানিয়ে নিলেন। লোকেরা তাঁকে তখনকার প্রথানুসারে 'যায়েদ বিন মুহাম্মদ' বলে ডাকতে লাগল, যত দিন না এ আয়াত অবতীর্ণ হল- اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ('তোমরা পালকপুত্রদের তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আল্লাহর নিকট এ-ই অধিক ন্যায়সংগত।–আহযাব,৫) এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি 'যায়েদ বিন মুহাম্মদ' এর স্থানে 'যায়েদ বিন হারেছা' হয়ে গেলেন। (আদ্ দুররুল মানসূর ৫/১৮১)

কুরআনের নির্দেশানুযায়ী তাঁর নাম থেকে উক্ত দুর্লভ সম্পর্কের মর্যাদা ও সম্মান কর্তিত হয়ে যায়। সম্ভবত এরই ক্ষতিপূরণস্বরূপ সকল সাহাবীদের মধ্যে পবিত্র কুরআনে একমাত্র তাঁরই নাম উল্লেখ হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেন, যেমন সামনে আসছে- فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

যা হোক, হযরত যায়নাবের বংশীয় মর্যাদা অনেক উচ্চ ছিল, আর যায়েদ ইবনে হারেছা বাহ্যত দাসত্বের দাগ বহন করার পর মুক্ত হয়েছিলেন। এ জন্য যায়েদের সঙ্গে বিবাহে হযরত যায়নাব ও তাঁর ভাই রাযী ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছা ছিল, এ ধরনের কল্পিত বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্য যেন বিবাহের পথে বাধা না হয়। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব ও তাঁর ভাইকে এ বিবাহে সম্মতি দিতে তাকিদ করলেন। তখনি আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাঁরা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছার সামনে বিসর্জন দেন। এভাবে যায়দ ইবনে হারেছার সঙ্গে যায়নাবের বিবাহ হয়ে গেল। (তাফসীরে তবারী ১৯/১১৩)

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِیْهِ وَتَخْشَی النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰی زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَیْ لَا یَكُوْنَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِیَآىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۳۷﴾

৩৭. (স্মরণ করুন) যখন আপনি, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও অনুগ্রহ করেছেন— তাকে বলছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর'। আর আপনি নিজ অন্তরে এমন একটি বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করার ছিলেন এবং আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ এর বেশি উপযুক্ত যে, আপনি তাঁকে ভয় করবেন। অতঃপর যখন যায়েদ আপন স্ত্রী থেকে প্রয়োজন পূরণ করে নিল[১], তখন আমি তার স্ত্রীকে আপনার বিবাহে দিয়ে দিলাম। যাতে মুসলমানদের জন্য নিজেদের পালকপুত্রের স্ত্রীদের বিয়ে করাতে কোন অসুবিধা না থাকে, যখন তারা (পালকপুত্ররা) আপন স্ত্রীদের থেকে প্রয়োজন পূরণ করে নেয়। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে[২]।

---

১. অর্থাৎ যায়েদ তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দতও শেষ হয়ে গেল, যায়নাবের নিকট তাঁর কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন রইল না।

২. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

বিবাহের পর যায়নাব (রা.) এর কাছে যায়েদ (রা.) হীন মনে হত। ফলে মনের মিল হল না। যখন উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হত, যায়েদ এসে নবীজির কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন ও বলতেন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেই। নবীজি নিষেধ করে বলতেন, আমার খাতিরে এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশে সে তোমাকে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করেছে। এখন ছেড়ে দিলে সে ও তার আত্মীয়রা একে আরেক অপমান মনে করবে। এজন্য আল্লাহকে ভয় কর এবং ছোট-খাট বিষয়ে ঝগড়া করো না, যথাসম্ভব বনিবনার চেষ্টা করতে থাক।

যখন কোন রকমেই সমস্যার সমাধান হল না এবং বারবার ঝগড়া ও নালিশ হতে থাকল, তখন সম্ভবত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে এসে থাকবে, একান্তই যদি যায়েদ ছেড়ে দেয়, তবে যায়নাবের মনোবেদনা এ ছাড়া লাঘব হবে না যে, স্বয়ং আমি তাকে বিবাহ করি। কিন্তু জাহেল ও মুনাফিকদের কথা ভেবে শঙ্কিত হলেন যে, তারা বদনাম করে বলবে, নিজ পালকপুত্রের বউকে বিবাহ করলেন।— কিন্তু ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে, আল্লাহর নিকট "পালকপুত্র" কোন বিষয়েই পুত্রের হুকুম রাখে না। অন্যদিকে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, স্বীয়

পয়গম্বরের মাধ্যমে এই মূর্খতাপূর্ণ রীতির মূলোৎপাটন করা, যাতে ভবিষ্যতে মুসলমানদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন রকমের দ্বিধা ও সংকোচ না থাকে।

নবীজির সঙ্গে হযরত যায়নাবকে বিবাহ দেওয়ার হিকমত ও তাৎপর্য

আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরকে অবগত করলেন যে, আমি যায়নাবকে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিচ্ছি। কেন দিচ্ছি? তা স্বয়ং কুরআনের আয়াত– لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ আপনার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ঐ ভ্রান্ত রসমের পরিসমাপ্তি ঘটানো এবং ভবিষ্যতের জন্য এতে কোন বাধা ও সংকীর্ণতা অবশিষ্ট না রাখা। আর সম্ভবত এই হেকমতের জন্যই পূর্বে চাপ দিয়ে যায়েদের সঙ্গে যয়নবের বিবহ দেওয়া হয়। কারণ, আল্লাহ জানতেন, এ বিবাহ বেশি দিন টিকবে না। আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা এই বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

মোটকথা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণের সমালোচনার চিন্তা করে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং এই আসমানী ভবিষ্যদ্বাণী (যায়নাব এর সাথে তাঁর বিবাহ) প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করছিলেন এবং যায়েদকে তালাকের পরামর্শ দিতেও লজ্জা করছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার ছিল এবং তাঁর ফয়সালা ও হুকুম অবশ্যই কার্যকর হওয়ার ছিল। শেষ পর্যন্ত যায়েদ তালাক দিয়ে দিলেন এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ যায়নাবের বিবাহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দিয়ে দিলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৪২০)

تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ

এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা গেল যে, নবীজি অন্তরে যা গোপন রেখেছিলেন তা ছিল এ বিবাহের ভবিষ্যদ্বাণী এবং এ বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা। একেই অবশেষে আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন, যেমন زَوّجناكها শব্দ থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যায়। (وتخشى الناس)–আর ভয় ছিল এ কথার যে, না জানি কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে খারাপ ধারণা বা সমালোচনা করে নিজের পরিণাম খারাপ করে বসে কিনা! কিন্তু যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মঙ্গলামঙ্গলের মোকাবেলায় এ ধরনের দ্বিধাও পয়গম্বরের উচ্চ শানের পরিপন্থী, এনজন্য حسنات الأبرار سيئات المقربين -এর নিয়মানুযায়ী একে ভর্ৎসনার ঢংয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমনঃ নবীদের (আ) ত্রুটির আলাচনায় সাধারণত করা হয়ে থাকে।

বি. দ্র. আমরা যে লিখেছি, আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবাহের সংবাদ আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন– এ সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহ فتح الباري-তে সূরা আহযাবের তাফসীরে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু বেহুদা ও অসংগত কাহিনী এক শ্রেণীর অসর্তক মুফাসসিরগণ ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলি সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর লেখেন- لا ينبغي التشاغل بها 'এসবে মগ্ন হওয়া সমীচীন নয়।' আর হাফেজ ইবনে কাছীর লেখেন- أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها 'এসব বিশুদ্ধ নয় বলে আমরা তা এড়িয়ে যেতে চাই, সুতরাং এসব (আমাদের কিতাবে) পরিবেশন করছি না।'

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهٗ ۖ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝

৩৮. নবীর জন্য সেই কাজ করতে কোন অসুবিধা নেই, যা আল্লাহ তাঁর জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহর এ রীতিই ছিল তাঁদের ক্ষেত্রেও, যারা পূর্বে অতীত হয়েছেন (অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ)— আর আল্লাহর ফয়সালা হচ্ছে সুনির্ধারিত ফয়সালা—

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسٰلٰتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللهَ ۗ وَكَفٰى بِاللهِ حَسِيبًا ۝

৩৯. যাঁদের বৈশিষ্ট্য হল- তাঁরা আল্লাহর পয়গামসমূহ পৌঁছে দিতেন, তাঁকেই ভয় করতেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করতেন না। আর হিসাবগ্রহণকারী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[১]।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অটল, যে বিষয় তাঁর কাছে সাব্যস্ত হয়ে আছে তা সংঘটিত হবেই। অতএব শরী'য়তে যা বৈধ করা হয়েছে, পয়গম্বরের তা করতে দোষ কী? আল্লাহর পয়গামসমূহ পৌছাতে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ ছাড়া কাউকেই কখনো ভয় করেননি। (সে মত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ দায়িত্ব পালনে আজ পর্যন্ত কোন কিছুর পরোয়া করেননি এবং কারো সমালোচনার চিন্তায় প্রভাবিত হননি।) সুতরাং এ বিবাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কেন হবে?

হযরত দাউদ (আ)-এর একশত বিবি ছিলেন। তদ্রূপ সুলায়মান (আ)-এর বিবিদের সংখ্যা যে অনেক ছিল তা সুবিদিত। নির্বোধরা আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করতে পারে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের জীবনে তার চেয়ে বড় বড় উদাহরণ রয়েছে। অতএব এ ধরনের মূর্খতাপূর্ণ টিপ্পনী কাটার ভয় করা উচিত নয়।

সামনে বলা হচ্ছে যে, যায়েদ বিন হারেছাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালকপুত্র বানানোর ফলে তিনি নবীজির সত্যিকার পুত্র হয়ে যাননি। তাই তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নবীর বিবাহ করতে অসুবিধা নেই। আর শুধু যায়েদ কেন, হুযূর (সা) তো পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। কারণ, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা পুত্র, তারা বাল্যকালেই মারা যান, আর কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতের অবতরণকালে পয়দাই হননি। হ্যাঁ, তাঁর কন্যাসন্তানগণ ছিলেন, যাদের মধ্যে হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সন্তানসন্ততিই দুনিয়ার বুকে বিস্তার লাভ করেন।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا۠

তবে (তিনি) আল্লাহর রাসূল[১] ও সকল নবীর জন্য মোহরস্বরূপ*[২]। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত[৩]।

---

১. অর্থাৎ কাউকেই তাঁর পুত্র মনে করো না। হাঁ, তিনি আল্লাহর রাসূল। এ হিসাবে সকলে তাঁর রূহানী পুত্র, যেমন আমরা اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছি।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী'।

২. **খতমে নবুওয়াত**

অর্থাৎ আপনার আবির্ভাবের ফলে নবীদের ধারার উপর মোহর লেগে গেছে। অতঃপর আর কাউকে নবুওয়াত প্রদান করা হবে না। যাঁদের পাওয়ার ছিল, তাঁরা পেয়ে গেছেন। এ জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকাল সকল নবীর শেষে রাখা হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামও শেষ যমানায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন উম্মতী হিসাবে আগমন করবেন। তখন তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাতের বিধান জারি হবে না। যেমন– আজও সমস্ত নবী নিজ নিজ স্থানে সমাসীন আছেন, কিন্তু চতুর্দিকে শুধু নবুওয়াতে মুহাম্মদীই চালু ও সক্রিয় আছে।

হাদীছে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি আজ মূসা আলাইহিস সালাম (পৃথিবীর বুকে) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁরও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৪৬৩১; ফাতহুল বারী ১৩/৩৩৪) বরং কোন কোন বিজ্ঞ মনীষীর মতে, পূর্ববর্তী নবীগণ নিজেদের যুগেও সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান রূহানিয়্যাত দ্বারা ধন্য ও উপকৃত হতেন, যেভাবে রাতের বেলায় চাঁদ ও তারকারাজি সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়, অথচ সূর্য তখন দেখা যায় না। আর যেভাবে বস্তুজগতে আলোর সমস্ত স্তরসমূহ সূর্যের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়, তদ্রূপ নবুওয়াত ও রেসালাতের সকল স্তর ও মর্তবাও রূহে মুহাম্মদীতে সমাহিত হয়। এ হিসাবে বলা যায় যে, তিনি মর্যাদা ও কাল উভয় দিক থেকেই সর্বশেষ নবী(خاتم النبيين)। অন্য যাদের নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছে, তাঁর মোহর লাগিয়েই তা তাঁদের দেওয়া হয়েছে। والله أعلم بالصواب

বি. দ্র. খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে কুরআন-হাদীস ও ইজমা প্রভৃতি থেকে হাজারো দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করত যুগের কতিপয় আলেম স্বতন্ত্র পুস্তকাদি লিখেছেন। সেগুলি পাঠ করলে এ বিষয়ে কিছুমাত্র দ্বিধা থাকে না যে, এই আকীদার অস্বীকারকারী অকাট্যরূপে কাফের এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত।

৩. অর্থাৎ তিনিই জানেন, রেসালাত বা খতমে নবুওয়াত কোন্ পাত্রে স্থাপন করা উচিত।

[রুকূ - ৬]

৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক[১]।

وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

৪৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ*, যাতে তিনি অন্ধকারপুঞ্জ থেকে বের করে তোমাদের আলোতে নিয়ে আসেন। আর তিনি ঈমানদারদের প্রতি অতি মেহেরবান[২]।

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান[৩]।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚ وَّاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি কত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তোমাদের হেদায়াতের জন্য মহামর্যাদাশালী পয়গম্বর ও পয়গম্বরদের সর্দার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় কর এবং প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে কখনো ভুলে যেয়ো না। উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে, রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যায়–সর্বদা তাঁর স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত রাখ।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'..এবং তাঁর ফেরেশতারা এর জন্য দোয়া করেন।'

২. অর্থাৎ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করার প্রতিদান এই যে, তিনি নিজ রহমত তোমাদের উপর নাযিল করেন, যা ফেরেশতাদের মাধ্যমে আসে। এই রহমত ও বরকতই তোমাদেরকে মূর্খতা ও গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে ইলম ও তাক্‌ওয়ার আলোতে নিয়ে আসে। যদি ঈমানদারদের উপর আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী না হয়, তবে ঈমানের দৌলত কোথা থেকে আসবে এবং কীভাবে রক্ষা পাবে? তাঁরই মেহেরবানীর ফলে মুমিনগণ কল্যাণ ও হেদায়াত এবং ঈমান ও এহসানের পথে উন্নতি লাভ করে।

এ তো দুনিয়াতে তাদের অবস্থা। পরকালের মর্যাদা ও সম্মান সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবেন এবং ফেরেশতাগণ সালাম করতে করতে তাঁদের কাছে আগমন করবেন। আর মুমিনদের পরস্পরের মধ্যেও দুনিয়ার ন্যায় পরকালে এই দো'য়াই প্রচলিত হবে।

৪৫. হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি– সাক্ষ্যদাতা[১], সুসংবাদদাতা ও সতর্ক-কারীরূপে[২],

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ﴿۴۵﴾

৪৬. এবং আল্লাহর নির্দেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে[৩]।

وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿۴۶﴾

৪৭. আপনি ঈমানদারদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা সম্মান[☆৪]।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿۴۷﴾

৪৮. আর আপনি কাফের ও মুনাফেকদের কথা শুনবেন না[৫] এবং তাদের নির্যাতন অগ্রাহ্য করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট[৬]।

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۴۸﴾

---

১. তিনি আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা দেন এবং এর পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যা কিছু বলেন, অন্তর ও আমলের দ্বারা তিনি তার সাক্ষী। আর হাশরের মাঠেও তিনি উম্মত সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, আল্লাহর পয়গাম কে কতটুকু কবুল করেছিল?

২. অর্থাৎ নাফরমানদের সতর্ক করেন এবং ফরমাবরদারদের সুসংবাদ শোনান।

৩. পূর্বে (আয়াত ৪৩) বলা হয়েছে, আল্লাহর রহমত মুমিনদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসে। এখানে বলা হচ্ছে যে, সেই আলোই এ উজ্জ্বল বাতি (তথা রাসূল সা.) থেকে ছড়িয়েছে। সম্ভবত سراج শব্দটি এস্থলে সেই অর্থে এসেছে, যে অর্থে সূরা নূহের এ আয়াতে (১৬) এসেছে— جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (আল্লাহ চাঁদকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন)। অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুওয়াত ও হেদায়াতের সূর্য, যা উদিত হওয়ার পর অন্য কোন আলোর প্রয়োজন বাকি থাকেনি– সকল আলো এই বৃহত্তম নূরের মধ্যে বিলুপ্ত ও প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'অনুগ্রহ'

৪. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলা এ উম্মতকে নবীজির ওসীলায় সকল উম্মতের উপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

৫. অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ আপনাকে এমন গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠ উম্মত দান করেছেন, অতএব আপনি দাওয়াত ও ইসলাহের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। আর আল্লাহ যে হুকুম দেন, তা বলতে বা করতে কোন কাফের ও মুনাফেকের বাজে কথার পরোয়া করবেন না।

৬. অর্থাৎ যদি এই দুর্বৃত্তরা কথায় ও কাজে আপনাকে কষ্ট দেয়– তবে এদের চিন্তা ছেড়ে আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। তিনি নিজ কুদরত ও রহমতে সকল কিছুর ব্যবস্থা করে

৪৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি মুমিন নারীদের বিয়ে কর, তারপর স্পর্শ করার পূর্বে তাদের তালাক দিয়ে দাও, তবে তাদের উপর জরুরী নয় তোমাদের জন্য ইদ্দত পালন, যা তোমরা গণনা করবে। এক্ষেত্রে তাদের কিছু উপহার দিয়ো এবং তাদের বিদায় করো উত্তমরূপে[১]।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝

৫০. হে নবী! আমি আপনার জন্য হালাল করেছি আপনার সেই স্ত্রীদের, যাদের মহর আপনি দিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার মালিকানাধীন

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ

দেবেন। কাফেরদেরকে আলোর পথে নিয়ে আসা বা শাস্তি দেওয়া— সবই তাঁর হাতে। আপনাকে এ চিন্তায় পড়ার দরকার নেই। ওদের উদ্দেশ্যই এই যে, আপনি ওদের সমালোচনা, দোষারোপ প্রভৃতিতে ঘাবড়ে গিয়ে নিজ দায়িত্ব পরিত্যাগ করে বসুন। সুতরাং অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া হোক, আপনি যদি এমন করেন, তবে আপনি যেন ওদের উদ্দেশ্যই পূর্ণ করে দিলেন এবং ওদের কথা মেনে নিলেন। (আল্লাহর পানাহ!)

১. স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে, যদি তার মহর নির্ধারিত করে থাকে তবে অর্ধেক মহর দিতে হবে, নতুবা কিছু দিয়ে (অর্থাৎ সামাজিক রীতি এবং আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী এক জোড়া পোশাক দিয়ে) ভদ্রভাবে বিদায় করবে। আর স্ত্রী ইচ্ছা করলে তখনি বিবাহ করতে পারে। এ অবস্থায় ইদ্দত পালন করতে হবে না। (হানাফী মাযহাবে خلوت صحيحة বা স্বামী-স্ত্রীর গ্রহণযোগ্য নির্জনতা সহবাসের পর্যায়ভুক্ত। বিস্তারিত মাসআলা ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য)।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্ব থেকে হুজূরের বিবিদের সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি আয়াত এসে গেল। এখন পুনরায় পূর্ববর্তী বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হচ্ছে।

অবতরণের প্রেক্ষাপট

রেওয়ায়েতসমূহে আছে, হুজূর (সা) এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকট গমন করলে সে বলল, আল্লাহ আপনার থেকে আশ্রয় দিন। উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি মহান সত্তার আশ্রয় চেয়েছ।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫৪) তারই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নির্দেশ আসে।

আয়াতে সকল ঈমানদারদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে জানা যায় যে, উক্ত নির্দেশ একা পয়গম্বরের জন্য নয়, বরং সকল মুসলমানের জন্যও এ নির্দেশ প্রযোজ্য। এ নির্দেশ অনুসারে হুজূর তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে বিদায় করে দিলেন। অতঃপর সে সারা জীবন নিজ মাহরূমীর জন্য অনুশোচনা করতে থাকে।

أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۚ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

দাসীদের, যাদের আল্লাহ গনীমতরূপে আপনাকে দান করেছেন[১] এবং আপনার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা ও খালার কন্যাদের, যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে। এবং (হালাল করেছি) মুমিন নারীকে, যদি সে নিজেকে নবীর জন্য দান করে দেয় এবং নবীও তাকে বিবাহ করতে চান। এ বিধান অন্য সকল মুসলমান ব্যতীত শুধু আপনার জন্য। আমার ঐ বিধান জানা আছে, যা আমি তাদের জন্য তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ব্যাপারে নির্ধারণ করে দিয়েছি। (উল্লিখিত নারীদের এজন্য হালাল করেছি), যাতে আপনার জন্য কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

---

১. অর্থাৎ গণীমত প্রভৃতি সূত্রে যে দাসী-বাঁদীরা আপনার হস্তগত হয়েছে, তারাও হালাল।

২. (ازواجك التى آتيت اجورهن)— আপনার স্ত্রীগণ, যাদের মহর আপনি দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা বর্তমানে আপনার বিবাহ বন্ধনে আছেন, তারা কুরায়শ বংশীয় ও মুহাজির হোক কিংবা না হোক, তারা সকলেই আপনার জন্য হালাল থাকবে, তাদের মধ্যে কাউকে ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। আর চাচা, ফুফু, মামা, খালার কন্যারা– অর্থাৎ কুরায়শ বংশীয় নারীরা, যারা পিতা বা মাতার দিক থেকে আপনার আত্মীয়া— তারা হিজরত করে থাকলে আপনার জন্য হালাল, তাদেরও বিবাহ করতে পারেন।

(وامرأة مؤمنة) আর যে মুমিন নারী নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, অর্থাৎ মহর ছাড়া আপনার বিবাহ বন্ধনে আসতে চায়, সেও আপনার জন্য হালাল, যদি আপনি এভাবে বিবাহ করতে পছন্দ করেন। (خالصةً لك)-এ অনুমতি একমাত্র পয়গম্বরের জন্য, যদিও তিনি এর উপর কখনো আমল করেননি (كما في الفتح)। সম্ভবত, ان اراد النبي শর্তের কারণে নবীজি একে তুলনামূলক অনুত্তম মুবাহ (إباحت مرجوحة) গণ্য করেছেন।

যা হোক, অন্য মুসলমানদের জন্য হুকুম তাই, যা সূরা নিসার ২৪ নং আয়াত থেকে জানা গেছে : اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ মহর ছাড়া বিবাহ নয়। আক্‌দের সময় হোক কিংবা পরে সাব্যস্ত করুক, মহর অনিবার্য। তা সাব্যস্ত না করে থাকলে মহরে-মিছল (যা তার বংশের অন্য মেয়েদের মহরতুল্য) ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরের উপর থেকে মহরের এ বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, মুমিনদের বেলায় চারের অধিক বিবাহের অনুমতি যেমন নেই, তদ্রূপ মহর ছাড়া বিয়েও দুরুস্ত নয়।

নবীজির (স) একাধিক বিবাহ— কিছু তত্ত্ব-তথ্য, কিছু হিকমত-তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত একাকী নির্লিপ্ততার জীবন যাপন করেন। অথচ এ বয়সটাই যৌবনের আসক্তির আসল সময়। অতঃপর আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে এবং অপর পক্ষের (তথা হযরত খাদীজার) নিবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি হযরত খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে (যার বয়স তখন অস্তগামী ছিল এবং যিনি দু'বার বিধবা হয়েছিলেন) বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত পরিপূর্ণ শান্তি ও পরম সন্তুষ্টির সাথে এই পবিত্রাত্মা বিবির সঙ্গে জীবন যাপন করেন। এ ছিল সেই কাল, যখন তিনি সমস্ত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। আর আল্লাহর এই নেক বান্দী তাঁর জন্য পাথেয় তৈরি করতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে ও মনের শান্তি অর্জনে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। জীবনের এই সুদীর্ঘকালে, যে কালটা অন্য অনেকের বেলায় আনন্দ-ফুর্তি ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উত্তম সময় হয়ে থাকে– কোন ঘোর ও চরম শত্রুও এমন একটি অক্ষর, একটি বিন্দু ও একটি কণাও খুঁজে পাবে না, যা নবীজির পয়গম্বরসুলভ নিষ্পাপতা ও আসাধারণ চরিত্র-মাধুর্যের উপর কোন কালিমা লেপন করতে পারে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে সেই পূর্ণতম মানুষের জীবনচরিত্রের কথা বলা হচ্ছে, যিনি স্বয়ং নিজ সম্পর্কে বলেছেন, আমাকে যে দৈহিক শক্তি দান করা হয়েছে তা বেহেশতী চল্লিশ জন পুরুষের সমান, যাদের একজন পুরুষের শক্তি দুনিয়ার একশত জনের সমান হবে। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ১৯২৬৯–এতে ৪০ জন পুরুষের কথা আছে, তবে জান্নাতী হওয়ার পরিষ্কার উল্লেখ নেই।) এ হিসাবে দুনিয়ার চার হাজার পুরুষের সমান শক্তি হুযূরকে দেওয়া হয়েছিল। আর নিশ্চয় দুনিয়ার পূর্ণতম মানবের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক শক্তি এমনি পরিপূর্ণ স্তরের হওয়াই সমীচীন। এ হিসাবে ধরা যাক, যদি চার হাজার বিবি তাঁর বিবাহাধীন থাকত, তবে তাঁর শক্তি হিসাবে এমন গণ্য হত যেমন একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারীর বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহু আকবার! তাঁর কঠোর সাধনা ও চরম আত্মসংযমের কোন সীমা আছে কি? তিনি তো ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত একরকম বৈরাগ্য অবস্থায় কাটিয়েছিলেন! অতঃপর হযরত খাদীজার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বিবাহ করেন। তিনি ছাড়া আটজন বিধবা তাঁর বিবাহে আসেন। ওফাতের সময় এই নয়জন জীবিত ছিলেন, তাঁদের নাম : ১। হযরত আয়েশা, ২। হযরত হাফছা, ৩। হযরত সাওদা, ৪। হযরত উম্মে সালামা, ৫। হযরত যয়নব, ৬। হযরত উম্মে হাবীবা, ৭। হযরত জুয়াইরিয়া, ৮। হযরত সাফিয়্যা ও ৯। হযরত মাইমুনা রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না ওয়া আরযাহুন্না (শেষ ৩ জন কুরায়শ বংশের নন)।

তো, দুনিয়ার এই সর্বাপেক্ষা অনন্যসাধারণ মানব, যিনি নিজ স্বাভাবিক শক্তি–সামর্থ্যের দিক দিয়ে কমপক্ষে চার হাজার বিবি রাখার যোগ্য ছিলেন— তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা নয়জন দেখে কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁর প্রতি বহু বিবাহের অভিযোগ আনতে পারে না।

নবীজির অসাধারণ যুহ্দ

আমরা একদিকে দেখি, তখন তাঁর বয়স ৫৩ বছর অতিক্রম করে গিয়েছিল । বড় বড় বিজয় লাভ করা সত্ত্বেও তিনি একদিন পেট ভরে খেতেন না। যাই আসত আল্লাহর পথে দিয়ে ফেলতেন। স্বেচ্ছাবরণকৃত দারিদ্র্য-ক্ষুধায় পেটে পাথর বাঁধতেন, মাসের পর মাস পবিত্রাত্মা বিবিদের ঘরে চুলা জ্বলত না– পানি ও খেজুর দিয়ে দিন গুজরান হত। রোযার পর রোযা রাখতেন, একাধারে কয়েক দিন ইফতারও করতেন না। রাতের পর রাত আল্লাহর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত– এ অবস্থা দেখে লোকদের মায়া হত। সুখ-সম্ভোগের উপকরণ দূরের কথা, সকল বিবিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, যার কাছে পরকালের জীবন পছন্দ সে আমাদের কাছে থাকুক, আর যে দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ চায় সে বিদায় হয়ে যাক (যাঁর জীবনের এমন অলৌকিক চিত্র, তাঁর ব্যাপারে একমাত্র জালেম ছাড়া আর কেউ এমন চিন্তা করতে পারে কি যে, তিনি (العياذ بالله) সুখ-সম্ভোগের জন্য একাধিক বিবাহ করেছেন?!)।

বিবিদের হকসমূহ আদায়ের প্রতি যত্নশিলতা

এসব অবস্থার সাথে অন্যদিকে দেখা যায় যে, তিনি সকল বিবির হক এমন পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে আদায় করতেন যে, এত বড় দায়িত্বভার অতি শক্তিধর পুরুষও বহন করতে পারে না। আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সৈন্যদের মোকাবেলায় বড় বড় সাহসী বীরপুরুষ সাহস হারিয়ে ফেলত, তিনি তখন পাহাড়ের ন্যায় অবিচল থাকতেন এবং মুখে বলতেন— أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب এবং إِلَيَّ عبادَ الله أنا رسول الله (বুখারী ২৮৬৪)

বিবিদের সম্পর্কের হক আদায় করতে গিয়ে ইবাদত-বন্দেগী ও রেসালাতের দায়িত্ব পালনে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি হত না এবং কঠিন থেকে কঠিন কাজেও এক মিনিটের জন্য দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়তেন না। এসব অসাধারণ ঘটনা বিচক্ষণ লোকদের নিকট অলৌকিকতা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়! প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাল্যকাল ও তাঁর যৌবন যেমন অলৌকিকতাপূর্ণ ছিল, তদ্রূপ তাঁর বার্ধক্যও ছিল অলৌকিকতাপূর্ণ। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র জীবনের প্রত্যেক অংশে পুণ্যাত্মা মুমিনদের জন্য এমন এমন নমুনা রেখে দিয়েছেন, যা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের আমলী পথপ্রদর্শক হতে পারে।

নবীর একাধিক বিবাহে উম্মতের খায়র-কল্যাণ

পবিত্রাত্মা নবী-বিবিদের নামমাত্র আধিক্যের কারণে বিরুদ্ধবাদীদের কত অভিযোগ! কিন্তু এই আধিক্যই উম্মতে মুসলিমার জন্য সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে। কেননা, এতে নবী-অনুসারী পুরুষ ও নারীরা সেসব হুকুম ও আদর্শ অনায়াসে জানতে পেরেছে, যেগুলি অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি ও দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। বলতে গেলে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক বিবাহের দ্বারা একটি বিরাট কল্যাণ হাসিল হয়েছে । তা এই যে, পারিবারিক জীবন ও মেয়েদের মাসায়েল সম্পর্কে নবীর আদেশ-নিষেধ ও তাঁর উত্তম আদর্শ সহজে জানা সম্ভব হয়েছে। তদ্রূপ বিভিন্ন গোত্র ও শ্রেণীর নারীরা তাঁর বৈবাহিক

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿۵۱﴾

৫১. আপনি তাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখুন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে রাখুন। আর আপনি যাদের পৃথক করে দিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কাউকে যদি পুনরায় কামনা করেন, তবে আপনার কোন গোনাহ নেই। তাতে এ সম্ভাবনা অধিক যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে, তারা দুঃখিত হবে না এবং আপনি তাদের যা দিয়েছেন তাতে তারা সকলে রাযি থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল[১]।

বন্ধনে থাকার কারণে সেইসব গোত্র ও শ্রেণীর লোকেরা তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সৌভাগ্য লাভ করে এবং এই উপায়ে দূরত্ব ও ভীতি হ্রাস পায়। তাছাড়া নিজ গোষ্ঠীর মেয়েদের সঙ্গে নবীজির দাম্পত্য-সাধুতা, চারিত্রিক মাধুর্য, শুভ আচরণ ও নির্ভেজাল চরিত্রের কথা শ্রবণ করে ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়ে যায়। শয়তানী দ্বিধা-সন্দেহের অপসারণ হয়। আর এভাবে তাঁর সংশ্রবে আল্লাহ-প্রেমিক, নবী-ভক্ত ও দুনিয়ার পথপ্রদর্শকদের সেই মহামর্যাদাশালী জামাত তৈরি হয়, যাদের অপেক্ষা অধিক পরহেজগার ও পুণ্যাত্মা কোন জামাত (নবীদের ছাড়া) আকাশের নীচে কখনো তৈরি হয়নি।

১. অর্থাৎ যে নারী নিজেকে সঁপে দেয়, তাকে কবুল করা না করার ইখতিয়ার আপনার রয়েছে। আর বর্তমান স্ত্রীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, রাখার বা তালাক দেওয়ারও ইখতিয়ার রয়েছে। তদ্রূপ, যে বিবিরা আপনার বিবাহে রইলেন, তাদের সঙ্গে সমভাবে পালা করে থাকা আপনার জন্য ওয়াজিব নয়। যাকে ইচ্ছা পালার মধ্যে আগেপিছে করতে পারেন। (ومن ابتغيت..) এবং যাকে পৃথক করে দিয়েছিলেন, তাকে পুনরায় ফেরত নেওয়ারও ইখতিয়ার রয়েছে।

এসব অধিকার ও ইখতিয়ার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনও এসব সুযোগ গ্রহণ করেননি। স্ত্রীগণের সঙ্গে আচার-ব্যবহারে এমনি ন্যায়নিষ্ঠা ও সমতা বজায় রাখতেন, যা বড় থেকে বড় সচেতন-সতর্ক মানুষের পক্ষেও সম্ভব হত না। তা সত্ত্বেও কারো প্রতি অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের আকর্ষণ অধিক হলে বলতেন : اللّٰهُمَّ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (আয় আল্লাহ! যেসব বিষয় আমার এখতিয়ারে আছে, তাতে এই আমার সমদৃষ্টি বা আচরণ, আর যা একান্তই আপনার মুঠিতে, আমার এখতিয়ারে নয়, তার জন্য আমাকে তিরস্কার করবেন না।) (জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৭২; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৪২০৫) সম্ভবত وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا বাক্যে এর প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের নিকট পালা করে সমানভাবে থাকা ওয়াজিব। কিন্তু হুজূর (সা)-এর উপর তা

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۟

৫২. এর পর অন্য নারীরা আপনার জন্য হালাল নয় এবং এও হালাল নয় যে, তাদের পরিবর্তে অন্যান্য স্ত্রী গ্রহণ করবেন, যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে[১]। তবে আপনার মালিকানাধীন দাসীদের কথা ভিন্ন[২]। আর আল্লাহ সবকিছুর পর্যবেক্ষণকারী[৩]।

[রুকূ - ৭]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ

৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী-গৃহে প্রবেশ করো না, অবশ্য তোমাদের খাওয়ার জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হলে (প্রবেশ করতে

ওয়াজিব ছিল না, যাতে বিবিরা এটাকে নিজেদের অধিকার মনে না করেন, বরং যাকে যতটুকু তিনি দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। (নতুবা প্রত্যহ এ নিয়ে ঝঞ্ঝাট লেগে থাকত, ফলে দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে ব্যাঘাত ঘটত এবং বিবিদের লক্ষও দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে আসল উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকত না, বরং তাঁরা এ চিন্তা-ফিকিরেই পড়ে থাকতেন)। কিন্তু সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব না হলেও নবীজি (সা) নিজের পক্ষ থেকে তারতম্য করেননি, সকলের পালা সমান রেখেছেন। শুধু হযরত সাওদা (রা) (যখন তাঁর বয়স অধিক হয়ে গিয়েছিল) নিজ পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৬৩)

১. অর্থাৎ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ... আয়াতে (৫০) যত প্রকার নারীকে বিবাহের অনুমতি আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তার অতিরিক্ত হালাল নয়। আর যারা এখন বর্তমান আছেন, তাদের পরিবর্তন করাও হালাল নয়, অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে কাউকে এজন্য পরিত্যাগ করা, যাতে তার স্থানে অন্যকে আনতে পারেন— এ হালাল নয়। হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, এ নিষেধাজ্ঞা পরবর্তীতে স্থগিত হয়ে যায়। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ২৫৬৫২)

কিন্তু নবীজি এর পর আর কোন বিবাহ করেননি এবং তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরিবর্তনও করেননি। তাঁর ওফাতের সময় বিবিরূপে তাঁরাই জীবিত ছিলেন ।

২. অর্থাৎ, দাসী-বাঁদী হালাল। নবীজির হেরেমে দুজন দাসী ছিলেন। একজন মারিয়া কিবতিয়া (রা.)। যাঁর গর্ভে সাহেবজাদা হযরত ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন, তবে বাল্যকালেই তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয়জন হযরত রায়হানা (রা.)।

৩. অর্থাৎ কারা আল্লাহ তাআলার বিধান ও সীমারেখা রক্ষা করে আর কারা করে না, তা তাঁর নজরে আছে। এ কথা মনে রেখে সকলের যথাকর্তব্য পালন করা উচিত ।

غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا

পারবে); তবে খাবার প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় বসে না থেকে। কিন্তু যখন তোমাদের ডাকা হয়, তখন প্রবেশ কর[১]। অতঃপর যখন খেয়ে নেবে, তখন চলে যাবে এবং পরস্পর মন লাগিয়ে কথাবার্তায় লিপ্ত হবে না[২]। তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি তোমাদের (বলতে) লজ্জা করেন, আর আল্লাহ সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না[৩]। আর যখন তোমরা নবী-পত্নীদের নিকট কোন জিনিস চাও, পর্দার আড়াল থেকে চেয়ো। এ খুবই পরিচ্ছন্ন পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য[৪]। আর তোমাদের জন্য

---

১. অর্থাৎ হুকুম ও অনুমতি ছাড়া দাওয়াতে যেয়ো না। আর না ডাকা পর্যন্ত আগে থেকে চলে যেয়ো না, এতে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে হবে এবং ঘরের লোকজনের কাজকামে অসুবিধা হবে।

২. অর্থাৎ খাওয়ার পর নিজ নিজ বাড়ির পথ ধরা উচিত। সেখানে মজলিস জমালে মেযবান ও বাড়ির অন্যদের কষ্ট হয়।

এ কথাগুলি যদিও নবীর বাড়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেননা আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট তাই ছিল– কিন্তু বিধান ব্যাপক। এ দ্বারা সকলকে এ ভদ্রতা শেখানো উদ্দেশ্য যে, দাওয়াত ছাড়া কারো বাড়ীতে খানা খাওয়ার জন্য চলে যাওয়া, অথবা তুফাইলী (দাওয়াতী ব্যক্তির সহগামী) হয়ে খাওয়া, অথবা খাওয়ার পূর্বে এমনিই মজলিস জমানো, অথবা আহার শেষে গাল-গল্পে মশগুল হওয়া— এসবের অনুমতি নেই।

৩. অর্থাৎ পয়গম্বর (সা.) লজ্জার কারণে নিজে কষ্ট সহ্য করেন ও তোমাদের খাতির করেন। পরিষ্কার বলেন না, তোমরা উঠে যাও, আমার কষ্ট হচ্ছে। এ তো তাঁর আখলাক ও ভদ্রতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের আদব ও সংশোধনের কথা শিক্ষা দিতে চান। সুতরাং তিনি (আয়াত নাযিল করে) পয়গম্বরের মুখেই নিজ বিধান শুনিয়ে দিলেন।

৪. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আদব শিক্ষা দিলেন। তাদের কেউ কেউ কখনো খাওয়ার জন্য নবীজির ঘরে একত্র হলে আহারের পর কথাবার্তা বলতে শুরু করতেন। তাঁর আরাম করার স্থানও তো ওই একটাই ছিল, কিন্তু লজ্জাবশত বলতেন না যে, তোমরা যাও। তাঁর খাতিরে আল্লাহই বলে দিলেন।'

(وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ)– আর আলোচ্য আয়াতে পর্দারও হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষেরা যেন নবীর স্ত্রীদের সামনে না যায়। কোনো বস্তু চাইতে হলে তা যেন পর্দার আড়াল থেকে চায়।

আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়। এবং এও বৈধ নয় যে, তোমরা তাঁর পর তাঁর পত্নীগণকে কখনও বিবাহ করবে। নিশ্চয় তোমাদের এ কাজ আল্লাহর নিকট গুরুতর[১]।	كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾

এতে উভয় পক্ষের দিল পবিত্র ও পরিষ্কার থাকে এবং শয়তানী ওয়াসওয়াসার কোন অবকাশ থাকে না।

১. অর্থাৎ কাফের-মুনাফিকরা যা ইচ্ছা বলুক এবং যত ইচ্ছা কষ্ট দিক, কিন্তু মুমিন-মুসলমানরা তো সকল দলীল-প্রমাণের আলোকে পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের অসামান্য সততা ও পবিত্রতা জানতে পেরেছে। সুতরাং তাদের পক্ষে আদৌ শোভন নয় যে, হুযূরের জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতের পর এমন কিছু করবে বা বলবে, যা সামান্য পর্যায়ে হলেও তাঁর কষ্টের কারণ হতে পারে। মুমিনদের কর্তব্য, নিজেদের প্রিয় ও পবিত্র পয়গম্বরের মহামর্যাদাকে সর্বদা অক্ষুণ্ন রাখা। খোদা না করুন, উদাসীনতা বা অসাবধানতাবশত এমন আচরণ যেন না করে বসে, যা তাঁর জন্য কষ্টকর হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংস ডেকে আনে। এমন আচরণসমূহের মধ্যে একটি মারাত্মক গোনাহ হচ্ছে— তাঁর পরে তাঁর পবিত্রাত্মা বিবিদের কাউকে বিবাহের ইচ্ছা করা, অথবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকতেই এহেন অশোভন ইচ্ছা প্রকাশ করা।

উক্ত বিধানের তাৎপর্য

বলা বাহুল্য, পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে পবিত্রাত্মা বিবিদের এমন বিশিষ্ট মর্যাদা কায়েম হয়েছে যে, রূহানী দিক থেকে তাঁরা সমস্ত মুমিনদের সম্মানিতা মাতা সাব্যস্ত হয়েছেন। কোন উম্মতের সঙ্গে বিবাহ হলে তাঁদের এই সম্মান যথারীতি অক্ষুণ্ন থাকবে কি? অথবা হুযূরের পর সংসারজীবনের ঝামেলায় পড়ে দীনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রচার-প্রসারের সেই মহান উদ্দেশ্য স্বাধীনভাবে পূর্ণ হবে কি, যার জন্যই মূলত আল্লাহ তাআলা নবীর পত্নী হিসেবে তাঁদের নির্বাচন করেছিলেন? এবং সম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিহীন কোন ব্যক্তিও কি এ ধারণা করতে পারে যে, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সর্দার, মুত্তাকী-পরহেজগারদের ইমাম, মহান চরিত্রের জীবন্ত প্রতীক রাসূল সা.-এর খেদমতে জীবন যাপনকারিনী একজন মহিলা এক মুহূর্তের জন্যও অন্য কারো ঘরে বাস করে অন্তরের আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে পারেন? বিশেষত যখন জানা আছে যে, এঁরা তো সেই নির্বাচিত মহিলা, যাঁদের সামনে দুনিয়া বা আখেরাত– এ দুটি পথের একটি অবলম্বনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হলে তাঁরা অত্যন্ত খুশী ও আযাদীর সাথে দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি ও আখেরাতের পথ অবলম্বন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

তাই তো ইতিহাস বলে, হুযূরের ওফাতের পর অতুলনীয় নির্লোভ ও পরহেজগারী এবং ধৈর্য ও আল্লাহ-নির্ভরতার সঙ্গে এই পবিত্র জান্নাতী রমণীরা আল্লাহর ইবাদতে নিজেদের জীবন কাটিয়েছেন এবং দীনী আহকামের প্রচার ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের জন্য নিজেদের ওয়াক্ফ করে রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন একজনের মধ্যেও কখনো ভুলেও দুনিয়ার

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা তা গোপন কর, আল্লাহ তো সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত[১]।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৫. নবী-পত্নীগণের গোনাহ নেই— তাঁদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগনে, তাঁদের আপন নারী ও তাঁদের মালিকানাধীন দাসীদের সামনে যাওয়ায়[২]। আর (হে নবী-পত্নীগণ!) আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর প্রত্যক্ষকারী[৩]।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۗ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৬. নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি 'সালাত' পাঠান।

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ

আরাম-আয়েশের চিন্তা আসেনি। আর আসবে কী করে, যখন পূর্বেই আল্লাহ তাআলা يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا এর ঘোষণা দিয়ে তাঁদের আত্মসংশোধন ও পবিত্রকরণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

فرضي الله عنهن وأرضاهن، وجعلنا ممن يعظمهن حق تعظيمهن، فوق ما نعظم أمهاتنا التي ولدننا، آمين

উল্লিখিত বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বিবরণের জন্য হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র.)-এর কিতাব 'আবে-হায়াত' দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ মুখে বলা তো দূরের কথা, অন্তরেও উক্ত ওয়াসওয়াসা কখনো আনতে নেই। আল্লাহর সম্মুখে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই এক রকম। অন্তরের কোন ভেদও তাঁর কাছে গোপন নয়।

২. ইতিপূর্বে নবী-পত্নীগণের সামনে পুরুষদের যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে যে, মাহরাম পুরুষদের সামনে যেতে নিষেধ নেই। এ ব্যাপারে সাধারণ মহিলাদের যে হুকুম সূরা 'নূর' (আয়াত : ৩১)-এ গত হয়েছে, নবী-পত্নীগণের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য। وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ এর বিশদ ব্যাখ্যাও আমরা সূরা নূরে করেছি। তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ পর্দার যে বিধান বর্ণিত হল, তা পূর্ণরূপে মেনে চল, একটু অন্যথাও যেন না হয়। বাইর ও ভিতর সকল বিষয়ে আল্লাহর সীমারেখা যেন রক্ষিত হয়। আল্লাহর কাছে তোমাদের কোনো অবস্থাই গোপন নয়— يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا صَلُّوۡا عَلَيۡهِ وَسَلِّمُوۡا تَسۡلِيۡمًا ﴿۵۶﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি 'সালাত' পাঠাও এবং পাঠাও অধিক পরিমাণে সালাম[১]।

---

১. নবীর প্রতি সালাত প্রেরণের অর্থ দয়া ও অনুগ্রহের সঙ্গে নবীর প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপন। এখন সালাত যার পক্ষ থেকে হবে, তার শান ও মর্যাদা অনুযায়ী প্রশংসা ও সম্মান এবং রহমত ও মেহেরবানী উদ্দেশ্য হবে। যেমনঃ বলা হয়– পুত্রের প্রতি পিতা, পিতার প্রতি পুত্র এবং ভাইয়ের প্রতি ভাই সদয়, অথবা এদের একে অন্যকে ভালবাসে। বলা বাহুল্য, পুত্রের প্রতি পিতার যে ধরনের ভালবাসা ও অনুগ্রহ হবে, পিতার প্রতি পুত্রের সে ধরনের হবে না। আর ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা ও অনুগ্রহের রূপ উল্লিখিত দুজন থেকেও ভিন্ন হবে।

সালাতের বিষয়টিও অনুরূপ বুঝতে হবে। আল্লাহও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 'সালাত' পাঠান অর্থাৎ রহমত ও শফকত সহকারে তাঁর প্রশংসা ও ইজ্জত-সম্মান করেন। আর ফেরেশতাগণও 'সালাত' পাঠান, কিন্তু প্রত্যেকের সালাত এবং অনুগ্রহ ও সম্মান জ্ঞাপন নিজ শান ও মর্যাদা অনুযায়ী হবে। সম্মুখে মুমিনদের প্রতি হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, তোমরাও সালাত ও রহমত পাঠাও। তবে এর ধরন উপরের দুটি থেকে ভিন্ন হবে। উলামায়ে কেরাম বলেছেন– আল্লাহর 'সালাত' হচ্ছে রহমত প্রেরণ করা এবং ফেরেশতাদের সালাত হচ্ছে এস্তেগফার করা, আর মুমিনদের সালাত হচ্ছে দো'য়া করা।

নবীজির প্রতি 'সালাত' প্রেরণের তরীকা, যা তিনিই শিখিয়েছেন

হাদীছে আছে, যখন এই আয়াত নাযিল হল, সাহাবীগণ আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম-এর নিয়ম তো আমাদের জানা হয়েছে (অর্থাৎ নামাযের তাশাহ্হুদে যা পড়া হয়- (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)। এখন 'সালাত' এর তরীকাও আমাদের বলে দিন, যাতে আমরা নামাযে তা পড়তে পারি। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দরূদ শিক্ষা দিলেন-

اَللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد اَللّٰهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

('ইয়া আল্লাহ! পরিপূর্ণ রহমত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমন আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। আপনি তো প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। আয় আল্লাহ! বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। আপনি তো প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪০৬)

মোটকথা– আল্লাহ তাআলা মুমিনদের হুকুম দিয়েছেন, তোমরাও নবীর প্রতি 'সালাত' (রহমত) পাঠাও। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিলেন, তোমাদের 'সালাত' এই যে, আল্লাহ তাআলার নিকট দরখাস্ত কর, তিনি যেন নিজের অধিক থেকে অধিকতর রহমত অনন্তকাল ধরে নবীর প্রতি নাযিল করতে থাকেন। কেননা, তাঁর রহমতের কোন সীমা ও শেষ নেই। এও আল্লাহ তাআলার রহমত যে, তিনি যে আমাদের

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি লা'নত করেন দুনিয়া ও আখেরাতে এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি[১]।

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

৫৮. যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কোন অপরাধ না করা সত্ত্বেও কষ্ট দেয়, ওরা বহন করে নেয় অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা[২]।

এই দরখাস্তের কারণে হুযূরের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর রহমত নাযিল করেন, তাকে (صلوا عليه বলে) আমাদের ন্যায় অক্ষম ও অধম বান্দাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিলেন, যেন আমরাই প্রেরণ করেছি। অথচ সর্বাবস্থায় রহমতের প্রেরক একমাত্র তিনিই। কোন বান্দার এই শক্তি নেই যে, সে নবীদের সর্দারের দরবারে তাঁর মর্যাদার যোগ্য তোহ্ফা পেশ করতে পারে।

দরূদ শরীফের ফজীলত

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর পয়গম্বরের জন্য এবং সেই সাথে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য রহমত নাযিলের দোয়া খুব কবুল হয়। এতে তাঁর প্রতি তাঁর মর্যাদানুপাতিক রহমত বর্ষিত হয়, আর একবারের দোয়ার ফলে দোয়াকারীর প্রতি দশ রহমত অবতীর্ণ হয়। এখন যার যত মনে চায়, ততটুকু হাসিল করে নিক।'

বি. দ্র. নবীর প্রতি 'সালাত' সম্বন্ধে অধিকতর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরে নেই। এর জন্য হাদীসগ্রন্থের শরাহসমূহ দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে শায়খ শামসুদ্দীন সাখাবী (র)-এর কিতাব القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع দেখার মত। আমরা মুসলিম শরীফের শরাহতে এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ লিখে দিয়েছি। فالحمد لله على ذلك

১. ইতিপূর্বে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার কারণ না হয়, বরং তাঁকে যেন পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। আর তাঁকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জ্ঞাপনের একটি উপায় হল, সালাত ও সালাম প্রেরণ করা। এখন বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ও রাসূলকে কষ্ট প্রদানকারী দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত, বিতাড়িত ও কঠিন শাস্তিতে নিপতিত। আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ– তাঁর পয়গম্বরগণকে কষ্ট দেওয়া, অথবা তাঁর শানে অশোভন কথাবার্তা বলা।

২. এরা হচ্ছে মুনাফিক, যারা রাসূলের পশ্চাতে তাঁর গীবত করত, অথবা তাঁর পবিত্রাত্মা বিবিদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করত– যেমন: সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে। সম্মুখে এমন কিছু কষ্টের দ্বার বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মুসলিম মহিলারা যেসবের সম্মুখীন হতেন।

হাদীছে আছে, যখন প্রয়োজনীয় কাজকর্মের জন্য মুসলিম পর্দানশীন মহিলারা বের হতেন, তখন বদমাশ মুনাফিকরা ওঁৎ পেতে থাকত এবং তাদের উত্যক্ত করত। আর ধরা পড়লে

[রুকূ - ৮]

৫৯. হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলমানদের নারীদের বলে দিন, 'তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে নেয়[১]। এতে এ সম্ভাবনা অধিক যে, তাদের চেনা যাবে, ফলে তাঁদের উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٥٩

৬০. মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে[৩] ও যারা মদীনায় গুজব ছড়ায়[৪]– তারা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي

বলত- ইনি যে কোন শরীফ মহিলা, আমরা তা বুঝতে পারিনি, দাসী-বাঁদী মনে করে উত্যক্ত করেছিলাম। (তবাকাতে ইবনে সা'আদ ৮/৩৩৫)

১. অর্থাৎ শরীর ঢাকার পরও চাদরের কিছু অংশ মাথা থেকে নীচে চেহারার উপর লট্‌কিয়ে দেবে।

হাদীছে আছে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলিম মহিলারা শরীর ও চেহারা ঢেকে এভাবে বের হতেন যে, দেখার জন্য শুধু একটি চোখ খোলা থাকত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফেতনার ক্ষেত্রে আযাদ মহিলাদের চেহারাও ঢেকে রাখা উচিত। নিতান্ত প্রয়োজনের কারণে দাসী–বাঁদীদের এ হুকুমের আওতাধীন করা হয়নি। কেননা, তাতে কাজকামে অসুবিধা হয়।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ যেন চেনা যায় যে, এ দাসী নয় বরং ভদ্র মহিলা, নষ্ট নয় বরং পুণ্যময়ী, যাতে দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা তাকে উত্ত্যক্ত না করে। নেকাব বা মুখাবরণকে এর নিদর্শনস্বরূপ রাখা হয়েছে। এ বিধান খুবই কল্যাণকর। আর সামনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মার্জনাকারী, মেহেরবান।' অর্থাৎ সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে ক্ষমার আশা রয়েছে।

পরিশিষ্ট : এ ব্যবস্থা ছিল আযাদ মহিলাদের সম্পর্কে, যাতে তাদের পরিচয় পেয়ে উত্যক্ত করার দুঃসাহস কারো না হয় এবং মিথ্যা ওযর করার সুযোগ না থাকে। পরবর্তী আয়াতে ভদ্র মহিলা হোক বা দাসী, যে কাউকেই উত্যক্ত করলে কঠোর শাস্তির ধমক শোনানো হয়েছে।

৩. যাদের কুদৃষ্টি ও যৌনপ্রবৃত্তির ব্যাধি আছে।

৪. এরা খুবসম্ভব ইহুদী সম্প্রদায়, যারা অধিকাংশ সময় ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করত। অথবা হতে পারে, মুনাফিকরাই উদ্দেশ্য।

الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেব, ফলে তারা আপনার সঙ্গে এই শহরে থাকতে পারবে না, তবে অল্প কিছুদিন-

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۞

৬১. তাও অভিশপ্ত হয়ে। ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং হত্যা করে ফেলা হবে[১]।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۞

৬২. এ-ই ছিল আল্লাহর রীতি যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও। আর আপনি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না।[২]

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۞

৬৩. লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, 'এর ইলম আল্লাহরই নিকট রয়েছে।' আর আপনি কী জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটেই[৩]?

---

১. অর্থাৎ যদি নিজেদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে আমি আপনাকে ওদের উপর চড়াও করে দেব, যাতে কিছু দিনের মধ্যে ওদের মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেন এবং যে কয়েক দিন থাকে, লাঞ্ছিত ও ভীত হয়ে থাকে।

এ অনুযায়ী ইহুদীরা মদীনা থেকে বহিষ্কৃত হয় এবং মুনাফিকরা ধমক শুনে সম্ভবত নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করে। ফলে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা মদীনাতে মহিলাদের উত্যক্ত-বিরক্ত করত এবং শত্রুদের শক্তি ও মুসলমানদের দুর্বলতা ও পরাজয়ের মিথ্যা সংবাদ রটাত'— ওদের প্রতি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত নিয়ম এই যে, পয়গম্বরদের বিরুদ্ধে যারা দুষ্কৃতি করেছে এবং ফাসাদ বিস্তার করেছে, তাদের লাঞ্ছিত ও পদদলিত অথবা ধ্বংস করা হয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এ হুকুম ছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে ফাসাদকারীদের বের করে দাও। হযরত শাহ সাহেব (র) 'তাওরাত' থেকে এ রকমই উদ্ধৃত করেছেন।

৩. যদিও কিয়ামতের সময় সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা কাউকেই বলেননি, কিন্তু এখানে তার নিকটবর্তিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীছে আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি উঠিয়ে বলেছেন- أنا والساعة كهاتين (আমি ও কিয়ামত এ দুই অঙ্গুলির ন্যায়।) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৫০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৯৫০-২৯৫১) অর্থাৎ মধ্যমা অঙ্গুলি শাহাদাত

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের প্রতি লা'নত করেছেন[১] এবং ওদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন,

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾

৬৫. যাতে ওরা চিরকাল থাকবে। ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾

৬৬. যেদিন ওদের চেহারাগুলি আগুনে ওলট-পালট করা হবে[২], সেদিন বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং আনুগত্য করতাম রাসূলের[৩]!'

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং ওরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও আমাদের বড়দের কথা মেনেছিলাম, আর ওরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে।

وَقَالُوا۟ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾

৬৮. 'হে আমাদের রব! ওদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং ওদের প্রতি চরম লা'নত করুন[৪]।'

رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

থেকে যতখানি বেড়ে আছে, আমি কিয়ামত থেকে ঠিক ততখানি পূর্বে এসেছি, কিয়ামত অত্যন্ত নিকটে চলে এসেছে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'যে কথার উত্তর দুনিয়ায় কারো কাছে নেই, সে বিষয়ে মুনাফিকরা বারবার প্রশ্ন করে সম্ভবত হুযূরকে জব্দ করার চেষ্টা করত। এ জন্য এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা হল।'

আর হতে পারে, পূর্বে যে ওদের বলা হয়েছিল- لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا এর উত্তরে বিদ্রূপস্বরূপ ওরা বলেছে, 'সেই কিয়ামত ও আখেরাত কবে আসবে, যার ধমক দেওয়া হচ্ছে? এর একটা সময় তো বলুন।'

১. এই লা'নতের ফলে এরা অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। পরিণামের কথা চিন্তা করে না।

২. অর্থাৎ উপুর করে ফেলে দিয়ে ওদের চেহারাসমূহ আগুনে উলট-পালট করা হবে।

৩. তখন আক্ষেপ করে বলবে– 'হায়, আমরা যদি দুনিয়ায় আল্লাহ ও রাসূলের কথা মত চলতাম, তবে এই পরিণাম দেখতে হত না।

৪. রাগের আতিশয্যে ওরা বলবে, এই পার্থিব প্রধানরা এবং ধর্মীয় নেতারা ধোঁকা দিয়ে ও মিথ্যা কথা বলে আমাদের এ মুসিবতে ফাঁসিয়েছে। এদেরই প্ররোচনায় আমরা সত্যের পথ থেকে

[রুকূ - ৯]

৬৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাঁকে ওদের কথন (রটনা) থেকে নির্দোষ প্রমাণ করে দিলেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট অতি মর্যাদাবান[১]।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَكُوۡنُوۡا كَالَّذِيۡنَ اٰذَوۡا مُوۡسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوۡا ؕ وَكَانَ عِنۡدَ اللّٰهِ وَجِيۡهًا ؕ

বিভ্রান্ত হয়েছি। আমাদের শাস্তি হলে এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আর আমাদের উপর যে অভিশাপ, তা থেকে বড় অভিশাপ এই বড়দের উপর পড়া উচিত। যেন ওদের দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করিয়ে এরা নিজেদের কলিজা ঠাণ্ডা করতে চাইবে।

এ ধরনেরই একটি আয়াত (৩৮-৩৯) সূরা আরাফের চতুর্থ রুকূতে গিয়েছে। সেখানে ওদের এই আবেদনের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ তোমরা এমন কোন কাজ করো না বা এমন কথা বলো না, যাতে তোমাদের নবী কষ্ট পেতে পারেন। এতে নবীর তো কিছুই হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর বিরাট মর্যাদা রয়েছে। তিনি সব কষ্টকর কাজ বা কথা খণ্ডন করে দেবেন। তবে এতে তোমাদের পরিণাম খারাপ হবে। চিন্তা করে দেখ, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে লোকেরা কী রকম কষ্টকর কথাবার্তা বলেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা ও মকবুলিয়তের প্রেক্ষিতে ওদের সবকিছু বাতিল করে দিলেন এবং মূসা (আ) যে নির্দোষ, তা প্রমাণ করে দিলেন।

كَالَّذِيۡنَ اٰذَوۡا مُوۡسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوۡا

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, কতিপয় ফাসাদকারী হযরত মূসা (আ)-কে অপবাদ দিতে লাগল যে, তিনি হযরত হারূনকে নির্জন প্রান্তরে নিয়ে হত্যা করে ফেলেছেন। আল্লাহ তাআলা এক অলৌকিক উপায়ে তা মিথ্যা প্রমাণ করে দেন। (তাফসীরে তবারী ১৯/১৯৪)

আর বুখারী (৩৪০৪) ও মুসলিম শরীফে (৩৩৯) আছে, হযরত মূসা (আ) লজ্জাবশত (সে কালের প্রথার খেলাফ) নির্জনে গোসল করতেন। লোকেরা বলল, তাঁর শরীরে কোন খুঁত আছে– (কুষ্ঠ রোগের দাগ বা অণ্ডকোষ স্ফীত)। একদা হযরত মূসা (আ) নির্জনে গোসল করার সময় কাপড় খুলে একটি পাথরের উপর রাখলেন। সেই পাথর কাপড় নিয়ে ছুটল, আর হযরত মূসা লাঠি নিয়ে পাথরের পিছনে ছুটলেন। যেখানে সকল লোক দেখতে পেত, সেখানে গিয়ে পাথর থামল। সকলে তাঁকে বস্ত্রহীন দেখে বুঝতে পারল, তাঁর দেহ নিষ্কলঙ্ক। জনৈক কবি সুন্দর বলেছেন-

پوشاند لباس ہر کرا عیبے دید ÷ بے عیباں را لباس عریانی داد

('যার শারীরিক দোষ আছে, তাকে দিলেন পোশাক। যে নির্দোষ, তাকে দিলেন নগ্নতার লেবাস।')

৭০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ۝

৭১. তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমল পরিশুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলবে, সে লাভ করবে মহাসাফল্য[১]।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

৭২. আমি এই 'আমানত' আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম। তারা এটি বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল। আর মানুষ তা বহন করে নিল। সে তো বড় জালেম, অজ্ঞ[২]—

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ۝

কোন কোন মুফাসসির লিখেছেন, কারূন জনৈক মহিলাকে কিছু দিয়ে জনসমক্ষে অপবাদ দেওয়াল যে, মূসা আলাইহিস সালাম (العياذ بالله) ওর সাথে (খারাপ কাজে) লিপ্ত হন। আল্লাহ তাআলা পরিণামে কারূনকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিলেন এবং সেই মহিলারই মুখ দিয়ে এই অপবাদ খণ্ডন করিয়ে দিলেন। সূরা 'কাসাসে' এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

বি. দ্র. মূসা আলাইহিস সালাম পাথরের পিছনে বিবস্ত্র অবস্থায় ছুটে গিয়েছিলেন একান্ত নিরুপায় হওয়ার কারণে। আর সম্ভবত তিনি ধারণাও করতে পারেননি যে, পাথর তাঁকে নিয়ে গিয়ে জনসমক্ষে উপস্থিত করবে। তবে পাথরের এ আচরণ ছিল অলৌকিক, প্রাকৃতিক নিয়মবহির্ভূত। অলৌকিক বিষয়াদি সম্বন্ধে আমরা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছি, তা পড়ে নিলে এ ধরনের শাখাগত বিষয়াদিতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার অবকাশ থাকে না।

যা হোক, উক্ত ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ তাআলার নিকট নবীগণ (আ) কত প্রিয়। তিনি তাঁদেরকে দৈহিক ও আত্মিক খুঁত ও কলঙ্ক থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার জন্য কতই না যত্নবান, যাতে মানুষের মনে তাঁদের সম্পর্কে ঘৃণা এবং হেয় জ্ঞান করার মনোভাব সৃষ্টি না হয়, যা সত্য গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে সঠিক ও সোজা কথা বলে, তারা উত্তম ও মকবুল আমলের তাওফীক পায় এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা হয়। বস্তুত আল্লাহ তাআলা ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই প্রকৃত সফলতার চাবিকাঠি নিহিত- যে-ই এ পথ অবলম্বন করবে, সে সফল হবে।

২. অর্থাৎ সে বাড়াবাড়ি করে ফেলল। যে ভার আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বতের ন্যায় বড় বড় সৃষ্টি বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করল, এই নাদান মানুষ তাই নিজ দুর্বল কাঁধে তুলে নিল।

কবি বলেছেন-

آسماں بار امانت نتوانست کشید ÷ قرعۂ فال بنام من دیوانہ زدند

('আমানতের যে ভার আসমান বহন করতে পারেনি, সে ভার বহন করার জন্য লটারীতে মানুষের নাম উঠল।')

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ সে নিজের জানের প্রতি সদয় হল না। আমানত কী? লোভ সংযত করে অন্যের জিনিস রক্ষা করা। আসমান-যমীন প্রভৃতির মধ্যে লিপ্সা বলতে কিছু নেই, থাকলেও সেই বস্তুরই আছে, যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে খাহেশ-লালসা একরকম, আর আল্লাহর বিধান তার বিপরীত। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের জিনিস অর্থাৎ বিধান ও হেদায়াত সংরক্ষণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এর পরিণাম এই যে, অমান্যকারীরা অপরাধের জন্য ধৃত হয় এবং মান্যকারীদের ভুল-ত্রুটি মাফ করা হয়। এখনো বিধান এটাই যে, কেউ স্বেচ্ছায় কারো আমানত নষ্ট করলে তার বদলা দিতে হবে, আর অনিচ্ছায় নষ্ট হয়ে গেলে বদলা দিতে হবে না।'

আয়াতটির আরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজের একটি বিশেষ আমানত সৃষ্টিকুলের এমন এক শ্রেণীর কাছে গচ্ছিত রাখতে চাইলেন, যে ইচ্ছা করলে এ আমানতকে নিজ চেষ্টা-সাধনা ও শক্তির দ্বারা রক্ষা করতে পারবে এবং তার উন্নতি সাধন করতে পারবে, যাতে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রকার অবস্থা ও গুণ প্রকাশ পায়। যেমন : যে সকল ব্যক্তি আমানতের পূর্ণ সংরক্ষণ করবে এবং তার উন্নতি সাধান করবে, তাদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হবে। পক্ষান্তরে, যারা গাফলত ও দুষ্টামিতে তা বিনষ্ট করে দেবে, তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর যারা এ ব্যাপারে কিছুটা ত্রুটি করবে, তাদের সঙ্গে ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করা হবে। (তো, পুরস্কৃত করা, শাস্তি দেওয়া ও ক্ষমা করা— এ সবই আল্লাহর বিভিন্ন গুণ।)

الأمانة- এর স্বরূপ

আমার ধারণায় উল্লিখিত আমানতটি হচ্ছে— ঈমান ও হেদায়াতের একটি বীজ, যা বনী আদমের অন্তরে রোপণ করা হয়েছে; যাকে مابه التكليف বলেও আখ্যায়িত করা যায় (অর্থাৎ যার ভিত্তিতে মানুষকে বিধান পালনের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে)। এর ত্রুটি ঈমানের ত্রুটি, তাই বলা হয়েছে- لا إيمان لمن لا أمانة له (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২৩৮৩)

এ সেই 'বীজ', যার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখলে এবং যার জন্য কষ্ট-পরিশ্রম করতে থাকলে ঈমানের বৃক্ষ গজায়। যেন বনী আদমের অন্তর আল্লাহ তাআলার শস্যক্ষেত্র– যাতে বীজও তিনিই ফেলেছেন, বৃষ্টি বর্ষণের জন্য রহমতের মেঘমালাও (অর্থাৎ নবীগণ) তিনি পাঠিয়েছেন, যাদের বক্ষ থেকে আল্লাহর ওহীর বৃষ্টিপাত হয়েছে। অতএব আল্লাহর আমানততুল্য ঈমানের এই বীজকে বিনষ্ট হতে না দিয়ে বরং পরিপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা ও

মেহনত-পরিশ্রম দ্বারা তার পরিচর্যা করাই মানুষের কর্তব্য, যাতে ভুলে বা অযত্নে গাছ গজানোর পরিবর্তে বীজই শুকিয়ে না যায়।

হযরত হোযাইফা বর্ণিত হাদীছে (বুখারী-৬৪৯৭, ৭২৭৬) এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে— إنّ الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن অর্থাৎ, এ আমানত হচ্ছে হেদায়াতের সেই বীজ, যা আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে মানুষের অন্তরের গভীরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জ্ঞান-বৃষ্টি হয়েছে, যার দ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হলে ঈমানের এই চারা অঙ্কুরিত হবে, বড় হবে, ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে এবং মানুষ তার মিষ্টি ফল আস্বাদনের সুযোগ পাবে। আর যদি উপকার লাভে ত্রুটি করা হয়, তবে গাছটির গজানো এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়াতেও ত্রুটি থাকবে। অথবা সম্পূর্ণ অযত্নে রাখলে সূচনাতেই বীজটি বরবাদ হয়ে যাবে।

উক্ত 'আমানত' বহন করার যোগ্যতা শুধু মানুষের মধ্যেই ছিল!

এ সেই আমানত, যা আল্লাহ তাআলা যমীন-আসমান ও পাহাড়-পর্বতের সম্মুখে পেশ করেছিলেন। কিন্তু এ বিরাট আমানত বহন করার যোগ্যতা কার মধ্যে ছিল? কে এই সাহস করতে পারত? তাই প্রত্যেকে স্বীয় অবস্থার ভাষায় বা মুখের ভাষায় সামর্থ্য-বহির্ভূত দায়িত্ব সম্বন্ধে ভীতি প্রকাশ করল এবং এই গুরুভার বহনের সামর্থ্য নেই বলে আরজ করল। বাস্তবিকই, মানুষ ছাড়া আর কোন্ সৃষ্টি আছে, যে নিজ চেষ্টা-সাধনার দ্বারা ঈমানের এ বীজের সংরক্ষণ ও প্রতিফলন করে ঈমানের ফলবতী বৃক্ষ হাসিল করতে পারে? বস্তুত এই মর্যাদাবিশিষ্ট আমানতের হক আদায় করতে পারা এবং একটি অনাবাদ যমীনকে, যাতে আল্লাহ কর্তৃক বীজ রোপণ করা হয়েছে– বিস্তর পরিশ্রম দ্বারা মনোরম উদ্যানে পরিণত করা একমাত্র সেই 'জালুম' (বড় জালিম) ও 'জাহুল' (চূড়ান্ত মূর্খ) মানুষেরই কাজ হতে পারে, যার নিকট উপযুক্ত যমীন আছে এবং পরিশ্রম ও চাষাবাদ করে কোন জিনিসকে বাড়ানোর শক্তি আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন।

'জালুম' ও 'জাহুল' শব্দ দু'টি যথাক্রম 'জালেম' ও 'জাহেল' শব্দের আধিক্যবাচক রূপ। জালেম ও জাহেল তাকে বলা হয়, যে বর্তমানে বাছ-বিচার ও জ্ঞানশূন্য, কিন্তু এই গুণাবলী অর্জনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা সে রাখে। সুতরাং সৃষ্টির প্রথম থেকেই যে সৃষ্টি জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের গুণে গুণান্বিত এবং এক মুহূর্তের জন্যও এ গুণগুলি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি (যথা ফেরেশতাগণ), অথবা যে সৃষ্টি উক্ত গুণগুলি অর্জন করার যোগ্যতাই রাখে না (যথা যমীন, আসমান, পাহাড় প্রভৃতি)– এ উভয় দল স্পষ্টতই আল্লাহ তাআলার এ আমানতের বাহক হতেই পারে না।

অবশ্য মানুষ ছাড়া 'জিন' নামে একটি সৃষ্টি আছে, যার মধ্যে এ দায়িত্ব বহনের কিছুটা যোগ্যতা পাওয়া যায় এবং এ জন্যই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ('আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। –যারিয়াত : ৫৬') আয়াতে উভয়কে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, জিনদের মধ্যে এ

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. যার পরিণাম হল— আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের ক্ষমা করবেন।* আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

আমানতের হক আদায় করার যোগ্যতা এতই দুর্বল ছিল যে, আমানত বহনের জন্য ওদেরকে ততটা উল্লেখযোগ্য মনে করা হয়নি। এ ব্যাপারে ওদের যেন মানুষের অধীন সাব্যস্ত করা হয়েছে, স্বতন্ত্রভাবে ওদের নাম নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতি সদয় হবেন'।

১. আমার মতে এস্থলে وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতে 'তাদের ক্ষমা করা'র পরিবর্তে 'তাদের অবস্থার প্রতি সুদৃষ্টি দান ও মেহেরবানী' করার অর্থ নিলে উত্তম হয়– যেমন لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ আয়াতে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, এতে কামেল মুমিনদের কথা বলা হয়েছে। আর كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-এর মধ্যে দুর্বল ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকারীদের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। والله تعالى أعلم

نسأل الله تعالى أن يتوب علينا، ويغفر لنا، ويثيبنا بالفوز العظيم، إنه جل جلاله وعم نواله غفور رحيم

تم سورة الأحزاب ولله الحمد والمنة

সূরা সাবা

সূরা ৩৪ । ৫৪ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٥٤ ، ركوعاتها ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তার একচ্ছত্র মালিক। এবং আখেরাতেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আর তিনিই প্রজ্ঞাবান, সম্যক অবহিত[১]।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ

২. তিনি জানেন– যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা তাতে আরোহণ করে[২]।

---

১. অর্থাৎ সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার, যিনি সকল আসমানী ও পার্থিব বস্তুর একচ্ছত্র মালিক ও খালিক এবং যিনি অপার হেকমতের মাধ্যমে সজ্ঞানে সেসবের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। তিনি এ সৃষ্টিরাজি অহেতুক পয়দা করেননি। এরূপ প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানবান সত্তা সম্বন্ধে এহেন ধারণা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিশ্বব্যবস্থার অবশেষে একটি মহৎ পরিণামে পর্যবসিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য– এ অনিবার্য পরিণতিকেই আখেরাত বলা হয়।

وله الحمد في الآخرة

আর দুনিয়ায় যেমন শুধু তিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, তদ্রূপ আখেরাতেও প্রশংসা কেবল তাঁরই। বরং এখানে তো বাহ্যত অন্য কারো প্রশংসা করা হয়ে থাকে– কেননা, সৃষ্টির কাজ স্রষ্টার কাজেরই ছায়া এবং সৃষ্টির কামাল (বা গুণ) তাঁরই প্রকৃত গুণের প্রতিবিম্ব– কিন্তু সেখানে সকল মাধ্যম ও পর্দা দূর হয়ে যাবে। সকলে দেখবে, যা কিছু হয় তাঁরই পক্ষ থেকে হয়। অতএব বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয় দিক দিয়েই একমাত্র প্রশংসিত সত্তারই প্রশংসা থাকবে।

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর ছোট-বড় কোন বস্তুই তাঁর জ্ঞানবহির্ভূত নয়। যা কিছু মাটির ভিতরে (ভূগর্ভে) চলে যায়– যথা জীবজন্তু, ছোটবড় কীট বা পিঁপড়া, উদ্ভিদের বীজ, বৃষ্টির পানি, মৃতের লাশ; এবং যা ভূগর্ভ থেকে নির্গত হয়– যথা ফসল, তরুলতা, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি, আর যা আকাশের দিক থেকে অবতীর্ণ হয়– যথা বৃষ্টি, ওহী, তাকদীর, ফেরেশতা প্রভৃতি এবং যা উপরে উত্থিত হয়– যথা আত্মা, দো'য়া, আমল, ফেরেশতা প্রভৃতি– এ সবকিছু এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতের সকল বস্তু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের সীমাভুক্ত।

وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ۝

আর তিনিই পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল[১]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৩. কাফেররা বলে, 'আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না[২]।' আপনি বলুন, 'কেন নয়, কসম আমার রবের, যিনি সকল অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা! অবশ্যই তোমাদের উপর তা আসবে[৩]। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুও তাঁর অগোচর হতে পারে না। আর এর চেয়ে ছোট বা বড় এমন কোন বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) নেই[৪]।

১. অর্থাৎ এই জীবন-প্রবাহ, দুনিয়াতে মানবের সরব উপস্থিতি– সবকিছু তাঁর রহমত ও ক্ষমা-গুণেরই নিদর্শন। নতুবা বান্দাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও হলে সব কিছু এক মুহূর্তে খতম হয়ে যেত! ইরশাদ হয়েছে– وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ('আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবকেই রেহাই দিতেন না।' –ফাতির, আয়াত ৪৫)

২. ওদের ধারণায় কিয়ামত কেন আসবে না, তার কারণ হিসাবে ওদেরই উক্তি সামনে আসছে– إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ('তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখনও তোমরা নাকি নতুনভাবে সৃষ্টি হবে!!')

৩. অর্থাৎ সেই নিষ্পাপ ও পবিত্র মানব, যাঁর সততা ও আমানতদারীর কথা পূর্ব থেকে সকলেই স্বীকার করে, আর এখন সমুজ্জ্বল দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা যাঁর সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে– তিনি জোরদার কসম খেয়ে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। এর পরও স্বীকার না করার কোন অর্থ হয় কি? হাঁ, তিনি যদি কোন অসম্ভব কথা বা হেকমতের খেলাফ কথা বলতেন, তবে অস্বীকৃতির একটা অবকাশ থাকত। কিন্তু কিয়ামত অসম্ভবও নয়, হেকমতের খেলাফও নয়। সুতরাং একে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া আর কী?

৪. অর্থাৎ কসম সেই আলিমুল গায়বের, যাঁর সর্বব্যাপী ইলম থেকে আকাশ ও পৃথিবীর কোন অণু বা অণুর চেয়ে ছোট-বড় কোন বস্তুও অনুপস্থিত নয়।

এ কথা সম্ভবত এজন্য বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের সময়ের নির্ধারণ আমরা করতে পারি না। এর ইলম তাঁরই আছে, যাঁর ইলমের বহির্ভূত কোন বস্তু নেই। তাঁরই পক্ষ থেকে আমাদের যতটুকু সংবাদ দেওয়া হয়েছে, আমরা অবিকল তাই পৌঁছিয়ে দিলাম।

আর এতে কাফেরদের এই কথারও উত্তর হয়ে গেল– أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ الخ অর্থাৎ যখন আমাদের অণু-পরমাণু বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে গেল, তখন কিভাবে তা পুনরায় জড়ো করা হবে? এর উত্তরে বলে দেওয়া হল, কোন অণুই তাঁর ইলম থেকে বাইরে নয়। আর ইতিপূর্বে জানানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তুর উপর তাঁরই কর্তৃত্ব

৪. (কিয়ামত এজন্য আসবে), যাতে আল্লাহ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের প্রতিদান দেন। এমন লোকদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

لِّيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ④

৫. আর যারা আমার আয়াতগুলিকে ব্যর্থ করার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন, যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ⑤

৬. এবং যেন যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা স্বচক্ষে দেখে নেয় যে, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা-ই সত্য এবং তা প্রদর্শন করে পরাক্রমশালী, সকল প্রশংসার অধিকারীর পথ[২]।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑥

রয়েছে। অতএব তোমাদের বিক্ষিপ্ত অণুসমূহ মুহূর্তের মধ্যে জড়ো করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

বি. দ্র. সুস্পষ্ট কিতাব দ্বারা 'লওহে মাহফূজ' উদ্দেশ্য, যার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ তাআলার ইলম অনুযায়ী রক্ষিত আছে।

১. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন এজন্য অনিবার্য, যাতে মানুষদেরকে সৎকর্মের ও অসৎকর্মের প্রতিফল দেওয়া যায় এবং আল্লাহ তাআলার সমস্ত গুণাবলী (প্রতিদান দেওয়া, শাস্তি প্রদান করা, ক্ষমা করা প্রভৃতি) পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

বি. দ্র. 'যারা দৌড়ঝাঁপ করে আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করার জন্য'– অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহ বাতিল করার জন্য এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে লোকদের তা থেকে বাধা দেওয়ার জন্য। এভাবে ওরা যেন আল্লাহকে অক্ষম করতে ও হারাতে চায় এবং মনে করে যে, ওরা তাঁর নাগালের ভিতর আসবে না, কখনো ধৃত হবে না।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন এজন্যও আবশ্যক, যাতে যাদের ঈমান ও বিশ্বাস ছিল, তাদের 'আইনুল ইয়াকীন' (অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যয়) হাসিল হয়ে যায় এবং তারা চোখে দেখে নেয় যে, কুরআনের সংবাদসমূহ হুবহু ও শতভাগ শুদ্ধ এবং নিঃসন্দেহে কুরআনই সেই কিতাব, যা মহাশক্তিশালী, প্রশংসিত আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার সঠিক পথ প্রদর্শন করত।

কোন কোন মুফাসসির (আয়াতটিকে স্বতন্ত্র ধরে) এর এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, আয়াতে وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ এর বিপরীতে আহলে ইলম (মুসলমান হোক বা আহলে কিতাব) এর কথা বলা হয়েছে যে– তাঁরা জানেন এবং প্রত্যক্ষ করছেন যে, কিয়ামত প্রভৃতি সম্বন্ধে কুরআন করীমের বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা মানুষকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মিলনের সঠিক পথে নিয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ

৭. কাফেররা বলে, 'আমরা কি তোমাদের এমন এক লোক দেখাব, যে তোমাদের এ সংবাদ দেয় যে- তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখনও তোমরা অবশ্যই নতুনভাবে সৃজিত হবে?'

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝

৮. সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছে, না কি সে উম্মাদ'? (কোনটিই নয়), বরং যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, ওরা আযাবে ও চরম ভ্রান্তিতে রয়েছে[২]।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۚ

৯. ওদের সামনে ও পিছনে যে আসমান ও যমীন রয়েছে, ওরা কি তা দেখে না? আমি ইচ্ছা করলে ওদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেব অথবা ওদের উপরে আকাশের টুকরা পতিত করব[৩]। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক (আল্লাহ)-অভিমুখী বান্দার জন্য রয়েছে নিদর্শন[১]।

---

১. কুরায়শ বংশের কাফেররা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ধৃষ্টতা করে বলত- আস, তোমাদের এমন এক লোক দেখাই, যে বলে- তোমরা পচে-গলে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যখন মাটিতে মিশে যাবে, তখনও নাকি তোমাদের নতুন করে জীবিত করে খাড়া করে দেওয়া হবে। আচ্ছা, এমন নিরর্থক কথা কে বিশ্বাস করতে পারে? এতে বুঝতে হবে যে, হয় এ লোকটা জেনে বুঝে আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যারোপ করছে এবং বলছে যে, তিনি এ রকম সংবাদ দিয়েছেন। তা না হলে এই ব্যক্তি নিছক পাগল, এর মাথায় ছিট আছে, পাগলদের ন্যায় আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলে العياذ بالله।

২. অর্থাৎ নবীর কথা মিথ্যাও না, পাগলামিও না। অবশ্য এ লোকগুলো জ্ঞান-বুদ্ধি ও সততা-কল্যাণের পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে এবং অনর্থক প্রলাপ বকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে। কারো এমন মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটা যে, সে আল্লাহর পয়গম্বরদের পর্যন্ত মিথ্যারোপকারী বা পাগল বলতে পারে, এটা তার জন্য এক ভয়ানক আযাবই বটে- بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ

৩. অর্থাৎ ওরা কি অন্ধ হয়ে গেছে যে, আকাশ-পৃথিবীও ওদের দৃষ্টিগোচর হয় না? অথচ সম্মুখে-পশ্চাতে যে কোন দিকে তাকালে তা দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি সম্পর্কে তো ওরাও স্বীকার করে যে, এসব আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে ধ্বংস করতে অসুবিধা কী? এবং যিনি এরূপ বিরাট জ্যোতিষ্কসমূহ সৃষ্টি করতে ও ধ্বংস করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মানুষের শরীর পচিয়ে-গলিয়ে ফের সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন?

[রুকূ - ২]

১০. নিশ্চয়ই আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম[২]– (আমি বলেছিলাম,) 'হে পাহাড়-পর্বত! তোমরা তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পাঠ কর'; এবং হে পাখিরা! (তোমরাও)*[৩]। আর আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ

এই লোকগুলোর কি কোন ভয় নেই? ওরা তাঁরই আকাশের নীচে এবং তাঁরই পৃথিবীর বুকে থেকে এসব ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলে কীভাবে? অথচ আল্লাহ ইচ্ছা করলে এখনই ওদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন অথবা আকাশ থেকে একটি শিলা খণ্ড নিক্ষেপ করে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারেন। ফলে ওরা দেখে নিবে কিয়ামতের ছোট-খাট এক নিদর্শন!!

১. অর্থাৎ আল্লাহর যে বান্দারা বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগায় ও আল্লাহ তাআলার প্রতি রুজু হয়, তাদের জন্য এই আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। তারা এ মহা ব্যবস্থাপক (আল্লাহ) ও তাঁর হেকমতপূর্ণ বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা দেখে বোঝে যে, এসব একদিন কোন একটা মহৎ ও পরিপূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, আর এরই নাম আখেরাতের ঘর (বা পরকাল)। এ চিন্তা করে তারা আরো বেশি নিজেদের মালিক ও খালেকের অভিমুখী হয় এবং যেসব আসমানী ও পার্থিব নে'য়ামত লাভ করেছে সেজন্য অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এমন বান্দার মধ্য থেকে কয়েকজনের আলোচনা সামনে আসছে।

২. অর্থাৎ নবুওয়াতের সঙ্গে অসাধারণ রাজত্বও দান করেন।

✯ দ্বিতীয় তরজমা– 'এবং পাখিদেরও (তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলাম)।'

৩. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অনেক সময় বনে-জঙ্গলে চলে যেতেন। সেখানে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করতেন, তাঁর ভয়ে কাঁদতেন, তাসবীহ-তাহলীল পড়তেন এবং অসাধারণ সুললিতকণ্ঠে 'যাবূর' পাঠ করতেন। যার বিস্ময়কর প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পড়া শুরু করত, পাখিরাও তাঁর চার পাশে জড় হয়ে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাত। আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম কুদরত ও অনুগ্রহে তাঁকে এ বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন।

এখানে পাহাড়-পর্বতের তাসবীহ বলতে হযরত দাউদ (আ)-এর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি মাত্রই উদ্দেশ্য নয়, অথবা সেই সাধারণ তাসবীহ উদ্দেশ্য নয়, যা সকল মাখলুক আপন অবস্থার দ্বারা বা জবানীতে পাঠ করে। কারণ, যদি এতটুকুই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হযরত দাউদের বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। অথচ এখানে তো তাঁর 'বিশেষ মর্যাদা'র নমুনা হিসাবেই পাহাড় ও পাখির তাসবীহ পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. (এবং বলেছিলাম), 'তুমি প্রশস্ত বর্মসমূহ তৈরি কর এবং (তার) কড়াগুলি সংযুক্ত কর পরিমাপমত[১]। আর তোমরা সকলে সৎকর্ম করতে থাক। তোমরা যা-কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা[২]।'

أَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾

১২. এবং সুলায়মানের (অধীন করে দিয়েছিলাম) বায়ুকে– তা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায়ও এক মাসের পথ। এবং তাঁর জন্য প্রবাহিত করে দিয়েছিলাম গলিত তামার ঝরনা[৩]। আর জিনদের মধ্যে অনেকে ছিল, যারা তাঁর সামনে তাঁর রবের আদেশে কাজ করত। (তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল),

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَأَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهٖ

উল্লেখ্য, يا جبال أوبي معه আয়াতাংশে যে নির্দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল 'তাকবীনী' (বা সৃষ্টিগত) নির্দেশ।

১. অর্থাৎ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহাকে মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। ফলে আগুন ও কারিগরি যন্ত্রপাতি ছাড়াই তিনি লোহাকে ইচ্ছামত ভেঙ্গে-বাঁকিয়ে নিতেন এবং লৌহবর্ম তৈরি করে বিক্রয় করতেন। বাইতুল মালের উপর নিজের বোঝা না চাপিয়ে বরং হাতের কামাই দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

কথিত আছে, কড়া সম্বলিত লৌহ-বর্ম সর্বাগ্রে তাঁর হাতেই নির্মিত হয়, এতে বর্ম ঢিলা-ঢালা থাকে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন, প্রশস্ত ও ঢিলা-ঢালা বর্ম তৈরি কর এবং তার আংটা ও কড়াগুলি সঠিক আন্দাজে যুক্ত কর, যা ছোট-বড় ও পাতলা-মোটা হওয়ার ব্যাপারে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিমাপমত হবে।

২. অর্থাৎ কারিগরি কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে প্রকৃত অনুগ্রহকারী সম্পর্কে যেন গাফলতি না হয়। বরং সর্বদা সৎকর্মে ব্যস্ত থাক। মনে রেখো, আল্লাহ সব কিছু দেখেন।

৩. হযরত সুলায়মান (আ)–এর সিংহাসন আকাশে উড়ত। বাতাস একে শাম থেকে ইয়ামান এবং ইয়ামান থেকে শামে নিয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন– বাতাসের সাহায্যে তিনি এক মাসের দূরত্ব অর্ধদিনে অতিক্রম করতেন। সূরা 'আম্বিয়া' ও সূরা 'নামলে' এর কিছু বর্ণনা গত হয়েছে, সামনে সূরা 'সাদে'ও কিছু বিবরণ আসবে।

গলিত তামার ঝরনা সম্বন্ধে কথিত আছে, আল্লাহ তাআলা ঝরনাটি ইয়ামানে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। জিনেরা তামা দিয়ে বড় বড় পাত্র (ডেগ, চিলমচি প্রভৃতি) তৈরি করত। এক একটি পাত্রে গোটা একটি সৈন্যদলের খাবার পাকানো হত ও খাওয়ানো হত।

وَمَنۡ یَّزِغۡ مِنۡهُمۡ عَنۡ اَمۡرِنَا نُذِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ السَّعِیۡرِ ۝

তাদের মধ্যে যে আমার হুকুম অমান্য করবে, আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব[১]।

یَعۡمَلُوۡنَ لَهٗ مَا یَشَآءُ مِنۡ مَّحَارِیۡبَ وَتَمَاثِیۡلَ وَجِفَانٍ کَالۡجَوَابِ وَقُدُوۡرٍ رّٰسِیٰتٍ ؕ اِعۡمَلُوۡۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُکۡرًا ؕ وَقَلِیۡلٌ مِّنۡ عِبَادِیَ الشَّکُوۡرُ ۝

১৩. তারা তাঁর জন্য তিনি যা চাইতেন তৈরি করত, যথা: বড় বড় ইমারত, প্রতিকৃতি, হাউজের মত (বড় বড়) পাত্র ও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ[২]। 'হে দাউদ-পরিবার! শোকর করার নিমিত্ত আমল করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই শোকর আদায়কারী[৩]।'

فَلَمَّا قَضَیۡنَا عَلَیۡهِ الۡمَوۡتَ مَا دَلَّهُمۡ عَلٰی مَوۡتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الۡاَرۡضِ تَاۡکُلُ

১৪. অতঃপর আমি যখন তাঁর মৃত্যু ঘটালাম, তখন তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একমাত্র মাটির

---

১. অর্থাৎ বহু সংখ্যক জিন, যাদের অন্যত্র শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, মামুলি কুলি-মজুরের মত সুলায়মান (আ.)-এর কাজকর্মে নিয়োজিত থাকত। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ছিল, সুলায়মানের আনুগত্য কর, সামান্য অবাধ্যতা করলে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ জিনেরা বড় বড় মহল, মসজিদ ও দুর্গ নির্মাণ করত এবং প্রতিকৃতি বানাত (যা শরী'য়তে মুহাম্মদীতে নিষিদ্ধ হলেও তাঁর (সুলায়মান আ. এর) শরী'য়তে নিষিদ্ধ ছিল না)। এ ছাড়া হাউজ বা পুকুরের ন্যায় বড় আকারের থালা-বাসন এবং এমন বিশাল ডেগ তৈরি করত, যা নাড়াচাড়া করা যেত না বলে একই স্থানে রাখা থাকত।

৩. অর্থাৎ এসব সুমহান নে'য়ামত ও অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাক– শুধু মুখে নয়, কর্মের দ্বারাও; অর্থাৎ এমন আমলাদি কর, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। বস্তুত আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতিই কমবেশি অনুগ্রহ করে থাকেন, কিন্তু পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা খুবই কম। যেহেতু এমন লোক কম, তাই কৃতজ্ঞদের মর্যাদা বেশি। অতএব কামেল কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে আল্লাহর কাছে নিজের মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি কর।

দাউদ (আ)-এর পরিবারকে উদ্দেশ্য করে এ কথাগুলো বলা হয়েছে। কারণ, তাদের প্রতি সাধারণ অনুগ্রহরাজি তো ছিলই। তা ছাড়াও দাউদ (আ.)-এর প্রতি যেসব অনুগ্রহ করা হয়েছে, এক হিসাবে তা তাদের সবার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

বর্ণিত আছে, দাউদ আলাইহিস সালাম পরিবারবর্গের সকলের মধ্যে সময় এমনভাবে বণ্টন করে দিয়েছিলেন যে, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোন সময় ছিল না, যখন ঘরে কেউ না কেউ আল্লাহ তাআলার ইবাদতে রত না থাকত।

مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

কীটই তাদের অবহিত করল, যা তাঁর লাঠি খাচ্ছিল। অনন্তর তিনি যখন পড়ে গেলেন তখন জিনেরা বুঝতে পারল, তারা যদি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত তবে অপমানজনক কষ্টে পড়ে থাকত না[১]।

১. হযরত সুলায়মান (আ) জিনদের দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করাচ্ছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে, তখন সমগ্র নকশা জিনদের বলে দিয়ে তিনি একটি কাঁচের ঘরে দরজা বন্ধ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মগ্ন হয়ে গেলেন। এভাবে মাসের পর মাস নির্জনে ইবাদতে রত থাকা তাঁর অভ্যাস ছিল। এ অবস্থাতেই ফেরেশতা তাঁর প্রাণ কব্য করলেন। আর তাঁর লাশ মুবারক লাঠির উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল। কেউই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হল না। ফলে মৃত্যুর পরও জিনেরা দীর্ঘকাল নির্মাণকাজ চালিয়ে গেল। যখন নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হল, তখন যে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তা ঘুণে খাওয়ার কারণে ভেঙ্গে পড়ল, আর সকলে তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অবহিত হল।

এর দ্বারা জিনেরা নিজেরাও বুঝল যে, তাদের গায়ব জানার দৌড় কতটুকু। সেইসঙ্গে এদের ভক্ত মানুষরাও বুঝতে পারল, জিনেরা গায়বের খবর যদি জানতই, তবে কি এ লাঞ্ছনাকর কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকত? না। বরং হযরত সুলায়মান (আ)–এর মৃত্যু হওয়ামাত্র কাজ ছেড়ে চলে যেত।

এ ঘটনা থেকে আরও প্রকাশ পেল যে, শয়তান প্রভৃতিকে বশ করা হযরত সুলায়মান (আ) এর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব ছিল না, এ ছিল একমাত্র আল্লাহর দয়া– যা আল্লাহ ইচ্ছা করলে মৃত্যুর পরে একটি লাশের মধ্যেও বহাল রাখতে পারেন। আরো উল্লেখ্য যে, সুলায়মান আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি যেসব অনুগ্রহ করা হয়েছিল, মৃত্যুর পরও এক জরুরী পর্যায় পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখা হল এবং বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, পয়গম্বরদের শুরু করা কাজ (যেমন বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ) কী কী উপায়ে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ করে থাকেন।

পূর্বাপর সামঞ্জস্য : এ পর্যন্ত ছিল কয়েকজন আল্লাহ-অভিমুখী ও তাঁর বিশেষ কৃতজ্ঞ বান্দার আলোচনা। সামনে এমন এক অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ জাতির (সাবা সম্প্রদায়ের) বর্ণনা আসছে, যারা চরম আরাম-আয়েশ এবং পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভের পরও কুফর ও অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়, ফলে শাস্তিস্বরূপ ওদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এরা ছিল ইয়ামানের ঐশ্বর্যশালী ও প্রভাবশালী এক জাতি, যারা শত শত বছর ধরে বিরাট প্রতিপত্তির সাথে রাজ্য শাসন করেছিল। এদের এক রানী (বিলকিস) ছিল, হযরত সুলায়মান (আ)–এর দরবারে যার উপস্থিতির বৃত্তান্ত সূরা 'নামলে' অতিবাহিত হয়েছে। হতে পারে, এ সূত্রেও এখানে সুলায়মান (আ)-এর পর 'সাবা সম্প্রদায়'-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. নিশ্চয় সাবা-সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন– দুটি উদ্যান, (একটি) ডান দিকে ও (অপরটি) বাম দিকে[১]। 'তোমরা আপন রবের রিযিক থেকে খাও এবং তাঁর শোকর কর[২]। (এ) এক উৎকৃষ্ট শহর, আর (তিনি) অতি ক্ষমাশীল রব[৩]।'

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ۞

১. অর্থাৎ বাগানের সুদীর্ঘ দুটি সারি পথের ডানে ও বামে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ছিল। যদি ওরা বুঝমান হত, তবে আল্লাহর রহমত ও কুদরতের এই নিদর্শনই ঈমান আনা ও কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

২. অর্থাৎ, উক্ত নিদর্শন ও নেয়ামত যেন মৌন ভাষায় বলছিল, তোমাদের প্রভু-প্রদত্ত নে'য়ামতসমূহ দ্বারা ধন্য হও এবং এই প্রকৃত অনুগ্রহকারীর শোকর আদায় কর, কুফর ও গোনাহ করে অকৃতজ্ঞ হয়ো না। অথবা পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী যেমন বলেছেন, অর্থ এই যে, নবীদের মুখে আল্লাহ তাআলা এ আদেশ দিয়ে থাকবেন।

কথিত আছে, তেরজন নবী এ জাতির প্রতি প্রেরিত হন। এ কথা সঠিক হলে তাঁরা হযরত মাসীহ (আ)– এর পূর্বে এসে থাকবেন এবং এই নবীগণের উত্তরসূরীরা পরবর্তী কালেও সাবা জাতিকে তাদের ধ্বংসের আগ পর্যন্ত নসীহত করতে থাকেন।

৩. **সাবা সম্প্রদায়ের কাহিনী**

أرض القرآن গ্রন্থপ্রণেতা (আল্লামা সুলায়মান নদভী র.) 'সাবা' সম্প্রদায়ের স্থাপনাসমূহের উল্লেখ করে লেখেন, "তাদের স্থাপনাসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সেই বাঁধ, যাকে হিজাযের আরবরা سدّ এবং ইয়ামানের আরবরা عَرِم বলে।" আরবদেশে স্থায়ী কোন নদী নেই। ফলে পাহাড়-পর্বত থেকে পানি নেমে মরুভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে শুকিয়ে যায়– খেত-খামারের কাজে আসে না। তাই সাবাবাসীরা পাহাড় ও উপত্যকাসমূহের মধ্যে সুবিধা মত বিভিন্ন স্থানে বড় বড় বাঁধ বেঁধে পানি আটকিয়ে রাখত এবং প্রয়োজন মত চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করত।

'সাদ্দে মাআরিব'

সাবা রাজ্যে এরূপ শত শত বাঁধ ছিল, তন্মধ্যে রাজধানী 'মাআরিবে'র 'সাদ্দে মাআরিব' সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। মাআরিব নগরীর দক্ষিণে ডান দিকে ও বাম দিকে 'আবলক' নামে দুটি পাহাড় আছে। সাবার লোকেরা পাহাড় দুটির মাঝে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৮০০ সনে 'সাদ্দে মাআরিব' নির্মাণ করেছিল। এ বাঁধ ১৫০ ফুট দীর্ঘ ও ৫০ ফুট প্রস্থ একটি বিশাল প্রাচীর। কালক্রমে এর অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো প্রায় এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট রয়েছে। 'আর্নড' নামক এক পাশ্চাত্য পর্যটক এর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ফ্রেঞ্চ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এবং এর বর্তমান মানচিত্র অতি উত্তমরূপে অঙ্কন করেছেন। উক্ত প্রাচীরের স্থানে স্থানে লিখিত লিপি রয়েছে, যার পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয়েছে।

১৬. কিন্তু ওরা (আমা হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি ওদের উপর প্রবল বন্যা* ছেড়ে	فَاَعۡرَضُوۡا فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ سَيۡلَ

جنتان عن يمين وشمال

উক্ত বাঁধের উপরে-নীচে বহু সংখ্যক জানালা ছিল, যেগুলি প্রয়োজন হলে খোলা ও বন্ধ করা যেত। বাঁধের ডানে-বামে পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি বড় বড় দরজা ছিল, যেগুলি দ্বারা পানি বণ্টিত হয়ে ডানে বামের খেত-খামারে প্রবাহিত হত। পানি সরবারহের এ ব্যবস্থাপনার ফলে ডান ও বাম উভয় দিকের এই মরুময় ও লবণাক্ত ভূমির তিনশত বর্গ মাইলের মধ্যে শত শত ক্রোশব্যাপী মনোরম উদ্যান তৈরি হয়েছিল, যার মধ্যে নানা জাতের রকমারি ফলমূল ও সুগন্ধময় গাছগাছালি ছিল। جنتان عن يمين وشمال বলে পবিত্র কুরআন এই বাগানগুলির দিকেই ইঙ্গিত করছে।

খৃষ্টপূর্ব ১৪৫ সনে সাবা জাতির সমকালীন গ্রীক ঐতিহাসিক আগা থরশিড্স বলেন, "আরবের সুজলা-সুফলা অঞ্চলে সাবার লোকেরা বসবাস করে। সেখানে অসংখ্য উৎকৃষ্ট ফলমূল হয়। সাগরের তীরবর্তী স্থলভাগে অতি সুন্দর বৃক্ষরাজি জন্মায়। তাছাড়া দেশের ভিতরে লোবান প্রভৃতি এবং দারুচিনি ও খেজুরের উঁচু উঁচু গাছপালার ঘন জঙ্গল বিদ্যমান এবং এসব বৃক্ষ থেকে মিষ্টি-মধুর সুগন্ধ ছড়াতে থাকে। গাছগাছালি এত বিচিত্র রকমের যে, প্রত্যেক প্রকারের নাম ও গুণ বর্ণনা করা মুশকিল, তবে সেসব থেকে যে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে, তা জান্নাতের সুগন্ধির চেয়ে কম নয় (?!) এবং তার প্রশংসা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যারা সমুদ্র-তীর দিয়ে পথ অতিক্রম করে, তারাও উপকূল থেকে বায়ু প্রবাহের সময় উক্ত সুগন্ধি যেন আবে-হায়াতের ন্যায় উপভোগ করে থাকে। এ উপমাও উক্ত সুগন্ধির মাধুর্যের মোকাবেলায় অতি সামান্য।'

'সাবা' রাজত্বকালের শেষভাগে জীবিত আর্টিমিড্রোস লেখেন, "সাবার বাদশাহর প্রাসাদ 'মাআরিবে' বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যেখানে আনন্দ-স্ফূর্তি ও ভোগ-বিলাসের পরিবেশ বিদ্যমান।"

بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوۡرٌ

মোটকথা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-শ্যামলিমা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশের উপকরণ এবং ভারসাম্যপূর্ণ আবহাওয়ার শহর 'মাআরিব' নগরী সত্যিই بلدة طيبة ('উৎকৃষ্ট শহর') এর উত্তম নমুনা ছিল।

আর আয়াতে যে بلدة طيبة এর সাথে رب غفور এর উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে শোকর কর। তবে মানবিক দুর্বলতার কারণে কিছু ত্রুটি থেকে গেলে আল্লাহ তা'আলা ছোট ছোট বিষয়ে পাকড়াও করেন না, নিজ মেহেরবানীতে মাফ করে দেন। তার নেয়ামতের যথার্থ শোকর কার দ্বারা আদায় হতে পারে?

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'বাঁধভাঙ্গা বন্যা।'

الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَیْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِیْلٍ ⑯

দিলাম এবং সেই উদ্যান দুটির পরিবর্তে ওদের এমন দু'টি উদ্যান দিলাম, যাতে ছিল তিক্ত ফলমূল, ঝাউগাছ ও অল্পকিছু কুলগাছ[১]।

ذٰلِكَ جَزَیْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِیْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ⑰

১৭. আমি ওদের এই শাস্তি দিয়েছিলাম, কারণ ওরা না-শোকরী করেছিল। আর আমি চরম অকৃতজ্ঞকেই (এমন) শাস্তি দিয়ে থাকি[২]।

وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا

১৮. আমি ওদের ও যে জনপদগুলিতে আমি বরকত রেখেছি, তার মাঝে এমনসব জনপদ স্থাপন করেছিলাম, যা (মুসাফিরদের) নজরে

---

১. অর্থাৎ ওরা উপদেশের প্রতি মনোযোগ দেয়নি এবং প্রকৃত দাতার কৃতজ্ঞতা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ফলে আমি বন্যার আযাব পাঠিয়ে দিলাম। সেই বাঁধ ভেঙ্গে গেল, সমস্ত বাগ-বাগিচা ও জমি-জমা পানিতে ডুবে গেল এবং সেই উৎকৃষ্ট, মিষ্টি ফলমূলের স্থলে নিকৃষ্ট গাছগাছালি ও ঝোপঝাড় রয়ে গেল। যেখানে আঙ্গুর, খেজুর ও রকমারি নে'য়ামত পয়দা হত, সেখানে এখন পিলুগাছ, ঝাউগাছ, তিক্ত ও বিস্বাদ ফলের গাছ ছাড়া আর কিছুই রইল না। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তু বলতে যা থাকল তা ছিল কিছু কুলগাছ।

এ ঘটনা হযরত মাসীহ (আ) ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী যুগে ঘটে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা 'আবরাহা আল আশরাম' রাজার আমলের একটি বিরাট প্রস্তরফলক আরিম বাঁধের ধ্বংসাবশেষের উপর পেয়েছেন, তাতেও উক্ত বাঁধ ভাঙ্গার উল্লেখ আছে। তবে এটা সম্ভবত কুরআনে বর্ণিত ঘটনার পরবর্তী কালের ঘটনা (والله أعلم)।

হযরত শাহ (আ. কাদের) শাহেব (র) লেখেন, 'যখন আল্লাহ ইচ্ছা করলেন তখন আযাব পাঠালেন। সেই বন্যা রোধকারী বাঁধে ছিদ্র হল এবং তার ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল। অবশেষে বন্যার চাপে বাঁধটি ভেঙ্গে গেল। পানি আযাবের ছিল বলে যে জমির উপর দিয়েই তা গড়িয়েছে, সে জমি বেকার হয়ে গেছে।

কথিত আছে, এক জ্যোতিষী বাঁধ ভেঙ্গে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। ফলে অনেকে দেশ ত্যাগ করে এদিক সেদিক চলে গিয়েছিল। যারা অবশিষ্ট ছিল, তাদেরই ভাগ্যে সেই সব উৎকৃষ্ট বাগানের পরিবর্তে এই নিকৃষ্ট ও বিস্বাদ দ্রব্যাদি জোটে। (والله تعالى أعلم)

২. অর্থাৎ এরূপ কঠোর শাস্তি বড় বড় অকৃতজ্ঞদেরই দেওয়া হয়। আর কুফরের চেয়ে বড় না-শোকরী আর কী হবে? সূরা 'নামল'-এর আয়াত (২৪) وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الخ –এ যে শিরকের উল্লেখ আছে, তা বাহ্যত রাণী বিলকীসের পরেও 'সাবা' জাতির মধ্যে অবশিষ্ট ছিল।

فِيۡهَا السَّيۡرَ ؕ سِيۡرُوۡا فِيۡهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيۡنَ ﴿١٨﴾

আসত এবং তাতে ভ্রমণের (মনজিলগুলি) পরিমিত দূরত্বের করেছিলাম (আর তাদের বলেছিলাম) 'এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ কর[১]।'

فَقَالُوۡا رَبَّنَا بٰعِدۡ بَيۡنَ اَسۡفَارِنَا وَظَلَمُوۡۤا

১৯. ওরা বলতে লাগল, 'হে আমাদের রব! আমাদের সফরের (মনজিলগুলির) মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দিন'[২]। এভাবে ওরা নিজেদের

---

১. القرى التي باركنا فيها বলতে শামদেশের এলাকাগুলি উদ্দেশ্য– অর্থাৎ তাদের দেশ থেকে শাম পর্যন্ত পথগুলি নিরাপদ ছিল। আর পথের দুই পাশে পরিমিত দূরত্বে এমনি সুবিন্যস্ত গ্রামের পর গ্রাম ছিল যে, পথিক পথের প্রতিটি মনযিলে পানাহার ও বিশ্রামের সুযোগ পেত। লোকালয়গুলির একটি অপরটির নিকটবর্তী ছিল এবং একটু পর পর দৃষ্টিগোচর হত। ফলে পথিকের মন ঘাবড়াত না। অধিকন্তু চোর-ডাকাতেরও ভয় ছিল না। এমতাবস্থায় তা সফর নয়, বরং একরকম আমোদ ভ্রমণ (Pleasure Trip) ছিল।

أرض القرآن এর লেখক লেখেন, 'ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল সাবা বাসীদের সুখ-সম্পদের মূল উৎস। ইয়ামান একদিকে ভারতবর্ষের সমুদ্র-তীরসমূহের বিপরীতে, অন্যদিকে আফ্রিকা মহাদেশের সমুদ্র-তীরসমূহের অপরদিকে অবস্থিত (সংক্ষেপে বললে, তার একদিকে আরব সাগরের তীর আর অন্যদিকে লোহিত সাগরের তীর। –অনুবাদক)। স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর, মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, হাতীর দাঁত– এসব সামগ্রী হাবশা ও ভারতবর্ষ থেকে ইয়ামানে এসে পৌঁছত। সেখান থেকে সাবা বাসীরা তা উটের পিঠে বোঝাই করে লোহিত সাগরের উপকূল ধরে স্থল পথে হিজায অতিক্রম করে শাম ও মিসরে নিয়ে যেত। পবিত্র কুরআন (হিজর : ৭৯) এই পথকে إمام مبين (উন্মুক্ত পথ) এবং এই ভ্রমণকেই رحلة الشتاء والصيف (কুরায়শ : ২) নামে উল্লেখ করেছে, যা কুরায়শরা জারি করেছিল। এই বাণিজ্য কাফেলার যাতায়াতের কারণে ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত বহু জনপদ সারিবদ্ধভাবে গড়ে ওঠে – قرى ظاهرة। ফলে যাত্রীদের জন্য নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক সফর সম্ভব হত।'

গ্রীক ঐতিহাসিক আরাউস থন্স (মৃত্যু: খ্রিস্টপূর্ব ১৯৪) বর্ণনা করেন, হায্রামওত থেকে 'সাবা' রাজ্য পর্যন্ত চল্লিশ দিনের পথ, আর 'মাঈন' থেকে 'আয়লা' (আকাবা) পৌছতে ব্যবসায়ীদের সত্তর দিন লাগত।

২. অর্থাৎ, আচার-আচরণের মৌন ভাষায়, অথবা হতে পারে মুখে প্রকাশ্যেই বলেছে– আয় আল্লাহ! এভাবে সফরের আনন্দ নেই। মনজিলগুলি দূরে দূরে হলে, আশেপাশে লোকালয় না থাকলে, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হলে তবেই না সফরের আনন্দ!

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আরাম-আয়েশে ওরা আত্মহারা হয়ে সফরের কষ্ট কামনা করেছিল এবং অন্যান্য দেশের সফরে পানি ও লোকালয়ের অভাবে যেরূপ কষ্ট ও ক্লান্তি হয় বলে শুনেছিল, তদ্রূপ তাদেরও দিতে বলেছিল। এ অত্যন্ত না

ক্ষতি করল। ফলে আমি ওদেরকে কিস্‌সা-কাহিনীতে পরিণত করলাম এবং ওদের সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম[১]। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য[২]।

أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ⑲

২০. নিশ্চয় ইবলীস ওদের ক্ষেত্রে আপন ধারণা সত্যে পরিণত করেছে, আর ওরা সকলেই ওর অনুসরণ করেছে– কেবল একদল ঈমানদার ব্যতীত[৩]।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑳

শোকরীর কথা। ঠিক এভাবেই বনী ইসরাঈল মান্‌না ও সালওয়ার প্রতি বিরক্ত হয়ে পিঁয়াজ-রসুন প্রার্থনা করেছিল।

১. অর্থাৎ আমি ওদের ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন করে দিলাম এবং ওদের বিভক্ত-বিক্ষিপ্ত করে ফেললাম। অধিকাংশ গোত্র এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ল– কেউ একদিকে, কেউ অন্যদিকে চলে গেল। জনপদগুলির নাম নিশানা পর্যন্ত ভুল হরফের মত বিলুপ্ত হয়ে গেল। এখন শুধু ওদের কাহিনী অবশিষ্ট রয়েছে, যাতে মানুষ শুনে শিক্ষা গ্রহণ করে। ওদের সেই বিরাট সভ্যতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।

ওদের ধ্বংস ও পতনের কারণ বর্ণনায় 'أرض القرآن'-এর প্রণেতা বলেন, গ্রীক ও রোমানরা মিসর ও শাম অধিকার করে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার বাণিজ্যকে স্থলপথের পরিবর্তে জলপথে পরিবর্তিত করে দেয়। ফলে যাবতীয় পণ্যদ্রব্য জাহাজ-নৌকাযোগে লোহিত সাগরের পথে মিসর ও শামের উপকূলসমূহে অবতরণ করতে থাকে। বাণিজ্যপথের এ গতি পরিবর্তনের ফলে ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত (যাত্রীর অভাবে) স্থল পথগুলি বিরান হয়ে পড়ে এবং সাবার নতুন জনপদগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়।'

সাবা জাতির ধ্বংসের কারণ হিসাবে লেখকের এ ব্যাখ্যা (ইংরেজ লেখক) মূলারের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে। হতে পারে, এও ওদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার একটি বাহ্যিক কারণ, তবে একেই একমাত্র কারণ বলা ঠিক নয়।

২. অর্থাৎ এসব হাল-অবস্থা শুনে বুদ্ধিমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যখন আল্লাহ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেন তখন বেশি করে শোকর আদায় করতে থাকবে, আর যখন দুঃখ-কষ্ট আসে তখন সবর ও ধৈর্য ধারণ করে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

৩. আদম (আ.)-কে সৃষ্টির দিন ইবলীস অনুমান করে বলেছিল- لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ('আমি অবশ্যই অল্প সংখ্যক ছাড়া তার (সকল) সন্তানকে আমার বশীভূত করে ফেলব।' –ইসরা, আয়াত ৬২), এবং এও বলেছিল : ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ('অতঃপর তাদের উপর আক্রমণ চালাব

২১. আর তাদের উপর ইবলীসের কোন আধিপত্য ছিল না, তবে (ছিল কেবল কুমন্ত্রণা দেওয়ার শক্তি), যাতে আমি পরিষ্কারভাবে জেনে নিই, কে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে আর কে তার বিষয়ে সংশয়ের মধ্যে থাকে। আর আপনার রব সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক[১]।

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾

[রুকূ - ৩]

২২. আপনি বলুন, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের (খোদা) মনে কর, তাদের ডাক[২]। তারা তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নয় এবং এ দুয়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই আর তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।'

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾

তাদের সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।' –আ'রাফ, আয়াত ১৭) –(ইবলীসের এই ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হল এবং) অধিকাংশ আদম-সন্তান এরূপই সাব্যস্ত হল।

১. অর্থাৎ শয়তানের এ ক্ষমতা নেই যে, সে জবরদস্তি করে, বল প্রয়োগে তাদের সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে দেবে। তবে হাঁ, সে প্ররোচিত করে, ফুসলিয়ে থাকে। আর এতটুকু সামর্থ্যও তাকে দেওয়া হয়েছে বান্দাদের যাচাই ও পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে, কে আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করত আল্লাহকে স্মরণ রাখে এবং কে দুনিয়ার জালে ফেঁসে পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যায় এবং নির্বোধের মত আখেরাতের বিষয়ে সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়।

দুনিয়ায় মানুষের জন্য ভাল-মন্দ উভয় দিকে যাওয়ার পথ প্রশস্ত রাখাই আল্লাহ তাআলার হেকমতের দাবি। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কয়েক স্থানে সবিস্তার আলোচনা হয়েছে। এমন নয় যে, শয়তান- (نعوذ بالله) আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কাউকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। উত্তমরূপে বুঝে নাও– (ربك على كل شيء حفيظ) প্রত্যেক বিষয় আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে রয়েছে এবং সকল হাল-অবস্থার পূর্ণ তত্ত্বাবধান তিনিই করে থাকেন। এই দুনিয়ায় যাকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন, তা অক্ষমতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে নয়, বরং উল্লিখিত হেকমত ও কল্যাণ বিবেচনায়ই তা দিয়েছেন।

২. মক্কার যে মুশরিকদের সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 'সাবা'বাসীদের ঘটনা শোনানো হল, এখান থেকে তাদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা খোদা বলে ধারণা কর, কোনো সংকট-মুহূর্তে তাদের ডেকে দেখ তো, তারা কী কাজে আসে?

২৩. এবং তাঁর নিকট সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না, তবে শুধু তার জন্য, যার জন্য তিনি অনুমতি দেবেন[১]। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভীতি দূর হয়, তখন তারা (পরস্পরকে) জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের রব কী বলেছেন?' অপর দল বলে, 'তা-ই যা সঠিক। আর তিনি সমুচ্চ, মহান[২]।

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۲۳﴾

১. অর্থাৎ ওই বেচারারা কী কাজে আসবে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাদের অণু পরিমাণও নিজস্ব ক্ষমতা নেই (বরং মূর্তিগুলোর তো অন্যের থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাও নেই), আকাশ ও পৃথিবীতে যাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং আল্লাহর কোন কাজে যাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই যে, তাঁর সাহায্য করে কিছুটা কৃতজ্ঞভাজন হবে। তাঁর মহান দরবারের অবস্থা তো এই যে, সেখানে বড় বড় নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরও এই শক্তি নেই যে, তাঁর অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া কারো জন্য এক অক্ষর সুপারিশ করবে। আল্লাহ তাআলার নবী, ওলী ও ফেরেশতাদের সুপারিশও একমাত্র তাদেরই জন্য উপকারে আসবে, যাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে।

২. এতে ফেরেশতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যাঁরা সর্বদা আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে সমুপস্থিত থাকেন। (এক হাদীস [মুসলিম, ২২২৯] অনুসারে) উপর থেকে যখন আল্লাহ তাআলার হুকুম অবতরণ করে, তখন স্বচ্ছ মসৃণ পাথরের উপর দিয়ে শিকল টানার মত শব্দ হতে থাকে। (সম্ভবত ঘনিষ্ঠতা ও বিস্তৃতিকে বোধগম্যতার নিকটবর্তী করার উদ্দেশ্যে এ উপমা প্রদান করা হয়েছে।) তখন ফেরেশতারা ভয় ও আতঙ্কে প্রকম্পিত হয়ে তাসবীহ পাঠ করতে করতে সেজদায় পতিত হন। অতঃপর এ অবস্থার অবসান হয়ে যখন তাঁদের মন শান্ত হয় এবং ততক্ষণে আল্লাহ তাআলার কালামও অবতরণ হয়ে সারে, তখন ফেরেশতাদের একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ কী হুকুম দিলেন? তদুত্তরে প্রত্যেক উপরস্থ ফেরেশতারা তাদের নিম্নস্থ ফেরেশতাদের বলেন, সেই হুকুমই হয়েছে যা আল্লাহ তাআলার হেকমতের অনুকূল এবং পূর্ব থেকে যার নিয়মনীতি জানা। বলা বাহুল্য, ন্যায্য ও সংগত হুকুম ছাড়া আর কী সেই দরবার হতে আসতে পারে?

সুতরাং যাঁর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অবস্থা এই যে, তিনি কোন নির্দেশ দিলে নৈকট্যধারীরাই ভয়-ভীতিতে এ রকম হয়ে যান, তাঁর দরবারে নিজ থেকে সুপারিশের জন্য দাঁড়ানোর সাহস কার হতে পারে?

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের আরো অনেক তাফসীর করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার লেখেন, এ সবই বুখারী শরীফে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সহীহ হাদীস এবং এটির সমর্থনসূচক অন্যান্য হাদীছের খেলাফ ('ফতহুল বারী' খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮১)।

২৪. আপনি জিজ্ঞাসা করুন, 'কে তোমাদের আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেন?' আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ'[১]। আর আমরা বা তোমরা হয় হেদায়াতের উপর আছি কিংবা আছি স্পষ্ট গোমরাহীতে[২]।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾

২৫. আপনি বলুন, 'তোমাদেরকে আমাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন করা হবে না।'

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬. আপনি বলুন, 'আমাদের রব আমাদের সকলকে সমবেত করবেন, তারপর আমাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই চূড়ান্ত ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ[৩]।'

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾

---

১. অর্থাৎ আসমান ও যমীন থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করা যে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাধীন, তা মুশরিকরাও স্বীকার করে থাকে। সুতরাং আপনি বলে দিন, যেহেতু তোমাদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত, তখন তোমরাই বল, আল্লাহর প্রভুত্বে অন্য কেউ অংশীদার কী করে হয়?

২. অর্থাৎ উভয় দল তো সত্যবাদী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই একটি হেদায়াতপ্রাপ্ত, আর অপরটি গোমরাহ। অতএব চিন্তা-ভাবনা করে সত্য ও হেদায়াতের পথ গ্রহণ করা উচিত।

কিছু লোক যে বলে, মিয়া সাহেব! উভয় দল পূর্ব থেকে আছে, থাকতে দাও, ঝগড়া করে কী লাভ? এখানে তাদের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, একদল অবশ্যই পাপী ও ভ্রান্ত, (সুতরাং উভয় দলকে থাকতে দেওয়ার অর্থ ভ্রান্ত দলকেও মেনে নেওয়া। এ কী করে সম্ভব?)– তবে কোন্ দল ভ্রান্ত, তা এখানে সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এটা মূলত বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কের একটি হিকমতপূর্ণ সুন্দর ঢং। যেন বলা হচ্ছে যে– তোমরাই বুঝে নাও। কারা ভ্রান্ত তা আমরা নিজেরা বলছি না। তবে একদল তো নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত। এখন উপরে বর্ণিত দলীল-প্রমাণ দৃষ্টে তোমরা নিজেরাই ফয়সালা করে নাও যে, কে ভ্রান্ত। এভাবে বিপক্ষের সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা বলে তাদের নিজেদের চিন্তা করার সুযোগ দান করা হল।

৩. অর্থাৎ প্রত্যেককে নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করা উচিত, কেউই অন্যের ভুল-ত্রুটির জবাবদিহি করবে না। এত সুস্পষ্ট বিষয় শোনার পরও যদি তোমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করতে প্রস্তুত না হও, তবে স্মরণ রেখো, আমি সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি,

২৭. আপনি বলুন, 'তোমরা আমাকে তাদের দেখাও তো, যাদের আল্লাহর সঙ্গে শরীকরূপে যুক্ত করে নিয়েছ[১]। কক্ষনো (তারা শরীক) নয়, বরং তিনিই আল্লাহ- যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।'

قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২৮. আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[৩]।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২৯. আর ওরা বলে, 'এই প্রতিশ্রুতি কবে (পূর্ণ) হবে? (বল), যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৪]।'

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

সুতরাং তোমাদের অভিযোগের অবকাশ নেই। এখন তোমরা নিজেরা নিজ আমলের জবাবদিহি করবে, আমার উপর তার দায়িত্ব আরোপিত হবে না। মোটকথা, খোদার দরবারে হাযির হওয়ার জন্য প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ চিন্তা করে রাখে। তিনি সকলকে একত্র করত সঠিক ও ন্যায় বিচার করবেন।

১. অর্থাৎ একটু সামনে আন তো, দেখি- কোন্ সে সত্তা, যে আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার? আমরাও দেখি- তার কী কী ক্ষমতা আছে?!! তা, তোমরা কি এসব পাথরের নিষ্প্রাণ ও হাতে গড়া মূর্তিগুলোকে পেশ করবে?

২. অর্থাৎ এরূপ সত্তা তোমরা কস্মিনকালেও পেশ করতে পারবে না। তিনি তো একমাত্র আল্লাহ, যিনি পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমতাবান এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের হেকমত ও প্রজ্ঞার অধিকারী। আর সকলে তাঁর অধীন ও অনুগত।

৩. তাওহীদের সঙ্গে এখানে রেসালাত বা নবুওয়াতের কথা বলা হল। অর্থাৎ, আপনার দায়িত্ব ও আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে- শুধু আরবদের নয়, বরং সমগ্র জগতের মানুষকে তাদের ভাল ও মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা। তো, আপনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপরও যারা উপলব্ধি করে না, তারা যা মনে চায় করুক। বুদ্ধিমানেরা তো নিজেদের ভালমন্দ চিন্তা করে আপনার কথা অবশ্যই মানবে। হাঁ, দুনিয়ায় জাহেল ও নির্বোধদেরই আধিক্য, কল্যাণকর কথাবার্তা মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ওদের কী করে থাকবে?

৪. অর্থাৎ আপনি যে মুহূর্ত (কিয়ামত) সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করছেন, তা কবে আসবে? আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে তা সত্বর এনে দেখিয়ে দিন।

قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আপনি বলুন, 'তোমাদের জন্য এমন এক দিনের ওয়াদা রয়েছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবে না, আগেও যেতে পারবে না[১]।'

[রুকূ - ৪]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ اِلْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. কাফেররা বলে, 'আমরা এই কুরআনের প্রতি কিছুতেই ঈমান আনব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতিও না[২]'। হায়! আপনি যদি (সেই দৃশ্য) দেখতেন, যখন জালেমদের স্বীয় রবের সামনে দাঁড় করানো হবে, (আর) ওরা একে অপরের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকবে[৩]। যাদের দুর্বল ভাবা হত তারা অহংকারীদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হতাম[৪]।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ

৩২. অহংকারীরা যাদের দুর্বল ভাবা হত তাদের বলবে, 'তোমাদের নিকট হেদায়েত পৌঁছার পর আমরা কি তোমাদের তা থেকে বাধা দিয়ে

---

১. অর্থাৎ অস্থির হয়ো না। যে দিনের ওয়াদা করা হয়েছে, তা অবশ্যই আসবে। যখন আসবে, তখন এক মিনিটেরও অবকাশ পাবে না। তাই তাড়াহুড়া না করে বরং সেই সময়টি আসার পূর্বে নিজেদের মুক্তির জন্য কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করা বেশি প্রয়োজন।

২. অর্থাৎ আমরা কুরআনও মানব না, পূর্ববর্তী কিতাবগুলিও মানব না– যেগুলিকে তোমরা আসমানী কিতাব বলে থাক, যথা: তাওরাত, ইনজীল প্রভৃতি। এসব একই গুদামের পচা মাল, যাতে ওই হিসাব-কিতাব ও কিয়ামতের বিষয় ছাড়া আর কিছু নেই। সুতরাং এসব কিছু আমরা কিছুতেই মানার নই।

৩. অর্থাৎ কোন ব্যর্থতার ক্ষেত্রে যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা একে অন্যের উপর ব্যর্থতার দায় চাপাতে থাকে, তেমনি হাশরের মাঠেও কাফেররা একে অন্যকে অভিযুক্ত করবে। একের দোষ অন্যের উপর চাপাতে চাইবে। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

৪. দুনিয়ায় যারা নিম্নস্তরের পরিগণিত হত এবং অন্যদের কথা মত চলত, তারা নিজেদের মাতব্বর প্রধানদের অভিযুক্ত করে বলবে, তোমরাই আমাদের এই বিপদে ফাঁসিয়েছ, তোমরা বাধা না দিলে আমরা অবশ্যই পয়গম্বরদের কথা মেনে নিতাম এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এই কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হত না।

جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

রেখেছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী[১]।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ
اَنْدَادًا ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا
الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. যাদের দুর্বল ভাবা হত তারা অহংকারীদের বলবে, 'না, বরং (তোমাদের) রাত-দিনের চক্রান্ত (আমাদের বাধা দিয়ে রেখেছিল)– যখন তোমরা আমাদের নির্দেশ দিতে, আমরা যেন আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর জন্য বিবিধ অংশীদার সাব্যস্ত করি[২]।' আর ওরা অনুতাপ গোপন করবে যখন আযাব দেখতে পাবে[৩]। এবং আমি কাফেরদের গলায় বেড়ি পরাব[৪]। ওদেরকে ওরা যা-কিছু করত তারই প্রতিফল দেওয়া হবে[৫]।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ
اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ

৩৪. আমি যে জনপদেই সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তার বিত্তশালীরা বলেছে, 'তোমাদের যে বার্তা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা

---

১. অর্থাৎ যখন তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা তোমাদের বুঝেও এসেছিল, তখন কেন কবুল করলে না? আমরা কি জোরপূর্বক তোমাদের অন্তরকে ঈমান ও বিশ্বাস থেকে বাধা প্রদান করেছিলাম? তোমাদের উচিত ছিল, কারো পরোয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নেওয়া। এখন নিজ অপরাধ অন্যদের ঘাড়ে চাপাচ্ছ কেন?

২. অর্থাৎ এটা ঠিক যে, তোমরা বলপ্রয়োগে বাধ্য করনি। কিন্তু রাতদিন তোমরা ধোঁকা, প্রতারণা ও বিভ্রান্তিকর কৌশলে আমাদের প্ররোচিত করতে এবং ফুসলাতে থাকতে। তোমাদের সাথে দেখা হলেই তোমরা বলতে, পয়গম্বরদের কথা মত আমরা যেন আল্লাহকে এক না মানি, বরং বিবিধ সৃষ্টিকেও তাঁর সমকক্ষ ও সমান জ্ঞান করি। তা, তোমাদের দিনরাতের অনবরত ফুসলানি ও ভীতি প্রদর্শন কি আর কার্যকর না হয়ে থাকতে পারত? (এ সবের ফলেই আমরা সত্যকে কবুল করা থেকে বিরত থেকেছি।)

৩. অর্থাৎ যখন ভয়ঙ্কর আযাব সামনে আসবে, তখন অনুসারী ও মাতব্বর-প্রধান উভয় দলই মনে মনে আফসোস করবে। প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, সত্যিই আমি অপরাধী ও পাপী ছিলাম, কিন্তু লজ্জায় একে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করবে না। আর প্রচণ্ড অস্থিরতা ও ভয়-বিহ্বলতায় সম্ভবত বলার শক্তিও থাকবে না।

৪. গলায় বেড়ি এবং হাত-পায়ে শিকল পরানো হবে।

৫. অর্থাৎ যেসব আমল করেছিল, আজ সেসবই শাস্তির আকারে প্রকাশ পাচ্ছে– যেমন কর্ম তেমন ফল।

بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

অস্বীকার করি[১]।'

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. ওরা এও বলেছে, 'আমরা ধনসম্পদে ও সন্তানসন্ততিতে অধিক এবং আমাদের উপর আদৌ আযাব আসবে না[২]।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আপনি বলুন, 'আমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[৩]।'

[রুকূ - ৫]

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ

৩৭. তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি এমন কিছু নয়, যা তোমাদের আমার নিকটবর্তী করে দেবে। বরং যারা ঈমান আনবে ও

---

১. এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, মক্কার কাফের-প্রধানদের সত্যবিমুখতা ও অবাধ্যতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। প্রত্যেক যুগে এরূপ হতভাগ্য সর্দারেরাই পয়গম্বরদের বিরোধিতা করেছে। ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের নেশা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। ফলে সে কারো সামনে মাথা নত করা এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে একাসনে বসা সহ্য করতে পারে না। এ জন্যই নবীদের প্রথম অনুসারী সাধারণত দুর্বল ও গরীব লোকেরা হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ বোঝা গেল যে, আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি ও সন্তুষ্ট আছেন। নতুবা আমাদের এত ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি কেন দেবেন? যেহেতু তিনি খুশি আছেন, সুতরাং কোন বিপদের আশঙ্কা আমাদের নেই। তোমরা অযথা আমাদের আযাবের ধমকি-হুমকি দিচ্ছ।

৩. অর্থাৎ নিছক জীবিকার প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রমাণ নয়। দুনিয়ায় কত বদমাশ, দুরাত্মা, জড়বাদী নাস্তিককে সুখী দেখতে পাওয়া যায়। অথচ কোনো ধর্মের লোকই এদের ভাল বলে না। পক্ষান্তরে বহু আল্লাহভক্ত, পরহেজগার ও নেক বান্দাকে দারিদ্র্য, উপবাসের কষ্ট ভুগতে দেখা যায়। অতএব বোঝা গেল, ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতা আল্লাহ তাআলার নিকট কারো প্রিয় ও মকবূল হওয়ার প্রমাণ নয়। এসব বিষয় তো অন্যান্য বিবেচনা ও হেকমতের উপর নির্ভরশীল, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। কিন্তু বহু লোক এ নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে না। কবি বলেন-

ومن الدليل على القضاء وحكمه ÷ بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

(আল্লাহর অটল ফয়সালা ও তাকদীরের প্রমাণ হচ্ছে, বুদ্ধিমান লোকের অসচ্ছল জীবন এবং নির্বোধ লোকের সচ্ছল জীবন।)

وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۝

সৎকাজ করবে[১], তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান তাদের কর্মের বিনিময়ে[২] এবং তারা (জান্নাতের) বালাখানাগুলিতে নিরাপদে থাকবে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ أُولَٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

৩৮. আর যারা আমার আয়াতগুলিকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে দৌড়-ঝাঁপ করে, ওরা আযাবে ধৃত হবে[৩]।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

৩৯. আপনি বলুন, 'আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দান করেন। আর তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা[৪]।'

---

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির আধিক্য আল্লাহ তাআলার নৈকট্যধারী হওয়ার আলামত নয় (যেমন পূর্বের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে) এবং তা নৈকট্য লাভের কারণও নয়। বরং কাফেরদের ক্ষেত্রে এসব উল্টা (আল্লাহ থেকে) দূরত্বের কারণ হয়ে থাকে। হাঁ, মুমিন যদি তার ধন-সম্পদকে সৎকাজে ব্যয় করে এবং সন্তানাদিকে উত্তম তালীম ও তরবিয়ত দান করত নেক ও ভদ্র করে গড়ে তোলে, তবে এমন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহ তাআলার এক পর্যায়ের নৈকট্য লাভের কারণ হতে পারে।

যা হোক, আল্লাহ তাআলার দরবারে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না। প্রশ্ন করা হবে শুধু ঈমান ও সৎকর্ম সম্বন্ধে।

২. অর্থাৎ নেক আমলের অনুপাতে যতটা প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশি প্রতিদান লাভ করবে– কমপক্ষে দশগুণ, ঊর্ধ্বে সাত শত গুণ। বরং আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি, যার কোন সীমা নেই। ইরশাদ হয়েছে– والله يضاعف لمن يشاء (বাকারা, আয়াত ২৬১)। উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে ضعف দ্বারা ব্যাপক অর্থে আধিক্য উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ যে হতভাগারা আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ অগ্রাহ্য করে এবং সেগুলির সমালোচনা করত লোকদের তা থেকে বিরত রাখে এবং এভাবে যেন আল্লাহ ও রাসূলকে হারিয়ে দিতে চায়, তাদের সকলকে গ্রেফতার করে উপস্থিত করা হবে– একজনও পালাতে পারবে না।

৪. এখানে মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, তোমরা ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার সময় অভাব ও দারিদ্র্যের ভয় করো না। ব্যয় করায় রিযিক কমে যায় না –যা তাকদীরে আছে, তা আসবেই আসবে। আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমতে যাকে যতটা দিতে চান, তোমাদের ব্যয় করা না

৪০. (স্মরণ কর), যেদিন তিনি ওদের সকলকে সমবেত করবেন, তারপর ফেরেশতাদের বলবেন, 'এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করত[১]?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝

৪১. ফেরেশতারা বলবে, 'আপনি পবিত্র, আপনার সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক, ওদের সাথে নয়। ওরা বরং জিনদের উপাসনা করত। ওদের অধিকাংশ এদেরই প্রতি বিশ্বাসী ছিল[২]।'

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝

করায় তাতে পার্থক্য হয় না। বরং সৎকাজে ব্যয় করলে বরকত হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাকে বিনিময় দান করেন -তা ধনের আকারে হোক, অথবা অন্তরের তৃপ্তি-পরিতৃপ্তির আকারে। আর আখেরাতে তার প্রতিদান পাওয়া তো সুনিশ্চিত।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার খাজানায় কোন কিছুর অভাব নেই। মুমিনদের উচিত, আল্লাহ তাআলার প্রতি মহৎ ও উচ্চ ধারণা রাখা এবং তাঁর মর্যির সামনে অভাব-অনটনের আশঙ্কা না করা : হাদীসে আছে- ولا تخش من ذي العرش إقلالا ('আরশের মালিক আল্লাহ তাআলা কম দেবেন এমন আশঙ্কা করো না।') [মুজামে কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০২০]

বি. দ্র. বর্তমান আয়াতে যেন ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে- দুনিয়ায় সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার দিক দিয়ে মানুষের অবস্থার মধ্যে যেমন তারতম্য রয়েছে, তদ্রূপ আখেরাতেও ছওয়াব ও আযাবের স্তরসমূহে পার্থক্য থাকবে।

১. বহু মুশরিক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত। অনেকে তাঁদের আকৃতি (মূর্তি) বানিয়ে পূজা করত, বরং কেউ কেউ লিখেছেন, ফেরেশতাপূজা থেকেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে। আমর ইবনে লুহাই এই ঘৃণ্য বিষয় শাম থেকে আরবে আমদানি করেছিল।

যা হোক, কিয়ামতের দিন কাফেরদের শুনিয়ে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, এরা কি তোমাদের পূজা করত? -সম্ভবত প্রশ্ন দ্বারা এ কথা বলাই উদ্দেশ্য, তোমরা তো এদের এমন কথা বলনি, এবং তোমরা এদের এই কাজে খুশি হওনি। যেমন: হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে প্রশ্ন করা হবে- أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ (তুমি কি লোকদের বলেছিলে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মাবূদ সাব্যস্ত করে নাও?' -মায়েদা, আয়াত ১১৬) এবং সূরা ফুরকানে ২য় রুকূতে (আয়াত ১৭) আছে- أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (তোমরা কি আমার এই বান্দাদের গোমরাহ করেছিলে?) -এই সব জায়গায় প্রশ্নের উদ্দেশ্য এ কথা প্রকাশ করাই যে, তোমরা তো এরূপ বলনি এবং তোমরা কাফেরদের এ কাজে রাযি হতে পার না।

২. অর্থাৎ, কেউ কোন দিক দিয়ে আপনার অংশীদার হবে- এ থেকে আপনার মহান সত্তা পবিত্র। আমরা এদের এমন কথা বলব অথবা এহেন জঘন্য কাজে আমরা সন্তুষ্ট হব- এর প্রশ্নই আসে না, আমাদের সন্তুষ্টি তো আপনার সন্তুষ্টির অধীন। এ পাপীদের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? আমরা তো আপনারই আজ্ঞাবহ দাস।

৪২. অতএব আজ তোমরা একে অন্যের উপকার বা ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখ না[১]। আর আমি অপরাধীদের বলব, 'সেই আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

৪৩. যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন ওরা বলে, 'এ ব্যক্তি আর কিছু নয় কেবল এটা চায় যে, তোমাদের সেসব (উপাস্য) থেকে নিবৃত্ত করবে, যাদের উপাসনা করত তোমাদের বাপ-দাদারা'[২]। এবং ওরা বলে, 'এ (কুরআন) মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়[৩]।' আর কাফেররা সত্য সম্পর্কে– যখন তা ওদের নিকট পৌছল– বলেছে, 'এ সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়[৪]।'

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

আসলে এ হতভাগারা আমাদের পূজা করত না; বরং আমাদের নাম করে শয়তানদের পূজা করত। প্রকৃতপ্রস্তাবে ওদেরই প্রতি এদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। শয়তানরা এদের যে দিকে নিয়ে যেত, সে দিকেই ছুটে চলত– চাই ফেরেশতাদের নাম করে, অথবা কোন নবী ও ওলীর নাম করে। –বরং কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবেও শয়তানকেই পূজা করে। ইতিপূর্বে অন্য কোথাও, সম্ভবত সূরা আনআমে (আয়াত ১২৮) আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১. অর্থাৎ আজ পূজারী ও পূজ্য (উপাস্য)– উভয়েরই অক্ষমতা নির্মমভাবে প্রকাশ পেয়েছে, আজ কেউ কারো বিন্দুমাত্র উপকার বা অপকার করতে পারবে না। মুশরিকরা যে উপাস্যদের (অর্থাৎ ফেরেশতাদের) বড় সাহায্যকারী মনে করত, আজ দুঃসময়ে তারা চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল।

২. এ কথাটা ওরা পরস্পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত। অর্থাৎ এ ব্যক্তি নবী-রাসূল কিছুই নন। তার আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাপ-দাদার তরীকা ছাড়িয়ে (যাকে আমরা পূর্বকাল থেকে সত্য বলে জেনে এসেছি) আমাদেরকে তার নিজের পথে নিয়ে আসা এবং নিজে নেতা ও প্রধান বনে যাওয়া। মোটকথা, শুধু রাজত্ব ও নেতৃত্ব হাসিল করাই তার উদ্দেশ্য (আল্লাহর পানাহ!)।

৩. অর্থাৎ কুরআন আর কী? এ তো কিছু মিথ্যা কথা, যা খোদার নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (আল্লাহর পানাহ!)

৪. অর্থাৎ এই যে তথাকথিত নবুওয়াত, যার জন্য কিছু অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা দেখানো হয়েছে; অথবা এই যে ইসলাম ধর্ম, যার কারণে স্বামী-স্ত্রী ও পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটছে;

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿۴۴﴾

৪৪. আমি ওদের (ইতিপূর্বে) কিতাবাদি দেইনি, যা ওরা পাঠ করে এবং ওদের কাছে আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি[১]।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿۴۵﴾

৪৫. এদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল। আর আমি পূর্ববর্তীদের যা দিয়েছিলাম, তার দশমাংশও এরা পায়নি। তো, ওরা আমার রাসূলদের অস্বীকার করেছিল। অতএব (দেখ), কেমন ছিল আমার পাকড়াও[২]!

[রুকূ - ৬]

قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۫ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ

৪৬. আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের একটিমাত্র উপদেশ দিচ্ছি- (তা এই) যে, তোমরা দু-দুজন ও এক একজন করে আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়াও, তারপর চিন্তা করে দেখ যে, তোমাদের এই সঙ্গী মোটেই উন্মাদ নয়। সে তো এক কঠোর শাস্তির পূর্বে তোমাদের জন্য একজন

কিংবা এই যে কুরআন, লোকদের অন্তরে যার অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে– এসব সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। (আল্লাহর পানাহ!)

১. অর্থাৎ এরা একেবারে নিরক্ষর ছিল, কোনও আসমানী কিতাব এদের হাতে ছিল না এবং এই দীর্ঘকাল যাবৎ কোন নবীও এদের মাঝে আসেননি। এ অবস্থায় আজ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক মহান পয়গম্বর ও মহামূল্যবান কিতাব দান করেছেন। সুতরাং একে সৌভাগ্য মনে করে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের কদর করা উচিত। বিশেষত যখন ইতিপূর্বে এরা নিজেরা বলেও থাকত– আমাদের মধ্যে যদি কোন পয়গম্বর আসতেন অথবা আমাদের প্রতি যদি কোন কিতাব অবতীর্ণ করা হত, তবে আমরা অন্যদের চেয়ে অধিক আজ্ঞাবহ হতাম। এখন তো তাদের চরম কাঙ্ক্ষিত জিনিস এসেছে, অথচ তারা তা অমান্য ও অস্বীকার করতে শুরু করেছে।

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, আমি (আল্লাহ) ওদের নিকট এমন কোনো কিতাব বা নবী প্রেরণ করিনি, যার শিক্ষা ও আদর্শ আপনার আনীত দীনের বিপরীত। সুতরাং কোন্ যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ বা দীনী দলিলের কারণে এরা আপনার বিরোধিতা করছে?

২. অর্থাৎ যেরূপ দীর্ঘায়ু, শারীরিক শক্তি, ধন-ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, তোমরা তার দশভাগের এক ভাগও পাওনি। কিন্তু ওরা যখন পয়গম্বরদের অস্বীকার ও বিরোধিতা করল, তখন কী পরিণাম হল দেখে নাও– সমস্ত উপায়-উপকরণ ব্যর্থ হয়েছে, এক মিনিটের জন্যও আল্লাহ তাআলার আযাবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। সুতরাং তোমরা কোন্ সাহসে এত অবাধ্যতা করছ?

عَذَابٍ شَدِيْدٍ۝

সতর্ককারী মাত্র[১]।'

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ۝

৪৭. আপনি বলুন, 'আমি যদি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় কামনা করি, তবে তা তোমাদেরই থাকুক! আমার বিনিময় তো আল্লাহরই যিম্মায়[২]। আর তিনি সকল কিছু প্রত্যক্ষকারী[৩]।'

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۝

৪৮. আপনি বলুন, 'আমার রব সত্য অবতীর্ণ করে চলেছেন। (তিনি) সকল গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত[৪]'।

---

১. অর্থাৎ একগুঁয়েমি ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ইখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলার নামে উঠে দাঁড়াও এবং কয়েকজন মিলে সম্মিলিতভাবে আলোচনা ও পরামর্শ করে নাও আর নির্জনেও পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা করে দেখ। তোমাদের এই সঙ্গী লোকটি (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিনি চল্লিশ বছরের বেশি তোমাদের চোখের সামনে কাটিয়েছেন, যাঁর শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত খুঁটিনাটি সকল অবস্থা তোমরা পর্যবেক্ষণ করেছ, যাঁর সাধুতা, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসায় তোমরা সর্বদা মুখর রয়েছ, কখনো কোন বিষয়ে অসাধুতা বা স্বার্থপরতার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করনি– এমন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি এমন ধারণা করতে পার যে, হঠাৎ করে অযথাই সকলকে শত্রু বানিয়ে নেওয়ার মত পাগলামি তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে? উন্মাদ ব্যক্তিরা কি কখনো এমন হেকমতের কথা বলতে পারে? অথবা তিনি স্বজাতির প্রতি যে রকম হিতাকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন করেছেন এবং তাদের পরকালীন কামিয়াবী ও পার্থিব উন্নতির যেরূপ বিরাট পরিকল্পনা পেশ করেছেন, এসব কি একজন পাগল করতে পারে? তিনি তোমাদেরকে কঠিন ধ্বংসাত্মক বিপদ ও সর্বনাশা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করছেন, বিগত জাতিসমূহের ইতিহাস শোনাচ্ছেন, সাক্ষ্য-প্রমাণাদির দ্বারা তোমাদের ভাল-মন্দ বোঝাচ্ছেন। এসব কাজ উন্মাদদের নয়, বরং মহান পয়গম্বরদেরই হয়ে থাকে, যদিও দুরাত্মারা সকল যুগেই তাঁদের উন্মাদ বলে এসেছে।

২. অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট আমার পরিশ্রমের কোন প্রতিদান চাই না। তোমাদের ধারণায় আমি যদি কোন বিনিময় কামনা করে থাকি, তবে তা তোমরা নিজেদের কাছেই রাখ, আমার প্রয়োজন নেই। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর নিকট রয়েছে। তোমাদের কাছে যে জিনিসটি চাই– অর্থাৎ ঈমান ও ইসলাম, তা শুধু তোমাদেরই মঙ্গলার্থে চাই। এর চেয়ে বেশি আমার কোন উদ্দেশ্য নেই।

৩. অতএব আমার সততা ও নিয়তও আল্লাহ তাআলার নজরে রয়েছে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে ওহী অবতরণ করছে এবং দীন-শরীয়তের বৃষ্টি হচ্ছে। এ সুযোগকে হাত ছাড়া করো না, এর দ্বারা উপকৃত হও। আল্লাহ তাআলা যে রকম জোরেশোরে সত্যকে বাতিলের মাথায় নিক্ষেপ করছেন, তাতে বুঝে নাও যে, বাতিল কোথাও টিকতে পারবে না, তা অবশ্যই অপসারিত হয়ে যাবে এবং দিকে দিকে সত্য দীনের বিজয়-কেতন উড়তে থাকবে। 'আল্লামুল গুয়ূব' আল্লাহ তাআলা দেখে-শুনেই বাতিলের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে

৪৯. আপনি বলুন, 'সত্য এসে গেছে। আর বাতিল না পারে (কোন কিছুর) সূচনা করতে, আর না পারে (তার) পুনরাবৃত্তি ঘটাতে[১]।'

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ۝٤٩

৫০. আপনি বলুন, 'আমি যদি বিভ্রান্ত হই, তবে নিজেরই ক্ষতির জন্য বিভ্রান্ত হব। আর যদি সৎপথে থেকে থাকি, তবে তা আমার প্রতি আমার রব যে ওহী প্রেরণ করেন তারই বদৌলতে। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী[২]।'

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ۝٥٠

৫১. হায়! আপনি যদি (সেই দৃশ্য) দেখতেন, যখন ওরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। আর ওরা (আমার আয়ত্তের) বাইরে যেতে পারবে না, বরং ওদেরকে নিকটবর্তী স্থান থেকে পাকড়াও করা হবে[৩]।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝٥١

দেওয়ার জন্য যথাসময়ে সত্যকে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ (বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, ফলে তা মিথ্যার মাথা চূর্ণ করে ফেলে। আর তৎক্ষণাৎ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। -আম্বিয়া, আয়াত ১৮)

১. অর্থাৎ সত্য দীন এসে গেছে, এখন আর তাকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন শক্তি কারো নেই। তা সকলেরই উপর বিজয়ী হবে এবং বাতিলকে পরাভূত করে ছাড়বে। সত্যের সামনে টিকতে পারে- এমন শক্তি বাতিলের কোথায়? বাতিল এখন সম্পূর্ণ নিরুপায়-অসহায়। তার দিন শেষ!

মক্কা বিজয়ের দিন এ আয়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৪৭৮)

২. অর্থাৎ আমি যদি প্রতারণা করে থাকি এবং এই দীন নিজে রচনা করে থাকি, তবে তা টিকবে কয় দিন?! এতে তো শেষ পর্যন্ত আমারই ক্ষতি। কারণ, এর পরিণতি দুনিয়ার শত্রুতা ক্রয় করে নেওয়া, লজ্জিত ও অপমানিত হওয়া এবং আখেরাতের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আমি যদি সত্য পথে থেকে থাকি, আর বাস্তবে বিষয়টি এমনই- তবে মনে রেখো, এ সবকিছু আল্লাহ তাআলার সাহায্য-সহায়তা এবং তাঁর ওহীর বরকত ও হেদায়াতেই হচ্ছে, যা কখনই আমার সঙ্গ বর্জন করবে না। আমার আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং তিনি অতি নিকটে আছেন- তিনি সর্বদা আমাকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর পয়গামকে বিশ্বের বুকে সমুজ্জ্বল করবেন, তোমরা মান আর না-ই মান।

৩. অর্থাৎ কাফেররা দুনিয়াতে আস্ফালন করছে। কিন্তু সেই দৃশ্যটি দেখার মত হবে, যখন ওরা হাশরের মাঠের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভীত-বিহ্বল হবে এবং কোথাও পালাতে পারবে না, বরং অতি সহজে ধৃত হবে।

৫২. আর ওরা বলবে, 'আমরা তাঁর (অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.-এর) প্রতি ঈমান আনলাম।' কিন্তু ওরা তখন এত দূর থেকে (ঈমানের) নাগাল কীভাবে পাবে[১]?

وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۚ۝

৫৩. অথচ ইতিপূর্বে ওরা তাঁকে অস্বীকার করেছিল এবং দূরবর্তী স্থান থেকে স্রেফ অনুমানের (ঢিল) ছুড়তে থেকেছে[২]।

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۝

৫৪. আর ওদের ও ওরা যা বাসনা করে তার মধ্যে প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে[৩], যেমন ওদের পূর্ববর্তী সমপন্থীদের সাথে করা হয়েছে। নিশ্চয় ওরাও অস্বস্তিতে (বা : দ্বিধা-দ্বন্দ্বে) ফেলে রাখে এমন সংশয়ের মধ্যে ছিল[৪]।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝

---

১. অর্থাৎ তখন বলবে, পয়গম্বরের কথায় আমাদের বিশ্বাস এসে গেছে। এখন আমরা ঈমান আনছি। অথচ এখন ঈমান আনার কী অর্থ? ঈমান এনে আত্মরক্ষার সুযোগ তো চলে গেছে। এখন সেই সুযোগ এতই দূরবর্তী যে, তা ওদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। সেখান থেকে আর ঈমানকে তুলে আনতে পারবে না।

মোটকথা, সেই ঈমানই গ্রহণীয় ও মুক্তিদানকারী, যা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে অর্জিত হয়। আখেরাতে তো চর্মচোখে দেখে সকলেরই বিশ্বাস হবে। তাতে কৃতিত্ব কোথায়?

২. অর্থাৎ পূর্বে যখন ঈমান আনার সময় ছিল, তখন শুধু অস্বীকার করতে থেকেছে এবং অলক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করেছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে সর্বদা অসার, অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলতে থেকেছে। সত্য ও অকাট্য বিষয়াদি কবুল করেনি। এখন অনুতাপ করে কী লাভ?

৩. অথাৎ ওরা যার আকাঙ্ক্ষা রাখে– যথা, কবুল হওয়ার মত ঈমান বা নাজাতপ্রাপ্তি, অথবা দুনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন, কিংবা দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী ও আরাম-আয়েশ– এসব জিনিস এবং কাফেরদের মধ্যে কঠিন প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কখনো ওরা এসবের নাগাল পাবে না।

৪. অর্থাৎ পূর্বেও এ ধরনের লোক গত হয়েছে। ওদের সাথে যে রকম ব্যবহার করা হয়েছিল, এদের সাথেও তাই করা হল। কেননা, ওরাও অর্থহীন সন্দেহ ও অযৌক্তিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত ছিল, যা কোনক্রমেই ওদের স্বস্তি বোধ করতে দিত না।

সূরা ফাতির

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৩৫ । ৪৫ আয়াত । ৫ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٤٥، رُكُوعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা[১]। যিনি দু দুটি, তিন তিনটি ও চার চারটি ডানাবিশিষ্ট ফেরেশতাদের[২] বাণীবাহক বানিয়েছেন[৩]। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান[৪]।

---

১. অর্থাৎ তিনিই আকাশ ও পৃথিবীকে অস্তিত্বহীনতা থেকে বের করে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, অথচ পূর্ব থেকে সৃষ্টির কোন নমুনা বা নিয়ম বর্তমান ছিল না।

২. অর্থাৎ কোন কোন ফেরেশতার দুই ডানা, কারো কারো তিন, কারো কারো চারটি ডানা রয়েছে। এই ডানা যে কেমন তা আল্লাহ তাআলাই জানেন, আর যিনি দেখেছেন তিনি কিছুটা বলতে পারবেন।

৩. অর্থাৎ কতক ফেরেশতা (সবাই নয়) নবীদের নিকট আল্লাহ তাআলার পয়গাম আনয়ন করেন। অপর দিকে কিছু ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে অন্যান্য বাহ্যিক ও আত্মিক বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (নাযি'আত, আয়াত ৫)

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টির মধ্যে যে অঙ্গ ও যে গুণ ইচ্ছা, নিজ হেকমত অনুযায়ী পয়দা করে দেন। ফেরেশতাদের দুই-তিন-চার ডানা (পাখা) তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি কোন ফেরেশতার ডানা চার থেকে বেশিও বানাতে পারেন। যেমনঃ হাদীসে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ছয় শত ডানা (পাখা) রয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩২৩২)

আর جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا থেকে এ কথা বোঝার সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তাআলা এসব মাধ্যমেরও কিছুটা মুখাপেক্ষী। মোটেই না, তিনি নিজের সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাশালী। নিতান্ত হেকমতের কারণে তিনি এসব উপকরণ ও মাধ্যমের ধারা জারী করেছেন।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত অবারিত করেন, তা রোধ করার কেউ নেই[১]। আর যা আটকে রাখেন, তিনি ছাড়া তা প্রেরণ করার কেউ নেই। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[২]।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

৩. হে মানুষ! তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা আছে কি, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং (সত্য থেকে) বিমুখ হয়ে কোথায় যাচ্ছ*[৩]?

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৪. ওরা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর সব বিষয় আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[৪]।

---

১. বাহ্যিক রহমত হোক– যথা বৃষ্টি, জীবিকা ইত্যাদি; বা আধ্যাত্মিক রহমত– যথা কিতাবের অবতারণ ও পয়গম্বর প্রেরণ। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা যখন মানুষের প্রতি নিজ রহমতের দ্বার অবারিত করেন, তখন কেউ তা বন্ধ করে দিতে পারে না।

২. অর্থাৎ নিজ পরিপূর্ণ হেকমত অনুযায়ী তিনি যা করার ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ করে ফেলতে পারেন। তিনি এমন ক্ষমতাশালী যে, তাঁকে প্রতিহত করার সাধ্য কারো নেই।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা– 'কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?'**

৩. অর্থাৎ সৃষ্টি করা এবং জীবিকার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে তোমাদের জীবিত রাখা একমাত্র আল্লাহর মুঠি ও ক্ষমতায়– এ কথা তোমরাও স্বীকার কর। এ সত্ত্বেও অন্য কেউ উপাস্য বা মাবূদ হওয়ার যোগ্য হয় কী করে? বরং যিনি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, তিনিই তো মাবূদ হবেন।

৪. অর্থাৎ এত বোঝানোর পরও –আর বোঝানোও এমন যে, এর পর আর অভিযোগ বা ওযর-আপত্তির পথ থাকে না– যদি ওরা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। পূর্ববর্তী নবীদের সঙ্গেও এরূপ আচরণ করা হয়েছে। সুতরাং আপনার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কোনো নতুন ব্যাপার নয়। গোঁড়া ও একগুঁয়ে লোকেরা কখনো নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হয়নি। এমন লোকদের ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করুন। তাঁর দরবারে পৌঁছার পর সকল বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ۝

৫. হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে এবং সেই বড় প্রতারকও (শয়তান) যেন আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাদের প্রতারিত করতে না পারে।

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ۝

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন, অতএব তোমরাও ওকে দুশমন গণ্য কর। সে তো স্বীয় দলবলকে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বানই জানায়[১]।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ۝

৭. যারা কাফের হয়েছে, ওদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।

[রুকূ - ২]

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ

৮. আচ্ছা! ঐ ব্যক্তি, যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজগুলো শোভন করে তোলা হয়েছে, ফলে সে সেসবকে ভাল মনে করে– (সে কি তার মত হতে পারে, যে মন্দ কাজকে মন্দই জেনে তা থেকে বিরত থেকেছে)? বস্তুত, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। অতএব ওদের জন্য

---

১. অর্থাৎ কিয়ামত আসবেই আসবে এবং সকলকে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার মহা আদালতে হাযির হতেই হবে। অতএব দুনিয়ার চাকচিক্য, অস্থায়ী ভোগ-বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মত্ত হয়ে যেয়ো না এবং সেই চিরপরিচিত দাগাবাজ শয়তানের ধোঁকায় পড়ো না। সে তোমাদের কখনো ভাল পরামর্শ দেবে না। বরং সে নিজের সাথে তোমাদেরও দোযখে নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করবে, নানা রকম কথা বানিয়ে আল্লাহ ও আখেরাতের দিক থেকে তোমাদের গাফেল করতে থাকবে। তোমাদের কর্তব্য, শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করা এবং ওর কথা অমান্য করে প্রমাণ করে দেওয়া যে, আমরা কোনক্রমেই তোমার ফাঁদে পড়ার নই, আমরা উত্তমরূপেই বুঝি, তুমি বন্ধুর ছদ্মবেশে জাতশত্রু।

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

আক্ষেপ করে করে আপনার প্রাণটাই যেন চলে না যায়। ওরা যা কিছু করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত[১]।

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

৯. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ুমণ্ডলী প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর আমি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই মৃত ভূখণ্ডের দিকে এবং তার দ্বারা ভূমিকে– নির্জীব হয়ে যাওয়ার পর– সজীব করে দেই। এভাবেই হবে পুনরুত্থান[২]।

---

১. অর্থাৎ শয়তান মন্দকর্মকে যার দৃষ্টিতে ভাল বানিয়ে দিয়েছে, সে কি তার সমান হতে পারে, যে আল্লাহর ফযলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য জানে এবং ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলে বোঝে? যখন উভয়ে সমান হতে পারে না, তখন উভয়ের পরিণাম কী করে সমান হতে পারে?

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

আর এমন ভেবো না, একজন মানুষ খোলা চোখে মন্দকে ভাল মনে করবে কেমন করে? এমন বোকামি কেউ করে নাকি? বস্তুত আল্লাহ তাআলা যাকে তারই অযোগ্যতা ও (সত্য গ্রহণের) ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে বিভ্রান্ত করতে চান, তার আকল-বুদ্ধি এমনই বিকৃত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, যাকে স্বীয় যোগ্যতা ও উক্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের ফলে হেদায়াতের পথে আনতে চান, কোন শয়তানের সাধ্য নেই তাকে ভুল পথে চালিত করার বা উল্টা কথা বোঝানোর।

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

যা হোক, যে ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মন্দকে ভাল, অসৎকর্মকে সৎকর্ম এবং বিষকে অমৃত মনে করে নেয়, তার সরলপথে আসার আশা আছে কি? যখন নেই এবং যখন হেদায়াত ও গোমরাহী– সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হেকমতের অধীন, তখন আপনি এই হতভাগাদের চিন্তায় নিজেকে কেন কষ্টে ফেলছেন? এ হতভাগারা হেদায়াত ও কল্যাণের কথা গ্রহণ করছে না কেন– এ দুঃখে আপনি কি নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দিবেন? আপনি ওদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন। আল্লাহ তাআলা ওদের সব কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত। তিনি নিজেই ওদের শাস্তি প্রদান করবেন। আপনি মনঃক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হবেন না।

২. আল্লাহ তাআলার হুকুমে বাতাস প্রবাহিত হয় এবং মেঘমালা বহন করে আনে। অতঃপর যে এলাকার মাটি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ ফসল-তরুলতা কিছুই ছিল না, চতুর্দিকে ধূলা উড়ছিল– বৃষ্টির পানিতে তাতে প্রাণের উদ্রেক হয়। ঠিক এভাবে বুঝে নাও, আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর তোমাদেরও পুনরায় জীবিত করে তুলবেন।

১০. কেউ যদি সম্মান-প্রতিপত্তি চায়, তবে সমস্ত সম্মান-প্রতিপত্তি তো আল্লাহরই হাতে[১]। তাঁরই দিকে পবিত্র 'কালাম' আরোহণ করে[২] এবং সৎকর্ম তাকে (আরো) উন্নীত করে[৩]।	مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ

বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা যখন মৃতদের জীবিত করার ইচ্ছা করবেন, তখন আরশের নিম্নদেশ থেকে এক (বিশেষ) বৃষ্টি হবে, যার পানি পড়ামাত্র মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন জাগতিক বৃষ্টি বর্ষণে জমি থেকে শস্যদানা উদ্গত হয়। বিস্তারিত বিবরণ রেওয়ায়াতসমূহে দ্রষ্টব্য। (তাফসীরে তবারী ১৯/৩৩৬; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/৫৫৬)

১. কাফেররা বিভিন্ন উপাস্য নির্ধারণ করে রেখেছিল, যাতে (তাদের মাধ্যমে) আল্লাহ তাআলার দরবারে ওদের মর্যাদা লাভ হয়- وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (ওরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য অবলম্বন করে রেখেছে, যাতে তারা ওদের জন্য মর্যাদার কারণ হয়।' -মারয়াম, আয়াত ৮১)। আবার বহু লোক মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করত, যাতে ওদের সম্মান-প্রতিপত্তি রক্ষা পায়- الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ('যারা মুসলমানদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু বানায়, তারা কি ওদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই হাতে।' -নিসা, আয়াত ১৩৯)

এ জাতীয় সকল লোকদের বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের ইজ্জত কামনা করে, তার উচিত আল্লাহ তাআলার কাছেই তা কামনা করা। কেননা, তিনিই তো একচ্ছত্র মর্যাদার অধিকারী। তাঁরই স্মরণ ও আনুগত্যে ইজ্জত হাসিল হয়। তিনিই এককভাবে সমস্ত ইজ্জতের মালিক। যে কেউ ইজ্জত পেয়েছে বা পাবে, তাঁরই ভাণ্ডার থেকে পেয়েছে বা পাবে।

২. পবিত্র কালাম বলতে- আল্লাহ তাআলার যিকির, দো'য়া, কুরআন তেলাওয়াত, ইলম ও নসীহতের কথা প্রভৃতি উদ্দেশ্য। এসব বিষয় আল্লাহর দরবারের দিকে আরোহণ করে এবং কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে।

৩. পবিত্র কালামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উর্ধ্বারোহণ। তার সঙ্গে অন্য সৎকর্মসমূহ যুক্ত হলে সেগুলি তাকে সহযোগিতা করত অধিকতর শক্তিশালী করে এবং বুলন্দ করতে থাকে। আসলে ভাল আমল ছাড়া ভাল কালামও পূর্ণ বুলন্দি ও উচ্চতা হাসিল করতে পারে না।

কোন কোন মুফাসসির يرفعه এর فاعل (কর্তা) الكلم-কে এবং ه (সর্বনামের) পাত্র العمل الصالح-কে ধরে এ অর্থ করেছেন যে, পবিত্র কালাম ভাল আমলকে উঁচু ও বুলন্দ করে। এ অর্থ করার সুযোগ রয়েছে। আবার কেউ কেউ يرفع ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ তাআলাকে ধরে অর্থ করেছেন- তিনি সৎকর্মকে বুলন্দ ও কবুলিয়তের স্তরে পৌছান।

যা হোক, মূলকথা এই যে, ভাল আমলাদি ও ভাল কথাবার্তা উভয়টির গুণ হচ্ছে বুলন্দ হওয়া ও উর্ধ্বে আরোহণ করা। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট ইজ্জত কামনা করে, সে তা এসব জিনিসের মাধ্যমে হাসিল করুক।

আর যারা মন্দ চক্রান্ত-কৌশল করতে থাকে, ওদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর ওদের চক্রান্তই ব্যর্থ হবে[১]।

وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ⑩

১১. আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে। তারপর তোমাদের জোড়া জোড়া বানিয়েছেন। আর তাঁর অজ্ঞাতে কোনো নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না[২]। এবং কোনো দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে যে আয়ু দেওয়া হয় এবং কারো আয়ু থেকে যা হ্রাস করা হয়, সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এ আল্লাহর পক্ষে সহজ[৩]।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑪

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ইজ্জত আল্লাহ তাআলারই হাতে, তোমাদের যিকির ও ভাল কাজকর্ম উর্ধ্বারোহণ করতে থাকে। যখন তা নিজ সীমায় পৌছবে, তখন মন্দের উপর (পূর্ণ) প্রাধান্য হাসিল করবে, কুফর দূরীভূত হবে, ইসলামের ইজ্জত হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র বাতিল ও ব্যর্থ হয়ে পড়বে।'

১. অর্থাৎ যারা অপকৌশল আঁটে এবং সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত থাকে, ওরা পরিশেষে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখুন, যে কুরায়শরা 'দারুন্ নদ্ওয়াহ'-তে বসে একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দী করতে, হত্যা করতে বা দেশান্তরিত করতে পরামর্শ করেছিল, পরিণামে ওরাই বদরের যুদ্ধে আপন ভূমি থেকে বের হল, মুসলমানদের হাতে নিহত হল এবং 'কালীবে বদর' নামে একটা কূপে চিরকালের জন্য নিক্ষিপ্ত হল।

২. অর্থাৎ আদমকে মাটি থেকে, তারপর তাঁর সন্তানসন্ততিকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর নর-নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মানববংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। আর গর্ভধারণ থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত যত বিবর্তন ও অবস্থা অতিবাহিত হয়, সব কিছুর খবর তিনিই জানেন। মাতাপিতাও জানে না, ভিতরে কী কী অবস্থা অতিক্রম করে। [এ বিষয়গুলোর কিছু কিছু যান্ত্রিক মাধ্যমে জানা ভিন্ন কথা –অনুবাদক।]

৩. অর্থাৎ যার যত বয়স, তা লওহে মাহফূজে লিখিত আছে। বান্দার বয়স দীর্ঘ ও স্বল্প হওয়ার কারণ-হিকমত এবং কে পরিণত বয়সে পৌছবে, কে পৌছবে না– এ সবই আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে রয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষে এসব খুঁটিনাটি বিষয় আয়ত্তে রাখা বান্দার মত মোটেই মুশকিল নয়। যা কিছু ঘটেছে এবং যা ঘটবে, সকল বড়-ছোট বিষয় এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য– সবকিছুর সমুদয় জ্ঞান অনাদিকাল থেকে তাঁর রয়েছে। তাঁকে নিজেদের উপর কিয়াস করা যায় না।

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. দু'টি দরিয়া একরকম নয়– একটি সুমিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, তিক্ত। আর উভয় থেকে তোমরা তাজা গোশত (মাছ) আহার কর এবং আহরণ কর অলঙ্কার, যা তোমরা পরিধান কর[১]। আর তুমি দরিয়ায় জাহাজসমূহকে দেখ যে, পানি চিরে চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে শোকর কর[২]।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ

১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি পরিভ্রমণ করবে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত[৩]। ইনিই

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সবকিছু ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়, যেমন মানুষের গঠন ও বিকাশ এবং প্রত্যেকের আপন নির্ধারিত বয়সে উপনীত হওয়া। ঠিক এভাবে বুঝে নিন যে, ইসলাম পর্যায়ক্রমে উন্নতি-বিকাশ লাভ করবে এবং অবশেষে কুফরের উপর বিজয়ী ও প্রাধান্য লাভ করবেই করবে।'

১. পূর্ব থেকে তাওহীদের দলীল-প্রমাণ এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাদির আলোচনা চলে আসছে। প্রসঙ্গত ইসলামের বিজয়ের প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইশারা-ইঙ্গিত করা হচ্ছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ, কুফর ও ইসলাম সমান নয়– আল্লাহ কুফরকে পরাজিত করবেনই, যদিও তোমরা উভয় থেকে ফায়দা হাসিল করবে। মুসলমানদের দ্বারা দীন-ধর্মের শক্তি অর্জন হবে, আর কাফেরদের থেকে জিয্য়া ইত্যাদি অর্থ-সম্পদ হাসিল হবে। আর নোনা ও মিঠা উভয় পানির সাগর থেকে গোশত অর্থাৎ মাছ পাওয়া যায়, আর অলঙ্কার অর্থাৎ মণিমুক্তা ও অপরাপর মূল্যবান রত্ন বেশির ভাগ নোনা পানির সাগর থেকেই সংগৃহীত হয়।

২. অর্থাৎ বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য জাহাজসমূহের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এর দ্বারা যে লাভ ও মুনাফা অর্জিত হয়, তাই আল্লাহ তাআলার فضل (অর্থাৎ দয়া)। এ সমস্ত নে'য়ামতের জন্য মানুষের উচিত আপন মালিকের শোকর আদায় করা।

৩. এ বিষয় পূর্বে কয়েক স্থানে গত হয়েছে। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র.) লেখেন, 'অর্থাৎ রাতদিনের ন্যায় কখনো কুফর বিজয়ী, কখনো ইসলাম বিজয়ী হয়। আর সূর্য ও চাঁদের ন্যায় প্রত্যেক জিনিসের সময় নির্ধারিত রয়েছে– তাতে আগ-পাছ হয় না। সত্যের সুস্পষ্ট বিজয় নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই হবে।

আল্লাহ, তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদের ডাক, তারা একটা খেজুর আঁটির আবরণেরও মালিক নয়[১]।

رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

১৪. তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ককে অস্বীকার করবে[২]। বস্তুত, সম্যক অবহিত (আল্লাহ)-র মত আর কেউ তোমাকে অবহিত করবে না[৩]।

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝

[রুকূ - ৩]

১৫. হে মানুষ! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ– তিনিই অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার অধিকারী[৪]।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসারণ করে এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

---

১. অর্থাৎ যাঁর গুণ-গরিমা ও মর্যাদা-মহিমা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনিই তোমাদের সাচ্চা প্রতিপালক এবং সমগ্র আসমান ও যমীনের মালিক। তিনি ছাড়া যাদের তোমরা খোদা বলে ডাক, সেই মিসকীনেরা আসমান-যমীনের মালিক হওয়া তো দূরের কথা, খেজুরদানার উপরে যে পাতলা আবরণ থাকে, তারও মালিক নয়।

২. অর্থাৎ যেসব উপাস্যের সাহায্য তোমরা কামনা কর, তারা তোমাদের ডাক শোনে না। আর যদি শুনতও, তবু কোনো উপকারে আসত না। বরং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরকী আচার-ব্যবহারের প্রতি প্রকাশ্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে শত্রু প্রমাণিত হবে।

৩. অর্থাৎ যাবতীয় হাল–অবস্থা আল্লাহ থেকে বেশি আর কে জানে? তিনিই বলছেন যে, এই শরীকেরা মিথ্যা, যারা কোন কাজেই আসতে পারে না। এমন সঠিক ও পরিপক্ক কথা আল্লাহ ছাড়া আর কে বলবে?

৪. অর্থাৎ সকল মানুষ আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কারণ, সকল সৌন্দর্য ও গুণ-মহিমার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর সত্তার মধ্যে। সুতরাং তিনিই তোমাদের ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার একমাত্র উপযুক্ত।

১৭. তা আল্লাহর জন্য মোটেও কঠিন নয়[১]।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾

১৮. কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। এবং কোনো ভারী বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি (কাউকে) তার বোঝা বহন করতে ডাকে, তবে কেউ তার কিছুই বহন করবে না যদিও সে আত্মীয় হোক[২]। আপনি তো কেবল তাদের সতর্ক করতে পারেন, যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে[৩]। আর যে কেউ সংশোধিত হবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই সংশোধিত হবে। এবং (সকলকে) আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে[৪]।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾

১৯. সমান নয়– অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾

২০. না অন্ধকাররাশি ও আলো,

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾

---

১. অর্থাৎ তোমরা যদি তাঁকে না মান, তবে তিনি তোমাদের হটিয়ে অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন, যারা সকল দিক দিয়ে তাঁর আজ্ঞাবহ ও অনুগত হবে– যেমনঃ আসমানের ফেরেশতাগণ। আর এমন করাটা আল্লাহ তাআলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু তাঁর হেকমতের দাবি এই যে, পৃথিবীর বুকে মানবধারা চলতে থাকুক এবং পরিশেষে প্রত্যেকে নিজের সৎ বা অসৎ কর্মের প্রতিফল লাভ করুক, যাতে এভাবে আল্লাহর সমস্ত গুণের (পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া এবং ক্ষমা করা) প্রকাশ ঘটে।

২. অর্থাৎ নিজ থেকে কেউ অন্যের পাপের বোঝা নিজের মাথায় তো নেবেই না, অন্য কেউ ডাকলেও সে তার কোন সহায়তা করতে পারবে না– চাই নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন। সকলকেই 'নাফসী' 'নাফসী' করতে হবে। একমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমতেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

৩. অর্থাৎ আপনার সতর্ক করায় সে-ই উপকৃত হবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, যে আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে এবং এ কারণেই তাঁর বন্দেগীতে রত থাকে। যার অন্তরে আল্লাহর ভয়ই নেই, এসব সতর্কবাণীতে তার কী ফায়দা হবে?

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার নসীহত মন দিয়ে শুনবে ও মানবে এবং নিজ অবস্থা শুধরিয়ে নেবে, এতে সে নিজেই লাভবান হবে। এটা আপনার উপর কিংবা আল্লাহর উপর কোন অনুগ্রহ করা নয়। আর এই লাভ পূর্ণরূপে তখন প্রকাশ পাবে, যখন সকলে আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে।

২১. এবং ছায়া ও রোদ।	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝٢١
২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃতরা[১]। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শোনান। আর যারা কবরে আছে আপনি তাদের শোনাতে সক্ষম নন।	وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝٢٢
২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারীমাত্র[২]।	إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ۝٢٣
২৪. আমি তো আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।	إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا

১. অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা অন্তর্চোখ দান করেছেন, ফলে সে সত্যের জ্যোতি ও আল্লাহ তাআলার ওহীর মাধ্যমে দ্বিধাহীনভাবে পথ অতিক্রম করতে করতে বেহেশতের বাগান ও আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়– তার সমান কি সে কাফের হতে পারে, যার অন্তর অন্ধ, ফলে সে ধারণা-কল্পনা ও কামনা-বাসনার অন্ধকারে পতিত হয়ে জাহান্নামের আগুন ও তার উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহের দিকে ছুটে চলেছে? নিশ্চয় না। এমনটি হওয়ার অর্থ হবে, মৃত আর জীবিত সমান হয়ে গেছে!! সবাই বোঝে, এ আদৌ হতে পারে না। বস্তুত, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে তার চেয়েও বেশি পার্থক্য রয়েছে, যা একজন জীবিত, সুস্থ মানুষ ও মৃত লাশের মধ্যে থাকে। আর প্রকৃত ও অবিনশ্বর জীবন একমাত্র ঈমানের মাধ্যমেই লাভ হয়, এর অনুপস্থিতিতে মানুষ হাজার মৃতের চেয়েও নিকৃষ্ট মৃততুল্য হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে মৃতদেরও শুনিয়ে দিতে পারেন। এ ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। আর পয়গম্বরের কর্তব্য হচ্ছে শুধু বোঝানো এবং ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া। এখন কোন মৃত অন্তরবিশিষ্ট কাফের তাঁর কথা না শুনলে জোর করে শোনানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ সকল মানুষ সমান নয়। যাদের হেদায়াত দেওয়া হবে তারাই তা পাবে। আপনি অনেক আশা করলেও কী হবে? আর ২০নং আয়াতে لا দু'বার ব্যবহার করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, অন্ধকারও আলোর সমান নয়, আলোও অন্ধকারের সমান নয়। আর ২২নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'আপনি শুনাতে পারেন না কবরবাসীদের'– অন্যদিকে হাদীসে এসেছে, মৃতদের 'সালাম' করো (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৯৭৫)। তাছাড়া অনেক স্থানে মৃতদের সম্বোধনও করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, মৃতের আত্মা শুনতে পায়। কবরে তো শায়িত তার লাশ, যা শোনে না।'

ইতিপূর্বে সূরা নমলের শেষাংশে (আয়াত ৮০-৮১) এ বিষয়ে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

وَاِنۡ مِّنۡ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِیۡهَا نَذِیۡرٌ ۝٢٤

আর এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী গত হয়নি[১]।

وَاِنۡ یُّکَذِّبُوۡکَ فَقَدۡ کَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۚ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالۡکِتٰبِ الۡمُنِیۡرِ ۝٢٥

২৫. ওরা যদি আপনাকে অস্বীকার করে, তবে ওদের পূর্ববর্তীরাও (রাসূলগণকে) অস্বীকার করেছিল। পূর্ববর্তীদের নিকট ওদের রাসূলগণ এসেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে[২]।

ثُمَّ اَخَذۡتُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ۝٢٦

২৬. অতঃপর আমি কাফেরদের পাকড়াও করেছিলাম। অতএব (দেখ), কেমন ছিল আমার পাকড়াও[৩]!

[রুকূ - ৪]

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهَا ؕ وَمِنَ الۡجِبَالِ جُدَدٌۢ بِیۡضٌ وَّحُمۡرٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهَا وَغَرَابِیۡبُ سُوۡدٌ ۝٢٧

২৭. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফলমূল উৎপন্ন করি[৪]। আর পাহাড়-পর্বতের মধ্যেও রয়েছে সাদা ও লাল অংশ, যেগুলোর বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং আছে গাঢ় কালো অংশ[৫]।

---

১. সতর্ককারী নবীও হতে পারেন, অথবা নবীর পথের দিকে আহ্বানকারী তাঁর স্থলাভিষিক্তও হতে পারেন। সূরা নাহ্‌লে (আয়াত ৩৬) এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

২. بالبينات– অর্থাৎ উজ্জ্বল শিক্ষা-আদর্শ, অথবা সুস্পষ্ট মুজেযাসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ছোট ছোট সহীফা এবং কাউকে কাউকে বিস্তারিত, বড় বড় কিতাব প্রদান করা হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ যখন অবিশ্বাস, অস্বীকার করতে থাকল, তখন ওদের পরিণাম কী হয়েছে তা দেখে নাও। তোমাদেরও সেই রকম পরিণাম হতে পারে।

৪. অর্থাৎ নানা শ্রেণীর ফল সৃষ্টি করেছেন। আবার এক এক শ্রেণীতে আছে বিভিন্ন রংয়ের ফল। একই মাটি, একই পানি, একই আবহাওয়া থেকে এত ভিন্ন রকমের বস্তু পয়দা করার দ্বারা আল্লাহর বিস্ময়কর কুদরতের প্রকাশ ঘটে ।

৫. অর্থাৎ সাদাও কয়েক ধরনের (কোনটা অনেক বেশি সাদা, কোনটা কম, কোনটা আরো কম) এবং লালও কয়েক ধরনের। আর আছে খুব গাঢ় কালো, একেবারে কাকের ডানার ন্যায়।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. আর তদ্রূপ মানুষ, পশু ও চতুষ্পদ প্রাণীও বিভিন্ন বর্ণের[১]। আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে, যারা ইলমধারী। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল[২]।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে– তারা এমন ব্যবসার প্রত্যাশা রাখে, যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার নয়[৩];

---

১. এ সবকিছু কুদরতের লীলাখেলার বিবরণ। তো, উদ্ভিদজগত, জড়জগত ও প্রাণীজগতে যেমন নানা বর্ণের সৃষ্টি রয়েছে, তদ্রূপ মানব জাতির প্রত্যেকের ধরন ভিন্ন। অতএব এ কীভাবে সম্ভব যে, মুমিন ও কাফের একে অপরের ন্যায় হবে এবং সমস্ত মানব একই রং-ঢং, অভিন্ন পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করে নেবে? এর মাধ্যমে মূলত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের মতভেদের কারণে তিনি যেন ভারাক্রান্ত না হন।

২. অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে এমনো আছে, যাদের অন্তরে ভয় নেই এবং এমনো আছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলে। তবে ভয় করে তারাই, যারা আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব, আখেরাতের স্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতা এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও নশ্বরতাকে গভীরভাবে অনুধাবন করে, নিজ প্রভুর বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের পূর্ণ জ্ঞান ও ইলম রাখে এবং ভবিষ্যতের (কবরের, আখেরাতের) সর্বদা ফিকির করে। যার মধ্যে এ উপলব্ধি ও জ্ঞান যে পরিমাণে থাকবে, সে আল্লাহ তাআলাকে ঐ পরিমাণ ভয়ই করবে। আর যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলেম আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সকল মানুষ আল্লাহ তআলাকে ভয় করে না, তাঁকে ভয় করা জ্ঞানীদের গুণ। আর আল্লাহ তাআলার আচরণও দুই ধরনের– তিনি এমন ক্ষমতাশালী যে, প্রত্যেক অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে পারেন; আবার এমন ক্ষমাশীলও যে, অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন।'

অতএব উভয় দিক থেকে বান্দার ভয় করা উচিত– কেননা, লাভ ও ক্ষতি উভয়টি আল্লাহরই মুঠিতে। তিনি যখন ইচ্ছা, রহমতের দুয়ার বন্ধ করে দিতে এবং আপদ অবতীর্ণ করতে পারেন।

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করত তাঁর আদেশ-নিষেধ মানে এবং ভক্তির সাথে তাঁর কিতাব পড়ে, তদুপরি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত-বন্দেগীতে আলস্য করে না– তারা প্রকৃতপ্রস্তাবে এমন বিরাট ব্যবসার আশাবাদী, যার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই।

৩০. যাতে তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পুরাপুরি দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো বেশি দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী[১]।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

৩১. আমি আপনার নিকট যে কিতাব পাঠিয়েছি, তা-ই সত্য, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থনকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, (সব কিছুর) দ্রষ্টা[২]।

وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝

৩২. অতঃপর আমি এই কিতাবের ওয়ারিস (অধিকারী) তাদের বানিয়েছি, যাদেরকে স্বয়ং আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের মধ্যে কতক নিজের প্রতি অত্যাচারী। আর তাদের মধ্যে কতক মধ্যপন্থী এবং কতক আল্লাহর তাওফীকে নেককাজসমূহে অগ্রগামী। এ-ই বিরাট মর্যাদা[৩]।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

যখন স্বয়ং আল্লাহ তাদের আমলের খরিদদার, তখন তাদের উক্ত আশা নিশ্চিতরূপে যথার্থ। এই ব্যবসায় কোন দিক থেকেই ক্ষতির আশঙ্কা নেই, বরং আগাগোড়া লাভই লাভ।

১. অর্থাৎ তিনি غفور –বহু গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং شكور –স্বল্প পরিমাণ ইবাদতেরও মূল্যায়ন করেন। আর তিনি পুরস্কাররূপে সাধারণ নিয়মের অধিক ছওয়াব দান করেন।

২. অর্থাৎ তিনি বান্দাদের হাল-অবস্থা উত্তমরূপে জানেন। তাই যথাসময়েই এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

৩. অর্থাৎ পয়গম্বরের পরে এই কিতাবের (কুরআনের) উত্তরাধিকারী এমন উম্মতকে বানিয়েছেন, যারা সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী সকল উম্মত থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তবে উম্মতের সকল সদস্য একরকম নয়। তাদের মধ্যে এমনো আছে, যারা ঈমান আনা সত্ত্বেও গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে (এরা হল ظالم لنفسه)। আর এমনো আছে, যারা মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে– পাপেও মত্ত না, বড় বুযুর্গ ও ওলীও নয় (তাদের مقتصد বলা হয়েছে)। আর এক দল রয়েছে কামেল, যারা আল্লাহ তাআলার ফযলে ও তাওফীকে আগে বেড়ে বেড়ে নেকী সঞ্চয় করে এবং পূর্ণতা অর্জনে মধ্যবর্তীদের ছাড়িয়ে যায়। তারা 'মুস্তাহাব' কাজকেও বাদ দেয় না এবং গোনাহর ভয়ে 'মাকরূহ তানযীহী', এমনকি কোন কোন 'মুবাহ' কাজকাম থেকেও বিরত থাকে। এরাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী (-سابق بالخيرات)।

৩৩. (তাদের জন্য আছে) অনন্তকাল বসবাসের উদ্যানসমূহ, যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদের পরানো হবে সোনার বালা ও মুক্তা এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের[১]।

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَهَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّ لُؤۡلُؤًا ۚ وَ لِبَاسُهُمۡ فِیۡهَا حَرِیۡرٌ ﴿۳۳﴾

৩৪. আর তারা বলবে, 'প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের রব অতি ক্ষমাশীল, খুবই গুণগ্রাহী[২]–

وَ قَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡۤ اَذۡهَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَكُوۡرُۨ ﴿۳۴﴾

৩৫. 'যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের দাখিল করেছেন স্থায়ী বসবাসের ঘরে– যেখানে আমাদের কোন ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং যেখানে আমাদের স্পর্শ করবে না কোন অবসাদও[৩]।'

الَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَۃِ مِنۡ فَضۡلِهٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیۡهَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

৩৬. আর যারা কাফের হয়েছে, ওদের জন্য রয়েছে দোযখের আগুন। ওদের ব্যাপারে (আর মৃত্যুর) ফয়সালা করা হবে না যে, ওরা মরে

وَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا یُقۡضٰی عَلَیۡهِمۡ فَیَمُوۡتُوۡا وَ لَا یُخَفَّفُ

উল্লেখ্য, 'মনোনীত' বান্দাদের মধ্যে এক হিসাবে সকলকেই (অর্থাৎ উল্লিখিত তিন স্তরের লোকদেরই) শামিল করা হয়েছে। কেননা, স্তরভেদে এরা সকলেই বেহেশতবাসী। গোনাহগার মুমিনও কোন না কোন সময় অবশ্যই জান্নাতে যাবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে– আমাদের গোনাহগারও শেষ পর্যন্ত ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। আর মধ্যপন্থীরা নিরাপদ এবং অগ্রবর্তীরা তো সর্বাগ্রেই রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দয়াবান, তাঁর কাছে কৃপণতা নেই। (তাফসীরে বাগাবী ৩/৫৭১; তারীখে দিমাশ্ক ৪১/৪৪২)

১. মুমিন পুরুষদের জন্য সেখানে আছে সোনার অলঙ্কার ও রেশমের পোশাক। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী কাপড় পরবে, সে আখেরাতে পরতে পাবে না।' (বুখারী, ৫৮৩৪)

২. অর্থাৎ দুনিয়ার কষ্ট ও হাশরের ময়দানের চিন্তা দূর করেছেন, আমাদের ক্ষমা করেছেন এবং মূল্যায়ন করত আমাদের ইবাদত-বন্দেগী কবুল করেছেন।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ইতিপূর্বে (শান্তিতে) বসবাস করার ঘর বলতে কিছু ছিল না। প্রত্যেক স্থানে ছিল জীবিকার চিন্তা, শত্রুর ভয় এবং কষ্ট ও ক্লান্তি। আর সেখানে (বেহেশতে) পৌঁছার পর সবই অদৃশ্য হয়ে যাবে।'

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝

যাবে। এবং ওদের থেকে দোযখের শাস্তিও কিছুমাত্র লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক চরম অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দেই[১]।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۚ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

৩৭. ওরা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের বের করুন, যাতে আমরা পূর্বে যেসব আমল করতাম তার বিপরীত নেক আমল করতে পারি'[২]। (আল্লাহ বলবেন,) 'আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দান করিনি, যার মধ্যে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তা করতে পারত? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলেন। অতএব (শাস্তি) আস্বাদন কর, জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই'[৩]।

[রুকূ - ৫]

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ

৩৮. নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সকল) অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

---

১. জাহান্নামে কাফেরদের মৃত্যু আসবে না, ফলে কখনো দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে না। আর শাস্তির কষ্টও কোন সময় হাল্কা হবে না। আল্লাহর নিকট চরম অকৃতজ্ঞদের শাস্তি এটাই।

২. অর্থাৎ তখন তো সে কাজগুলিকেই (যাতে আমরা লিপ্ত হতাম) ভাল মনে করতাম, কিন্তু এখন আর তা করব না। একটুখানি দোযখ থেকে বের করে দিন, তাহলে আমরা উত্তমরূপে নেকীসমূহ কামাই করে আনব এবং আজ্ঞাবহ হয়ে আপনার দরবারে হাযির হব।

৩. দোযখবাসীদের এই উত্তর দেওয়া হবে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছিলাম, যার দ্বারা চাইলে বুঝতে পারতে। এবং যথেষ্ট বয়স দান করেছিলাম, যার মধ্যে চিন্তা করতে চাইলে সকল ভাল ও মন্দ সম্পর্কে চিন্তা করে উপদেশ গ্রহণ করতে ও সরল পথ অবলম্বন করতে পারতে। এমন কি, তোমাদের মধ্যকার অনেকে ষাট-সত্তর বছর দুনিয়াতে জীবিত থেকে মৃত্যুবরণ করেছ। তদুপরি আমার পক্ষ থেকে এমনসব ব্যক্তি পাঠিয়েছিলাম এবং তোমাদের এমনসব অবস্থার সম্মুখীন করেছিলাম, যা মন্দ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করত এবং গাফলতের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে থাকত। তারপরও কি কোন ওযর-আপত্তি বাকী থাকে? এখন অপদস্থ হয়ে আযাবের স্বাদ ভোগ করতে থাক এবং কোন দিক থেকে সাহায্যের আশা করো না।

إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٣٨

এবং তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত[১]।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۝٣٩

৩৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন[২]। এখন যে কেউ কুফরী করবে, তার কুফরী (-র শাস্তি) তার উপরই বর্তাবে। আর কাফেরদের জন্য ওদের কুফর স্বীয় রবের নিকট অসন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করবে না এবং কাফেরদের জন্য ওদের কুফর ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করবে না[৩]।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَرُونِي مَاذَا

৪০. আপনি বলুন, 'আচ্ছা, তোমরা তোমাদের সেসব শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ কি, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ডাক? আমাকে দেখাও তো, তারা পৃথিবীর কোন

১. অর্থাৎ তিনি বান্দাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য –সকল অবস্থা ও কর্ম এবং অন্তরের গোপন কথা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। কারো নিয়ত ও অবস্থা তাঁর কাছে অজ্ঞাত নয়। সে অনুযায়ীই তিনি সবার সঙ্গে আচরণ করেন। তিনি এও জানেন যে, যারা এখন এ কথা বলে চিল্লাচ্ছে যে, আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা আর অপরাধ করব না– তারা নিজেদের দাবিতে মিথ্যাবাদী। যদি সত্তরবারও ওদের প্রত্যাবর্তন করানো হয়, তবু দুষ্কৃতি থেকে বিরত হতে পারবে না। ওদের প্রকৃতিটাই এ রকম- وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ('আর যদি ওদের আবারো পাঠানো হয়, তবে অবশ্যই আবারো সেই কাজই করবে, যা করতে ওদের নিষেধ করা হয়েছিল, আর ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। –আন'আম, আয়াত ২৮)

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের জায়গায় তোমাদের পৃথিবীর বুকে আবাদ করেছেন এবং তাদের পরে তোমাদের রাজত্ব দান করেছেন। সুতরাং এখন আল্লাহর হক আদায় করা তোমাদের কর্তব্য।

৩. অর্থাৎ কুফর ও না-শোকরী এবং আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের অস্বীকৃতিতে তাঁর কোনই ক্ষতি নেই। তিনি আমাদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। অকৃতজ্ঞ নিজের কর্মের শাস্তি নিজেই ভোগ করবে। কুফরের পরিণাম এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সর্বদা অসন্তোষ ও ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কাফেরের ক্ষয়-ক্ষতির পাল্লা প্রতিনিয়ত ভারী হতে থাকে।

خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا

অংশ সৃষ্টি করেছে[১]? অথবা আকাশসমূহে কি তাদের কোন অংশীদারি আছে? অথবা আমি কি মুশরিকদের কোন কিতাব দিয়েছি, ফলে ওরা এর সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছে[২]?' (কিছুই না), বরং জালেমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়[৩]।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

৪১. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সামলিয়ে রেখেছেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়ে যায়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তাদের সামলিয়ে রাখতে পারবে না[৪]। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, অতি ক্ষমাপরায়ণ[৫]।

---

১. অর্থাৎ তোমাদের উপাস্যদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে বল দেখি, তারা পৃথিবীর কোন্ অংশটি সৃষ্টি করেছে, অথবা আকাশসমূহের সৃষ্টিকরণে ও তা সামলানোয় তাদের কতটুকু অংশগ্রহণ রয়েছে? যদি কিছুই না থাকে, তবে ওরা কী করে খোদা হয়ে বসল? কিছুটা আক্ল-বুদ্ধি তো খাটিয়ে দেখ।

২. অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য কোন প্রমাণ যখন নেই, তখন কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় প্রমাণই পেশ কর, যার ভিত্তিতে এ শিরকী দাবি করছ।

৩. অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য বা ধর্মীয় কোনই প্রমাণ নেই। আসল কথা এই যে, শয়তানের প্রবঞ্চনায় এদের মধ্যে বড়রা ছোটদের এবং পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে আসছে যে, هؤلاء شفعاءنا عند الله (এসব মূর্তি প্রভৃতি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী হবে) এবং তাঁর নৈকট্য দান করবে। অথচ এটা নিতান্ত ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা সুপারিশকারী হওয়া দূরে থাক, বড় থেকে বড় নৈকট্যপ্রাপ্তরাও তাঁর নিকট কাফেরদের পক্ষে সুপারিশের জন্য মুখ খুলতে পারবে না।

৪. অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই কুদরত ও শক্তি এত বড় বড় নক্ষত্রকে নিজেদের কক্ষপথ থেকে সরে যেতে এবং নিজ স্থান ও শৃঙ্খলা থেকে এদিক-সেদিক হেলে পড়তে দিচ্ছে না। ধরুন— যদি এ সকল গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কেন্দ্র বা কক্ষ থেকে স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে, তবে আল্লাহ ছাড়া কার শক্তি আছে এগুলিকে ধরে রাখার? তাই তো, কিয়ামতের দিন যখন বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলা বিপর্যস্ত করে ফেলবেন, তখন কোন শক্তিই তা ঠেকাতে পারবে না।

৫. অর্থাৎ মানুষের কুফর ও অপরাধের দাবি এই যে, এ বিশ্ব-ব্যবস্থাপনা মুহূর্তে উলটপালট করে দেওয়া হোক। কিন্তু মহান আল্লাহর ধৈর্য-সহ্য ও সহনশীলতার ফলে তা অটুট রয়েছে। তাঁর ক্ষমা সক্রিয় না থাকলে সমগ্র দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

৪২. ওরা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে কসম করে বলত, যদি ওদের নিকট কোন সতর্ককারী আসে, তবে ওরা অবশ্যই যে কোন সম্প্রদায়ের চেয়ে অধিক সৎপথের অনুসারী হবে। অতঃপর যখন ওদের নিকট সতর্ককারী আগমন করলেন, তখন তাঁর আগমন ওদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল–

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ۝

৪৩. (বৃদ্ধি করল) পৃথিবীতে অহংকার প্রদর্শন ও কূট-ষড়যন্ত্র। অথচ কূট-ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্রকারীদেরই পরিবেষ্টন করে নেবে[১]। বস্তুত ওরা কেবল পূর্ববর্তীদের (ক্ষেত্রে কার্যকর) রীতির অপেক্ষা করছে। তো (মনে রেখো), তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর নিয়ম রদবদল হতে দেখবে না[২]।

اِسْتِكْبَارًا فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ۝

১. আরবের লোকেরা যখন শুনত, ইহুদী প্রভৃতি জাতি নিজ নিজ নবীদের বিভিন্নভাবে নাফরমানী করেছিল, তখন বলত, 'আমাদের মধ্যে যদি কখনো নবীর আগমন হয়, তবে আমরা এসব জাতির চেয়ে উত্তমরূপে নবীর আনুগত্য ও সহযোগিতা করে দেখাব। কিন্তু যখন আল্লাহ এমন নবী পাঠালেন, যিনি মর্যাদায় সকল নবীর চেয়ে অগ্রগামী, তখন ওরা সত্য থেকে আরো বেশি দূরে চলে যেতে লাগল। গর্ব ও অহংকার ওদেরকে নবীর অনুগত হতে দিল না। সাহায্য ও আনুগত্য করার পরিবর্তে ওরা শত্রুতায় মেতে উঠল এবং নানা রকম অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, স্বয়ং চক্রান্তকারীদেরই উপর আপন চক্রান্ত উল্টে পড়বে। যদিও ওরা সাময়িকভাবে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে যে, আমরা কলা-কৌশল করে এমন এমন ক্ষতি সাধন করতে পেরেছি। কিন্তু পরিণামে দেখতে পাবে, বাস্তবে বিরাট ক্ষতি ওদেরই পোহাতে হবে। ধরা যাক, দুনিয়ায় রেহাই পেয়েও গেল, কিন্তু আখেরাতে নিশ্চিতরূপে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২. অর্থাৎ এরা এ অপেক্ষায় আছে যে, অতীত অপরাধীদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, এদের সাথেও তাই করা হোক। তো, এরা অবাধ্যতা থেকে বিরত না হলে তাই হবে। অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার যে নীতি রয়েছে, তা পরিবর্তিত হওয়ার নয় অর্থাৎ এমন হবে না যে, শাস্তির স্থলে পাপীরা সম্মান ও পুরস্কার লাভ করল। আর তা রদবদল হওয়ারও নয় যে, পাপীর পরিবর্তে নিরপরাধকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. ওরা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতে পেত, ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? অথচ পূর্ববর্তীরা ছিল ওদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আর আল্লাহ এমন নন যে, তাঁকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছু অক্ষম করতে পারে। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান[১]।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো জীবকেই রেহাই দিতেন না[২]। কিন্তু তিনি তাদের অবকাশ দিচ্ছেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে যাবে, তো নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা[৩]।

---

১. অর্থাৎ বড় বড় শক্তিশালী জাতি আল্লাহ তাআলার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়নি, যেমন আদ, ছামূদ প্রভৃতি জাতি। এরা কোন্ ছার! জেনে রাখ, আকাশ ও পৃথিবীর কোন শক্তি আল্লাহ তাআলাকে প্রতিহত করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী এবং তাঁর ক্ষমতা পরিপূর্ণ। এরপরও কী করে তিনি অক্ষম হতে পারেন?

২. অর্থাৎ মানুষ যেসব গোনাহ করে, তিনি যদি সেসবের প্রত্যেকটির কারণে ধরপাকড় শুরু করেন, তবে দুনিয়ার বুকে কোন প্রাণীই অবশিষ্ট থাকবে না। অপরাধীদের তো নিজ নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আর যারা কামেল আজ্ঞাবহ, তাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে তাদের তুলে নেওয়া হবে। কেননা, বিশ্বের ব্যবস্থাপনাই এমনভাবে কায়েম করা হয়েছে যে, এখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের বসবাস করতে থাকা হেকমতের পরিপন্থী। আর যখন মানুষেরই অবস্থান থাকবে না, তখন আর অন্যান্য সৃষ্টি রাখা হবে কেন? এদের অস্তিত্ব, বরং সমগ্র জগতের স্থিতিই তো মানব সম্প্রদায়ের অবস্থান ও অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

৩. অর্থাৎ একটি নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক অপরাধের জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় করেন না।

যখন প্রতিশ্রুত সময়টি এসে যাবে, তখন তাঁর ধরপাকড় শুরু হবে। সকল বান্দা তাঁর দৃষ্টিতলে রয়েছে, কারো বিন্দু পরিমাণ ভাল বা মন্দ আমল তাঁর জ্ঞানবহির্ভূত নয়। অতএব তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ঠিক ঠিক ফয়সালা করা হবে। তখন অপরাধী কোথাও আত্মগোপন করতে পারবে না। আর আনুগত্যকারীর হক নষ্ট হবে না।

اللَّهُمَّ اجعلنا ممن يطيعك واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم

সূরা ইয়াসীন

সূরা ৩৬ । ৮৩ আয়াত । ৫ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ
آياتها ٨٣، ركوعاتها ٥

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইয়াসীন। — يٰسٓ ۟

২. পরিপক্ক* কুরআনের কসম, — وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۟

৩. নিশ্চয়ই আপনি রাসূলদের একজন। — اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۟

৪. সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত[১]। — عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

৫. (এ কুরআন) পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর নাযিলকৃত[২]– — تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۟

৬. যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের বাপ-দাদাদের সতর্ক করা হয়নি; ফলে তারা উদাসীন। — لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۟

৭. নিশ্চয়ই তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে (আল্লাহর) কথা অবধারিত হয়ে গেছে, অতএব ওরা ঈমান আনবে না[৩]। — لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۟

---

* **দ্বিতীয় তরজমা–** জ্ঞানগর্ভ।

১. অর্থাৎ পবিত্র কুরআন স্বীয় অলৌকিকতা, প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিপক্ক বিষয়াবলির কারণে এ কথার অতি শক্তিশালী সাক্ষী যে, যিনি তা নিয়ে এসেছেন, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত এবং সরল পথের উপর অধিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁর অনুসরণকারীদের লক্ষ্যস্থল থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

২. অর্থাৎ, দীনের এই সরল পথ অথবা হেকমতপূর্ণ এ কুরআন সেই আল্লাহরই অবতারিত, যিনি এক দিকে পরাক্রমশালী– ফলে অস্বীকারকারীকে শাস্তি প্রদান করেই ছাড়বেন, আবার তিনি দয়াশীলও– ফলে মান্যকারীদের প্রতিদান ও পুরস্কারে ভূষিত করবেন। এ জন্যই কুরআনের কিছু আয়াতে প্রকাশ পায় তাঁর করুণা ও দয়াদ্রতার শান, আর কিছু আয়াতে তাঁর ক্রোধ ও রাগের শান।

৩. **নবীজির (স) গুরুদায়িত্ব**
অর্থাৎ আপনার উপর অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সেই আরব জাতিকে কুরআনের মাধ্যমে সতর্ক ও জাগ্রত করা আপনার দায়িত্ব, যাদের নিকট শত শত বছর ধরে

কোন সতর্ককারী আসেনি। ফলে তাদের অজ্ঞতা ও গাফলতের অবস্থা এই যে, আল্লাহরও কোন খবর তাদের নেই, আখেরাতেরও খবর নেই। অতীত থেকেও তাদের কোন শিক্ষা নেই, ভবিষ্যতেরও কোন ফিকির নেই। সৃষ্টির সূচনা ও পরিণতি– কোন দিকেই তাদের লক্ষ নেই। পাপ-পুণ্যের পার্থক্য এবং ভাল-মন্দের জ্ঞান তাদের নেই।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

এ সুদীর্ঘ অজ্ঞতা ও গাফলতের অন্ধকার থেকে একটি জাতিকে বের করে আলো ও হেদায়াতের রাজপথে এনে দাঁড় করানো কোন মামুলি ও সহজ কাজ নয়। আপনি নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে তাদেরকে উক্ত গাফলত ও অজ্ঞতার ভয়ঙ্কর পরিণাম ও ভীতিপ্রদ ভবিষ্যত সম্বন্ধে সতর্ক করবেন এবং কল্যাণ ও সফলতার উচ্চতম স্তরে পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, যাতে এই জাতি প্রথমত নিজেরা সুউচ্চ সফলতা লাভ করে, অতঃপর সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য সফলতার দ্বার খুলে দিতে পারে (নিজেরাও সরল পথ লাভ করে এবং গোটা বিশ্বকে সরল পথ প্রদর্শন করে)।

কিন্তু আপনি এমন অনেক ব্যক্তির সম্মুখীন হবেন, যারা কোন প্রকার উপদেশেই কান দেয় না। এজন্য ওদের ঘাড়ে শয়তান পূর্ণোদ্যমে চেপে বসে এবং ওদের নির্বুদ্ধিতা ও দুরাচারকে ওদের দৃষ্টিতে সুন্দর করে দেখায় এবং ওদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল অবস্থাকে– চাই তা যতই ঘৃণ্য হোক না কেন, সুন্দর আকৃতিতে প্রকাশ করে। অবশেষে ওরা পরজীবন অস্বীকার করত নিজেদের পার্থিব কামনা-বাসনাকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেয়। তখন এক দিক থেকে শয়তানের এ কথা সত্যে পরিণত হয়– لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (সাদ, রুকূ ৮২-৮৩) (মুখলেসদের ছাড়া আমি সকলকে বিভ্রান্ত করেই ছাড়ব) –অন্য দিকে আল্লাহ তাআলার এ বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়ে যায়– لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (আমি তোর দ্বারা এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা দোযখকে ভরে দেব)। (বর্তমান আয়াতে لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে)

আল্লাহ তাআলার জানা আছে যে, ওরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা ও নির্ভয়তার কারণে শয়তানের প্ররোচনায় ফেঁসে যাবে এবং আল্লাহর আযাবের যোগ্য হবে। সুতরাং এমন ব্যক্তিদের সুপথে আসার ও হেদায়াত গ্রহণ করার কী আশা হতে পারে?

অতএব সতর্কীকরণ ও সংশোধনের পথে এবং দাওয়াত-তাবলীগের কাজে আপনাকে যদি এহেন দুরাচারীদের সম্মুখীন হতে হয়, তবে বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হবেন না। আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন এবং ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবেন।

সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত

আলোচ্য আয়াত ও তার পূর্ণ ব্যাখ্যা বোঝার জন্য নিচের আয়াতগুলি দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে।

(ক)

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

('যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে, আমি তার জন্য নিযুক্ত করি এক শয়তান, অনন্তর সে হয় তার সাথী। আর শয়তানরা এদের সৎপথ থেকে বাধা দিয়ে রাখে, অথচ এরা মনে করতে থাকে, তারা তো সৎপথে আছে।'(যুখরুফ, আয়াত ৩৬-৩৭)

বোঝা গেল, শয়তানকে শুরুতেই কারো উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয় না। বরং নিজে অন্ধ হয়ে নসীহত থেকে বিমুখ থাকার পরিণামে শয়তান তার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে। যেমন হাত-পা দ্বারা দীর্ঘকাল যাবৎ কাজ না নিলে তা বেকার হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন- فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ('এরপর ওরা যখন ফিরে গেল, তখন আল্লাহও ওদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিলেন।' –সফ, আয়াত ৩৫) আরো ইরশাদ হচ্ছে– وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ('আর আমি ওদের অন্তর ও চোখ উল্টিয়ে দেব, কেননা ওরা প্রথমবার নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান আনেনি। আর আমি ওদেরকে স্বীয় অবাধ্যতার মধ্যে বিভ্রান্ত অবস্থায় ফেলে রাখব।' –আনআম, আয়াত ১১১)

(খ) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ الخ

('আমি ওদের পিছনে (কিছু) সহচর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, ফলে তারা ওদের সামনে ও পিছনে যা (মন্দ আমলাদি) আছে, ওদের দৃষ্টিতে তা শোভনীয় করে দিয়েছিল; আর এভাবে ওদের ব্যাপারেও শাস্তির কথা অবধারিত হয়ে গেছে অন্যান্য দলের সাথে –হা-মীম আস-সাজ্‌দা, আয়াত ২৫।')

কর্তৃত্ব লাভ করার পর শয়তান এ কাজ (সুন্দর করে দেখানোর কাজ) করে, যার ফল দাঁড়ায়– وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ

(গ)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ

('আর যে ব্যক্তি তার মাতাপিতাকে বলল, 'আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তোমরা আমাকে এই ওয়াদা দিচ্ছ যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করা হবে, অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়েছে?' আর তখন তারা উভয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে (এবং ওকে বলে,) 'দুর্ভোগ তোর! তুই ঈমান গ্রহণ কর, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।' তখন সে বলে, এসব পূর্ববর্তীদের বানোয়াট কথা! এরাই এমন লোক, যাদের ব্যাপারে (আযাবের) কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এরা সেসব জিন ও মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, যারা এদের পূর্বে গত হয়েছে।' –আহকাফ, আয়াত ১৭-১৮)

এই দুরাচারীরাই حَقَّ الْقَوْلُ عَلَيْهِم-এর উপযুক্ত–

এসব আয়াত থেকে বোঝা গেল, حق القول বিষয়টি সেই ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই কার্যকর হয়, যারা মৃত্যুর পর কোন দ্বিতীয় জীবনের বিশ্বাসই রাখে না, মন্দকে মন্দ বলে জানে না, বরং শয়তানের প্ররোচনায় নিজের পাপসমূহকে পুণ্য এবং গোমরাহীকে হেদায়াত জ্ঞান করে। যতই যুক্তিসঙ্গত প্রমাণাদি শোনানো হোক এবং সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দেখানো হোক– ওরা সব কিছুকে মিথ্যা বলতে থাকে এবং নিরর্থক বিতর্ক করতে থাকে। হেদায়াতকারী ও পয়গম্বরদের কথার প্রতি বাহ্যত কান পাতে, কিন্তু একটি অক্ষরও বোঝার চেষ্টা করে না। একমাত্র কু-প্রবৃত্তিকেই নিজেদের উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চোখ– কোনটার দ্বারাই কাজ নেয় না।

এরাই তারা, যাদের সত্যবিমুখতা ও অবাধ্যতার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা ওদের দিল মোহর করে দেন। অতঃপর তাতে আর কোনো কল্যাণবাণী প্রবেশ করার কোন অবকাশ থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তি নিজের কাছে আলো প্রবেশের সকল দরজা বন্ধ করে দিলে আল্লাহ তাআলা তাকে অন্ধকারে পতিত করেন। অথবা রোগী যদি ওষুধ সেবন না করার কসম করে বসে, চিকিৎসকের সঙ্গে শত্রুতা করে এবং সব রকমের অনিয়ম করে ও কুপথ্য খেতে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তার ব্যাধিকে ধ্বংসকর করে দেন এবং তার সুস্থতার কোনই আশা অবশিষ্ট থাকে না।

আরো কতিপয় আয়াত

আল্লাহ তাআলা বলেন-

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

('এগুলো হচ্ছে সেই সব জনপদ, যার কিছু হাল-অবস্থা আমি আপনাকে শোনাই। আর নিশ্চয় ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ওরা কখনই ঈমান গ্রহণ করার ছিল না ঐ বিষয়ের প্রতি, যে বিষয়কে ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে ফেলেছিল। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তর মোহর করে দেন।' –আ'রাফ, আয়াত ১০১)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ

('অতঃপর আমি নূহের পরে কত পয়গম্বর তাঁদের কওমের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। অনন্তর তাঁরা ওদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এনেছিলেন, কিন্তু ওরা ইতিপূর্বে যাকে মিথ্যা বলেছিল, সেই বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার ছিল না। এভাবেই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর মোহর করে দেনই।' –ইউনুস, আয়াত ৭৪)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

('আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু আপনি যদি ওদের নিকট কোনো নিদর্শন নিয়ে আসেন, তবে অবশ্যই কাফেররা বলবে, 'তোমরা সকলে মিথ্যা রচনা কর। এভাবে আল্লাহ যারা জ্ঞান রাখে না তাদের হৃদয় মোহর করে দেন। অতএব আপনি অবিচল থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।' –রূম, আয়াত ৫৮-৬০)

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ، الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

('এভাবেই আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহপোষণকারী ব্যক্তিকে– যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক করে, ওদের নিকট আগত কোনো সনদ ছাড়াই। ওদের এ বিতর্ক আল্লাহ ও ঈমানদারদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, অবাধ্য ব্যক্তির অন্তর মোহর করে দেন।' –মুমিন, আয়াত ৩৪-৩৫)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

('ওদের মধ্যে কতক এমন, যারা আপনার দিকে কান পাতে (এবং আপনার কথা শোনে)। অবশেষে যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন ওরা যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের বলে, 'এ ব্যক্তি এইমাত্র কী বললেন?' এরাই এমন লোক, যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন।' –মুহাম্মদ, আয়াত ১৬)

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

('বরং আল্লাহ ওদের কুফরীর কারণে ওদের অন্তর মোহর করে দিয়েছেন। অতএব ওরা ঈমান আনে না, অল্প সংখ্যক ছাড়া।' –নিসা, আয়াত ১৫৫)

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

('কখনই (এমন) নয়, বরং ওদের কৃতকর্মই ওদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।' –মুতাফফিনীন, আয়াত ১৪)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ

('আচ্ছা, আপনি ওকে দেখেছেন কি, যে নিজ প্রবৃত্তিকে স্বীয় প্রভু বানিয়ে নিয়েছে, ফলে আল্লাহ ওকে পথভ্রষ্ট করেছেন জেনেশুনে, আর ওর কান ও অন্তর মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের উপর আবরণ রেখে দিয়েছেন? অতএব আল্লাহর পর কে ওকে সৎপথে আনবে?' –জাছিয়া, আয়াত ২৩)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

('আমি তো জাহান্নামের জন্য বহু সংখ্যক জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি। ওদের অন্তর আছে যার দ্বারা ওরা বোঝে না, চোখ আছে যার দ্বারা ওরা দেখে না এবং কান আছে যার দ্বারা ওরা

৮. আমি ওদের গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, আর সেগুলো (ওদের) চিবুক পর্যন্ত। ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে[১]।

اِنَّا جَعَلۡنَا فِیۡۤ اَعۡنَاقِهِمۡ اَغۡلٰلًا فَهِیَ اِلَی الۡاَذۡقَانِ فَهُمۡ مُّقۡمَحُوۡنَ ۝۸

৯. আমি ওদের সামনেও প্রাচীর (প্রতিবন্ধক) ও পিছনেও প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং ওদের ঢেকে দিয়েছি। ফলে ওরা (কিছুই) দেখতে পায় না[২]।

وَجَعَلۡنَا مِنۡۢ بَیۡنِ اَیۡدِیۡهِمۡ سَدًّا وَّمِنۡ خَلۡفِهِمۡ سَدًّا فَاَغۡشَیۡنٰهُمۡ فَهُمۡ لَا یُبۡصِرُوۡنَ ۝۹

শোনে না। ওরা চতুষ্পদ পশুর মত, বরং তাদের চেয়েও বেশি বিপথগামী। ওরাই গাফেল।' –আ'রাফ, আয়াত ১৭৯)

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هٰذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ

('ওরা (আল্লাহর) কথাকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে। ওরা বলে, 'যদি তোমাদের এই নির্দেশ প্রদান করা হয় তবে গ্রহণ করো, আর যদি এই নির্দেশ না দেওয়া হয় তবে বিরত থেকো। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে কিছুই করতে পারবেন না। ওরাই সেই লোক, যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।' –মায়েদা, আয়াত ৪১)

(যা হোক, উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে দুরাচারীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং যারা স্বীয় পাপাচার-অনাচার দ্বারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছে– তাদেরই ব্যাপারে বর্তমান আয়াতে বলা হয়েছে– ... لقد حق القول على أكثرهم)

১. এখানে সেসব লোকের কথাই বলা হয়েছে, যাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ পূর্বের টীকায় (সবিস্তার) উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত, এ ছিল কুঅভ্যাস, কুসংস্কার, ধনলিপ্সা, খ্যাতিলিপ্সা এবং পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের বেড়ি, যা তাদের উপর কঠিনভাবে চেপে বসেছিল, এসব থেকে তারা কিছুতেই মুক্ত হতে পারত না। তাছাড়া গর্ব ও অহংকারের কারণে তাদের মাথা উঁচু হয়ে থাকত, হক কথার সামনেও তারা মাথা নত করত না।

২. নবীর শত্রুতা ওদের জন্য হেদায়াত গ্রহণের পথে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, এই শত্রুতা ওদেরকে কিছুতেই সত্য গ্রহণ করতে দিত না। উপরন্তু মূর্খতাপূর্ণ রীতি-নীতি, পথ-পদ্ধতি, বাতিল কামনা-বাসনা ও ধ্যান-ধারণার তিমির অন্ধকারে ওরা এভাবে আবদ্ধ ছিল যে, সম্মুখ-পশ্চাৎ ও উঁচু-নীচু কিছুই ওদের নজরে আসত না। অতীত-ভবিষ্যৎ কোনটার প্রতিই ওদের দৃষ্টি ছিল না। না ছিল ভাল-মন্দের বাছ-বিচার।

উল্লেখ্য, (এসব হচ্ছে কাফেরদের কার্যকলাপ, তাদের অনাচার-দুরাচার। কিন্তু) এ কর্ম-কাণ্ডকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে (جعلنا اغلالًا ... جعلنا سدًّا ... فاَغْشَيْنا ... –)!

১০. আর আপনি ওদের সতর্ক করেন বা না করেন, উভয়ই ওদের জন্য সমান। ওরা ঈমান আনবে না[১]।

وَسَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝

১১. আপনি তো কেবল তাকে সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখেও ভয় করে। সুতরাং তাকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদানের[২]।

اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَخَشِیَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَيۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَةٍ وَّاَجۡرٍ كَرِيۡمٍ ۝

১২. নিশ্চয় আমিই মৃতদের জীবিত করব[৩]। আর আমি লিখে রাখি- যা কিছু (আমল) তারা

اِنَّا نَحۡنُ نُحۡیِ الۡمَوۡتٰی وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا

এর তাৎপর্য এই যে, সকল ভাল ও মন্দের স্রষ্টা তিনিই এবং কারণ ও হেতুর উপর ফলাফল তাঁরই ইচ্ছায় আবর্তিত হয়ে থাকে।

ইমাম রাযী (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, বিশ্ব জগতে বিরাজমান নিদর্শনাদি নিয়ে ওরা চিন্তা-ভাবনা করে না। যেমন فهم مقمحون আয়াতাংশে এই ইশারা আছে যে, ওরা স্বয়ং ওদের সত্তায় বিদ্যমান নিদর্শনাদির প্রতি লক্ষ করে না। কেননা, মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে রাখলে, নত না করলে নিজ দেহের দিকে দৃষ্টি দিবে কী করে?

১. ওদের জন্য উভয়ই সমান, কিন্তু আপনার জন্য সমান নয়; বরং এমন কঠোর শত্রু ও অবাধ্য জাতিকে নসীহত করা এবং সংশোধনের জন্য সচেষ্ট থাকা মহামর্যাদা লাভের কারণ। আর এই আদর্শ অনেক সময় অন্যদের হেদায়েতের কারণ হয়ে যায়।

এ ধরনেরই আয়াত সূরা বাকারার প্রথম দিকে (আয়াত : ৬) গত হয়েছে। (তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

২. অর্থাৎ সতর্ক করার উপকার তার ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়, যে উপদেশ মত চলে এবং অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় রাখে। যার অন্তরে আল্লাহর ভয়ই নেই এবং নসীহতেরও কোন পরোয়া নেই, সে নবীর সতর্কীকরণ ও উপদেশ দানের দ্বারা কতটুকু উপকৃত হবে? এমন লোকেরা আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও সম্মান লাভের পরিবর্তে শাস্তি ও লাঞ্ছনার উপযুক্ত হবে।

সামনের আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সম্মান বা লাঞ্ছনার পরিপূর্ণ প্রকাশ (এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ) জীবনের দ্বিতীয় পর্বে হবে, যার সূচনা মৃত্যুর পর থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সুনিশ্চিত, যেখানে সকলে নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করবে।

আর সম্ভবত আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই আরব জাতি- যাদের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ সম্পূর্ণ মরে গেছে- এদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কুদরতে পুনরায় জীবনীশক্তি

অগ্রীম প্রেরণ করে এবং তাদের রেখে যাওয়া নিদর্শনাদিও*১। আমি তো সকল বিষয় এক প্রকাশ্য কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি২।

وَاٰثَارَهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

[রুকূ - ২]

১৩. আপনি তাদের জন্য বর্ণনা করুন এক জনপদবাসীর দৃষ্টান্ত৩– যখন সেখানে প্রেরিতগণ (বা : রাসূলগণ) আগমন করলেন৪,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝

সঞ্চারিত হবে, যাতে তারা দুনিয়ায় বড় বড় কীর্তি সাধন করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মহান উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারে।

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'এবং নিজেদের পশ্চাতে রেখে যাওয়া আমলসমূহ।'

১. অর্থাৎ যেসব নেক বা বদ আমল অগ্রীম পাঠিয়েছে, তা লিখে রাখি। এবং বিভিন্ন আমলের ভাল-মন্দ পরিণাম বা নিদর্শন যা পিছনে রেখে যায়– যথা, কোন কিতাব লিখল অথবা ইলম শিক্ষাদান করল, কিংবা (কল্যাণকর কাজে) ইমারত নির্মাণ করল, অথবা নেক বা বদ প্রথা চালু করল– সবই آثارهم এর অন্তর্ভুক্ত। বরং এ শব্দাবলির ব্যাপকতায় সেই পদচিহ্নও শামিল হতে পারে, যা কোন ইবাদতের উদ্দেশ্যে চলার সময় মাটিতে পড়ে। যেমনঃ কোন কোন সহীহ হাদীছে (মুসলিম : ৬৬৫) রয়েছে, ديارکم تكتب آثارکم (তোমাদের বাড়িঘর (মসজিদের কাছে) স্থানান্তর করো না, তোমাদের পদচিহ্ন লিখে রাখা হয়। (অতএব মসজিদ থেকে বাড়ি যত দূরে হবে, পদচিহ্ন ও ছওয়াব তত বেশি হবে।)

২. অর্থাৎ সকল আমল ও তার ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পর তো নিয়মানুযায়ী লেখা হয়ই, ঘটার পূর্বেও প্রত্যেকটি বিষয় 'লওহে মাহফূজে' লিখিত রয়েছে। আর এ লেখাও নিতান্ত ব্যবস্থাপনাগত নিয়মের কারণে এবং বিবিধ কল্যাণ বিবেচনায়। নতুবা আল্লাহ তাআলার অনাদি ইলমে সকল ছোট-বড় বিষয় পূর্ব থেকেই বর্তমান রয়েছে। এ অনুসারেই তা লওহে মাহফূজে নকল করা হয়েছে।

৩. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই জনপদ বলতে 'আনতাকিয়া' (এন্টিয়ক) শহর উদ্দেশ্য। আর বাইবেলের 'প্রেরিত' পুস্তকের ৮ম ও ১১তম পরিচ্ছেদে 'আনতাকিয়া' নগরীর এরূপ একটি কাহিনী একটু পার্থক্যের সাথে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এবং আলোচ্য আয়াতগুলির পূর্বাপরের বিবেচনায় ইমাম ইবনে কাছীর (র) এ মতের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথা সঠিক হলে অন্য কোন জনপদ উদ্দেশ্য হবে। (والله أعلم) —এই কাহিনীর মধ্যে রয়েছে মুমিনদের জন্য সুসংবাদ এবং কাফেরদের জন্য শিক্ষার বিষয়।

৪. এঁদের নাম সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না। এও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, তাঁরা সরাসরি আল্লাহ তাআলার প্রেরিত পয়গম্বর ছিলেন, না কোন পয়গম্বরের মাধ্যমে তাদের উক্ত লোকালয়ে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উভয় সম্ভাবনা থাকলেও পয়গম্বর হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। সম্ভবত তাঁরা হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামের পূর্বে প্রেরিত হয়ে থাকবেন।

১৪. যখন আমি ওদের নিকট দুই ব্যক্তিকে পাঠালাম। কিন্তু ওরা তাদের অস্বীকার করল। অতঃপর আমি তৃতীয় জনের দ্বারা (তাদের) শক্তিশালী করলাম আর তারা বললেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি[১]।'

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

১৫. ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ এবং দয়াময় (আল্লাহ) কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা শুধুই মিথ্যা বলছ[২]।'

قَالُوا مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তাঁরা বললেন, 'আমাদের রব জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি[৩]।

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

১৭. 'আর আমাদের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া[৪]।'

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৮. ওরা বলল, 'আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের প্রস্তরাঘাতে

قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم

---

১. অর্থাৎ প্রথমে দুজন গেলেন। অতঃপর তাঁদের সাহায্যার্থে তৃতীয়জন প্রেরিত হলেন। তিনজনে সম্মিলিতভাবে বললেন, 'আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আসিনি, আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং আমরা যা কিছু বলব, তাঁরই পয়গাম মনে করবে।'

২. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নেই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরই প্রেরণ করবেন। বলো তো, তোমরা কোন্ বিষয়ে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী? যা হোক, অযথা আল্লাহর নাম নিয়ো না, তিনি কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তিনজনে ষড়যন্ত্র করে একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে এনেছ এবং তা খোদার নামে চালিয়ে দিচ্ছ।

৩. অর্থাৎ আমরা যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে থাকি, তবে তা তিনি দেখছেন। তিনি কি দেখেও অবিরত মিথ্যাবাদীদের সমর্থন করতে থাকবেন? এমন হতেই পারে না। সুতরাং তোমরা বুঝ আর নাই বুঝ, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় জানেন, আমরা নিজেদের দাবিতে সত্যবাদি এবং একটি কথাও নিজেদের পক্ষ থেকে বলছি না। এ জন্যই কার্যত তিনি আমাদের সমর্থন করছেন।

৪. অর্থাৎ আমরা নিজেদের কর্তব্য পালন করেছি– আল্লাহর পয়গাম খুব সুস্পষ্ট, সুসংগত ও হৃদয়গ্রাহী উপায়ে তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি। দলিল-প্রমাণসহ সত্য পৌঁছানোর পর এখন নিজেরা চিন্তা করে নাও যে, অস্বীকার ও শত্রুতার পরিণাম কী হওয়া উচিত?

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝

হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবে যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।'

قَالُوۡا طَآئِرُكُمۡ مَّعَكُمۡ اَئِنۡ ذُكِّرۡتُمۡ ؕ بَلۡ اَنۡتُمۡ قَوۡمٌ مُّسۡرِفُوۡنَ ۝

১৯. তাঁরা বললেন, 'তোমাদের অমঙ্গলের কারণ তোমাদেরই সাথে রয়েছে। তোমাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে বলেই (তোমরা আমাদের এসব বলছ)? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়[২]।'

وَجَآءَ مِنۡ اَقۡصَا الۡمَدِيۡنَةِ رَجُلٌ يَّسۡعٰى قَالَ يٰقَوۡمِ اتَّبِعُوا الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۝

২০. আর শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল[৩]। সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা প্রেরিতগণের (বা: রাসূলদের) অনুসরণ কর।

---

১. সম্ভবত প্রেরিতগণকে (বা : রাসূলগণকে) অস্বীকার এবং কুফর ও অবাধ্যতার কারণে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদ এসেছিল। তাই এ কথা (تطيرنا بكم...) বলেছে। অথবা তাঁরা বোঝালে ওদের পরস্পরে মতভেদ হল– কেউ মানল, কেউ মানল না। একেই ওরা অমঙ্গল বলল। অর্থাৎ, তোমাদের অশুভ পদার্পণে আমাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও মতানৈক্যের বিপদ আপতিত হয়েছে। এসব অমঙ্গল তোমাদের কারণেই। নতুবা ইতিপূর্বে আমরা বেশ আরাম-আয়েশ ও শান্তির জীবন যাপন করছিলাম। তোমরা তোমাদের ওয়াজ-নসীহত থেকে আমাদের মুক্তি দাও। যদি এ তরীকা পরিত্যাগ না কর এবং ওয়াজ-নসীহত থেকে বিরত না হও, তবে আমরা কঠিন কষ্ট ও আযাব দিয়ে এবং পাথর ছুঁড়ে তোমাদের শেষ করে ফেলব।

২. অর্থাৎ (আমাদের কারণে নয়; বরং) তোমাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কুফলস্বরূপ আযাব এসেছে। যদি তোমরা সকলে সত্য ও সততাকে গ্রহণ করে নিতে, তবে তোমাদের মধ্যে এই অশুভ মতানৈক্যও পয়দা হত না, এরূপ বিপদাপদেও পড়তে না। সুতরাং অমঙ্গলের উপকরণ স্বয়ং তোমাদেরই মধ্যে বিদ্যমান। আমরা তোমাদের উত্তম নসীহত করেছি এবং ভালমন্দ বুঝিয়েছি বলেই কি নিজেদের অমঙ্গলের কারণ আমাদের উপর আরোপ করছ এবং আমাদের হত্যার হুমকী দিচ্ছ? আসল কথা হল, তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা ও মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছ। না বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাচ্ছ, না ভাল মানুষের মত কথা বলছ!

৩. কথিত আছে, এই পুণ্যবান ব্যক্তির নাম ছিল হাবীব। তিনি শহরের দূরবর্তী প্রান্তে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

স্বভাবজাত ধার্মিকতা ও দীন-প্রিয়তা তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেয়নি। ঘটনা শুনেই প্রেরিতগণের সমর্থন ও সহযোগিতা এবং অস্বীকারকারীদের নসীহত ও উপদেশের উদ্দেশ্যে তিনি ছুটে আসেন, খোদা না করুন– হতভাগারা নিজেদের হুমকি-ধমকি কার্যকর করে ফেলে কিনা! এ থেকে বোঝা যায়, সেই প্রেরিতগণের আওয়াজ শহরের দূর-দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

২১. 'অনুসরণ কর তাঁদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এবং যারা সঠিক পথে রয়েছেন[১]।

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝

পারা - ২৩

২২. আর আমার কাছে কী কারণ আছে যে, আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তাঁরই কাছে তোমরা (সকলে) প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]?

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৩. 'আমি কি তাঁর পরিবর্তে এমনসব উপাস্য গ্রহণ করব, যাদের সুপারিশ আমার কোনো উপকারে আসবে না যদি দয়াময় (আল্লাহ) আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান এবং তখন তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না?

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۝

২৪. 'এমন করলে নিশ্চয় আমি স্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হব[৪]।

اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

২৫. 'আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। সুতরাং আমার কথা শোন[৫]।'

اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۝

---

১. অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত, তাঁরা তাঁরই পয়গাম নিয়ে এসেছেন। তাঁরা অন্যদের যে নসীহত করছেন, স্বয়ং তাঁরা তা পালন করছেন। তাঁদের আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম, স্বভাব-চরিত্র, চালচলন সবই ঠিক আছে। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে (তোমাদের) উপকার করছেন, কোন বিনিময় তোমাদের নিকট চান না। তা সত্ত্বেও এমন নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যাত্মাদের আনুগত্য তোমরা করবে না? এবং তাঁদের মারফত আল্লাহ তাআলা যে পয়গাম পাঠিয়েছেন, তা কবুল করবে না?

২. নিজেকে সম্বোধন করে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তোমাদের কী হল যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর বন্দাত্ব গ্রহণ করছ না?

৩. অর্থাৎ এমন ভেবো না যে, সৃষ্টি করে তিনি তোমাদের স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক রয়নি। না, মৃত্যুর পর সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাই সে সময়কার চিন্তা কর– তখন কী হবে!

৪. অর্থাৎ এটা কত সুস্পষ্ট গোমরাহী যে, এই মেহেরবান ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালককে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করা হবে, যারা আল্লাহপ্রদত্ত কোন কষ্ট থেকে আমাদেরকে নিজেরাও বাঁচাতে পারবে না, সুপারিশ করেও মুক্তি দেওয়াতে পারবে না।

৫. অর্থাৎ তোমাদের সমাবেশে বিনাদ্বিধায় ঘোষণা করছি যে, আমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। এটি সবাই শুনে রাখ।

২৬. (তাকে) বলা হল, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর[১]।' সে বলল, 'হায়! (কত ভল হত), যদি আমার সম্প্রদায় জানত–

قِيۡلَ ادۡخُلِ الۡجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيۡتَ قَوۡمِيۡ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۶﴾

২৭. 'যে, আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন সম্মানিত ব্যক্তিদের[২]।'

بِمَا غَفَرَ لِيۡ رَبِّيۡ وَجَعَلَنِيۡ مِنَ الۡمُكۡرَمِيۡنَ ﴿۲۷﴾

২৮. আমি তার পরে তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি, আর আমি (বাহিনী) অবতীর্ণ করিও না।

وَمَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلٰى قَوۡمِهٖ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ جُنۡدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنۡزِلِيۡنَ ﴿۲۸﴾

২৯. তা ছিল একটি বিকট আওয়াজমাত্র। ফলে তখনই ওরা নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল[৩]।

اِنۡ كَانَتۡ اِلَّا صَيۡحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمۡ خٰمِدُوۡنَ ﴿۲۹﴾

৩০. হায় আফসোস বান্দাদের প্রতি! ওদের নিকট যে রাসূলই আসতেন, তাঁকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ ۚ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۰﴾

এ কথা সেই প্রেরিতগণকে সম্ভবত এজন্য শুনিয়েছে, যাতে তাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট এ ব্যক্তির ঈমান বিষয়ে সাক্ষী হন। আর সম্প্রদায়কে এজন্য শুনিয়েছে, যাতে শুনে কিছুটা প্রভাবিত হয়, অথবা কমপক্ষে দুনিয়ায় একজন মুমিনের ঈমানী শক্তি প্রত্যক্ষ করে নেয়।

১. অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি মিলে গেল। কথিত আছে, স্বজাতি তাকে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে ফেলে। একদিকে শাহাদত সংঘটিত হল, অন্যদিকে আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ এল– অবিলম্বে বেহেশতে প্রবেশ কর। শহীদদের রূহ রোজ হাশরের পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করে বলে হাদীসে উল্লেখ আছে। (মুসলিম, ১৮৮৭)

২. জাতি শত্রুতা করে তাকে মেরেই ফেলল, অথচ বেহেশতে পৌঁছেও তার অন্তরে স্বজাতির প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। আক্ষেপ করে বলতে থাকে, আহা! তারা যদি আমার অবস্থা এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে ইজ্জত ও নে'য়ামত দান করেছেন তা জানতে পারত, তবে সকলেই ঈমান গ্রহণ করত।

৩. অর্থাৎ তার পর তার জাতিকে কুফর, জুলুম ও প্রেরিত ব্যক্তিগণকে অস্বীকার করার শাস্তিস্বরূপ ধ্বংস করা হয়। তবে এই ধ্বংসসাধনের জন্য আকাশ থেকে ফেরেশতা বাহিনী পাঠানোর মত কোন বড়সড় ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়েনি। বিভিন্ন জাতির ধ্বংসসাধনের জন্য বড় বড় বাহিনী প্রেরণের সাধারণ নিয়মও আল্লাহ তাআলার নেই। (কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কল্যাণ বিবেচনায় ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করা ভিন্ন কথা।) বড় বড় বিরুদ্ধবাদীদের ঠাণ্ডা করার জন্য একটিমাত্র গর্জন-ই যথেষ্ট। আলোচিত ব্যক্তির জাতির অবস্থাও এই হল যে, ফেরেশতাদের একটিমাত্র চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সকলে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

৩১. ওরা কি দেখে না, আমি ওদের আগে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি যে, তারা ওদের নিকট আর ফিরে আসছে না[১]?

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ۝

৩২. আর ওদের সকলকে অবশ্যই একত্র করে আমার কাছে উপস্থিত করা হবে[২]।

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ۝

[রুকূ - ৩]

৩৩. তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত ভূমি। তা আমি জীবিত করেছি এবং তা থেকে উৎপন্ন করেছি শস্য। এ থেকেই তারা আহার করে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ۝

৩৪. আর ভূমিতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি এবং তাতে প্রবাহিত করেছি ঝরনামালা–

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ۝

৩৫. যাতে তারা তার (অর্থাৎ বাগানের) ফলমূল থেকে আহার করতে পারে[৩]। আর তাদের

لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ

---

১. অর্থাৎ ওরা দেখে ও শোনে যে, দুনিয়াতে অনেক অনেক জাতি পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ধ্বংস হয়েছে, যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। আর এদের মধ্য থেকে কেউ-ই পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেনি, বরং আযাবের জাঁতাকলে সকলেই পিষ্ট হয়ে নাশ হয়ে গেছে। এতেও শিক্ষা হয় না- বরং যখনই কোন নতুন রাসূলের আগমন হয়, যথারীতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে, যা ছিল ইতিপূর্বের কাফেরদের অভ্যাস। আজো সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কার কাফেরদের সেই একই আচরণ।

২. অর্থাৎ তা তো ছিল দুনিয়ার আযাব, আর আখেরাতের শাস্তি বাকি আছেই। এমন ভেবো না যে, ধ্বংস হওয়ার পর দুনিয়ায় ফিরে আসে না বলে ব্যাপার শেষ হয়ে গেল। না, সকলকে আবার একদিন আল্লাহর দরবারে হাযির হতে হবে, যেখানে সকল অপরাধী ধৃত হয়ে আসবে, এর কোন অন্যথা হবে না।

৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় জীবিত হবে এবং জীবিত হওয়ার পর আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে– এ বিষয়ে সন্দেহ হতে পারত বলে একটি উদাহরণের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। যমীন শুষ্ক ও মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, তারপর আল্লাহ তাকে এমনভাবে জীবিত করে তোলেন যে, দেখতে দেখতে তা তরু-তাজা হয়ে শ্যামলিমায় ভরে ওঠে। বিভিন্ন বাগ-বাগিচা, শস্য-ফসল ও ফলমূল তা থেকে উৎপন্ন হয়, যা তোমরা উপভোগ কর। ঠিক এভাবে বুঝে নাও যে, মৃত দেহের মধ্যে জীবাত্মা ফুঁকে দেওয়া হবে।

وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

হাত এসব সৃষ্টি করেনি। এর পরও কি তারা শোকর করবে না[১]?

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সকল জোড়া সৃষ্টি করেছেন– যা কিছু ভূমিতে উৎপন্ন হয় তার মধ্যে, স্বয়ং তাদের (মানুষের) মধ্যে এবং সেসব বস্তুর মধ্যে যা সম্পর্কে তারা জানে না[২]।

যা হোক, মৃত যমীন তাদের জন্য একটি নিদর্শন– যার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন ও আল্লাহ তাআলার একত্ব, মহত্ত্ব ও তাঁর অনুগ্রহসংক্রান্ত বিষয়াবলি উত্তমরূপে বুঝতে পারবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

পূর্বের আয়াতগুলিতে ভীতি প্রদর্শনের দিকটা সুস্পষ্ট, যাতে আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয়ে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করে। আর বর্তমান আয়াতগুলিতে উৎসাহ দানের দিক প্রকাশ পাচ্ছে, যেন আল্লাহ তাআলার নে'য়ামতকে উপলব্ধি করত শোকরগোযারীর দিকে ধাবিত হয়। সেই সঙ্গে এও বোঝে যে, যে আল্লাহ মৃত যমীনকে জীবিত করে থাকেন, সেই আল্লাহর পক্ষে একটি মৃত জাতিকে ঈমানী শক্তি দিয়ে জীবিত করে দেওয়া মুশকিল হবে কেন?

১. অর্থাৎ এ ফল-ফলাদি আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা পয়দা হয়। তাদের হাতে এই শক্তিও নেই যে, একটি আঙ্গুর বা খেজুরের দানা সৃষ্টি করবে। যে পরিশ্রম ও সাধনা বাগানে ও তার পরিচর্যায় করা হয়, তা ফলপ্রসূ করাও একমাত্র আল্লাহর হাতে রয়েছে। আর গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, যে কাজ বাহ্যত হাতে হয়, তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ তাআলারই দেওয়া শক্তি-সামর্থ্যে এবং তাঁরই এরাদায় হয়। অতএব সবদিক দিয়েই তাঁর শোকর আদায় ও অনুগ্রহ স্বীকার করা অত্যাবশ্যক হল।

বি. দ্র. বিজ্ঞ অনুবাদক (র) وما عملته এর ما কে না-বাচক ধরেছেন এবং এটিই অধিকাংশ পরবর্তী তফসীরকারের অভিমত। কিন্তু পূর্ববর্তীগণ সাধারণত ما কে موصولة (বা সংযোগবাচক বলে) ধরেছেন বলে বর্ণিত আছে এবং ইবনে মাসউদ (রা.)এর কেরাত– ومما عملته أيديهم এরই সমর্থন করে।

২. অর্থাৎ তিনি জোড়া সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদের মধ্যে, মনুষ্য জাতির মধ্যে এবং অপরাপর এমন সৃষ্টিসমূহের মধ্যে, যাদের সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানও তাদের নেই। এই জোড়া-জোড়া সৃষ্টি হতে পারে বৈপরীত্যের দিক থেকে, যথা পুরুষ-নারী, নর-মাদী, তিতা-মিঠা, সাদা-কালো, দিন-রাত, আলো-আঁধার। অথবা সমতুল্যতা ও সাদৃশ্যের দিক থেকে, যথা- একই রং ও স্বাদের ফল এবং একই আকৃতির দুই জন্তু।

যা হোক, সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন কোন সৃষ্টি নেই, যার সদৃশ বা বিসদৃশ (বিপরীত) জোড়া নেই। একমাত্র আল্লাহরই সত্তা এমন, যাঁর কোন জোড়া নেই, না সদৃশ, না বিসদৃশ। কারণ,

৩৭. তাদের জন্য আরো একটি নিদর্শন হল রাত। তা থেকে আমি দিনকে অপসারণ করি, আর তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়[১]।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ

৩৮. আর সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করে। এ হচ্ছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তার নির্ধারণ[২]।

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ

জোড়া– সদৃশ হোক বা বিসদৃশ– এমন বস্তুরই হতে পারে, যার কোন না কোন পর্যায়ের কোন সমকক্ষ আছে। অথচ স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন দিক দিয়েই সমকক্ষতা নেই।

১. سلخ হল কোন জন্তুর চামড়া এমনভাবে খসিয়ে নেওয়া, যাতে নীচের গোশত বের হয়ে পড়ে। ঠিক এভাবে যেন রাতের অন্ধকারের উপর দিনের আবরণ জড়িয়ে রয়েছে। যখন এই আলোর আবরণ উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন মানুষ অন্ধকারে পতিত হয়। অতঃপর পুনরায় সূর্য তার নির্ধারিত সময়ে উদিত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করে।

দিন-রাতের এই আবর্তনের উপর কিয়াস করে বুঝে নিন, ঠিক এভাবে আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগত ধ্বংস করে পুনরায় তাকে জীবিত করতে পারেন। আর নিঃসন্দেহে একমাত্র সেই আল্লাহই ইবাদতের যোগ্য, যাঁর হাতে এসব বিরাট পরিবর্তনের চাবিকাঠি রয়েছে, যেসবের দ্বারা আমরা নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকি। এমনিভাবে যেই একচ্ছত্র ক্ষমতাধারী সত্তা রাতকে দিনের দ্বারা পরিবর্তন করে থাকেন, তাঁর পক্ষে এটি কোন কষ্টকর ব্যাপার নয় যে, রেসালাতের সূর্য দ্বারা দুনিয়া থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূরীভূত করে দেবেন। তবে রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্যের উদয় ও অস্তের সুনির্ধারিত সময় রয়েছে। ঠিক তেমনি প্রত্যেক বিষয় যথাসময়ে হয়ে থাকে।

২. সূর্যের পরিক্রমণ ও গতিপথ সুনির্ধারিত, এই পথ ধরেই সে পরিভ্রমণ করছে– এক ইঞ্চি বা এক মিনিটও এদিক-সেদিক হতে পারে না। যে কাজে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাতে সে সদা নিরত রয়েছে, মুহূর্তের বিশ্রামও তার নেই। রাত-দিনে এবং বছরব্যাপী পরিভ্রমণে যে যে গন্তব্যস্থলে পৌছার নির্দেশ তার প্রতি আছে, সেখানে সে পৌছে। অতঃপর সেখান থেকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। কিয়ামতের নিকটমুহূর্ত পর্যন্ত সে এরূপ করতে থাকবে। অবশেষে এক সময় আসবে, যখন তার প্রতি নির্দেশ হবে– যেদিকে সে অস্তমিত হয়েছিল, সেদিক থেকে প্রত্যাবর্তন করতে (অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে উদিত হতে)। এটাই সেই সময়, যখন তওবার দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হবে, যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৩৬)

মোটকথা, সূর্যের উদয়-অস্তের এসব ব্যবস্থাপনা সেই সর্বময় ক্ষমতাধারী ও সর্বজ্ঞ সত্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, যাঁর ব্যবস্থপনাকে অন্য কেউ প্রতিহত করতে পারে না এবং যাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যাপারেও খুঁত ধরার অবকাশ নেই। স্বয়ং তিনি যখন ইচ্ছা করবেন এবং যেভাবে চাবেন, এই ব্যবস্থাপনাকে উলট-পালট করবেন। এতে কেউই বাধ সাধতে পারবে না।

৩৯. আর চাঁদের জন্যও আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। অবশেষে তা খেজুর গাছের পুরাতন ডালের ন্যায় হয়ে যায়[১]।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতও দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে[২]।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস রয়েছে, যার মধ্যে আরশের নীচে সূর্যের সেজদাবনত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। এস্থলে এর ব্যাপারে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। এ বিষয়ে আমার রচিত سجود الشمس নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

১. সূর্যের ন্যায় চাঁদ সর্বদা একরকম থাকে না, বরং প্রত্যহ বাড়ে-কমে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য ২৮টি মন্‌যিল নির্ধারিত করে দিয়েছেন– সেগুলো সে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাধীনে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করে।

৩৭নং আয়াতে রাত-দিনের বর্ণনা ছিল। অতঃপর সূর্যের উল্লেখ হয়েছে, যার দ্বারা বছর ও ঋতুর বিবিধ অবস্থা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এখন চাঁদের আলোচনা হচ্ছে, যার আবর্তনের সাথে চান্দ্রমাসগুলির অস্তিত্ব সম্পৃক্ত।

চাঁদ ও সূর্য মাসের শেষে যখন মিলিত হয়, তখন চন্দ্র একেবারে লুকিয়ে যায়। অতঃপর যখন চাঁদ সামনে অগ্রসর হয়, তখন দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে মনযিল অতিক্রম করত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চতুর্দশ রাত্রিতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। তারপর আবার কমতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে সেই প্রথম অবস্থায় উপনীত হয় এবং খেজুর বৃক্ষের পুরাতন ডালের ন্যায় (ডাল বলতে সেই ছোট ছোট ডাল উদ্দেশ্য, যার মাথায় খেজুর-কাঁদি ঝুলে থাকে) সরু, বাঁকা ও নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

২. সূর্যের রাজত্ব দিনের বেলায়, আর চাঁদের রাজত্ব রাতের বেলায়। চাঁদের আলোতে পৃথিবী যখন আলোকিত হয়, সূর্যের এই সাধ্য নেই যে, তখন এসে চাঁদকে পরাভূত করবে, অর্থাৎ দিন আগে বেড়ে রাতের কিছু অংশ গ্রাস করে নেবে অথবা দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই রাত এসে উপস্থিত হবে। যে অঞ্চলে, যে ঋতুতে রাত-দিনের যে পরিমাণ নির্ধারিত, তাতে চন্দ্র-সূর্যের পক্ষে এক মিনিট আগপাছ হওয়ার সাধ্য নেই। তদ্রূপ প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ আবর্তন-সীমার মধ্যে থেকে পরিক্রমণ করছে, তা থেকে এক তিল এদিক-সেদিক সরতে পারে না। এবং এরূপ বিদ্যুৎ গতি ও বিশাল অবয়ব সত্ত্বেও পরস্পরে সংঘর্ষ বাধে না, নির্ধারিত পরিমাণ থেকেও অগ্রগামী বা পশ্চাদগামী হতে পারে না।

এতে স্পষ্টত বোঝা যায়, এসব বিশাল জ্যোতিষ্কাবলি ও তাদের উপগ্রহগুলো এক সর্বশক্তিমান ও সীমাহীন কুদরতের মালিকের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার অধীনেই আপন আপন

৪১. তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

৪২. এবং আমি তাদের জন্য নৌকার ন্যায় এমনসব জিনিস সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে[১]।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদের ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন (কেউ) তাদের সাহায্যকারী হবে না এবং তাদের উদ্ধারও করা হবে না–

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ

৪৪. তবে (আমি তা করি না) আমার মেহেরবানীর ফলে এবং (তাদেরকে) কিছুকাল জীবনোপভোগের সুযোগ দেওয়ার জন্য[২]।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ

কাজ করে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যে মহান সত্তা রাত-দিনের ও চন্দ্র-সূর্যের এই মহাব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাতে ও পুনর্জীবন দানে কেন অক্ষম হবেন?

বি. দ্র. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) –لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ এ বাকপদ্ধতির তাৎপর্য বর্ণনা করত বলেন, চন্দ্র-সূর্য মাসের শেষে মিলিত হয় এবং এই মিলনকালে চন্দ্র সূর্যকে ধরে, সূর্য চন্দ্রকে ধরে না। এ জন্যই لا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس বলা হয়নি। والله أعلم

১. অর্থাৎ হযরত নূহ (আ)–এর আমলে যখন মহাপ্লাবন এল, তখন আদম (আ)–এর বংশধরকে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ) কর্তৃক নির্মিত বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়ে নিলেন। তা না হলে মানব-বীজই অবশিষ্ট থাকত না। অতঃপর সেই নৌকারই নিদর্শনরূপে অন্যান্য নৌকা ও জাহাজ সৃষ্টি করে দিলেন, যেগুলির উপর তোমরা চড়ে বেড়াচ্ছ। কিংবা (من مثله مايركبون– এর অর্থ এই যে,) নৌকাতুল্য অন্যান্য যানবাহন সৃষ্টি করলেন, যেগুলির উপর তোমরা আরোহণ করে থাক। যেমন উট, যাকে আরবের লোকেরা স্থলভাগের জাহাজ বলে থাকে।

২. অর্থাৎ হে মাটির পুতুল মানুষ! লক্ষ কর, কত বিপদসংকুল বিশাল সাগর নৌযানযোগে পাড়ি দিচ্ছ, যেখানে বড় বড় জাহাজও একটি খড়কুটার সমান নয়। আল্লাহ তখন ডুবিয়ে দিতে চাইলে কে রক্ষা করবে এবং কে-ই বা ডাকে সাড়া দেবে? এ তাঁরই মেহেরবানী ও হেকমত যে, এভাবে তিনি সকল জলযানকে ডুবিয়ে দেন না। কেননা, তাঁর রহমত ও হেকমতের দাবি এই যে, এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়ার চাকা চলতে থাকুক। তবে পরিতাপের বিষয়, বহু লোক এ নিদর্শনসমূহ বুঝতে চেষ্টা করে না, তাঁর নে'য়ামতসমূহের কদর করে না।

৪৫. আর যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা তা থেকে আত্মরক্ষা কর, যা আছে তোমাদের সম্মুখে এবং যা (রেখে যাও) তোমাদের পেছনে*, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়- (তখন ওরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

৪৬. আর ওদের নিকট ওদের রবের আয়াত-সমূহ থেকে যে আয়াতই আসে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[১]।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

৪৭. যখন ওদের বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর', তখন কাফেররা ঈমানদারদের বলে- 'আমরা কি সেই ব্যক্তিকে খাওয়াব, যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন[২]?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۖ

★ **দ্বিতীয় তরজমা-** '... তাকে ভয় কর যা আছে তোমাদের সম্মুখে এবং যা আছে তোমাদের পশ্চাতে (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের আযাব)'।

১. 'যা আছে সম্মুখে' অর্থাৎ প্রতিফল দিবস, আর 'যা রেখে যাও পিছনে' অর্থাৎ নিজেদের আমল-আচরণ। অর্থ হল- যখন বলা হয় যে, কিয়ামতের শাস্তি ও বদআমলের অকল্যাণ থেকে বাঁচার ফিকির কর, যাতে আল্লাহর রহমত তোমাদের উপর বর্ষিত হয়, তখন ওরা উপদেশের প্রতি মোটেই কান দেয় না, বরং আল্লাহর হুকুম-আহকাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২. অর্থাৎ অন্যান্য খোদায়ী নির্দেশ মানা তো দূরের কথা, ফকীর-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা -যা ওদের নিকটও ছওয়াবের কাজ- এই কাজটি যখন পয়গম্বর ও মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের করতে বলা হল, তখন চরম নীচু ও বিদ্রুপাত্মক ভাষায় তা অস্বীকার করে এবং বলে, যাদের স্বয়ং আল্লাহ তাআলা খেতে দেননি, আমরা তাদের খাওয়াব কেন? আমরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না। ওদের খাওয়ানোর ইচ্ছা যদি তাঁর থাকত, তবে তিনি ওদের গরীব ও অভাবী এবং আমাদের ধনী ও সম্পদশালী বানাতেন না।

লক্ষ কর, এহেন নির্বুদ্ধিতা ও নির্লজ্জতার কোন অর্থ আছে কি? আল্লাহ কাউকে কিছু দিতে চাইলে এর একমাত্র উপায় কি এটা যে, তিনি স্বয়ং বিনা মাধ্যমে তার হাতে রিযিক প্রদান করবেন? অন্যের মাধ্যমে দেওয়ানোই যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, তবে তোমরা কীভাবে বুঝে নিলে যে, আল্লাহ তাআলা ওদের খাদ্য দিতে চান না? এ তো তাঁর পরীক্ষা যে, গরীবদের সাহায্যের জন্য ধনীদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এদের মাধ্যমে রিযিক পৌছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই পরীক্ষায় যে অকৃতকার্য হয়, স্বীয় দুর্ভাগ্য ও দুষ্কৃতির জন্য তার কাঁদা উচিত।

তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ[১]।'

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۝

৪৮. ওরা বলে, 'এই ওয়াদা কবে (পূর্ণ) হবে? (বল), যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।'

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

৪৯. ওরা তো কেবল এক বিকট আওয়াজেরই প্রতীক্ষায় আছে, যা ওদের এ অবস্থায় পাকড়াও করবে যে, ওরা পরস্পরে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۝

৫০. তখন ওরা কোন ওসিয়ত করতেও সক্ষম হবে না এবং আপন পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না[৩]।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

বি. দ্র. কোন কোন সলফের উক্তি থেকে বোঝা যায়, আলোচ্য আয়াতগুলি কতক মুলহিদ-যিন্দীকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এমতাবস্থায় বলতে হবে– ওরা এ কথা শুধুই ঠাট্টাচ্ছলে বলেনি, বরং প্রকৃত অর্থেই বলেছে।

১. এই বাক্যটি যদি কাফেরদের উক্তির অংশ হয়, তবে অর্থ হবে– হে মুমিনদের দল! তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছ। কারণ, তোমরা এমন লোকদের পেট ভরতে চাও, আল্লাহ তাআলা যাদের পেট ভরতে চান না।

কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কাফেরদের সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, কী ধরনের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা তোমরা বলছ!

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র.) লেখেন, 'তাকদীরের বাহানা করে নেককাজ থেকে বিরত থাকা, আর দুনিয়ার মজা লুটতে দৌড়-ঝাঁপ করা অবশ্যই গোমরাহী।'

২. অর্থাৎ এই কিয়ামত ও আযাবের ধমকি-হুমকি কখন পূর্ণ হবে? যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে সত্বর পূর্ণ করে দেখিয়ে দাও।

৩. অর্থাৎ কিয়ামত এমন অতর্কিতে এসে পড়বে যে, ওরা তখন নিজেদের কাজকামে নিমজ্জিত থাকবে। যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁকা হবে, তখন সকলে জ্ঞান হারাবে এবং পরিশেষে মরে স্তূপীকৃত হবে। মরার পূর্বে কাউকে কিছু বলতে চাইলেও বলার সুযোগ পাবে না, আর যারা বাইরে ছিল তারা ঘরে ফেরার অবকাশ পাবে না।

[রুকূ - ৪]

৫১. এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, আর তখনই ওরা কবর থেকে (বের হয়ে) আপন রবের দিকে ছুটে চলবে[১]।	وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. ওরা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল[২]?' এ সেই বিষয়, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় (আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণ সত্য বলেছিলেন[৩]।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾
৫৩. তা হবে কেবল এক বিকট আওয়াজ, আর তখনই ওদের সকলকে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে[৪]।	إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. আজ কোন ব্যক্তির উপর সামান্য জুলুমও করা হবে না এবং তোমাদের তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে[৫]।	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾

১. অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে, অমনি সকলে জীবিত হয়ে নিজ নিজ কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে, আর ফেরেশতারা তাদের দ্রুত গতিতে হাঁকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবেন।

২. সম্ভবত শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক ও দ্বিতীয় ফুঁকের মধ্যবর্তী সময়ে তারা নিদ্রাবস্থায় থাকবে। অথবা কিয়ামতের ভয়ঙ্কর শাস্তির মোকাবেলায় কবরের আযাবকে হালকা মনে করবে এবং তাকে নিদ্রার সাথে তুলনা করবে, তাই বলবে– ...مَن بعثَنا مِن مَّرْقَدنا। কিংবা مرقد বলে এস্থলে 'নিদ্রাস্থল' উদ্দেশ্য নয়, শুধু 'শয়নস্থল' উদ্দেশ্য (সুতরাং আয়াত থেকে এ কথা বের হয় না যে, সকল কবরবাসী কিয়ামত পর্যন্ত নিদ্রায় থাকবে)।

৩. তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ উত্তর দেওয়া হবে। অথবা ভবিষ্যৎকে বর্তমান কাল সাব্যস্ত করে এখনই উত্তর দিচ্ছেন যে, কে উঠিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করছ? একটু চোখ খোল (এবং শোন)! এ সেই পুনরুত্থান, যার ওয়াদা খোদায়ে রহমানের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল এবং যার সংবাদ পয়গম্বরগণ সর্বদা দিচ্ছিলেন।

৪. অর্থাৎ কেউ পালিয়েও যেতে পারবে না এবং লুকিয়েও থাকতে পারবে না।

৫. অর্থাৎ কারো নেকী নষ্ট হবে না, অপরাধ থেকে বেশি শাস্তিও দেওয়া হবে না। ঠিক ঠিক সুবিচার হবে এবং যে নেককর্ম বা অসৎকর্ম তারা করত, তাই আযাব ও ছওয়াবের আকারে সামনে এসে উপস্থিত হবে।

৫৫. নিশ্চয় আজ জান্নাতবাসীরা (আপন) ব্যস্ততায় মগ্ন, খোশগল্পে লিপ্ত থাকবে*।	إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তারা ও তাদের স্ত্রীগণ ছায়ায়, সুসজ্জিত পালঙ্কে হেলান দিয়ে বসে থাকবে।	هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. তাদের জন্য সেখানে আছে ফলমূল এবং তাদের জন্য আছে যা-কিছু তারা চাইবে[১]।	لَهُمْ فِيْهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. পরম দয়াময় রবের পক্ষ থেকে (তাদেরকে) বলা হবে– 'সালাম'[২]।	سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. আর 'হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও[৩]'।	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'সুখ-সম্ভোগে (বা আনন্দে) রত থাকবে'।

১. বেহেশতে সব রকমের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ থাকবে। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে আজ সুখ-সম্ভোগই হবে তাদের 'ব্যস্ততা', তাদের কাজ! তারা ও তাদের স্ত্রীরা মিলেমিশে অতি মনোরম ছায়াতলে, খাট-পালঙ্কের উপর আরাম করতে থাকবে। সর্বপ্রকার ফলমূল ইত্যাদি তাদের জন্য সমুপস্থিত থাকবে।

মোটকথা, বেহেশতবাসীদের মনে যা-কিছুর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা জাগবে, তাই দেওয়া হবে এবং মুখে যা-ই চাইবে তাই পাবে।

এ তো হল বস্তুগত ভোগসামগ্রীর কথা। সম্মুখে রূহানী নে'য়ামতসমূহের দিকে سلام قولا من رب رحيم দ্বারা একটুখানি ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ দয়ালু পালনকর্তার পক্ষ থেকে জান্নাতীদের সালাম বলা হবে। এ ফেরেশতাদের মাধ্যমে হবে, অথবা ইবনে মাজার একটি হাদীস অনুযায়ী দয়ালু প্রভু সরাসরি 'সালাম' বলবেন। (ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৪– اسناده ضعيف)। তখন যে সম্মান-মর্যাদা ও স্বাদ-আনন্দ জান্নাতীদের লাভ হবে, তা কি আর ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব?!

اللّٰهُمَّ ارزقنا هذه النعمة العظمى بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

৩. অর্থাৎ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশে তোমাদের কোন অংশ নেই, তোমাদের স্থান অন্যত্র। সেখানেই তোমাদের থাকতে হবে।

৬০. হে আদম-সন্তানেরা! আমি কি তোমাদের এ আদেশ করিনি যে, 'তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?	اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ﴿۶۰﴾
৬১. 'এবং এও যে, আমার ইবাদত কর। এ-ই সরল পথ[১]?	وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾
৬২. 'নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যকার বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি?	وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾
৬৩. 'এ সেই জাহান্নাম, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾
৬৪. 'আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর। কারণ, তোমরা কুফরীতে লিপ্ত ছিলে[২]।'	اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾
৬৫. আজ আমি ওদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। আর ওদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং ওদের পা ওরা যা করত সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে[৩]।	اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾

১. অর্থাৎ পরকালীন জীবনেরই জন্য নবী-রাসূলের মাধ্যমে তোমাদের বারবার বোঝানো হয়েছিল যে, অভিশপ্ত শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, ওর অনুসরণ কিছুতেই করো না। সে তোমাদের জাহান্নামে না নিয়ে ছাড়বে না। যদি শ্বাশত মুক্তি চাও, তবে এই নাও সরল পথ, এ পথেই চলতে থাক এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর।

২. অর্থাৎ আফসোস্, এত নসীহত ও উপদেশ সত্ত্বেও তোমাদের সুবুদ্ধির উদয় হল না। আর এই অভিশপ্ত শয়তান বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ছেড়েছে। তোমাদের কি শত্রু-মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারার এবং নিজ লাভ-ক্ষতি চিনতে পারার সামর্থ্যটুকুও ছিল না? দুনিয়ার কাজকামে তো খুবই বিচক্ষণতা-বুদ্ধিমত্তা দেখাতে, কিন্তু আখেরাতের ব্যাপারে এতই স্থূলবুদ্ধি হয়ে গেলে যে, মোটা মোটা কথা বোঝার যোগ্যতাও রইল না? এখন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার খেসারত পোহাতে থাক। এই যে দোযখ প্রস্তুত রয়েছে! কুফর অবলম্বন করার ফলে তোমাদেরকে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কুফরের ঠিকানা এটাই। অতএব নিজেদের এই ঠিকানায় প্রবেশ করো!

৩. অর্থাৎ আজ এই লোকগুলো নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার না করলে তাতে কী? আমি ওদের মুখ সীল করে দেব এবং হাত-পা-কান ও চোখ, এমন কি শরীরের চামড়াকে

৬৬. আমি ইচ্ছা করলে ওদের চোখগুলো বিলোপ করে দিতে পারি। অনন্তর ওরা পথের দিকে দৌড় দিতে চাইবে, কিন্তু দেখবে কেমন করে?

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۝

৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে স্ব স্ব স্থানে থাকাবস্থায়ই ওদের আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারি। তখন ওরা সামনেও এগুতে পারবে না এবং পিছনেও ফিরতে পারবে না[১]।

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَٰعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝

[রুকূ - ৫]

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি, তার গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি ওরা বোঝে না[২]?

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝

হুকুম দেওয়া হবে, তোমাদের দ্বারা যেসব অপরাধ করেছিল, তা বর্ণনা কর। তখন প্রত্যেক অঙ্গ আল্লাহ তাআলার কুদরতে বাকশক্তিসম্পন্ন হবে এবং ওদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন– حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ('অবশেষে যখন ওরা জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন ওদের কান, চোখ ও চামড়া ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে– ওদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।' –হা-মীম সেজদা, আয়াত ২০) –এবং আরো বলেন- قَالُوٓا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ {সেগুলি বলবে, আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন আল্লাহ, যিনি বাকশক্তি দিয়েছেন সব কিছুকে।'} (হা-মীম সেজদা, আয়াত ২১)

১. অর্থাৎ ওরা যেমন আমার নিদর্শনাদির প্রতি চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে, আমিও ইচ্ছা করলে দুনিয়াতেই শাস্তিস্বরূপ ওদের বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দিতে পারি। ফলে এদিকে-সেদিকে যাওয়ার পথও দেখতে পাবে না। এবং ওরা যেমন শয়তানী পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে চলতে চায় না, তদ্রূপ আমার শক্তি আছে ওদের আকৃতি বিকৃত করে দিয়ে একেবারে পঙ্গু বানিয়ে দেওয়ার। ফলে ওরা কোন প্রয়োজনে স্বস্থান থেকে নড়তেও পারবে না।

কিন্তু আমি এরূপ করতে চাইনি এবং এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য থেকে ওদের মাহরূম করিনি। এ ছিল আমার পক্ষ থেকে রহমতপূর্ণ অবকাশ। আজ সেই চোখ ও হাত-পাগুলিই সাক্ষ্য দেবে, এই অসৎ লোকগুলো তাদেরকে কী অশোভন কাজকামেই না নিয়োজিত করেছিল।

২. অর্থাৎ চোখ ছিনিয়ে নেওয়া এবং আকৃতি বিকৃত করে পঙ্গু বানিয়ে দেওয়াকে কঠিন মনে করো না। তোমরা কি লক্ষ কর না, একজন সুস্থ-সবল মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছে কীভাবে

৬৯. আমি তাঁকে কবিতা শিখাইনি। আর তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। এ তো খাঁটি উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন[১]–

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶۹﴾

দেখতে-শুনতে ও চলতে-ফিরতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। শৈশবে যেমন দুর্বল-শক্তিহীন ও অন্যদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকে, বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় সেই অবস্থার দিকেই ফিরে আসে। অতএব যে আল্লাহ বার্ধক্যের বয়সে শক্তি-সামর্থ্য রহিত করে দেন, তিনি কি যৌবনকালে তা করতে পারেন না?

১. **তিনি কবি নন, তাঁর আনীত কিতাব কবিতা নয়**

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা ধ্রুব সত্য। কবির কল্পনা নয়। এই পয়গম্বরকে আমি কুরআন দান করেছি, যা উপদেশমালা ও উজ্জ্বল শিক্ষা-দীক্ষায় ভরপুর। তাঁকে কোন কাব্যগ্রন্থ দেইনি, যার মধ্যে নিছক কল্পনাপ্রসূত ও ছন্দবদ্ধ বাক্যাবলীর সমাহার থাকে। বরং সৃষ্টিগতভাবে তাঁর পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতিকে কবিত্ব থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এরই ফল যে, তিনি ছিলেন সেই অভিজাত বংশের একজন, যার সামান্য দাসীরাও সেই যুগে কবিতা বলার স্বভাবগত যোগ্যতা রাখত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি আজীবন কোন কবিতা রচনা করেননি। হাঁ, যুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কখনো এক-আধ বার তাঁর যবান মুবারক থেকে অবলীলাক্রমে ছন্দবদ্ধ উক্তি নির্গত হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। একে তো আর কবিত্ব বা কবিতা বলা হয় না। তিনি নিজে কবিতা বলা তো দূরের কথা, অন্য কবির কবিতা বা ছন্দও জীবনে দুই-চার বারের অধিক উচ্চারণ করেননি। আর কবিতা পড়ার সময় প্রায়ই তাতে এমন পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যাতে কবিতা আর কবিতা না থাকে, শুধু কবির মূল উদ্দেশ্যটা প্রকাশ পেয়ে যায়।

মোটকথা, তাঁর পবিত্র প্রকৃতিকে কবিত্বের প্রতি ঝুকতে দেওয়া হয়নি। কেননা, এই জিনিস তাঁর মহান দায়িত্বের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। তিনি তো ছিলেন সত্যের ব্যাখ্যাকার। সামান্য মিথ্যা এবং অতিরঞ্জন ছাড়া দুনিয়াকে প্রকৃত সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়ের সাথে পরিচয় করানোই ছিল তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, একজন কবির কাজ এটি হতে পারে না। কেননা, কবিত্বের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা তো মিথ্যা, বাড়াবাড়ি, অবাস্তব আকাশ-কুসুম কল্পনা ও কল্পনাপ্রসূত বিষয় সৃষ্টি করার উপরই নির্ভরশীল। কাব্যের মধ্যে যদি কোন প্রশংসনীয় বিষয় থেকে থাকে, তবে তা হল মানব মনে তার প্রতিক্রিয়া ও আবেদন। তো, কাব্যের এই প্রশংসনীয় জিনিসটি পবিত্র কুরআনের গদ্যে এত বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায় যে, সমগ্র বিশ্বের কবিরা সম্মিলিতভাবেও নিজেদের কাব্যসমষ্টির মধ্যে তা সৃষ্টি করতে পারে না। কুরআন করীমের অভিনব প্রকাশভঙ্গি ও বাকরীতি দেখার পর সুনিশ্চিতরূপে বলা যায়, কাব্যের প্রাণ যেন গদ্যের ভেতর দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই বড় বড় সাহিত্যিক ও বিজ্ঞজনেরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে কুরআনকে কাব্য বা যাদু বলে বসত। অথচ কুরআনের সঙ্গে কাব্য ও যাদুর কী সম্পর্ক? স্রেফ কবিত্ব ও যাদুশাস্ত্রের উপর ভর করে দুনিয়াতে কখনো জাতীয়তা ও আধ্যাত্মিকতার সেরূপ মহামর্যাদাশালী ও অক্ষয়-চিরস্থায়ী ইমারতসমূহ দাঁড়াতে পেরেছে কি, যা কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে? আল্লাহর হুকুমে মৃত অন্তরে অনন্ত প্রাণ দান করা– এ পয়গম্বরদেরই কাজ, কবিদের নয়।

৭০. (তা এজন্য নাযিল হয়েছে), যাতে তিনি যার মধ্যে প্রাণ আছে তাকে সতর্ক করেন, এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সুপ্রমাণিত হয়ে যায়*[১]।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۝

৭১. ওরা কি দেখে না যে, আমি আমার হাতের সৃষ্ট বস্তুরাজির মধ্যে ওদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছি, এখন ওরাই সেগুলির মালিক[২]?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ۝

৭২. এবং সেগুলিকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে তার কতক ওদের বাহন এবং কতক ওরা ভক্ষণ করে।

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ۝

৭৩. আর ওদের জন্য সেগুলোর মধ্যে আছে আরো বহু উপকারিতা ও পানীয় বস্তু। তবুও কি ওরা শোকর করবে না[৩]?

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ۝

মোটকথা, আল্লাহ তাআলা আরবদের এ কথা বলার আদৌ সুযোগ দেননি যে- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে কবি ছিলেন, কবিত্ব থেকে উন্নতি লাভ করে নবী হয়ে গিয়েছেন!

✯ **দ্বিতীয় তরজমা-** 'কাফেরদের ব্যাপারে (আযাবের) কথা অবধারিত হয়ে যায়'।

১. অর্থাৎ যাতে জিন্দা অন্তরবিশিষ্ট মানুষ কুরআন শুনে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে এবং কাফেরদের অভিযোগের পথ বন্ধ হয়।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যার মধ্যে প্রাণ আছে, অর্থাৎ যে নেক আছর গ্রহণ করে, তার ফায়দার জন্য এবং কাফেরদের অভিযোগের পথ বন্ধ করার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।'

২. আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত আয়াতসমূহের আলোচনার পর এখন (তাঁরই সৃষ্ট) প্রাকৃতিক নিদর্শনাদির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে যে, একদিকে কুরআনের নির্দেশ ও নসীহত শোন আর অন্যদিকে গভীরভাবে লক্ষ কর যে, আল্লাহ তাআলার কত কী নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে। উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, খচ্চর প্রভৃতি জন্তু তোমরা সৃষ্টি করনি। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ কুদরতে পয়দা করেছেন। অতঃপর নিজ ফযলে তোমাদেরকে এগুলির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন, ফলে তোমরা যেখানে ইচ্ছা তাদের বিক্রি কর এবং যে কাজ ইচ্ছা তাদের দিয়ে করাও।

৩. লক্ষ কর, কত বড় বড় দেহধারী ও শক্তিশালী অবয়ববিশিষ্ট জন্তুকে দুর্বল দেহধারী মানুষের সামনে অক্ষম ও বশীভূত করে দিয়েছেন। শত সহস্র উটের বহরকে একটি অল্পবয়স্ক বালক লাগাম ধরে অনায়াসে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যায়, একটুও অবাধ্য হতে পারে না। কত কত

৭৪. ওরা আল্লাহর পরিবর্তে এই আশায় অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করে যে, ওরা (তাদের মাধ্যমে) সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।	وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝
৭৫. এই উপাস্যরা ওদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। আর ওরা (মুশরিকেরা) হবে তাদের এমন বাহিনী, যাদের (জাহান্নামে) উপস্থিত করা হবে[১]।	لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝
৭৬. অতএব ওদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। আমি জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে[২]।	فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝
৭৭. মানুষ কি লক্ষ করে না যে, আমি তাকে (সামান্য) শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? আর অমনি সে হয়ে উঠল প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী[৩]।	اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

শক্তিশালী জন্তুর উপর মানুষ আরোহণ করে এবং কোন কোনটাকে কেটে নিজের খাদ্য বানায়। গোশত খাওয়া ছাড়াও ওদের চামড়া, হাড়, ইত্যাদি কত কাজে লাগে। ওদের ওলান যেন দুধের ফোয়ারা। এসব ফোয়ারা থেকে কত মানুষ পিপাসা নিবারণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শোকর-গুযার বান্দার সংখ্যা খুবই কম।

১. অর্থাৎ যে আল্লাহ এসব নে'য়ামত দান করলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এভাবে আদায় করল যে, তাঁর বিপরীতে অন্যান্য প্রভু ও উপাস্য নির্ধারণ করল!! যাদের ব্যাপারে তারা মনে করে যে, দুঃসময়ে কাজে আসবে এবং সাহায্য করবে। তো, স্মরণ রেখো, ওরা তোমাদের সাহায্য করবে দূরের কথা, নিজেরা নিজেদেরই সাহায্য করতে পারবে না। হাঁ, যখন তোমাদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন হবে, তখন ওরা তোমাদের গ্রেফতার করিয়ে দেবে (অর্থাৎ তারাই তোমাদের গ্রেফতারের কারণ হবে)। সেই সময় বুঝতে পারবে, যাদের পক্ষে জীবনভর সংগ্রাম করেছিলে, তারা আজ কীভাবে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে!!

২. অর্থাৎ স্বয়ং আমার সঙ্গে যখন ওদের এহেন আচরণ, সুতরাং ওদের কথায় আপনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হবেন না। আপনি নিজ দায়িত্ব আদায় করতে থাকুন আর ওদেরকে আমার সোপর্দ করে দিন– আমি ওদের জাহেরী ও বাতেনী হাল-অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত, আমি ওদের ঠিক ঠিক হিসাব গ্রহণ করব।

৩. অর্থাৎ মানুষ গোড়াতে কী ছিল, তা সে স্মরণ রাখে না। সে একটি নিকৃষ্ট শুক্রবিন্দু ছিল, অতঃপর আল্লাহ কী থেকে কী বানিয়ে দিলেন! তিনি এই বিন্দুকে এমন শক্তি ও বাকক্ষমতা

৭৮. আর সে আমার সম্পর্কে এক উপমা তৈরি করেছে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গেছে। সে বলে, 'কে হাড়গুলিতে জীবন দান করবে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও[১]?'

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

৭৯. আপনি বলুন, 'সেগুলিতে সেই সত্তা জীবন দান করবেন, যিনি তাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি সর্বপ্রকার সৃজন জানেন*[২]–

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ ۝

৮০. 'যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও[৩]।'

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝

দান করলেন যে, সে এখন কথায় কথায় তর্ক-বিতর্ক শুরু করে। এমন কি, আজ সে নিজের সীমা অতিক্রম করে স্রষ্টার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

১. অর্থাৎ দেখ, আল্লাহর প্রতি কেমন বাক্য সে প্রয়োগ করছে? মনে হয়, সে একচ্ছত্র শক্তিশালী আল্লাহকে অক্ষম সৃষ্টির ন্যায় ভেবে নিয়েছে। তাই তো সে বলছে, পরিশেষে যখন দেহ পচে-গলে নিছক অস্থিতে পরিণত হবে, আর তাও পচা পুরাতন কংকাল– তখন সেগুলিকে পুনর্জীবিত করবে কে? এরূপ প্রশ্ন করার সময় সে নিজ সৃষ্টির কথা বিলক্ষণ ভুলে গেছে, নতুবা এ নিকৃষ্ট শুক্রবিন্দু এহেন শব্দাবলী উচ্চারণের ধৃষ্টতা দেখাত না। বরং নিজে গোড়াতে কী ছিল তা লক্ষ করে কিছুটা লজ্জা বোধ করত। এবং কিছুটা বুদ্ধি ব্যবহার করে নিজ প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যেত– যার উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তিনি সৃষ্টিকুল সম্পর্কে সম্যক অবগত'।

২. অর্থাৎ যিনি প্রথমবারে এই অস্থিসমূহে জীবন দান করেছেন, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার জীবন দান করা কঠিন হবে কেন? বরং তা প্রথমবারের চেয়ে সহজ হওয়া উচিত وهو أهون عليه –('আর তা তাঁর জন্য অতি সহজ' –রূম, আয়াত ২৭)। আর সেই সর্বশক্তিমানের জন্য তো সব কিছুই সহজ, প্রথমবার হোক অথবা দ্বিতীয়বার। কারণ, তিনি সব রকমের সৃষ্টিই করতে জানেন। দেহের অংশগুলি ও অস্থির চূর্ণগুলি যেখানেই বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে থাকুক না কেন, সেগুলির প্রতিটি কণার অবস্থান তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

৩. অর্থাৎ প্রথমে পানি থেকে সবুজ ও সতেজ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই বৃক্ষকে শুকিয়ে জ্বালানী কাঠে পরিণত করেছেন– যা থেকে এখন তোমরা আগুন বের করছ। অতএব যে আল্লাহ এরূপ বিপরীতমুখী গুণবিশিষ্ট বস্তুসমূহের একটি থেকে আরেকটি পয়দা করতে পারেন, তিনি একটি বস্তুকে জীবন ও মৃত্যুর মাঝে ওলট-পালট করতে (অর্থাৎ, প্রথমে জীবন দিতে, অতঃপর মৃত্যু ঘটাতে, তারপর পুনর্জীবিত করতে) পারবেন না? অবশ্যই পারবেন।

৮১. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? অবশ্যই। তিনিই তো প্রকৃত স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ[১]।

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾

৮২. তাঁর শান্ এই যে, তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করলে তাকে শুধু বলেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়[২]।

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতএব পবিত্র সেই সত্তা, যাঁর হাতে রয়েছে সকল কিছুর কর্তৃত্ব এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]।

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

বি. দ্র. কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী 'সবুজ বৃক্ষ' দ্বারা সেসব বৃক্ষ উদ্দেশ্য করেছেন, যার ডালগুলিকে পরস্পর ঘর্ষণ করলে আগুন বের হয়, যেমন বাঁশগাছ অথবা আরবের (مرخ وعفار) 'মারখ' ও 'আফার' বৃক্ষ। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর ন্যায় বিরাট বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে এই কাফেরদের মত সামান্য বস্তু পুনর্বার পয়দা করা কঠিন হবে কেন?

২. অর্থাৎ কোন ছোট বা বড় জিনিস প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন?! তাঁর দরবারে তো কেবল ইচ্ছা করার বিষয়– যখনি কোন বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, 'হয়ে যা', তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল। এক সেকেণ্ডও দেরি হতে পারে না।

বি. দ্র. আমার ধারণায় আলোচ্য আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে এ রকমও বলা যেতে পারে যে, পূর্বে দেহ সৃষ্টির উল্লেখ ছিল, আর এখানে রূহ্ সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। সূরা ইসরায় 'রূহ' সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেখুন।

৩. অর্থাৎ যাঁর হাতে বর্তমানেও আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল সৃষ্টির কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের চাবিকাঠি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যাঁর দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে, সেই মহা-মহিমময় সত্তা অক্ষমতা, নির্বুদ্ধিতা ও সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র।

সূরা সাফ্‌ফাত

سُوۡرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৩৭ । ১৮২ আয়াত । ৫ রুকূ । মক্কী

اٰیَاتُهَا ۱۸۲ رُکُوۡعَاتُهَا ۵

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

১. শপথ তাদের, যারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়[১]।

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ

২. অতঃপর তাদের, যারা হুমকি-ধমকি দিয়ে বিতাড়িত করে[২]।

فَالزّٰجِرٰتِ زَجۡرًا ۙ

৩. তারপর তাদের, যারা স্মরণ করানোর জন্য পাঠ করে[☆] [৩]—

فَالتّٰلِیٰتِ ذِکۡرًا ۙ

৪. নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ একজনই[৪]।

اِنَّ اِلٰـهَکُمۡ لَوَاحِدٌ ؕ

---

১. অর্থাৎ যারা সারিবদ্ধভাবে কাতারে কাতারে দাঁড়ায়- চাই তারা ফেরেশতা হোন, যাঁরা আল্লাহ তাআলার হুকুম শোনার জন্য নিজ নিজ স্থানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। অথবা ইবাদতকারী মানুষ হোক, যারা নামায বা জেহাদ ইত্যাদিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।

বি. দ্র. কথাবার্তায় জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে শপথের ব্যবহার হয়, যা প্রায়ই অস্বীকারকারীর মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন সময় শুধু একটি বিষয়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যও শপথের ব্যবহার করা হয়। আর কুরআন কারীমে ব্যবহৃত শপথসমূহের অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সাধারণত যার শপথ করা হয়, তা শপথের বিষয়টির পক্ষে একটি সাক্ষী বা প্রমাণ হয়।

২. অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ শয়তানদের ধমকিয়ে বিতাড়িত করেন, যাতে ওরা চুরি করে শুনতে না পারে। কিংবা যে ফেরেশতারা মানুষদের অন্তরে পুণ্যের কথা ঢেলে দিয়ে তাদের গোনাহ থেকে বিরত রাখেন। অথবা সেই পুণ্যবান মানুষরা উদ্দেশ্য, যারা নিজেদের নফসকেও পাপ থেকে বিরত রাখে এবং অন্যদেরও পাপাচারের কারণে বকা-ঝকা করে। বিশেষত জেহাদের ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে তাদের হুঙ্কার ও হুশিয়ারি অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'যারা 'যিকির' (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহ) পাঠ করে'।

৩. অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা বা মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম শোনার পর একে অপরকে বলার জন্য তা পাঠ করে ও ইয়াদ করে।

৪. নিশ্চয় আকাশের উপর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নেক বান্দাগণ সকল যুগে স্পষ্ট ভাষায় ও আচার-আচরণের মাধ্যমে এ সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন যে, সকলের মালিক ও মাবূদ এক আল্লাহ, আর আমরা তাঁরই বান্দা।

৫. (তিনি) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব এবং রব সকল উদয়স্থলেরও[১]।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ۝

৬. আমি নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি এক শোভা অর্থাৎ তারকারাজির দ্বারা[২],

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ۝

৭. এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে (তার) হেফাজত করেছি[৩]।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ۝

৮. অবাধ্য শয়তানরা উর্ধ্ব জগতের মজলিসের (কথোপকথন) শুনতে পারে না*, বরং ওদের উপর সবদিক থেকে (উল্কা) নিক্ষেপ করা হয়-

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ۝

১. উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একদিকে রয়েছে উদয়স্থলসমূহ। প্রতি দিনকার সূর্যের উদয়স্থলও ভিন্ন এবং প্রত্যেকটি তারকার উদয়স্থলও ভিন্ন। উদয়স্থল বলতে বোঝায় সেই স্থান, যেখান থেকে সূর্য-তারকা উদিত হয়। উদয়স্থলসমূহের বিপরীতে রয়েছে সেই পরিমাণ অস্তস্থলসমূহ। তবে উদয়স্থলের উল্লেখ দ্বারা অস্তস্থলের কথা বুঝে এসে যায় বলে সম্ভবত এখানে অস্তস্থলগুলির উল্লেখ করা হয়নি। অধিকন্তু, সূর্য ও তারকারাজির অস্তের তুলনায় উদয়ের মধ্যেই আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব ও বড়ত্বের শান্ বেশি প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়।

২. অর্থাৎ অন্ধকার রাতে অগণিত তারকারাজির ঔজ্জ্বল্যে দর্শকদের কাছে মহাকাশ কতই না সুন্দর, সুশোভিত ও আলোকোজ্জ্বল দেখায়!

৩. অর্থাৎ তারকারাজি আকাশের শোভা-সৌন্দর্য তো বটেই, সেই সঙ্গে কোন কোন তারকা (যা আকাশ থেকে খসে পড়ে) শয়তানদেরকে বাধাপ্রদান ও বিতাড়নের কাজেও ব্যবহৃত হয়।

এই খসে পড়া তারকাগুলির স্বরূপ কী? এরা কি আলোবিশিষ্ট নক্ষত্র ছাড়া অন্য কোন স্বতন্ত্র ও ভিন্ন নক্ষত্র, না আলোকোজ্জ্বল নক্ষত্রের কিরণেই বায়ুমণ্ডলীয় কোন কিছু আগ্নেয় দাহিকার রূপ ধারণ করে, না কি স্বয়ং নক্ষত্রগুলির ভেঙ্গে পড়া অংশসমূহ? –এ বিষয়ে উলামা ও বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তবে এদের স্বরূপ যাই হোক না কেন, এদের দ্বারা শয়তান বিতাড়নের কাজ নেওয়া হয়। এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সূরা 'হিজ্‌র'-এ (আয়াত ১৮) গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'ফেরেশতাদের (কথোপকথন) শুনতে পারে না'।

৯. বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে[১]। আর ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি[২]।

دُحُوۡرًا وَّلَهُمۡ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾

১০. কিন্তু যে ছোঁ মেরে কিছু ছিনিয়ে নেয়, জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু নেয়[৩]।

اِلَّا مَنۡ خَطِفَ الۡخَطۡفَةَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾

১১. এখন আপনি কাফেরদের জিজ্ঞাসা করুন, ওদের (পুনর্বার) সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমি আরো যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা সৃষ্টি করা[৪]? আমি ওদের সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদা থেকে[৫]।

فَاسۡتَفۡتِهِمۡ اَهُمۡ اَشَدُّ خَلۡقًا اَمۡ مَّنۡ خَلَقۡنَا ؕ اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّنۡ طِیۡنٍ لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾

১২. বরং আপনি বিস্মিত হন, আর ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে[৬]।

بَلۡ عَجِبۡتَ وَیَسۡخَرُوۡنَ ﴿۱۲﴾

---

১. ঊর্ধ্ব জগতের মজলিস বলতে ফেরেশতাদের মজলিস উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে পৌঁছে খোদায়ী ওহীর কোন কথা শুনে ফেলার শক্তি শয়তানদের দেওয়া হয়নি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা যখন ঊর্ধ্ব আকাশের নিকট পৌঁছার চেষ্টা করে, তখন যেদিক দিয়ে যায় সেদিক থেকেই ফেরেশতাগণ হুঙ্কার দিয়ে ও মেরে মেরে তাড়িয়ে দেন।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় এভাবেই সর্বদা (শয়তানদের উপর) মার পড়তে থাকবে, আর আখেরাতের চিরকালীন শাস্তি তো ভিন্ন আছেই।

৩. অর্থাৎ এই ছোটাছুটির মধ্যেও শয়তানদের কেউ এক আধটু কথা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলে (অর্থাৎ শুনে ফেললে) ওর রক্ষা নেই। ফেরেশতাগণ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিয়ে ওর পশ্চাদ্ধাবন করেন। –এর আলোচনা সূরা হিজ্‌রের শুরুতে (আয়াত ১৮) রয়েছে।

৪. অর্থাৎ পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞাসা করুন, ওদের ধারণায় আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, ফেরেশতা, শয়তান প্রভৃতি সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না স্বয়ং ওদের সৃষ্ট করা বেশি কঠিন? আর তাও একবার সৃষ্টি করার পর। বলা বাহুল্য, যে আল্লাহ এমন বিরাট বিশাল মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর পক্ষে ওদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হওয়ার কোন কারণ বা যুক্তি আছে কি?

৫. অর্থাৎ ওদের মূল সম্বন্ধে আমার ভাল করেই জানা আছে। এক ধরনের আঠালো কাদামাটি দিয়ে যার দেহ সৃষ্টি করলাম, আজ ওর দাবি, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ওকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অক্ষম। এ সম্পূর্ণ অমূলক দাবি। প্রথমে যেমন ওকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বারও সেই মাটি থেকে ওঠাবেন।

৬. অর্থাৎ আপনি ওদের ব্যাপারে অবাক হচ্ছেন যে, এমন পরিষ্কার কথা কেন বোঝে না! আর ওরা আপনার প্রতি বিদ্রূপ করে যে, এই নবী কী ধরনের অবাস্তব কথা বলছেন!

১৩. এবং যখন ওদের নসীহত করা হয়, ওরা উপদেশ গ্রহণ করে না।	وَإِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ۝
১৪. আর কোনো নিদর্শন দেখলে হাসি-তামাশা করে।	وَإِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ۝
১৫. এবং বলে, 'আর কিছু নয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদু[১]।	وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝
১৬. 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়গোড় হয়ে যাব, তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হব?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝
১৭. 'এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদারাও[২]?'	اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝
১৮. আপনি বলুন, 'হাঁ! আর তোমরা হবে লাঞ্ছিত[৩]।'	قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۝
১৯. ব্যস্, তা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ, আর তখনই ওরা দেখতে শুরু করবে[৪]।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝
২০. আর বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! এ-ই তো কর্মফল-দিবস।'	وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

১. অর্থাৎ নসীহত শুনে চিন্তা-ফিকির করে না এবং যেসব মুজেযা ও নিদর্শন দেখে, তাকে যাদু বলে হেসে উড়িয়ে দেয়।

২. অর্থাৎ সর্বদা একই কথা বলে যাচ্ছে যে, ভাই! যখন আমাদের দেহ মাটিতে মিশে মাটি হয়ে গেল, শুধু হাড়গোড় অবশিষ্ট রইল এবং এর চেয়ে বড় কথা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা, যাদের মরণের পর যুগ যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, যাদের হাড়গোড়ও সম্ভবত অবশিষ্ট নেই– আমাদের এই সকলকেই নতুন করে পুনর্জীবিত করা হবে, এ কথা কী করে বিশ্বাস করি?

৩. হাঁ, অবশ্যই উত্থিত হবে এবং তখন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে এ অস্বীকৃতির শাস্তি ভোগ করবে।

৪. অর্থাৎ একটিমাত্র হুংকারে সকলে উঠে দাঁড়াবে এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকবে (এ বিকট আওয়াজ শিঙ্গা ফোঁকার কারণে হবে।)

২১. হাঁ, এটা সেই বিচার-দিবস, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে[১]।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

[রুকূ - ২]

২২-২৩ অপরাধীদের, ওদের সহচরদের এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করত– তাদের একত্র কর[২]। অতঃপর ওদের সবাইকে দোযখের পথ দেখাও[৩]।	اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ
২৪. 'ওদের থামাও, ওদের প্রশ্ন করা হবে[৪]–	وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ
২৫. 'তোমাদের কী হল যে, তোমরা পরস্পরের সাহায্য করছ না?'	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ
২৬. বরং আজ ওরা আত্মসমর্পণ করছে[৫]।	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ
২৭. আর ওরা একে অপরের অভিমুখী হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।	وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ

---

১. অর্থাৎ, ওরা পরস্পরে বলবে– এ তো সত্যিসত্যিই বিচারের দিন এসে গেল। নবীগণ যে দিনের সংবাদ দিতেন, আর আমরা হাসিঠাট্টা করে উড়িয়ে দিতাম।

২. আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে এ কথা বলা হবে।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হবে যে, ওদের সকলকে একত্র করে দোযখের পথ দেখিয়ে দাও।

বি. দ্র. أزواج বলতে সমশ্রেণীর পাপী অথবা ওদের কাফের স্ত্রীরা উদ্দেশ্য, আর مايعبدون من دون الله দ্বারা মূর্তি, শয়তান প্রভৃতি উদ্দেশ্য।

৪. উপরোক্ত নির্দেশ দানের পর কিছু সময় ওদের থামিয়ে রাখা হবে, যাতে ওদের একটি প্রশ্ন করা যায়, যার উল্লেখ সামনের আয়াতে রয়েছে।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো বলতে– نحن جميع منتصر (আমরা পরস্পর একে অন্যের সাহায্যকারী)। আজ কী হল যে, কেউই নিজ সাথীর সাহায্য করছ না, বরং প্রত্যেকে বিনাবাক্যে অপদস্থ, ধৃত অবস্থায় চলে আসছ?

২৮. ওরা (অনুসারীরা, নেতাদের) বলবে, 'তোমরাই আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে*[১]।'

قَالُوْۤا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۝

২৯. নেতারা বলবে, 'বরং তোমরাই বিশ্বাসী ছিলে না।

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝

৩০. 'এবং তোমাদের উপর আমাদের কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না। বরং তোমরা ছিলে অবাধ্য সম্প্রদায়।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ۝

৩১. 'অতএব আমাদের সবার ব্যাপারে আমাদের রবের কথাই অবধারিত হয়ে গেছে– আমাদের অবশ্যই (শাস্তি) আস্বাদন করতে হবে।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ۝

৩২. 'আমরা তোমাদের পথভ্রষ্ট করেছি, আর আমরা তো ছিলামই পথভ্রষ্ট[২]।'

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ۝

★ **দ্বিতীয় তরজমা**–' তোমরা তো শক্তি নিয়ে আমাদের উপর চড়াও হতে!' অথবা– তোমরা তো জোর-জবরদস্তি করে আমাদের পরাভূত করে ফেলতে।

১. يمين (ডান হাত) এর মধ্যে সাধারণত শক্তি বেশি থাকে। উদ্দেশ্য হল, তোমরাই শক্তি ও ভয় দেখিয়ে আমাদের উপর চড়াও হতে। অথবা يمين দ্বারা খায়র ও বরকতের দিক বোঝানো হয়েছে। অর্থ হল– তোমরাই তো কল্যাণ ও নেকীতে বাধা প্রদানের জন্য আমাদের উপর চড়াও হতে। এ কথাবার্তা অনুসারী ও নেতাদের মধ্যে হবে।

২. অর্থাৎ নিজেরা তো ঈমান আননি, এখন আমাদের অভিযুক্ত করছ। তোমাদের উপর আমাদের কী শক্তি ছিল? তোমাদের অন্তরে ঈমান ঢুকতে না দেওয়ার শক্তিও কি আমাদের ছিল? না। তোমরা নিজেরাই বিচার-বুদ্ধি ও ইনসাফের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলে। তাই নিঃস্বার্থ উপদেশ দানকারীদের কথা না মেনে আমাদের ধোঁকায় এসে গেছ। যদি বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিণামদর্শিতার সাথে কাজ করতে, তবে আমাদের কথায় কখনো কান দিতে না।

(فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) -আর আমরা! তো, জানা কথা, আমরা তো পথভ্রষ্টই ছিলাম। এক পথভ্রষ্টের দ্বারা পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকা ছাড়া আর কী আশা করা যায়? সুতরাং আমরা তাই করেছি, যা আমাদের অবস্থার দাবি। কিন্তু তোমাদের এমন কী হল যে, আমাদের হুকুম মেনে নিলে?

৩৩. অতএব সেদিন শাস্তিতে ওরা পরস্পরের শরীক হবে[১]।	فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۞
৩৪. আমি অপরাধীদের সাথে এরূপই করে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ۞
৩৫. ওদের অবস্থা এই ছিল যে, ওদের যখন বলা হত, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই'– তখন ওরা অহংকার করত[২]	اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ۞
৩৬. এবং বলত, 'আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আপন উপাস্যদের পরিত্যাগ করব?'	وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ۞
৩৭. তা নয়, বরং তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন এবং রাসূলদের সমর্থন করেছেন[৩]।	بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞
৩৮. তোমাদের অবশ্যই যাতনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।	اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ۞

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا

যা হোক, যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেছে– আল্লাহর হুজ্জত আমাদের উপর কায়েম হয়েছে এবং তাঁর এ বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে– لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ('আমি অবশ্যই তোর দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।') আজ আমাদের সকলকে নিজ নিজ দুষ্কৃতি ও অপরাধের শাস্তি আস্বাদন করতেই হবে।

১. অর্থাৎ সকল অপরাধী আপন স্তর অনুসারে আযাবে শরীক হবে, যেমন অন্যায়-অপরাধেও শরীক ছিল।

২. অর্থাৎ নবীর কথায় কালিমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে আনতে গর্ব ও অহংকার ওদের বাধা দিত। কারণ, এ কালিমায় ওদের মিথ্যা উপাস্যদের অস্বীকার করা হয়। ফলে এটি ওরা মুখে স্বীকার করত না, চাই অন্তরে তা স্বীকার করুক।

৩. অর্থাৎ কবিদের মিথ্যা তো সকলের জানা। কিন্তু যিনি দুনিয়াতে নির্ভেজাল সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলদের সমর্থন করেছেন, সেই সত্যবাদী সত্তাকে কী করে কবি বল? পাগল ও উন্মাদ ব্যক্তিরা কি এরূপ সত্য-সঠিক ও পরিপক্ক নীতিমালা পেশ করে থাকে?

৩৯. এবং তোমাদের তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে[১]–	وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
৪০. তবে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাগণের (বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন)[২]।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝
৪১. তাদেরই জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক–	اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ۝
৪২. ফলমূল[৩] এবং তাদের সম্মানিত করা হবে[৪]	فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ۝
৪৩. নেয়া'মতের উদ্যানসমূহে।	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝
৪৪. তারা পালঙ্কে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে সমাসীন হবে।	عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝
৪৫. খাদেমগণ তাদের কাছে স্বচ্ছ শরাবের পেয়ালা নিয়ে আসা-যাওয়া করবে—	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝
৪৬. যে শরাব হবে শুভ্র, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝
৪৭. তাতে মাথা ঘুরবে না এবং তা পান করে তারা মাতালও হবে না[৫]।	لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ তাওহীদের অস্বীকৃতি এবং নবীর শানে যেসব ধৃষ্টতা করছ, তার শাস্তি তোমরা অবশ্যই আস্বাদন করবে। দুনিয়াতে যা কিছু করছ, একদিন তা সবই সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে।

২. অর্থাৎ তাদের অবস্থা তো সম্পূর্ণ বিপরীত। সেদিন তারা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে।

৩. অর্থাৎ এমন বিস্ময়কর ও দুর্লভ ফলফলাদি তারা খেতে পাবে, যার গুণাবলীর পূর্ণ বিবরণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ বান্দাদেরও জানিয়ে দিয়েছেন, যেমন সূরা ওয়াকেআয় (আয়াত ৩৩) বলেছেন- لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ('যা শেষ হবে না, নিষিদ্ধও হবে না।')

৪. একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন, কী কী মর্যাদায় তারা ভূষিত হবে।

৫. অর্থাৎ তা পান করে পরিপূর্ণ স্বাদ ও আনন্দ লাভ হবে এবং দুনিয়ার সুরার মধ্যে যেসব অনিষ্ট ও অকল্যাণ থাকে, তাতে সেসবের নাম-নিশানাও থাকবে না– মাথা ঘোরাও থাকবে না, মাতালও হবে না, বমিও আসবে না, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গও খারাপ হবে না, আর সুরার ঝরনাধারাও কখনো নিঃশেষ হবে না।

৪৮. আর তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, ডাগর চোখবিশিষ্ট স্ত্রীগণ[১]।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۙ﴿٤٨﴾

৪৯. তারা যেন লুকিয়ে রাখা ডিম[২]।

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. তাদের মধ্যকার একজন বলবে, 'আমার এক সঙ্গী ছিল।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ ۙ﴿٥١﴾

৫২. 'সে বলত, 'তুমি কি (আখেরাতে) বিশ্বাসীদের দলভুক্ত?

يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫৩. 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়-গোড় হয়ে যাব, তখনো কি (পুনর্জীবিত করে) আমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে[৩]?'

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

---

১. অর্থাৎ লজ্জায় ও নারীসুলভ ঢংয়ে অবনমিত চোখবিশিষ্ট হুরগণ, যারা তাদের স্বামীদের ছাড়া আর কারো দিকে চোখ উঠিয়ে দেখবে না।

২. অর্থাৎ তাদের রং এমন স্বচ্ছ-সুন্দর হবে যেমন পাখীর ডানার নীচে আচ্ছাদিত ডিম, যাতে কোন দাগও লাগেনি এবং ধূলোবালিতেও মলিন হয়নি। অথবা ডিমের ভিতরে শক্ত খোলসের নীচে যে সাদা অংশ, তার ন্যায়। আর কেউ বলেছেন যে, উটপাখির ডিম উদ্দেশ্য, যার রং অত্যন্ত সুন্দর হয়।

যা হোক, এই উপমাটি শুভ্রতার দিক থেকে নয়; বরং স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন বা সুন্দর হওয়ার বিবেচনায়। তাই তো অন্যত্র বলা হয়েছে– كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (তারা যেন ইয়াকুত ও প্রবাল। –রহমান, আয়াত ৫৮)

৩. অর্থাৎ বেহেশতে বন্ধু-বান্ধবের আসর জমবে এবং পবিত্র সুরাভর্তি পানপাত্রের পালা চলতে থাকবে। এ সুখ-সম্ভোগ ও আনন্দ-স্ফূর্তির সময় নিজেদের পূর্ব জীবনের কিছু অবস্থা নিয়ে তারা আলোচনা করবে এবং জনৈক জান্নাতী বলবে– ভাল কথা, দুনিয়াতে আমার এক সঙ্গী ছিল, যে আমাকে আখেরাতে বিশ্বাস রাখার কারণে ভর্ৎসনা করত এবং বোকা ঠাওরাত। ওর নিকট এ ছিল অনর্থক কথা যে, এক ব্যক্তি মাটিতে মিশে গেল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুই রইল না, শুধু ছিন্ন-ভিন্ন হাড়গোড় অবশিষ্ট রইল। এ অবস্থায় তাকে কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়ার জন্য পুনর্জীবিত করা হবে। তার মতে, এরূপ উদ্ভট কথায় কেউ বিশ্বাস করতে পারে না!

৫৪. (অতঃপর) জান্নাতী ব্যক্তিটি বলবে, 'আচ্ছা, তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে'?'	قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝٥٤
৫৫. অনন্তর সে উঁকি দেবে, তখন ওকে দেখতে পাবে দোযখের মাঝখানে।	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝٥٥
৫৬. সে বলবে, 'আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করেছিলে!	قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝٥٦
৫৭. 'আর যদি আমার রবের অনুগ্রহ না হত, তবে আমিও (আযাবে) ধৃতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম[২]।'	وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝٥٧
৫৮. 'এখন কি আমাদের আর মৃত্যু হবে না'-	اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۝٥٨
৫৯. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া? এবং আমাদের শাস্তিও দেওয়া হবে না?'	اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝٥٩
৬০. 'নিশ্চয় এ-ই মহাসাফল্য।'	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٦٠
৬১. 'এমন সফলতার জন্যই পরিশ্রমকারীদের পরিশ্রম করা উচিত[৩]।'	لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝٦١

১. অর্থাৎ আমার ওই সঙ্গী নিশ্চয় দোযখে পতিত হয়ে থাকবে। সুতরাং আস, জাহান্নামে একটু উঁকি দিয়ে দেখি- কী অবস্থায় আছে!

এটি সেই জান্নাতী ব্যক্তির উক্তি। আর কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তাআলার উক্তি। অর্থাৎ তিনি বলবেন, তোমরা কি উঁকি দিয়ে ওকে দেখতে চাও?

২. অর্থাৎ সেই জান্নাতী তার সঙ্গীর অবস্থা দেখতে পাবে যে- সে দোযখের আগুনে নিপতিত। এ অবস্থা দেখে সে শিক্ষা নেবে এবং আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে। সে বলবে- হতভাগা! তুই তো আমাকেও তোর সাথে ধ্বংস করতে চেয়েছিলি। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহই আমাকে সাহায্য করত এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছে এবং ঈমান ও হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয়নি। নতুবা আজ আমিও তোর মত ধৃত হতাম এবং এই যন্ত্রণাদায়ক আযাবে নিপতিত হতাম।

৩. অর্থাৎ আনন্দের আতিশয্যে সে বলবে, এ কি সত্য নয় যে, দুনিয়াতে আমরা যে মৃত্যুবরণ করেছিলাম সেই মৃত্যুর পর এখন আর আমাদের মরতে হবে না এবং আর কখনো এই আরাম-আয়েশ ছেড়ে শাস্তি ও কষ্টের দিকে যেতে হবে না? আল্লাহ তাআলার দয়া ও রহমতে এই সুখ-সম্ভোগ ও আমোদ-ফূর্তি চিরকাল থাকবে। সত্যিই বিরাট সাফল্য একেই বলা হয়

৬২. আচ্ছা! এটি উত্তম আতিথেয়তা, না যাক্কুম বৃক্ষ?	أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ۝
৬৩. আমি একে জালেমদের জন্য এক আপদ* বানিয়েছি।	إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ۝
৬৪. তা এমন বৃক্ষ, যা উৎপন্ন হয় দোযখের তলদেশে[১]।	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ ۝
৬৫. তার মোচা এমন, যেন শয়তানদের মাথা[২]।	طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ۝
৬৬. সুতরাং ওরা তা থেকে আহার করবে এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।	فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝

এবং এটিই সেই মহান উদ্দেশ্য, যা হাসিলের জন্য সব রকম চেষ্টা-সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'পরীক্ষা'।

১. ইতিপূর্বে বেহেশতীদের আপ্যায়নের বর্ণনা ছিল। এখান থেকে দোযখীদের আপ্যায়নের (!) অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। 'যাক্কুম' বৃক্ষবিশেষের নাম, যা অত্যন্ত তিক্ত ও বিস্বাদ– যেমন আমাদের এ অঞ্চলে আছে (تھوہر یا سیہنڈ)'থূহর' বা 'সীহণ্ড' বৃক্ষ। দোযখের মধ্যে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে এক ধরনের বৃক্ষ উৎপন্ন করেছেন, এখানে যাকে 'যাক্কুম' নামে উল্লেখ করেছেন।

এই বৃক্ষ জালিমদের জন্য পরকালে এক বিপদ। কারণ, যখন দোযখীরা ক্ষুধায় অস্থির হবে, তখন এ বৃক্ষই খেতে দেওয়া হবে এবং তা গলায় ঢোকানো বা ঢোকার পর যে প্রতিক্রিয়া হবে, তা অত্যন্ত কষ্টকর এবং স্বতন্ত্র শাস্তি হবে।

আর দুনিয়াতেও এ বৃক্ষ এক ধরনের আপদ ও পরীক্ষাস্বরূপ। কারণ, কুরআনে এর উল্লেখ শুনে কাফেররা বিভ্রান্ত হয়। কেউ বলে, সবুজ বৃক্ষ দোযখে কী করে উৎপন্ন হল? অথচ এটা হতে পারে যে, এই বৃক্ষের প্রকৃতিই আগ্নেয়। যেমন: (سمندر) 'সামুন্দর' নামের অগ্নি-কীট অগ্নিতে জীবিত থাকে। আর সাহারানপুর জেলায় কোম্পানীবাগে এমন বৃক্ষও রয়েছে, যার লালনপালন আগুনের দ্বারা করা হয়। আবার (কাফেরদের) কেউ কেউ বলে, অমুক ভাষায় খেজুর ও মাখনকে 'যাক্কুম' বলা হয়। সুতরাং এগুলি সামনে রেখে একে অপরকে ডেকে বলবে, 'আস যাক্কুম খাই'।

২. অর্থাৎ অত্যন্ত কুশ্রী শয়তানের মত তার আকৃতি। অথবা সাপকে শয়তান বলা হয়েছে। অর্থাৎ তার গুচ্ছ (দেখতে) সাপের মাথার ন্যায় হবে। যেমন: আমাদের এলাকায় বৃক্ষ বিশেষকে এমন হওয়ার কারণে 'নাগফনা' বলা হয়।

৬৭. তারপর ওদের জন্য তার উপর থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ[১]।	ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۝
৬৮. অতঃপর ওদের অগ্নিকুণ্ডে নিয়ে যাওয়া হবে[২]।	ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِ۟لَى الْجَحِيْمِ ۝
৬৯. ওরা আপন বাপ-দাদাদের পথভ্রষ্ট পেয়েছে।	اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۝
৭০. অতএব ওরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে ছুটে চলেছে[৩]।	فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ۝
৭১. ওদের আগেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ লোক পথভ্রষ্ট হয়েছিল।	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
৭২. আর আমি ওদের মধ্যে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছিলাম।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝
৭৩. অতএব লক্ষ কর, যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণতি কেমন হয়েছে?	فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝
৭৪. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের (কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন)[৪]।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১. 'যাক্কুম' খেয়ে পিপাসিত হবে, তখন ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। ফলে নাড়িভুঁড়ি গলে বের হয়ে পড়বে। (আল্লাহর পানাহ!)

২. অর্থাৎ তীব্র ক্ষুধার্থ হলে আগুন থেকে সরিয়ে উক্ত খাবার ও পানীয় পানাহার করানো হবে। অতঃপর আবার আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

৩. অর্থাৎ পরবর্তী কাফেররা পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসরণ করে গোমরাহ হল। যে পথে পূর্ববর্তীদের চলতে দেখল, সেই পথেই ছুটল। গর্ত বা কূপ কিছুই দেখল না।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী এবং আখেরাতের ভয় প্রদর্শনকারীগণ আসতে থাকেন। কিন্তু যারা তাঁদের কথা শুনেনি ও মানেনি, তাদের পরিণতি কী হয়েছে, লক্ষ কর (তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে)। একমাত্র আল্লাহ তাআলার সেই বাছাই করা বান্দারাই রক্ষা পেয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরিণামের ফিকির ছিল। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সকলকেই সতর্ক করা হয়, তাদের মধ্যে নেক লোকেরা রক্ষা পায় এবং অসৎ লোকেরা আগুনে প্রজ্বলিত হয়।'

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সম্মুখে অস্বীকারকারীদের শিক্ষা প্রদান এবং মুমিনদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিছু সংখ্যক সতর্ককারী ও যাদের সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে।

[রুকূ - ৩]

৭৫. নিশ্চয় নূহ আমাকে ডেকেছিলেন। আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী!

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۟ۖ

৭৬. আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করেছি মহা সংকট থেকে।

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۟ۖ

৭৭. এবং তাঁর বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۟ۖ

৭৮. আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ রীতি চালু রেখেছি যে-

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۟ۖ

৭৯. (তারা বলে)- বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের উপর বর্ষিত হোক শান্তি।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۟

৮০. আমি এভাবেই পুণ্যবানদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۟

৮১. তিনি তো আমার ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۟

৮২. অতঃপর আমি অন্যদের ডুবিয়ে দিয়েছি[১]।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۟

১. প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত হযরত নূহ আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে বুঝাতে ও নসীহত করতে থাকেন, কিন্তু তাদের দুষ্কৃতি এবং তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহারের মাত্রা অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত নূহ (আ) বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রেরণকারী মহান প্রভুর অভিমুখী হয়ে আরয করলেন- اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ (প্রভু হে! আমি পরাজিত, আপনি আমাকে সাহায্য করুন)।

দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর ডাকে কেমন সাড়া দিলেন এবং কী উপায়ে তাঁকে সাহায্য করলেন। নিজ পরিবার-পরিজনসহ নূহ আলাইহিস সালামকে কাফেরদের রাত-দিনের নির্যাতন থেকে রক্ষা করলেন, অতঃপর ভয়াবহ প্লাবনের সময় তাঁকে হেফাজত করলেন এবং একমাত্র তাঁর সন্তানসন্ততি দ্বারা পৃথিবী আবাদ করলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে তাঁর সুনাম অবশিষ্ট রাখলেন। ফলে আজ পর্যন্ত লোকেরা তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করে এবং সমগ্র বিশ্বে 'নূহ আলাইহিস সালাম' বলে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

এ তো হল নেক বান্দাদের পরিণাম। অন্যদিকে তাদের শত্রুদের অবস্থা দেখ যে, সকলেই মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়। আজ দুনিয়ার বুকে ওদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্কৃতির কারণে দুনিয়াতেই ওদের জীবন-জাহাজের ভরাডুবি হয়ে গেল।

৮৩. তাঁরই অনুসারীদের একজন ইবরাহীম[১]।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ۝٨٣

৮৪. (স্মরণ কর), যখন তিনি আপন রবের নিকট এলেন পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে[২],

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝٨٤

৮৫. যখন তিনি আপন পিতা ও স্বজাতিকে বললেন, 'তোমরা কিসের উপাসনা কর?

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝٨٥

৮৬. 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা উপাস্যদের কামনা কর[৩]?

اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝٨٦

৮৭. 'তাহলে বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা[৪]?'

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٧

বি. দ্র. অধিকাংশ আলেমদের মতে আজ সমগ্র দুনিয়ার মানুষ হযরত নূহ আলাইহিস সালামের তিন পুত্র (সাম, হাম ও ইয়াফিছ) এর বংশধর। তিরমিযী শরীফের কোন কোন হাদীসেও (৩২৩১) এর সমর্থন পাওয়া যায়। والتفصيل يطلب من مظانه

১. সমস্ত নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে একই পথের অনুসারী এবং তাঁদের প্রত্যেক পরবর্তীজন পূর্ববর্তীজনের সত্যায়নকারী ও সমর্থনকারী। এ জন্যই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-কে নূহ (আ)-এর দলভুক্ত বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে— إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ '{(তাওহীদের) এ দীনই তোমাদের দীন, যা (নবী-রাসূলদের) অভিন্ন দীন। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর।' (মুমিনূন, আয়াত ৫২)

২. অর্থাৎ সবরকম বিশ্বাসগত ও নৈতিক রোগ থেকে অন্তরকে পবিত্র করেন এবং পার্থিব ঝামেলা-জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে বিনয় ও নম্রতার সাথে স্বীয় প্রভুর অভিমুখী হন এবং স্বজাতিকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার নসীহত করেন।

৩. অর্থাৎ বল তো, এই যে পাথরের মূর্তিগুলি— এগুলো কী জিনিস? তোমরা এসবকে এতই কামনা কর যে, আল্লাহকে ছেড়ে এদের পিছনে পড়েছ!! সত্যি-সত্যিই কি এদের হাতে বিশ্বজগতের রাজত্ব-প্রভুত্ব রয়েছে? অথবা এরা কি ছোট-বড় কোনও ক্ষতির মালিক? সত্যিকারের মালিককে ছেড়ে এই মিথ্যা অথর্বদের এত খোশামোদ ও পক্ষপাতিত্বের কারণটা কী শুনি?

৪. অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ আছে কি? নাকি তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বোঝ না, যে কারণে পাথর-মূর্তিকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করেছ? অথবা তোমাদের কি তাঁর ক্রোধ ও পরাক্রমশালিতার খবর নেই, যে কারণে এত বড় স্পর্ধা দেখানোর দুঃসাহস হয়েছে? আচ্ছা বল তো দেখি, বিশ্বজগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমরা কী ধারণা পোষণ কর?

৮৮. অতঃপর তিনি তারকারাজির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেন।	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾
৮৯. এবং বললেন, 'আমি পূর্ণ সুস্থ নই'।	فَقَالَ إِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾
৯০. অতএব ওরা পিছন ফিরে তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. অতঃপর তিনি ওদের মূর্তিগুলির কাছে চলে গেলেন এবং বললেন, 'কী, তোমরা খাও না'?	فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾

১. **إِنِّيْ سَقِيْمٌ-বলার উদ্দেশ্য**

তাঁর জাতির লোকদের মধ্যে খুব তারকা-ভক্তি ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ) ওদেরকে দেখানোর জন্য তারকারাজির দিকে তাকিয়ে বললেন– আমার শরীর-মন পুরাপুরি ভাল না (আর দুনিয়াতে এমন কে-ই বা আছে, যে সকল দিক দিয়েই সুস্থ, দৈহিক বা মানসিক কোন না কোন অসুবিধা তার নেই? বিশেষত অনবরত জাতির দুরবস্থা দেখে তাঁর যে কষ্ট ও দুঃখ ছিল, তা তাঁর মানসিক ও আত্মিক অসুস্থতার জন্য যথেষ্ট ছিল।)– অথবা إِنِّيْ سَقِيْمٌ-এর অর্থ এই ছিল যে, আমি অসুস্থ হতে যাচ্ছি (অসুস্থতা বলা হয় দেহ-মনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়াকে। আর মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থার সম্মুখীন হবে।)

যা হোক, হযরত ইবরাহীম (আ) এর উদ্দেশ্য ঠিকই ছিল। কিন্তু তারকারাজির দিকে তাকিয়ে إِنِّيْ سَقِيْمٌ বলায় লোকেরা বুঝল, তিনি তারকার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, তিনি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়বেন। জাতীয় এক উৎসবে যোগদানের জন্য তারা শহর থেকে বাইরে যাচ্ছিল। এ কথা শুনে তারা হযরত ইবরাহীমকে মাজুর মনে করে শহরে একা রেখে চলে যায়।

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল, নির্জনতার সুযোগ পেলে মিথ্যা উপাস্যদের খবর নেবেন। তাই সবাই চলে যাওয়ার পর মূর্তিশালায় ঢুকে পড়ে মূর্তিগুলোকে সম্বোধন করে বললেন– 'এই যে খাদ্য ও ভোগ্যসামগ্রী তোমাদের সামনে রাখা, এগুলো খাও না কেন, অথচ তোমাদের আকৃতি খাদ্য গ্রহণকারীদেরই মত?!

বি. দ্র. উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে বোঝা গেল, হযরত ইবরামীমের إِنِّيْ سَقِيْمٌ বলা তাঁর উদ্দিষ্ট অর্থের দিক থেকে মিথ্যা ছিল না। তবে শ্রোতারা যে অর্থ বুঝেছিল, সেই হিসেবে বাস্তবের পরিপন্থী ছিল। এজন্য কোন কোন সহীহ হাদীসে (বুখারী, ৩৩৫৮) এর উপর كذب শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এ মিথ্যা নয়, বরং একে 'তাওরিয়া' (تورية) বলে। শরী'য়তসম্মত কারণে (মিথ্যা পরিহারে) এ ধরনের 'তাওরিয়া' মুবাহ। যেমন: হিজরত বিষয়ক হাদীছে আছে, এক ব্যক্তির ممن الرجل (ইনি কোন গোত্রের?) প্রশ্নের উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- من الماء (কেননা, মানুষের উৎস তো পানি-ই)। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/১৬৩; তবাকাতে ইবনে সাআদ ১/১১৩– হাদীসটি বদর

৯২. 'তোমাদের কী হয়েছে যে, কথা বলছ না[১]?' مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝

৯৩. অতঃপর তিনি ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডান হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করতে লাগলেন[২]। فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝

৯৪. অনন্তর ওরা (তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন) তাঁর কাছে দৌড়ে এল[৩]। فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۝

৯৫. তিনি বললেন, 'তোমরা কি তার উপাসনা কর, যা তোমরা নিজেরা নির্মাণ কর? قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝

৯৬. 'অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তোমরা যা কিছু তৈরি কর তাদের[৪]।' وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝

যুদ্ধসম্পর্কিত) তদ্রূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেছিলেন- رجل يهديني السبيل (তিনি এমন মানুষ, যিনি আমাকে পথ দেখান।)

তবে এ তাওরিয়াও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বুলন্দ মর্যাদা ও মহান শানের কিছুটা খেলাফ ছিল বলে حسنات الأبرار سيئات المقربين –এর নিয়মে এক হাদীছে একে خطيئة আখ্যায়িত করা হয়েছে। (বুখারী, হাদীস ৭৪১০)

১. মূর্তিগুলোর তরফ থেকে খাওয়ার ব্যাপারে যখন কোন উত্তর পাওয়া গেল না, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কথা বল না কেন?' অর্থাৎ তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকৃতি তো মানুষের মতই বানানো হয়েছে, কিন্তু তারা তোমাদের মধ্যে মানুষের প্রাণ দিতে পারল না। আশ্চর্যের ব্যাপার, এ সত্ত্বেও পানাহারে সমর্থ এবং বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষ কী করে নির্জীব অনুভূতিহীন মানব-আকৃতির সামনে মাথা নত করছে এবং নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে ওদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে?

২. অর্থাৎ সজোরে আঘাত করে করে ভেঙ্গে ফেললেন।

ইতিপূর্বে সম্ভবত সূরা 'আম্বিয়া' তে (আয়াত ৫৭-৫৮) এই কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩. লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে দেখতে পেল, মূর্তিগুলো ভাঙাচুরা অবস্থায় পড়ে আছে। লক্ষণাদি দ্বারা বুঝতে পারল, এ ইবরাহীম ছাড়া আর কারো কাজ নয়। তাই সকলে দৌড়ে তাঁর কাছে এল।

৪. অর্থাৎ যে-ই ভেঙে থাকুক, কিন্তু তোমরা এরূপ নির্বুদ্ধিতার কাজ কর কেন? পাথরের যে নিষ্প্রাণ মূর্তি স্বয়ং তোমরা নিজ হাতে বানালে, তা পূজার যোগ্য হয়ে গেল? আর যেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের এবং তোমাদের সকল কর্মের, এমনকি এই পাথরগুলিরও স্রষ্টা,

قَالُوا ابْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ ۝

৯৭. ওরা (পরস্পরকে) বলল, 'তোমরা তার জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর। অতঃপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।'

فَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ۝

৯৮. তো, ওরা তাঁর অনিষ্ট করতে চাইল, কিন্তু আমি ওদেরই নিচু করে দিলাম[১]।

وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ۝

৯৯. আর তিনি বললেন, 'আমি আমার রবের কাছে যাচ্ছি। নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ দেখাবেন[২]।'

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

১০০. হে আমার রব! 'আমাকে একজন সৎপুত্র দান করুন[৩]।'

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ۝

১০১. অতএব আমি তাঁকে সুসংবাদ দিলাম এক সহনশীল পুত্রের[৪]।

তাঁর সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্কই নেই? প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করলেন তিনি, আর উপাসনা হবে অন্যদের, আর সেই অন্যরাও সৃষ্টির সৃষ্টি– এ কেমন অজ্ঞতা!

১. ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তার কোন উত্তর দিতে না পেরে ওরা এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ওতে তাঁকে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা মনে করল, এ ব্যবস্থার ফলে মানুষের মনে মূর্তি-প্রতিমার প্রতি আকীদা-বিশ্বাস গাঢ় হবে এবং মনে এই ভয় ঢুকে যাবে যে, বিরুদ্ধবাদীদের যখন এই পরিণাম, তখন ভবিষ্যতে আর কেউ যেন এমনটি করার ধৃষ্টতা না দেখায়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওদেরই অপমানিত করে ছাড়লেন। ইবরাহীম (আ)-এর জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে শীতল উদ্যানে পরিণত করলেন। এতে সবার সামনে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তোমরা এবং তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা –সকলে মিলে এক আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দার কিছুই ক্ষতি করতে পার না। আগুনের এ ক্ষমতা নেই যে, ইবরাহীম (আ)-এর রবের অনুমতি ছাড়া সামান্য পরিমাণও পোড়াবে।

২. যখন তিনি স্বজাতির দিক থেকে নিরাশ হলেন এবং পিতাও কঠোরতা শুরু করল, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) হিজরতের এরাদা করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে 'শাম' দেশের পথ প্রদর্শন করলেন।

৩. অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও দেশ ছাড়লাম। সুতরাং দীন-ধর্মের কাজে আমার সাহায্য এবং দীনী ধারাকে অবশিষ্ট রাখার জন্য আমাকে একজন সুসন্তান দান করুন।

৪. **'যাবীহুল্লাহ' হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ) নন**

এখান থেকে জানা গেল, হযরত ইবরাহীম (আ) সন্তান লাভের জন্য দো'য়া করেন, যা আল্লাহ তাআলা কবূল করেন। আর (দোয়ার মাধ্যমে লাভ করা) সেই সন্তানকেই কুরবানীর

জন্য পেশ করা হয়। বর্তমান তাওরাত থেকেও জানা যায়, যে পুত্রসন্তান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দো'য়ার ফলে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)। আর এ জন্যই তাঁর নাম ইসমাঈল রাখা হয়- কেননা, إسماعيل দুটি শব্দের সমষ্টি- سمع ও إيل ; سمع এর অর্থ শ্রবণ করা এবং إيل এর অর্থ আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললেন, আমি ইসমাঈল সম্পর্কে তোমার দো'য়া শুনেছি। এ জন্য বর্তমান আয়াতে যার উল্লেখ হয়েছে, তিনি হযরত ইসমাঈলই, হযরত ইসহাক (আ) নন (সুতরাং 'যাবীহুল্লাহ' হযরত ইসহাক নন। বরং হযরত ইসমাঈল আ.)।

তদুপরি, কুরবানী প্রভৃতি ঘটনার আলোচনার পর আলাদাভাবে হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেমন সামনে আসছে- وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا। বোঝা গেল, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ এর মধ্যে ইসহাক (আ) ছাড়া অন্য কোন পুত্রের (অর্থাৎ ইসমাঈলের) সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি প্রমাণ

তাছাড়া, হযরত ইসহাক (আ.)-এর জন্মের সুসংবাদের সাথে সাথে এরও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি নবী হবেন। আর সূরা হূদে তাঁর সঙ্গে হযরত ইয়াকূব (আ)—এর সুসংবাদও শোনানো হয়েছে, যিনি হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র হবেন। ইরশাদ হয়েছে— وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ ('এবং ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম।' —হূদ, আয়াত ৭১)। সুতরাং কী করে এ ধারণা করা যায় যে, হযরত ইসহাক (আ) যাবীহুল্লাহ? তা হলে তো অর্থ এই হবে যে, নবী বানানো এবং সন্তান দানের পূর্বেই তাঁকে যবেহ করে দেওয়া হবে! এ অসম্ভব। অগত্যা মানতেই হবে যে, ذبيح الله হচ্ছেন হযরত ইসমাঈলই (আ.), যাঁর জন্মের সুসংবাদের সময় তাঁর নবী হওয়া বা সন্তান লাভ করা- এমন কোন ওয়াদাই করা হয়নি। যাবীহ যেহেতু হযরত ইসমাঈল- এ কারণেই কুরবানীর পুণ্যস্মৃতি ও প্রথা হযরত ইসহাক (আ.)-এর পরিবর্তে হযরত ইসমাঈল (আ)-এরই বংশের লোকদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে অব্যাহতভাবে চলে আসছে। আর বর্তমানেও ইসমাঈল (আ)-এর রূহানী সন্তানেরাই (অর্থাৎ মুসলমানরা) এই পবিত্র পুণ্যস্মৃতির ধারক ও বাহক।

কুরবানীর স্থান ছিল 'মারওয়া'

প্রচলিত তাওরাতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, 'মূরা' বা 'মুরয়া' ছিল কুরবানীর স্থান। এটি কোন্ স্থান, তা নির্ধারণে ইহুদী ও খ্রিস্টানরা অত্যন্ত অর্থহীন ও দূরবর্তী বিবিধ সম্ভাবনার কথা বলেছে। অথচ অত্যন্ত নিকটবর্তী ও সহজ কথা এ-ই যে, এ দ্বারা কাবাগৃহের সম্মুখস্থ অতি নিকটবর্তী 'মারওয়া'ই উদ্দেশ্য, যেখানে সাফা-মারওয়ার সাঈ শেষে উমরা সম্পাদনকারীরা হালাল হন। আর সম্ভবত بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ আয়াতাংশে উক্ত সাঈ-এর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম মালেক (র)-এর হাদীসগ্রন্থ মুওয়াত্তার এক বর্ণনায় (১৪৬৮) আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মারওয়া'র প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন- এ কুরবানীর স্থান। সম্ভবত এ দ্বারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর কুরবানীর স্থানের দিকেই

ইশারা করা উদ্দেশ্য। নতুবা হুযূরের আমলেও বর্তমানের ন্যায় লোকেরা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী মিনাতেই কুরবানী করত। মারওয়াতে নয়। বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ)-এর আসল কুরবানীর স্থান 'মারওয়া'-ই ছিল। পরবর্তীকালে হাজীদের ও কুরবানীর জন্তুর আধিক্যহেতু মিনা পর্যন্ত কুরবানীর স্থান প্রসারিত করা হয়। পবিত্র কুরআনেও هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ {যা নজরানারূপে কাবায় পৌঁছবে। –মায়েদা : ৯৫} এবং ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ('অতঃপর সেগুলির স্থান সেই প্রাচীন গৃহের নিকট। –হজ্জ : ৩৩') বলা হয়েছে, যদ্বারা কাবার নৈকট্য প্রকাশ পায়। والله أعلم

যা হোক, দলীল-প্রমাণ এ কথাই বলে যে, যাবীহুল্লাহ হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আ), যিনি মক্কায় এসে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর বংশ বিস্তার লাভ করে।

আরো দলীল-প্রমাণ

তাওরাতে এও স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নিজের 'একমাত্র' ও প্রিয় পুত্রের কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর সর্বজনস্বীকৃত যে, হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইসহাক (আ) থেকে বয়সে বড়। সুতরাং 'যাবীহ' হযরত ইসমাঈল (আ), যিনি ইসহাকের জন্মের পূর্বে একমাত্র পুত্র ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ) তো একমাত্র সন্তান ছিলেন না!

আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন, এস্থলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার উত্তরে যে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁকে غلام حليم বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যখন হযরত ইসহাক (আ)-এর সুসংবাদ ফেরেশতাদের মাধ্যমে দেওয়া হল, তখন তারা তাঁকে غلام عليم বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর উপর বা অন্য কোন নবীর উপর حليم শব্দটির প্রয়োগ কুরআনে কোথাও করা হয়নি। হাঁ আলোচ্য আয়াতে যে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে কেবল সেই পুত্র এবং তাঁর পিতা ইবরাহীমকেই এই উপাধিতে (حليم) ভূষিত করা হয়– إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (হূদ, আয়াত ৭৫) এবং إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (তওবা, আয়াত ১১৪)—এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, এ দুই পিতা-পুত্রই এ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার বিশেষভাবে যোগ্য (মোটকথা, যাঁকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে غلام حليم বলা হয়েছে। অথচ হযরত ইসহাক (আ.)-কে غلام عليم বলা হয়েছে। তাঁর জন্য কোথাও حليم শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। তাই 'যাবীহ' তিনি ছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আরেক সন্তান অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ.)।)

حليم ও صابر প্রায় সমার্থক। আর এই غُلَامٌ حَلِيمٌ (সহনশীল পুত্র) এখানে নিজের ব্যাপারে বলেছেন–سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ('আপনি আমাকে আল্লাহ চাহেন তো, অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন।') অন্যত্র পরিষ্কার বলা হয়েছে– وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফল– তারা সকলে ছিলেন ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত।' (আম্বিয়া, আয়াত ৮৫)। সম্ভবত এ জন্যই সূরা 'মারয়ামে' হযরত ইসমাঈল (আ)-কে صادق الوعد বলা হয়েছে। কারণ, سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ

১০২. অতঃপর যখন সে আপন পিতার সঙ্গে ছোটাছুটি করার বয়সে উপনীত হল, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি, তোমাকে যবেহ করছি। তাই তুমি চিন্তা করে দেখ, তোমার অভিমত কী?' সে বলল, 'হে আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, তা করে ফেলুন। আপনি আমাকে আল্লাহ চাহেন তো, অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন[১]।'

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

مِنَ الصَّابِرِيْنَ এর মধ্যে যে ওয়াদা করা হয়েছে, তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন।

মোট কথা, حليم, صابر ও صادق الوعد–এই উপাধিগুলির পাত্র একই ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম (সুতরাং তিনিই 'যাবীহুল্লাহ')।

সূরা বাকারায় (আয়াত ১২৮) আছে, কাবাগৃহ সংস্কারের সময় হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) যে দোয়া করেছিলেন, তাতে এ বাক্যও আছে– وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ('আর আমাদের আপনার পূর্ণ অনুগত বানান এবং আমাদের সন্তানসন্ততির মধ্যেও আপনার অনুগত একটি জামাত বানান।') এতে যেমন مسلمين -এই দ্বিবচন শব্দটি আছে, তেমনি আলোচ্য কুরবানীর ঘটনায় فعل (ক্রিয়া) থেকে দ্বিবচন ব্যবহার করে বলা হয়েছে– فلما أسلما এবং এ উভয়ের বংশধরকেই বিশেষভাবে مسلم উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ পিতা-পুত্র যথাক্রমে কুরবানী করা ও কুরবান হওয়ার মাধ্যমে اسلام অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে আত্মসমর্পণ, আত্মনিবেদন এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ পেশ করেছেন। এই أسلما অর্থাৎ উভয়ের আত্মসমর্পণেরই বরকত হল, আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুই জনের বংশধরকে أمة مسلمة নামে ভূষিত করেছেন। فلله الحمد على ذلك

১. অর্থাৎ ইসমাঈল যখন পিতার সঙ্গে ছোটাছুটি করার এবং তাঁর কাজে সাহায্য করার বয়সে পৌছলেন, তখন ইবরাহীম (আ) ছেলেকে নিজ স্বপ্নের কথা শোনালেন, যাতে বোঝা যায় যে, ছেলে খুশীতে প্রস্তুত হবে, না জোর খাটাতে হবে।

কথিত আছে, পরপর তিন রাতে একই স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তৃতীয় দিন ছেলেকে অবহিত করেন। ছেলে বিনা দ্বিধায় কবুল করে বললেন– আব্বাজান! (দেরি কেন) মালিকের যা হুকুম, পালন করুন। (এরূপ কাজে পরামর্শের প্রয়োজন নেই– আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনে পিতৃস্নেহ বাধার কারণ হওয়া উচিত নয়।) রইল আমার ব্যাপার– অতএব আপনি ইনশাআল্লাহ দেখতে পাবেন, কীরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে আত্মনিবেদন করি।

এরূপ পিতাপুত্রের উপর আল্লাহ তাআলার রহমত-বৃষ্টি বর্ষিত হোক।

فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ ۚ

১০৩. অতঃপর যখন তাঁরা উভয়ে আদেশ মান্য করলেন এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন–[১]।

وَنَادَيۡنٰهُ اَنۡ يّٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ ۙ

১০৪. আর আমি তাঁকে ডেকে বললাম, 'হে ইবরাহীম!

قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

১০৫. 'তুমি তো স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখালে[২]।' আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓـؤُا الۡمُبِيۡنُ

১০৬. নিশ্চয়ই এ ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা[৩]।

وَفَدَيۡنٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيۡمٍ

১০৭. আর আমি সেই পুত্রের বিনিময়ে দান করলাম এক মহান কুরবানীর পশু[৪]।

---

১. উপুড় করে এজন্য শোওয়ালেন, যাতে পুত্রের চেহারা চোখের সামনে না থাকে। তাতে পিতৃস্নেহ উথলে উঠতে পারে। বলা হয়, এটা ছেলেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

শোয়ানোর পর কী হল, তা আয়াতে বলা হয়নি। উদ্দেশ্য হল– তখন ইবরাহীমের (আ.) মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বইল এবং এ দৃশ্য দেখে ফেরেশতাদেরও যে অবস্থা হল, তা ভাষায় বর্ণনার অতীত!

২. অর্থাৎ এবার থামুন– আপনি নিজ স্বপ্ন সত্য করে দেখিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য পুত্রকে যবেহ করানো নয়; বরং আপনাকে পরীক্ষা করা। তাতে তো আপনি পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৩. অর্থাৎ এরূপ কঠিন নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করি, অতঃপর সৎকর্মশীলদের দৃঢ়পদ রাখি। ফলে তাঁদের বুলন্দ মর্তবা দান করি।

তাওরাতে আছে– যখন ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতে চাইলেন এবং ফেরেশতারা ডাক দিয়ে তাঁকে থামতে বললেন, তখন ফেরেশতাগণ এই কথাগুলি বলেছিলেন– 'আল্লাহ বলেন যে, যেহেতু আপনি এরূপ মহান কাজ করেছেন এবং নিজের একমাত্র পুত্রকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেননি, তাই আমি আপনাকে বরকত দেব এবং আপনার বংশকে আকাশের তারকারাজি ও সমুদ্র সৈকতের বালুকারাশির ন্যায় বিস্তৃত করে দেব। (তাওরাত, তাকভীন [পয়দায়েশ] ২২ :১৫-১৭)

৪. ذبح عظيم –অর্থাৎ বড় মর্যাদাশালী জন্তু, যা বেহেশত থেকে এসেছে। অথবা বিরাট দামী, মোটা, হৃষ্টপুষ্ট জন্তু। অতঃপর এই কুরবানী-প্রথাকে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পুণ্যস্মৃতি হিসাবে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়।

১০৮. এবং ইবরাহীমের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ রীতি চালু রেখেছি যে–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝١٠٨

১০৯. (তারা বলে,) সালাম বর্ষিত হোক ইবরাহীমের উপর[১]।

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ۝١٠٩

১১০. আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝١١٠

১১১. নিশ্চয় তিনি আমার ঈমানদার বান্দাদের (বিশিষ্ট) একজন[২]।

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝١١١

১১২. আর আমি তাঁকে ইসহাকেরও সুসংবাদ দিলাম, যিনি নবী, পুণ্যবানদের (বিশিষ্ট) একজন[৩]।

وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ۝١١٢

১১৩. এবং আমি তাঁর উপর ও ইসহাকের উপর বরকত নাযিল করেছি। আর তাঁদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে সৎকর্মশীলও আছে এবং নিজের প্রতি সুস্পষ্ট জুলুমকারীও রয়েছে[৪]।

وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ۝١١٣

---

১. অদ্যাবধি দুনিয়াবাসী ইবরাহীম (আ)-কে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে– على نبينا وعليه ألف سلام وتحية

২. অর্থাৎ তিনি আমার সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঈমানদার বান্দাদের একজন।

৩. বোঝা গেল, প্রথম সুসংবাদ ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে ছিল এবং কুরবানীর সমস্ত কাহিনী তাঁকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে।

৪. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ذريتهما -দ্বারা দুই পুত্রের সন্তানাদি উদ্দেশ্য। দুই পুত্র থেকে বহু সন্তান-সন্ততি বিস্তার লাভ করে। ইসহাক (আ)-এর বংশধরের মধ্যে বনী ইসরাঈলের নবীগণ জন্ম লাভ করেন। আর ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে রয়েছে আরবগণ, যাদের মধ্যে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন। محسن وظالم– অর্থাৎ বংশধরের মধ্যে সবাই সমান নয়– ভালও আছে, যারা বড়দের নাম সমুজ্জ্বল রাখে এবং মন্দও আছে, যারা নিজেদের দুষ্কৃতির কারণে বংশের কলঙ্ক বলে আখ্যায়িত হয়।

বি. দ্র. অধিকাংশ মুফাসসির وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا এর ضمير তথা সর্বনাম দ্বারা 'ইবরাহীম' ও 'ইসহাক (আ)'-কে উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) 'ইসমাঈল' ও 'ইসহাক (আ)' উদ্দেশ্য করে আলোচ্য বিষয়ে অনেক ব্যাপকতার সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

[রুকূ - ৪]

১১৪. নিশ্চয় আমি মূসা ও হারূনের প্রতিও বিশেষ অনুগ্রহ করেছি।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١١٤﴾
১১৫. এবং তাঁদের ও তাঁদের সম্প্রদায়কে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছি [১]।	وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿١١٥﴾
১১৬. আর আমি তাঁদের সাহায্য করেছি, ফলে তাঁরাই বিজয়ী হয়েছে[২]।	وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾
১১৭. এবং তাঁদের সুস্পষ্ট কিতাব দিয়েছি [৩]।	وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. এবং তাঁদের প্রদর্শন করেছি সরলপথ[৪]।	وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾
১১৯. আর তাঁদের উভয়ের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ রীতি চালু রেখেছি যে-	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. (তারা বলে)- মূসা ও হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।	سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. নিশ্চয় তাঁরা ছিলেন আমার (বিশিষ্ট) ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত[৫]।	اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১. অর্থাৎ ফেরাওন ও তার জাতির জুলুম-অত্যাচার থেকে তাঁদের উদ্ধার করি এবং লোহিত সাগর অতি সহজে পার করিয়ে দেই।

২. অর্থাৎ ফেরাওনকে সদলবলে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে বনী ইসরাঈলকে প্রাবল্য ও বিজয় দান করলাম এবং তাদেরকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ধন-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বানিয়ে দিলাম।

৩. অর্থাৎ তাওরাত শরীফ, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ কাজকর্মে ও কথাবার্তায় দীনী অবিচলতা দান করি এবং সকল বিষয়ে সরলপথে পরিচালিত করি। মূলত এ সবই নবীদের নিষ্পাপতার অবধারিত অনুষঙ্গ।

৫. অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন আমার কামেল ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম।

১২৩. নিশ্চয় ইলয়াসও রাসূলদের একজন।	وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. (স্মরণ কর), যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'তোমরা কি ভয় কর না?'	اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. 'তোমরা কি 'বাআ'ল' কে ডাক এবং পরিত্যাগ কর সর্বোত্তম স্রষ্টাকে[১]?	اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. 'আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের রব[২]?'	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾
১২৭. কিন্তু ওরা তাঁকে অস্বীকার করল। অতএব ওরা অবশ্যই (আযাবে) ধৃত হবে[৩]–	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের (কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন)[৪]।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এ রীতি চালু রেখেছি যে–	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. (তারা বলে)– ইলয়াসীনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক[৫]।	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾

১. হযরত ইলয়াস আলাইহিস সালাম কারো কারো মতে হযরত হারূনের বংশধর। আল্লাহ তাআলা তাঁকে শামদেশের (بعلبك) 'বা'লাবাক' নামক শহরে প্রেরণ করেন। সেখানকার লোকেরা 'বাআ'ল' নামক এক মূর্তির পূজা করত। হযরত ইলয়াস (আ) ওদের আল্লাহর গযব ও মূর্তিপূজার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেন।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় মানুষও চিন্তা-ভাবনা ও কলা-কৌশল ব্যবহার করে বাহ্যত অনেক বস্তু-সামগ্রী তৈরি করে। কিন্তু সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী তিনিই, যিনি সমস্ত মূল ও শাখা-প্রশাখা, পদার্থ ও গুণাগুণ এবং গুণাবলী ও গুণধারী– সকলের ও সবকিছুর প্রকৃত স্রষ্টা, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টি করেছেন। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টাকে ছেড়ে উক্ত মূর্তির পূজা করা ও তার কাছে সাহায্য চাওয়া কী করে বৈধ হতে পারে? যে মূর্তি একটি কণা পর্যন্ত বাহ্যিকভাবেও সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তার অস্তিত্ব পর্যন্ত নিজ পূজারীদের দান, ওরা যেমন চেয়েছে, তৈরি করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে– তা উপাস্য হয় কীভাবে?

৩. অর্থাৎ ওরা তাঁকে অবিশ্বাস করার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে।

৪. অর্থাৎ সকলেই তাঁকে অস্বীকার করেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দারা অস্বীকার করেনি। সুতরাং একমাত্র তারা শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৫. 'হযরত ইলয়াস'কে 'ইলয়াসীন'ও বলা হয়– যেরূপ 'তূরে সাইনা'কে 'তূরে সিনীন'ও বলা হয়ে থাকে। অথবা 'ইলয়াসীন' দ্বারা হযরত ইলয়াস (আ)-এর অনুসারীগণ উদ্দেশ্য।

১৩১. আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১৩২. নিশ্চয় তিনি আমার ঈমানদার বান্দাদের (বিশিষ্ট) একজন।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৩৩. নিশ্চয়ই লূতও ছিলেন রাসূলদের একজন।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৩৪. (স্মরণ কর), যখন আমি রক্ষা করলাম তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে–

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝

১৩৫. এক বৃদ্ধা ছাড়া, যে রয়ে গেল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে[১]।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝

১৩৬. অতঃপর আমি অন্যদের নির্মূল করে দিলাম[২]।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝

১৩৭. আর তোমরা তো ওদের (বাসভূমির) উপর দিয়ে ভোর বেলায় যাতায়াত কর,

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۝

১৩৮. এবং রাতেও। তার পরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না[৩]?

وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

আবার কেউ কেউ শব্দটিকে (آل ياسين) 'আলে-ইয়াসীন' পড়েছেন। তো 'ইয়াসীন' তাঁর পিতার নাম আর তিনি 'আলে ইয়াসীন' অর্থাৎ ইয়াসীন এর সন্তান। অথবা হতে পারে, ইয়াসীন তাঁরই নাম। আর শুরুর آل শব্দটি অতিরিক্ত– যেমন: كما صليت على آل إبراهيم অথবা اللّٰهُمَّ صل على آل أبي أوفى এর মধ্যে آل অতিরিক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. অর্থাৎ তাঁর স্ত্রী, যে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

২. অর্থাৎ লূৎ ও তাঁর পরিবারবর্গ ছাড়া অন্যা সকল বাসিন্দার উপর জনপদটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়। এ কাহিনী ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এখানে মক্কাবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা, মক্কা থেকে যেসব কাফেলা শামে যাতায়াত করত, তাদের রাস্তা থেকে লূত জাতির উল্টিয়ে দেওয়া বসতিগুলো দৃষ্টিগোচর হত। অর্থাৎ ওরা রাতদিন সেদিকে যাতায়াতকালে এই নিদর্শন দেখে, তবু ওদের শিক্ষা হয় না। ওরা কি বোঝে না, এক অবাধ্য জাতির যে দশা হয়েছিল, ঠিক সে দশা অন্যান্য অবাধ্য জাতিরও হতে পারে?

[রুকূ - ৫]

১৩৯. নিশ্চয় ইউনুসও ছিলেন রাসূলদের একজন।

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৪০. (স্মরণ কর), যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে এক বোঝাই নৌকায় উঠলেন,

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝

১৪১. তারপর তিনি লটারীতে অংশগ্রহণ করলেন এবং পরাভূত হলেন (অর্থাৎ দোষী হিসেবে তাঁর নামই উঠল)[১]।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝

১৪২. পরে মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, আর তিনি ছিলেন অভিযুক্ত*[২]।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝

১৪৩. তিনি যদি তাসবীহ পাঠে রত না হতেন,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝

১৪৪. তবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তারই পেটে থাকতেন[৩]।

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

---

১. নৌকা সমুদ্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। লোকেরা বলল, নৌকায় এমন কোন গোলাম রয়েছে, যে নিজ মালিক থেকে পালিয়ে এসেছে। আরোহীদের সকলের নামে কয়েকবার লটারী দেওয়া হলে প্রত্যেক বার তাঁর নাম ওঠে। –সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়াতে এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তিনি (নিজেকে) ভর্ৎসনা করছিলেন'।

২. এই অভিযোগ ছিল যে, তিনি ইজতেহাদী ভুলবশত আল্লাহ তাআলার হুকুমের অপেক্ষা না করেই জনপদ থেকে বের হয়ে গেলেন এবং একটি দিন নির্দিষ্ট করে বলে গেলেন যে, সেদিন আযাব আসবে।

৩. যেহেতু তিনি মাছের পেটের মধ্যে এবং পেটে যাওয়ার পূর্বেও আমাকে খুব স্মরণ করতেন, সেজন্য আমি শীঘ্র তাঁকে নাজাত দিলাম। নতুবা কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেট থেকে বের হওয়ার সৌভাগ্য হত না, কেননা মাছের খাদ্যে পরিণত হয়ে যেতেন।

বি. দ্র. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কখনো বের হতে না পারা। আর এ ঘটনা ফুরাত নদীর। প্রসঙ্গত আল্লামা মাহমূদ আলুসী বাগদাদী (র) লেখেন, 'আমরা এ নদীতে বিরাট বিরাট মাছ প্রত্যক্ষ করেছি। সুতরাং এ ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'

পূর্বে (আম্বিয়া : ৮৭) বলা হয়েছে, মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর তাসবীহ ছিল– لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

১৪৫. তার পর আমি তাঁকে এক খোলা প্রান্তরে ফেলে দিলাম, আর তিনি ছিলেন রুগ্ন।	فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۚ
১৪৬. এবং তাঁর উপর একটি লতাজাতীয় গাছ উদ্গত করে দিলাম[১]।	وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۚ
১৪৭. আর তাঁকে এক লক্ষ বা তারও বেশি মানুষের নিকট রাসূলরূপে পাঠালাম[২]।	وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۚ
১৪৮. এবং তারা ঈমান আনল। ফলে আমি তাদের একটা সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগের সুযোগ দিলাম[৩]।	فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۚ
১৪৯. অতএব আপনি ওদের (মক্কার মুশরিকদের) জিজ্ঞাসা করুন, 'তোমার রবের জন্যই কি রয়েছে কন্যাসন্তানেরা আর ওদের জন্য পুত্রসন্তানেরা?	فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۚ

১. মাছের প্রতি নির্দেশ হলে সে হযরত ইউনুসকে পেট থেকে বের করে একটি খোলা মাঠে ফেলে দিল। সম্ভবত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য, বায়ু ইত্যাদি মাছের পেটে না ঢোকায় তিনি অসুস্থ ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিলেন। কথিত আছে, গায়ে একটি মাছি বসলে বা সামান্য রৌদ্রকিরণ পড়লেও তাঁর কষ্ট হত। আল্লাহ তাআলার কুদরতে সেখানে একটি কদুগাছ উৎপন্ন হয়। তার পাতা তাঁকে ছায়া দিল। তদ্রূপ আল্লাহর কুদরতে খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতির ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ শুধু সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালকদের ধরলে এক লাখ ছিল, আর ছোট-বড় সকলকে শামিল করলে লাখের অধিক ছিল। অথবা এমনও বলা যায়, এক লাখের বেশি ও দুই লাখের কম ছিল। ভগ্নাংশ না ধরলে এক লাখ বলতে হয়, আর ভগ্নাংশ ধরলে লাখ থেকে কয়েক হাজার বেশি হবে।

৩. অর্থাৎ ঈমান ও ঈয়াকীনের বদৌলতে তাঁর জাতি আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রক্ষা পায় এবং তাদের নির্ধারিত জীবনকাল পর্যন্ত দুনিয়ার জীবন উপভোগ করতে থাকে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, তিনি যাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারা তাঁর সন্ধানে ছিল, এমন সময় তিনি গিয়ে উপস্থিত হলে তারা খুবই আনন্দিত হয়।'

এ কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা ইউনুস (আয়াত ৯৮) ও সূরা আম্বিয়াতে (আয়াত ৮৭-৮৮) গত হয়েছে- তা দ্রষ্টব্য।

১৫০. 'অথবা আমি কি ফেরেশতাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছি আর ওরা (তা) দেখছিল?'	اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۝
১৫১. শোনো! ওরা শুধুমাত্র নিজেদের মনগড়া কথার ভিত্তিতে বলে–	اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝
১৫২. 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন'! আর ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী[১]।	وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝
১৫৩. তিনি কি পুত্রসন্তানদের পরিবর্তে কন্যাসন্তানদের পছন্দ করেছেন?	اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ নবীদের অবস্থা তো শোনা হল যে, হযরত নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা, হারুন, ইলয়াস, লূত, ইউনুস আলাইহিমুস সালাম– সকলেরই সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলার সাহায্যেই হয়েছে। যত বড় নৈকট্যপ্রাপ্তই হোন না কেন, আল্লাহর সাহায্য থেকে তিনি বে-নিয়ায নন।

ফেরেশতা ও জিনদের ব্যাপারে আরব মুশিরদের ঘৃণ্য আকীদা ও এর খণ্ডন

এবার ফেরেশতাদের ও জিনদের কিছু অবস্থা শুনে রাখ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ মালুম মুশরিকরা কী সব ধ্বংসকর আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত! যেমন: আরবের কোন কোন গোত্র বলত, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। তাঁদের মায়েরা কারা, জিজ্ঞাসা করা হলে বলত, বড় বড় জিনের মেয়েরা। এভাবে (العياذ بالله) জিন ও ফেরেশতা উভয় জাতির সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আত্মীয়তার সম্পর্ক সাব্যস্ত করে রেখেছিল। সম্মুখে উভয়ের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে। তবে তার আগে ভূমিকা হিসাবে আরবের কাফেরদের এহেন ঘৃণ্য আকীদার খণ্ডনে তাদের প্রতি একটি প্রশ্ন করা হয়েছে।

সে মত আল্লাহ তাআলা আলোচ্য সূরার প্রথম থেকে স্বীয় আজমত ও একত্ববাদের দলীল প্রমাণ এবং (পূর্ববর্তী উম্মতদের) কাহিনীর অধীনে নিজ মহান কুদরতের বিবিধ নিদর্শন বর্ণনার পর বলছেন– এখন এই নির্বোধদের একটু জিজ্ঞাসা কর যে, এত বড় আজমত ও কুদরতের মালিক আল্লাহ যদি নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করতেনও, তবে কি তিনি কন্যা গ্রহণ করতেন আর তোমাদের পুত্র দান করতেন? একে তো এত বড় ধৃষ্টতা দেখিয়ে মহান আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করেছে, তাও আবার দুর্বল এবং তাদের দৃষ্টিতে যারা নিকৃষ্ট তাদেরকে তাঁর জন্য রেখেছে। তদুপরি ফেরেশতাদের মেয়ে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে কি আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তখন ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল যে, তাদের নারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে? لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এই মূর্খতার কোন শেষ আছে কি?

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার কর?	مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ۝
১৫৫. তোমরা কি ভেবে দেখ না[১]?	اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۝
১৫৬. অথবা তোমাদের নিকট কি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে?	اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِیْنٌ۝
১৫৭. তাহলে তোমাদের কিতাব আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]।	فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۝
১৫৮. আর ওরা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জিনেরা নিশ্চয় জানে যে, ওরা অবশ্যই ধৃত হবে।	وَجَعَلُوْا بَیْنَهٗ وَبَیْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ۝
১৫৯. ওরা যা কিছু বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র[৩]।	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یَصِفُوْنَ۝

১. অর্থাৎ একটু চিন্তা তো কর। অসৎ কর্মের, ভ্রান্ত বিশ্বাসেরও তো একটা সীমা থাকা চাই। একটা ভ্রান্ত আকীদা তৈরি করতে হবে বলে তা কি এ পরিমাণ বেহুদা–অর্থহীন হতে হবে? এটা কোন্ ধরনের বিচার-বুদ্ধির কথা যে, নিজেদের জন্য তো পুত্রসন্তান পছন্দ করলে আর আল্লাহ তাআলার জন্য কন্যাসন্তান রেখে দিলে?

২. অর্থাৎ তোমরা এই বেহুদা ও উদ্ভট ধারণা কোথা থেকে পেলে? আকল-বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য নীতিমালার সঙ্গে তো এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে কি এ আকীদার স্বপক্ষে কোন ধর্মীয় প্রমাণ আছে? থাকলে তাই দেখাও।

৩. অর্থাৎ এই নির্বোধেরা আল্লাহ ও জিনদের মাঝে জামাই-শ্বশুরের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। সুবহানাল্লাহ, কী সব কথা ওরা বলে। সম্ভব হলে জিনদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, স্বয়ং তারা নিজেদের সম্পর্কে কী ধারণা করে। তারা জানে, অন্যান্য অপরাধীর মত তারাও গ্রেফতার হয়ে আল্লাহর হুযূরে আসবে। তা, শ্বশুরের সঙ্গে কি জামাতার এ ধরনের সম্পর্ক হয়?

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী جَعَلُوْا نَسَبًا-এর এই অর্থ নিয়েছেন যে, কাফেররা দুষ্ট জিনদের আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত, যেমন- অগ্নিপূজকরা يزدان ও أهرمن -কে (পরস্পরের সমকক্ষ এবং) একজনকে পুণ্যের খোদা, আর একজনকে মন্দের খোদা বলে বিশ্বাস করে।

১৬০. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের (কথা ভিন্ন)[১]।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

১৬১. বস্তুত, তোমরা ও যাদের উপাসনা তোমরা কর-

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

১৬২. তোমরা সকলে আল্লাহর ব্যাপারে (কাউকে) বিভ্রান্ত করতে পারবে না,

مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬৩. তবে তাকেই, যে জাহান্নামে প্রবেশ-কারী[২]।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

১৬৪. 'আমাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে এক নির্ধারিত স্থান[৩]।'

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

---

১. অর্থাৎ জিন জাতির হোক বা মানব জাতির, একমাত্র আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দারাই উক্ত ধর-পাকড় থেকে রক্ষা পাবে। বোঝা গেল, আল্লাহর সাথে কারো কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধ নেই, তাঁর দরবারে আছে শুধু বন্দাত্ব ও ইখলাসের মূল্য।

২. বহু লোক মনে করে, পাপের লাগাম জিনদের হাতে আর পুণ্যের লাগাম ফেরেশতাদের হাতে। ফেরেশতাগণ যাকে ইচ্ছা কল্যাণের পথে অগ্রসর করেন এবং আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বানিয়ে দেন। আর জিনেরা যাকে ইচ্ছা অমঙ্গল ও কষ্টে ফেলে বা পথভ্রষ্ট করে। সম্ভবত এ সকল কাল্পনিক এখতিয়ারের কারণেই ফেরেশতাদেরকে সন্তান এবং জিনদেরকে শ্বশুর সাব্যস্ত করে রেখেছিল।

এহেন ধ্যান-ধারণার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের এবং তাদের হাতে কোনই স্বতন্ত্র এখতিয়ার নেই। তোমরা এবং যে শয়তানদের তোমরা পূজা কর, সকলে মিলেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে একটি প্রাণীকেও গোমরাহ করার শক্তি রাখ না। গোমরাহ সে-ই হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা তার অযোগ্যতা ও অমার্জনীয় পাপাচারের কারণে দোযখী লিখে দিয়েছেন এবং যে নিজের পাপাচারের কারণেই নিজ থেকে দোযখের পথ ধরেছে।

৩. এটি ফেরেশতাদের উক্তি, যা আল্লাহ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে তাদের যবানে পেশ করলেন, যেমন: কুরআনের অনেক স্থানে তিনি মানুষের যবানে দো'য়াসমূহ পেশ করেছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফেরেশতার একটি নির্ধারিত সীমা আছে, তিনি তা লঙ্ঘন করতে পারেন না।

এ কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, কাফেররা বলে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা, জিনদের স্ত্রীদের গর্ভে জন্ম হয়েছে। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, জিনেরা নিজ অবস্থা খুব ভাল করেই জানে (অর্থাৎ তারা ধৃত হবে)। আর ফেরেশতাগণ বলেন– আল্লাহ তাআলার হুকুমের বাইরে যাওয়ার অবকাশ তাঁদের নেই।

১৬৫. 'এবং নিশ্চয় আমরাই সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছি[১]।

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ۟ۚ

১৬৬. 'এবং আমরাই তাস্‌বীহ পাঠকারী[২]।'

وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۝

১৬৭. আর ওরা (মুশরিকরা) তো বলত–

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ۟ۙ

১৬৮. 'আমাদের নিকট যদি পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কোন উপদেশবাণী থাকত,

لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۟ۙ

১৬৯. 'তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহর মনোনীত বান্দা হয়ে যেতাম।'

لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১৭০. এখন ওরা তা অস্বীকার করেছে। অতএব শীঘ্রই জানতে পারবে[৩]।

فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের (অর্থাৎ রাসূল-দের) ব্যাপারে আমার এ কথা পূর্বেই স্থির হয়ে আছে যে–

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ۟ۚ

১৭২. নিশ্চয় তাঁরাই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۟

---

১. অর্থাৎ নিজ নিজ সারিতে প্রত্যেকে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী এবং তাঁর হুকুম শোনার জন্য দণ্ডায়মান থাকেন। সাধ্য নেই যে, একটু আগে পিছে সরে যাবেন।

২. এখানে ফেরেশতাদের কথা শেষ হল। সম্মুখে মক্কাবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩. আরবের লোকেরা নবীদের নাম শুনত, কিন্তু তাঁদের আনীত ইলম-জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তাই তারা বলত, আমরা যদি পূর্ববর্তীদের জ্ঞানমালা লাভ করতাম অথবা আমাদের কাছে কোন কিতাব ও নসীহতবাণী অবতীর্ণ হত, তবে আমরা খুব আমল করে দেখাতাম, মারেফত ও ইবাদতের মধ্যে উন্নতি করতাম এবং আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।'

কিন্তু এখন যখন তাদের মধ্যে নবী আসলেন, তারা ফিরে গেল। পূর্বের সে কথা ও প্রতিশ্রুতি কিছুই স্মরণ রাখল না। অতএব এই অস্বীকৃতি ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার যে পরিণাম, তা শীঘ্রই দেখে নেবে।

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে[১]।	وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ۝
১৭৪. অতএব আপনি কিছুকাল পর্যন্ত ওদের উপেক্ষা করুন।	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ۝
১৭৫. এবং ওদের দেখতে থাকুন। ওরাও শীঘ্র দেখে নেবে[২]।	وَاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ۝
১৭৬. তবে কি ওরা আমার আযাব তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ۝
১৭৭. তা যখন ওদের আঙ্গিনায় অবতীর্ণ হবে, তখন যাদের সতর্ক করা হয়েছে তাদের প্রভাত হবে খুবই মন্দ[৩]!	فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ۝
১৭৮. আপনি কিছু কাল পর্যন্ত ওদের উপেক্ষা করুন।	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ۝

১. অর্থাৎ এ কথা আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে সাব্যস্ত হয়ে আছে যে, তিনি কাফেরদের মোকাবেলায় স্বীয় পয়গম্বরদের সাহায্য করেন এবং অবশেষে আল্লাহর সৈন্যদলই বিজয় লাভ করে। মধ্যবর্তী অবস্থা যত প্রতিকূলই হোক, সর্বশেষ বিজয় ও সফলতা খাঁটি বান্দাদের জন্যই। এ বিজয় ও সফলতা জ্ঞানগত দলীল-প্রমাণের দিক দিয়েও লাভ হয় এবং বাহ্যিক প্রাধান্য ও আধিপত্যের আকারেও হাসিল হয়। তবে শর্ত এই যে, বাস্তবেই جند الله বা আল্লাহর লস্কর হতে হবে।

২. অর্থাৎ এখন কিছুদিন ওদের কিছু বলবেন না। ধৈর্যের সঙ্গে ওদের অবস্থা দেখতে থাকুন। ওরাও নিজেদের পরিণাম দেখে নেবে। কার্যত পরবর্তীতে দেখে নিয়েছেও।

৩. فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ শুনে ওরা বলে থাকবে– তবে আর দেরি কেন, আমাদের পরিণাম আমাদের সত্বর দেখিয়ে দাও। এর উত্তরে বলা হচ্ছে, নিজেদের উপর যে আপদ আনার জন্য তাড়াহুড়া করছ, তা সত্যসত্যই এসে পড়লে সে সময়টি অত্যন্ত দুঃসময় হবে। আল্লাহর আযাব এভাবে আসবে– যেমন: কোন শত্রু ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় আছে এবং ভোর হতে না হতেই ময়দানে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপকভাবে হতাহত করে গেল। ইতিপূর্বে ভয়ের কথা শুনিয়ে যাদের সতর্ক করা হয়েছে, আযাব আসলে তাদের ঠিক এই পরিণতি হবে। মক্কা বিজয় প্রভৃতিতে এমনই ঘটেছিল।

১৭৯. এবং দেখতে থাকুন। ওরাও শীঘ্র দেখে নেবে[১]।

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝

১৮০. ওরা যেসব কথা বলে তা থেকে আপনার রব পবিত্র, যিনি সকল ক্ষমতা-মর্যাদার মালিক।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝

১৮১. এবং শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের উপর।

وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝

১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের রব[২]।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

---

১. সম্ভবত পূর্বের আয়াতে (১৭৫) দুনিয়ার আযাব সম্পর্কে আর এ আয়াতে আখেরাতের আযাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আপনি দেখতে থাকুন, ভবিষ্যতে আখেরাতে এই কাফেরদের কী সব দেখতে হয়।

২. সূরার উপসংহারে সকল মৌলিক বিষয়ের সারসংক্ষেপ বলে দেওয়া হল– অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্র এবং সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণতার ধারক ও বাহক। সমস্ত সৌন্দর্য তাঁরই সত্তার মধ্যে নিহিত। আর নবী ও রাসূলদের প্রতি তাঁর পক্ষ থেকে সালাম আসে, যা তাঁদের মর্যাদাশীল, নিষ্পাপ, নিরাপদ ও বিজয়ী হওয়ার প্রমাণ।

বি. দ্র. হাদীসসমূহে বাদ নামায ও মজলিস-সমাপ্তিতে এই আয়াতগুলি (১৮০-১৮২) পাঠের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৮; মুজামে কাবীর তবারানী, বর্ণনা ৫১২৪) এজন্য আলোচ্য সূরার তাফসীরও এ বরকতময় আয়াতগুলির মাধ্যমে সমাপ্ত করছি। আয় আল্লাহ! আমার খাতেমা বা জীবনের সমাপ্তিও যেন এ পরিপক্ক আকীদার উপর হয়–

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

সূরা সোয়াদ

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৩৮ । ৮৮ আয়াত । ৫ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٨٨، رُكُوعَاتُهَا ٥

বিসমিল্লাহ:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ①

১. সোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ②

২. বস্তুত যারা কাফের, তারা অহমিকা ও বিরোধিতায় লিপ্ত[১]।

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ③

৩. আমি ওদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তখন ওরা আর্তনাদ করেছিল, অথচ তা তো পরিত্রাণের সময় ছিল না[২]।

وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ④

৪. ওরা এতে আশ্চর্য বোধ করেছে যে, ওদের নিকট ওদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন। আর কাফেররা বলতে শুরু করেছে- 'এ তো যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী[৩]।'

---

১. অর্থাৎ এ মহামর্যাদাশালী, উচ্চ মর্তবার অধিকারী কুরআন (যা অমূল্য নসীহতে ভরপুর এবং অত্যন্ত কার্যকর উপায়ে লোকদের হেদায়াত ও মারেফতের কথা বুঝিয়ে দেয়)- দৃপ্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে, কাফেররা যে কুরআনের সত্যতা এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতকে অস্বীকার করছে, তার কারণ এটা নয় যে, কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে বা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবলীগ ও বর্ণনার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। বরং এ অস্বীকৃতি ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আসল কারণ এই যে, এ লোকেরা মিথ্যা গৌরব, মূর্খতাপূর্ণ অহমিকা এবং শত্রুতাপূর্ণ বিরোধিতায় ডুবে আছে। এই গর্ত থেকে একটুখানি বের হলেই দেখতে পারত, তাদের সামনে সত্য ও হেদায়েতের আলোকিত রাজপথ পড়ে আছে।

২. অর্থাৎ এদের জানা উচিত, ঠিক এরূপ গর্ব ও অহংকারের কারণেই আল্লাহর নবীদের বিরোধিতা করে বহু সম্প্রদায় ইতিপূর্বে ধ্বংস হয়েছে। সেই লোকেরাও দীর্ঘদিন যাবৎ আল্লাহর পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। অতঃপর যখন দুঃসময় এসে পড়ল এবং আল্লাহর আযাব চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিল, তখন ঘাবড়ে গিয়ে চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করল। কিন্তু তখন ফরিয়াদ করে কী লাভ? নিষ্কৃতি ও মুক্তির সুযোগ ততক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং ওদের চিৎকার ও কান্নাকাটির প্রতি দৃষ্টি দানের সময় অতীত হয়ে গিয়েছিল।

৩. অর্থাৎ আসমান থেকে কোন ফেরেশতা আসলে তবু একটি কথা ছিল। কিন্তু আমাদেরই মধ্য থেকে একজন মানুষ আবির্ভূত হয়ে আমাদের সতর্ক করতে ও ধমকাতে শুরু করেছে এবং

৫. 'সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য সাব্যস্ত করেছে? এ তো বড় অদ্ভুত বিষয়।'

أَجَعَلَ الْأٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝

৬. আর ওদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা (মজলিস থেকে এই বলে) উঠে দাঁড়াল যে, চল এবং তোমাদের উপাস্যদের ব্যাপারে অবিচল থাক[১]।

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ

বলছে, আমি আসমানওয়ালা আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছি। এ আশ্চর্যের কথা। এখন এ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায় যে, একজন যাদুকর মিথ্যা, মনগড়া কথা প্রচার করছে। যাদুর জোরে কিছু ভেলকি দেখিয়ে একে মুজেযা বলতে শুরু করেছে এবং কিছু কিচ্ছা-কাহিনী সংকলন করে মিথ্যা দাবি করছে যে, এসব আল্লাহর নাযিলকৃত জ্ঞানরাজি, আর আমি তাঁর পয়গম্বর।

১. অর্থাৎ আরো শোন! এত অসংখ্য দেব-দেবীর রাজ খতম করে তিনি মাত্র একজন খোদা থাকতে দিলেন। এর চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, এত বিশাল জগতের ব্যবস্থাপনা একক আল্লাহর দায়িত্বে দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন শাখা ও বিভাগের যে দেব-দেবীর উপাসনা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে, তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে!! যেন আমাদের বাপদাদারা নিছক নির্বোধ ছিল! তারা (না বুঝে) এত দেব-দেবীর সামনে মাথা নত করে এসেছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, আবু তালিব অসুস্থ হলে আবু জাহলসহ কয়েকজন কুরায়শ-প্রধান আবু তালিবের নিকট এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অভিযোগ করল, ইনি আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করেন এবং আমাদের নানাভাবে নির্বোধ সাব্যস্ত করেন। আপনি তাকে বোঝান। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'চাচাজান! তাদের কাছে আমি একটিমাত্র কলেমার স্বীকারোক্তি কামনা করি। তারা তা মেনে নিলে সমস্ত আরব তাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরা তাদের খেদমতে জিযিয়া দিতে শুরু করবে।' তারা খুশী হয়ে বলল, 'বলুন, সেই কলেমাটি কী?' আপনি একটি কলেমার কথা বলছেন, আমরা আপনার দশটি কলেমা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি।' তিনি বললেন, 'বেশী নয়, একটিমাত্র, একটি কলেমাই– لا إله إلا الله

এ শোনামাত্র ওরা আক্রোশে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলে উঠল, 'এত সব খোদাকে হটিয়ে মাত্র এক খোদা! চল যাই, ইনি নিজ অভিসন্ধি থেকে কখনো ফিরবেন না। ইনি তো ব্যস, আমাদের উপাস্যদের পিছনে কোমর বেঁধে লেগেছেন। তোমরাও শক্তভাবে নিজেদের উপাস্যদের উপাসনা ও সহযোগিতায় অবিচল থাক, যাতে তার ষড়যন্ত্র ও প্রচার কোন দুর্বল বিশ্বাসীকেও পিতৃপুরুষদের পুরাতন ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তার অক্লান্ত চেষ্টা-

নিশ্চয়ই এ এক উদ্দেশ্যমূলক বিষয়[১]।	إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ ۝٦
৭. 'আমরা পরবর্তী ধর্মে এ কথা শুনিনি। এ মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছু নয়[২]।	مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ إِنْ هٰذَآ إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧
৮. 'আমাদের সকলের মধ্য থেকে তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হল[৩]?' আসলে, ওরা	ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ

সাধনার মোকাবেলায় আমাদের অনেক বেশি ধৈর্য ও অবিচলতা দেখানো প্রয়োজন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৩৪১৯; তিরমিযী, হাদীস :৩৫১২)

১. অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে এত জোরেশোরে এবং দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছেন, এতে অবশ্যই তাঁর কোন গরজ রয়েছে। তা হচ্ছে, এক আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি আমাদের সকলকে তাঁর প্রজা ও অনুগত বানাতে এবং পৃথিবীতে রাজত্ব ও আধিপত্য অর্জন করতে চান। অতএব আমাদের কর্তব্য হবে, তাঁকে এই উদ্দেশ্য হাসিলে সফল হতে না দেওয়া।

কোন কোন তাফসীরকার إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ এর এ অর্থ করেছেন যে, নিশ্চয় এটি এমন বিষয়, যার ইচ্ছা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করে ফেলেছেন, কোনক্রমেই তা থেকে পিছপা হবেন না। অথবা এই অর্থ যে, এ বিষয় হবেই হবে। আল্লাহর ইচ্ছা এ-ই যে, দুনিয়াতে এই বিপ্লব সংঘটিত হোক। সুতরাং যতদূর সম্ভব, ধৈর্য ও সবরের সাথে নিজেদের পুরাতন ধর্ম ও বিধান সংরক্ষণ করতে থাক। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, ওরা হেয় করত বলছে– নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছা-এরাদা এরূপই। কিন্তু মানুষ যাই ইচ্ছা ও কামনা করে তা পূর্ণ হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং আমাদের উচিত, তাঁর মোকাবেলায় পিছপা না হওয়া।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পরবর্তী ধর্ম' বলে বাপ-দাদাদের ধর্মকে বুঝাত। অর্থাৎ আমরা শুনেছি যে, পূর্বেকার লোকেরা এমনসব কথা বলত, কিন্তু আমাদের মুরব্বীরা তো এ রকম বলে যাননি।'

আর এও হতে পারে যে, الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ- বলতে নাসারাদের ধর্ম (খৃষ্টধর্ম) উদ্দেশ্য। অধিকাংশ সলফে সালেহীন তাই বলেছেন। অর্থাৎ, কিতাবধারী নাসারাদের সম্পর্কেও আমরা শুনিনি যে, তারা সকল খোদাকে বাদ দিয়ে এক খোদাকেই রেখেছে, বরং তারাও তো তিন খোদা মেনে থাকে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রাসূল বলে মানে না। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাঁর কোন সমর্থন থাকলে নাসারারা অবশ্যই তাঁকে গ্রহণ করত। বোঝা গেল, এসব শুধু তাঁর মনগড়া কথা (নাউযুবিল্লাহ)।

৩. অর্থাৎ ঠিক আছে, কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলেই মেনে নেওয়া হল এবং আসমান থেকে নবীরূপে কোন ফেরেশতাকে নাই পাঠানো হল; কিন্তু এ কথা কীভাবে মানা সম্ভব যে, খোদা

فِیْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِیْ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ ؕ

আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে আছে। বস্তুত, ওরা এখনো আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি[১]।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۚ

৯. ওদের নিকট কি আপনার রবের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ আছে, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا ۫ فَلْیَرْتَقُوْا فِی الْاَسْبَابِ ۝

১০. অথবা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তার রাজত্ব কি ওদের হাতে? তা হলে ওরা দড়ি টানিয়ে (আকাশে) আরোহণ করুক ✯ [২]।

আমাদের সকলের মধ্য থেকে একমাত্র মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-কেই বেছে নিয়েছেন?! সারা দেশে এই পদের জন্য একমাত্র তিনিই ছিলেন? আর কোন সর্দার ও ধনী মানুষ আল্লাহ পেলেন না, যার উপর স্বীয় কালাম নাযিল করতে পারতেন?

১. এ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওদের অসঙ্গত, বেহুদা কথার উত্তর। অর্থাৎ, ওদের এসব আজে-বাজে উক্তির কোন সারবত্তা নেই। আসল কথা এই যে, আমার নসীহতবাণী সম্বন্ধে ওদের এখনো সন্দেহ রয়েছে। ওরা এ কথা বিশ্বাস করে না যে, যে ভয়ঙ্কর আযাব সম্পর্কে ওদের সতর্ক করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। কেননা, এখন পর্যন্ত ওরা আল্লাহর চাবুকের 'স্বাদ' আস্বাদন করেনি! যখন ওদের উপর আল্লাহর চাবুক পড়বে, তখন সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**– '... যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে (আকাশে) আরোহণ করুক।' অথবা– 'ওরা (আসমানের) দ্বারসমূহে আরহণ করুক।'

২. অর্থাৎ রহমতের ভাণ্ডারসমূহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব– সবই আল্লাহর হাতে। তিনি পরাক্রমশালী ও বড়ই মার্জনাকারী। তিনি যার উপর যে অনুগ্রহ ইচ্ছা করতে পারেন, কেউ-ই এতে বাধা দিতে বা প্রশ্ন তুলতে পারে না।

সুতরাং তিনি যদি স্বীয় হেকমত ও জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা কোন মানুষকে নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত করেন, তবে তোমরা তাতে হস্তক্ষেপ করার কে? তোমাদের এরূপ বলার কী অধিকার যে, প্রভু! ইনার প্রতি এই মেহেরবানী করলেন, আমাদের প্রতি করলেন না? রহমতের ভাণ্ডারসমূহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মালিক-মুখতার কি তোমরা যে, এ ধরনের বাজে অভিযোগ করছ? যদি হয়ে থাক, তবে নিজেদের সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগাও এবং দড়ি টানিয়ে আকাশে আরোহণ কর, যাতে সেখান থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহীর আগমন বন্ধ করে দিতে পার এবং উর্ধ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজ

১১. (ওরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাহিনীগুলোর মত এক তুচ্ছ বাহিনী, যারা ওখানে পরাজিত হবে[১]।	جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ﴿١١﴾
১২. ওদের পূর্বে অস্বীকার করেছে- নূহের সম্প্রদায়, আ'দ সম্প্রদায় ও পেরেকধারী* ফেরাওন[২],	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ﴿١٢﴾
১৩. এবং ছামূদ সম্প্রদায়, লূতের সম্প্রদায় ও 'আয়কা'ওয়ালারা[৩]। এই সংঘবদ্ধ বাহিনীগুলি-	وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ﴿١٣﴾
১৪. এদের প্রত্যেকেই রাসূলদের অস্বীকার করেছিল। ফলে আমার শাস্তি অবধারিত হয়ে গেছে[৪]।	اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾

মর্যি মত আকাশ ও পৃথিবী পরিচালনা করতে পার। আর যদি এতটুকুও করতে না পার, তবে বুঝে নাও- আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং রহমতের ভাণ্ডারসমূহের মালিক তোমরা নও। অতএব খোদায়ী ব্যবস্থায় (যেমন কাউকে নবুওয়াত প্রদানে) হস্তক্ষেপ কেন? এ তো লজ্জাহীনতা ও পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়।

১. অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহের রাজত্ব ও ভাণ্ডারের মালিক হওয়া দূরে থাক, এই বেচারারা মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলমাত্র, যারা পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ন্যায় ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। এই বরবাদির দৃশ্য বদরের জেহাদ থেকে শুরু করে মক্কা বিজয় পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেছে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়েছে। এখন এরা যদি বাড়াবাড়ি করে, তবে ওদের মত এরাও ধ্বংস হবে।'

এতে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক পরিষ্কার হয়ে গেল।

★ দ্বিতীয় তরজমা- 'বিপুল শক্তিধর'।

২. ذُو الْاَوْتَادِ-অর্থাৎ বিপুল শক্তিধর ও বিশাল সেনাবাহিনীর মালিক, দুনিয়াতে যার সাম্রাজ্যের ভীত অতি মজবুত ছিল। আর কেউ কেউ বলেন, সে মানুষকে পেরেক ঠুকে শাস্তি দিত বলে তার নাম ذُو الْاَوْتَادِ (পেরেকওয়ালা) হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. যাদের প্রতি হযরত শুআয়ব আলাইহিস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন।

৪. অর্থাৎ এই বড় বড় শক্তিধর বাহিনী রাসূলদের অস্বীকার করে শাস্তি থেকে রক্ষা পায়নি। এদের তুলনায় তোমরা কোন ছার! অস্বীকার করলে তোমরাও শাস্তি পাবে।

[রুকূ - ২]

১৫. ওরা শুধুমাত্র একটি বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরতি থাকবে না[১]।

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝

১৬. আর ওরা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব-দিবসের পূর্বে এখনই দিয়ে দিন[২]।'

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝

১৭. ওরা যা বলে আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করুন। এবং আমার বান্দা শক্তিশালী দাউদকে স্মরণ করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন খুবই (আল্লাহ)-অভিমুখী[৩]।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝

১৮. আমি পাহাড়-পর্বতকে (তাঁর) অধীন করে দিয়েছিলাম– তারা সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর সঙ্গে তাস্‌বীহ পাঠ করত[৪];

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۝

---

১. অর্থাৎ শিঙ্গার বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে। পূর্ণ শাস্তি শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার পরই হবে। অথবা صيحة দ্বারা দুনিয়ারই একটি গর্জন উদ্দেশ্য হতে পারে।

২. অর্থাৎ যখন কিয়ামতের কথা শুনত, তখন বিদ্রুপ করে বলত, আমাদেরকে আখেরাতের অংশও এখনি দিয়ে দিন। এখনি আমরা নিজেদের আমলনামা দেখে নিই এবং শাস্তি যা হওয়ার, নগদই তা নিয়ে ফারেগ হয়ে যাই!!

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এস্থলে নবীজিকে (দাউদের কাহিনী) স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি তালূতের শাসনামলে অনেক সবর করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব লাভ করেন এবং জালূত প্রভৃতি শত্রুদেরকে জেহাদে পরাস্ত করেন। ঠিক এই চিত্রই আমাদের পয়গম্বরের বেলায় অঙ্কিত হয়।

বি. দ্র. ذا الأيد-এর তরজমা হযরত শাহ সাহেব (র) করেছেন, ہاتھ کے بل والا (বাহুবল সম্পন্ন), অর্থাৎ রাজশক্তিসম্পন্ন। অথবা হতে পারে, তাঁর হাতে যে লোহা মোমের মত নরম হয়ে যেত, এর দ্বারা সেই দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। অথবা 'বাহুবল সম্পন্ন' বলতে, তিনি সরকারী মাল খেতেন না, নিজ হাতে ও বাহু দ্বারা কামাই করে খেতেন। আর أواب দ্বারা উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি আল্লাহর প্রতি রুজু করতেন।

৪. অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় যখন হযরদ দাউদ (আ) তাসবীহ পড়তেন, তখন পাহাড়-পর্বতও তাঁর সঙ্গে তাসবীহ পড়ত। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা সাবা'তে (আয়াত ১০) গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

১৯. এবং পাখিদেরও, যাদের সমবেত করে দেওয়া হত। সকলেই দাউদের জন্য নিবেদিত থাকত[১]।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ

২০. আর আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম[২] এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও বিবাদ নিষ্পত্তির যোগ্যতা[*৩]।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

২১. আপনার নিকট কি বিবাদকারী লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করল,

وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

২২. যখন তারা দাউদের কাছে এসে উপস্থিত হল। ফলে তিনি তাদের কারণে ঘাবড়ে গেলেন[৪]।

اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا

---

১. অথবা অর্থ হল– সকলে তাঁর সঙ্গে আল্লাহ-অভিমুখী থাকত।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাঁর রাজত্বের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এবং আমার সাহায্য-সহায়তায় বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সৈন্যবাহিনী দিয়ে তাঁর কর্তৃত্ব কায়েম করে দিয়েছিলাম।

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'মীমাংসাকারী বাগ্মিতা'।

৩. অর্থাৎ তিনি বড় কুশলী ও জ্ঞানী ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে ফয়সালা করতেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে এবং যখন কথা বলতেন, অত্যন্ত মীমাংসাসুলভ বক্তব্য দিতেন।

যা হোক, আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়াত, চমৎকার কৌশল, বিচারশক্তি এবং নানা রকম ইলমী ও আমলী গুণ ও যোগ্যতা দান করেছিলেন। এ সত্ত্বেও পরীক্ষা থেকে তিনিও রক্ষা পাননি। সম্মুখে এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

৪. হযরত দাউদ প্রতি তিনদিনকে এভাবে ভাগ করেছিলেন– একদিন দরবার ও বিচার শালিসের জন্য, একদিন পরিবারবর্গের কাছে থাকার জন্য, একদিন আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য। এই দিন নির্জনে থাকতেন, দারোয়ানরা কাউকেই ভিতরে আসতে দিত না। একদিন ইবাদতে মশগুল আছেন, এমন সময় অতর্কিতে কয়েকজন লোক দেয়াল ডিঙিয়ে তাঁর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর শক্তি ও মহামর্যাদা সত্ত্বেও এই অতর্কিত ঘটনায় ঘাবড়ে গেলেন। ভাবলেন– এরা কি মানুষ, না অন্য কোন জীব। মানুষ হলে এমন অসময়ে প্রবেশের সাহস কী করে হল? দারোয়ানরা কেন বাধা দিল না? যদি দরজা দিয়ে না এসে থাকে, তবে এত উঁচু দেয়াল টপকে আসল কী করে? আল্লাহ জানেন, এরূপ অস্বাভাবিকভাবে কী নিয়তে ও কী উদ্দেশ্যে এসেছে।

তারা বলল, 'আপনি ভয় পাবেন না, (আমরা) বিবাদমান দু'টি পক্ষ। আমাদের একে অপরের উপর জুলুম করেছে। সুতরাং আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে দিন এবং অবিচার করবেন না, আর আমাদের দেখিয়ে দিন সরল পথ[১]।

لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২৩. 'এ আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে, আর আমার আছে একটি দুম্বা। এর পরও সে বলে, 'সেটি আমাকে দিয়ে দাও' এবং কথায় সে আমাকে পরাভূত করে ফেলে[২]।'

اِنَّ هٰذَآ اَخِیْ ۟ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِیَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۟ فَقَالَ اَكْفِلْنِیْهَا وَعَزَّنِیْ فِی الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৪. তিনি বললেন, 'সে তার দুম্বাগুলোর সাথে (যুক্ত করার জন্য) তোমার দুম্বাটি দাবি করে নিশ্চয় তোমার উপর জুলুম করেছে[৩]। বস্তুত শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর জুলুম

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَیَبْغِیْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِیْنَ

মোদ্দাকথা, হঠাৎ এ বিস্ময়কর ও ভীতিকর ঘটনা দেখে মন অন্যদিকে চলে গেল এবং ইবাদতে যে একাগ্রতার সঙ্গে মশগুল ছিলেন, তা নষ্ট হয়ে গেল।

১. আগমনকারীরা বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না এবং আমাদের কারণে ভীত হবেন না। আমরা দু'পক্ষ ঝগড়ার মীমাংসা করাতে আপনার খেদমতে হাযির হয়েছি। আপনি আমাদের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করে দিন। অসংগত বিচার যেন না হয় এবং আমাদের এড়িয়ে যাবেন না। আমরা ন্যায়বিচারের সোজা পথ জানতে এসেছি।

(এ ধরনের কথাবার্তা শুনে হযরত দাউদ (আ) আরো বেশি আশ্চর্য হয়ে থাকবেন।)

২. অর্থাৎ ঝগড়া এই নিয়ে যে, আমার এই ভায়ের নিকট নিরানব্বইটি দুম্বা আছে, আর আমার আছে একটি। সে চায়, এই একটিও আমার কাছ থেকে কোন রকমে ছিনিয়ে নিয়ে তার একশ পূর্ণ করবে। বড় মুসিবত এই যে, ধন-সম্পদে সে যেমন আমার চেয়ে বেশি, কথায়ও সে আমার চেয়ে জোরদার। যখন কথা বলে, আমাকে পরাভূত করে এবং কথার জোরে লোকেরাও তার কথায় সায় দেয়। মোটকথা, আমার হক কেড়ে নেওয়ার জন্য সে সব রকম জোর খাটাচ্ছে।

৩. প্রথমে হযরত দাউদ শরী'য়তের বিধান অনুসারে প্রমাণ ইত্যাদি তলব করে থাকবেন। পরিশেষে বললেন, (তোমার এ ভাই যদি এমনটি করে থাকে, তবে) অবশ্যই এটা তার বাড়াবাড়ি ও অবিচার– সে এভাবে তার গরীব ভাইয়ের সম্পদ গ্রাস করতে চায়।

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۚ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۩

করে থাকে। তবে যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, (তারা এর ব্যতিক্রম)। কিন্তু এমন লোক খুবই কম[১]।' আর দাউদ বুঝতে পারলেন, আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছি। অতএব তিনি আপন রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন ও নত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন*, আর (তাঁর) অভিমুখী হলেন।

فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ

২৫. অতএব আমি তাঁর সেই ব্যাপার ক্ষমা করলাম[২]।

---

১. অর্থাৎ অংশীদারদের অভ্যাসই হচ্ছে একে অন্যের উপর জুলুম করা। শক্তিশালী অংশীদার চায় দুর্বল অংশীদারকে গ্রাস করতে। একমাত্র ঈমানদার ও নেক বান্দারা এর ব্যতিক্রম, কিন্তু দুনিয়াতে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন'।

২. অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনার পর দাউদ (আ) বুঝতে পারলেন, এ ঘটনা তাঁর জন্য একটি ফেতনা তথা পরীক্ষা ছিল। এ কথা মনে হওয়ামাত্রই তিনি নিজ ত্রুটি মাফ করানোর জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর সম্মুখে ঝুঁকে পড়লেন। পরিশেষে আল্লাহ তাঁর ত্রুটি মাফ করে দিলেন।

এস্থলে কতক মুফাসসিরের অসতর্কতা

দাউদ আলাইহিস সালামের সেই ত্রুটিটি কী ছিল? এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণ লম্বা-চওড়া এক কাহিনী বয়ান করেছেন। তবে হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (র) এ সম্বন্ধে লেখেন– 'তাফসীরকারগণ এস্থলে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসই শিরোধার্য। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর থেকে কোনো হাদীস নেই।' আর হাফেজ আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম তাঁর كتاب الفصل গ্রন্থে অত্যন্ত তীব্রভাবে এসব কাহিনী খণ্ডন করেছেন। আর ইমাম আবু হায়্যান প্রমুখ এই কাহিনীগুলি এড়িয়ে বর্তমান আয়াতগুলির যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও (تكلف) কষ্ট-কল্পনা থেকে মুক্ত নয়।

সঠিক ব্যাখ্যা

আমাদের নিকট এখানে সঠিক কথা তা-ই, যা ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, অর্থাৎ দাউদ আলাইহিস সালাম এক রকমের عجب (আত্মপ্রসাদ) এর কারণে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হন–

ঘটনা এই যে, তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে একবার আরয করলেন, হে প্রভু! রাত ও দিনে এমন কোন মুহূর্ত নেই, যার মধ্যে দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ তোমার

ইবাদতে (অর্থাৎ নামায বা তাসবীহ ও তাকবীরে) রত না থাকে।—আসলে তিনি দিন ও রাতের চব্বিশ ঘণ্টাকে পরিবারবর্গের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করে রেখেছিলেন, যাতে তাঁর ইবাদতখানা এক মুহূর্তের জন্যও ইবাদতশূন্য না থাকে। তিনি এ ধরনের আরো কিছু কথা আরয করেন (সম্ভবত নিজের সুন্দর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে।)

আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর এ কথা (প্রকাশভঙ্গি) পছন্দ হয়নি। ইরশাদ হল– দাউদ! এসব কিছু আমার দেওয়া তাওফীকের ফল, আমার সাহায্য না হলে তুমি এ কাজ করতে পারতে না। হাজার চেষ্টা করেও অবিচল থাকতে পারবে না। শপথ আমার জালালের! আমি তোমাকে একদিন তোমার কাছেই সোপর্দ করে দেব। (অর্থাৎ আমার সাহায্য হটিয়ে নেব)। দেখব– তখন তুমি কতদূর ইবাদতে মশগুল থাকতে এবং নিজ ব্যবস্থাপনা অটুট রাখতে পার। দাউদ আলাইহিস সালাম আরয করলেন– 'হে প্রভু! সেই দিনটি কবে তা আমাকে বলে দিন।' ব্যস্ সে দিনই তিনি ফেতনায় পতিত হলেন।

[মুহাদ্দেছ হাকেম (র) 'মুসতাদরাক' কিতাবে (বর্ণনা ৩৬৬২) বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এর সনদ সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম যাহাবী (র) তাঁর 'তালখীস' গ্রন্থে এর সমর্থন করেছেন।]

এ বর্ণনা অনুযায়ী 'ফেতনা'র অর্থ এই যে, দাউদ (আ) যখন ইবাদতে মশগুল হবেন, তখন শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাতে মশগুল থাকতে পারবেন না এবং নিজ ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবেন না।

পাঠক কুরআনী বর্ণনার আলোকে দেখলেন যে, কেমন অস্বাভাবিকভাবে কতিপয় ব্যক্তি সহসা ইবাদতখানায় প্রবেশ করত হযরত দাউদ (আ)-কে ঘাবড়ে দিল এবং এবাদতে তাঁর বিশেষ মগ্নতা নষ্ট করে নিজেদের বিবাদের প্রতি আকৃষ্ট করে নিল। কঠোর প্রহরা ও নিরাপত্তা-ব্যবস্থা তাদেরকে দাউদ (আ)-এর নিকট পৌঁছতে বাধা দিতে পারল না। তখন দাউদ (আ)-এর মনে আসল যে, আল্লাহ তাআলা আমার সেই দাবির কারণে আমাকে এই ফেতনায় পতিত করেছেন।

এখানে 'ফেতনা' শব্দটির মর্ম অনেকটা তেমন, যেমন এক হাদীসে এসেছে, একদা হযরত হাসান ও হোসাইন (রা) বাল্যকালে লম্বা জামা পরিধান করে হেলে-দুলে আসছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে দেখলেন, তখন তিনি খুতবা বন্ধ করে তাঁদের কোলে উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন– আল্লাহ তাআলা সত্যিই বলেছেন– إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ('তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফেতনার (পরীক্ষার) বস্তু)।' (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪১০৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৬০৩৮)

কোন কোন বর্ণনায় আছে, বান্দা যখন কোনো নেকী করে বলে– 'আয় আল্লাহ! আমি এ কাজ করেছি, আমি সদকা করেছি, আমি নামায পড়েছি, আমি খানা খাইয়েছি,' –তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমি তোমাকে সাহায্য করেছি এবং তোমাকে সামর্থ্য দিয়েছি'। পক্ষান্তরে যখন বান্দা বলে, 'হে পরওয়ারদেগার! তুমি সাহায্য করেছ, তুমি

وَاِنَّ لَهٗ عِنۡدَنَا لَزُلۡفٰی وَحُسۡنَ مَاٰبٍ ﴿۲۵﴾

নিশ্চয় তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম ঠিকানা[১]।

یٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلۡنٰكَ خَلِیۡفَةً فِی الۡاَرۡضِ فَاحۡكُمۡ بَیۡنَ النَّاسِ بِالۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الۡهَوٰی فَیُضِلَّكَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ

২৬. 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি বানিয়েছি। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, নিশ্চয় ওদের

আমাকে তাওফীক দিয়েছ এবং তুমি আমার উপর অনুগ্রহ করেছ,' –তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তুমি আমল করেছ, তুমি এরাদা করেছ, তুমি এ নেকী কামাই করেছ।' (মাদারেজুস সালেকীন, ১ম খণ্ড, পৃ ৯৯)।

অতএব, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের মত মহামর্যাদাশালী পয়গম্বর যখন নিজ সুব্যবস্থাপনার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, 'হে প্রতিপালক! রাতদিনের কোন মুহূর্ত এমন নেই, যখন আমার ঘরের লোকজন বা আমি নিজে আপনার ইবাদতে মশগুল থাকি না',তখন তা আল্লাহ তাআলার নিকট কী করে পছন্দ হতে পারে? –আর বড়দের ছোট ছোট কথার উপরও ধরপাকড় হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন, যাতে সতর্ক হয়ে নিজ ত্রুটির প্রতিকার করেন। সে মত তিনি প্রতিকার করলেন এবং উত্তমরূপে প্রতিকার করলেন (فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّرَاكِعًا وَّأَنَابَ)।

আমার নিকট আয়াতের সহজ-সরল ব্যাখ্যা এ-ই। তবে হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) সেই প্রসিদ্ধ কাহিনীর আলোকে যা কিছু লিখেছেন, তা 'মূযেহুল কুরআন'-এ দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দরবারে তিনি পূর্বের মতই নৈকট্যপ্রাপ্ত আছেন। উক্ত ত্রুটির কারণে নৈকট্য ও মর্যাদার মধ্যে কোন কমতি আসেনি; শুধু একটুখানি সতর্ক করা হল। কেননা, নৈকট্যপ্রাপ্তদের ছোট ত্রুটিও বড় গণ্য করা হয়– حسنات الأبرار سيئات المقربين

কবি বলেন–

گرچہ ایک موبد گنہ کوجستہ بود ÷ لیک آں مو در دو دیدہ رستہ بود
بود آدم دیدۂ نور قدیم ÷ موئے در دیدہ بود کوہ عظیم

যদিও তিনি একটা চুল পরিমাণ ভুল করেছিলেন,
কিন্তু সে চুল যে পড়েছিল দুই চোখের ভেতর।
হযরত আদম (আ) ছিলেন মহাপ্রভুর চোখের মণি
তাই তো চোখে পড়া চুল পাহাড়তুল্য গণ্য হয়।

لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি[১]। কেননা, ওরা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে[২]।

[রুকূ - ৩]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

২৭. আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মাঝে যা আছে, আমি তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে আগুনের দুর্ভোগ[৩]।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۖ اَمْ

২৮. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান বানিয়ে দেব? অথবা

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। এ জন্য তাঁরই নির্দেশ মত চল এবং মামলা-মোকদ্দমার মীমাংসা ইনসাফের সাথে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী করতে থাক। কখনো কোনো বিষয়ে প্রবৃত্তির সামান্য মিশ্রণও যেন না হতে পারে। কারণ, এ জিনিস মানুষকে আল্লাহ তাআলার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হলে তার ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কোথায়?

২. অর্থাৎ সাধারণত মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব এজন্য করে যে, হিসাবের দিনের কথা তার স্মরণে থাকে না। যদি অন্তরে এ কথা হাযির থাকে যে, একদিন আল্লাহ তাআলার সম্মুখে যেতে হবে এবং পাই পাই করে আমলের হিসাব দিতে হবে, তাহলে কখনো আল্লাহ তাআলার মর্যির বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে না।

বি. দ্র. يوم الحساب এর সম্পর্ক نسوا এর সঙ্গে না হয়ে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ এর সাথে হতে পারে। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ তাআলার বিধান ভুলে যাওয়ার কারণে হিসাবের দিন ওদের কঠোর শাস্তি হবে।

৩. অর্থাৎ আসমান-যমীন সৃষ্টির কোন ফলাফল নেই– বিষয়টা আদৌ এমন নয়। বরং এ দুনিয়ার মহা ফলাফল আছে। তা হচ্ছে আখেরাত। সুতরাং এখানে থেকে সেখানকার জন্য কিছু কাজ করা উচিত। সেই কাজ হচ্ছে, মানুষ নিজ কামনা-বাসনার দাসত্ব বর্জন করত সত্য ও ন্যায়ের মূলনীতি অনুযায়ী আমল করবে এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের হকসমূহ আদায় করবে। দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন নয় যে, খেয়ে পরে শেষ করে দেবে, ভবিষ্যতে হিসাব-কিতাব কিছু নেই! এসব তো ওদের ধারণা, যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে। তা, এরূপ অস্বীকারকারীদের জন্য আগুন প্রস্তুত রয়েছে।

نَجۡعَلُ الۡمُتَّقِیۡنَ کَالۡفُجَّارِ ﴿۲۸﴾

আমি কি মুত্তাকীদের ফাসেক-ফাজেরদের সমান বানিয়ে দেব[১]?

کِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ اِلَیۡکَ مُبٰرَکٌ لِّیَدَّبَّرُوۡۤا اٰیٰتِهٖ وَلِیَتَذَکَّرَ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ﴿۲۹﴾

২৯. (এ) এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা এর আয়াতগুলির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে[২]।

---

১. অর্থাৎ আমার ইনসাফ ও হেকমতের দাবি কক্ষনো এটা নয় যে, আমি নেক, ঈমানদার বান্দাদের দুষ্কৃতিপরায়ণ ও বিপর্যয়কারীদের সমান গণ্য করি! অথবা মুত্তাকী পরহেজগারদের সঙ্গেও সেই ব্যবহার করি, যা দুরাত্মা ও পাপাচারী লোকদের সাথে করা উচিত। যখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য হওয়া জরুরী, সুতরাং হিসাব-কিতাব এবং শাস্তি ও পুরস্কারের জন্য কোন একটা সময় থাকা অপরিহার্য।

দুনিয়াতে আমরা দেখি, বহু নেক ও ঈমানদার ব্যক্তি নানা রকম বিপদাপদে পড়ে আছে; অথচ বহু দুরাত্মা, লম্পট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রয়েছে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু-পরবর্তী যে দ্বিতীয় জীবনের সংবাদ আল্লাহ-রাসূল দিয়েছেন, তা হেকমতের সম্পূর্ণ অনুকূল। সেখানেই প্রত্যেক পুণ্যাত্মা ও দুরাত্মা যথাক্রমে ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল পাবে। অতএব হিসাবের দিনকে অস্বীকার করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হতে পারে না।

২. অর্থাৎ যখন সৎ মানুষ ও অসৎ মানুষের পরিণাম এক হতে পারে না, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াতসম্বলিত কোন কিতাব আসা এবং মানব জাতিকে যথাযথভাবে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া জরুরি ছিল। এ কারণেই 'কুরআন' নামক এই কিতাবের আগমন ঘটেছে, যার শব্দাবলী ও হরফসমূহ এবং অর্থ ও বিষয়বস্তু– সকল কিছুতে গভীর বরকত রয়েছে এবং যা এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে লোকেরা এর আয়াতসমূহের অর্থ-মর্ম ও তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী লোকেরা এর নসীহতসমূহ দ্বারা উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২৮ নম্বর আয়াতটির প্রতি লক্ষ করুন। তাতে এমন পরিষ্কার ও যুক্তিসংগত উপায়ে পুনরুত্থানের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, তা নিয়ে স্বল্পবুদ্ধির ব্যক্তিও চিন্তা করলে সঠিক ফলাফলে পৌঁছতে পারবে।

বি. দ্র. সম্ভবত تدبر ও تذکر দ্বারা যথাক্রমে মানুষের (قوت علمية) জ্ঞানশক্তি ও (قوت عملية) কর্মশক্তিকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ কথাগুলো হযরত দাউদ (আ)-এর আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে। সম্মুখে তাঁর আলোচনার সমাপ্তিপর্ব আসছে।

৩০. আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান[১]। তিনি বড় উত্তম বান্দা; তিনি ছিলেন খুবই (আল্লাহ)-অভিমুখী।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۳۰﴾

৩১. (স্মরণ কর), যখন বিকাল বেলায় তাঁর সামনে কিছু উৎকৃষ্ট ঘোড়া পেশ করা হল।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿۳۱﴾

৩২. অনন্তর তিনি বললেন, 'আমি এ সম্পদের (অর্থাৎ জেহাদের ঘোড়ার) মহব্বতকে আমার রবের 'যিকির' এর উপর প্রাধান্য দিয়েছি। অবশেষে সূর্য পর্দার আড়াল হয়ে গেল।

فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿۳۲﴾

৩৩. 'ঘোড়াগুলি পুনরায় আমার কাছে আন।' অতঃপর তিনি (ওদের) পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলেন☆[২]।

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿۳۳﴾

---

১. অর্থাৎ পুত্র সুলায়মান (আ) দান করলেন, যিনি পিতার ন্যায় নবী ও বাদশাহ হলেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমি সম্পদকে ভালবেসে আমার রবের 'স্মরণ' থেকে (গাফেল হয়ে গেছি), এমনকি সূর্য ...। ঘোড়াগুলি আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর তিনি (ওদের) পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে (তরবারি) চালাতে লাগলেন (অর্থাৎ যবেহ করতে লাগলেন)'।

২. অর্থাৎ জেহাদের জন্য পালিত, খুব ভাল জাতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াসমূহ তাঁর সম্মুখে আনা হল। তা দেখতে দেখতে এত দেরি হয়ে গেল যে, সূর্য ডুবে গেল। সম্ভবত এই ব্যস্ততায় পড়ে আসরের সময়ের ওযীফা পড়তে পারেননি। এতে তিনি বললেন, কোন ক্ষতি নেই। কারণ, যদিও আল্লাহর যিকিরে ব্যাঘাত ঘটেছে, কিন্তু বস্তুত জেহাদের ঘোড়ার মহব্বত ও তত্ত্বাবধানও তাঁরই যিকিরের সঙ্গে সম্পর্কিত। জেহাদের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ তাআলার কলেমাকে বুলন্দ করা, তাই জেহাদের উপকরণ ও আসবাবের তত্ত্বাবধানও যিকরুল্লাহরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা জেহাদের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতেও উৎসাহ প্রদান করেছেন বলেই আমরা এ উৎকৃষ্ট সম্পদকে এত মহব্বত করি।

জেহাদ-প্রীতির এই আতিশয্যেই তিনি সেই ঘোড়াগুলি ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিলেন। তা ফিরিয়ে আনা হলে হযরত সুলায়মান প্রবল ভালবাসা ও সম্মানের সাথে ওদের ঘাড় ও পায়ের গোছাগুলি মুছতে ও পরিষ্কার করতে লাগলেন।

কোন কোন তাফসীরকার আয়াতের এমন তাফসীরই করেছেন। আর حب الخير শব্দ দ্বারা এর সমর্থনও হয়। خير শব্দটি যেন সেই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে (বুখারী, হাদীস ৩৬৪৪) ইরশাদ করেছেন– الخيل

معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة (ঘোড়ার কপালে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত কল্যাণ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।)

আয়াতের অন্য তাফসীর

কিন্তু অন্য আলেমগণ আয়াতের এ অর্থ করেছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) ঘোড়াগুলির দেখাশোনায় ব্যস্ত হয়ে সেই সময়ের নামায বা ওযীফার কথা ভুলে গেলেন। (নবীদের পক্ষে কোন কিছু ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়।) তাই তিনি বললেন, 'দেখ- সম্পদের মহব্বত আমাকে আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছে, এমনকি সূর্যাস্ত হয়ে গেলেও ওযীফা আদায় করতে পারিনি। এটা ঠিক, এই সম্পদের মহব্বতের মধ্যেও ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণের একটি দিক ছিল, কিন্তু বিশিষ্ট ও নৈকট্যপ্রাপ্তদের এ চিন্তাও থাকে যে, যে ইবাতদের জন্য যে সময় নির্ধারিত তাতে যেন অন্যথা না হয়। এমন হলে তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন (যদিও তা ওযরের কারণে হয়েছে)। কবি বলেন :

گر زباغ دل خلالے کم بود ÷ بر دل سالک ہزاراں غم بود

অর্থ ঃ {আল্লাহর পথের পথিকের হৃদয়-বাগানে পরিচর্যা কম হলে তার মনে হাজারো অশান্তি সৃষ্টি হয়।'}

খন্দকের জেহাদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়। যদিও তিনি সরাসরি জেহাদে মশগুল ছিলেন এবং তাঁর কোন ত্রুটিও ছিল না, তবু যে কাফেরদের কারণে এমন অবস্থা হল, তাদের প্রতি এভাবে বদ-দো'য়া করেছিলেন- ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ('আল্লাহ ওদের ঘরবাড়ি ও কবরগুলো আগুনে পূর্ণ করে দিন।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৯৩১)

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম নির্ধারিত সময়ের একটি ইবাদত বাদ পড়ে যাওয়ায় অস্থির হয়ে পড়লেন। নির্দেশ দিলেন, সেই ঘোড়াগুলি ফিরিয়ে আন (যা আল্লাহ তাআলার যিকির বাদ পড়ে যাওয়ার কারণ হয়েছে)। আনা হলে গায়রতের প্রাবল্যে ও প্রভুপ্রেমের আতিশয্যে তলোয়ার নিয়ে ওদের ঘাড় ও পায়ের গোড়ালি কাটতে শুরু করলেন, যাতে নিজের মধ্য থেকে গাফলতের মূলোৎপাটন ঘটে এবং এই গাফলতের মোটামুটি কাফফারা হয়ে যায়।

মনে হয়, তাঁর শরী'য়তে ঘোড়ার কুরবানী জায়েয ছিল এবং তাঁর নিকট ঘোড়া প্রভৃতি এত বিপুল পরিমাণে ছিল যে, কয়েকটি ঘোড়া কুরবানী করায় জেহাদে শঙ্কট সৃষ্টির আশংকা ছিল না।

আর فَطَفِقَ مَسْحًا শব্দ দ্বারা এ কথা জরুরী হয় না যে, সব কয়টি ঘোড়াই যবেহ করে ফেলেছেন। বরং এটি শুধু এতটুকু বোঝায় যে, যবেহর কাজ শুরু করে দিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

এই তাফসীরের সমর্থন একটি মরফূ হাদীস দ্বারা হয়, যা উবাই ইবনে কাব থেকে 'হাসান সনদে' তবারানী বর্ণনা করেছেন। (তাফসীরে 'রূহুল মা'আনী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

৩৪. আর আমি সুলায়মানকে পরীক্ষায় ফেললাম এবং তাঁর সিংহাসনের উপর একটি (নিষ্প্রাণ) 'ধড়' রেখে দিলাম। অতঃপর তিনি (আল্লাহ)-অভিমুখী হলেন[১]।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۞

৩৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর অন্য কারো জন্য হবে না। নিশ্চয় আপনিই পরম দাতা[২]।'

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۞

১. সহীহ হাদীসে আছে, হযরত সুলায়মান একদিন শপথ করে বললেন, আজ রাতে আমি সকল স্ত্রীর নিকট গমন করব (যাদের সংখ্যা সত্তর বা নব্বই অথবা এক শতের কাছাকাছি ছিল) এবং প্রত্যেক স্ত্রী একটি করে শিশু জন্ম দেবে, যারা আল্লাহ তাআলার পথে জেহাদ করবে। ফেরেশতা তখন তাঁর অন্তরে এ কথা ঢেলে দিলেন যে, ইনশাআল্লাহ বলে নিন। কিন্তু (অন্তরে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) মুখে বলা হল না। আল্লাহর কুদরত, সেই সহবাসের ফলে একজন স্ত্রীও সন্তান জন্ম দেয়নি। শুধু একজনের একটি অপূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম হল। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৪২৪; ফাতহুল বারী : ৪৬০)

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ধাত্রী সেই অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে বলল– এই নিন, আপনার শপথের ফল। (এই অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চাকে এখানে جسد বা 'ধড়' শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে।)

এটা দেখে হযরত সুলায়মান অনুতপ্ত ও আল্লাহ-অভিমুখী হলেন এবং 'ইনশাআল্লাহ' না বলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হাদীছে আছে, যদি 'ইনশাআল্লাহ' বলে নিতেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাই দিতেন, যা তাঁর কামনা ছিল। (প্রাগুক্ত)

বি. দ্র. অধিকাংশ তাফসীরকার আয়াতের তাফসীর অন্যভাবে করেছেন এবং এস্থলে সুলায়মান আলাইহিস সালামের আংটি ও জিন্নাতসম্পর্কিত বহু ভিত্তিহীন কাহিনী নকল করেছেন। তাফসীরের কিতাবাদি দ্রষ্টব্য। ইবনে কাছীর (র) লেখেন– সালাফের এক জামাত থেকে এ দীর্ঘ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এ সবই ইহুদী-খ্রিস্টানদের কিচ্ছা-কাহিনী থেকে গৃহীত। والله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب

২. অর্থাৎ এমন বিরাট সাম্রাজ্য দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কেউ পাবে না– অন্য কেউ এর যোগ্যও হবে না। অথবা অর্থ এই যে, কারো যেন আমার থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার দুঃসাহস না হয়।

বি. দ্র. হাদীছে আছে, প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ) দো'য়া আছে, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কবুল করার ওয়াদা করেছেন– অর্থাৎ সে দো'য়াটি তিনি অবশ্যই কবুল করবেন (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৯৯)। সম্ভবত এ দোয়াটি ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর সেই

৩৬. অতএব আমি বাতাসকে তাঁর অধীন করে দিলাম, যা তাঁর আদেশে তিনি যেখানে চাইতেন মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۝٣٦

৩৭. এবং (তাঁর অধীন করে দিলাম) সকল নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তানদের[১],

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۝٣٧

৩৮. এবং আরো জিনদের, যারা ছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ[২]।

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝٣٨

৩৯. এসব আমার দান। এখন তুমি (কারো প্রতি) অনুগ্রহ কর অথবা নিজের কাছে রাখ, কোনো হিসাব প্রদান ছাড়া[৩]।

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٩

দো'য়া। তিনি তো পয়গম্বরপুত্র ও রাজপুত্র ছিলেন। তাই এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দোয়াই করলেন যে, রাজত্ব দান করুন! তাও অসাধারণ রকমের রাজত্ব। সেই যুগ ছিল রাজা-মহারাজাদের যুগ। তাই এ দো'য়া যুগোপযোগী ছিল।

বলা বাহুল্য, রাজত্ব হাসিল করে তার দ্বারা নিজেদের শান-শৌকত প্রদর্শন করা নবীদের উদ্দেশ্য হয় না, বরং তার দ্বারা সেই দীনের ও আসমানী বিধানের প্রচার-প্রসার ও প্রাধান্য বিস্তার উদ্দেশ্য হয়, যে দীনের বাহকরূপে তাঁরা প্রেরিত হন। সুতরাং এই দো'য়াকে দুনিয়াদারদের দো'য়ার মত গণ্য করা উচিত হবে না।

১. অর্থাৎ জিনেরা তাঁর নির্দেশে বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করত এবং মণি-মুক্তা তুলে আনার জন্য সমুদ্রের তলদেশে ডুব দিত।

বাতাস ও জিনদের অধীন করে দেওয়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে সূরা সাবা প্রভৃতিতে কিছু আলোচনা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আরো অনেক জিন ছিল, অবাধ্যতা, দুষ্কৃতি ও বিদ্রোহের কারণে যাদের বন্দী করে ফেলে রাখা হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ কাউকে দান করা বা না করা তোমার ইচ্ছা।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিপুল পরিমাণ দান করলেন, কিন্তু হিসাব-কিতাবের কোন বাধ্যবাধকতা রাখলেন না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ মেহেরবানী করলেন যে, এত পরিমাণ দুনিয়া দিলেন এবং হিসাব মাফ করে দিয়ে স্বাধীন বানিয়ে দিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের হাতে ঝুড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।'

৪০. আর নিশ্চয় তাঁর জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম ঠিকানা[১]।

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰی وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

[রুকূ - ৪]

৪১. আমার বান্দা আইউবকে স্মরণ করুন, যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, 'শয়তান আমাকে যন্ত্রণায় ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে[২]।'

وَاذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰی رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝

১. অর্থাৎ রাজত্ব সত্ত্বেও আমার দরবারে তাঁর যে রূহানী নৈকট্য ও মর্যাদা রয়েছে এবং জান্নাতুল ফেরদাওসে তাঁর জন্য যে উচ্চতর আসন প্রস্তুত রয়েছে, তা তো আছেই।

২. **আযাব প্রদানকে শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ**

কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলালে বোঝা যায়, যেখানে কোন কষ্ট বা মন্দের দিক থাকে অথবা কোন সঠিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার ব্যাপার থাকে, সেখানে অনেক সময় বিষয়টিকে শয়তানের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। যেমন মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় এসেছে– وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ (এবং শয়তানই আমাকে তার কথা বলতে ভুলিয়ে দিল। –কাহ্ফ, আয়াত ৬৩) (এখানে نسيان-কে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে)– কেননা, এ ধরনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কারণ কোন না কোন পর্যায়ে শয়তানই হয়ে থাকে। এ নিয়মেই বর্তমান আয়াতে হযরত আইয়ূব (আ) স্বীয় রোগ ও দুঃখ-কষ্টের কারণ শয়তানকে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি যেন বিনয় ও আদবের সাথে স্বীকার করলেন যে, নিশ্চয় আমার দ্বারা নিজ মর্যাদানুপাতিক কিছুটা ত্রুটি বা কোন ভুল হয়ে গেছে, যার ফলে এ কষ্টে আমি পতিত হয়েছি।

অথবা অসুস্থ অবস্থায় ও যন্ত্রণার সময় শয়তান তাঁর মনের মধ্যে নানা ওয়াসওয়াসা দিতে সচেষ্ট হয়ে থাকবে। আর তিনি তা দূর করার জন্য কষ্ট-ক্লেশ বরদাশত করে থাকবেন। একেই نصب ও عذاب শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। والله أعلم

হযরত আইয়ূব (আ)-এর কাহিনী সূরা আম্বিয়াতে গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য। (আয়াত ৮৩-৮৪)। প্রকাশ থাকে যে, কতক গল্পবাজ হযরত আইয়ূবের অসুস্থতা সম্বন্ধে যেসব কিস্সা-কাহিনী বর্ণনা করেছে, তাতে অনেক অতিরঞ্জন আছে। যে রোগ ব্যাপকভাবে মানুষের ঘৃণার উদ্রেককারী হয়, তা নবীদের মর্যাদার পরিপন্থী (তাই আল্লাহ তাআলা এমন রোগ তাঁদের দেন না)। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন– لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰی فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا (তোমরা ওদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাকে ওরা যে রোগের কথা রটাত তা থেকে নির্দোষ প্রমাণ করে দিলেন, আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট অতি মর্যাদাবান। –আহযাব, আয়াত ৬৯)। সুতরাং উক্ত বর্ণনাসমূহের ততটুকুই গ্রহণ করা যাবে, যতটুকু নবুওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী নয় (এবং যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে সুপ্রমাণিত– অনুবাদক)।

৪২. (আল্লাহ বললেন,) 'তুমি নিজের পায়ের দ্বারা (যমীনে) আঘাত কর। এই তো গোসল করার সুশীতল ঝরনা ও পান করার ঠান্ডা পানি।'

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. আর আমি তাঁকে দান করলাম তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ– আমার পক্ষ থেকে মেহেরবানীস্বরূপ এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ[১]।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

৪৪. আর (আল্লাহ তাঁকে আদেশ করলেন)– তোমার হাতে এক মুষ্টি তৃণ নাও এবং তার দ্বারা আঘাত কর, আর শপথ ভঙ্গ করো না[২]।' আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। বড় উত্তম বান্দা তিনি! নিশ্চয় তিনি ছিলেন খুবই (আল্লাহ)-অভিমুখী।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِّعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

---

১. যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থ করতে চাইলেন, তাঁকে মাটিতে পদাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। পদাঘাত করামাত্রই সেখান থেকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে ঠাণ্ডা পানির ঝরনা নির্গত করে দিলেন। তা থেকেই তিনি গোসল করতেন এবং পান করতেন। এতে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর তাঁর পরিবার-পরিজন যারা ছাদ ধ্বসে মারা গিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা স্বীয় মেহেরবানীতে তাঁকে তাদের দ্বিগুণ দান করলেন– যাতে বুদ্ধিমানেরা এসব ঘটনা দৃষ্টে বুঝতে পারে, যে বান্দা বিপদাপদে সবর করে এবং এক আল্লাহ-অভিমুখী হয়, আল্লাহ তাআলা নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাকে সাহায্য করেন।

২. হযরত আইয়ূব (আ) অসুস্থ অবস্থায় কোন বিষয়ে রাগ করে কসম করলেন, তিনি সুস্থ হলে নিজ স্ত্রীকে একশ বেত্রাঘাত করবেন। এই স্ত্রী তাঁর দুঃসময়ের সাথী ছিলেন, অধিকন্তু কোন বড় ভুলও করেননি। আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানীতে কসম কার্যকর করার এমন একটি কৌশল তাঁকে শিখিয়ে দিলেন, (যাতে স্ত্রীর কষ্ট না হয়)। (তাফসীরে তবারী ২০/১১০-১১১)

উল্লেখ্য, এটি তাঁর জন্য সীমিত ছিল। এখন যদি কেউ এ ধরনের কসম করে বসে, তবে শুধু এতটুকু করলে কসম পুরা হবে না।

বি. দ্র. যে (حيلة তথা) কৌশলের দ্বারা শরী'য়তের কোন বিধান বা দীনী উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, তা জায়েয নয়। যেমন: যাকাত ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়ার জন্য লোকেরা নানা কৌশল আবিষ্কার করেছে। তবে যে হীলা বা কৌশল দ্বারা শরী'য়তের বিধান বিঘ্নিত না হয়, বরং কোন ভাল কাজের সহায়ক হয়, তার অনুমতি আছে। والتفصيل يطلب من مظانه

৪৫. আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবকেও স্মরণ করুন, যাঁরা ছিলেন হাত ও চোখের অধিকারী[১]।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ۝

৪৬. আমি তাঁদের একটি বিশেষ গুণ দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিলাম অর্থাৎ পরকালের স্মরণ[২]।

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৪৭. আর তাঁরা (সকলেই) আমার নিকট মনোনীত, অতি উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৮. এবং ইসমাইল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফ্‌লকেও স্মরণ করুন। তাঁরা সকলেই ছিলেন অতি উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত[৩]।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۝

৪৯. এ ছিল (নবীগণের) আলোচনা[৪]। আর মুত্তাকীদের জন্যও রয়েছে উত্তম ঠিকানা–

هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

৫০. অনন্তকাল বসবাসের জান্নাতসমূহ, (যার) দুয়ারগুলি তাদের জন্য খোলা[৫]।

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ۝

১. ذي الأيدي والأبصار– অর্থাৎ অতি আমলদার ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, যাঁরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বন্দেগী করতেন এবং চোখের দ্বারা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি দেখে দেখে ঈমান-ইয়াকীন বৃদ্ধি করতেন।

২. নবীদের স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁদের মত আল্লাহর ও আখেরাতের স্মরণকারী কেউ-ই নেই। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁদের জন্য সবচেয়ে বেশি মর্যাদা রয়েছে।

৩. হযরত ইসমাঈল ও যুলকিফল-এর আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। আর আল-য়াসা' হযরত ইল্‌য়াসের খলীফা ছিলেন বলে কথিত আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকেও নবুওয়াত দান করেছিলেন।

৪. অর্থাৎ এ আলোচনা ছিল নবীদের। সামনে সাধারণ মুত্তাকীদের পরিণামের কথা শোন।

৫. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'বেহেশতে প্রবেশ করার পর দেখিয়ে দেওয়া ছাড়াই প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে চলে যাবে।' আওয়াজ দিয়ে দরজা খোলানোরও প্রয়োজন হবে না।

৫১. যেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তারা সেখানে বহু ফলমূল ও পানীয়ের ফরমায়েশ করবে[১]।

مُتَّكِـِٔيۡنَ فِيۡهَا يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿۵۱﴾

৫২. আর তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, সমবয়স্কা নারীগণ[২]।

وَعِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ اَتۡرَابٌ ﴿۵۲﴾

৫৩. এ তা, তোমাদেরকে হিসাব-দিবসের জন্য যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে[*]।

هٰذَا مَا تُوۡعَدُوۡنَ لِيَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿۵۳﴾

৫৪. এ তো আমার দেওয়া রিযিক; যা কখনো নিঃশেষ হবার নয়[৩]।

اِنَّ هٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهٗ مِنۡ نَّفَادٍ ﴿۵۴﴾

৫৫. এ তো (শুনলে)[৪]। আর নিশ্চয় অবাধ্যদের জন্য রয়েছে অতি মন্দ ঠিকানা-

هٰذَا ؕ وَاِنَّ لِلطّٰغِيۡنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿۵۵﴾

৫৬. তথা জাহান্নাম, যাতে ওরা প্রবেশ করবে। আর তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

جَهَنَّمَ ۚ يَصۡلَوۡنَهَا ۚ فَبِئۡسَ الۡمِهَادُ ﴿۵۶﴾

৫৭. এই তো (ওদের শাস্তি)। অতএব ওরা তা আস্বাদন করুক[৫]। আরো আছে ফুটন্ত পানি ও পুঁজ[৬]।

هٰذَا ۙ فَلۡيَذُوۡقُوۡهُ حَمِيۡمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿۵۷﴾

---

১. অর্থাৎ তাদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের ফলমূল ও পানীয় দ্রব্যাদি সেবাদানকারী বালকেরা এনে হাযির করবে।

২. أتراب – অর্থাৎ সকল স্ত্রী হবে যুবতী, সমবয়স্কা। অথবা অর্থ হল– তারা আকার-আকৃতি ও চাল-চলনে আপন স্বামীদের সমবয়স্কা মনে হবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– 'এ সেই নেয়ামত, যা হিসাব-দিবসে (মিলবে) বলে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে'।

৩. অর্থাৎ এগুলি লয়-ক্ষয়হীন, চিরস্থায়ী নে'য়ামত, যা কখনো শেষ হবে না।

رزقنا الله منها بفضله وكرمه فإنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين

৪. অর্থাৎ পরহেজগারদের পরিণামের কথা শুনলে। সামনে দুরাচারীদের পরিণামের কথা শোন।

৫. অর্থাৎ এই যে শাস্তি উপস্থিত, এখন এর স্বাদ আস্বাদন করুক।

৬. غساق – কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা দোযখীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ ও ওদের ময়লা-আবর্জনা উদ্দেশ্য, যার মধ্যে সাপ-বিচ্ছুর বিষ মিশ্রিত থাকবে। আর কারো কারো মতে

৫৮. এবং আছে এরূপ আরো বিভিন্ন শাস্তি।

وَّاٰخَرُ مِنۡ شَکۡلِہٖۤ اَزۡوَاجٌ ﴿۵۸﴾

৫৯. (নেতৃস্থানীয় কাফেররা অনুগামীদের দেখে বলবে) 'এ একটি দল, যারা তোমাদের সাথে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এদের ভাগ্যে প্রশস্ত জায়গা না জুটুক। এরা তো দোযখে প্রবেশকারী।'

هٰذَا فَوۡجٌ مُّقۡتَحِمٌ مَّعَکُمۡ ۚ لَا مَرۡحَبًۢا بِهِمۡ ؕ اِنَّهُمۡ صَالُوا النَّارِ ﴿۵۹﴾

৬০. ওরা (অনুগামীরা) বলবে, 'বরং তোমাদেরই ভাগ্যে প্রশস্ত জায়গা না জুটুক! তোমরাই আমাদের সামনে এই বিপদ এনেছ। আর কত নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল[১]।'

قَالُوۡا بَلۡ اَنۡتُمۡ ۟ لَا مَرۡحَبًۢا بِکُمۡ ؕ اَنۡتُمۡ قَدَّمۡتُمُوۡهُ لَنَا ۚ فَبِئۡسَ الۡقَرَارُ ﴿۶۰﴾

৬১. (অতঃপর) ওরা বলবে, 'হে আমাদের রব! যে আমাদের সামনে এ বিপদ এনেছে, আপনি জাহান্নামে ওর শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন[২]।'

قَالُوۡا رَبَّنَا مَنۡ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدۡهُ عَذَابًا ضِعۡفًا فِی النَّارِ ﴿۶۱﴾

غساق বলে প্রচণ্ড শীতল পানিকে, যা পান করতে অসহনীয় কষ্ট হবে। এ যেন حميم এর সম্পূর্ণ বিপরীত। والله أعلم

১. এই কথোপকথন দোযখীদের পরস্পরের মধ্যে হবে, যখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে একের পর এক এনে এনে দোযখের কিনারায় জমা করবেন। প্রথম দল হবে সর্দার-প্রধানদের, ওদের পর ওদের অনুসারী, অনুগতদের জামাত আসবে। দূর থেকে এদের আসতে দেখে প্রথম দলের লোকেরা বলবে– 'এই দেখ! আর একটি দল ঠেলাঠেলি ও চাপাচাপি করে তোমাদের সাথে দোযখে যাওয়ার জন্য আসছে। এদের উপর আল্লাহর মার পড়ুক। এরা এখানেই আসল! আল্লাহ করুন, এদের ভাগ্যে যেন প্রশস্ত স্থান না জুটে।'

তদুত্তরে (আগমনকারীরা) বলবে– হতভাগারা! তোদেরই উপর আল্লাহর মার পড়ুক, আল্লাহ তোদের যেন কোথাও আরামের জায়গা না দেন। তোরাই তো তারা, যাদের প্ররোচনা ও বিভ্রান্তির কারণে আজ আমাদের এই দুর্দশা। এখন বল, কোথায় যাই? এ স্থান ছাড়া আর কোথাও ঠাঁই নেই। যেভাবেই হোক, এখানেই সকলে মিলে মরতে হবে!!

২. অর্থাৎ পরস্পরকে দোষারোপ ও অভিশাপ করার পর দ্বিতীয় দল আল্লাহ তাআলার নিকট আরয করবে– 'হে প্রতিপালক! যে ব্যক্তি নিজের দুষ্কৃতির ফলে এ বিপদ ও মুসিবত আমাদের মাথার উপর নিয়ে এল, তাকে দোযখে দ্বিগুণ আযাব দিন।'

৬২. আর কাফেররা বলবে, 'আমাদের কী হল যে, আমরা সেই লোকগুলিকে দেখছি না, যাদের আমরা অতি দুরাচারীদের মধ্যে গণ্য করতাম?

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

৬৩. 'আমরা কি (অন্যায়ভাবে) তাদের ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছিলাম, নাকি তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হয়েছে[১]?'

اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

৬৪. এ কথা অবশ্যই সঠিক যে, জাহান্নামীরা পরস্পরে কলহ করবে[২]।

اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

[রুকূ - ৫]

৬৫. আপনি বলুন, 'আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, যিনি এক ও মহাশক্তিধর।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾

৬৬. '(যিনি) আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার রব; পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল[৩]।'

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾

ওদের ভাবখানা এমন যে, তার দ্বিগুণ আযাব দেখে নিজেদের অন্তর কিছুটা ঠান্ডা হবে। কিন্তু সেখানে এর উপায় কোথায়? আর একে অন্যকে অভিশাপ দেওয়া– এও একটি স্বতন্ত্র আযাব।

১. সেখানে ওরা দেখতে পাবে, পরিচিত সাধারণ ও উচ্চ শ্রেণীর সকল লোক দোযখে যাওয়ার জন্য একত্র হয়েছে, কিন্তু যে মুসলমানদের ওরা চিনত এবং সর্বাপেক্ষা মন্দ জেনে বিদ্রুপ করত, তাদের সেখানে দেখা যাচ্ছে না। তখন বিস্মিত হয়ে বলবে, আমরা কি ভুল করে অন্যায়ভাবে তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিলাম? তারা আসলে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্তই না? নাকি এখানেই কোথাও রয়েছে; কিন্তু আমাদের চোখ ভুল করছে, ফলে তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

২. অর্থাৎ বাহ্যত এ কথা কল্পনার অতীত যে, এমন ভয়ঙ্কর অবস্থায় ওরা একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে। কারণ, আযাবের ভয়ানক দৃশ্য কি ওদের অন্য কোন দিকে মনোযোগী হতে দেবে? কিন্তু স্মরণ রেখো! এমনটি হবেই হবে। এ ধ্রুব সত্য, এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। আর আসল কথা হল, এও ওদের আযাবেরই অংশ।

৩. অর্থাৎ আমার কাজ হচ্ছে আসন্ন বিপদসঙ্কুল মুহূর্ত (কিয়ামত) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করা এবং যে ভয়ানক ভবিষ্যৎ আসছে, তা থেকে বেখবর থাকতে না দেওয়া।

৬৭. আপনি বলুন, 'তা এক গুরুতর সংবাদ–	قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿٦٧﴾
৬৮. 'যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে আছ[১]।'	اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. উর্ধ্বজগতের মজলিস সম্পর্কে* আমার কোনই জ্ঞান ছিল না, যখন তারা পরস্পরে বিতর্ক করছিলেন।	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. 'আমার নিকট তো কেবল এই ওহী পাঠানো হয় যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র[২]।'	اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٠﴾

আর তোমাদের যে বিচারকের সম্মুখীন হতে হবে, তিনি তো এক আল্লাহ, যাঁর সম্মুখে ছোট-বড় কেউই টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবে না। সব কিছুই তাঁর সম্মুখে অবনমিত। আকাশ, পৃথিবী ও তাদের মধ্যকার সকল বস্তু তাঁর আয়ত্তাধীন– যতক্ষণ ইচ্ছা কায়েম রাখবেন, যখন ইচ্ছা ভেঙে-চুরে সমান করে দেবেন। এমন মহাক্ষমতাধর ও পরাক্রমশালীকে কে বাধা দিতে পারে? তাঁর সর্বশক্তিশালী মুঠি থেকে কে বের হয়ে পালিয়ে যেতে পারে? সেই সঙ্গে তাঁর অসীম রহমত ও মার্জনাকে সীমিত করার সাধ্য কার আছে? (মোটকথা, তিনি শাস্তি দিতে চাইলে কেউ বাধা দিতে বা পালাতে পারবে না। আর তিনি ক্ষমারও পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।)

১. অর্থাৎ কিয়ামত ও তার অবস্থাদি কোন মামুলি বিষয় নয়। বড় গুরুতর ও নিশ্চিত বিষয়, যার সংবাদ আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। ইরশাদ হয়েছে– عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (লোকেরা পরস্পর কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ওরা জিজ্ঞাসাবাদ করছে সেই মহাসংবাদ সম্বন্ধে, যার ব্যাপারে ওরা মতবিরোধে লিপ্ত। –নাবা, আয়াত ১-৩) কিন্তু আফসোস, তোমরা এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিন্ত। তোমাদের উপরাকার্থে যা কিছু বলা হয়, তোমরা তা আমলে নেও না, বরং উল্টা বিদ্রুপ করে বল, তা কবে আসবে, কেমন করে আসবে? এত দেরি কেন হচ্ছে? তাড়াতাড়ি ডেকে আন না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ফেরেশতাদের (কথোপকথন) সম্পর্কে।'

২. ملأ أعلى (উর্ধ্বজগতের মজলিস) অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা প্রমুখের মজলিস, যাঁদের মাধ্যমে বিশ্বজগতসম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাপনাসমূহ আঞ্জাম পায়। আয়াতের অর্থ হল– উর্ধ্বজগতের মজলিসে বিশ্বব্যবস্থাপনার স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে যেসব আলোচনা ও কথাবার্তা হয়, সে সম্পর্কে আমি কী জানি যে, তোমাদের বলব? তবে হাঁ, আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয় আমাকে অবহিত করেছেন, তা বয়ান করেছি। আমি যা কিছু বলি, তাঁরই ওহী ও অবগতি দানের সূত্রে বলি।

তো, আমার প্রতি এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, সকলকে যেন আসন্ন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিই। রইল এ কথা যে, তা কখন আসবে এবং কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তো সতর্ক করার জন্য এটি জানা জরুরী না, আর এ সম্বন্ধে কাউকে জানানোও হয়নি।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۞

৭১. (স্মরণ করুন), যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ সৃষ্টি করব[১]।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ۞

৭২. 'অতঃপর আমি যখন তাকে পরিপূর্ণরূপে তৈরি করে ফেলব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব[২], তখন তোমরা তাঁর সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো।'

এক হাদীছে আছে, কয়েকজন পয়গম্বরের বৈঠকে কিয়ামতের আলোচনা হয় যে, তা কবে আসবে। সকলে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমি জানি না'। অতঃপর সকলে হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। শেষে সকলে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– কিয়ামত ঠিক কবে সংঘটিত হবে তা তো আমারও জানা নেই, অবশ্য আল্লাহ তাআলা আমার সঙ্গে এই ওয়াদা করেছেন...।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৩৫৫৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩৮৬৮১ –পুরো হাদীস এসব কিতাবে দ্রষ্টব্য)

আরেক হাদীছে আছে, হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন–ما المسئول عنها بأعلم من السائل অর্থাৎ আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি না। (আয়-যুহদ, ইবনুল মুবারাক, হাদীস : ২২৮)

বোঝা গেল, ঊর্ধ্ব জগতের মজলিসে কিয়ামত সম্বন্ধে এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও আলোচনা হয়ে থাকে। এ ছাড়া আরো বহু বিষয় আছে, যেগুলি সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচনা ও কথাবার্তা হয়ে থাকে। এক হাদীছে (তিরমিযী : ৩৫১৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলার কয়েকবার এ প্রশ্ন করা যে– فيم يختصم الملأ الأعلى 'ঊর্ধ্বজগতে কী নিয়ে কথা হচ্ছে?' অতঃপর নবীজির উত্তর প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।– কিন্তু সেখানে কী আলোচনা হয় তা আল্লাহর ওহী ছাড়া আর কোনভাবে জানা সম্ভব নয়।

সে মত, এই ওহীর মাধ্যমেই দোযখীদের ঝগড়া সম্বন্ধে তিনি অবহিত হন, এরই মাধ্যমে ঊর্ধ্বজগতের বৈঠকের কথোপকথন ও বিতর্কের সংবাদ তাঁর কাছে আসে এবং আদম (আ)-এর ব্যাপারে ইবলীসের যে বিতর্ক, যার কথা সামনে উল্লেখ হচ্ছে– তাও এ ওহীর মাধ্যমেই জানা যায়। (অতএব এসব বিষয় অবশ্যই গ্রহণীয়)

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ফেরেশতাদের মধ্যে এ ব্যাপারেও (অর্থাৎ আদমের সৃষ্টির বিষয়ে) আলোচনা হয়েছিল, যা আল্লাহ তাআলা এখানে উল্লেখ করেছেন।'

২. অর্থাৎ শরীরের কাঠামো সঠিকরূপে তৈরি করত তাতে নিজের পক্ষ থেকে একটি রূহ ফুঁকে দেব।

৭৩. অতঃপর ফেরেশতারা সকলে একযোগে সেজদা করল–

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

৭৪. কেবল ইবলীস ছাড়া[১]। সে অহংকার করল। আর সে ছিলই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত[২]।

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭৫. আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিল[৩]? তুই কি অহংকার করলি, নাকি তুই মর্যাদায় বড়[৪]?'

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۝

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'روحي এজন্য বলা হয়েছে যে, তা পানি ও মাটি থেকে তৈরি নয়, বরং তা গায়বের জগত থেকে এসেছে।'

রূহ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা বনী ইসরাঈলে (আয়াত ৮৫) গত হয়েছে। সেখানে রূহকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

১. এ কাহিনী 'বাকারাহ', 'আরাফ' প্রভৃতি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আরাফে (আয়াত ১২-১৩) আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি, তা একবার দেখে নিন।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ইবলীস মূলত জিন ছিল, আর জিনদের অধিকাংশই আল্লাহর বিধান অমান্যকারী; কিন্তু সে তখন (ইবাদত ইত্যাদি বেশি করার ফলে) ফেরেশতাদের মধ্যে থাকা আরম্ভ করেছিল।'

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'দেহকে জাহেরী হাত (কুদরত) দ্বারা এবং রূহকে গায়বের (বা বাতেনী) হাত (কুদরত) দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা গায়বী জিনিস এক ধরনের কুদরত দ্বারা আর জাহেরী জিনিস অন্য প্রকার কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেন। তবে মানুষের সৃষ্টির মধ্যে উভয় প্রকার কুদরতই ব্যবহার করা হয়েছে।'

[সূরা মায়েদার ৬৪নং আয়াত) بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ–এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আল্লাহ তাআলার (صفات) গুণাবলীর বিষয়ে আমাদের নিকট সালাফে সালেহীনের মত ও পথই অধিকতর শক্তিশালী ও সতর্কতা-নির্ভর।

৪. তুই (বুঝে-শুনে কোন অসৎ উদ্দেশ্যে) নিজেকে বড় বানাতে চেয়েছিস, না বাস্তবেই তুই নিজেকে মর্যাদায় উঁচু মনে করিস?

৭৬. সে বলল, 'আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে[১]।'

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

৭৭. আল্লাহ বললেন, 'তুই জান্নাত থেকে বের হয়ে যা। কারণ, তুই বিতাড়িত হলি[২]।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝

৭৮. 'আর তোর উপর আমার লা'নত কর্মফল-দিবস পর্যন্ত[৩]।'

وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৭৯. সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন[৪]।'

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

৮০. তিনি বললেন, 'তোকে অবকাশ দেওয়া হল-

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝

৮১. 'নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত[৫]।'

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝

৮২. সে বলল, 'আপনার শক্তি-ক্ষমতার কসম, আমি অবশ্যই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব-

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

৮৩. তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ছাড়া।'

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

---

১. সূরা আরাফে এর আলোচনা গত হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'আগুন গরম ও উত্তেজনাপূর্ণ, আর মাটি ঠাণ্ডা, শান্ত। ইবলীস আগুনকে উত্তম মনে করল, আল্লাহ তাআলা মাটিকে পছন্দ করলেন।'

২. অর্থাৎ শয়তান বেহেশতে ফেরেশতাদের কাছে যাতায়াত করত। এখন সেখান থেকে তাকে বহিষ্কার করা হল।

৩. অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত তোর আমলাদির কারণে অভিশাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অতঃপর কী হবে? তা তো বলাই বাহুল্য। তার বর্ণনা সামনে আসছে- لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ

সেখানে (আখেরাতে) যে অভিশাপ পড়বে, তার তুলনায় এখানকার অভিশাপসমূহ কিছুই না!

৪. অর্থাৎ শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত।

৫. অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত, তারপর নয়।

৮৪. আল্লাহ বললেন, 'তো, সত্য কথা এই যে– আর আমি সত্যই বলি[১]–

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

৮৫. 'আমি অবশ্যই তোর দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।'

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীদের জন্য কেবল এক উপদেশ।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৮. আর তোমরা কিছুকাল পর এর সংবাদ সম্পর্কে অবশ্যই জানতে পারবে[২]।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

---

১. অর্থাৎ আমার সকল কথা সত্য-সঠিকই হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ, উপদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন নিজেদের শত্রু-মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পার। অতএব, অভিশপ্ত শয়তান, যে তোমাদের চিরশত্রু, ওর পথে চলো না। নবীদের কথা মান্য কর, যাঁরা তোমাদের কল্যাণের জন্য আগমন করেছেন। আমি তোমাদের কাছে এই নসীহতের কোন প্রতিদান বা পারিশ্রমিক চাই না, আর (ما أنا من المتكلفين) অযথা নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বানিয়েও বলি না। আল্লাহ তাআলা একটি বার্তা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমাদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। কিছুকাল পরে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে, যে সকল সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা কতদূর সত্য এবং যে নসীহত করা হয়েছে, তা কীরূপ যথার্থ ও উপকারী ছিল।

সূরা যুমার

সূরা ৩৯ । ৭৫ আয়াত । ৮ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٧٥ ، ركوعاتها ٨

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. (এ) কিতাবের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২. আমি আপনার প্রতি কিতাবটি যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি* । অতএব আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁরই জন্য ইবাদতকে নির্ভেজাল করে**

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ

৩. শুনে রাখ! খাঁটি ইবাদত আল্লাহরই জন্য[২]। আর যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য সাহায্যকারী গ্রহণ করেছে (ওরা বলে), 'আমরা তো তাদের উপাসনা কেবল এজন্য করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।' নিশ্চয় আল্লাহ ওদের মাঝে সেই বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যাতে ওরা

---

১. যেহেতু তিনি পরাক্রমশালী, সেজন্য এ কিতাবের বিধি-বিধান প্রসার লাভ করবেই করবে এবং তা প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাধাদানকারী এই মহান কিতাবকে প্রতিহত করতে পারবে না। আর তিনি হেকমতওয়ালা, প্রজ্ঞাময়। এজন্য দুনিয়ার কোন কিতাব পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার মোকাবেলা করতে পারবে না, তার মত কিছুতেই হবে না।

* দ্বিতীয় তরজমা- '... 'সত্য'সহ অবতীর্ণ করেছি'।

** দ্বিতীয় তরজমা- '... তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে'।

২. অর্থাৎ আপনি যথারীতি আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করতে থাকুন- যা শিরক, রিয়া প্রভৃতির কালিমা থেকে পবিত্র হবে। কথায় ও কাজে লোকদের তাঁরই দিকে দাওয়াত দিন এবং ঘোষণা করে দিন, আল্লাহ তাআলা এমন ইবাদত-বন্দেগীই কবুল করেন, যা একমাত্র তাঁরই জন্য হয়, তাঁর নিকট ইখলাসবিহীন আমলের কোন মূল্য নেই।

মতবিরোধ করছে[১]। আল্লাহ তাকে সৎপথ দেখান না, যে মিথ্যাবাদী, (সত্যের) চরম প্রত্যাখ্যানকারী[২]।	يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝
৪. আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি তো পবিত্র[৩]। তিনিই একক, পরাক্রমশালী আল্লাহ[৪]।	لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

১. (মূর্তি-পূজার অজুহাত বর্ণনায়) সাধারণত মুশরিকরা বলে থাকে যে, এসব ছোট ছোট মাবূদ ও দেব-দেবীর উপাসনা করে আমরা বড় আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারব, ফলে তিনি আমাদের উপর দয়া করবেন এবং আমাদের কার্যসিদ্ধ হবে। এর উত্তরে বলা হচ্ছে, এসব বাজে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে যে বিবাদ-বিসংবাদ করছ এবং আহলে-হকের সঙ্গে মতভেদ করছ, এসবের চূড়ান্ত ফয়সালা ও তার পূর্ণ বাস্তবায়ন অচিরেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা হবে।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন মনে সাব্যস্ত করে রেখেছে যে, কখনো সত্য গ্রহণ করব না, মিথ্যা ও অসত্যকেই সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকব, প্রকৃত অনুগ্রহকারীর পরিবর্তে মিথ্যা অনুগ্রহকারীদেরই উপাসনা করব— এহেন দুরাচারী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার নিয়ম এই যে, তিনি তাকে হেদায়েত ও কামিয়াবীর পথ দেখান না।

৩. এখান থেকে তাদের কথা খণ্ডন করা হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে– যথা: খ্রিস্টানরা হযরত মাসীহ (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে এবং সেই সাথে তাঁকে তিন আল্লাহর এক আল্লাহ মানে। তদ্রূপ আরবের কোন কোন গোত্র ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে।

আয়াতের মর্ম হল, অসম্ভব হলেও ধরা যাক– আল্লাহ তাআলা যদি সন্তান গ্রহণের এরাদা করতেন, তবে তিনি নিজ সৃষ্টির মধ্য থেকেই কাউকে এর জন্য মনোনীত করতেন। কেননা, দলীল-প্রমাণ দ্বারা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, সবই তাঁর সৃষ্টি। অতএব সন্তান নিলে আপন সৃষ্টি থেকেই নিতে হবে। কিন্তু এ অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে শ্রেণীগত বা জাতিগত কোন পর্যায়েই সাদৃশ্য নেই। এ অবস্থায় একে অপরের পিতা বা পুত্র কী করে হতে পারে? আর সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যেহেতু এ সম্পর্ক অসম্ভব, তাই আল্লাহ তাআলার পক্ষে এর এরাদা করাও অসম্ভব।

তদুপরি, যদি সন্তান গ্রহণ অসম্ভব না হত, তবুও ফেরেশতাদের কন্যারূপে গ্রহণ করা কোন রকমেই বোধগম্য হত না। কারণ, এর কী অর্থ যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যা মন্দ আল্লাহ নিজের জন্য সেই জিনিস মনোনীত করতেন, আর উৎকৃষ্ট সন্তানদের (অর্থাৎ পুত্রদের) বেছে বেছে তোমাদের দিতেন?

৪. অর্থাৎ সব কিছু তাঁর সম্মুখে পরাভূত, তাঁর উপর কারো আধিপত্য নেই। তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। সুতরাং কিসের জন্য তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন?

৫. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথার্থ উদ্দেশ্যে। তিনি রাত দ্বারা দিনকে এবং দিন দ্বারা রাতকে আচ্ছাদিত করেন[১]। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে (তোমাদের) কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবে। শোনো! তিনিই পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল[২]।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

৬. তিনি তোমাদের একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া[৩]। আর তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশুর আটটি নর-মাদী সৃষ্টি করেছেন[৪]। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেটে তিন অন্ধকারের মধ্যে[৫] পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন[৬]। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব,

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ

---

১. মাগরিবের সময় পূর্ব দিকে দেখ– মনে হবে, দিগন্ত থেকে অন্ধকারের একটি চাদর চলে আসছে এবং তার সম্মুখে পশ্চিম দিকে দিনের যে আলো, তাকে পাটির ন্যায় গুটিয়ে ফেলছে। তদ্রূপ সুবহে সাদিকের সময় দেখা যায়, দিনের আলো এসে রাতের আঁধারকে হটিয়ে দিচ্ছে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "একটির উপর অন্যটি চলে আসে, এমনই চলতে থাকে, কোন অন্যথা হয় না।"

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাশক্তি দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রের এই ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন এবং তাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। মানুষের ধৃষ্টতা ও দুষ্কৃতি তো এমন ভয়াবহ যে, এর কারণে বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়াই যথার্থ ছিল, কিন্তু আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল। তাই স্বীয় দয়া ও ক্ষমাগুণে তিনি এমন করেন না।

৩. অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ)।

৪. অর্থাৎ তোমাদের উপকারের জন্য তিনি চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আটটি নর-মাদী মিলিয়ে পয়দা করেছেন: উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল –(প্রত্যেকটির নর ও মাদী মিলে মোট আটটি)। সূরা আনআমে এদের আলোচনা গত হয়েছে।

৫. তিন অন্ধকার বলতে– একটি হচ্ছে পেট, দ্বিতীয়টি জরায়ু, তৃতীয়টি ঝিল্লী, যে ঝিল্লীর ভিতরে বাচ্চা থাকে এবং যা প্রসবকালে বাচ্চার সাথে বেরিয়ে আসে।

৬. পর্যায়ক্রমে পয়দা করেছেন অর্থাৎ– বীর্য থেকে জমাট রক্ত, জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড তৈরি করেছেন। অতঃপর হাড়গোড় তৈরি করলেন এবং তার উপর মাংস চড়ালেন, তারপর আত্মা ফুঁকে দিলেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা (সত্য থেকে) বিমুখ হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ*[১]?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৭. তোমরা কুফর অবলম্বন করলে, আল্লাহ তো তোমাদের মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফরকে পছন্দ করেন না[২]। আর (তাঁর) শোকর করলে, তিনি তা-ই তোমাদের জন্য পছন্দ করেন[৩]। আর কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না[৪]। অতঃপর তোমাদেরকে স্বীয় রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমরা যা করতে তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞাত[৫]।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا

৮. যখন মানুষকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, সে স্বীয় রবকে তাঁর অভিমুখী হয়ে ডাকতে

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ?'

১. অর্থাৎ যখন স্রষ্টা, রব, মালিক ও রাজাধিরাজ তিনিই, তখন তিনি ছাড়া আর কে উপাস্য হতে পারে? এক আল্লাহর জন্য এসব গুণের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও অন্যের উপাসনা কী করে কর? এবং এ সত্য মেনে নিয়েও তাওহীদ বর্জন করছ কীভাবে?

২. অর্থাৎ কাফের হয়ে তাঁর নে'য়ামত ও অনুগ্রহ অস্বীকার করলে তোমাদেরই ক্ষতি, তাঁর কিছুই আসে যায় না। তবে এও সত্য যে, তিনি কুফরের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাঁর বান্দারা কাফের ও অস্বীকারকারী হয়ে গেলে তিনি চরম অসন্তুষ্ট হন এবং একে খুবই অপছন্দ করেন।

৩. অর্থাৎ বান্দারা তাঁর হকসমূহ স্বীকার করত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত হলে তা তিনি পছন্দ করেন, যার সুফল বান্দারাই লাভ করে।

৪. অর্থাৎ না-শোকরী করবে একজন, পাকড়াও হবে অন্যজন– এমন জুলুম, অবিচার তাঁর আদালতে নেই। যে যা করবে, সে তার ফল ভোগ করবে।

৫. অর্থাৎ সেখানে গিয়ে সকলেই দেখতে পাবে, ভাল-মন্দ আমল সবই সামনে উপস্থিত আছে– কোন ছোট-বড় আমলকেই অনুপস্থিত পাবে না। কেননা, কোন কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বহির্ভূত নয়। এমনকি অন্তরের গভীরে যা গুপ্ত আছে, তাও তিনি জানেন।

إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ ⑧

থাকে। অতঃপর তিনি যখন নিজের পক্ষ থেকে তাকে নেয়া'মত দান করেন, তখন সে যার জন্য ইতিপূর্বে (তাঁকে) ডাকছিল তা ভুলে যায় এবং আল্লাহর জন্য সমকক্ষ স্থির করে, যাতে তাঁর পথ থেকে (অন্যদেরও) বিচ্যুত করে[১]। আপনি (এমন ব্যক্তিকে) বলুন, 'স্বীয় কুফর নিয়েই কিছু দিন মজা লুটে নাও। তুমি তো দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত[২]।'

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْءَاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ⑨

৯. আচ্ছা! যে ব্যক্তি রাতের প্রহরগুলিতে সেজদারত অবস্থায় ও দাঁড়িয়ে ইবাদতে মশগুল থাকে, আর সে আখেরাতকে ভয় করে এবং স্বীয় প্রভুর রহমতের আশা রাখে- (সে কি উপরোক্ত কাফেরের সমান)? আপনি বলুন, 'যারা প্রজ্ঞার অধিকারী আর যাদের প্রজ্ঞা নেই, উভয়ে কি সমান? বস্তুত উপদেশ শুধু তারাই গ্রহণ করে, যারা বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন[৩]।

---

১. অর্থাৎ মানুষের অবস্থা আজীব, অদ্ভুত- বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করে। কারণ দেখে, বিপদ দূর করার কেউ নেই। তারপর যখন আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে একটু আরাম ও স্বস্তি ভাগ্যে জুটে, অমনি সে পূর্বাবস্থা ভুলে যায়, যার জন্য একটু আগেই আমাকে ডেকেছিল। সুখ-সম্ভোগের নেশায় সে এমন মত্ত ও গাফিল হয়ে যায়, যেন কখনো আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। তখন আল্লাহপ্রদত্ত নে'য়ামতসমূহকে সে মিথ্যা ও মনগড়া খোদার অবদান বলে মনে করতে শুরু করে এবং ওদের সাথে এমন আচরণ করে, যা এক আল্লাহর সঙ্গে করা উচিত ছিল। এভাবে সে নিজেও গোমরাহ হয় এবং নিজ কথা ও কাজের দ্বারা অন্যদেরও গোমরাহ করে।

২. অর্থাৎ ঠিক আছে, কাফের অবস্থায় দুনিয়াতে আরো কিছুদিন আনন্দ-ফুর্তি করে নাও এবং আল্লাহ যে কয়দিনের অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, সে কয়দিন দুনিয়ার নে'য়ামতে মত্ত থাক। তারপর তোমাকে দোযখে যেতে হবে, যেখান থেকে কখনো নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ যে বান্দা রাতের ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে, তাঁর সম্মুখে কখনো করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকে, কখনো সেজদায় পড়ে থাকে; একদিকে আখেরাতের ভয় তার অন্তরকে অস্থির করে রাখে, অন্যদিকে আল্লাহ তাআলার রহমতের আশায় বুক বাঁধে- এমন ভাগ্যবান বান্দা কি উল্লিখিত সেই হতভাগার সমান হতে পারে, যে বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকে, কিন্তু উদ্ধার পাওয়ামাত্র আল্লাহকে ত্যাগ করে? কখনো

[রুকূ - ২]

১০. আপনি বলুন, 'হে আমার ঈমানদার বান্দারা[১]! স্বীয় রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ[২]। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। শুধু ধৈর্যশীলদেরই অপরিমিত প্রতিদান দেওয়া হবে[৩]।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۭ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۭ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩

১১. আপনি বলুন, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি ইবাদতকে তাঁরই জন্য নির্ভেজাল করে*।

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ⑪

১২. 'আমাকে আরো আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন সর্বপ্রথম আদেশ মান্যকারী হই[৪]।'

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑫

নয়। এমন হলে তো বলতে হবে, জ্ঞানী ও মূর্খ অথবা বুদ্ধিমান ও বেকুবের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই!!

কিন্তু এ কথাও তারাই বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যাদের আকল-বুদ্ধি দান করেছেন।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঈমানদারদের এই কথা বলে দিন।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেকী করেছে, আখেরাতে তার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, যে নেকী করেছে, সে আখেরাতের পূর্বে এই দুনিয়াতেই কল্যাণ লাভ করবে– জাহেরী বা বাতেনী, বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক।

৩. অর্থাৎ যদি এক ভূখণ্ডে সৎপথে চলতে বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হও, তবে আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। অন্য এলাকায় চলে যাও, যেখানে স্বাধীনভাবে তাঁর বিধি-বিধান পালন করতে পার। নিঃসন্দেহে এভাবে আপন ভূমি ত্যাগ করার ক্ষেত্রে বহু বিপদাপদ সইতে হবে এবং স্বীয় স্বভাব ও তবিয়তের বিপরীত নানা রকম অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, অফুরন্ত ছওয়াবও শুধু তারাই পাবে, যারা আমল করবে, ধৈর্য ধরবে। এই ছওয়াবের বিপরীতে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ কিছুই নয়।

* **দ্বিতীয় তরজমা**– '... তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে'।

৪. সে মত তিনি বাহ্যজগতে এ উম্মতের মধ্যে এবং অদৃশ্য জগতে (এ উম্মত শুধু নয়) সমগ্র পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম আজ্ঞাবহ বান্দা। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১৩. আপনি বলুন, 'আমি যদি আমার রবের অবাধ্যতা করি, তবে এক গুরুতর দিবসের শাস্তির ভয় করি'[১]।

قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

১৪. আপনি বলুন, 'আমি তো আল্লাহরই ইবাদত করি তাঁরই জন্য আমার ইবাদতকে নির্ভেজাল করে।

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ ۝

১৫. 'আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যার ইচ্ছা উপাসনা কর[২]।' আপনি বলুন, 'চরম ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদেরকে ও নিজ পরিবার-পরিজনকে কিয়ামতের দিন ক্ষতির সম্মুখীন করবে। শুনে রাখ! এ-ই সুস্পষ্ট ক্ষতি[৩]।'

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ۝

১৬. ওদের জন্য ওদের উপরের দিক থেকেও থাকবে আগুনের আচ্ছাদন এবং ওদের নীচের দিক থেকেও থাকবে আচ্ছাদন[৪]। এরই ভয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দেখান। হে আমার বান্দারা! অতএব আমাকে ভয় কর[৫]।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝

---

১. অর্থাৎ আমার ন্যায় নিষ্পাপ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত রাসূলও যদি– অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া যাক– নাফরমানী করি, তবে সেদিনের আযাব থেকে আমিও নিরাপদ নই। এখন ভেবে দেখ, অন্যদের অবস্থা কেমন হবে।

২. অর্থাৎ আমি তো আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরম ইখলাসের সাথে এক আল্লাহরই বন্দেগী করি। বাকি তোমাদের এখতিয়ার আছে, যার ইচ্ছা তার পূজা করে যাও। তবে মনে রাখতে হবে, এর পরিণাম কী? সম্মুখে তা-ই স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে নিজেদেরও রক্ষা করতে পারবে না, নিজ পরিবার-পরিজনকেও না, সকলকে জাহান্নামের অগ্নি-শিখার খোরাকে পরিণত করবে। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে?

৪. অর্থাৎ সকল দিক থেকে আগুন ওদের ঘিরে ধরবে, যেমন মেঘমালা আকাশ ছেয়ে ফেলে।

৫. অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ, এ বিষয়টি ভয় পাওয়ার মত কিনা? যদি হয়, তবে আল্লাহ তাআলার আযাব-গযব সম্পর্কে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত।

১৭. আর যারা তাগুতের উপাসনা করা থেকে বেঁচে রইল এবং আল্লাহর অভিমুখী হল, তাদেরই জন্য রয়েছে সুসংবাদ[১]। অতএব আপনি সুসংবাদ শুনিয়ে দিন আমার সেই বান্দাদের–

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ

১৮. যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যা কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে[২]। এরাই তারা, যাদের আল্লাহ সৎপথ দেখিয়েছেন এবং এরাই বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক[৩]।

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১৯. আচ্ছা, যার ব্যাপারে শাস্তির কথা অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি আগুনে পতিত (এমন) ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারবেন[৪]?

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۚ

---

১. অর্থাৎ যারা শয়তানের কথা মানেনি এবং সকল মিথ্যা অংশীদার থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি রুজু করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

২. অর্থাৎ সব রকমের কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যে কথা ভাল সে মত চলে।

অথবা (কথা দ্বারা আল্লাহর কথা উদ্দেশ্য।) অর্থ এই যে, তারা আল্লাহর কথা শোনে এবং তার মধ্যে অধিক থেকে অধিক উত্তম বিষয়গুলোর উপর আমল করে। যেমন: কোন ক্ষেত্রে একটি দিক হচ্ছে রুখ্‌সতযোগ্য ও শুধু মুবাহ, আর অপরটি আযীমত ও উত্তম। তারা এ ধরনের ক্ষেত্রে রুখ্‌সতের উপর আমল না করে আযীমতের উপর আমল করে। তারা রুখ্‌সতের দিকগুলো তালাশ করে বেড়ায় না। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার কালাম শোনে এবং এর উত্তম কথাগুলির অনুসরণ করে। বস্তুত, এর সমস্ত কথাই উত্তম। كذا قال المفسرون

কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) অন্যভাবে আয়াতের অর্থ বয়ান করে বলেন, 'তারা অনুসরণ করে তার উত্তম দিকটির, অর্থাৎ যেসব বিষয় করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করে, আর যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বর্জন করে। অতএব প্রথমোক্ত বিষয়গুলো আঞ্জাম দেওয়া আর নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্জন করাই হল أحسن (উত্তম)-এর অনুসরণ।

৩. অর্থাৎ সফলতার পথ তারাই পেয়েছে। কেননা, তারা আকল-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে খাঁটি তাওহীদ ও আল্লাহ-অভিমুখিতার পথ অবলম্বন করেছে।

৪. অর্থাৎ নিজেদের জিদ, অবাধ্যতা ও অসৎ কাজকর্মের কারণে যাদের ব্যাপারে আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কি হেদায়াতের পথ পেতে পারে? এবং যে হতভাগারা স্বীয় চিরকালীন দুর্ভাগ্যের কারণে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, তাদেরকে কে পথে আনতে পারবে এবং কে তাদের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারবে? নিশ্চয় কেউ না।

২০. কিন্তু যারা আপন রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বহু বালাখানা, যার উপর আছে আরো নির্মিত বালাখানা[১] (এবং) যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত। এ আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদার বরখেলাফ করেন না।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿۲۰﴾

২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর সেই পানি যমীনের ঝরনাসমূহে প্রবাহিত করেন[২], অতঃপর তার দ্বারা বিবিধ বর্ণ ধারণকারী ফসল উৎপন্ন করেন[*৩]। এরপর ফসল শুকিয়ে যায়। তখন তুমি তাকে পীতবর্ণের দেখতে পাও। অতঃপর তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেন? নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে[৪]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۲۱﴾

---

১. এতে জান্নাতের স্তরসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং এ ইশারাও যে, এসব জিনিস প্রস্তুত রয়েছে। কিয়ামত দিবসে তা তৈরি করা হবে, এমন নয়।

২. অর্থাৎ বৃষ্টির পানি পাহাড়-পর্বত ও বিভিন্ন ভূখণ্ডের ছিদ্রসমূহে শোষিত হয়ে ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে।

উল্লেখ্য, ঝরনাধারা নির্গত হওয়ার যদি আরো কারণ থাকে, তবে আয়াত তা অস্বীকার করে না।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** '... বিভিন্ন বর্ণের ফসলাদি উৎপন্ন করেন'।

৩. অথবা زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ- এর অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন রকমের ফসল– যথা: গম, ধান প্রভৃতি।

৪. অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ফসলের অবস্থা দেখে এই উপদেশ গ্রহণ করে যে, এর সৌন্দর্য ও শ্যামলিমা ক্ষণস্থায়ী, যেমন ঠিক এ অবস্থা দুনিয়ার জাঁকজমকেরও। অতএব মানুষের উচিত, দুনিয়ার সাময়িক আনন্দে মেতে পরিণাম সম্বন্ধে গাফেল না হওয়া।

ফসল বিভিন্ন অংশের সমষ্টি– যথা: তার মধ্যে শস্যকণা রয়েছে, যা মানুষের খাদ্য হয়, আবার ভুষিও (খোসা) আছে, যা জীবজন্তুর খাদ্য হয়। তবে এর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করতে হয় এবং নিজ নিজ স্থানে রাখতে হয়। তদ্রূপ দুনিয়ার অবস্থা। এতে ভাল-মন্দ, আরাম-কষ্ট প্রভৃতি সব অবস্থা মিলে-মিশে আছে। একটি সময় আসবে, যখন এই দুনিয়ারূপ ফসলও কেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। তারপর তার প্রত্যেক অংশকে পৃথক করে সঠিক স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে– সৎকর্ম

[রুকূ - ৩]

২২. আচ্ছা, আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন, ফলে সে তার রবের পক্ষ থেকে আগত আলোর মধ্যে আছে– (সে কি কঠিন অন্তরের ব্যক্তির সমান হতে পারে?)। সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের বিষয়ে কঠিন। ওরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে[১]।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَعَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

২৩. আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উৎকৃষ্ট বাণী[২]– এমন কিতাব, যা(-র আয়াতগুলি) পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, যা(-র বিভিন্ন বিষয়) পুনরাবৃত্ত[৩]। যারা আপন রবকে ভয় করে

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ

ও শান্তি নিজ ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছবে, আর মন্দ ও কষ্ট তার নির্ধারিত স্থানে গিয়ে পৌঁছবে। মোটকথা, ফসলের বিভিন্ন অবস্থা দেখে বুদ্ধিমান লোকেরা অত্যন্ত উপকারী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অধিকন্তু আয়াতের মধ্যে এই দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে আল্লাহ আকাশের বৃষ্টি দ্বারা মাটির বুকে ঝরনাধারা প্রবাহিত করে দিলেন, তিনিই জান্নাতের বালাখানার তলদেশে অত্যন্ত মানানসইভাবে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত করে দেবেন।

১. অর্থাৎ এ দুজন কী করে সমান হতে পারে? এদের একজন তো এমন যে, ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাআলা তার অন্তর খুলে দিয়েছেন, ইসলাম সত্য হওয়ার ব্যাপারে তার কোন সংশয়-সন্দেহ নেই এবং ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলতে তার কোন দ্বিধা নেই। আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক ও অন্তর্দৃষ্টির এমন বিস্ময়কর আলো দান করেছেন, যার দ্বারা সে স্থিরতা ও শান্তির সাথে আল্লাহ তাআলার পথে অগ্রসরমান। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে সেই হতভাগা, যার অন্তর পাথরের মত শক্ত- তাতে না কোন নসীহত দাগ কাটতে পারে, না কল্যাণের কোন ফোঁটা তার ভেতরে ঢুকতে পারে। আল্লাহকে স্মরণের তাওফীক তার কখনো হয় না। ধারণা-কল্পনা, রিপুর তাড়না এবং বাপদাদার রীতি-নীতির অনুকরণ-অনুসরণের অন্ধকারপুঞ্জে সে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে। অতএব এরা দু'জন কক্ষনো সমান নয়।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার কোন কথা এই কিতাবের বাণীসমূহের চেয়ে উত্তম নয়।

৩. অর্থাৎ সঠিক, সত্য, পরিপক্ক, উপকারী, যুক্তিযুক্ত এবং সাহিত্যপূর্ণ হওয়া– এসব বৈশিষ্ট্য প্রতিটি আয়াতে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। একটি আয়াত অন্যটির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। এবং আয়াতগুলোর বিষয়াবলীর মধ্যে কোন বিরোধ ও বৈপরীত্য নেই। বরং বহু আয়াতের

ثُمَّ تَلِيۡنُ جُلُوۡدُهُمۡ وَقُلُوۡبُهُمۡ اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ

তাদের চামড়া তার ফলে সঙ্কুচিত হয়ে যায় (অর্থাৎ তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়)। অতঃপর তাদের দেহ-মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে[১]।

বিষয়বস্তু এমন সাদৃশ্যপূর্ণ যে, এক আয়াতকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে দেখলে আয়াতের সহীহ তাফসীর জানা যায়। তাই তো বলা হয়- القرآن يفسر بعضه بعضا (কুরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা করে।)

আর مثاني এর অর্থ এই যে, এতে আহকাম, উপদেশ ও কাহিনীসমূহ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ঢঙে পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে, যাতে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। তাছাড়া তেলাওয়াতের মধ্যেও এর আয়াতগুলি বারবার পঠিত হয়।

কোন কোন তাফসীরকার متشابه ও مثاني এর এই অর্থ করেছেন যে, কোন কোন স্থানে একই রকমের বিষয় বহু দূর পর্যন্ত আলোচনা করা হয়। একই বিষয়ের এমন আয়াতগুলি হল متشابه। আর কোন কোন স্থানে এক বিষয়ের সাথে পরের বাক্যে বিপরীত বিষয় বর্ণিত হয়, যেমন- إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (পুন্যবানরা থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, আর পাপীরা দোযখে। -ইনফিতার, আয়াত ১৩-১৪)- অথবা نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন, আমিই প্রকৃত ক্ষমাশীল, অতি মেহেরবান। এবং এও শুনিয়ে দিন যে, আমার শাস্তি যাতনাদায়ক শাস্তি। -হিজ্‌র, আয়াত ৪৯-৫০)। অথবা- وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (আর আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতি মেহেরবান। -আলে ইমরান, আয়াত ৩০)। এ ধরনের আয়াতসমূহকে مثاني বলা হবে। কারণ, এগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন দুই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১. অর্থাৎ কালামে পাক শোনার পর আল্লাহ তাআলার ভয় এবং তাঁর কালামের আজমতের কারণে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে আর শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায়। تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ... -'তাদের চামড়া ও অন্তর নরম হয়ে যায়' অর্থাৎ, ভয়-ভীতির অবস্থা প্রকাশ পায় এবং তাদের দেহ ও মন এবং জাহের ও বাতেন আল্লাহ তাআলার স্মরণের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, আর আল্লাহ তাআলার স্মরণ তাদের দেহ ও আত্মা উভয়ের মধ্যে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এ অবস্থা সবলচিত্ত, কামেল বান্দাদের বেলায় ঘটে। বাকি থাকল, কখনো দুর্বলচিত্ত, অপূর্ণ ব্যক্তিদের উপর অন্য রকমের কাইফিয়্যত ও হাল- যথা: মূর্ছা, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি প্রকাশ পাওয়া— তো আয়াতে একে অস্বীকার করা হয়নি। আর এরা উক্ত কামেলদের চেয়ে শ্রেয়- এ কথাও বলা যায় না। বরং এরূপ সংজ্ঞাহীন ও বেসামাল হয়ে যাওয়া সাধারণত যার কারণে এরূপ হয়েছে তার শক্তি আর যার এ অবস্থা হয়েছে তার দুর্বলতা প্রকাশ করে। তিরমিযী শরীফে (হাদীস ২৩৮২) স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এক হাদীস বর্ণনার সময় আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর উপর এ ধরনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

এ আল্লাহর পথ-নির্দেশ। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ দেখান। আর যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই[১]।

اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আচ্ছা, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন স্বীয় মুখ দ্বারা কঠিন আযাব প্রতিহত করবে– (সে কি তার সমান, যে আযাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ)? আর অপরাধীদের বলা হবে, 'তোমরা যা করতে তার (শাস্তি) আস্বাদন কর[২]।'

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল। ফলে ওদের উপর ওরা ধারণাও করতে পারেনি এমন দিক থেকে আযাব আসল।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ ওদেরকে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন। আর নিশ্চয় আখেরাতের আযাব (এর চেয়ে) গুরুতর। হায়, এরা যদি জানত[৩]!

---

১. অর্থাৎ যার জন্য আল্লাহ তাআলা স্বীয় হেকমত অনুসারে চান, তার জন্য সফলতার রাস্তাসমূহ খুলে দেন এবং তাকে মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে দেন। আর যাকে তারই অযোগ্যতা ও দুরাচারের কারণে আল্লাহ তাআলা হেদায়াতের তাওফীক না দেন, তাকে সহায়তা করার মত কে আছে?

২. মানুষের স্বভাব হল, সম্মুখ থেকে কোন আক্রমণ এলে তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। কিন্তু হাশরের দিন জালেমদের হাত বাঁধা থাকবে বলে আযাবের মারগুলি সরাসরি মুখে এসে পড়বে। তো, যে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম আযাব নিজ চেহারায় গ্রহণ করবে এবং যাকে বলা হবে, যে কর্ম দুনিয়াতে করেছিলে তার মজা ভোগ কর– সে কি ওই মুমিনের মত হতে পারে, যার উপর আখেরাতে কোন কষ্ট ও আঘাত পৌঁছার আশঙ্কা নেই; বরং আল্লাহ তাআলার ফযলে সে শান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকবে? নিশ্চয় না।

৩. অর্থাৎ বহু জাতি নবীদের অস্বীকার করার ফলে দুনিয়াতে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হয়েছে, আর আখেরাতের আযাব তো রয়েছেই। তবে কি বর্তমান অস্বীকারকারীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, তাদের সাথে এ আচরণ করা হবে না? বস্তুত, তাদের যদি বুদ্ধি থাকত তবে কিছু ফিকির করত।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ

২৭. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে–

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

২৮. তা আরবী ভাষার কুরআন, যার মধ্যে বক্রতা নেই; যাতে তারা ভয় করে চলে[১]।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন– এক ব্যক্তি এমন, যার মধ্যে পরস্পরবিরোধী কয়েক ব্যক্তি অংশীদার, আর অপর ব্যক্তি এমন, যে সম্পূর্ণরূপে একই ব্যক্তির। এ দু'ব্যক্তির অবস্থা কি সমান[২]? সমস্ত প্রশংসা

---

১. অর্থাৎ সত্যকে না বোঝার কারণ ওদের নিজেদের উদাসীনতা ও নির্বুদ্ধিতা। বোঝানোর ব্যাপারে কুরআনের কোন ত্রুটি নেই। কুরআন তো প্রত্যেকটি বিষয় দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ দিয়ে দিয়ে বোঝায়, যাতে লোকেরা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে এবং নিজেদের পরিণাম দুরুস্ত করার চেষ্টা করে।

কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষার কিতাব, যে ভাষা কুরআন যাদের সর্বপ্রথম সম্বোধন করেছে তাদের মাতৃভাষা ছিল। এতে কোনই বক্রতা নেই, বরং তার বক্তব্য সরল ও সুস্পষ্ট, যা সুস্থ বুদ্ধি কবুল করে। এর ভাষা বা বিষয়বস্তুতে কোন প্রকার অসংগতিও নেই। যেসব বিষয় গ্রহণ করতে বলে, তা গ্রহণ করায় কোনই অসুবিধা নেই এবং যেসব জিনিসের উপর আমল করাতে চায়, সেসবের উপর আমল করাও অসম্ভব নয়। কুরআনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এই যে, লোকেরা অনায়াসে তা দ্বারা উপকৃত হোক, বিশ্বাসগত ও আমলগত ভুলভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকুক এবং সহজ ও সুস্পষ্ট নসীহত শুনে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকুক ও তাকওয়ার জীবন যাপন করুক।

২. অর্থাৎ কয়েকজন অংশীদার একই দাস বা চাকরের মধ্যে শরীক। ঘটনাক্রমে প্রত্যেক অংশীদার স্বার্থপর, অভদ্র ও একগুঁয়ে বলে প্রত্যেকে চায়, দাস শুধু তার কাজে নিয়োজিত থাকুক, অন্য শরীকদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখুক। বলা বাহুল্য, এই টানাটানিতে দাস অত্যন্ত পেরেশান ও অস্থির থাকবে। পক্ষান্তরে, যে দাস সম্পূর্ণরূপে এক মনিবের হবে, সে এক ধরনের একাগ্রতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং কয়েক মনিবকে সন্তুষ্ট রাখার ঝামেলা তাকে পোহাতে হবে না। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, এ উভয় দাস সমান হতে পারে না।

এর আলোকে মুশরিক ও তাওহীদপন্থীর অবস্থা বোঝা সম্ভব। মুশরিকদের অন্তর কয়েক দিকে বিভক্ত এবং বহু মিথ্যা উপাস্যকে সন্তুষ্ট রাখার চিন্তায় ব্যস্ত। পক্ষান্তরে তাওহীদবাদীর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, ধ্যানধারণা ও চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্র একমাত্র আল্লাহ। সে সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্তে তাঁকেই সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। সে বোঝে, তাঁর সন্তুষ্টির পর আর কারো সন্তুষ্টির প্রয়োজন নেই।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

আল্লাহর জন্য। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[১]।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝

৩০. আপনিও মরণশীল এবং ওরাও মরণশীল।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

৩১. অতঃপর, নিশ্চয় তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে বিবাদ করবে[২]।

পারা - ২৪ [রুকূ - ৪]

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৩২. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে যখন তা তার নিকট পৌঁছে? এমন কাফেরদের ঠিকানা জাহান্নামে নয় কি[৩]?

অধিকাংশ তাফসীরকার এই উদাহরণের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন।

কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে দাস কয়েক মনিবের, কেউ-ই তাকে আপন মনে করে না, তার যত্ন নেয় না। আর যে দাস সম্পূর্ণরূপে একজনের, সে তাকে আপন মনে করে এবং আপন তত্ত্বাবধানে রাখে। প্রথমটি তাদের উদাহরণ, যারা কয়েক রবের বান্দা; আর দ্বিতীয়টি তাদের, যারা এক রবের বান্দা।'

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। কারণ, তিনি বড় উচ্চ মানের বিষয়াদি ও গভীর কথা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু হতভাগা আছে, যারা এই উদাহরণগুলি বোঝার চেষ্টা করে না।

২. অর্থাৎ (দুনিয়াতে) মুশরিক ও তাওহীদবাদীর মধ্যে যে মতবিরোধ, তার ফলাফল কিয়ামতের দিন সর্বসমক্ষে প্রকাশ পাবে– যখন পয়গম্বর ও উম্মত সকলকে একত্র করা হবে এবং কাফেররা নবী ও মুমিনদের মোকাবেলায় তর্কবিতর্ক করবে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "কাফেররা সেদিন বলবে, আমাদের নিকট কেউ আল্লাহর বার্তা পৌছায়নি। তখন ফেরেশতাদের সাক্ষ্য, যমীন ও আসমানের সাক্ষ্য এবং হাত-পায়ের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে" যে, ওদের এই দাবি মিথ্যা।

তদ্রূপ অপরাপর সমস্ত বাদানুবাদের ফয়সালাও সেই দিন প্রভুর সামনে হয়ে যাবে।

اختصام শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে নেওয়া ভাল, যাতে বিভিন্ন হাদীস ও আছারের (آثار) খেলাফ না হয়।

৩. 'আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে'—অর্থাৎ তাঁর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে অথবা সন্তান সাব্যস্ত করে, অথবা তাঁর সঙ্গে এমন গুণাবলী সম্পৃক্ত করে, যা বাস্তবে তাঁর উপযুক্ত নয়। আর

৩৩. আর যারা সত্য নিয়ে আসে এবং তাকে বিশ্বাস করে, তাঁরাই আল্লাহভীরু[১]।

وَالَّذِىۡ جَآءَ بِالصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُتَّقُوۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৪. তাদের জন্য তাদের রবের নিকট আছে যা-কিছু তারা চাইবে। এ-ই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান-

لَهُمۡ مَّا يَشَآءُوۡنَ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ‌ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الۡمُحۡسِنِيۡنَ ۖۚ ﴿۳۴﴾

৩৫. (তা এজন্য), যাতে আল্লাহ তাদের থেকে তারা যে মন্দকর্ম করেছিল তা দূর করে দেন এবং তাদেরকে তাদের প্রতিদান দান করেন– তারা যে উত্তম আমল করত তার বিনিময়ে[২]।

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ اَسۡوَاَ الَّذِىۡ عَمِلُوۡا وَيَجۡزِيَهُمۡ اَجۡرَهُمۡ بِاَحۡسَنِ الَّذِىۡ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۳۵﴾

'সত্যকে অস্বীকার করে, যখন তা পৌঁছে তার নিকট'—অর্থাৎ নবীগণ যে সত্য বিষয়াদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন, তা শোনামাত্রই অস্বীকার করে, চিন্তা করে বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। যে ব্যক্তি সত্যের এত বড় দুশমন, নিঃসন্দেহে তার চেয়ে বড় জালেম কেউ হতে পারে না এবং এমন জালেমদের ঠিকানা দোযখ ছাড়া আর কিছু নয়।

মুফাসসিররগণ আয়াতের এ তাফসীরই করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ নবী যদি প্রতারণার উদ্দেশ্যে আল্লাহরই নাম নিয়ে থাকেন, তবে তার চেয়ে অসৎ আর কে? আর যদি তিনি সত্য হয়ে থাকেন অথচ তোমরা তাকে মিথ্যুক বলছ, তবে তোমাদের চেয়ে দুরাচারী আর কে?'—অর্থাৎ তাঁর নিকট من كذب على الله আর كذب بالصدق الخ এর পাত্র ভিন্ন ভিন্ন। পরের আয়াতের ক্ষেত্রেও একই কথা।

১. অর্থাৎ আল্লাহভীরু লোকদের অবস্থা এই যে, তারা সত্য নিয়ে আসেন, সর্বদা সত্য বলেন এবং সত্যের সমর্থন করেন।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যিনি সত্য নিয়ে আসলেন তিনি নবী, আর যিনি সত্যকে মানলেন তিনি মুমিন।' (অর্থাৎ তাঁর মতে উভয় বাক্যের পাত্র ভিন্ন ভিন্ন।)

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী ও পুণ্যবান লোকদেরকে তাদের উত্তম কার্যের প্রতিদান দেবেন এবং তাদের দ্বারা ভুলক্রমে যে মন্দকাজ হয়ে গিয়ে থাকবে, তা মাফ করে দেবেন।

বি. দ্র. আয়াতে اَسۡوَاَ ও اَحۡسَنِ (صيغه تفضيل এর তথা অতিশয়তা নির্দেশকারী শব্দ) হয়তো এ জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, উচ্চ মর্যাদাবানদের সামান্য পুণ্য অন্যদের পুণ্যের তুলনায় অধিক গণ্য হয় এবং তাদের সামান্য ত্রুটি অন্যদের ত্রুটির তুলনায় বড় বিবেচিত হয়।

৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? ওরা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। আসলে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۚ﴿۳۶﴾

৩৭. এবং আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন[১]?

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾

৩৮. আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো– তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক, আল্লাহ আমাকে কোন কষ্ট দিতে চাইলে তারা কি তাঁর দেওয়া কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি তাঁর অনুগ্রহ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ

---

১. কয়েক আয়াত পূর্বে শিরকের অসারতা ও মুশরিকদের মূর্খতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ জাতীয় আলোচনার কারণে মুশরিকরা পয়গম্বর আলাইহিসসালাতু ওয়াস্সালামকে নিজেদের দেব-দেবীর ভয় দেখিয়ে বলত, দেখুন, আমাদের দেব-দেবীর অবমাননা করে তাদের রাগান্বিত করবেন না। পাছে তারা আপনাকে বদ্ধ পাগল বানিয়ে দেয় (নাউযুবিল্লাহ)।

তদুত্তরে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহর বান্দা হয়ে গিয়েছেন, তিনি কীভাবে তোমাদের এই অক্ষম ও নিঃস্ব খোদাদের ভয় করতে পারেন? তাঁর জন্য কি সেই সর্বশক্তিমান ও শাস্তি দানকারীর সাহায্য-সহায়তা যথেষ্ট নয়? অন্য কাউকে ভয় বা সমীহ করার দরকার কী?

এক আল্লাহর ইবাদতকারীকে এমন অহেতুক ভীতি প্রদর্শন করাটা মুশরিকদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, সুপথে পরিচালনা করা–না করা সবই আল্লাহর হাতে। যখন কোন ব্যক্তিকে তারই বদ আমল ও বক্রতার কারণে আল্লাহ তাআলা সফলতার পথ না দেখান, তখন সে এরূপ মস্তিষ্ক-বিকৃত ও পাগল হয়ে যায় এবং মোটা মোটা কথা বোঝার শক্তিও তার মধ্যে থাকে না।

এ আহমকদের কি এতটুকু বুঝও নেই যে, যে বান্দা আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে এসে গেছেন, কোন শক্তি তাঁর কিছুমাত্র অনিষ্ট করতে পারে না? যে শক্তিই তাঁর বিরোধিতা করবে, তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। আল্লাহ তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের পক্ষে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বেন না।

رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾

রোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে[১]।'

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. আপনি বলুন, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করে যাও। আমিও কাজ করছি। তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে–

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾

৪০. 'কে সে, যার উপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি নেমে আসবে এবং তার উপর আপতিত হবে চিরস্থায়ী আযাব[২]।'

---

১. অর্থাৎ একদিকে তোমাদেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ পাক আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। অন্যদিকে রয়েছে পাথরের নির্জীব মূর্তিসমূহ বা অক্ষম সৃষ্টি, যারা সকলে মিলে আল্লাহর দেওয়া সামান্য কষ্ট ও আরামও হটাতে পারে না। তোমরাই বল, উভয়ের মধ্যে কার উপর ভরসা করা যায় এবং কাকে নিজ সাহায্যের জন্য যথেষ্ট মনে করা যায়?

হযরত হূদ আলাইহিস সালামের জাতিও বলেছিল–

إِنْ نَقُولُ إِلا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ

হযরত হূদ (আ) এই উত্তর দিয়েছিলেন যে–

قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ - مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ- إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (সূরা হূদ, আয়াত ৫৪-৫৬)

আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বজাতিকে বলেছিলেন-

وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (সূরা আনআম, আয়াত ৮০-৮১)

২. অর্থাৎ শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, এক আল্লাহর বান্দা বিজয়ী হয়, না শত দরজার ভিখারিরা। বাস্তবতা অচিরেই বলবে, যে বান্দা আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয়ে এসেছে, তার সকল বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

বি. দ্র. عذاب يخزيه দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং عَذَابٌ مُقِيْمٌ দ্বারা আখেরাতের আযাব উদ্দেশ্য। والله أعلم।

৪১. আমি মানুষের জন্য আপনার প্রতি সত্য দীনসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি* । এখন যে ব্যক্তি সৎপথে আসবে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য (আসবে) এবং যে গোমরাহ হবে, সে নিজেরই অমঙ্গলের জন্য গোমরাহ হবে। আর আপনি ওদের যিম্মাদার নন[১]।

إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

[রুকূ - ৫]

৪২. আল্লাহ (প্রাণীদের) রূহ তাদের মৃত্যুর সময় কব্জ করে নেন, আর যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের রূহও কব্জ করেন তাদের নিদ্রাকালে। অতঃপর, যাদের ব্যাপারে মৃত্যুর ফয়সালা করেছেন তাদের রূহ রেখে দেন, আর অন্যদের রূহ পাঠিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে[২]।

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি'।

১. অর্থাৎ এ কিতাবের মাধ্যমে আপনার জবানীতে নসীহতপূর্ণ সত্য কথা বলে দেওয়া হয়েছে এবং দীন ও হেদায়াতের পথ যথাযথভাবে বাতলে দেওয়া হয়েছে। এবার প্রত্যেক মানুষ নিজ লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা করে নিক। নসীহত অনুসারে চললে তারই মঙ্গল হবে, নতুবা সে নিজেরই পরিণাম খারাপ করবে। আপনার উপর এ দায়িত্ব নেই যে, জোরপূর্বক তাদের পথে নিয়ে আসবেন। শুধু সত্যের পয়গাম পৌছে দেওয়াই আপনার দায়িত্ব ছিল, তা আপনি পালন করেছেন। সামনের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করুন, যাঁর হাতে রয়েছে– মৃত্যু ও জীবন দান করা, জাগ্রত ও নিদ্রিত করা।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন নিদ্রায় প্রাণ নিয়ে নেন, পরে (আবার) পাঠিয়ে দেন। এ-ই আখেরাতের নিদর্শন। বোঝা গেল, ঘুমের মধ্যেও 'রূহ' চলে যায়, যেমন মৃত্যুতে চলে যায়। নিদ্রায় চলে যাওয়ার পর যদি রয়ে যায়, আর ফিরে না আসে, তবে তাই মৃত্যু। অবশ্য এই 'রূহ' বলতে হুঁশ (বা চৈতন্য) উদ্দেশ্য। আরেক হচ্ছে সেই 'রূহ', যদ্বারা শ্বাস চলে, হৃদস্পন্দন চালু থাকে এবং খাদ্য হজম হয়– এটা মৃত্যুর পূর্বে (দেহ থেকে) বিচ্ছিন্ন হয় না।' (মূযেহুল কুরআন)

কিন্তু হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে ইমাম বাগাবী (র) (৪/৮১) বর্ণনা করেন, 'ঘুমের মধ্যে রূহ বের হয়ে যায়। কিন্তু দেহের সাথে বিশেষ উপায়ে তার এক প্রকার সম্পর্ক

৪৩. তবে কি ওরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে[১]? আপনি বলুন, 'তারা যদিও কোন কিছুর ক্ষমতা না রাখে এবং তাদের কোনো আকল-বুদ্ধি না থাকে, তবুও (তাদের সুপারিশকারী মানবে)[২]?'

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝

৪৪. আপনি বলুন, 'সমস্ত সুপারিশ তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]।'

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

থেকে যায়, ফলে জীবনের সমাপ্তি ঘটে না।' (যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে রশ্মি বা কিরণের মাধ্যমে পৃথিবীকে উত্তপ্ত রাখে।)

এ থেকে বোঝা যায়, ঘুমের মধ্যেও সেই জিনিসই বের হয়, যা মৃত্যুর সময় বের হয়। তবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না, বিচ্ছিন্ন শুধু মৃত্যুতেই হয়ে থাকে। والله أعلم

১. অর্থাৎ মূর্তি সম্পর্কে মুশরিকরা দাবি করে, তারা আল্লাহর দরবারে ওদের সুপারিশকারী। তাদের সুপারিশ দ্বারাই উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এ জন্যই তাদের উপাসনা করা হয়।

তো, প্রথম কথা হল, সুপারিশকারী হলেই যে উপাস্য হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। দ্বিতীয়ত- সুপারিশকারী সে-ই হতে পারে, যে.আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত। আর সেও কেবল তারই জন্য সুপারিশ করতে পারে, যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন।

মোটকথা, সুপারিশকারীকে অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে এবং যার জন্য সুপারিশ, তাকে সন্তোষভাজন হতে হবে- তবেই সুপারিশ চলবে। অথচ এখানে উভয় বিষয়ই অনুপস্থিত- মূর্তিদের অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই, কাফেরদের সন্তোষভাজন হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। অতএব ওদের দাবি মিথ্যা।

২. অর্থাৎ মূর্তি-প্রতিমার না আছে এখতিয়ার, না আছে আকল-বুদ্ধি। তা সত্ত্বেও তাদেরকে সুপারিশকারী মনে করা আশ্চর্যের বিষয়।

৩. অর্থাৎ বর্তমানেও পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীতে তাঁরই কর্তৃত্ব-রাজত্ব এবং ভবিষ্যতেও তাঁরই নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে। অতএব তাঁর অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া কার সাধ্য 'টু' শব্দটি করার?

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহর সম্মুখে সুপারিশ চলবে, কিন্তু আল্লাহর হুকুম অনুসারে, তোমাদের কথায় নয়। আর যখন মৃত্যু আসে, তখন কারো কথায় আযরাঈল তা থেকে রেহাই দেন না।'

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ
الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

৪৫. যখন এককভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না ওদের অন্তর সংকুচিত হয়। আর যখন আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, অমনি ওরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে[১]।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

৪৬. আপনি বলুন, 'হে আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, (সকল) অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন[২]।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ
جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ
سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ

৪৭. অপরাধীদের কাছে যদি পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা সব থাকে এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণ, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব থেকে নিজেদের রক্ষা করতে তার সমস্তটাই দিয়ে দেবে। আর আল্লাহর পক্ষ

---

১. মুশরিকের চরিত্র হল, যদিও কোন কোন সময় সে আল্লাহর আজমত ও মহব্বতের কথা মুখে স্বীকার করে, কিন্তু ওর অন্তর এক আল্লাহর উল্লেখ ও গুণগাণে খুশী হয় না। হাঁ, অন্য দেবদেবী ও মিথ্যা উপাস্যদের প্রশংসা করা হলে খুশীর আতিশয্যে সে ফুলে ওঠে, যার লক্ষণ তার চেহারায়ও ফুটে ওঠে।

পীর-আউলিয়া নিয়ে কতক লোকের বাড়াবাড়ি

দুঃখের বিষয়, বর্তমান কালেও বহু নামমাত্র মুসলমান এমন আছে যে, এক আল্লাহর কুদরত ও আজমত এবং তাঁর ইলমের সীমাহীন বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোচনা হলে তাদের চেহারায় ভাবান্তর লক্ষ করা যায় না। কিন্তু কোন পীর-ফকীরের আলোচনা আসলে এবং তাদের সত্য-মিথ্যা কারামত, হাস্যকর ফকীরালি ইত্যাদি বর্ণনা করা হলে চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং অন্তরের মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলতে থাকে। বরঞ্চ অনেক সময় এ শ্রেণীর লোক খাঁটি একত্ববাদের প্রবক্তাদেরকে আউলিয়া কিরামের বিরোধী ঠাওরায়– فإلى الله المشتكى وهو المستعان

২. অর্থাৎ এরূপ সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট বিষয়ের মধ্যেও যখন বাদানুবাদ চলছে এবং আল্লাহর প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাবোধও অন্তরে অবশিষ্ট নেই, তখন আয় আল্লাহ! আপনারই কাছে ফরিয়াদ– আপনিই এসব বিতর্কের আমলী (কর্মগত) ফয়সালা করে দিয়েন। ('আমলী ফয়সালা' হচ্ছে- নেককারদের জান্নাতে আর বদকারদের জাহান্নামে দাখিল করে দেওয়া। –অনুবাদক)

مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ۝

থেকে ওদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যার কল্পনাও ওরা করত না।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۝

৪৮. ওদের সামনে ওরা যত অপকর্ম করেছিল তা প্রকাশ পাবে এবং ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা ওদের বেষ্টন করে ফেলবে[১]।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَاۤ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

৪৯. যখন মানুষকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করে, সে আমাকে ডাকতে থাকে[২]। অতঃপর আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে কোনো নেয়া'মত দান করলে সে বলতে থাকে- 'এ তো আমি আমার জানা মতই লাভ করেছি☆[৩]।' (তা নয়), বরং এ একটা পরীক্ষা। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না[৪]।

---

১. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন উক্ত মতবিরোধগুলির ফয়সালা শোনানো হবে, তখন জালেমদের- যারা শিরক করে আল্লাহ তাআলার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছিল- ভয়াবহ অবস্থা হবে। ধরে নিন, সেদিন যদি সমগ্র পৃথিবীর ধনভাণ্ডার বরং তার চেয়েও বেশি সম্পদ ওদের কাছে মজুদ থাকে, তবে অকাতরে সব দিয়ে হলেও কোন রকমে জান বাঁচাতে চাইবে। যে দুষ্কর্ম-পাপাচার ওরা দুনিয়াতে করত, তা সবই এক এক করে ওদের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং ওরা এমন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আযাবের স্বাদ ভোগ করবে, যা ওদের কল্পনায়ও কোনো দিন আসেনি।

মোটকথা, খাঁটি একত্ববাদ ও সত্য দীন নিয়ে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে এবং যে আযাব নিয়ে হাসি-তামাশা করত, তা ওদের বেষ্টন করে নেবে।

২. অর্থাৎ যাঁর আলোচনায় সে বিরক্তিবোধ করত, বিপদের সময় তাঁকেই ডাকে এবং যাদের আলোচনায় খুশী হত, তাদের ভুলে যায়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা-** 'এ তো আমি আমার জ্ঞানবলে লাভ করেছি'।

৩. অর্থাৎ কিয়াস ও যুক্তির দাবি এটাই ছিল যে, এ নে'য়ামত আমিই লাভ করি। কারণ, আমার মধ্যে এর যোগ্যতা ছিল এবং এটি অর্জনের উপায়-উপকরণ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল! আল্লাহও আমার সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অতএব আমার কাছে এ সম্পদ কেন আসবে না?

মোটকথা, তার দৃষ্টি নিজের যোগ্যতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি নিবদ্ধ হল, আল্লাহর দয়া ও কুদরতের কথা স্মরণ করল না।

৪. অর্থাৎ তার কথা ঠিক নয়, বরং এ নে'য়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা যে, বান্দা তা পেয়ে প্রকৃত নে'য়ামতদাতাকে চেনে কি না এবং তাঁর শোকর আদায় করে কি না। যদি না করে, তবে এ নে'য়ামতই তার জন্য বিপদ ও অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

৫০. ওদের পূর্ববর্তীরাও এ কথা বলেছিল। অতঃপর ওরা যা কামাই করত, তা ওদের কোনো উপকারে আসেনি।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۝

৫১. এবং ওদের উপর পতিত হয়েছে ওরা যত অপকর্ম করেছিল তা(-র শাস্তি)[১]। আর এদের মধ্যে যারা অপরাধী, তাদের উপরেও শীঘ্র আপতিত হবে তারা যেসব অপকর্ম করছে তা(-র শাস্তি) এবং তারা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না[২]।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ۝

৫২. ওরা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করেন? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্য[৩]।

اَوَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'পরীক্ষা এই যে, ওর বুদ্ধি কাজ করতে শুরু করে এবং ফায়দা পৌঁছাতে থাকে। এক সময় এই বুদ্ধির কারণে সে বিভ্রান্ত হয়। সেই বুদ্ধিই তো থাকে, অথচ বিপদ এসে উপস্থিত হয়।' তখন কারো হটানোতে হটে না।

১. যেমন: কারূন উপরোক্ত কথাই বলেছিল। তার পরিণাম কী হয়েছিল তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। (সূরা কাসাস, আয়াত ৭৬)

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাপীদের উপর যেমন ওদের দুষ্কৃতির শাস্তি পতিত হয়েছিল, বর্তমান মুশরিকদের উপরও সেরূপ পতিত হবে। যখন আল্লাহ তাআলা এদের শাস্তি দিতে চাবেন, তখন এরা আত্মগোপন করে অথবা অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিকার প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতা আল্লাহর নিকট কারো প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয়। এমনকি, রিযিক পাওয়ার ব্যাপারটা আকল-বুদ্ধি ও জ্ঞান-যোগ্যতার উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। এ জন্যই দেখা যায়, বহু নির্বোধ বা দুর্বৃত্ত স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছে, অথচ অনেক বুদ্ধিমান ও নেক লোক কষ্ট-অনাহারে থাকে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জ্ঞান-বুদ্ধি খাটাতে এবং চেষ্টা-তদবীর করতে কেউই ত্রুটি করে না। তারপরও একজনের রুযী প্রশস্ত হয় আর একজনের সংকীর্ণ থাকে। জেনে রাখা চাই, এ শুধু জ্ঞান-বুদ্ধির কাজ নয় যে, নিজের জন্য রুযীকে প্রশস্ত করে নেবে; বরং এ বণ্টন-ব্যবস্থা প্রকৃত রিযিকদাতার হেকমত ও বিচার-বিবেচনাধীন এবং তাঁরই হাতে থাকে।

[রুকূ - ৬]

৫৩. আপনি বলে দিন, 'হে আমার সেই বান্দারা, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। তিনিই তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১]।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

৫৪. 'আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও– তোমাদের উপরে আযাব আসার আগে, অতঃপর

وَاَنِيْبُوْۤا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ

---

১. **মেহেরবান আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও অসীম দয়া-মায়া**

এ আয়াত আরহামুর রাহিমীন (সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু) আল্লাহর অফুরন্ত রহমত এবং অসাধারণ ক্ষমা ও উদারতার কথা ঘোষণা করছে এবং আয়াতটি কঠিন থেকে কঠিন দুরারোগ্য ও নৈরাশ্যকর ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য মহৌষধ। মুশরিক, কাফের, মুরতাদ, ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, বেদআতী, বদমাশ, ফাসেক, ফাজের– যত মহাপাপী হোক না কেন, আয়াতটি শোনার পর তার জন্য আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাওয়ার কোনই অবকাশ থাকে না। কেননা, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার সকল গুনাহ মাফ করতে পারেন। কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং বান্দা নিরাশ হবে কেন?

তবে অবশ্যই এ কথাও ঠিক যে, অপরাপর আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কুফর ও শিরকের অপরাধ তওবা ছাড়া মাফ হবে না।

অতএব– إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا কথাটি একটি শর্তের সাথে যুক্ত। তা হল– لمن يشاء । যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন : إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। তবে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গোনাহ, যার জন্য ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন। –সূরা নিসা, আয়াত ১১৬)

তবে এই শর্তের অর্থ এটা নয় যে, তওবা ছাড়া আল্লাহ তাআলা ছোট বা বড় কোন গোনাহ মাফ করতেই পারেন না। আবার বর্তমান আয়াত থেকে এ কথাও বের হয় না যে, কোন অপরাধের জন্য তওবার প্রয়োজনই নেই। তওবা ছাড়াও গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে এর জন্য শর্ত হল, আল্লাহর তা ইচ্ছা করা। আর তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে অন্যান্য আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা কুফর ও শিরক এর সাথে তওবা ছাড়া যুক্ত হবে না অর্থাৎ তওবা করা ছাড়া আল্লাহ কুফর-শির্ক মাফ করার ইচ্ছাই করবেন না। সুতরাং তা মাফও হবে না। আলোচ্য আয়াতটির শানে নুযূল থেকেও এ কথা বুঝে আসে। যেমন: পরের আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে জানা যাবে।

لَا تُنْصَرُوْنَ۝

তোমাদের সাহায্য করা হবে না[১]।

৫৫. وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ۝

আর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যে উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর– তোমাদের উপর তোমরা টেরও না পাও এমন অতর্কিতভাবে আযাব আসার আগেই[২];

৫৬. اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ۝

পাছে কেউ বলে, 'হায়! আল্লাহর ব্যাপারে আমি যে ত্রুটি করেছি, তার জন্য আফসোস! আমি তো হাসি-ঠাট্টাকারীদের দলভুক্ত ছিলাম[৩]'।

---

১. ক্ষমার আশা প্রদানের পর এখান থেকে তওবার দিকে মনোযোগী করা হচ্ছে। অর্থাৎ, বিগত ভুল-ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং আল্লাহর অনন্ত দয়া ও ক্ষমাগুণের কারণে লজ্জিত হয়ে কুফর ও অবাধ্যতার পথ ছাড় এবং দয়াল প্রভুর অভিমুখী হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কাছে সোপর্দ করে দাও, তাঁর হুকুম-আহকামের সামনে বিনয় ও ইখলাসের সাথে মাথা নত করে দাও। আর ভালভাবে বুঝে নাও, বস্তুত তিনি করুণা করলেই নাজাত পাওয়া সম্ভবপর। আর তাঁর প্রতি আমাদের রুজু ও ধাবিত হওয়াও তাঁর করুণা ও দয়ার মুখাপেক্ষী।

অবতরণের প্রেক্ষাপট

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যখন আল্লাহ তাআলা ইসলামকে জয়যুক্ত করলেন, তখন যে সকল কাফের শত্রুতা করে আসছিল, ওরা বুঝতে পারল, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে। এটা বুঝতে পেরে নিজেদের ভুল–ভ্রান্তির জন্য অনুতপ্ত হল; কিন্তু লজ্জা-শরমে এ কথা ভেবে মুসলমান হল না যে, এখন আমাদের মুসলমানী কি কবুল হবে? শত্রুতা করেছি, বহু যুদ্ধ করেছি এবং আল্লাহর কত ইবাদতকারীর রক্ত প্রবাহিত করেছি!– তখন আল্লাহ তাআলা এই ঘোষণা দিলেন যে, এমন কোন গোনাহ নেই, যার জন্য আল্লাহ তাআলা তওবার দুয়ার খোলা রাখেননি। তোমরা নিরাশ হয়ো না, তওবা কর ও রুজু হও– তোমাদের ক্ষমা করা হবে। মনে রেখো, মাথার উপর যখন আযাব এসে যাবে অথবা মৃত্যু নজরে আসতে শুরু করবে, তখন তওবা কবুল হবে না'।– এমন কি, সে সময় কেউ সাহায্যও করতে পারবে না। অতএব তার আগেই তওবা করে মুসলমান হয়ে যাও।

২. 'উৎকৃষ্ট বাণী' বলতে কুরআন কারীম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কুরআনের হেদায়াতের উপর চল এবং আযাব আসার পূর্বে নিজেদের ভবিষ্যতের সুব্যবস্থা করে নাও। নতুবা আযাব নাযিলের পর কোন কিছু করা সম্ভব হবে না, কোন কলা-কৌশলও চলবে না। আল্লাহর আযাব এমন হঠাৎ করে এসে উপস্থিত হবে যে, কোথা থেকে এসে পড়ল বুঝতেই পারবে না।

৩. অর্থাৎ রিপুর তাড়না, মনের বাসনা, সমাজ-প্রথা ও অন্ধ অনুকরণ এবং দুনিয়ার স্বাদ ও আনন্দে পড়ে আল্লাহকে একদমই চিনিনি। তাঁর দীন, পয়গম্বর এবং যে ভয়ঙ্কর পরিণাম

৫৭. অথবা বলে, 'আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দান করতেন, আমি অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম[১]',

اَوۡ تَقُوۡلَ لَوۡ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِیۡ لَکُنۡتُ مِنَ الۡمُتَّقِیۡنَ ﴿۵۷﴾

৫৮. অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করে বলে, 'হায়! আমি যদি (দুনিয়াতে) প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম! তা হলে আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম[২]।'

اَوۡ تَقُوۡلَ حِیۡنَ تَرَی الۡعَذَابَ لَوۡ اَنَّ لِیۡ کَرَّۃً فَاَکُوۡنَ مِنَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ﴿۵۸﴾

৫৯. অবশ্যই! তোমার নিকট তো আমার আয়াতসমূহ এসেছিল। কিন্তু তুমি সেসবকে অস্বীকার করেছিলে এবং করেছিলে অহংকার। আর তুমি ছিলে কাফেরদের দলভুক্ত[৩]।

بَلٰی قَدۡ جَآءَتۡکَ اٰیٰتِیۡ فَکَذَّبۡتَ بِہَا وَ اسۡتَکۡبَرۡتَ وَ کُنۡتَ مِنَ الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۵۹﴾

সম্বন্ধে পয়গম্বরগণ সাবধান করতেন, আমরা এসব কিছুর প্রতি হাসি-ঠাট্টা করতাম। এসব বিষয়ের কোন তাৎপর্যই বুঝিনি। আফসোস! আল্লাহকে চিনতে এবং তাঁর হক আদায় করতে কতই না ত্রুটি করেছি, যার ফলে আজ এই দুর্দিন দেখতে হল।

(কাফের এ কথা হাশরের মাঠে বলবে।) আর যদি কাফের-গোনাহগার সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ এর অর্থ হবে- عملت عمل ساخر مستهزئ (আমি ঠাট্টাকারী ও উপহাসকারীর মত কাজ করেছি।) প্রখ্যাত তাফসীরকার ইবনে কাছীর র. এমন ব্যাখ্যাই করেছেন।

১. যখন আক্ষেপ করে কোন কাজ হবে না, তখন নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য এ খোঁড়া অভিযোগ পেশ করবে যে- কী আর বলি, আল্লাহ আমাকে হেদায়াত করেননি! তিনি হেদায়াত করতে চাইলে আমিও আজ মুত্তাকীদের পর্যায়ে পৌছে যেতাম। (এর উত্তর সম্মুখে আসছে- (بلى قد جاءتك آياتي الخ)

আর হতে পারে, এ উক্তি অভিযোগ ও বিতর্কস্বরূপ নয়; বরং নৈরাশ্য প্রকাশার্থে বলবে- অর্থাৎ আমি নিজ দুর্ভাগ্য ও বদ-আমলবশত এর যোগ্যই ছিলাম না যে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন ও মনযিলে মকসূদে পৌছে দেবেন। যদি আমার মধ্যে যোগ্যতা ও মনুষ্যত্ব থাকত এবং আল্লাহ আমাকে সাহায্য করতেন, তবে আমিও আজ বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

২. যখন অনুতাপ ও ভুল স্বীকার উভয়ই বিফল হবে এবং দোযখের আযাব চোখের সামনে এসে পড়বে, তখন প্রচণ্ড অস্থির হয়ে বলবে, আমাকে পুনরায় একবার দুনিয়াতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে দেখবেন, আমি কী রকম পুণ্যবান হয়ে আসি!

৩. অর্থাৎ মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কি পথ দেখাননি এবং নিদর্শনাদি ও আহকাম দিয়ে তাঁর পয়গম্বরদের পাঠাননি? কিন্তু তুমি তো তাঁদের কোন কথাই শোননি। যা কিছু বলা হয়েছিল, তা তুমি গর্বভরে অস্বীকার করেছিলে, তোমার দম্ভ সত্য গ্রহণে বাধা হয়ে রইল।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۞

৬০. আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের দেখবেন যে, ওদের চেহারা কালো[১]। অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়[২]?

وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْۗءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

৬১. আর আল্লাহ মুত্তাকীদের মুক্তি দান করবেন তাদের সফলতার বদৌলতে। তাদের অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না[৩]।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۡ وَّهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۞

৬২. আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰۗئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট। আর যারা আল্লাহর আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত[৪]।

আর কথা এই যে, আল্লাহ আদিতেই জানতেন, তুমি তাঁর নিদর্শনকে অস্বীকার করবে এবং গর্ব ও অবাধ্যতার আচরণ করবে। তোমার মেযাজ ও স্বভাবের প্রকৃতিই এমন যে, তোমাকে হাজার বার দুনিয়ায় পাঠানো হলেও নিজ আচরণ থেকে ফিরে আসতে পারবে না। وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُون (ওদের আবারো পাঠানো হলে অবশ্যই সেই কাজই করবে, যা থেকে ওদের নিষেধ করা হয়েছিল, আর ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। –আন'আম, আয়াত ২৮)। এমন লোকদের সফলতা দান করা আল্লাহর নীতি নয়।

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য আগমন করে, তাকে অস্বীকার করাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। কারণ, অস্বীকারকারী যেন দাবি করে, আল্লাহ অমুক কথা বলেননি, অথচ তিনি তা বলেছেন। তো এ অস্বীকৃতির কালিমা কিয়ামতের দিন ওদের চেহারায় প্রকাশ পাবে।

২. ৫৯নং আয়াতে কাফেরদের দুটি অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছে– فكذبت بها واستكبرت অর্থাৎ অস্বীকৃতি, যা মিথ্যারোপের নামান্তর এবং অহংকার। এখানে অপরাধ দুটির পরিণাম বর্ণিত হল যে, মিথ্যারোপের ফলে ওদের মুখ কাল হবে এবং গর্ব ও অহংকারের ঠিকানা দোযখ ছাড়া আর কোথাও নয়।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদেরকে তাদের চিরন্তন সফলতা ও সৌভাগ্যের বদৌলতে জান্নাতে পৌছাবেন, যেখানে তাঁরা সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ এবং সব রকমের চিন্তা-ফিকির ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবেন।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার পর তার স্থিতি ও সংরক্ষণের যিম্মাদারিও গ্রহণ করেছেন। আর আকাশ ও পৃথিবীসহ সকল বস্তুতে তাঁরই আধিপত্য ও

[রুকূ - ৭]

৬৪. আপনি বলুন, 'হে মূর্খরা! তবে কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে বলছ[১]?'

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّیْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ۝

৬৫. অথচ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি নিশ্চয় এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, আপনি যদি শিরক করেন, তবে আপনার আমল অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

وَلَقَدْ اُوْحِیَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

৬৬. না, বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং শোকরকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন[২]।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

কর্তৃত্ব। কেননা, সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই কাছে। অতএব আল্লাহকে ছেড়ে মানুষ কোথায় যাবে? মানুষের উচিত, তাঁরই ক্রোধকে ভয় করা এবং তাঁরই রহমতের আশাবাদী হওয়া। ঈমান ও কুফর, জান্নাত ও দোযখ– সব তাঁরই আয়ত্তাধীন। তাঁর বাণীসমূহ অস্বীকার করে মানুষের কোথাও ঠাঁই হবে না। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ কোন সফলতার আশা করতে পারে না।

১. অর্থাৎ চরম মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা এই যে, মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের পূজা করে এবং আল্লাহর পয়গম্বর সম্বন্ধে (نعوذ بالله) এই আশা রাখে যে, তিনি মুশরিকদের পথে এসে যাবেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, মুশরিকরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেব-দেবীর পূজার প্রতি আহ্বান করেছিল। তারই উত্তরে এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। (তাফসীরে তবারী : ২৪/৪০৩)

২. অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধির ফয়সালা এই যে, বস্তুনিচয় সৃষ্টি করা, তা রক্ষা করা এবং এসবের উপর বিভিন্নভাবে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করতে থাকা– একমাত্র আল্লাহরই কাজ। সুতরাং ইবাদত-বন্দেগীর উপযুক্তও তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

আর দীনী দৃষ্টিকোণ থেকেও লক্ষণীয় যে, আল্লাহর সমস্ত নবীগণ এবং আসমানী সকল দীন-ধর্ম তাওহীদের সত্যতা ও শিরকের অসারতা সম্বন্ধে একমত। এমন কি, প্রত্যেক নবীকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, (আখেরাতে) মুশরিকদের সমস্ত আমল অকেজো ও নিষ্ফল এবং শিরকের পরিণাম চরম বঞ্চনা ও ক্ষতি বৈ কিছুই নয়।

অতএব মানুষের অবশ্য কর্তব্য হল, সে সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং তাঁর কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বান্দা হবে। তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবে। অক্ষম ও নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করবে না। তাঁকে সেরূপ মহান ও সমুচ্চ সত্তা বলে স্বীকার করবে, যেরূপ তিনি বাস্তবেই আছেন।

৬৭. ওরা আল্লাহর মর্যাদা যথাযোগ্যভাবে অনুধাবন করেনি[১]। আর কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর এক মুঠিতে থাকবে এবং আকাশগুলি গোটানো অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র এবং ওরা যে শিরক করে তা থেকে বহু উর্ধ্বে[২]।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدۡرِهٖ ۖ وَالۡاَرۡضُ جَمِيۡعًا قَبۡضَتُهٗ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطۡوِيّٰتٌۢ بِيَمِيۡنِهٖ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ۝

৬৮. আর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারাই আছে, তারা সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে– তবে সে নয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুঁ দেওয়া হবে, আর তৎক্ষণাৎ তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে[৩]।

وَنُفِخَ فِي الصُّوۡرِ فَصَعِقَ مَنۡ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنۡ فِي الۡاَرۡضِ اِلَّا مَنۡ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيۡهِ اُخۡرٰى فَاِذَا هُمۡ قِيَامٌ يَّنۡظُرُوۡنَ ۝

---

১. অর্থাৎ একজন বান্দার পক্ষে আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্ব এবং মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যে পরিমাণ বোঝা ও উপলব্ধি করা উচিত, মুশরিকরা সেই পরিমাণ বোঝেনি ও উপলব্ধি করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহর উচ্চতম মর্যাদা ও বুলন্দ মর্তবার মোটামুটি ধারণা রাখে, সে কি অক্ষম ও মুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে, এমনকি নির্জীব পাথর-মূর্তিদেরকে তাঁর শরীক স্থির করতে পারে? নিশ্চয় না।

সম্মুখে তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্বের কতিপয় নিদর্শন বর্ণিত হচ্ছে।

২. অর্থাৎ যাঁর মহান শান্ এই যে, কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর এক হাতে এবং গোটা আকাশমণ্ডলী গোটানো কাগজের ন্যায় অপর হাতে থাকবে– নির্জীব বা অক্ষম ও মুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে ইবাদতে তাঁর শরীক করা কতদূর সমীচীন? স্বয়ং সেই শরীকেরা তো আল্লাহর মুঠিতে পড়ে রয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তাদের উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য করতে পারেন, তারা একটুও নড়চড় করতে পারে না। সুতরাং এমন অক্ষমেরা সেই পরাক্রমশালীর শরীক হয় কী করে?

বি. দ্র. مطويات بيمينه সম্পর্কে সূরা আম্বিয়ার আয়াত (১০৪) نطوي السماء– এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। আর يمين প্রভৃতি শব্দ متشابهات এর অন্তর্ভুক্ত, স্বরূপ বোঝা ছাড়াই এর প্রতি ঈমান রাখা জরুরী। কোন কোন হাদীছে (মুসলিম : ১৮২৭) আছে– وكلتا يديه يمين (তাঁর উভয় হাত ডান।) এ দ্বারা তাঁর দেহ, সীমা, দিক প্রভৃতি থাকার ধারণা খণ্ডিত হয়ে যায়।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার হচ্ছে বিশ্বজগতের বিলুপ্তির জন্য। দ্বিতীয় ফুৎকার পুনর্জীবিত হওয়ার। এই তৃতীয়টি হবে হাশরের পর, ফলে সংজ্ঞাহীনতা ছেয়ে যাবে। আর চতুর্থ ফুৎকারে চেতনা লাভ হবে– এরপর আল্লাহর সম্মুখে সকলে উপস্থিত হবে।'

কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞ আলেমদের মতে মোট দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার হবে। প্রথমবারে সকলেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। এবং জীবিতরা তো মরে যাবে আর যারা (পূর্বে) মরে গিয়েছিল তাদের

৬৯. আর পৃথিবী আপন রবের নূরে আলোকিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে, পয়গম্বর ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[১]।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝٦٩

৭০. এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের (ফল) পুরোমাত্রায় দেওয়া হবে[২]। আর আল্লাহ তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত[৩]।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝٧٠

আত্মার উপর সংজ্ঞাহীনতার অবস্থা সঞ্চারিত হবে। এরপর দ্বিতীয় ফুৎকার হবে– ফলে মৃতদের আত্মা দেহের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আর সংজ্ঞাহীনরা সংজ্ঞা লাভ করবে। তখন তারা হতভম্ভ হয়ে হাশরের মাঠের অকল্পনীয় ও ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করতে থাকবে। এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে সকলকে দ্রুতগতিতে হাযির করা হবে।

বি. দ্র. الا من شاء الله –দ্বারা অনেকের মতে জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল মওত (বা আজরাঈল) উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ তাঁদের সঙ্গে আরশ-বহনকারী ফেরেশতাদেরও শামিল করেছেন। কারো কারো নিকট নবী ও শহীদগণ উদ্দেশ্য। والله أعلم

যা হোক, এই ব্যতিক্রম প্রথম ফুৎকারের সময় হবে। এরপর হতে পারে, তাঁদেরও বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন : لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (রাজত্ব আজ কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহরই। –মু'মিন, আয়াত ১৬)। এতে এমন এক মুহূর্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যখন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকবে না।

১. অর্থাৎ তার পর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হিসাব-কিতাবের জন্য স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবেন (كما ورد في بعض روايات الدر المنثور) (তাফসীরে তবারী ২০/২৬১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৭০)। –তখন আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী ও অবর্ণনীয় নূরের জ্যোতিতে হাশরের মাঠ উদ্ভাসিত হবে। হিসাবের খাতা খোলা হবে, সকলের আমলনামা সম্মুখে রাখা হবে। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও অন্য সাক্ষীগণ উপস্থিত হবেন এবং অত্যন্ত ইনসাফের সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির সঠিক ফয়সালা শোনানো হবে। কারো প্রতি কোন রকমের বাড়াবাড়ি হবে না।

বি. দ্র. شهداء (সাক্ষীরা) বলতে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) ছাড়াও ফেরেশতা, প্রিয়নবীর উম্মতের লোকেরা এবং মানুষের হাত-পা প্রভৃতি– সব উদ্দেশ্য হতে পারে। আর হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র)-এর মতে প্রত্যেক উম্মতের পুণ্যবান ব্যক্তিগণ উদ্দেশ্য।

২. অর্থাৎ পুণ্যের প্রতিদানে কমতি এবং পাপের শাস্তিতে আধিক্য হবে না। যার যতটুকু ভাল বা মন্দ আমল, তা সবই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। সেই অনুযায়ী বিনিময় দেওয়া হবে, যার কিছুটা বিবরণ সম্মুখে আসছে।

৩. অর্থাৎ সাক্ষীদের উপস্থিতি শুধু অভিযোগের পথ বন্ধ করার জন্য হবে, নতুবা আল্লাহর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। (كذا في الموضح)

[রুকূ - ৮]

وَسِيۡقَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا فُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمۡ يَاۡتِكُمۡ رُسُلٌ مِّنۡكُمۡ يَتۡلُوۡنَ عَلَيۡكُمۡ اٰيٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنۡذِرُوۡنَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هٰذَا ؕ قَالُوۡا بَلٰى وَلٰـكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ الۡعَذَابِ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ۝

৭১. কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে[১]। অবশেষে যখন জাহান্নামের নিকট পৌঁছবে, তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে[২] এবং তার রক্ষীরা ওদের বলবে[৩]– 'তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি[৪], যারা তোমাদের সামনে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ পাঠ করতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্ক করতেন?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে আযাবের কথা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল[৫]।'

---

১. অর্থাৎ কাফেরদের গলাধাক্কা দিয়ে খুব অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আর যেহেতু কাফেরদের শ্রেণী ও স্তর অনেক, সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণী ও স্তরের কাফেরদের আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করে দেওয়া হবে।

২. দুনিয়াতে জেলখানার ফটক যেমন খোলা থাকে না, বরং কোন বন্দীকে তা খুলে প্রবেশ করানো হয়, অতঃপর বন্ধ করে দেওয়া হয়– তদ্রূপ দোযখীরা দোযখের নিকট পৌঁছলে দরজাগুলো খুলে তাতে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হবে। এর পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন– عليهم نار مؤصدة (ওদের বেষ্টন করবে আবদ্ধ আগুন। –বালাদ, আয়াত ২০)

৩. অর্থাৎ দোযখের রক্ষী ফেরেশতাগণ কাফেরদের ভর্ৎসনা করত এ কথা বলবেন।

৪. অতএব সমজাতি হওয়ার কারণে তাদের থেকে উপকার হাসিল করা খুব সহজ ছিল।

৫. অর্থাৎ পয়গম্বরগণ তো অবশ্যই এসেছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহর বাণীসমূহ শুনিয়েছিলেন এবং আজকের দিন সম্বন্ধে অনেক সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ও অযোগ্যতার কারণে আমরা তাঁদের কথা মানিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অটল তাকদীর কার্যকর হল এবং আযাবের কথা আমাদের কাফেরদের ক্ষেত্রে সত্যে পরিণত হল– فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (মোটকথা, ওরা নিজ অপরাধ স্বীকার করবে। দূর হোক দোযখীরা! –মুলক, আয়াত ১১)

৭২. বলা হবে, 'তোমরা জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, যেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে।' আর কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল[১]!

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚفَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

৭৩. আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে[২]। অবশেষে তারা যখন তার নিকটে পৌছবে– আর তার দ্বারগুলি (পূর্বেই) খুলে দেওয়া হয়েছে– এবং তার রক্ষীগণ তাদের বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম! তোমরা পূত-পবিত্র! সুতরাং তোমরা এতে প্রবেশ কর অনন্তকাল অবস্থানের জন্য![৩]

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝

৭৪. এবং তারা বলবে, 'আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন[৪] এবং আমাদেরকে এই যমীনের[৫] এমন অধিকারী বানিয়েছেন যে, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ

---

১. অর্থাৎ তোমরা গর্ব ও অহংকারের কারণে আল্লাহর কথা মাননি। এখন চিরকাল দোযখে পড়ে থেকে এর মজা ভোগ করতে থাক।

২. ঈমান ও তাক্ওয়ার স্তরসমূহ যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন, সেজন্য প্রত্যেক স্তরের মুমিন-মুত্তাকীদের জামাতও পৃথক হবে এবং এসব জামাতকে অত্যন্ত উৎসাহ দিয়ে দ্রুত জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩. অর্থাৎ মেহমানদের জন্য যেমন তাদের আগমনের পূর্বেই মেহমানখানার দরজা খোলা রাখা হয়, তদ্রূপ জান্নাতীরা সেখানে পৌছে জান্নাতের দরজাগুলো খোলা পাবে। যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে– مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ (তাদের জন্য জান্নাতের দুয়ারগুলি খোলা। –সোয়াদ, আয়াত ৫০)। আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁদের সালাম জানিয়ে ও গুণকীর্তন করে সাদরে তাঁদের গ্রহণ করবেন এবং জান্নাতে থাকার সুসংবাদ শুনাবেন।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর শোকর, নবীদের মুখে যেসব ওয়াদা দুনিয়ায় করা হয়েছিল, আজ তা স্বচক্ষে (বাস্তবায়িত হতে) দেখতে পেলাম।

৫. অর্থাৎ জান্নাতের যমীনের।

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ۝

পারি[১]।' অতএব আমলকারীদের প্রতিদান কত উত্তম!

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

৭৫. আর আপনি ফেরেশতাদের দেখবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছে। এবং মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে এবং বলা হবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের রব[২]।'

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে থাকার অনুমতি রয়েছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকে সেই স্থান চাইবে, যা তার জন্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত।'

আর কারো কারো নিকট আয়াতের মর্ম এই যে, জান্নাতে বেড়ানো ও সাক্ষাতের জন্য যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। এতে বাধা থাকবে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন হিসাব-কিতাবের জন্য নুযূল (نزول اِجلالِي) ফরমাবেন, তখন ফেরেশতাগণ আরশের চতুর্দিকে সারি বেঁধে স্বীয় রবের পবিত্রতা ও গুণকীর্তন করতে থাকবেন এবং সকল মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেওয়া হবে, ফলে তখন চতুর্দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রব উঠবে– الحمد لله رب العالمين অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক (এবং যিনি সমস্ত জগতের মাঝে এত উত্তম মীমাংসা করেছেন।) এ প্রশংসামুখর ধ্বনি শেষে দরবার সমাপ্ত হবে।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ আয়াতের এই অর্থই বয়ান করেছেন।

কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র)-এর মতে আয়াতটিতে উর্ধ্ব জগতের সাধারণ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং بَيْنَهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা ফেরেশতারা উদ্দেশ্য। তিনি লেখেন– ফেরেশতাদের মধ্যে ফয়সালা করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফেরেশতা (উর্ধ্ব জগতে) নিজ নিয়মে একটি তদবীর পেশ করেন– (যেমন: উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের বিতর্ক সম্পর্কিত হাদীছে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)। –এর পর আল্লাহ তাআলা একজনের কথা কার্যকর করেন এবং তাই হেকমতের অনুকূল হয়। এ রীতি এখনো চলমান এবং কিয়ামত দিবসেও থাকবে। والله تعالى أعلم بالصواب

تم سورة الزمر بعون الله وتوفيقه ولله الحمد

সূরা মু'মিন

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৪০ । ৮৫ আয়াত । ৯ রুকূ । মক্কী

آياتها ٨٥، ركوعاتها ٩

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ۝١

২. (এ) কিতাবের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ–

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢

৩. গোনাহ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী[১], কঠোর শাস্তিদাতা, ক্ষমতাবান*[২]। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে[৩]।

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

৪. আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে কেবল তারাই বিতর্ক করে যারা কাফের[৪]। সুতরাং শহরে-নগরে ওদের ভ্রমণ-পর্যটন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে[৫]।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ۝٤

১. অর্থাৎ তওবা কবুল করে গোনাহসমূহ থেকে এমন পাক-সাফ করে দেন, যেন কখনো গোনাহ করেইনি। তদুপরি তওবাকে স্বতন্ত্র ইবাদত গণ্য করে এর জন্য স্বতন্ত্র প্রতিফল দান করেন।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'অনুগ্রহশীল'

২. অর্থাৎ অসীম শক্তিশালী, প্রাচুর্যের অধিকারী এবং অমুখাপেক্ষী– যিনি বান্দাদের উপর অনুগ্রহ ও নে'য়ামতরাজির বৃষ্টি বর্ষণ করে চলেন।

৩. যেখানে পৌঁছে প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর বাণীসমূহ এবং তাঁর আজমত ও কুদরতের নিদর্শনাদি এমন নয় যে, এসবের মধ্যে কোন বিতর্কের অবতারণা করা হবে। কিন্তু যারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দলীল-প্রমাণ এবং সুস্পষ্ট বাণীসমূহকেও অস্বীকার করতে হবে, তারাই এমন সত্য বিষয়ে অন্যায় তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করে থাকে।

৫. অর্থাৎ উক্ত কাফেরদের পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও দুনিয়াতে কাফেরদেরকে শহরে-বন্দরে ঘুরে বেড়াতে ও ভোগ-বিলাস করতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এ দ্বারা

৫. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং ওদের পরে আরো বহু দল অস্বীকার করেছিল। আর প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং করেছিল অসার বিতর্ক, যাতে এর মাধ্যমে সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি ওদের পাকড়াও করেছি। সুতরাং (দেখ), কেমন ছিল আমার শাস্তি[১]?

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

৬. আর এভাবেই যারা কাফের হয়েছে, ওদের ক্ষেত্রে আপনার রবের এ কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামী[২]।

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝

প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। এ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবকাশ মাত্র! ওরা কিছু দিন ভ্রমণ করে দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করুক, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দীন বিরোধী ষড়যন্ত্র করে নিক। এরপর একদিন গাফিলতির নেশায় মত্ত অবস্থায় ধৃত হবে। অতীত জাতিসমূহের অবস্থা এমনই হয়েছিল।

১. অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের দুরাচারী লোকেরা নিজ পয়গম্বরকে ধরে হত্যা বা নিপীড়ন করতে চেয়েছে এবং মিথ্যা প্রতারণা-প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে সত্য দীনকে পরাজিত করতে এবং সত্যের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি ওদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেইনি। বরং ওরা তো পয়গম্বরদের ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি ওদের পাকড়াও করে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। সুতরাং দেখে নাও, আমার শাস্তি কেমন হয়েছে?! ওরা সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। আজও সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কিছু নিদর্শন কোথাও কোথাও অবশিষ্ট রয়েছে, যা দেখে মানুষ আজও ওদের ব্যাপারে ধারণা নিতে পারে।

২. অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহের উপর আযাব আসার কথা যেমন সম্পূর্ণরূপে সত্য হয়েছে, বর্তমানের কাফেরদের উপরও আযাব অবতীর্ণ হয়ে গেছে বলে ধরে নাও (কারণ, তা আসবেই আসবে)। আর পয়গম্বরদের ঘোষণা অনুযায়ী কাফেরদের উপর যেমন পার্থিব আযাব এসেছিল, তেমনি আপনার প্রভুর এ কথাও সত্য যে, আখেরাতে এই কাফেরদের ঠিকানা দোযখই হবে।

বি. দ্র. কোন কোন তাফসীরকার أنهم أصحاب النار কে لأنهم أصحاب النار এর অর্থে ধরে এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, অতীত কাফেরদের ন্যায় বর্তমান কাফেরদের ব্যাপারেও আল্লাহর কথা সত্য। কেননা, এরাও দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত।

ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ۝

৭. যারা আরশ বহন করে আছে এবং যারা রয়েছে তার চারপাশে, তারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে[১]। (বলে)– 'হে আমাদের রব! আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। অতএব তাদের ক্ষমা করুন, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে। এবং তাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন[২]।'

---

১. পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে পাপিষ্ঠ ও কাফেরদের করুণ অবস্থার বর্ণনা ছিল। এখানে তার বিপরীতে তওবাকারী মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ, মহান আরশ বহনকারী এবং তার চতুর্দিকে তওয়াফকারী অসংখ্য ফেরেশতা, যাঁদের একমাত্র কাজ হল আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করা এবং যারা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঈমানদার ও বিশ্বাসী– এমন ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রভুর নিকট মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুবহানাল্লাহ! এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, মাটির উপর বিচরণকারী যে মুমিনদের দ্বারা গোনাহ-খাতা ও দোষ-ত্রুটি হয়ে গেছে, ঊর্ধ্বলোকের ফেরেশতাগণ আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য গায়েবানা ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যেহেতু ফেরেশতাদের ব্যাপারে বলা আছে– وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ তাই বলা যায়, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই তারা এই প্রার্থনার জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকবেন।

২. এখানে মুমিনদের জন্য ফেরেশতারা কী দোয়া করেন তা বাতলানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে তারা আরয করেন, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনার ইলম ও রহমত সর্বব্যাপী। অতএব যে কেউ আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানমতে মন্দ কাজকর্ম পরিত্যাগ করে খাঁটি দিলে আপনার দিকে রুজু হয় এবং আপনার পথে চলার চেষ্টা করে, তার দ্বারা যদি মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন দোষত্রুটি ও গোনাহ-খাতা হয়ে যায়– তবে আপনি স্বীয় করুণা ও রহমতে তাকে ক্ষমা করুন। দুনিয়াতেও তাকে ধর-পাকড় করবেন না এবং আখেরাতেও দোযখের সম্মুখীন করবেন না।

যে মুসলিমগণ তওবা ও আল্লাহমুখিতার পথ অবলম্বন করে না, তাদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হয়নি। বর্তমান আয়াত এ বিষয়ে নীরব। বাহ্যত আরশ বহনকারীগণ তাদের জন্য দো'য়া করেন না। তবে তাদের সঙ্গে আল্লাহর কী আচরণ হবে? এ প্রশ্নের উত্তর অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের দ্বারা নিরূপিত হবে।

৮. 'হে আমাদের রব! এবং তাদের দাখিল করুন অনন্তকাল বাস করার জান্নাতরাজিতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদের দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেককার তাদেরও। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

رَبَّنَا وَاَدۡخِلۡهُمۡ جَنّٰتِ عَدۡنِ اِلَّتِیۡ وَعَدۡتَّهُمۡ وَمَنۡ صَلَحَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَاَزۡوَاجِهِمۡ وَذُرِّیّٰتِهِمۡ ؕ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ ۙ

৯. 'এবং তাদের রক্ষা করুন সকল অকল্যাণ থেকে। আর সেদিন আপনি যাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করলেন, তার প্রতি দয়া করলেন। আর এ-ই তো মহা সাফল্য[২]।

وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ ؕ وَمَنۡ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوۡمَئِذٍ فَقَدۡ رَحِمۡتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَالۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ۠

১. অর্থাৎ এ কথা ঠিক যে, বেহেশত প্রত্যেকে নিজ আমলের দ্বারা লাভ করবে (যেমন এখানেও ومن صلح এর শর্ত দ্বারা বোঝা যায়); নিজের মধ্যে ঈমান ও পুণ্য না থাকলে স্ত্রী, পুত্র ও পিতামাতাও উপকারে আসবে না– কিন্তু (হে আল্লাহ) আপনার হেকমত এও যে, একজনের কারণে আপনি বহু জনকে তাদের আমলের চেয়ে উন্নত স্তরে পৌছিয়ে দিতে পারেন (সুতরাং উক্ত মু'মিনদের স্ত্রী-সন্তান প্রভৃতিকেও আপনি তাদের স্তরে পৌঁছে দিন এবং সবাইকে জান্নাতে একত্রে রাখুন), যেমন: আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (সূরা তূর, আয়াত ২১)

আর গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝে আসে, আসলে এই উচ্চস্তরে আরোহণও তাদেরই (অর্থাৎ মুমিনদের স্ত্রী, সন্তান প্রভৃতির) আধ্যাত্মিক কোন আমলের প্রতিদান হিসাবে হবে। যেমন: তাদের মনের কামনা ছিল, তারাও যেন সেই নেক মানুষের পথে চলতে পারে। এই নেক নিয়ত ও পুণ্যের আকাঙ্ক্ষাই হয়তো আল্লাহর নিকট গৃহীত হয়ে যাবে, ফলে এরাও উচ্চস্তরে স্থান লাভ করবে। অথবা সেই নেক মানুষকে এভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হবে যে, তার পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানদেরও জান্নাতে তার স্তরে রাখা হবে।

২. অর্থাৎ হাশরের মাঠে ওই মু'মিনরা যেন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার (ভীতি ও পেরেশানীর) সম্মুখীন না হয়। আর এ মহা সাফল্য একমাত্র আপনার মেহেরবানীতেই হাসিল হতে পারে।

কোন কোন তাফসীরকার سيئات -এর অর্থ أعمال سيئة অর্থাৎ মন্দ আমলাদি করেছেন। অর্থাৎ– ভবিষ্যতে তাদের মন্দ কাজকর্ম থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের স্বভাবকে নেক করে দিন, যাতে তা মন্দের দিকে না যায়।

আর আজ এখানে (দুনিয়াতে) যে ব্যক্তি মন্দ থেকে রক্ষা পেল, তার উপর আপনার বড় দয়া বর্ষিত হল। কারণ, সে-ই আখিরাতে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করবে। এই তাফসীর অনুযায়ী يومئذ -এর তরজমা 'সেদিন' এর পরিবর্তে 'এই দিন' হবে।

[রুকূ - ২]

১০. যারা কাফের, তাদের ডেকে বলা হবে, '(আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের যে অসন্তুষ্টি, আল্লাহ (তোমাদের প্রতি) এর চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতেন যখন ঈমান আনার জন্য তোমাদের আহ্বান করা হত আর তোমরা অস্বীকার করতে[১]।'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝

১১. ওরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দান করেছেন[২]। এখন আমরা আমাদের অন্যায়-অপরাধ স্বীকার করছি[৩]।

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ আপনার দয়া হোক, যাতে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায়। নিজ আমল দ্বারা কেউই রক্ষা পেতে পারে না। অল্প-স্বল্প মন্দ থেকে কে মুক্ত?' এ কথা উল্লিখিত উভয় তাফসীরের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে।

১. এ কথা কিয়ামতের দিন বলা হবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ আজ তোমরা নিজ নফসের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাকে ভর্ৎসনা করছ। দুনিয়াতে যখন তোমরা কুফরী করতে, তখন আল্লাহ এর চেয়ে বেশি তোমাদের ভর্ৎসনা করতেন (এবং তোমাদের কাজকামে অসন্তুষ্ট হতেন।) তারই প্রতিফল আজ তোমরা পাবে।'

আর কোন কোন তাফসীরকার উভয় مقت- এর সময় একই ধরেছেন এবং এ অর্থ করেছেন যে, দুনিয়াতে তোমাদের বারবার ঈমানের প্রতি ডাকা হত, আর তোমরা বারবার কুফরী করতে। আজ এর শাস্তি ভোগ করার সময় তোমরা নিজেদের প্রতি যে পরিমাণ অসন্তুষ্ট হচ্ছ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি তার চেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "মানুষ শুরুতে মাটি ছিল বা বীর্য। সুতরাং মৃতই ছিল। এরপর প্রাণ এল, জীবিত হল। আবার মরল, তারপর জীবিত করে ওঠানো হল। এ হচ্ছে- দুই মৃত্যু ও দুই জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (তোমরা কিভাবে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হচ্ছ! অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন! অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করলেন। এর পর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তার পর তোমাদের জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। -বাকারা, আয়াত ২৯)।

তাফসীরকারদের এ ছাড়া আরো মতামত আছে। কিন্তু এটিই অধিক নিকটবর্তী তাফসীর।

৩. অর্থাৎ আমরা অস্বীকার করে বলতাম, মৃত্যুর পর আর জীবিত হব না। হিসাব-কিতাবও নেই, অন্য কোনো কাহিনীও নেই! এ জন্যই পাপাচার ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে নির্ভীক ছিলাম।

فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ⑪

অতএব (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি[১]?'

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ یُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْكَبِیْرِ ⑫

১২. তোমাদের এ শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হলে তোমরা অস্বীকার করতে, আর তাঁর সঙ্গে শির্ক করা হলে তোমরা (তা) বিশ্বাস করতে। এখন হুকুম শুধু আল্লাহর, যিনি সমুচ্চ, মহান[২]।

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ وَیُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا یَتَذَكَّرُ

১৩. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক অবতীর্ণ করেন। তবে চিন্তা-ভাবনা সে-ই করে*,

---

এখন নিজ চোখে দেখে নিয়েছি যে, প্রথম মৃত্যুর পর আপনি যেমন আমাদের জীবিত করেছিলেন অর্থাৎ নাস্তি (অনস্তিত্ব) থেকে বের করে অস্তিত্ব দান করেছিলেন, পয়গম্বরদের কথা অনুযায়ী দ্বিতীয় মৃত্যুর পরও পুনরায় জীবন দান করেছেন। আর মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের যেসব বিষয় আমরা অস্বীকার করতাম, তা এখন আমাদের সামনে রয়েছে। সুতরাং নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি ও গোনাহ-খাতা স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

১. অর্থাৎ আফসোস! বাহ্যত এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। হাঁ, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনি যেখানে দু' দু'বার মৃত্যু ও জীবন দান করেছেন, তৃতীয়বারও আমাদের আবার দুনিয়ায় পাঠাতে পারেন, যাতে এবার সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে নেকী কামাই করে নিয়ে আসতে পারি।

২. অর্থাৎ এখন দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এখন তো তোমাদেরকে নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

আর তোমাদের জন্য চিরকালীন ধ্বংসের ফয়সালা এজন্য হয়েছে যে, তোমরা এক আল্লাহর আহ্বানে কখনো সাড়া দাওনি। সর্বদা তাঁকে বা তাঁর একক খোদা হওয়াকে অস্বীকার করেছিলে। হাঁ, কোন মিথ্যা মাবূদের দিকে ডাকা হলে তৎক্ষণাৎ آمنا وصدقنا (ঈমান আনলাম ও সত্য বলে মেনে নিলাম) বলে তার পিছনে ছুটতে। এ থেকে তোমাদের স্বভাব ও রুচির স্বরূপ যে কেমন, তা আন্দাজ করা যায়। অর্থাৎ, হাজারবারও যদি তোমাদের দুনিয়াতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবু সেই কুফর ও শিরকই কামাই করে আনবে। অতএব দোযখে চিরকালীন বন্দীত্বই তোমাদের অপরাধের সঠিক শাস্তি। এই শাস্তি-বিধান সেই সর্বশক্তিশালী আল্লাহর উচ্চ আদালত থেকে জারী করা হয়েছে, ভবিষ্যতে যার বিরুদ্ধে কোনো আপীল করার সুযোগ নেই। অতএব এ শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির আকাঙ্ক্ষা নিরর্থক।

* **দ্বিতীয় তরজমা– 'উপদেশ সে-ই গ্রহণ করে ...'।**

যে (সত্যের প্রতি) রুজু হয়[১]।	اِلَّا مَنۡ یُّنِیۡبُ ﴿۱۳﴾
১৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ডাক ইবাদতকে তাঁর জন্য খাঁটি করে*, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে[২]।	فَادۡعُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ وَلَوۡ كَرِهَ الۡكٰفِرُوۡنَ ﴿۱۴﴾
১৫. (তিনি) উচ্চ সম্মান-মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় হুকুমে 'রূহ' অবতীর্ণ করেন[৩], যাতে তিনি (নবীজি) সতর্ক করেন সাক্ষাতের দিন[৪] সম্পর্কে–	رَفِیۡعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الۡعَرۡشِ ۚ یُلۡقِی الرُّوۡحَ مِنۡ اَمۡرِهٖ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ لِیُنۡذِرَ یَوۡمَ التَّلَاقِ ﴿۱۵﴾
১৬. যেদিন সকল মানুষ (কবর থেকে) বেরিয়ে আসবে[৫]। আল্লাহর নিকট তাদের কোন	یَوۡمَ هُمۡ بٰرِزُوۡنَ ۚ لَا یَخۡفٰی عَلَی اللّٰهِ

১. অর্থাৎ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্বের নিদর্শন প্রত্যেক বস্তুতে বিরাজমান। বিশেষত মানুষ তার রুযীর বিষয়টি, যার ফয়সালা আকাশ থেকে হয়ে থাকে– বুঝে নিলে অন্য সব কিছুই তার বুঝে আসবে। কিন্তু সেদিকে যদি রুজুই না হয় এবং চিন্তা-ভাবনা না করে, তবে কী করে বুঝে আসবে?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– '...তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে'।

২. অর্থাৎ বান্দাদের কর্তব্য, তারা যেন বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করে কাজ করে এবং এক আল্লাহর প্রতি রুজু হয়ে তাঁকেই ডাকে, তাঁর বন্দেগীতে কাউকেই শরীক না করে। অবশ্য আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের এই একত্ববাদের কারণে কাফের ও মুশরিকরা চরম ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হবে। কেননা, সমস্ত দেব-দেবী বর্জন করে মাত্র এক আল্লাহ রাখা হল! কিন্তু যে ব্যক্তি পাকা তাওহীদবাদী, সে মুশরিকদের সমাবেশে এই তাওহীদেরই আওয়াজ বুলন্দ করে এবং ওদের গাত্রদাহের মোটেই পরোয়া করে না।

৩. الروح– বলতে ওহী উদ্দেশ্য, যা প্রথমে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়, অতঃপর তাঁদের মাধ্যমে অন্য বান্দাদের নিকট পৌছে। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই পৌছতে থাকবে।

৪. অর্থাৎ যেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাযির হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ভাল বা মন্দ আমলের সাক্ষাত লাভ করবে।

৫. অর্থাৎ কবর থেকে বের হয়ে এক উন্মুক্ত সমতল মাঠে হাযির হবে, যেখানে কোন আড়াল বা বাধা থাকবে না।

مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

বিষয় গোপন থাকবে না[১]। (বলা হবে): রাজত্ব আজ কার? একক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই[২]।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭. আজ প্রত্যেককে সে যা করেছে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। আজ মোটেই জুলুম হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾

১৮. আপনি ওদের সতর্ক করতে থাকুন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন অন্তরগুলি কণ্ঠাগত হবে আর ওরা (তা) চেপে ধরে রাখবে[৩]। অপরাধীদের কোন বন্ধু থাকবে না, না এমন কোন সুপারিশকারী যার কথা গ্রহণ করা হয়[৪]।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি চোখের চুরি এবং অন্তরসমূহে যা কিছু গোপন আছে তা জানেন।

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ

২০. এবং আল্লাহ ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন[৫]। আর ওরা তাঁর পরিবর্তে যাদের

---

১. অর্থাৎ উত্তমরূপে বুঝে নাও– তোমাদের সেই সর্বোচ্চ বিচারকের দরবারে হাযির হতে হবে, যাঁর কাছে তোমাদের কোন অবস্থাই গোপন নয়। সেদিন সকল জাহেরী ও বাতেনী অবস্থা প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ সেদিন সমস্ত মাধ্যম ও পর্দা উঠে যাবে। জাহেরী ও নকল আকৃতিতেও কারো কোন আধিপত্য থাকবে না। সেই একক বিশ্বপ্রভুরই আধিপত্য ও কর্তৃত্ব থাকবে, যাঁর সামনে সকল শক্তি পরাস্ত ও পরাভূত।

৩. অর্থাৎ ভয় ও আতঙ্কে কলিজাগুলি ভীত হয়ে গলদেশ পর্যন্ত এসে যাবে এবং লোকেরা দুই হাতে সেগুলিকে ধরে চাপতে থাকবে, যেন শ্বাসের সঙ্গে বের হয়ে না যায়।

৪. অর্থাৎ এমন কোন সুপারিশকারী হবে না, যার কথা অবশ্যই মানতে হয়। বরং সুপারিশ সে-ই করতে পারবে, যে অনুমতি লাভ করবে এবং তারই জন্য করবে, যার জন্য অনুমোদন করা হবে।

৫. অর্থাৎ সকলের অলক্ষ্যে চুরি করে কারো প্রতি তাকাল, অথবা আড়চোখে দেখল, কিংবা অন্তরে কোন নিয়ত করল, অথবা কোন বিষয়ের এরাদা করল বা খেয়াল এল– এর প্রত্যেকটাই আল্লাহ জানেন এবং ইনসাফের সাথে ফয়সালা করেন।

মِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑳	ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ— তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[১]।

[রুকূ - ৩]

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ㉑	২১. এরা কি যমীনের বুকে ভ্রমণ করেনি? তা হলে দেখতে পেত, এদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? শক্তিতে এবং পৃথিবীতে (রেখে যাওয়া) নিদর্শনাদিতে ওরা ছিল এদের চেয়ে প্রবল[২]। অতঃপর আল্লাহ ওদেরকে ওদের গোনাহর কারণে পাকড়াও করলেন, আর আল্লাহ থেকে ওদের কোন রক্ষাকারী ছিল না[৩]।
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ㉒	২২. এ শাস্তির কারণ এই যে, ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আগমন করতেন। কিন্তু ওরা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ ওদের পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা[৪]।
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ㉓	২৩. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম[৫]–

---

১. অর্থাৎ ফয়সালা করা তারই কাজ হতে পারে, যিনি শুনতে ও জানতে পারেন। অতএব পাথরের এই নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলো, যাদের তোমরা ইলাহ মনে কর, ফয়সালা করবে কীভাবে?! আর যে ফয়সালাও করতে পারে না, সে খোদা হয় কী করে?

২. آثار– অর্থাৎ বড় বড় সুরক্ষিত কিল্লা, সুউচ্চ অট্টালিকা ও নানা প্রকার স্মৃতিচিহ্ন।

৩. দুনিয়ার আযাব থেকেই যখন কেউ রক্ষা করতে পারেনি, তখন আখেরাতে কে রক্ষা করবে?

৪. অর্থাৎ রাসূলকে অস্বীকার করলে তোমরাও ওদের ন্যায় ব্যর্থ-ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অবশেষে অপমানিত ও ধ্বংস হবে। আর আল্লাহ পাক স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতাবলে পয়গম্বরকে প্রাধান্য ও বিজয় দান করবেন। –এই প্রসঙ্গেই সামনে মূসা (আ) ও ফেরাওনের কাহিনী বর্ণিত হচ্ছে।

৫. 'নিদর্শনাদি' বলতে মুজেযাসমূহ উদ্দেশ্য। আর 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' দ্বারা সম্ভবত সেগুলোর মধ্যে বিশেষ বিশেষ মুজেযা উদ্দেশ্য, অথবা মুজেযা ছাড়া অন্য প্রকারের দলীল-প্রমাণ উদ্দেশ্য।

২৪. ফেরাওন, হামান ও কারূনের নিকট[১]। তখন ওরা বলল, '(এ) যাদুকর, মিথ্যাবাদী[২]।	اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝
২৫. তিনি যখন আমার কাছ থেকে সত্য নিয়ে ওদের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন ওরা বলল, 'যারা তার সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা কর, আর তাদের নারীদের জীবিত রাখ[৩]।' বস্তুত কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়ে থাকে[৪]।	فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝
২৬. ফেরাওন বলল, 'আমাকে সুযোগ দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলি। আর সে তার রবকে ডাকুক[৫]। আমি আশঙ্কা করি যে, সে	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ

এমনও হতে পারে যে– آيات দ্বারা ঐশী শিক্ষা-দীক্ষা ও বিধি-বিধান উদ্দেশ্য। আর سلطان مبين দ্বারা মুজেযাবলি কিংবা সেই পবিত্র শক্তি ও খোদায়ী নুসরত-সাহায্য উদ্দেশ্য, যার নিদর্শন-চিহ্ন পয়গম্বরদের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. হামান ফেরাওনের মন্ত্রী ছিল, আর কারূন বনী ইসরাঈলের সর্বাপেক্ষা বড় ধনী ও ব্যবসায়ী ছিল। সে মূসা আলাইহিস সালামের বিরোধিতায় ফেরাওনের মর্যি মত চলত। ইতিপূর্বে তার কাহিনী গত হয়েছে।

২. অর্থাৎ, ইনি মুজেযার নামে যা দেখাচ্ছেন, তা আসলে যাদু। কাজেই তিনি একজন যাদুকর এবং নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার। মনে হয়, ওদের কতক এ কথা বলেছে এবং অন্যরা সমর্থন করেছে।

৩. এ নির্দেশ এখন দ্বিতীয়বার দেওয়া হচ্ছিল, মূসা আলাইহিস সালাম তশরীফ আনার পর। উদ্দেশ্য ছিল বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করা এবং তাদের সংখ্যা আরও কমিয়ে দেওয়া। তাছাড়া তাদের মনে এ ধারণা পয়দা করা যে, মূসার কারণেই তাদের উপর এ সকল বিপদ এসেছে! যাতে এ ধারণায় লোকেরা তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে এবং বনী ইসরাঈলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার কৌশল সফল হয়। রইল– এ নির্দেশ কার্যকর হয়েছিল কিনা? তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

৪. অর্থাৎ এরূপ প্রতারণা ও কলাকৌশলে কী হয়? আল্লাহ তাআলা তাঁর খাঁটি বান্দাদের সাহায্য করত কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

৫. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ফেরাওন বলল, আমাকে সুযোগ দাও।' সম্ভবত তার পারিষদবর্গ মূসাকে মেরে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছিল না। কেননা, তাঁর মুজেযা দেখে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল, না জানি তাঁর প্রভু প্রতিশোধ নেন।

دِيۡنَكُمۡ اَوۡ اَنۡ يُّظۡهِرَ فِى الۡاَرۡضِ الۡفَسَادَ ﴿۲۶﴾

তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে অথবা পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়িয়ে দেবে[১]।'

وَقَالَ مُوۡسٰٓى اِنِّىۡ عُذۡتُ بِرَبِّىۡ وَرَبِّكُمۡ مِّنۡ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤۡمِنُ بِيَوۡمِ الۡحِسَابِ ﴿۲۷﴾

২৭. আর মূসা বললেন, 'আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি প্রত্যেক সেই অহংকারী থেকে[২], যে হিসাব-দিবসে বিশ্বাস করে না[৩]।'

[রুকূ - ৪]

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤۡمِنٌ ۖ مِّنۡ اٰلِ فِرۡعَوۡنَ يَكۡتُمُ اِيۡمَانَهٗۤ اَتَقۡتُلُوۡنَ رَجُلًا اَنۡ

২৮. ফেরাওনের সম্প্রদায়ের এক ঈমানদার ব্যক্তি –যে তার ঈমান গোপন করত– বলল, 'তোমরা কি একজন লোককে এ কথা বলার

ফেরাওন নিজেও মনে মনে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু মানুষের নিকট শক্তি ও বাহাদুরী প্রদর্শন করার জন্য চরম ঔদ্ধত্য ও নির্লজ্জতাহেতু এ কথা বলছিল, যাতে লোকেরা বোঝে, হত্যাকাণ্ডে তাকে বাধা দেওয়ার মত কেউ নেই এবং তার অভিপ্রায়কে কোন শক্তিই ব্যাহত করতে পারে না।

১. অর্থাৎ তাকে জীবিত থাকতে দিলে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় রকম ক্ষতির আশঙ্কা। হতে পারে, সে তার ওয়াজ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদের মাঝে প্রচলিত ধর্মীয় রীতি-নীতিকে পরিবর্তন করে ফেলবে, অথবা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে দেশের মধ্যে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে। পরিণামে তোমাদের (তথা কিবতীদের) রাজত্বের পরিসমাপ্তি হয়ে দেশ বনী ইসরাঈলের হাতে চলে যাবে।

২. হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন ওদের সলা-পরামর্শের খবর শুনলেন, তখন স্বজাতিকে বললেন– এসবের আমি মোটেই পরোয়া করি না। শুধু ফেরাওন কেন, সারা দুনিয়ার অহংকারী ও দাম্ভিকেরা একত্র হয়ে গেলেও ওদের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমার ও তোমাদের প্রভুই যথেষ্ট। তাই আমি নিজেকে তাঁরই আশ্রয়ে সোপর্দ করে দিয়েছি, তিনিই আমার রক্ষক ও সহায়ক। যেমন আল্লাহ বলেছেন– لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি। –তা-হা, আয়াত ৪৬)

বলা বাহুল্য, আল্লাহর সহায়তা ও সাহায্যের পর কোন অহংকারী মানুষের দিক থেকে কোন ভয় হতে পারে কি?

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হিসাব-কিতাবের বিশ্বাস যার আছে, সে (অন্যের প্রতি) জুলুম করবে কী করে?'

يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ

কারণে মেরে ফেলবে যে, 'আমার রব আল্লাহ,' অথচ সে তো তোমাদের নিকটে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছে? সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যা (-র শাস্তি) তার উপরই পতিত হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে তোমাদেরকে যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় দেখায়, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর আপতিত হবে[১]। নিশ্চয়

---

১. অর্থাৎ একজন মুমিন ব্যক্তি, যে এতদিন ফেরাওন ও তার জাতি থেকে নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল– সে ফেরাওনের কথা ذَرُوْنِيْٓ أَقْتُلْ مُوْسٰى –এর উত্তরে বলে উঠল, 'আপনি কি একজন মানুষকে শুধু এ কারণে খুন করতে চান যে, তিনি এক আল্লাহকে নিজ প্রভু বলেন, অথচ তিনি তার দাবির স্বপক্ষে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দেখিয়ে দিয়েছেন? তাকে তো হত্যা করার কোনো প্রয়োজনও নেই; বরং এতে আপনাদের ক্ষতিরই সম্ভাবনা। কারণ, তিনি যদি নিজ দাবিতে মিথ্যা হন, তবে এত বড় মিথ্যার জন্য আল্লাহ অবশ্যই তাকে ধ্বংস বা লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। এত বড় মিথ্যাবাদীকে অনবরত ঢিল দিয়ে রাখা আল্লাহর নীতি নয়। দুনিয়াবাসীকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই একদিন তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যে, দুনিয়া প্রকাশ্যরূপে তার লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতা, মিথ্যা ও প্রতারণার তামাশা দেখতে পাবে। সুতরাং অযথা তার রক্তে আপনাদের হাত রঞ্জিত করার প্রয়োজন থাকবে না।

আর যদি বাস্তবে তিনি সত্যের উপর থেকে থাকেন, তবে দুনিয়া ও আখিরাতের যে আযাব সম্পর্কে তিনি অবিশ্বাসীদের সতর্ক করছেন, তার কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই আপনাদের উপর এসে পড়বে।

মোটকথা, প্রথম ক্ষেত্রে তাকে হত্যার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা নিতান্তই ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ।'

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'তার কথার সারমর্ম হচ্ছে– যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন, তবে যার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন, তিনিই শাস্তি দিয়ে ছাড়বেন। আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে নিজেদের ব্যাপারে ফিকির করুন।'

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের কথা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে নবুওয়াতের দাবিদারের মিথ্যা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়নি। যদি এমন দাবিদারের মিথ্যা ও প্রতারণা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তবে তাকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে ওয়াজিব। আমাদের কালে নবীয়ে আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ নবী হওয়া যেহেতু অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, অতএব এখন কোন ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবি করে বসলে এর অর্থ দাঁড়ায়– অকাট্যরূপে প্রতিষ্ঠিত একটি আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করা। ফলে সে মুরতাদ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

আল্লাহ তাকে সুপথ দেখান না, যে সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী[১]।

يَٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَٰهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝

২৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদেরই রাজত্ব, তোমরাই যমীনে প্রবল। তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে, যদি আমাদের উপর তা এসে পড়ে[২]?' ফেরাওন বলল, 'আমি তো তোমাদের সে উপদেশই দিচ্ছি, যাকে আমি (সঠিক) মনে করি এবং আমি তোমাদের কল্যাণের পথই দেখাচ্ছি[৩]।'

وَقَالَ الَّذِىٓ ءَامَنَ يَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝

৩০. আর সেই ঈমানদার ব্যক্তি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি (পূর্ববর্তী) সম্প্রদায়গুলির দিবসের মত দিবসের–

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ

৩১. 'অর্থাৎ নূহ এর সম্প্রদায়, আ'দ, ছামূদ ও ওদের পরবর্তী লোকদের মত অবস্থার। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অবিচার

ও কাফের হয়ে যায়। এ জন্য তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন রকমের দ্বিধা, ইতস্ততা এবং কালক্ষেপণের কোনই অবকাশ নেই।

১. অর্থাৎ মূসা যদি মিথ্যাবাদী হতেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে কিছুতেই এমন এমন মুজেযা দেখানোর এবং অবিরত সফলতা অর্জন করার সুযোগ দিতেন না। আর যদি আপনারা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, কারণ, একজন সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলছেন– তবে পরিণামে আল্লাহ তাআলা আপনাদের লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করবেন।

২. অর্থাৎ নিজেদের বিপুল উপায়-উপকরণ ও বিশাল সৈন্যবাহিনীর কারণে অহংকারী হয়ো না। আজ তোমাদের এ শান-শৌকত রয়েছে, কিন্তু কাল যদি আল্লাহর আযাব এসে তোমাদের ঘিরে ফেলে, তবে তা থেকে কোন রক্ষাকারী পাবে না। এ সকল উপায়-উপকরণ কোন কাজেই আসবে না।

৩. অর্থাৎ তোমার নসীহতে আমার চিন্তা-ভাবনায় কোনো পরিবর্তন হয়নি! আমার মতে যা কিছু মঙ্গলকর, তাই তোমাদের সামনে পেশ করছি। আমার মতে কল্যাণ এতেই যে, এ ব্যক্তির কাহিনী সূচনাতেই খতম করে দেওয়া হোক।

ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

করতে চান না[১]।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝

৩২. 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি হাঁক-ডাকের দিবসের[২]–

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ

৩৩. 'যেদিন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে[৩]। আল্লাহ (-র আযাব) থেকে তোমাদের কোন রক্ষাকারী থাকবে না। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন,

---

১. অর্থাৎ আপনারা যদি এভাবেই শত্রুতা ও অস্বীকার করাতে অটল থাকেন, তবে আমার আশঙ্কা হয়, না জানি আপনাদেরও সেই দুর্দিন দেখতে হয়, যা পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে নিজেদের নবীদের বিরোধিতা করায় দেখতে হয়েছিল।

স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর দরবারে অবিচার নেই। এরূপ কঠিন অপরাধের কারণে আপনাদের বা অন্যান্য জাতিকে যদি তিনি ধ্বংস করে দেন, তবে তা অবশ্যই সুবিচার ও ইনসাফের দাবিতে হবে। এ কি হতে পারে যে, কোন রাষ্ট্র তার প্রতিনিধিদের নিহত ও লাঞ্ছিত হওয়া দেখতে থাকবে, অথচ হত্যাকারী ও শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেবে না? (তদ্রূপ আল্লাহ তাঁর নবীদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়েন।)

২. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে يوم التناد দ্বারা কিয়ামতের দিন উদ্দেশ্য, যেদিন হাশরের ময়দানে একত্র হওয়া এবং হিসাব দেওয়ার জন্য সকলের ডাক পড়বে। এমনিভাবে বেহেশতবাসী, দোযখী ও আ'রাফবাসীরা একে অন্যকে ডাকবে, আর পরিশেষে সবাইকে ডেকে বলা হবে– يا أهل الجنة خلود لاموت ويا أهل النار خلود لاموت ('হে জান্নাতবাসীগণ! এ তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান; তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা! চিরস্থায়ী তোমাদের এ বাসস্থান; তোমাদের আর মৃত্যু নেই।') كذا ورد في الحديث (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৫৪৫; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৭৩৪)

কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র)-এর মতে يوم التناد দ্বারা ফেরাওনের উপর আযাব আসার দিন উদ্দেশ্য। তিনি লেখেন, তাদের উপর হাঁক-ডাকের দিন এল, যেদিন তারা লোহিত সাগরে ডুবে মরল। তখন তারা ডুবতে বসে একে অন্যকে ডাকতে শুরু করে।

এমন দুর্দিন আসবে– এটা ওই মু'মিন ব্যক্তিটি কী করে জানল?– হতে পারে, তার কাশ্‌ফ হয়েছিল। অথবা এ থেকে অনুমান করেছেন যে, প্রত্যেক হঠকারী জাতির উপর এভাবেই আযাব আসে।'

৩. অর্থাৎ হাশরের মাঠ থেকে পিঠ ফিরিয়ে দোযখের দিকে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অথবা আযাব অবতরণকালে তা থেকে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করবে।

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

ওর জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই[১]।'

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُۨ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর নিশ্চয় ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট ইউসুফ আগমন করেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে। তা সত্ত্বেও তিনি যা নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছিলেন, তার বিষয়ে তোমরা সন্দেহেরই মধ্যে রইলে। অবশেষে তিনি যখন মৃত্যু বরণ করলেন, তোমরা বলতে শুরু করলে, 'আল্লাহ তাঁর পরে আর কোনো রাসূল পাঠাবেন না[২]।' এভাবেই আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমা-লঙ্ঘনকারী, সন্দেহপোষণকারীদের–

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ

৩৫. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক করে তাদের নিকট কোনো সনদ আসা ছাড়াই। এ আল্লাহ ও ঈমানদারদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত[৩]।

---

১. অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে ভাল-মন্দ সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি। এর পরও যদি আপনারা না মানেন, তবে বুঝতে হবে, আপনাদেরই অবাধ্যতা ও বক্রতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাআলা এ-ই চেয়েছেন যে, আপনারা নিজেদের পছন্দ করা ভ্রান্তি ও গোমরাহীতেই পড়ে থাকুন। অতএব এরূপ ব্যক্তির পথে আসার কোন আশা নেই।

২. অর্থাৎ ব্যস, সকল ল্যাঠা চুকে গেল। ইনি নিজেও রাসূল ছিলেন না, এখন তাঁর পর আর কোন রাসূলও আসবেন না। এভাবে তারা যেন একেবারে রেসালাতের ধারাকেই অস্বীকার করল। কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবদ্দশায় মিসরবাসীরা তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দেয়নি। তাঁর পরলোক গমনের পর যখন মিশরের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার দূরাবস্থা হল, তখন তারা বলতে শুরু করল, ইউসুফ (আ)-এর অস্তিত্ব এ শহরের জন্য বড় বরকতময় ছিল। এমন নবী (ভবিষ্যতে) আর আসবে না। একদিকে পূর্বের সেই অস্বীকৃতি, অপরদিকে পরের এই স্বীকারোক্তি!! এটাই সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি।

যা হোক, মুমিন ব্যক্তিটির কথার মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নে'য়ামত চলে যাওয়ার পর নে'য়ামতের কদর হয়। তাই মূসার বর্তমানে তাঁর কদর নেই।

৩. অর্থাৎ জ্ঞানগত ও ধর্মীয় প্রমাণ ছাড়া তারা আল্লাহর আয়াত সম্বন্ধে কলহ-বিবাদ করে। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি ও নির্লজ্জতা আর কী হতে পারে? এ জন্যই আল্লাহ এবং তাঁর ঈমানদার বান্দারা কাফেরদের (ও তাদের এ কাজের) প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এটাই তাদের চরম অভিশপ্ত হওয়ার কারণ।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, অবাধ্য ব্যক্তির অন্তরে মোহর করে দেন[১]।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ

৩৬. ফেরাওন বলল, 'হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি পথসমূহে পৌছতে পারি–

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ

৩৭. আকাশমণ্ডলীর পথসমূহে। তাহলে আমি মূসার মাবূদকে উঁকি মেরে দেখতে পারব[২]। আর আমি তো মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি[৩]।' এভাবেই ফেরাওনের দৃষ্টিতে ওর মন্দ কর্ম-কাণ্ড শোভন করে দেওয়া হয়েছিল এবং ওকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল[৪]। আর ফেরাওনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল[৫]।

---

১. যারা সত্যের সামনে অহংকারবশত আত্মসমর্পণ করে না এবং পয়গম্বরদের নসীহত শুনে মাথা নত করে না, অবশেষে তাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা এমন করে দেন যে, তাতে সত্য গ্রহণ ও কল্যাণ প্রবেশের অবকাশই থাকে না (একেই 'অন্তরে মোহর করা' বলা হয়েছে)।

২. এ ছিল ওই অভিশপ্তের চরম ঔদ্ধত্য ও নির্লজ্জতা। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট আল্লাহ তাআলার সুমহান গুণাবলীর কথা শুনে সম্ভবত সে ধরে নিয়েছে যে, মূসার আল্লাহ আকাশে বাস করেন। তাই সে এমন বিদ্রূপ ও হাসিঠাট্টা শুরু করে দিল। কথা সত্য যে, "পিপীলিকার যখন মৃত্যু আসে, তখন তার পাখা গজায়।"

সূরা কাসাসে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে (আয়াত : ৩৮)

৩. অর্থাৎ নবুওয়াতের দাবি এবং বিশ্ব-জগতে আরো কোন মাবূদ আছে বলে তার যে দাবি– সবই মিথ্যা। আমার তো আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নজরে আসে না! যেমন আল্লাহ তাআলা তারই কথা উল্লেখ করেছেন– مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِي (আমি তো আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন প্রভু আছে বলে জানি না। –কাসাস, আয়াত ৩৮)

৪. মন্দকর্ম করতে করতে মানুষের আকল-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এরূপ হাস্যকর ক্রিয়াকলাপ শুরু করে, যার পর সুপথে আসার আর কোন উপায়ই থাকে না। ফেরাওনের ক্ষেত্রেও তাই হল।

৫. অর্থাৎ ফেরাওনের যত কলা-কৌশল, ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি ছিল, সবই অসার ছিল। এসব স্বয়ং তারই ধ্বংসের কারণ হল, মূসা (আ)-এর কোনই ক্ষতি করতে পারেনি।

[রুকূ - ৫]

৩৮. সেই ঈমানদার লোকটি বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদের কল্যাণের পথে পৌঁছে দেব[১]।

وَقَالَ الَّذِيٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ﴿۳۸﴾

৩৯. 'হে আমার সম্প্রদায়! দুনিয়ার এই জীবন তো সামান্য ভোগমাত্র; আর আখেরাতই চিরস্থায়ী নিবাস[২]।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿۳۹﴾

৪০. 'যে মন্দ কাজ করবে, তাকে সে কাজের অনুরূপ প্রতিফলই দেওয়া হবে। আর যারা সৎকাজ করবে– হোক তারা নর বা নারী– এবং হবে মুমিন, তারাই জান্নাতে যাবে। সেখানে তাদের দেওয়া হবে বে-হিসাব রিযিক[৩]।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۴۰﴾

---

১. ফেরাওন বলেছিল– وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ –এর উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বলল, سبيل الرشاد (কল্যাণ ও উন্নতির পথ) তা নয়, যাকে ফেরাওন سبيل الرشاد মনে করে। তোমরা বরং আমার অনুসরণ কর, যাতে প্রকৃত মঙ্গল ও উন্নতির পথে চলার ভাগ্য হয়।

২. অর্থাৎ নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জীবন, কয়েক দিনের সুখ-সম্ভোগ ও আনন্দ-আহ্লাদে পড়ে আখেরাতকে ভুলো না। দুনিয়ার জীবন ভাল-মন্দ যেমনই হোক শেষ হয়ে যাবে। এরপর সেই জীবন শুরু হবে, যা কখনো শেষ হবে না। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হল, এখানে থেকে তার পাথেয় সংগ্রহের ফিকির করা। নতুবা সর্বদা দুঃখ-কষ্টে পড়ে থাকতে হবে।

কবি বলেন–

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائینگے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائینگے

('এখন তো ঘাবড়ে গিয়ে বলে, মরে যাব। কিন্তু মরেও শান্তি না পেলে কোথায় যাবে?')

৩. এখানে পরকালীন জীবনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, কী উপায়ে তাতে সফলতা অর্জিত হতে পারে। আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, সেখানকার জন্য ঈমান ও সৎকর্মের প্রয়োজন, ধন-সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর এও স্পষ্ট হল যে, আল্লাহর রহমত তাঁর ক্রোধের উপর প্রাধান্য রাখে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সুযোগ হাতছাড়া না করা।

৪১. 'হে আমার সম্প্রদায়! কী ব্যাপার, আমি তোমাদের মুক্তির দিকে ডাকি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে[১]!

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝

৪২. 'তোমরা আমাকে ডাকছ, যাতে আমি আল্লাহর সাথে কুফর করি এবং তাঁর সঙ্গে এমন কিছুকে শরীক করি, যার ব্যাপারে আমার জানা নেই[২]। আর আমি তোমাদের ডাকছি পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল সত্তার দিকে[৩]।

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

৪৩. 'এ সুনিশ্চিত যে, তোমরা আমাকে যার দিকে ডাকছ, তাকে ডাকার কোন অর্থ নেই– না দুনিয়াতে না আখেরাতে[৪]। এবং এও

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ

---

১. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা বড় অদ্ভুত! আমি চাই তোমাদেরকে ঈমানের পথে এনে আল্লাহর আযাব থেকে নাজাতের ব্যবস্থা করতে, আর তোমরা চেষ্টা করছ নিজেদের সাথে আমাকেও দোযখের আগুনে দাখিল করতে!! একদিক থেকে তো এরূপ দুশমনী, আর অন্যদিক থেকে এমন হিতাকাঙ্ক্ষা!

২. অর্থাৎ তোমাদের চেষ্টার সারাসার এই যে, আমি (العياذ بالله) এক আল্লাহকে অস্বীকার করি, তাঁর নবীদের কথা না মানি এবং নাদান-জাহেলদের ন্যায় সেইসব জিনিসকে মা'বূদ সাব্যস্ত করি, যাদের উপাস্যতা কোন দলীল ও জ্ঞানগত নীতি দ্বারা প্রমাণিত নয়। আমি এও জানি না যে, এসব জিনিসকে কীভাবে মা'বূদ বানানো হল? বরং আমি জানি যে, এর বিপরীতে বহু অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

৩. অর্থাৎ আমার কামনা এই যে, কোনভাবে তোমাদের মাথা সেই একক আল্লাহর সামনে ঝুঁকিয়ে দিই, যিনি সর্বশক্তিশালীও এবং অত্যধিক গোনাহ-মার্জনাকারীও। তিনি অপরাধীকে ধরলে কেউ ছাড়াতে পারে না, আর মাফ করলে কেউ বাধাও দিতে পারে না। তিনিই এর যোগ্য যে, মানুষ তাঁকে ভয় করবে এবং তাঁর সম্মুখে আশায় বুক বেঁধে দাসত্বের মাথা নত করবে। মনে রেখো, আমি সেই আল্লাহরই আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাঁর দিকে তোমাদের ডাকছি।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ছাড়া এমন কেউ নেই, যে দুনিয়া বা আখেরাতে সামান্য লাভ বা ক্ষতির মালিক। অতএব অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য আহ্বান করা মূর্খতা ও বোকামী নয় তো আর কী? ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামতের দিন পর্যন্তও ওর ডাকে সাড়া দেবে না এবং ওদের ডাক সম্বন্ধে এদের কোন খবরই নেই। আর যখন মানুষকে

مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

সুনিশ্চিত যে, আমাদেরকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে এবং সীমালঙ্ঘন-কারীরাই জাহান্নামী[১]।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৪. 'তোমরা অচিরেই আমি তোমাদের যা বলছি তা স্মরণ করবে[২]। আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের ভাল করেই দেখেন[৩]।'

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ

৪৫. অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের সকল জঘন্য চক্রান্ত থেকে রক্ষা করলেন,* আর

(হাশরের মাঠে) একত্র করা হবে, তখন উপাস্যরা ওদের দুশমন হবে এবং ওদের উপাসনা অস্বীকার করবে। -আহকাফ, আয়াত ৫-৬)

তো এরূপ অক্ষম ও অসহায় বস্তুগুলোর দিকে আহ্বান করার কী অর্থ? ! আরে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এগুলির মধ্যে বহু বস্তু এমন, যারা নিজেরাও নিজেদের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে না, বরং আহ্বান করার শক্তিও রাখে না!!

১. অর্থাৎ পরিশেষে বাধ্য হয়ে এক আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে পৌঁছে সকলে নিজেদের বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হবে। বল দেখি, অক্ষম সৃষ্টিকে স্রষ্টার পদ দেওয়ার চেয়ে বড় বাড়াবাড়ি আর কী? (অতএব এ বাড়াবাড়ির ফল কী হতে পারে?)

২. অর্থাৎ ভবিষ্যতে যখন নিজেদের সীমালঙ্ঘনের মজা ভোগ করবে, তখন আমার নসীহতের কথা স্মরণ হবে যে- হাঁ, একজন ভাল মানুষ যে আমাদের বোঝাত, সে ঠিকই বলত। কিন্তু তখন এসব স্মরণ করে অনুতপ্ত হলেও কোন লাভ হবে না।

৩. অর্থাৎ নসীহত করে, সুপথ দেখিয়ে আমি আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে তোমাদের অভিযোগের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছি এবং সমস্ত উপকারী কথা বুঝিয়ে দিয়েছি। তোমরা না মানলে তোমাদের সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। এখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সোপর্দ করছি, তাঁরই উপর আমার ভরসা। তোমরা আমাকে নির্যাতন করতে চাইলে আল্লাহই আমাকে রক্ষা ও সাহায্য করবেন। সকল বান্দাই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে, তিনি আমার ও তোমাদের উভয়েরই ব্যাপার দেখছেন, কারো কোন আচরণ তাঁর কাছে গোপন নেই। একজন আজ্ঞাবহ মুমিনের কাজ এই যে, যথাসাধ্য চেষ্টার পর সে ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেবে।

★ দ্বিতীয় তরজমা- 'আল্লাহ তাকে ওরা যা কিছু ষড়যন্ত্র করেছিল তার সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন।'।

ফেরাওনের লোকদের বেষ্টন করে নিল নিকৃষ্ট আযাব[১]–

بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ

৪৬. অর্থাৎ আগুন, যার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় ওদের হাযির করা হয়*[২]।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا

১. অর্থাৎ হক-বাতিলের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সর্বশেষ ফল এই হল যে, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের, যাদের মধ্যে ফেরাওন সম্প্রদায়ের ঐ মুমিন ব্যক্তিও ছিল– ফেরাওনগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ রাখলেন। ওদের কোন চক্রান্তই সফল হতে দেননি। বরং ওদের চক্রান্তের পরিণাম ওদেরই উপর এসে পড়ল। যে ব্যক্তি (তথা ফেরাওন) সত্যের অনুসারীদের পশ্চাদ্ধাবন করল, সে মারা পড়ল এবং তার জাতির ভেলা লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হল।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদের সকাল-সন্ধ্যায় দোযখের সম্মুখে হাযির করা হয়।'

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন দোযখের যে স্থানে ওদের দাখিল করা হবে, তা ওদের প্রত্যেককে সকাল-সন্ধ্যায় দেখানো হয়, যাতে নমুনাস্বরূপ আসন্ন আযাবের কিছুটা মজা ভোগ করতে থাকে!

এতে বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, প্রত্যেক কাফেরের সামনে দোযখের, আর প্রত্যেক মুমিনের সামনে জান্নাতের নমুনা প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮৬৬)

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াত দ্বারা শুধু ফেরাওনীদের বরযখের জগতে শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস (বুখারী, হাদীস ১৩৩৮) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত কাফের বরং (কতক) গোনাহগার মুমিনরাও বরযখে শাস্তি পেয়ে থাকে (আল্লাহর পানাহ!)। আর কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, জান্নাতীদের মধ্যে শহীদদের আত্মা যেমন সবুজ পাখীবিশেষের অবয়ব ধারণ করে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়, তদ্রূপ দোযখীদের মধ্যে ফেরাওনীদের আত্মা কালো পাখীবিশেষের অবয়বে ঢুকিয়ে প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় দোযখে পাঠানো হয়। (অবশ্য আত্মার সশরীরে জান্নাত বা দোযখে বসবাস করার পালা আসবে আখেরাতে, তার আগে নয়।) [তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, বর্ণনা ১৮৪৩৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৮৮-৮৯)

এ বর্ণনাটি সহীহ হলে বলা যায়, এর দ্বারা জানা গেল যে, ফেরাওনীদের আত্মাসমূহকে দোযখের সম্মুখে পাঠানো হয়। এ জন্যই আয়াতে বলা হয়েছে– ওদেরকে দোযখের সামনে হাযির করা হয়। অপরদিকে সাধারণ দোযখীদের ক্ষেত্রে এই বিষয় ঘটে না। তাই তাদের ব্যাপারে হাদীছে (সহীহ মুসলিম, ২৮৬৬) বলা হয়েছে– عرض عليه مقعده..... – অর্থাৎ দোযখে তার ঠিকানা যেখানে, তা তাকে দেখানো হয়। এ কথা বলা হয়নি যে, তাকে দোযখের সামনে হাযির করা হয়।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝٤٦

আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন (ফেরেশতাদের আদেশ করা হবে), 'ফেরাওনের লোকদের কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।'

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝٤٧

৪৭. (ওই সময়টি স্মরণযোগ্য,) যখন ওরা আগুনের ভিতর পরস্পর বিতর্ক করবে আর দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ প্রতিহত করবে[১]?'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝٤٨

৪৮. অহংকারীরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো আগুনের মধ্যে আছি! বস্তুত আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে বিচার করে ফেলেছেন[২]।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝٤٩

৪৯. যারা আগুনে থাকবে, তারা দোযখের প্রহরীদের বলবে, 'আপনাদের রবের নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন একটা দিন আমাদের আযাব কিছুটা লাঘব করে দেন[৩]।'

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আমাদের দ্বারা নিজেদের আনুগত্য ও অনুসরণ করিয়েছ, যে কারণে আজ আমরা ধৃত হয়েছি। সুতরাং এখানে আমাদের কিছু তো উপকার কর। বড়দের পক্ষে ছোটদের কিছু না কিছু খোঁজ-খবর তো নিতে হয়। দেখছ না, আজ আমরা কী বিপদে পতিত হয়েছি! এই বিপদের কিছুটা অংশ আমাদের থেকে লাঘব করে দিতে পার না?

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা প্রধান ছিল তারা উত্তরে বলবে, আজ তোমরা ও আমরা সকলে একই বিপদে পতিত হয়েছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকের অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন, যা একেবারে অকাট্য ও অটল। এখন আর এই সুযোগ নেই যে, কেউ কারো কোন উপকার করবে। আমরা নিজেদেরই বিপদ লাঘব করতে পারি না, তোমাদের কী উপকার করব?

৩. অর্থাৎ নিজদের সরদার-প্রধানদের দিক থেকে নিরাশ হয়ে দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের নিকট দরখাস্ত করবে, আপনারাই স্বীয় রবকে অনুরোধ করে একটা নিষ্কৃতির দিনের ব্যবস্থা করে দিন, যেদিন আমাদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে।

৫০. তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আসতেন না?' ওরা বলবে, 'অবশ্যই'। তারা বলবে, 'তাহলে তোমরা ডাকতে থাক।' বস্তুত কাফেরদের ডাক ব্যর্থই হয়[১]।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰۗؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

[রুকূ - ৬]

৫১. নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের ও ঈমানদারদের পার্থিব জীবনে সাহায্য করি[২]

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে রাসূলদের কথা মাননি এবং পরিণামের ফিকির করনি। তা করলে কিছু কাজ হত। এখন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে, সুপারিশ বা খোশামোদে কোন কাজ হবে না। দোযখে পড়ে চিল্লাতে থাক। তোমাদের জন্য আমরাও সুপারিশ করতে পারব না, তোমাদের বিলাপ-আর্তনাদেও কোন লাভ হবে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'দোযখের ফেরেশতাগণ বলবেন, সুপারিশ করা আমাদের কাজ নয়, আমরা তো আযাব দেওয়ার কাজে নিয়োজিত। সুপারিশ রাসূলদের কাজ, কিন্তু তোমরা তো রাসূলদের বিরোধিতা করতে।'

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াত দ্বারা জানা গেল, আখেরাতে কাফেরদের প্রার্থনায় কোন ফল হবে না। অবশ্য দুনিয়াতে ওদের প্রার্থনায় আল্লাহ তাআলা কোন কিছু দিয়ে দিলে তা ভিন্ন কথা। যেমনঃ ইবলীসের প্রার্থনায় ওকে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁচার অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তাঁদের বিজয়ী করেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা উঠেন, আল্লাহর সাহায্যে তা সফল হয়। সত্যের সাধকদের কুরবানী কখনো ব্যর্থ হয় না। মাঝে তাঁরা যতই জোয়ার-ভাটা এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হোন না কেন, পরিণামে তাঁদের মিশন অবশ্যই সফল হয়ে থাকে। জ্ঞানগত দিক দিয়ে ও যুক্তি-প্রমাণে তো তাঁরা সর্বদাই বিজয়ী থাকেন, কিন্তু পার্থিব বিজয় এবং বাহ্যিক মর্যাদা ও সফলতাও শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই হাসিল হয়। সত্যের দুশমন কখনো প্রবল থাকতে পারে না। ওদের সাময়িক উত্থান-উন্নতি সাগরের ফেনা বা সোডা-পানির বুদবুদ সদৃশ। অবশেষে আল্লাহর অনুগত মুমিনদের মোকাবেলায় ওরা লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা নিজ ওলীদের পক্ষে ওদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়েন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, আয়াতে মুমিনদের সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে, তাতে শর্ত এই যে, তাদেরকে প্রকৃত মুমিন ও রাসূলদের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (তোমরাই বিজয়ী থাকবে, যদি তোমরা ঈমানদার হও। –আলে-ইমরান, আয়াত ১৩৯)। মুমিনদের গুণাবলি কুরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের উচিত, সেই মানদণ্ডে নিজেদের যাচাই করে দেখা।

এবং সেই দিনও সাহায্য করব, যেদিন সাক্ষীরা দন্ডায়মান হবে[১]–	الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿۵۱﴾
৫২. যেদিন অস্বীকারকারীদের ওজর-আপত্তি ওদের কোনো উপকারে আসবে না। বরং ওদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং ওদের জন্য আছে নিকৃষ্ট নিবাস[২]।	يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾
৫৩. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে পথের দিশা দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলাম কিতাবের–	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿۵۳﴾
৫৪. যা ছিল বুদ্ধিমানদের জন্য হেদায়াত ও নসীহত[৩]।	هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿۵۴﴾
৫৫. অতএব আপনি অবিচল থাকুন– নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য– এবং নিজ গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সন্ধ্যায় ও সকালে স্বীয় রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন[৪]।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿۵۵﴾

১. অর্থাৎ হাশরের মাঠে যখন পূর্বাপর সকল মানুষ সমবেত হবে, তখন আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় সর্বসমক্ষে তাদের মান-মর্যাদা ও সফলতা-কামিয়াবির প্রকাশ ঘটাবেন। দুনিয়াতে তো এ ব্যাপারে কিছুটা সন্দেহ থেকেও যেতে পারে এবং অস্পষ্টতা অনুভূত হতে পারে, সেখানে কিছুমাত্র সন্দেহ ও অস্পষ্টতা থাকবে না।

২. অর্থাৎ ওদের ভাগ্যে কোনই সাহায্য-সহায়তা জুটবে না।

এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিপরীতে অভিশপ্তদের পরিণাম বর্ণনা করলেন।

৩. অর্থাৎ দুনিয়াতেই দৃষ্টান্ত দেখে নাও– ফেরাওন ও তার জাতির বিপুল শক্তি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সত্যের শত্রুতা ও দুশমনি কিভাবে তাদের ধ্বংস করে ছাড়ল। পক্ষান্তরে, মূসা আলাইহিস সালামের বরকত ও পথপ্রদর্শনের ফলে বনী ইসরাঈলের মজলুম ও দুর্বল লোকদের আল্লাহ তাআলা সমুন্নত করলেন এবং সেই আজিমুশ্‌শান কিতাব তাওরাতের উত্তরাধিকারী বানালেন, যা দুনিয়ার বুদ্ধিমানদের জন্য হেদায়াতের প্রদীপ ছিল।

৪. অর্থাৎ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিশ্বাস রাখুন, আপনার সঙ্গে যে ওয়াদা রয়েছে, তা অবশ্যই পূরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা উভয় জগতে আপনাকে এবং আপনার বদৌলতে আপনার অনুসারীদের বিজয়ী করবেন। তবে জরুরী হল– আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের

৫৬. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক করে তাদের কাছে কোন সনদ আসা ছাড়াই, ওদের অন্তরে আর কিছু নয়, আছে কেবল অহংকার, যে পর্যন্ত ওরা কখনো পৌঁছতে পারবে না[১]। অতএব আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[২]।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

জন্য সব রকমের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, কারো দ্বারা কোন প্রকারের ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং রাতদিন ও সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা কথায় ও কাজে স্বীয় রবের তাসবীহ ও তাহমীদের ওযীফা জারী রাখা। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক কোনভাবে তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া যাবে না। এর পর আল্লাহ তাআলার সাহায্য সুনিশ্চিত।

আয়াতে যদিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে, তবে সমগ্র উম্মতকে এ কথা শোনানো উদ্দেশ্য।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শতবার এস্তেগফার করতেন। প্রত্যেক বান্দার ত্রুটি তার মর্যাদানুপাতিক হয়। এ জন্য প্রত্যেকেরই এস্তেগফার করা জরুরী।'

১. অর্থাৎ যারা একত্ববাদের দলীল-প্রমাণ এবং আসমানী কিতাবাদি ও পয়গম্বরদের মুজেযা ও হেদায়াত নিয়ে অযথা বিতর্ক করে এবং সনদহীন কথাবার্তা বলে বলে সত্যের আওয়াজকে স্তিমিত করতে চায়, তাদের কাছে কোনই যুক্তি-প্রমাণ নেই। এ সমস্ত সুস্পষ্ট বিষয়ে দ্বিধা-সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই। আসলে কেবল আত্মম্ভরিতা ও অহংকারই সত্যের সম্মুখে তাদেরকে মাথা নত করতে এবং পয়গম্বরদের অনুসরণ করতে বাধা দেয়। তারা নিজেদের অনেক বড় মনে করে এবং পয়গম্বরের চেয়ে বড় হয়ে থাকতে চায়, অথবা কমপক্ষে তাঁর সামনে যেন নত না হতে হয়। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখতে হবে, এ লক্ষ্যে তারা কখনো পৌঁছতে পারবে না। হয় পয়গম্বরের সম্মুখে তাদেরকে আনুগত্যের মাথা নত করতে হবে, না হয় তারা চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি এই বিতর্ককারীদের চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করেন এবং ওদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন।

সম্মুখে এমন কিছু বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা আসছে, যা সম্পর্কে ওরা বিতর্ক করে– যথাঃ মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, ওরা একে অসম্ভব মনে করত। অথবা স্রষ্টার একত্ববাদ, যা ওরা অস্বীকার করত।

৫৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না[১]।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তারা ও দুরাচারীও সমান নয়। তোমরা খুবই কম চিন্তা-ভাবনা কর[২]।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِىْٓءُ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. তোমাদের রব বলেছেন, 'আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব[৩]। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিরত থাকে, ওরা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে[৪]।'

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

---

১. অর্থাৎ বস্তুগত দিক থেকে আকাশ ও পৃথিবীর বিশালতা ও আয়তনের সম্মুখে মানুষ কোন্ ছার! এদিকে মুশরিকরাও স্বীকার করে, পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাই। সুতরাং যিনি এতসব বিশাল বস্তু সৃষ্টি করলেন, তাঁর পক্ষে মনুষ্যজাতিকে (মৃত্যুর পর) দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কেন কঠিন হবে? আশ্চর্যের বিষয় হল, এমন মোটা কথাও অনেকে বোঝে না।

২. অর্থাৎ একজন অন্ধ যে সরল পথ দেখতে পায় না, আর একজন চক্ষুষ্মান যে অত্যন্ত দৃষ্টিসম্পন্নতার সাথে সরল পথ দেখে ও বোঝে– এ দুজন কি সমান হতে পারে? অথবা একজন পুণ্যবান মুমিন ও একজন পাপাচারী কাফেরের পরিণাম কি একরকম হতে পারে? যদি হতে না পারে, তবে এমন একটি দিন অবশ্যই হওয়া চাই, যখন উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরস্পরের পার্থক্য উন্মোচিত হবে এবং প্রত্যেকের ইলম ও আমলের ফলাফল পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। সেই দিনটি হচ্ছে শেষ বিচারের দিন। কিন্তু আফসোস, তোমরা এতটুকুও চিন্তা কর না।

৩. অর্থাৎ আমারই বন্দেগী কর, কারণ আমি এর প্রতিফল দেব। আর আমারই কাছে চাও, কারণ, তোমাদের চাওয়া বিফলে যাবে না।

৪. বন্দেগীর শর্ত হচ্ছে স্বীয় প্রভুর কাছে চাওয়া। না চাওয়াটা অহংকার।

[রুকূ - ৭]

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ۝

৬১. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে আরাম করতে পার এবং দিন সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য☆১। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর করে না২।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۝

৬২. এই আল্লাহই তোমাদের রব, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা বিমুখ হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ☆☆৩?

এই আয়াত থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা বান্দার ডাকে সাড়া দেন। এ কথা তো নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বান্দার প্রত্যেক দোয়াই কবুল করবেন, অর্থাৎ সে যা চাইবে, তা-ই দিয়ে দেবেন। না, বরং দোয়া কবুল করার অনেক উপায় রয়েছে, যা হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। কোন জিনিস দেওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর হেকমতের অধীন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ (অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে তা দূর করে দেন, যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাক। –আন'আম, আয়াত ৪১)

যা হোক, বান্দার কাজ হচ্ছে চাওয়া এবং এই চাওয়া স্বতন্ত্র একটি ইবাদত, বরং ইবাদতের সার-নির্যাস।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–**'দিনকে করেছেন আলোয় উজ্জ্বল'।

১. রাতের শীতলতায় ও অন্ধকারে সাধারণত মানুষ ঘুমায় ও আরাম করে। যখন দিন হয়, তখন সতেজ হয়ে দিনের আলোতে নিজেদের কাজকামে ব্যস্ত হয়। তখন দেখা ও চলাফেরার জন্য কৃত্রিম আলোর মোটেই প্রয়োজন হয় না।

২. অর্থাৎ তাদের কর্তব্য ছিল, কথা ও কাজে এবং মনে-প্রাণে প্রকৃত অনুগ্রহকারীর শোকর আদায় করা। কিন্তু বহু লোক কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে শিরক করে।

☆☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তোমরা কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ'!

৩. অর্থাৎ রাত-দিনের সকল নে'য়ামতই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তা তোমরা স্বীকার কর। অতএব বন্দেগীও একমাত্র তাঁরই হওয়া উচিত। এখানে পৌঁছে তোমরা কেন বিভ্রান্ত হয়ে যাও যে, প্রকৃত মালিক তো একজন, কিন্তু বন্দেগী কর অন্যজনের?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে থাকে, তারা এভাবেই বিপথগামী হয়*।

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন আবাসস্থল এবং আকাশকে করেছেন ছাদ[১]। আর তোমাদের আকৃতি বানিয়েছেন এবং সুন্দর বানিয়েছেন তোমাদের আকৃতি। এবং তোমাদের দান করেছেন পরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহ। এই আল্লাহই তোমাদের রব। অতএব আল্লাহ বড় বরকতময়, যিনি সমগ্র জগতের রব[২]।

هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনিই চিরঞ্জীব[৩]। তিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। অতএব তোমরা তাঁকে ডাক প্রার্থনাকে তাঁর জন্য খাঁটি করে**। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের রব[৪]।

---

* দ্বিতীয় তরজমা– 'এভাবেই তারাও বিপথগামী হয়েছিল, যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করতে থেকেছে'।

১. অর্থাৎ গম্বুজস্বরূপ (ছাদ) বানিয়েছেন।

২. মানুষের আকৃতি সকল প্রাণীর আকৃতির চেয়ে উত্তম এবং সকল প্রাণীর রিযিকের চেয়ে তার রিযিক পবিত্র, পরিচ্ছন্ন।

৩. যার উপর কোনো অবস্থাতেই কখনো লয় ও মৃত্যু সংঘটিত হয়নি এবং হতে পারেও না। আর যখন তাঁর জীবন স্বকীয়, তখন জীবন-সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ও স্বকীয় হবে।

** দ্বিতীয় তরজমা– '...তাঁর ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে'।

৪. যাঁর সত্তা মৃত্যু ও সমস্ত দুর্বলতা থেকে পবিত্র এবং যিনি স্বীয় মহিমায় অনন্তকাল ধরে জীবিত, শুধু তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত এবং তিনিই সমস্ত গুণ ও প্রশংসার মালিক। এ জন্যই هو الحي এর পর الحمد لله رب العالمين বলা হয়েছে, যেমন: আগের আয়াতে নে'য়ামতসমূহের উল্লেখের পর فتبارك الله أحسن الخالقين বলা হয়েছিল।

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, لا إله إلا الله এর পরে الحمد لله رب العالمين বলা উচিত। আলোচ্য আয়াতই এই উক্তির উৎস।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ مِنْ رَّبِّیْ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۶﴾

৬৬. আপনি বলুন, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক আমাকে তাদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার নিকট আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এসে গেছে। আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন বিশ্ব জগতের রবের অনুগত থাকি[১]।

هُوَالَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُیُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ یُّتَوَفّٰی مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْۤا اَجَلًا مُّسَمًّی

৬৭. 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন– মাটি থেকে[২], অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে[৩]। এর পর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে। অতঃপর (তোমাদের অবকাশ দেন), যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যে উপনীত হও, তারপর যেন বৃদ্ধ হও। আর তোমাদের মধ্যে কতক আগেই মৃত্যু বরণ করে। এবং (অবকাশ দেন), যাতে তোমরা নির্ধারিতকালে উপনীত হও[৪]

১. অর্থাৎ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দেখার পর কোন মানুষের পক্ষে এক আল্লাহর সম্মুখে দাসত্বের মাথা নত না করার এবং একমাত্র তাঁরই আজ্ঞাবহ না হওয়ার কোনো অবকাশ থাকে কি?

২. অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদমকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন। অথবা বলা যায়, তোমাদেরকেও মাটি থেকে পয়দা করেছেন। কারণ, শুক্রবিন্দু যেসব খাদ্যের নির্যাস, তা মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়।

৩. অর্থাৎ আদম-সন্তানের আসল হচ্ছে একটি পানি-কণা (শুক্রবিন্দু), যা পরবর্তী স্তরে জমাট রক্তে পরিণত হয়।

৪. অর্থাৎ শিশু থেকে যুবক এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়। আর কোন কোন মানুষ যৌবন বা বার্ধক্যের পূর্বেই মারা যায়। যা হোক, সকলকেই এক নির্ধারিত ও লিখিত সময় পর্যন্ত পৌঁছতে হবে– অর্থাৎ মৃত্যু বা হাশরের সময়। এ থেকে কেউই রেহাই পাবে না :

ہر آنکہ زاد بناچار بایدش نوشید ÷ زجام دہر مئے کُلّ مَن عَلَیْها فَان

('যে কেউ জন্ম নেবে, তাকে মৃত্যুর সুরা পান করতে হবে। কেননা আল্লাহর বাণী অমোঘ– كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংসশীল।')

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

এবং যাতে তোমরা অনুধাবন কর[১]।

هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৬৮. 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর তিনি যখন কোনো কিছু (করার) ইচ্ছা করেন, তাকে শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়[২]।'

[রুকূ - ৮]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۝

৬৯. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক করে? ওরা (তা থেকে) বিমুখ হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে?

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۫ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৭০. (ওরাই তারা,) যারা (এ) কিতাবকে এবং আমি আমার রাসূলদের যা দিয়ে পাঠিয়েছি তা অস্বীকার করেছে। শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে[৩],

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۭ يُسْحَبُوْنَ ۝

৭১. যখন ওদের গলদেশে থাকবে বেড়ি ও শিকল[৪]। ওদের হেঁচড়ানো হবে–

فِى الْحَمِيْمِ ۬ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۝

৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর জ্বালানো হবে আগুনে[৫]।

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ চিন্তা করে দেখ যে, যখন এতগুলি অবস্থা (ও পর্যায়) তোমাদের উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হল, তখন আরেকটি অবস্থাও তো অতিক্রম করতে পারে– তা হচ্ছে মরে গিয়ে জীবিত হওয়া।' সুতরাং একে কেন অসম্ভব মনে করছ?

২. অর্থাৎ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত এবং 'কুন ফায়াকুন' এর শানের কথা চিন্তা কর, অতঃপর ভাব- মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদের জীবিত করা তাঁর জন্য কি কঠিন? অবশ্যই না।

৩. অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকারের পরিণাম কী, তা জানতে পারবে।

৪. শিকলের এক মাথা গলায় আটকানো থাকবে এবং অপর মাথা থাকবে ফেরেশতাদের হাতে– এভাবে অপরাধী ও কারাবন্দীদের ন্যায় ওদের আনা হবে।

৫. অর্থাৎ দোযখে ওদেরকে কখনো ফুটন্ত পানির শাস্তি, কখনো আগুনের শাস্তি দেওয়া হবে। أعاذنا الله منهما

৭৩-৭৪. তারপর ওদের বলা হবে, 'কোথায় সেই গাইরুল্লাহরা, যাদের তোমরা শরীক সাব্যস্ত করতে[১]? ওরা বলবে, 'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে[২]। বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুকে ডাকতাম না[৩]।' এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের বিভ্রান্ত করেন[৪]।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭৫. তোমাদের এ শাস্তির কারণ এই যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে উল্লাস করে বেড়াতে এবং এ কারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে[৫]।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝

৭৬. তোমরা দোযখের দ্বারগুলিতে প্রবেশ কর[৬], তাতে চিরকাল থাকার জন্য। আর কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের বাসস্থান!

اُدْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ এখন তো তাদের কেউ উপকারে আসল না! সম্ভব হলে সাহায্যের জন্য ওদের ডাক দেখি।

২. অর্থাৎ তারা আমাদের ভুলে গেছে। সম্ভবত তখন পূজারী ও উপাস্যদের পৃথক করে দেওয়া হবে। অথবা ضلوا عنا বলে উদ্দেশ্য এই হবে যে, তারা আছে বটে। তবে তাদের দ্বারা যখন কোন ফায়দা হচ্ছে না, তখন তাদের থাকা না থাকা সমান।

৩. অধিকাংশ তাফসীরকার এর এ অর্থ করেছেন যে, আমরা দুনিয়াতে যাদের ডাকতাম– এখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা আসলে কিছুই ছিল না। এ যেন অনুতাপ ও আফসোসের সুরে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেওয়া।

কিন্তু হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র)-এর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, মুশরিকরা প্রথমে অস্বীকার করে বলবে, আমরা শরীক সাব্যস্তই করিনি। অতঃপর ঘাবড়ে গিয়ে মুখ থেকে ضلوا عنا বের হয়ে যাবে– যার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শরীক স্থির করার স্বীকারোক্তি রয়েছে। এর পর নিজেদের কিছুটা সামলে নিয়ে অস্বীকার করে বসবে এবং বলবে, আমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন কিছুকে ডাকিইনি।

৪. অর্থাৎ এখানে (আখেরাতে) যেমন প্রথমে অস্বীকার করল, কিন্তু স্থির থাকল না, বরং ঘাবড়ে গিয়ে স্বীকার করে ফেলল– একই অবস্থা এ কাফেরদের দুনিয়াতেও ছিল।

৫. অর্থাৎ দেখলে তো, অন্যায় অহংকার ও গর্বের পরিণাম কেমন হয়? এখন সেই অহংকার কোথায় গেল?

৬. প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধী তাদের জন্য নির্ধারিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

৭৭. অতএব আপনি অবিচল থাকুন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর আমি ওদেরকে যার ভয় দেখাই, তার কিছুটা আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনাকে (তার আগেই) মৃত্যু দান করি- সর্বাবস্থায় ওদেরকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে[১]।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝

৭৮. নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাঁদের মধ্যে কতক এমন, যাঁদের বৃত্তান্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি[২], আর তাঁদের কতকের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর কোন রাসূলের ক্ষমতা ছিল না আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই কোন নিদর্শন নিয়ে আসার[৩]। অতঃপর যখন আল্লাহর হুকুম আসল, ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হল এবং বাতিলপূজারীরা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হল[৪]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ ওদেরকে শাস্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পূর্ণ হবেই হবে। হতে পারে, তার কিয়দংশ আপনার বর্তমানে পূর্ণ হবে (যেমন বদর ও মক্কা বিজয় প্রভৃতিতে হয়েছে), অথবা আপনার ওয়াফাতের পর তা পূর্ণ হবে। তবে যেটাই হোক, কোন অবস্থাতেই ওরা আমার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোথাও ভেগে যেতে পারবে না। সকলের পরিণাম আমারই হাতে। এই জীবনের পর বাকি আযাব পরজীবনে হবে- নিষ্কৃতির কোন সম্ভাবনা নেই।

২. অর্থাৎ কারো কারো বিস্তারিত বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, কারো বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়নি। (তবে হতে পারে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁদেরও বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।) যা হোক, যাদের নাম জানা আছে, তাঁদের প্রতি বিস্তারিতভাবে এবং যাদের নাম-ধাম জানা নেই, তাঁদের প্রতি মৌলিকভাবে ঈমান আনা জরুরী : لا نفرق بين أحد من رسله (আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কারো ক্ষেত্রেই পার্থক্য করি না।)

৩. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে সকলেই অক্ষম। রাসূলদেরও এ ক্ষমতা নেই যে, যে মুজেযা ইচ্ছা দেখিয়ে দেবেন। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যার অনুমতি হবে, কেবল সেই নিদর্শনই দেখাতে পারেন।

৪. অর্থাৎ যখন আল্লাহর হুকুম হয়, তখন রাসূলগণ ও তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করে দেওয়া হয়। রাসূলগণ সফল ও বিজয়ী হন, আর বাতিলপন্থীদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই জোটে না।

[রুকূ - ৯]

৭৯. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার কতকের উপর আরোহন কর। আর কতক তো তোমরা ভক্ষণ কর।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۷۹﴾

৮০. সেগুলিতে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে[১] এবং এক উদ্দেশ্য এটাও যে, তোমরা তাতে (আরোহণ করে) তোমাদের অন্তরে যে প্রয়োজন আছে তা পূরণ করতে পার[২]। আর সেগুলির উপর ও নৌযানেও তোমাদের আরোহণ করানো হয়[৩]।

وَلَكُمْ فِیْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَیْهَا حَاجَةً فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿۸۰﴾

৮১. আর তিনি তোমাদের স্বীয় নিদর্শনাবলি দেখান। অতএব আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে তোমরা অস্বীকার করবে[৪]?

وَیُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ ۖ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿۸۱﴾

৮২. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তা হলে দেখতে পেত, এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল! ওরা সংখ্যায় এদের চেয়ে বেশি ছিল এবং শক্তিতে ও পৃথিবীতে (রেখে যাওয়া) নিদর্শনাদিতে (স্মৃতিচিহ্নে) প্রবল ছিল। কিন্তু ওরা যা কামাই করত তা ওদের উপকারে আসেনি[৫]।

اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِی الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾

---

১. যথা: তাদের চামড়া, লোম, পশম ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন রকমের কাজ হয়।

২. আরোহন করা তো স্বতন্ত্র একটি উদ্দেশ্য। তদুপরি এ সকল বাহন-জন্তু দ্বারা মানুষ আরো অনেক দীনী ও পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করে।

৩. অর্থাৎ স্থলভাগে জীবজন্তুর পিঠে এবং জলভাগে নৌযানের বুকে চেপে ভ্রমণ কর।

৪. অর্থাৎ এত পরিমাণ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও কি মানুষ শুধু অস্বীকারই করতে থাকবে? (আর আল্লাহ যে আরো কত নিদর্শন দেখাবেন, তা কে জানে?)

৫. অর্থাৎ পূর্বে বহু জাতি অতীত হয়েছে, যারা সংখ্যায় এবং শক্তিতে এদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। ওরা পৃথিবীর বুকে এদের তুলনায় বহু গুণ বেশি নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন ও নিদর্শন রেখে যায়। কিন্তু যখন আল্লাহর আযাব এল, তখন ওই শক্তি ও ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ কোন কাজেই আসেনি। ওরা সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে।

৮৩. যখন ওদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে ওদের কাছে আগমন করলেন, তখন ওরা নিজেদের নিকট যে জ্ঞান ছিল তার কারণে দম্ভ করতে লাগল। আর যা নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা ওদের বেষ্টন করে নিল[১]।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٨٣

৮৪. তো, ওরা যখন আমার আযাব দেখল তখন বলতে লাগল– 'আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যাদের শরীক করতাম তাদের প্রত্যাখ্যান করলাম[২]।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ۝٨٤

৮৫. কিন্তু আমার আযাব দেখে ওদের ঈমান আনয়ন ওদের কোন উপকারে আসেনি[৩]।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا

---

১. অর্থাৎ দুনিয়া কামানোর বিভিন্ন উপায় ও বস্তুগত উন্নতি-উৎকর্ষ সম্পর্কে যে জ্ঞান ওদের ছিল এবং মনে-প্রাণে যেসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস লালন করত, তা নিয়েই ওরা গৌরব করতে থাকে এবং নবীদের (আ) ইলম ও হেদায়াতকে তুচ্ছ মনে করে হাসিঠাট্টা করতে থাকে। পরিশেষে ওদের সামনে নিজেদের হাসি-তামাশার স্বরূপ প্রকাশ পেল এবং ওদের ঠাট্টা ও বিদ্রূপ স্বয়ং ওদেরই ঘিরে নিল।

২. অর্থাৎ যখন বিপদ চোখের সামনে এসে পড়ল এবং আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করতে লাগল, তখন হুঁশ হল এবং ঈমান ও তওবার কথা মনে পড়ল। এখন বুঝে আসল যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্যেই কাজ হয়। আর যেসব সত্তাকে আমরা আল্লাহর মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলাম, তারা সবই অক্ষম ও অথর্ব। এদের খোদায়ী আসনে সমাসীন করা আমাদের মারাত্মক বোকামী ও ধৃষ্টতা ছিল।

৩. অর্থাৎ এখন অনুতাপ করলে ও অন্যায় স্বীকার করলে কোন লাভ নেই, ঈমান ও তওবার সময় পার হয়ে গেছে। আযাব দেখে নেওয়ার পর তো যে কেউ ঈমান আনতে বাধ্য হয়। তাই এ বিশ্বাস মুক্তির কারণ হয় না, এ বিশ্বাসের কারণে আগত আযাবও হটে যায় না। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন– وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ (আর এমন লোকদের জন্য তওবা নেই, যারা মন্দ কাজকর্ম করতে থাকে, এমনকি যখন ওদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে, 'এখন তওবা করছি'! এবং এমন লোকদেরও তওবা নেই, যারা মারা যায় কুফরী অবস্থায়। –নিসা, আয়াত ১৮)

ফেরাওনের ঘটনায় আল্লাহ বলেন– آٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ {এখন? অথচ তুমি এর আগে নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে এবং তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

بَأْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ

এ-ই আল্লাহর রীতি, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে এসেছে। আর সেখানে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[১]।

–ইউনুস, আয়াত ৯১}– এবং হাদীছে (তিরমিযী : ৩৮৪৭) এসেছে– إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر (নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার চূড়ান্ত মৃত্যু-যাতনা শুরু হয়।)

১. অর্থাৎ চিরকাল এমনি হয়ে এসেছে যে, মানুষ প্রথমে অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এর পর যখন আযাবে ধৃত হয়, তখন আর্তনাদ শুরু করে এবং নিজেদের ভ্রান্তি স্বীকার করে। আল্লাহর নিয়ম এই যে, এ অসময়ের তওবা তিনি কবুল করেন না। পরিশেষে কাফেররা নিজেদের পাপাচারের কারণে ধ্বংস ও নিপাত হয়ে যায়।

اللّٰهُمَّ احفظنا من الخسران واحفظنا من غضبك وسخطك في الدنيا والآخرة

تم سورة المؤمن ولله الحمد والمنة

সূরা হা-মীম আস্‌সাজদা

সূরা ৪১ । ৫৪ আয়াত । ৬ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۵۴، رُكُوْعَاتُهَا ۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ۚ ①

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ ②

২. (এই কিতাব) সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ[১]।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ ③

৩. (এ) এমন কিতাব, যার আয়াতগুলি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে[*২], যা আরবী ভাষার কুরআন- জ্ঞানী লোকদের জন্য[৩];

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ④

৪. যা সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী[৪]। কিন্তু ওদের অধিকাংশ মুখ ফিরিয়ে রেখেছে, ফলে ওরা শোনে না[৫]।

---

১. অর্থাৎ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অতি বড় মেহেরবানী ও রহমত এই যে, তিনি তাদের হেদায়াতের জন্য এমন মহামর্যাদাপূর্ণ ও অতুলনীয় কিতাব নাযিল করেছেন।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** '... বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে'।

২. কুরআনের আয়াতসমূহ শব্দগত দিক থেকে যে পৃথক পৃথক, তা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু অর্থগত দিক থেকেও শত শত রকমের বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে বর্ণনা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ কুরআন কারীম অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, যা কুরআনের প্রথম শ্রোতাদের মাতৃভাষা, যাতে তাদের বুঝতে কষ্ট না হয় এবং নিজেরা বুঝে অন্যদেরও ভালভাবে বুঝাতে সক্ষম হয়।

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

কিন্তু এ সত্ত্বেও কুরআন দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হতে পারে, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। নির্বোধ জাহেলরা এ বিরাট নে'য়ামতের কী-ই বা কদর করবে?

৪. অর্থাৎ যারা কুরআনকে স্বীকার করে, কুরআন তাদের মুক্তি ও সফলতার সুসংবাদ শোনায়, আর যারা অস্বীকার করে তাদের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে।

৫. অর্থাৎ আশ্চর্যের কথা এই যে, কুরআনের উল্লিখিত গুণাবলি সত্ত্বেও তাদের অনেকেই এ কিতাবের অমূল্য নসীহতের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। যখন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই,

৫. আর ওরা বলে, আপনি আমাদের যার দিকে আহ্বান করেন, আমাদের অন্তর তার বিষয়ে গিলাফে আবৃত। আর আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং আপনার ও আমাদের মাঝে রয়েছে পর্দা। অতএব আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করি[১]।'

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝

৬. আপনি বলুন, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি এই ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের মা'বুদ তো এক মা'বূদ। অতএব তাঁরই প্রতি অবিচল থাক এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর[২]। আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য–

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝

তখন আর শুনতে চাইবে কেন? আর ধরুন, কানে শুনল বটে, কিন্তু দিলের কানে শুনল না এবং কবুল করার তাওফীক হল না– তাহলে তো শোনা আর না শোনা সমান হল।

১. অর্থাৎ নসীহতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না বা কান দেয় না– শুধু এতটুকুই নয়, বরং এমন ধরনের কথাবার্তা বলে, যা শুনে নসীহতকারী একেবারে নিরাশ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে নসীহত শোনানোর ইচ্ছাও চলে যাবে। যেমন ওরা বলে, আপনার কথাবার্তার বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, এজন্য কোন কথা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে না। আর আপনি যখন কথা বলেন, তখন আমাদের কান বধির হয়ে যায় এবং বধিরতার কারণে কিছুই শোনা যায় না। আপনার ও আমাদের মাঝে এমন অন্তরায় রয়েছে, যা একজনকে অন্যের সঙ্গে মিলিত হতে দেয় না। শত্রুতা ও বিদ্বেষের যে প্রাচীরগুলো দণ্ডায়মান, তা মাঝখান থেকে উঠে গেলে এবং যে গভীর খাদ বাধা হয়ে আছে তা ভরাট হয়ে গেলে আমাদের মধ্যে মিলন হতে পারে। কিন্তু এমনটি হওয়া অসম্ভব।

অতএব আপনি কেন অযথা মাথা ঘামাচ্ছেন? আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। আপনি আপনার কাজ করে যান, আমরা আমাদের কাজ করি। আমরা আপনার নসীহতে কখনো প্রভাবিত হব– এমন আশা করবেন না।

২. অর্থাৎ আমি খোদা নই যে, জোরপূর্বক তোমাদের অন্তরকে দীনের দিকে ঘুরিয়ে দেব। আর আমি ফেরেশতাও নই, যাঁকে পাঠানোর জন্য তোমরা বলে থাক। অন্য কোন সৃষ্টিও নই, বরং আমি তোমাদেরই স্বজাতির একটি মানুষ এবং একরকম হওয়ার কারণে আমার কথা বোঝা তোমাদের জন্য সহজ। তবে আমি এমন মানুষ, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ ওহীর জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা যতই বিমুখ হও না কেন এবং যতই নৈরাশ্যজনক কথা বল না কেন, আমি আল্লাহর পয়গাম অবশ্যই পৌঁছাব।

৭. 'যারা যাকাত দেয় না, আর ওরা আখেরাতে অবিশ্বাসী[১]।'

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ۝

৮. 'যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান[২]।'

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ۝

ওহী মারফত আমাকে বলা হয়েছে, তোমাদের সকলের মাবূদ ও বিচারক একজনই, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব সকলের উচিত, সর্বাবস্থায় সেই এক আল্লাহর দিকেই মুখ করে রাখা, তাঁর পথ থেকে একটুও এদিক-সেদিক পা না রাখা। আর পূর্বে বক্র পথে চলে থাকলে স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আগে-পরের গোনাহ-খাতা মাফ করানো।

১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ওদের আচরণ এই যে, ওরা অক্ষম সৃষ্টিকে বন্দেগীর মধ্যে তাঁর শরীক করে। আর বান্দাদের সঙ্গে ওদের ব্যবহার এই যে, সদকা ও যাকাতের অর্থ দিয়েও কোন গরীব-মিসকীনকে সাহায্য করতে অভ্যস্ত নয়। সেই সঙ্গে পরিণাম সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিশ্চিন্ত। কারণ, মৃত্যুর পরে যে কোন জীবন আছে এবং ভাল-মন্দ কাজের হিসাবও হবে, তা ওরা স্বীকারই করে না। অতএব এমন লোকদের ভবিষ্যৎ– ধ্বংস, দুর্দশা ও বরবাদ হওয়া ছাড়া আর কী হতে পারে?

আয়াতে الزكوة- এর মর্ম

সালাফে সালেহীন (পূর্ববর্তী মনীষীগণ) এর কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে الزكوة শব্দের অর্থ করেছেন কলেমা তায়্যেবা। আর কেউ কেউ زكوة এর অর্থ নিয়েছেন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা– অর্থাৎ তারা স্বীয় নফসকে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও মন্দ চরিত্র থেকে পাক-সাফ করে না। এর মধ্যে কলেমা তায়্যেবাকে বর্জন করা ও যাকাত প্রভৃতি আদায় না করা অন্তর্ভুক্ত। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন– قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (নিশ্চয় সফল হয়েছে সে, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে। –আ'লা, আয়াত ১৪) এবং – قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। –শামস, আয়াত ৯) এবং – وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكٰوة (এবং দান করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতা ও পবিত্রতা। –মারয়াম, আয়াত ১৩)।

এ অর্থ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কাফেররা শাখাগত বিধি-বিধান (যেমন যাকাত প্রদান) এর পরোক্ষ শ্রোতা নয়। অথবা এ কারণে যে, আয়াতটি মক্কী, আর যাকাত প্রভৃতির বিধান মদীনায় নাযিল হয়। والله أعلم

২. অর্থাৎ যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না, অনন্তকাল জারী থাকবে। জান্নাতে প্রবেশের পর তারাও শেষ হবে না, তাদের ছওয়াবেরও সমাপ্তি ঘটবে না।

[রুকূ - ২]

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِیْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۟

৯. আপনি বলুন, 'তোমরা কি সেই সত্তাকে অস্বীকার কর, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জন্য বিবিধ সমকক্ষ সাব্যস্ত কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের রব[১]।

وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِیْهَا وَقَدَّرَ فِیْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِیْۤ اَرْبَعَةِ اَیَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِیْنَ ۟

১০. 'আর তিনি পৃথিবীতে তার উপরিভাগে সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, তার ভিতরে বরকত রেখেছেন এবং তাতে তার খাদ্যসমূহ পরিমাপমত রেখে দিয়েছেন[২]। (এসব করেছেন) পুরো চারদিনে। (এ উল্লেখ করা হল) জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য[৩]।'

---

১. অর্থাৎ কী আশ্চর্যের কথা, তোমরা বিশ্বপ্রভুর একত্ববাদ ও মহৎ গুণাবলী অস্বীকার কর, আর এমন বস্তুসমূহকে তাঁর সমান মনে কর, যারা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেরও ক্ষমতা রাখে না।

২. 'এবং তার ভিতরে বরকত রেখেছেন' -অর্থাৎ নানা প্রকার খনি, গাছ, ফল, ফসল ও প্রাণী মাটি থেকে উদ্‌গত হয়।

'তাতে তার খাদ্যসমূহ পরিমাপমত রেখেছেন'- অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের খাদ্যসামগ্রী এক বিশেষ পরিমাণে এবং তাঁর হেকমত অনুযায়ী পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন। সে অনুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চলে ও প্রত্যেক দেশে সেখানকার অধিবাসীদের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

৩. অর্থাৎ এসব কাজ চার দিনে হয়েছে- দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দু'দিনে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি। যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে অথবা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা রাখে, তাকে বলে দিন- এসব পূর্ণ চারদিনে হয়েছে, এ থেকে কমবেশ হয়নি।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, سواءً للسائلين 'অর্থাৎ (জিজ্ঞাসাকারীদের) জওয়াব পূর্ণ হল।'

'দিন' বলতে কোন্ দিন উদ্দেশ্য?

এখানে 'দিন' বলতে পরিচিত ও সাধারণ দিন উদ্দেশ্য নয়। কেননা, পৃথিবী, সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্বে এই দিনের অস্তিত্বই ছিল না। অতএব 'চারদিন' বলে এখানকার চার দিনের সমপরিমাণ সময় উদ্দেশ্য। অথবা এখানে 'দিন' দ্বারা সেই দিন উদ্দেশ্য, যা সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে- وَاِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (আর আপনার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। -হজ্জ, আয়াত ৪৭)। আল্লাহই ভাল জানেন।

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۭ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ۝

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে অভিনিবেশ করলেন আর তা ছিল ধোঁয়ারূপে[১] এবং তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, 'তোমরা আস স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।' তারা বলল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম[২]।'

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ

১২. অতঃপর তাদের সাত আকাশ করে দিলেন দু'দিনে[৩]

---

১. অর্থাৎ তারপর আকাশমণ্ডলীর প্রতি মনোযোগী হলেন, তখন তা পুরোটা একখণ্ড ধোঁয়ার মত ছিল। তিনি একে বিভক্ত করে সাত আকাশ তৈরি করলেন, যেমন সামনে আসছে।

বি. দ্র. হতে পারে دخان দ্বারা আকাশের মূল উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলেন এ দুটির (আকাশ ও পৃথিবীর) সংযোগে দুনিয়া আবাদ করার। এ সংযোগ-স্থাপন এদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। (যা হোক, উভয়ের সংযোগে একটি মহাব্যবস্থা চালু করা উদ্দেশ্য ছিল)। তারা উভয়ে স্বেচ্ছায় সংযুক্ত হল— আকাশ থেকে সূর্যের কিরণ এল, তাপ পড়ল, বায়ু প্রবাহিত হল, এতে বাষ্প উপরে উঠল। এরপর পানি হয়ে বৃষ্টি পড়ল, যার ফলে পৃথিবীর বুকে নানা ধরনের বস্তুসামগ্রী পয়দা হল। আর পূর্বে যে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীতে তার খাদ্যসামগ্রী রেখেছেন'– এর অর্থ হল, তাতে সেসব বস্তু উৎপন্ন হওয়ার যোগ্যতা ও ব্যবস্থা রেখেছেন। والله أعلم

৩. অর্থাৎ দুইদিনে আকাশ তৈরি করলেন। আর পূর্বোক্ত কার্যগুলি হয়েছে চার দিনে। মোট ছয় দিন হল। যেমন অন্যত্র উল্লেখ আছে– خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (–আস্সাজদা, আয়াত ৪)

বি. দ্র. যে সকল মারফূ হাদীছে বিশ্বসৃষ্টির নির্দিষ্ট দিন ও ক্রমিকতার কথা এসেছে, অর্থাৎ অমুক অমুক বস্তু আল্লাহ সপ্তাহের অমুক অমুক দিনে সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো সহীহ হাদীস নজরে পড়েনি। এমনকি, মুসলিম শরীফে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা) এর হাদীস সম্পর্কে তাফসীরকার ইবনে কাছীর (র) লেখেন– وهو من غرائب الصحيح، وقد علّله البخاري في التاريخ، فقال : رواه بعضهم عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، وهو الأصح —'এটি সহীহ মুসলিমের একটি 'গরীব' (غريب) [শুধুমাত্র এক সনদে বর্ণিত] হাদীস। ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে একে মা'লূল (আপত্তিযুক্ত) সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে কা'ব ইবনে আহবার থেকে বর্ণনা করেছেন (নবীজী থেকে নয়)। আর এ-ই সহীহ।'

আর তাফসীরে রূহুল মাআনী'তে কাফ্ফাল শাফেয়ী (র)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে– تفرّد به مسلم، وقد تكلّم عليه الحفاظ: علي بن المديني والبخاري وغيرهما، وجعلوه من كلام

وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا

এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান প্রেরণ করলেন[১]। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুশোভিত করেছি এবং তাকে করেছি সুরক্ষিত। এ সবই

এ হাদীস শুধু كعب، وأن أباهريرة إنما سمعه منه، ولكن اشتبه على بعض الرواة، فجعله مرفوعًا ইমাম মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। আর হাফেজে হাদীস আলী ইবনে মাদীনী (র), ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ এ হাদীস সম্পর্কে আপত্তি করেছেন এবং বলেছেন, এ হচ্ছে কা'বের (বর্ণিত) কথা, আর আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব থেকে শুনেছেন। কিন্তু কোন কোন রাবী বিভ্রমবশে এটিকে মারফূ' বানিয়ে দিয়েছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

আলোচ্য আয়াত ও সূরা বাকারার আয়াত (২৯)– ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سموات থেকে প্রকাশ পায় যে, সাত আকাশ পৃথিবী সৃষ্টির পর বানানো হয়েছে। অপরদিকে সূরা নাযিআতের আয়াত (৩০) والأرض بعد ذلك دحها থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবীকে আকাশ সৃষ্টির পর বিছানো হয়েছে।

এর উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া হয়েছে। অধমের নিকট আবু হাইয়্যানের ব্যাখ্যা পছন্দ। তাঁর মতে প্রথম আয়াতে ثم এবং দ্বিতীয় আয়াতে بعد ذلك কালের দিক থেকে পরবর্তিতার অর্থে হওয়া জরুরী নয়। বরং হতে পারে যে, উক্ত শব্দাবলি 'সংবাদদানে পরবর্তিতা' অথবা 'মর্যাদার পরবর্তিতা' বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন– ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ আয়াতে (বালাদ : ১৭) ثم এবং অন্যত্র– عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ আয়াতে (কলম : ১৩) بعد ذلك শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, কুরআনে কারীমে শব্দ দুটি কালের পরবর্তিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সুস্পষ্ট নয় (সুতরাং আসমান ও যমীনের মধ্যে কোন্‌টি আগে সৃষ্টি করা হয়েছে আর কোন্‌টি পরে– তা কুরআনে পূর্ণ স্পষ্ট নয়)। তবে নে'য়ামতের আলোচনাকালে পৃথিবীর উল্লেখ আগে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও কুদরতের আলোচনায় আকাশের উল্লেখ আগে করা হয়েছে। এর তাৎপর্য সামান্য চিন্তা করলেই বুঝে আসে।

এখানে দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই। এ কয়েকটি কথা আলেমদের অবগতির জন্য লেখা হল।

১. অর্থাৎ যে হুকুম যে আকাশের জন্য সমীচীন ছিল, তা সেখানে প্রেরণ করেছেন।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'এ তো রবই জানেন, সেখানে (আকাশে) কোন্‌ কোন্‌ সৃষ্টি বসবাস করে এবং ওদের ধরন-ধারণই বা কী। এতটুকু পৃথিবীতে যদি হাজার হাজার সৃষ্টি (বা প্রজাতি) বসবাস করতে পারে, তবে এত বিরাট আকাশ শূন্য পড়ে থাকবে কেন?'

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾

পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর সুব্যবস্থাপনা[১]।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾

১৩. তারপরও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন, 'আমি তোমাদের সতর্ক করছি আদ ও ছামূদের আযাবের মত এক কঠোর আযাব সম্পর্কে[২]।'

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. (তা তখন আপতিত হয়,) যখন ওদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন ওদের সম্মুখ ও পিছন দিক থেকে[৩], এ বার্তা নিয়ে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। ওরা বলল, 'আমাদের রব চাইলে ফেরেশতাদের পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করি[৪]।'

---

১. দেখলে মনে হয়, তারকাগুলো নিকটবর্তী আকাশেই জড় হয়ে আছে। রাতে এই সমস্ত কুদরতি প্রদীপমালার কারণে আকাশ কত সুশোভিত মনে হয়। তদুপরি আকাশ কেমন সুরক্ষিত যে, তা পর্যন্ত কারো পৌঁছার ক্ষমতা নেই। ফেরেশতাদের সতর্ক পাহারা বসানো হয়েছে। কোন শক্তিই এ মজবুত ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা, তা সবচেয়ে শক্তিশালী ও সর্বজ্ঞ সত্তার হাতে কায়েম হয়েছে।

২. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা যদি এরূপ মহামর্যাদার আয়াতগুলি শোনার পরও নসীহত কবুল না করে এবং তাওহীদ ও ইসলামের পথ অবলম্বন থেকে বিমুখ থাকে, তবে বলে দিন– আমি তোমাদের সতর্ক করছি যে, তোমাদের পরিণামও 'আদ', 'ছামূদ' প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ন্যায় হতে পারে।

৩. অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে। সম্ভবত ওদের মধ্যে অনেক রাসূল আগমন করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে হযরত হূদ (আ) ও হযরত সালেহ (আ) এ দুজনই প্রসিদ্ধ।

অথবা مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রাসূলগণ আগমন করেন ওদেরকে অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয়াদি বুঝাতে। তাঁরা নসীহত ও উপদেশের কোন দিক ও কোন পর্যায় বাদ দেননি।

৪. অর্থাৎ মানুষ কেমন করে আল্লাহর রাসূল হতে পারে? যদি রাসূল পাঠাতেই হত, তবে আল্লাহ আসমান থেকে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন। যা হোক, আপনারা নিজেদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এনেছেন, আমরা তা মানতে প্রস্তুত নই।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ⑮

১৫. তো, আদ সম্প্রদায় পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহং প্রকাশ করল এবং বলতে লাগল, 'কে আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী[১]?' ওরা কি লক্ষ করে না, যে আল্লাহ ওদের সৃষ্টি করেছেন তিনি ওদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর ওরা আমার নিদর্শনাদি অস্বীকার করতে থাকল[২]।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ⑯

১৬. ফলে আমি ওদের উপর প্রবল ঝড়ো বাতাস পাঠালাম বিপদসঙ্কুল কয়েক দিন পর্যন্ত, যাতে ওদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করাই[৩]। আর পরকালের আযাব তো চরম লাঞ্ছনাকর। এবং ওদের সাহায্য করা হবে না[৪]।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

১৭. রইল ছামূদ, আমি ওদেরকে পথ বাতলে দিলাম। কিন্তু ওরা পথ গ্রহণের পরিবর্তে অন্ধত্বকেই পছন্দ করল[৫]।

---

১. সম্ভবত রাসূলগণ যখন আযাবের হুমকি দিয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলেছিল, আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কে, যাকে আমরা ভয় করব?

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ওদের দেহ অনেক বড় বড় হত। শারীরিক শক্তির কারণে অহংকারী ছিল। আর অহংকারে ফুলে ওঠা আল্লাহর নিকট পতনের কারণ হয়।'

২. অন্তরে নিদর্শনগুলির সত্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও জিদ ও শত্রুতাবশত তা অস্বীকার করতে থাকল।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ওদের অহংকার দমনের জন্য এক দুর্বল সৃষ্টি দ্বারা আল্লাহ তাআলা ওদেরকে ধ্বংস করে দিলেন– সাত রাত ও আট দিন অনবরত ঝঞ্ঝাবায়ু বইতে থাকে। বৃক্ষ, মানুষ, ঘরবাড়ি, জীবজন্তু– কোন কিছুই রক্ষা পায়নি।'

৪. অর্থাৎ আখেরাতের লাঞ্ছনা তো অনেক বেশি। কেউ প্রাণপনে চেষ্টা করলেও তা প্রতিরোধ করতে পারবে না, না সেখানে কেউ সাহায্য করতে পারবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তায় অস্থির থাকবে। ভালবাসা ও সহানুভূতির বড় বড় দাবিদাররাও এগিয়ে আসবে না।

৫. অর্থাৎ নাজাতের যে পথ আমার পয়গম্বর প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকে চোখ বন্ধ করে নিল এবং অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। ফলে আল্লাহ তাআলাও ওদেরকে ওরা যা পছন্দ করেছিল তাতে পড়ে থাকতে দিলেন।

فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۟

অতএব ওদেরই কৃতকর্মের কারণে ওদের পাকড়াও করল অপমানকর আযাবের গর্জন[১]।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۟

১৮. আর আমি তাদের রক্ষা করলাম, যারা ঈমান এনেছিল ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছিল[২]।

[রুকূ - ৩]

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۟

১৯. (স্মরণ কর), যেদিন আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের ধারে সমবেত করা হবে এবং ওদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে[*][৩]।

حَتّٰۤى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۟

২০. অবশেষে ওরা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন ওদের কান, চোখ ও চামড়া ওদের বিরুদ্ধে ওদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে[৪]।

---

১. অর্থাৎ ভূমিকম্প হল, যার সঙ্গে ছিল ভয়ঙ্কর শব্দ। সেই শব্দে ওদের কলিজা ফেটে গেল।

২. অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানির পথ পরিহার করে চলত, আল্লাহ তাদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করলেন। তাদের গায়ে আযাবের একটু আঁচড়ও লাগেনি।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ওদেরকে (অন্যদের অপেক্ষায়) থামিয়ে রাখা হবে।'

৩. অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধীদের পৃথক দল হবে এবং এসব দলকে পরস্পরের অপেক্ষায় জাহান্নামের নিকট থামিয়ে রাখা হবে।

৪. ওরা দুনিয়ায় কান দিয়ে আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতসমূহ শুনেছে এবং চোখ দিয়ে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখেছে, কিন্তু কোনটা দ্বারাই উপকৃত হয়নি। সর্বতোভাবে আল্লাহর নাফরমানীই করতে থেকেছে। ওদের ধারণাই ছিল না যে, গোনাহসমূহের সম্পূর্ণ রেকর্ড স্বয়ং ওদের সত্তার মধ্যে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যা সময়মত প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

কতক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, হাশরের ময়দানে কাফেররা নিজেদের অপরাধ অস্বীকার করবে। তখন হুকুম হবে– যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গোনাহ করেছিল, তাদের সাক্ষ্য নেওয়া হোক। তখন প্রত্যেক অঙ্গ সাক্ষ্য দেবে এবং এতে ওদের মুখের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তখন ওরা হতভম্ব হয়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে– (হতভাগারা) দূর হও, তোমাদেরই পক্ষ থেকে আমি বিতর্ক করছিলাম এবং তোমাদেরকে (আগুন থেকে) রক্ষা করতে চাচ্ছিলাম,

২১. আর ওরা নিজেদের চামড়াগুলিকে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে[১]?' সেগুলি বলবে, 'আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন আল্লাহ, যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন[২]।' আর তিনিই তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[৩]।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২২. তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে–এ ভয়ে তোমরা গোপনীয়তা অবলম্বন করতে না☆[৪]। বরং তোমরা ধারণা করতে, আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপের অনেক কিছুই জানেন না[৫]।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(অথচ তোমরা নিজেরাই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে শুরু করলে!) [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৬৯; মুসনাদে আবু ইয়া'লা, হাদীস ১৩৮৮]

১. অর্থাৎ আমরা যখন মুখে (অপরাধগুলো) অস্বীকার করছিলাম, তখন তোমাদের কী প্রয়োজন হল যে, সত্য প্রকাশ করে দিতে শুরু করলে? জিজ্ঞাসা করি, কথা বলা তোমাদের শেখাল কে?

২. অর্থাৎ যাঁর মহাশক্তি বাকশক্তিসম্পন্ন সব কিছুকে কথা বলার শক্তি দান করেছে, আজ তিনিই আমাদেরও বাকশক্তি দান করেছেন। অতএব কথা বলা ও (তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে) জানানো ছাড়া উপায় কী? যখন একচ্ছত্র অধিপতি চাইছেন যে, আমরা বলি– তখন চুপ থাকে এমন সাধ্য কার? যিনি মুখে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি কি হাত-পায়ে তা দিতে পারেন না?

৩. এ কথা– হয় আল্লাহ তাআলার, না হয় চামড়ার। উভয় সম্ভাবনা আছে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তোমাদের কান, চোখ ও চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে– এ ভয়ে তোমরা (গোনাহ থেকে) বিরত থাকতে না।'

৪. অর্থাৎ গোনাহ করার সময় অন্য মানুষ থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে। কিন্তু ভাবতেও পারনি যে, হাত-পা বলে দিতে পারে, ফলে তাদের থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করনি। আর তা করতে চাইলেও তার শক্তি কোথায় ছিল?

৫. অর্থাৎ তোমাদের কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পায় যে, সম্ভবত আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বিশ্বাসই তোমাদের ছিল না। মনে করতে, যা ইচ্ছা করতে থাকি, কে আর দেখবে? যদি এই বিশ্বাস থাকত যে, আল্লাহ আমাদের সমস্ত আমল-আচরণ সম্বন্ধে অবহিত এবং তাঁর নিকট আমাদের সব হিসাবপত্র সংরক্ষিত হচ্ছে, তবে কিছুতেই এ দুষ্কর্ম করতে না।

২৩. আর তোমাদের এ ধারণাই– যা তোমরা তোমাদের রবের ব্যাপারে পোষণ করতে– তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে আজ তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدٰىكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. এখন ওরা যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবু আগুনই ওদের ঠিকানা। আর যদি (আল্লাহকে) রাজি করতে চায়, তবে ওদের চাওয়া পূরণ করা হবে না[1]।

فَإِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি ওদের পিছনে কিছু সহচর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, আর তারা ওদের সামনের ও পিছনের সবকিছু ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছিল[2]। এবং ওদের ব্যাপারেও শাস্তিবাণী অবধারিত হয়ে গেছে– ওদের পূর্বে অতিবাহিত জিন ও মানবের (অন্য) দলগুলোর সাথে[3]। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত[4]।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, দুনিয়াতে কোন কোন বিপদ ধৈর্যের দ্বারা আসান হয়। সেখানে ধৈর্য ধরুক বা না ধরুক, দোযখই ওদের ঠিকানা হবে। (যেখান থেকে কখনো মুক্তি নেই।) আর কোন কোন বিপদ কাকুতি-মিনতি করলে টলে যায়। সেখানে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেও কেউ তা কবুল করবে না (এবং বিপদ দূর হবে না)।"

২. অর্থাৎ ওদের উপর শয়তানের দল নিয়োজিত ছিল, যাতে ওদের অপকর্মগুলিকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে তোলে, চাই তা পূর্বে করে থাকুক বা পরে; এবং যাতে ধ্বংসাত্মক অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের সম্মুখে সুন্দর বানিয়ে পেশ করে। স্মর্তব্য, ওদের পিছনে শয়তানগুলোকে যে নিযুক্ত করা হয়েছিল, এটাও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার ফলে ঘটেছিল। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ (যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে, আমি তার জন্য নিযুক্ত করি এক শয়তান, অনন্তর সে হয় তার সাথী। –যুখরুফ, আয়াত ৩৬)

৩. অর্থাৎ সেই কথাই অবধারিত হল, যা মানব সৃষ্টির শুরুতে বলে দেওয়া হয়েছিল– لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (আমি অবশ্যই জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।)

৪. যখন মানুষের উপর চরম ক্ষতি ও ধ্বংস আসে, তখন এভাবেই আসে এবং এভাবে তার উপকরণ তৈরি হয়।

[রুকূ - ৪]

২৬. কাফেররা বলতে লাগল, 'তোমরা এই কুরআনের প্রতি কর্ণপাত করো না এবং এর (পাঠের) মাঝে হট্টগোল কর; হয়ত তোমরা প্রবল হবে[১]।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝

২৭. অতএব আমি অবশ্যই কাফেরদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং ওদেরকে ওরা যেসব জঘন্য কাজ করত, তার প্রতিফল অবশ্যই দেব[২]।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

২৮. এ-ই আল্লাহর দুশমনদের শাস্তি অর্থাৎ আগুন। ওদের জন্য তাতে রয়েছে স্থায়ী ঠিকানা– ওরা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ[৩]।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝

২৯. আর কাফেররা বলবে, 'হে আমাদের রব! যেসব জিন ও মানুষ আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল, ওদের উভয়কে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা ওদের পদদলিত করব,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَاۤ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا

---

১. কুরআন কারীমের আওয়াজ শ্রবণকারীদের অন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাব ফেলত। যে-ই শুনত বিমোহিত হয়ে যেত। এতে বাধা দেওয়ার জন্য কাফেররা এক কৌশল বের করল, তারা একে অন্যকে বলল, যখন কুরআন পড়া হয় তখন সেদিকে কান দিয়ো না এবং এমন শোরগোল করো যে, অন্যরাও শুনতে না পারে। এভাবে আমাদের হই-চই কুরআনের আওয়াজকে স্তিমিত করে দেবে।

আজো জাহেলরা এরূপ কলাকৌশল অবলম্বন করার প্রয়াস পায়, যাতে উপকারী কথা হট্টগোলে না শোনা যায়। কিন্তু সত্যের বজ্র কি মশা-মাছির ভনভনানিতে চাপা পড়তে পারে? এসব কৌশল সত্ত্বেও সত্যের আওয়াজ হৃদয়ের গভীরে পৌঁছেই থাকে।

২. নিজেরাও নসীহতের কথা না শোনা এবং অন্যদেরও শুনতে না দেওয়া– এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর কী হতে পারে?

৩. ওরা অন্তরে আয়াতগুলোর সত্যতা বুঝত, কিন্তু জেদ, হঠকারিতা ও শত্রুতার কারণে অস্বীকার করতে থাকত।

لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

যাতে ওরা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যারা বলেছে, 'আমাদের রব আল্লাহ' অতঃপর তারা অবিচল থেকেছে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হবে (আর বলবে) যে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর সেই বেহেশতের, যার ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হত[২]।'

---

১. অর্থাৎ আমরা তো বিপদে ফেঁসেছি। কিন্তু মানুষ ও জিনদের মধ্যে যে শয়তানেরা আমাদের প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে এই বিপদে ফাঁসিয়েছে, তাদের একটুখানি আমাদের সামনে হাযির করুন, যাতে ওদেরকে আমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলতে পারি এবং চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে ওদের ঢুকিয়ে দিতে পারি। এভাবে প্রতিশোধ নিতে পারলে আমাদের অন্তরের জ্বালা কিছুটা হালকা হবে।

২. قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রভুত্বকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে এবং এর উপর কায়েম থেকেছে। রুবুবিয়ত ও উপাস্যতায় কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত করেনি এবং এই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হটেওনি, বহুরূপীর মত রংও বদলায়নি। যা কিছু মুখে বলেছে, তার দাবি অনুযায়ী বিশ্বাসে ও আমলে অবিচল থেকেছে। তারা আল্লাহর কামেল রুবুবিয়তের হক ও দাবি কী, তা জেনেছে। আর যে আমল করেছে, একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ও কৃতজ্ঞতা আদায়ের উদ্দেশে করেছে। তদুপরি স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বুঝেছে এবং তা পালন করেছে।

মোটকথা, গাইরুল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে সোজা মহাপ্রভুর দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং তাঁরই পথে চলেছে।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا...

এমন দৃঢ় ও অবিচল বান্দাদের কাছে– মৃত্যুর সময়, কবরে পৌঁছার পর, অতঃপর কবর থেকে ওঠার সময় আল্লাহর ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন, যাঁরা তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে বলেন, এখন আর আপনাদের ভীত ও চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। নশ্বর দুনিয়ার সকল চিন্তা ও দুঃখের অবসান হয়েছে, এখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। এখন অনন্তকালের জন্য হরেক রকমের দৈহিক ও আত্মিক আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছে। নবীদের (আ) মুখে জান্নাতের যেসব ওয়াদা করা হয়েছিল, তা এখন আপনাদের জন্য পূর্ণ করা হবে।

বলা বাহুল্য, এ সেই দৌলত, যা নিশ্চিতরূপে লাভ করার পর কোন চিন্তা ও কষ্ট মানুষের কাছেও ভিড়তে পারে না।

বি. দ্র. বেশ সম্ভাবনা আছে যে, পরহেজগার ও পুণ্যবানদের নিকট শুধু পরজীবনেই না, এই পার্থিব জীবনেও ফেরেশতাদের এক রকমের অবতরণ হয়ে থাকে। তাঁরা আল্লাহর হুকুমে

৩১. 'আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়াতে ও আখেরাতে[১]। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করবে[২]–

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝

৩২. 'ক্ষমাশীল করুনাময়ের পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ[৩]'।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

সেই নেক বান্দাদের অন্তরে দীনী ও পার্থিব বিষয়াদিতে কল্যাণকর কথাবার্তা এলহাম করে থাকেন, যা তাদের দিলের সুকূন এবং প্রশান্তি ও সান্ত্বনার কারণ হয়ে থাকে। যেমন: এঁদের বিপরীতে ২৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেরদের উপর শয়তান চাপানো হয়, যে জঘন্য কাজকর্মকে ওদের দৃষ্টিতে শোভন করে ওদের বিভ্রান্তিতে ফেলে। এক স্থানে শয়তানদের ব্যাপারেও 'নাযিল হওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (ওরা অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, পাপীর কাছে; ওরা শোনা কথা পাপীদের দিকে ছুঁড়ে মারে, আর ওদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী। –শু'আরা, আয়াত ২২২-২২৩)

যা হোক, কোন কোন তাফসীরকারের নিকট আয়াতের এ অর্থও হতে পারে (যে, পুণ্যবানদের নিকট দুনিয়াতেই ফেরেশতাদের অবতরণ হয়, যেমনিভাবে কাফেরদের কাছে শয়তানরা অবতরণ করে।) এ অর্থের উপর পরবর্তী আয়াত– نحن أولياءكم في الحيوة الدنيا অধিকতর ফিট হয়। والله أعلم

১. কেউ কেউ একে আল্লাহর কথা বলেছেন। তাহলে ফেরেশতাদের কথা এর পূর্বেই শেষ হয়েছে। তবে অধিকাংশের নিকট এটিও ফেরেশতাদেরই কথা। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদের দিলে এ কথা এলহাম করেন এবং তাদের সাহস বৃদ্ধি করেন।

হতে পারে, ফেরেশতাগণ এ কথা ইহজীবনেই কোন কোন বান্দার সঙ্গে সরাসরি বলে থাকেন। আর এও হতে পারে যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে বা তারপর বলে থাকেন। তখন– نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأٰخِرَةِ এর অর্থ এই হবে যে, আমরা দুনিয়াতেও তোমাদের বন্ধু থেকেছি, তাই তো আল্লাহর হুকুমে আত্মিকভাবে তোমাদের সাহায্য করতাম। আর আখেরাতেও বন্ধু হব যে, সেখানে তোমাদের জন্য শাফাআত করব বা তোমাদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করব।

২. অর্থাৎ অন্তরে যেসব বস্তুর কামনা-বাসনা পয়দা হবে অথবা যা কিছু মুখে চাইবে, সবই পাবে। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন জিনিসেরই অভাব নেই।

৩. এখন কল্পনা কর, সেই ক্ষমাশীল, করুণাময় স্বীয় মেহমানের সঙ্গে কেমন মধুর ব্যবহার করবেন! আর এ কত ইজ্জত ও সম্মানের কথা যে, এক দুর্বল বান্দা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মেহমান হবে!!

[রুকূ - ৫]

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٣٣

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে ও বলে, 'আমি তো আদেশ মান্যকারীদের একজন'[১]?'

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ۝٣٤

৩৪. ভাল ও মন্দ সমান নয়। (মন্দের) মোকাবিলা সেই পন্থায় করুন, যা উৎকৃষ্ট। তাহলে (দেখবেন), আপনার ও যার মাঝে শত্রুতা ছিল সহসাই সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেল[২]।

---

১. পূর্বা-পর সম্পর্ক

৩০ নং আয়াতে সেই বিশেষ মকবূল বান্দাদের উল্লেখ ছিল, যারা শুধু এক আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন ও স্বীয় দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছেন। বর্তমান আয়াতে তাদের আরেকটি উচ্চ গুণ ও মাকামের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

আয়াতের মর্ম হল, উত্তম ব্যক্তি তিনি, যিনি আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়, তাঁরই আজ্ঞাবহ হওয়ার ঘোষণা করে, তাঁরই মনোনীত পথে চলে এবং দুনিয়াবাসীকে তাঁরই দিকে আসার আহ্বান করে। তার কথা ও কাজ বান্দাদের আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করতে ফলপ্রসু হয়। যে সৎকর্মের দিকে সে মানুষকে ডাকে তা নিজে করে। আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের কথা ঘোষণা করতে সে কোথাও এবং কখনো বিরত হয় না। তার কাছে একমাত্র দীন-ইসলামই জাতীয়তাবাদের নিদর্শন এবং সে সব রকমের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নিজেকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে ঘোষণা করে। আর যে মহান দীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য সায়্যেদুনা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং যার জন্য সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই দীনের জন্যই সে লোকদের আহ্বান করে।

২. আল্লাহর প্রতি একজন সত্যিকার আহ্বানকারীর জন্য যে উন্নত আদর্শের প্রয়োজন, বর্তমান আয়াতে তা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, উত্তমরূপে বুঝে নাও, নেকী বদীর সমান হতে পারে না এবং বদী নেকীর সমান হতে পারে না– উভয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। বরং এক নেকী অন্য নেকীর চেয়ে এবং এক বদী অন্য বদীর চেয়ে অধিক ক্রিয়াশীল হতে পারে।

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

এজন্য একজন অনুগত মুমিন, বিশেষত আল্লাহর দিকে একজন আহ্বানকারীর আদর্শ এই হওয়া উচিত যে, সে মন্দের উত্তর মন্দ দ্বারা দেবে না, বরং যথাসম্ভব মন্দের মোকাবিলায় ভাল ব্যবহার নিয়ে আসবে। কেউ যদি তাকে শক্ত কথা বলে অথবা কোন শত্রু মন্দ ব্যবহার

৩৫. আর এ গুণ কেবল তাদের দান করা হয়, যারা ধৈর্যধারণ করে। এবং এ গুণ দান করা হয় কেবল মহাভাগ্যবান ব্যক্তিকে[১]।

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

৩৬. আর যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

করে, তবে তার মোকাবিলায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যা উৎকৃষ্ট হবে। যেমন রাগের উত্তরে সংযম, গালির উত্তরে ভদ্রতা ও সভ্যতা এবং কঠোরতার উত্তরে নম্রতা ও উদারতা প্রদর্শন করবে। এরূপ ব্যবহারের ফলে তোমরা দেখতে পাবে, কঠোর থেকে কঠোরতর দুশমনও নরম হয়ে যাবে এবং যদিও আন্তরিক বন্ধু না হয়, তবুও এক সময় আসবে যখন সে বাহ্যত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত তোমার সঙ্গে ব্যবহার করতে শুরু করবে, বরং সম্ভবত কিছুদিন পর খাঁটি বন্ধু হয়ে যাবে এবং তার অন্তর থেকে শত্রুতার মনোভাব মুছে যাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন। عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً (আশা আছে, আল্লাহ তোমাদের ও যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা, ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন–মুমতাহিনাহ্ : ৭)

অবশ্য কোন ব্যক্তির স্বভাব ও প্রকৃতিই যদি সাপ-বিচ্ছুর মত হয় এবং নম্র ব্যবহার ও ভদ্রতা তার উপর কোন দাগ না কাটে, তবে ভিন্ন কথা। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

যা হোক, আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের মহান আসনে যারা অধিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে অনেক ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং ভদ্রতা থাকা প্রয়োজন।

১. অর্থাৎ মন্দ ব্যবহার সহ্য করে ভদ্রতার সাথে উত্তর দেওয়া অনেক বড় ধৈর্য ও সাহসিকতার কাজ। এ চরিত্র ও উন্নত স্বভাব আল্লাহর কাছ থেকে তারাই লাভ করে, যারা বড় সৌভাগ্যবান।

যোগসূত্র : ইতিপূর্বে সেই শত্রুর সাথে আচরণ শেখানো হয়েছে, যে সৎব্যবহার ও ভদ্র আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু এমন এক দুশমন (তথা শয়তান)-ও আছে, যে কোন অবস্থাতেই এবং কোন উপায়েই দুশমনি ছাড়তে প্রস্তুত হয় না। তুমি যতই খোশামোদ কর বা নম্রতা দেখাও, তার একমাত্র লক্ষ হয়– কী করে তোমার ক্ষতি করবে। এরূপ পাক্কা শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার তদবীর সামনে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

২. অর্থাৎ এহেন শয়তানের মোকাবেলায় নম্রতা ও উদারতায় কাজ হয় না। ওর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল, আল্লাহর আশ্রয়ে এসে পড়া। এ সেই মজবুত কিল্লা, যেখানে শয়তান পৌছতে পারে না। তুমি যদি সত্যিই ইখলাস ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহকে ডাক,

৩৭. আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে– রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র[১]। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, বরং সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক[২]।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾

তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে আশ্রয় দেবেন। কেননা, তিনি প্রত্যেকেরই ডাক শুনেন এবং উত্তমরূপে জানেন, কে কতটুকু ইখলাস ও বিনয়ের সাথে তাঁকে ডেকেছে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এই আয়াতের সামঞ্জস্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লেখেন, 'কখনো অনিচ্ছায় রাগ উঠলে (বুঝতে হবে), এ শয়তানের কারসাজি।' সে চায় না, তুমি সদ্ব্যবহারে দৃঢ় থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াতের লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জন কর।

১. **পূর্বা-পর সম্পর্ক**

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের আলোচনার পাশাপাশি এখানে আসমান-যমীনে বিরাজমান কিছু নিদর্শনাদির কথা বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহর পথের 'দাঈ' আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও একত্ব এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রভৃতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বোঝাতে এসব দ্বারা সাহায্য নিতে পারবে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, একদিকে আল্লাহর বিশেষ বান্দারা নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছে, অন্যদিকে চন্দ্র, সূর্য এবং আকাশ ও পৃথিবীর বিরাট সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা চিন্তাশীল লোকদের সেই এক আল্লাহর দিকেই আসার দাওয়াত দিচ্ছে। কবি বলেন :

وفي كل شيء له آية ÷ تدل على أنه واحد

('প্রত্যেক বস্তুতে রয়েছে তাঁর নিদর্শন, যা প্রমাণ করে, তিনি একক-লা-শরীক আল্লাহ।')

সুতরাং মানুষের উচিত, জগতে বিদ্যমান এসব নিদর্শন নিয়েই মেতে না থাকা, যেমন অনেক জাতি মেতে রয়েছে। বরং সেই অনন্ত, অসীম কুদরতের মালিকের সামনে মাথা নত করা, যিনি এই নিদর্শনসমূহের স্রষ্টা এবং যাঁর হুকুমে এদের প্রকাশ ঘটেছে।

আর সম্ভবত এ বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে যে, রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য যেমন একে অন্যের বিপরীত এবং আল্লাহ তাআলা এদের মধ্যে পরিবর্তন করতে থাকেন, তদ্রূপ তাঁর এ ক্ষমতাও আছে যে, তিনি দাওয়াত ইলাল্লাহর বরকত এবং 'দাঈ' এর সৎসাহস, উদারতা ও সুমধুর ব্যবহারের ফলে শ্রোতাদের অন্তর্জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দেবেন এবং অন্ধকার অবস্থাকে একটি আলোকজ্জল পরিবেশে রূপান্তরিত করে দেবেন।

২. সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির পূজারীরাও মুখে এ কথা স্বীকার করত যে, এদের উপাসনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহরই ইবাদত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এসব

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩

৩৮. এখন ওরা যদি অহংকার করে (মুখ ফিরিয়ে নেয়), তবে যারা আপনার রবের কাছে আছে তারা তো রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকে এবং তারা ক্লান্ত হয় না[১]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৯. তাঁর নিদর্শনসমূহের আরেকটি এই যে, তুমি ভূমিকে নিস্তেজ অবস্থায় দেখতে পাও। অতঃপর আমি যখন তার উপরে পানি বর্ষণ করি, তা হয়ে ওঠে সতেজ ও স্ফীত। যিনি একে জীবিত করেন, নিশ্চয় তিনিই মৃতদের জীবিত করবেন। তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান[২]।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۭ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ

৪০. যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার নিকট গোপন নয়। আচ্ছা, যে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে সে উত্তম, না ওই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে নির্ভয়ে?

উপাসনার যোগ্য নয়– ইবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। কোন গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহ করা।

১. অর্থাৎ গর্ব ও অহংকারের কারণে যদি ওরা সত্যকে গ্রহণ না করে এবং তাওহীদের দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে না আসে, তবে না আসুক– এতে ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে, ওদের ব্যাপারে আল্লাহর কোনই পরোয়া নেই। আচ্ছা, যাঁর বড়ত্ব ও পরাক্রমের অবস্থা এই যে, নৈকট্যপ্রাপ্ত অসংখ্য ফেরেশতা দিনরাত তাঁর ইবাদতে রত এবং তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনায় মগ্ন, তারা কখনো ক্লান্তিও বোধ করেন না এবং বিরক্তও হন না– তাঁর সম্মুখে এ বেচারারা এবং এদের অহংকার কোন্ ছার! অযথা মিথ্যা অহমিকা দেখিয়ে এরা নিজেদেরই ক্ষতি করছে।

২. অর্থাৎ যমীনের দিকে লক্ষ কর– তা চুপচাপ, লাঞ্ছিত-অপমানিত এবং বিপুলভাবে অবনমিত অবস্থায় পড়ে থাকে, গ্রীষ্মের খরতাপে চতুর্দিকে ধূলা উড়তে থাকে। কিন্তু যখন এক পসলা বৃষ্টি পড়ে অমনি তার সজীবতা, সৌন্দর্য ও বসন্ত ফুটে ওঠে। এই পরিবর্তন কার কুদরতী হাতের ছোঁয়ায় ঘটে? যে আল্লাহ এভাবে মৃত যমীনকে জীবিত করে দিলেন, তিনি কি মৃত মানুষের দেহে পুনরায় জীবন দান করতে পারবেন না? এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি মৃত অন্তরগুলিকে দাওয়াত ইলাল্লাহর প্রভাবে নতুন জীবন দান করতে পারেন না? নিশ্চয় তিনি সব কিছু করতে পারেন, তাঁর শক্তির সামনে বাধা-বিপত্তি বলে কিছু নেই।

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

তোমরা যা ইচ্ছা করে যাও। নিশ্চয় তিনি তোমরা যা কিছু কর তার সম্যক দ্রষ্টা[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ

৪১. যারা 'উপদেশবাণী'কে অস্বীকার করেছে তা তাদের নিকট আসার পরও, (তারাই তাতে বক্রতা অবলম্বন করে)[২]। অথচ তা তো এক দুর্লভ গ্রন্থ–

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

৪২. যাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়– না তার সামনে থেকে, না পিছন থেকে। (তা) প্রজ্ঞাবান, সমস্ত প্রশংসার অধিকারীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ[৩]।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার দাঈ'দের মুখে তাঁর নাযিলকৃত আয়াতসমূহ শুনে এবং কালের পাতায় তাঁর সৃষ্টিগত নিদর্শনসমূহ দেখেও যারা বক্রতা থেকে ফিরে আসে না এবং অমূলক সংশয়-সন্দেহের অবতারণা করে সোজা-সরল কথাকেও বক্র বানায়, অথবা অযথা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে তার ভুল অর্থ দাঁড় করায়, অথবা মিথ্যা ওযর-বাহানা তৈরি করে আয়াতগুলি মানতে অস্বীকার করে– এমন বক্র লোকদের আল্লাহ উত্তমরূপে চেনেন। হয়তবা সেই লোকেরা নিজেদের প্রতারণা ও চালাকির কারণে খুব গৌরব বোধ করে, কিন্তু আল্লাহর নিকট ওদের কোন চালাকি গোপন নয়। যখন তাঁর সম্মুখীন হবে তখন বুঝতে পারবে। বর্তমানে তিনি ঢিল দিয়ে রেখেছেন, তিনি অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে ধরেন না। এ জন্যই সামনে বলে দিয়েছেন– اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ –অর্থাৎ ঠিক আছে, যা তোমাদের বুঝে আসে করে যাও। কিন্তু স্মরণ রাখবে, তোমাদের সকল কীর্তিকলাপ তাঁর গোচরে রয়েছে, একদিন একসঙ্গে সবগুলোর ফল ভোগ করতে হবে।

এখন নিজেই চিন্তা করে দেখ– এক ব্যক্তি, যে নিজের দুষ্কৃতির বদৌলতে প্রজ্বলিত আগুনে পতিত হবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে স্বীয় নেকী ও সরল পথের অনুসরণের বদৌলতে চিরকাল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে– এ দু'য়ের মধ্যে কে শ্রেয়?

২. অর্থাৎ ওরা অযথা বক্র স্বভাবের কারণে উপদেশবাণী (তথা কুরআন)-এ সন্দেহের সৃষ্টি করে। অথচ এর মধ্যে মিথ্যার প্রবেশ কোন দিক থেকেই সম্ভব নয়। এই উপদেশবাণীটি কেমন? তা এক সুস্পষ্ট এবং পরিপক্ক ও সুরক্ষিত কিতাব, যাকে নির্বোধ বা পাপাচারী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

৩. অর্থাৎ এমন মহান সত্ত্বার অবতারিত কিতাবে মিথ্যা আসবে কী করে? এবং যে কিতাবের সংরক্ষণের যিম্মাদার তিনি নিজে, বাতিল কী করে তার কাছে ভিড়তে পারে?

৪৩. আপনাকে সে কথাই বলা হয়, যা আপনার পূর্বের রাসূলগণকে বলা হয়েছিল। নিশ্চয় আপনার রব ক্ষমাশীল, আবার মর্মন্তুদ শাস্তিদাতাও[১]।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৪৪. আমি যদি একে অনারব ভাষার কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই ওরা বলত, 'এর আয়াতগুলো স্পষ্ট করা হল না কেন? কী! আজমী ভাষার (কিতাব) আর আরবী ভাষার (রাসূল)[২]?' আপনি বলুন, 'তা ঈমানদারদের জন্য হেদায়াত ও (রোগের) শেফা[৩]।' আর যারা ঈমান আনে না, ওদের কানে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন ওদের জন্য অন্ধত্ব[৪]।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْ لَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ

১. অর্থাৎ আপনার সঙ্গে কাফিরদের যে আচরণ, পয়গম্বরদের সঙ্গে প্রত্যেক যুগের কাফেরদের আচরণ এমনই ছিল। পয়গম্বরগণ সর্বদা কল্যাণকামিতা প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু এর উত্তরে ওরা তাঁদেরকে হরেক রকমের কষ্ট দিয়েছে। তখন পয়গম্বরগণ যেভাবে সবর করেছেন, আপনিও সবর করতে থাকুন। পরিণতিতে, কিছু লোক তওবা করে সৎপথে এসে যাবে, যাদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে ক্ষমা। আর কিছু লোক নিজেদের বক্রতা ও জিদের উপর কায়েম থাকবে, যারা অবশেষে বেদনাদায়ক শাস্তির যোগ্য হবে।

২. কোন কথা মানতে না চাইলে মানুষ হাজারো হিলা-বাহানা বের করতে পারে। মক্কার কাফেররা আর কিছু না পেয়ে বলতে লাগল, আমরা কুরআনকে আরবী ভাষাভাষী পয়গম্বরের মু'জিযা তখনি স্বীকার করতাম, যখন তা আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নাযিল হত। — কিন্তু এমন করা হলে তখন ওরা অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করত, মিয়া! এটা কত বড় অসংগতি যে, রাসূল তো আরবী ভাষার এবং তাঁর জাতি ও তাঁর শ্রোতারাও আরবী ভাষাভাষী, কিন্তু তার সঙ্গে প্রেরিত কিতাব এমন ভাষার যে, আরবী ভাষার লোকেরা তার একটি অক্ষরও বুঝতে পারে না।

৩. অর্থাৎ অনর্থক ও বাজে সন্দেহ তৈরি করলে কখনো তা শেষ হবে না। তবে সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, এ পবিত্র কিতাব ঈমানদার ও আমলকারীদেরকে অতি বিস্ময়কর হেদায়াত, অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করে এবং যুগ-যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা যে ব্যাধিতে আক্রান্ত, তার নিরাময় করে তাদের সুস্থ ও সতেজ করে তোলে।

৪. অর্থাৎ বাদুড়ের চোখ যেমন সূর্যের আলোতে অন্ধ হয়ে যায়, এই কাফেররাও কুরআনের আলোতে কিছু দেখে না। এতে কুরআনের কোন ত্রুটি নেই। বরং কাফেরদের উচিত, নিজেদের দৃষ্টির দুর্বলতা ও ত্রুটি অনুভব করে এর চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

أُولَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ۝٤٤

ওদের (যেন) দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে[১]।

[রুকূ - ৬]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ۝

৪৫. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতে মতভেদ করা হল[২]। আর যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্বনির্ধারিত না থাকত, তবে ওদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা অবশ্যই করে দেওয়া হত[৩]। নিশ্চয় ওরা কুরআন সম্পর্কে এমন সন্দেহে পতিত যা (ওদের) অস্থিরতায় (বা : দ্বিধা-দ্বন্দ্বে) ফেলে রাখে[৪]।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ۝

৪৬. যে সৎকর্ম করল, নিজের কল্যাণের জন্যই (করল); আর যে মন্দকর্ম করল, (এর অকল্যাণ) তার উপরেই বর্তাবে। আর আপনার রব বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন[৫]।

---

১. কাউকে দূর থেকে ডাকলে শোনে না, আর শুনলেও ভাল করে বোঝে না। তদ্রূপ, কুরআনের অস্বীকারকারীরাও সত্য ও সত্যের উৎস থেকে এতই দূরে পড়ে আছে যে, সত্যের আওয়াজ ওদের অন্তরের কানে পৌঁছে না। আর কখনো পৌঁছলেও তার সঠিক অর্থ বোঝে না।

২. অর্থাৎ বর্তমানে যেমন কুরআনের মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে, তদ্রূপ ইতিপূর্বে তাওরাত সম্পর্কেও মতভেদ হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে কী পরিণাম হয়েছিল, তা দেখে নাও।

৩. পূর্বনির্ধারিত কথা এটাই যে, চূড়ান্ত ফয়সালা আখেরাতে হবে।

৪. অর্থাৎ অবান্তর সন্দেহ-সংশয় ওদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, সর্বদা অন্তরে অশান্তি অনুভব করছে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে জুলুমের লেশমাত্র নেই। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমল দেখতে পাবে– যেরূপ করবে, তাই সম্মুখে আসবে। কারো সৎকর্ম তাঁর দরবারে বিনষ্ট হবে না, একজনের অসৎকর্ম অন্য জনের উপর চাপানোও হবে না।

পূর্বাপর সম্পর্ক : যেহেতু নেকী ও বদীর পরিপূর্ণ প্রতিফল কিয়ামতের দিন পাওয়া যাবে এবং কিয়ামত কবে আসবে– কাফেররা প্রায়ই এ প্রশ্ন করত, তাই সামনে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে– إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ الخ

পারা - ২৫

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ۝

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই উপর ন্যস্ত করা হয়[১]। তাঁর অজ্ঞাতসারে ফলমূল নিজের খোসা থেকে বের হয় না, কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না ও সন্তানও প্রসব করে না[২]। যেদিন তিনি ওদের ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়[৩]?' সেদিন ওরা বলবে, 'আমরা আপনাকে জানিয়েছি, 'আমাদের মধ্যে কেউ (তা) স্বীকার করে না[☆৪]।'

---

১. অর্থাৎ একমাত্র তিনিই জানেন, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে। বড় থেকে বড় নবী এবং ফেরেশতাও তার সময় নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না। যাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক, এ কথাই বলবেন– ما المسئول عنها بأعلم من السائل (জিজ্ঞাসাকারী থেকে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশি জানে না।)

২. অর্থাৎ আল্লাহর ইলম সর্বব্যাপী– তাঁর ইলমের বাইরে কোন খেজুর নিজ খোসা থেকে, কোন শস্য তার শীষ থেকে এবং কোন ফল বা ফসল নিজ আবরনী থেকে বের হয় না। অনুরূপ কোন নারী বা কোন মাদী জন্তুর পেটে যে বাচ্চা বর্তমান এবং যা সে প্রসব করে– সবই আল্লাহর ইলম অনুযায়ী হয়।

ঠিক এভাবে বুঝে নাও, দুনিয়ার ফলাফল হিসাবে যে আখেরাতের প্রকাশ এবং কিয়ামতের সংঘটন অনিবার্য, তার সময়ও কবে আসবে তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। কোন মানুষ বা ফেরেশতা এর খবর জানে না, আর তার জন্য এ খবর রাখার জরুরতও নেই। মানুষের জন্য জরুরী হচ্ছে, আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী কিয়ামতে বিশ্বাস রাখা এবং সেই দিনের ফিকির করা, যেদিন কোন শরীক কাজে আসবে না এবং কোন মুক্তিদাতা পাওয়া যাবে না।

৩. অর্থাৎ যাদেরকে প্রভুত্বে আমার শরীক স্থির করতে, এখন ডাক দেখি! তারা কোথায়?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমাদের কেউ (তাদের) দেখছে না।'

৪. অর্থাৎ আমরা তো আপনাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, আমাদের মধ্যে এমন কোন আত্মস্বীকৃত অপরাধী নেই, যে শিরক করার অপরাধ স্বীকার করতে প্রস্তুত আছে! (অর্থাৎ অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে মিথ্যা বলবে এবং বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করবে।)

আর কেউ কেউ شهيد কে شاهد অর্থে ধরেছেন। তাদের নিকট আয়াতের মর্ম হল, 'আমাদের কেউ শরীকদের এখানে দেখছে না।'

৪৮. আর ওরা ইতিপূর্বে যাদের ডাকত তারা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে এবং ওরা বুঝে নেবে, ওদের কোনো রক্ষা নেই[১]।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٤٨﴾

৪৯. মানুষ মঙ্গল প্রার্থনায় ক্লান্ত হয় না। আর যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে চরম হতাশ, অতিশয় নিরাশ হয়ে পড়ে।

لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ﴿٤٩﴾

৫০. আর যদি আমি তাকে আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তাকে কোন কষ্ট স্পর্শ করার পর, তবে সে অবশ্যই বলতে শুরু করে, 'এ আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর যদি আমি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হইও, তবে নিশ্চয় আমার জন্য তাঁর নিকট কল্যাণই থাকবে[২]।'

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে যাদেরকে আল্লাহর শরীক হিসাবে ডাকত, আজ কোথাও তাদের পাত্তা নেই। তারা নিজেদের উপাসনাকারীদের সাহায্যে আসছে না। আর উপাসনাকারীরাও এখন আর তাদেরকে ডাকার কথা চিন্তা করছে না। কারণ, ওরাও বুঝতে পেরেছে, খোদায়ী শাস্তি থেকে বাঁচার কোন পথ নেই এবং নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। অতএব আজ ওরা নিরাশ হয়ে যাবে এবং যাদের পক্ষ নিয়ে পয়গম্বরদের বিরুদ্ধে লড়াই করত, আজ তাদের প্রতি সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে থাকবে।

২. অর্থাৎ মানুষের স্বভাব অদ্ভুত প্রকৃতির। যখন দুনিয়ায় একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখতে পায় এবং কিছু আরাম-আয়েশ ও সুস্থতা ভাগ্যে জোটে, তখন লোভের কারণে আরো বেশি স্বাদ ভোগ করতে চায়। কোন কিছুতেই তার লোভের পেট ভরে না। মনে হয় যেন সম্ভব হলে সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ নিজে একা গ্রাস করে নেবে। আর যদি সামান্য কোন দুঃখ-কষ্ট এসে পড়ে এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে নিজের প্রতিকূলে দেখে, তখন নিরাশ ও হতাশ হতেও দেরি লাগে না, তার অন্তর দ্রুত নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, তার দৃষ্টি শুধু সম্মুখের উপায়-উপকরণের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে। যিনি উপায়-উপকরণেরও স্রষ্টা, সেই সর্বশক্তিমানের উপর আস্থা থাকে না। অথচ তিনি চাইলে এক মুহূর্তে সমস্ত উপায়-উপকরণের রোখ্ পালটে দিতে পারেন।

(وَلَئِنْ اَذَقْنَا رَحْمَةً..) উক্ত হতাশার পর যদি আল্লাহ বালা-মুসীবত দূর করে নিজ মেহেরবানীতে পুনরায় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে দেন, তখনই সে বলতে শুরু করে– هذا لي অর্থাৎ আমি অমুক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম। তার কারণে এবং আমার জ্ঞান-গরিমার ফলে এমনটিই হওয়ার

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ۝

অতএব আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে ওদের (নিজেদের) কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করব এবং ওদের আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি[১]।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ۝

৫১. আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও স্বীয় পার্শ্ব পরিবর্তন করে ফেলে। আর যখন তাকে স্পর্শ করে অনিষ্ট, তখন সে লম্বা-চওড়া দো'য়া করতে থাকে[২]।

কথা। মোটকথা, আল্লাহর মেহেরবানী সে ভুলে যায় এবং কয়েক মিনিট পূর্বে তার অন্তরে নিরাশার যে অবস্থা ছিল, তাও উধাও হয়ে যায়। ফের আরাম-আয়েশের নেশায় এমন মত্ত হয়ে যায় যে, ভবিষ্যতে আবারও যে কোন বিপদ ও কষ্ট আসতে পারে, এই আশঙ্কা পর্যন্ত থাকে না। বরং মনে করে, সর্বদা এই হালেই থাকবে।

(وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْ..) আর যদি এসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে কখনো কিয়ামতের নাম শুনতে পায়, তখন বলে, 'এ জিনিস কখনো হবে বলে আমি মনে করি না। আর যদি বাস্তবেই এমনটি হয় এবং আমাকে স্বীয় প্রভুর নিকট ফিরে যেতেই হয়, তবুও আমার বিশ্বাস, সেখানে আমার পরিণাম উত্তম হবে। আমি যদি আল্লাহর নিকট মন্দ ও অযোগ্য হতাম, তবে দুনিয়াতে এই ভোগ-বিলাসের আনন্দ আমাকে কেন দেওয়া হল? সুতরাং আখেরাতেও আমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হবে বলে আশা করি।

১. অর্থাৎ ঠিক আছে, এ কথা ভেবে আনন্দিত হও যে, এমন অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার সত্ত্বেও সেখানে মজা লুটবে! কিন্তু সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারবে, কাফেরদের কী কঠোর শাস্তিই না ভোগ করতে হবে এবং সারা জীবনের কীর্তিকলাপ সম্মুখে এসে যাবে!

২. অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত নে'য়ামতরাশি ভোগ করার সময় নে'য়ামতদাতার দানকে স্বীকার করা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে আল্লাহর দিক থেকে ফিরে যায়। এরপর যখন কোন কষ্ট ও বিপদ আসে, তখন আল্লাহরই সামনে হাত প্রশস্ত করে লম্বা-চওড়া দোয়ায় লিপ্ত হয়। শরম লাগে না যে, এখন তাঁকে কোন্ মুখে ডাকবে! মজার ব্যাপার এই যে, কখনো কখনো উপায়-উপকরণকে নিজের প্রতিকূলে দেখে ভিতর থেকে মন হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু এই অবস্থায়ও দিশাহারা ও পেরেশান হয়ে দো'য়ার হস্ত আপনা আপনি আল্লাহর দিকে উঠে যায়! এর অর্থ হল, অন্তরে আছে নিরাশা আর মুখে 'আয় আল্লাহ'।

শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এসব হল মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিবরণ– বিপদে ধৈর্য নেই, সুখে শোকর নেই।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ ۝٥٢

৫২. আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো, যদি কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তারপরও তোমরা একে অস্বীকার কর– তবে ওর চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে, যে ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত[১]?'

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ

৫৩. আমি শীঘ্রই ওদেরকে আমার নিদর্শনাদি দেখাতে থাকব– পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে এবং স্বয়ং ওদের মধ্যে। যাতে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তা (কুরআন) সত্য[২]।

---

১. ইতিপূর্বে মানব স্বভাবের বিস্ময়কর চিত্র অঙ্কন করত তার দুর্বলতা ও ব্যাধিসমূহের প্রতি খুবই কার্যকর উপায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এখন সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে অবহিতকারী এবং পরিণামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী এই যে কিতাব (কুরআন), তা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে (আর বাস্তবে বিষয়টি এমনই), তা সত্ত্বেও তোমরা তাকে না মান এবং এমন মহামূল্যবান নসীহতকে অস্বীকার করে নিজ পরিণামের ফিকির না কর, বরং সত্যের বিরোধিতা করে করে বহু দূরে চলে যাও– তবে এর চেয়ে গুরুতর গোমরাহী ও ক্ষতিগ্রস্ততা আর কিছু হতে পারে কি?

২. অর্থাৎ কুরআনের সত্যতার অনেক দলীল-প্রমাণ তো আপন জায়গায় আছেই, তবে এখন আমি এই কাফেরদেরকে তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের চতুর্দিকে সমগ্র আরবে এবং সারাবিশ্বে কুদরতের এমনসব নিদর্শন দেখাব, যার দ্বারা কুরআন ও কুরআন-বাহকের সত্যতা একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে। –সেই নিদর্শনগুলি কী? তা হল ইসলামের বিরাট ও বিস্ময়কর বিজয়সমূহ, যা বস্তুগত উপায়-উপকরণের সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যেমন: মক্কার কাফেররা বদরের যুদ্ধে স্বয়ং নিজেদের মধ্যে, তারপর মক্কাবিজয়ে আরবের কেন্দ্রস্থলে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে পুরো দুনিয়াতে এসব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে।

এমনও হতে পারে, آيَات দ্বারা আল্লাহর কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাদি উদ্দেশ্য। মানুষ যদি চিন্তা করে দেখে, তবে নিজেদের সত্তার মধ্যে এবং নিজেদের অস্তিত্বের বাইরে সমগ্র বিশ্বের বস্তুনিচয়ের মধ্যে এমনসব নিদর্শন দেখতে পাবে, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার একত্ব ও বড়ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তদুপরি তার মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্যসমূহের সমর্থন লাভ হয়। কেননা, এই বিশ্বজগতে বিরাজমান ও কার্যকর খোদায়ী রীতি-নীতি (سنن إلهية) ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি (نواميس فطرية) সম্পর্কে কুরআন যা-কিছু বর্ণনা করেছে– তা সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত।

উল্লেখ্য, সৃষ্টিজগতের উক্ত রহস্যাদি এবং মানুষের অস্তিত্বে ও এর বাইরে সমগ্র জগতে বিরাজমান নিদর্শনাদি যেহেতু হঠাৎ করেই মানুষের সামনে স্পষ্ট ও প্রকাশিত হয় না; বরং

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

এ কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার রব সকল বিষয়ে সাক্ষী[১]?

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

৫৪. শুনে রাখ, ওরা আপন রবের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত। শুনে রাখ, তিনি প্রত্যেক জিনিসকে পরিবেষ্টন করে আছেন[২]।

সময়ে-সময়ে ও ধীরে-ধীরে তা উদ্ভাসিত হতে থাকে, তাই আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে– سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ (আমি তাদেরকে নিদর্শনাদি দেখাতে থাকব)।

১. অর্থাৎ ধরে নাও, কুরআনের সত্যতাকে কেউই মানল না, তবে এক আল্লাহর সাক্ষ্য কি কম? তিনি প্রত্যেক বস্তুর সাক্ষী এবং প্রত্যেক বস্তুতে চিন্তা করলে তাঁর সাক্ষ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. অর্থাৎ ওরা এই ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছে যে, কখনো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং তাঁর সম্মুখে যেতে হবে না। অথচ আল্লাহ তাআলা সর্বদা সবকিছু ঘিরে আছেন। তাঁর মুঠি ও ঘেরাও থেকে ওরা কখনো বের হয়ে যেতে পারবে না। মৃত্যুর পর যদি ওদের দেহের অণুপরমাণু মাটিতে মিশে যায় অথবা পানিতে ভেসে যায় কিংবা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তবুও এক এক অণুর উপর আল্লাহর ইলম ও ক্ষমতা ব্যাপ্ত, সেই অণুগুলি জমা করে নতুন করে জীবিত করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

সূরা শূরা

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা ৪২ । ৫৩ আয়াত । ৫ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٥٣، رُكُوعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ①

১. হা-মীম।

عٓسٓقٓ ②

২. আইন-সীন-কাফ।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩. এভাবেই আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তী (রাসূল)দের প্রতি ওহী পাঠান পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④

৪. আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। আর তিনিই সমুন্নত, মহান[১]।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ

৫. আসমানসমূহ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়[২];

---

১. অর্থাৎ (অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও সুন্দর বিষয়াবলিসম্বলিত) এই সূরা যেমন আপনার প্রতি ওহী করা হচ্ছে, তদ্রূপ আপনার প্রতি ও অন্য নবীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা আল্লাহ তাআলার শ্বাশত নীতি। এতে তাঁর হেকমত ও হুকুমতের শান প্রকাশ পায়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রভাবে অথবা অসংখ্য ফেরেশতার চাপে বা তাঁদের অত্যধিক যিকিরের ফলে যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়, তাতে আকাশ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আসমানসমূহে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও এমন নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা সেজদাবনত না রয়েছেন। (জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১২)

আর কেউ কেউ আয়াতের এই অর্থ করেছেন যে, মুশরিকরা যে আল্লাহ তাআলার জন্য অংশীদার ও পুত্র-কন্যা স্থির করে, এটা আল্লাহ পাকের দরবারে এমন জঘন্য ধৃষ্টতা যে, এর কারণে সকল আসমান ফেটে চুরমার হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা সূরা মারয়ামে (৯০) বলেছেন– تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (মনে হয়, এখনই আকাশমণ্ডলী ফেটে যাবে, যমীন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধ্বসে পড়বে– কারণ, ওরা দয়াময়ের

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤

আর ফেরেশতারা তাঁদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে[১]। শুনে রাখ, আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

৬. যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ওদের পর্যবেক্ষণ করছেন। আর আপনি ওদের যিম্মাদার নন[৩]।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ

৭. এভাবেই আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষার কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি কেন্দ্রীয় জনপদ (অর্থাৎ মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদের সতর্ক করেন[৪] এবং সতর্ক করেন সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে,

---

সন্তান আছে বলে দাবি করে।) কিন্তু আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত এবং ফেরেশতাদের তাসবীহ ও এস্তেগফারের বরকতে এই বিশ্বব্যবস্থা টিকে আছে।

১. অর্থাৎ দোয়া করেন, আল্লাহ তাআলা যেন মুমিনদের গোনাহ-খাতা মাফ করেন এবং দুনিয়ায় কাফেরদের অকস্মাৎ পাকড়াও করত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও বরবাদ না করেন (বরং তাদের অবকাশ দেন)।

২. অর্থাৎ তিনি নিজ মেহেরবানীতে ফেরেশতাদের দোয়া কবুল করত মুমিনদের গোনাহ-খাতা মাফ করেন এবং কাফেরদের এক বিশেষ সময়ের জন্য অবকাশ দেন। নতুবা সমগ্র দুনিয়া চোখের পলকে সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত।

৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে মুশরিকদের অবকাশ দেওয়া হয় বলে এমন মনে করো না, ওরা সর্বদার জন্য বেঁচে গেল। বরং ওদের সকল আমল ও অবস্থা আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত আছে। যথাসময়ে তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে। ওরা কেন ঈমান আনে না এবং ঈমান না আনা সত্ত্বেও ওদের তৎক্ষণাৎ কেন ধ্বংস করে দেওয়া হয় না— আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। এসব দায়-দায়িত্ব আপনার নয়। আপনার দায়িত্ব শুধু সত্যের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়া। বাকিটা আল্লাহর কাজ। সময় আসলে তিনি ওদের পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করবেন।

৪. ام القرى– বলতে মক্কা শরীফ উদ্দেশ্য। কারণ, সমগ্র আরবের মানুষ সেখানেই সমবেত হয়ে থাকে এবং সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর ঘর সেখানেই অবস্থিত। আর এ ঘরই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম ইবাদতস্থল। বরং কিছু রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে সেখান থেকে বিস্তার করতে আরম্ভ করেন, যেখানে কাবাঘর অবস্থিত। (তাফসীরে তবারী ৯/৪০৩-৪০৪)

আর মক্কার আশপাশ বলতে প্রথমে আরব দেশ, তারপর সমগ্র দুনিয়া উদ্দেশ্য।

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ ⑦

যাতে কোন সন্দেহ নেই। (সেদিন) একদল যাবে জান্নাতে, আর একদল জ্বলন্ত আগুনে[১]।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ⑧

৮. আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে অবশ্যই একই উম্মত বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যারা অপরাধী, তাদের কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সাহায্যকারী[২]।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑨

৯. ওরা কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে? বস্তুত আল্লাহই অভিভাবক, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান[৩]।

---

১. অর্থাৎ আপনি সতর্ক করুন যে, এমন একদিন আসবে, যখন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলে আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য একত্র হবে। এ একটি নিশ্চিত ও স্থিরীকৃত বিষয়, যার ব্যাপারে কোন দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ নেই। সেদিনের জন্য মানুষের প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। সেদিন সমগ্র মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হবে– এক ভাগ বেহেশতী ও এক ভাগ দোযখী। এখন চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, তোমাদের কোন্ দলে শামিল হওয়া উচিত এবং তাতে শামিল হওয়ার জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য।

২. তাঁর অবশ্যই ক্ষমতা ছিল, তিনি ইচ্ছা করলে সকলকে এক দল বানিয়ে দিতে এবং একই পথের অনুসারী করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর হেকমতের দাবি হল, তাঁর রহমত ও গযব উভয় গুণের প্রকাশ ঘটা। তাই বান্দাদের হাল-অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা রেখেছেন– কাউকে তাঁর আনুগত্যের কারণে রহমতের পাত্র বানিয়েছেন, আর কাউকে তাঁর নাফরমানী ও অবাধ্যতার কারণে রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন। যারা রহমত থেকে মাহরূম হয়ে তাঁর গযবের যোগ্য হয়েছে আর আল্লাহর হেকমতের দাবি হচ্ছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, তাদের কোথাও ঠাঁই নেই, কোন বন্ধু নেই, কোন সাহায্যকারী নেই, যে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে।

৩. অর্থাৎ বন্ধু ও সাহায্যকারী বানাতে হলে আল্লাহকেই বানাও, যিনি সব কিছু করতে পারেন। এমন কি, তিনি মৃতদের জীবিত করতে পারেন এবং সকল বিষয়ের ক্ষমতা রাখেন। ওই বেচারারা (মূর্তিগুলি) অক্ষম ও অসহায়। তারা তোমাদের কী সাহায্য করবে?

[রুকূ - ২]

وَمَا اخۡتَلَفۡتُمۡ فِیۡهِ مِنۡ شَیۡءٍ فَحُكۡمُهٗۤ اِلَی اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّیۡ عَلَیۡهِ تَوَكَّلۡتُ ٭ وَاِلَیۡهِ اُنِیۡبُ ﴿۱۰﴾

১০. তোমরা যে কোন বিষয়ে মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর যিম্মায়[১]। এই আল্লাহই আমার রব। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে রুজু হই[২]।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّمِنَ الۡاَنۡعَامِ اَزۡوَاجًا ۚ یَذۡرَؤُكُمۡ فِیۡهِ ؕ لَیۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ ۚ

১১. (তিনি) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদি পশুর মধ্যেও (সৃষ্টি করেছেন) জোড়া[৩]। এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন[৪]। তাঁর মত নয় কোনো কিছুই[৫]।

---

১. অর্থাৎ সকল বিবাদ-বিরোধের ফয়সালা তাঁরই নিকট সোপর্দ হওয়া উচিত। আকীদা-বিশ্বাস হোক বা বিধি-বিধান, ইবাদত-বন্দেগী হোক বা লেনদেন– যে কোন বিষয়ে মতভেদ হলে তার সর্বোত্তম মীমাংসা আল্লাহর হাতে। তিনি সৃষ্টিগত দলীল-প্রমাণের দ্বারা কিংবা স্বীয় কিতাবের মাধ্যমে বা নিজ রাসূলদের জবানীতে, স্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে যে বিষয়ে যে ফয়সালা করে দেন, যে হুকুম দেন– তাতে কিছুমাত্র আপত্তি করার কোন অধিকার বান্দার নেই।

অতএব (এই মৌলিক নীতির আলোকে চিন্তা করে দেখ), আল্লাহ তাআলা সর্বদা স্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে এবং নিদর্শনাদি দেখিয়ে তাওহীদের নির্দেশ দিয়ে এসেছেন, যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। এ অবস্থায় বান্দার পক্ষে কী করে জায়েয হবে– এমন অকাট্য ফয়সালা ও হুকুমের বিরোধিতা করা এবং অমূলক সন্দেহ বের করত আল্লাহর ফয়সালা অমান্য করা?

২. অর্থাৎ আমি তাঁরই উপর সর্বদা ভরসা করি এবং সকল ব্যাপারে তাঁরই দিকে রুজু করে থাকি।

৩. অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও জোড়া অর্থাৎ নর ও মাদী সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তারাও তোমাদের উপকারে আসে।

৪. অর্থাৎ মানবজাতির পৃথক এবং জীবজন্তুর পৃথক জোড়া সৃষ্টি করে এর মাধ্যমে তাদের অনেক অনেক বংশ ছড়িয়ে দিয়েছেন, যারা সমগ্র পৃথিবীর বুকে নিজেদের জীবিকা উপার্জনে চেষ্টা-তদবীর করছে।

৫. অর্থাৎ তাঁর কোন সমতুল্য নেই— সত্তার মধ্যেও না, গুণাবলির মধ্যেও না। এমন কি কারো হুকুম ও ফয়সালা তাঁর হুকুম-আহকাম ও ফয়সালার মত নয়। তাঁর দীনের ন্যায় কোন ধর্ম নেই। এবং তাঁর কোন জোড়াও নেই, সমকক্ষও নেই, সমশ্রেণীও নেই।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑪

আর তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা[১]।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑫

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে অবহিত[২]।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দীনের সে বিষয়ই বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে[৩]—যে, তোমরা

---

১. অর্থাৎ তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন । তবে তাঁর দেখা ও শোনা সৃষ্টিজীবের দেখা ও শোনার মত নয়। তাঁর সত্তার মধ্যে কামেল গুণাবলি সবই আছে, কিন্তু কোন গুণই এমন নয়, যার পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা যেতে পারে। কেননা, তাঁর তুলনা কোথাও নেই। তিনি সৃষ্টির সাদৃশ্য ও উপমা থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র। তাই তাঁর গুণাবলির স্বরূপ কী করে বুঝে আসবে?

২. সমস্ত ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই হাতে– কোন্ ভাণ্ডার থেকে কাকে কতটুকু দান করবেন, তা তাঁরই ইচ্ছা ও ক্ষমতাধীন। সকল জীবকে তিনিই রুযী দেন, কিন্তু পরিমান নির্ধারণ নিজ হেকমত অনুযায়ী করে থাকেন। কে কোন্ বস্তুর কতটুকু পাওয়ার যোগ্য, তাকে কী পরিমাণ দেওয়া সমীচীন হবে, তা তিনিই জানেন। আর রুযী সম্বন্ধে যে নিয়ম, অন্যান্য বস্তু দানের ক্ষেত্রেও সেই নীতিই অনুসৃত হয়।

৩. আদম আলাইহিস সালামের পর সর্বপ্রথম রাসূল হলেন হযরত নূহ (আ)। বরং বলা উচিত, শরী'য়তের হুকুম-আহকাম বিধিবদ্ধ করনের ধারা মূলত তাঁর থেকেই শুরু হয়। আর সর্বশেষ নবী হচ্ছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর মাধ্যমে রিসালাত ও নবুওয়াতের ধারা সম্পূর্ণ ও সমাপ্ত হয়। মাঝে যে সকল নবী ও রাসূলের আগমন হয়, তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সমধিক প্রসিদ্ধ, যাঁদের অনেক অনুসারী প্রত্যেক যুগে পরিলক্ষিত হয়। এই পাঁচজনকে 'উলুল-আযম' (শীর্ষস্থানীয়) পয়গম্বর বলা হয়।

যা হোক, এখানে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টরূপে বলেছেন, দীন মৌলিকভাবে সর্বকালে একই রয়েছে। কেননা, 'আকায়েদ', 'আখলাক' ও 'দিয়ানাতের উসূল' (দীনের অন্য মৌলিক বিষয়াদি)– এসবের মধ্যে সবাই অভিন্ন। হ্যাঁ, কোন কোন শাখা বিষয়ে যুগোপযোগী কিছু পার্থক্য হয়েছে এবং দীন কায়েম করার পথ-পদ্ধতি প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তাআলা ভিন্ন ভিন্ন দান করেছেন। যেমন অন্যত্র বলেছেন– لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (আমি তোমাদের প্রত্যেক দলকে [ভিন্ন] জীবনবিধান ও পথ-পদ্ধতি দান করেছি —মায়েদা : ৪৮)

الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⑬

দীন কায়েম কর এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করো না[১]। মুশরিকদের কাছে সে বিষয় খুবই কঠিন, যার প্রতি আপনি ওদের আহবান করছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের দিকে টেনে নেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে নিজের দিকে পথ দেখান[২]।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ

১৪. ওরা ওদের নিকট জ্ঞান আসার পরই মতভেদ সৃষ্টি করেছে– পরস্পরের জিদের কারণে। আর যদি একটি কথা না থাকত, যা আপনার

---

১. অর্থাৎ সকল নবী ও তাঁদের উম্মতের প্রতি হুকুম হয়েছে, তারা যেন আল্লাহর দীনকে নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা (সর্ব উপায়ে) কায়েম রাখে এবং দীনের মধ্যে কোন প্রকার বিভেদ সৃষ্টি না করে।

২. অর্থাৎ আপনি যে একত্ববাদের ধর্মের প্রতি মানব জাতিকে দাওয়াত দেন, মুশরিকদের জন্য তা খুবই দুর্বিসহ। অথচ আপনি তো কোন নতুন ও অভিনব বিষয় ওদের সামনে পেশ করছেন না, যা ইতিপূর্বে কেউ পেশ করেনি। তাওহীদের ন্যায় পরিষ্কার, যুক্তিসংগত ও সর্বসম্মত বিষয়ও দুর্বিসহ মনে হওয়া এবং তার মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি করা— এর চেয়ে বড় মূর্খতা ও হতভাগ্যের বিষয় আর কী হবে?

الله يجتبي إليه ...

আসল কথা হল, হেদায়াত প্রভৃতি সবই আল্লাহর হাতে। বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, বাছাই করে নিজের দিকে টেনে নেন এবং নিজ রহমত ও অনুগ্রহে নৈকট্য ও কবুলিয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন। আর যারা নিজেদের উত্তম যোগ্যতা বলে তাঁর অভিমুখী হয় ও তাঁর পথে মেহনত-মুজাহাদা করে, তাদের মেহনতকে সফল করা এবং তাঁদেরকে সাহায্য ও কামিয়াব করাও তাঁরই কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (আপনার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। ওদের নেই মনোনয়নের ক্ষমতা – কাসাস, আয়াত ৬৮)। তিনি আরো বলেন– اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰۤئِكَةِ رُسُلًا وَّ مِنَ النَّاسِ (আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বার্তাবাহক মনোনীত করেন এবং মানুষের মধ্য থেকেও –হজ্জ, আয়াত ৭৫) — আরো বলেন– وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (আর যারা আমার জন্য সাধনা করবে, আমি অবশ্যই তাদের দেখিয়ে দেব আমার পথ। –আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

যা হোক, আল্লাহ স্বীয় হেকমত অনুসারে যার হেদায়াত চান, সে-ই হেদায়াত পেতে পারে এবং সে-ই সফল হতে পারে।

سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ۝

রবের পক্ষ থেকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য পূর্বনির্ধারিত- তবে ওদের মধ্যে অবশ্যই মীমাংসা করে দেওয়া হত। আর ওদের পর যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিস বানানো হয়েছে, নিঃসন্দেহে তারাও তার বিষয়ে সন্দেহে পতিত, যা (তাদের) অস্থিরতায় (বা : দ্বিধা-দ্বন্দ্বে) ফেলে রেখেছে[১]।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ

১৫. অতএব আপনি ওই বিষয়ের দিকেই আহবান করে যান এবং অবিচল থাকুন যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। আপনি ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আর বলুন, 'আমি সেই কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ-

---

১. অর্থাৎ তাওহীদ ও দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং আসমানী কিতাবগুলিতে বিকৃতিসাধন করেছে, তারা কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা অস্পষ্টতার কারণে এরূপ করেনি। এমন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট এবং সর্বসম্মত বিষয়াদির মধ্যে দ্বিধা ও জটিলতা থাকতেই পারে না। বস্তুত অহংকার, জিদ, শত্রুতা এবং অর্থ ও পদের মোহ প্রভৃতিই এই মতভেদ ও মতপার্থক্যের কারণ হয়েছে। এর পর যখন মতবিরোধ কায়েম হয়ে গেল এবং বিভিন্ন মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন মোর্চা তৈরি করে নিল, তখন পরবর্তী বংশধরেরা চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হল এবং এমন সন্দেহ ও সংশয়ের জন্ম হল, যা কোন অবস্থাতেই ওদের শান্তিতে থাকতে দেয়নি।

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ..)– তবে এসব কিছু এ কারণে হল যে, আল্লাহ তাআলা নিজ হেকমতে বান্দাদের অবকাশ দিয়েছেন। নতুবা তিনি চাইলে সকল মতভেদ এক মুহূর্তে খতম হয়ে যেত। কিন্তু এমন করাটা দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য-পরিপন্থী ছিল। আল্লাহর পরিপূর্ণ হেকমতের দাবি এ-ই যে, এসব মতবিরোধের কার্যকর ও চরম মীমাংসা একটা নির্ধারিত সময়ে পরবর্তী জীবনে করা হবে। যদি এটা পূর্ব থেকেই স্থীরিকৃত না হত, তবে অনতিবিলম্বে সকল ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিয়ে দেওয়া হত।

اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

বিসংবাদ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে[১]।

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ

১৬. যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে (বহু মানুষ) তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়ার পরও, ওদের বিতর্ক ওদের রবের নিকট বাতিল।

---

১. অর্থাৎ যেহেতু চতুর্দিক থেকে সত্য দীন সম্পর্কে বিরোধ ও মতভেদের ঝড় উঠছে, সুতরাং আপনার কর্তব্য, দৃঢ় সংকল্পের সাথে সেই দীন ও বিধানের দিকে লোকদের আহ্বান করতে থাকা, যার দিকে আদম (আ) ও নূহ (আ) এবং তাঁদের পর সমস্ত আম্বিয়া দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। আপনি নিজ প্রভুর হুকুম থেকে একটুও এদিক-সেদিক হবেন না। আপনি কথায় ও কাজে এবং সর্বদা-সর্বাবস্থায় সেই পথেরই উপর অবিচল থাকুন, যে পথের উপর এখন পর্যন্ত থেকেছেন। আপনি অস্বীকারকারীদের ও বিরুদ্ধবাদীদের কামনা-বাসনার একটুও পরোয়া করবেন না এবং পরিষ্কার ঘোষণা করে দিন যে, আমি আল্লাহর নাযিলকৃত প্রত্যেক কিতাবের প্রতি খাঁটি অন্তরে বিশ্বাস রাখি– চাই তা তাওরাত হোক বা ইনজিল বা কুরআন, কিংবা যে কোন কালে যে কোন পয়গম্বরের উপর নাযিলকৃত সহীফা। আমার কাজ পূর্ববর্তী সত্যগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা নয়, বরং সবগুলিকে স্বীকার করা এবং তা অক্ষুণ্ন রাখা।

আমার প্রতি নির্দেশ এসেছে, তোমাদের মধ্যে যেন সুবিচার করি। যেসব মতবিরোধ তোমরা সৃষ্টি করেছ, তার যেন ইনসাফপূর্ণ ফয়সালা করে দিই এবং হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধানের প্রচার-প্রসারে এবং মামলা-মোকাদ্দমার বিচারে ন্যায় ও সমতার নীতি যেন কায়েম রাখি। যে কোন স্থানে বা মাযহাবে যে কোন সত্য পাওয়া যাক, তা যেন স্বীকার করি। তোমাদের যেমন আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করি, তোমাদের পূর্বে আমি নিজে যেন তা পূর্ণরূপে পালন করে আল্লাহর কামেল আজ্ঞাবহ বান্দা হই। কেননা আমি জানি, তোমাদের ও আমাদের প্রভু একই। এজন্য আমাদের সকলেরই তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা উচিত। যদি তোমরা এরূপ না কর, তবে তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

আমরা দাওয়াত ও তাবলীগের কর্তব্য আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ অন্যের আমলের যিম্মাদার নয়। প্রত্যেকের আমল তার সঙ্গে আছে, তা-ই তার সামনে উপস্থিত হবে। সুতরাং এর ফলাফল বহন করার জন্য তৈরি থাকা উচিত। ভবিষ্যতে তোমাদের সাথে আমাদের বিবাদ ও বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সকলকেই আল্লাহর আদালতে হাযির হতে হবে। সেখানে গিয়ে প্রত্যেকেই উত্তমরূপে বুঝতে পারবে, সে দুনিয়া থেকে কী কামাই করে এনেছে।

বি. দ্র. এ আয়াতগুলি মক্কায় অবতীর্ণ। আর কেতাল (বা জিহাদ) সম্পর্কিত আয়াতগুলি মদীনায় অবতীর্ণ হয়।

আর ওদের উপর (আল্লাহর) গযব এবং ওদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি[১]।

رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿١٦﴾

১৭. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সত্যসহ কিতাব ও তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন[২]। আর তুমি কী জান, হয়ত কিয়ামত আসন্ন[৩]?

اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿١٧﴾

১৮. কিয়ামতের ব্যাপারে তারাই তাড়াহুড়া করে যারা তাতে ঈমান রাখে না। আর যারা ঈমান রাখে, তারা তার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং তারা জানে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, ওরা নিশ্চয় চরম বিভ্রান্তিতে পতিত[৪]।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿١٨﴾

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর দীন, তাঁর কিতাব ও তাঁর বাণীর সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এমন কি বহু জ্ঞানী লোক তা কবুল করেছে এবং অনেকে কবুল না করা সত্ত্বেও এগুলির সত্যতা স্বীকার করতে শুরু করেছে। তো, সত্যের এরূপ প্রকাশ ও স্পষ্টতার পরও যারা অযথা ঝগড়া করে অথবা সত্য গ্রহণকারীদের সঙ্গে বিতর্ক করে, তারা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও কঠোর শাস্তির যোগ্য। তাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহ মিথ্যা এবং সকল তর্ক-বিতর্ক বাতিল ও ভিত্তিহীন।

২. আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক দাঁড়িপাল্লাও অবতীর্ণ করেছেন, যার দ্বারা বস্তুসামগ্রী ওজন করা হয়। তদ্রূপ জ্ঞানগত, বৌদ্ধিক ও আত্মিক দাঁড়িপাল্লাও অবতীর্ণ করেছেন, যাকে 'আকলে সালীম' (عقل سليم) বা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা-বুদ্ধি বলা হয়। তদুপরি তিনি অবতীর্ণ করেছেন 'আখলাকী' বা নৈতিক দাঁড়িপাল্লা তথা ন্যায় ও ইনসাফের গুণ। আর সর্বাপেক্ষা বড় দাঁড়িপাল্লা হচ্ছে সত্য দীন, যা দ্বারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির হক বা অধিকারসমূহ সম্পূর্ণ সঠিকভাবে জানা যায় এবং যার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ও যথাযথ হয়, কম-বেশ হয় না।

৩. অর্থাৎ নিজের আমল ও অবস্থা আল্লাহর কিতাবের মানদণ্ডে যাচাই কর এবং সত্য দীনের দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করে দেখ। তাহলে বুঝবে, তা কতখানি নিখুঁত ও সঠিক। কে জানে, হয়ত কিয়ামতের মুহূর্তটি অতি নিকটে এসে গেছে। তখন তো কিছু করা সম্ভব হবে না। তাই চিন্তা-ভাবনা করে যা করার, কিয়ামত আসার আগেই করে নাও।

৪. অর্থাৎ কিয়ামতে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা হাসি-বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলে– হ্যাঁ গো! ওই কিয়ামত কবে আসবে? এত দেরি কেন হচ্ছে? তাড়াতাড়ি এসে পড়ে না কেন? — কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ঈমান ও বিশ্বাস দ্বারা ভূষিত করেছেন, তারা সেই ভয়ঙ্কর

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি কোমল[১]। তিনি যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন[২]। আর তিনিই শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝

[রুকূ - ৩]

২০. যে আখেরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য তার ফসলে বৃদ্ধি ঘটাই[৩]। আর যে দুনিয়ার ফসল চায়, আমি তাকে তা থেকে কিছু দেব এবং তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই[৪]।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۝

২১. ওদের কি শরীকেরা রয়েছে, যারা ওদের জন্য এমন দীন স্থির করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি[৫]?

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ۚ

মুহূর্তটির চিন্তায় ভীত ও প্রকম্পিত থাকে। তারা ভাল করেই বোঝে, এ বিষয়টি অটল ও অনিবার্য, কিছুতেই টলার নয়। এ জন্যই তারা আখেরাতের প্রস্তুতিতে সদা ব্যস্ত।

এ থেকেই বুঝে নাও, এই কলহ-বিবাদকারীদের পরিণাম কী হবে! কারো যদি কিয়ামতের বিশ্বাসই না থাকে, তবে সে কী প্রস্তুতি নেবে? আর সে এ সত্যের প্রতি যত বিদ্রূপ করবে, তার গোমরাহী তত বেশি বাড়তে থাকবে।

১. অর্থাৎ অবিশ্বাস ও অস্বীকৃতি সত্ত্বেও কারো রুযী বন্ধ করেন না, বরং বান্দাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থারও রেয়াত করেন এবং খুবই মমতা ও সূক্ষ্ম কৌশলে তাদের লালন-পালন করেন।

২. যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা– দান করেন।

৩. এক নেকীর বিনিময়ে দশগুণ ছওয়াব দেন, বরং সাতশত গুণ এবং এর চেয়েও বেশি দেন। আর দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের বরকতে যে স্বস্তি ও বরকত লাভ হয়, তা তো আছেই।

৪. দুনিয়ার জন্য যতই মেহনত করা হোক, ভাগ্যে যতটুকু থাকে ততটুকুই লাভ হয়। এর পর আখেরাতে এই মেহনতের কোনই ফায়দা নেই।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবীদের মাধ্যমে আখেরাতের ও সত্য দীনের পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি ব্যতীত আর কেউ এমন নেই, যে অন্য কোন পথ নির্ধারণ করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে। কেউ আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল এবং হালালকৃত বিষয়কে হারাম করতে পারে না। অতএব মুশরিকরা নবীদের বর্ণিত খোদায়ী পথ ছেড়ে অন্যান্য পথ কোথা থেকে আবিষ্কার করল?

আর যদি সুনির্ধারিত একটি কথা না থাকত, তবে ওদের মধ্যে অবশ্যই ফয়সালা করে দেওয়া হত[১]। আর নিশ্চয় অপরাধীদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব।

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. আপনি গোনাহগারদেরকে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন, তা তো ওদের উপর পতিত হবেই[২]। আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা থাকবে জান্নাতের বাগানসমূহে। তাদের জন্য আপন রবের নিকট আছে তারা যা-কিছু চাইবে। এ-ই বিরাট মর্যাদা[৩]।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

২৩. এরই সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাদের দান করেন, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল[৪]। আপনি বলুন, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না– আত্মীয়তার হৃদ্যতা ছাড়া[৫]।'

ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ

---

১. অর্থাৎ (এখন করা না হলেও) যথাসময়ে ফয়সালা অবশ্যই করা হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এর ওয়াদা থাকল।

২. অর্থাৎ নিজেদের কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে আজ ভয় না করলেও সেদিন ভীত হবে এবং এ ভয় ওদের উপর অবশ্যই পতিত হবে। আযাব থেকে পালানোর কোন পথই সেদিন খুঁজে পাবে না।

৩. অর্থাৎ জান্নাতে সব রকমের দৈহিক ও আত্মিক সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ রয়েছে। আর আছে নিজেদের প্রভুর নৈকট্য। এ-ই বিরাট অনুগ্রহ। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এর সামনে কী মূল্য রাখে?

৪. আর আল্লাহ যে সুসংবাদ দান করেন, তা অবশ্য অবশ্য বাস্তবায়িত হয়।

৫. অর্থাৎ আমি যে কুরআনের মত দৌলত তোমাদের দিচ্ছি, শ্বাশত মুক্তি ও সফলতার পথ প্রদর্শন করছি এবং জান্নাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছি– এ সবই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই হিতাকাঙ্ক্ষা ও অনুগ্রহের কোন প্রতিদান আমি তোমাদের নিকট চাই না।

اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى

শুধু একটি জিনিস চাই, তোমাদের সঙ্গে আমার যে বংশীয় ও আত্মীয়ের সম্পর্ক রয়েছে, কমপক্ষে তা স্মরণে রাখ। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তোমাদের আচরণ কেমন হয়ে

وَمَنۡ يَّقۡتَرِفۡ حَسَنَةً نَّزِدۡ لَهٗ فِيۡهَا حُسۡنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ شَكُوۡرٌ ۝

আর যে নেক কাজ করবে, আমি তার জন্য তাতে সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেব। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী[১]।

থাকে? অনেক সময় অনুচিৎ ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতা করে থাক। আমার অনুরোধ, তোমরা যদি আমার কথা না মানতে চাও, মেনো না। আমার দীন গ্রহণ না কর অথবা আমার সমর্থন ও সহযোগিতায় না দাঁড়াও, ঠিক আছে। কিন্তু কমপক্ষে আত্মীয়তা ও রক্ত-সম্পর্কের রেয়াত করত জুলুম ও কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাক এবং আমাকে এতটুকু স্বাধীনতা দাও, যাতে আমি নিজ প্রভুর পয়গাম দুনিয়াবাসীর কাছে পৌঁছাতে পারি। এতটুকু সৌহার্দ্য ও স্বাভাবিক হৃদ্যতা পাওয়ার অধিকার কি আমার নেই?

বি. দ্র. আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বুখারী (৪৮১৮) ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ এর অর্থ করেছেন, তোমরা পরস্পর একে অপরকে মহব্বত কর এবং আত্মীয়তার হক সম্পর্কে অবগতি লাভ কর। আর কেউ কেউ قربى দ্বারা 'আল্লাহর নৈকট্য' উদ্দেশ্য করেছেন– অর্থাৎ ওই সব কাজের প্রতি মহব্বত রাখ, যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তবে সর্বাধিক গ্রহণীয় তাফসীর তাই, যা আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছি।

একটি আপত্তিকর ব্যাখ্যা

কোন কোন আলেমের মতে مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَىٰ- এর অর্থ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত (তথা পরিবারবর্গ)-এর প্রতি মহব্বত। এ হিসেবে মর্মার্থ হল, আমি তাবলীগের জন্য তোমাদের কাছে কোনই প্রতিদান চাই না, শুধু এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক রাখ।

নিঃসন্দেহে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি রাখা এবং তাঁদের হক ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা উম্মতের অবশ্য কর্তব্য ও ঈমানের অঙ্গ। আর তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা বস্তুত হুযূরের প্রতি মহব্বতেরই অংশ। কিন্তু তাই বলে আলোচ্য আয়াতের উক্ত তাফসীর করা সঠিক নয়। কারণ, শানে নুযূল ও সহীহ রেওয়ায়াতসমূহের খেলাফ হওয়া ছাড়াও এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল মনে হয় না। والله اعلم بالصواب

১. অর্থাৎ মানুষ কল্যাণ ও নেকির পথ অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা তার কল্যাণ বৃদ্ধি করেন। আখেরাতে তো প্রতিদান ও ছওয়াবরূপে, আর দুনিয়াতে সৎস্বভাব দান করে। অধিকন্তু এমন মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতিও ক্ষমা করে দেন।

এখানে এ বিষয়টি হয়ত এ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্বে বলা হয়েছে– কমপক্ষে আত্মীয়তার ভালবাসাটুকু দেওয়া উচিৎ। যার সারকথা হল, কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকা। এখন বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি সৎকর্ম করবে, সে অধিক বিনিময় পাবে। কারণ, আল্লাহর নিকট কারো সৎকর্ম বিনষ্ট হয় না, বরং বাড়তে থাকে।

২৪. ওরা কি বলে, 'তিনি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছেন?' তো আল্লাহ যদি চান, তবে আপনার অন্তর মোহর করে দিতে পারেন। আল্লাহ মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং নিজের বাণীসমূহের দ্বারা সত্যকে করেন প্রতিষ্ঠিত। নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্বন্ধেও পূর্ণ অবহিত[১]।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

১. অর্থাৎ অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া হোক, আপনি যদি কোন একটি কথাও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে বলেন, তবে আপনার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। এরপর ফেরেশতা এই অলৌকিক কালাম নিয়ে আপনার অন্তরে অবতরণ করতে পারবেন না এবং ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। বরং ইতিপূর্বে প্রদত্ত ওহীও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا. اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে অবশ্যই সেই জিনিস প্রত্যাহার করে নিতে পারি, যা ওহী মারফত আপনার নিকট পাঠিয়েছি। অতঃপর আপনি নিজের জন্য এমন কাউকে পাবেন না, যে আমার মোকাবেলায় তা এনে দেওয়ার যিম্মাদার হবে। তবে আপনার রবের মেহেরবানীতে [তা প্রত্যাহার করা হয় না]। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর দায় বড় বেশি। –বনী ইসরাঈল, আয়াত ৮৬)

কিন্তু যেহেতু আপনার পক্ষে মিথ্যা বলার কোনই সম্ভাবনা নেই, এবং আপনি যা শোনাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম— তাই শুধু হতভাগাদের অবমূল্যায়ন এবং সমালোচনা করার কারণে এই করুণাবৃষ্টি (তথা ওহী) বন্ধ করে দেওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা অব্যাহত রাখবেন এবং স্বীয় বাণীসমূহের দ্বারা কার্যত মিথ্যাকে মিথ্যা এবং সত্যকে সত্য প্রমাণ করে ছাড়বেন। তখন সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে, দুই দলের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী, আর কার অন্তরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন, ফলে তাতে কল্যাণ বর্ষণ ও সত্য গ্রহণের কোন অবকাশ থাকেনি।

بكلماته

এখন প্রশ্ন হল, সেই কথাগুলি কী, যা দ্বারা মিথ্যা নিশ্চিহ্ন এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? আমার মতে তা হচ্ছে সেই সব প্রমাণ ও নিদর্শন, যেগুলি কুরআন ও পয়গম্বরের সত্যতা প্রমানে আল্লাহ কায়েম করেছেন। বিশেষত ওই নিদর্শনাদি, যা মানুষের নিজেদের মাঝে এবং বিশ্বচরাচরের দিগদিগন্তে বিদ্যমান। সূরা আস-সেজদার শেষাংশে— سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ আয়াতের (৫৩) ব্যাখ্যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ নিদর্শনগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর কাদের অন্তর নির্মল-পবিত্র আর কাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত-অপবিত্র, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে একাধিক মত রয়েছে। তবে উল্লিখিত অর্থ-ব্যাখ্যাই বান্দার (তাফসীরকারের) নিকট অনায়াসলব্ধ ও অগ্রগণ্য। এ তাফসীর অনুযায়ী وَيَمْحُ اللّٰهُ

২৫. এবং তিনিই আপন বান্দাদের থেকে তওবা কবুল করেন, গোনাহ-খাতা ক্ষমা করেন এবং তোমরা যা কিছু কর তা জানেন।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের ডাকে তিনি সাড়া দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের অধিক দান করেন[১]। আর যারা কাফের, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

الْبَاطِلَ আয়াতটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য, পূর্বের বাক্য— يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। আয়াতের অনুবাদে বিষয়টি সুস্পষ্ট এবং অধিকাংশ বিজ্ঞজন একেই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য মুতারজিম (শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান) রাহিমাহুল্লাহ শব্দটির অর্থ বর্তমান কালের নিয়েছেন, যা অবশ্যই সহীহ। কিন্তু বান্দার (তাফসীরকারের) মতে এখানে ভবিষ্যৎ কালের অর্থ নেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ– আল্লাহ মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন আর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ –কে يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ধরে বলেছেন– 'আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে দেবেন কেন? (বরং) অন্তরকেই বন্ধ করে দেবেন, যাতে মিথ্যা রচনার মত কোন বস্তুর উদ্ভবই সেখানে না হয়। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করলে পয়গাম পাঠানো ছাড়াই কুফর নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বীয় বাণীর দ্বারা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাই নবীর প্রতি তিনি নিজ কালাম পাঠান।'

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম পৌঁছান, তোমরা চাই মিথ্যা মনে কর বা সত্য মনে কর। এরপর বান্দার সকল ব্যাপার আল্লাহর হাতে। প্রত্যেক বান্দার সঙ্গে দুনিয়া ও আখেরাতে তার অবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আচরণ করা হয়। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং সকল কিছু জানা সত্ত্বেও বহু গোনাহ ক্ষমা করে দেন। যে ঈমানদার ও নেক বান্দারা তাঁর কালাম শুনে তা মান্য করে, তিনি তাদের দো'য়া কবুল করেন এবং তাদের ইবাদত-বন্দেগীকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করেন। আর সাধারণ নিয়মানুযায়ী তারা যে পরিমাণ প্রতিদান ও ছওয়াবের যোগ্য হয়, তিনি তার চেয়েও বেশি দান করেন।

রইল অস্বীকারকারী ও কাফেরদের ব্যাপার, মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত যাদের রুজু ও তওবার তাওফীক হয়নি, তাদের পরিণামের কথা পরবর্তী বাক্যে রয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর (সকল) বান্দাদের জন্য রিযিক প্রসারিত করে দিতেন, তবে নিঃসন্দেহে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি পরিমাপমত যা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের ভাল করেই জানেন ও দেখেন[১]।

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ۚ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তারা হতাশ হয়ে যাওয়ার পর এবং তাঁর রহমত বিস্তার করেন। আর তিনিই কর্মবিধায়ক, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী[২]।

---

১. আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডারে কোন জিনিসের অভাব নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর সকল বান্দাকে ধনী ও সম্পদশালী করে দিতে পারেন। কিন্তু সকলকে অপরিমিত রুযী দান করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা তাঁর হেকমতবিরুদ্ধ। এরূপ করা হলে অধিকাংশ লোক অবাধ্যতা ও পাপাচার করে দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করত। আল্লাহর সম্মুখেও মাথা নত করত না, তাঁর সৃষ্টিজীবেরও পরোয়া করত না। বহু সম্পদ দেওয়া সত্ত্বেও তাতে অনেকে সন্তুষ্ট হত না– লোভ আরো বৃদ্ধি পেত। যেমন: বর্তমান অবস্থায়ও অধিকাংশ সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে লক্ষ করা যায়, যত পায় তার চেয়ে বেশি চায়। তাদের চেষ্টা ও কামনা হল, কিভাবে সকলের ঘর শূন্য করে নিজ ঘর ভরে ফেলা যায়।

অতএব, এহেন স্বভাব-চরিত্রের উপস্থিতিতে ব্যাপক ধনাঢ্যতা ও সচ্ছলতা থাকলে মারাত্মক ও ব্যাপক সংঘাত সৃষ্টি হত এবং সে ক্ষেত্রে কারো কাছে কারও দমে যাওয়া ও নতি স্বীকারের কোন কারণও থাকত না। হাঁ, দুনিয়ার সাধারণ প্রবণতার বাইরে কোন মহান সংস্কারক ও আল্লাহনির্দেশিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে অসাধারণভাবে এমন হতে পারে যে, সাধারণ লোকের ব্যাপক সচ্ছলতা ও নিশ্চিন্ততা সত্ত্বেও তারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ, নাফরমানি ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হল না এবং যুগান্তকারী বিপ্লবের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার মনোজগতই বদলে গেল। তবে সেটা অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম বলেই গণ্য।

যা হোক, বর্তমান অবস্থায় দুনিয়া যে ব্যবস্থাপনায় চালিত হবে, তার দাবি এটাই যে, সকলকে সম্পদশালী না করে বরং প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও অবস্থার বিবেচনায় যতটুকু সংগত ততটুকুই দেওয়া হবে। আর এটা একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, কার জন্য কোন্ অবস্থা বেশি সমীচীন। কারণ, সকলের অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা তাঁরই সম্মুখে রয়েছে।

২. অর্থাৎ অনেক সময় বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থাদি লক্ষ করে মানুষ বৃষ্টি সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তাআলা রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং নিজ দয়া ও বরকতসমূহ চতুর্দিকে প্রসারিত করে দেন, যাতে বান্দাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রিযিকের ন্যায় রিযিকের উপায়-উপকরণও তাঁরই হাতে। তিনি যেমন বিশেষ পরিমাপমত রুযী দান করেন,

২৯. তাঁর নিদর্শনাদির একটি হল আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা[১] এবং এদের মধ্যে জীব-জন্তু ছড়িয়ে দেওয়া[২]। আর তিনি যখন ইচ্ছা তাদের সমবেত করতে সক্ষম[৩]।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

[রুকূ - ৪]

৩০. তোমাদের উপর যা-কিছু বিপদ পতিত হয়, তা পতিত হয় তোমাদেরই হাতের কর্মের ফলে; আর তিনি বহু (গোনাহ) ক্ষমা করে দেন[৪]।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۰﴾

বৃষ্টিও বিশেষ সময়ে ও বিশেষ পরিমাণে দান করেন। আসল কথা হচ্ছে, সকল কাজ তাঁরই এখতিয়ারে এবং যা কিছু তিনি করেন, তা সম্পূর্ণ হেকমত মোতাবেক ও সঠিক হয়। কেননা, তাঁর সত্তার মধ্যে সকল উত্তম গুণাবলি ও পূর্ণতার সমাবেশ ঘটেছে। তাই সবরকমের কার্যসম্পাদন ও সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর দরবার থেকেই হতে পারে।

বি. দ্র. আল্লাহর রহমত ও কুদরত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাওয়া কাফেরদের কাজ। তবে একজন মুমিনের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, শুধু উপায়-উপকরণকে নৈরাশ্যজনক মনে করল। একেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন– فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا (তারা যখন তার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্য নির্জনে গিয়ে বসল। –ইউসুফ, আয়াত ৮০) এবং حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ (অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হওয়ার উপক্রম করলেন। –ইউসুফ, ১১০)

১. অর্থাৎ রিযিক পৌঁছানো এবং এর উপায়-উপকরণ (বৃষ্টি প্রভৃতি)-এর ব্যবস্থা করা যেমন তাঁর হাতে, তদ্রূপ এই উপকরণগুলির আসমানী ও ভূমণ্ডলীয় উপায়-উপকরণ এবং তাদের প্রভাব ও ফলাফলও তাঁরই সৃষ্টি।

২. এ আয়াত থেকে বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীর ন্যায় আকাশমণ্ডলীতেও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে।

৩. অর্থাৎ যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি সকলকে জড়োও করতে পারেন। এটা কিয়ামতের দিন ঘটবে।

৪. অর্থাৎ নে'য়ামতসমূহ যেমন এক বিশেষ পরিমাণে এবং বিশেষ সময়ে ও অবস্থায় দেওয়া হয়, তেমনি বিপদাপদও বিশেষ বিশেষ কারণে ও নিয়মের অধীনে পতিত হয়। যেমন: বান্দাদের উপর যেসব কষ্ট ও মুসীবত আসে, তার নিকটবর্তী বা দূরবর্তী কারণ বান্দাদেরই কোন না কোন আমল হয়ে থাকে। এর উদাহরণ এমন, যেমন মানুষ পানাহার ইত্যাদিতে সতর্কতা অবলম্বন না করায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, বরং কোন কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অথবা যেমন : কোন কোন সময় মায়ের অনিয়ম শিশুকে বিপদগ্রস্ত করে, কিংবা কখনো কখনো মহল্লার একজনের অনিয়ম ও ভুলের কারণে সমগ্র মহল্লা ও শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক এরূপ

৩১. আর তোমরা পৃথিবীতে (পালিয়ে আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না। এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না আছে কোন কার্যনির্বাহক আর না কোন সাহায্যকারী[১]।

وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ۖۚ وَمَا لَـكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ﴿۳۱﴾

৩২. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল সমুদ্রে চলমান পর্বতসদৃশ জাহাজসমূহ[২]।

وَمِنۡ اٰيٰتِهِ الۡجَوَارِ فِى الۡبَحۡرِ كَالۡاَعۡلَامِ ؕ ﴿۳۲﴾

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন, ফলে সেগুলি সারাদিন সমুদ্রপৃষ্ঠে থেমে থাকবে[৩]। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য[৪]।

اِنۡ يَّشَاۡ يُسۡكِنِ الرِّيۡحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّـكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ۙ ﴿۳۳﴾

অবস্থা আধ্যাত্মিক ও বাতেনী অসতর্কতা ও অনিয়মেরও। বলতে গেলে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি মুসিবত একদিকে বান্দার কোন না কোন অতীত আমলেরই ফল, অপরদিকে ভবিষ্যতে তার জন্য এক সতর্ককারী। তবে একই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে, আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে বান্দার অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন। প্রত্যেক গোনাহর জন্য পাকড়াও হতে থাকলে পৃথিবীর বুকে কোন প্রাণীই টিকতে পারত না।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আয়াতের সম্বোধন (عاقل بالغ তথা) বুদ্ধিসম্পন্ন সাবালকদের প্রতি, চাই গোনাহগার হোক বা নেককার। কিন্তু নবীগণ এর অন্তর্ভুক্ত নন (তদ্রূপ শিশুরাও না)– তাঁদের বিষয় ভিন্ন। আর আয়াতে যে 'মুসিবতে'র কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে দুনিয়ার কষ্ট, কবর ও আখিরাতের বিপদ— সবই শামিল আছে।'

১. অর্থাৎ তিনি তো নিজ মেহেরবানীতে মাফ করে থাকেন। নতুবা কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে চাইলে অপরাধী পালিয়ে কোথাও আত্মগোপন করতে পারবে না। আর তিনি ছাড়া অন্য কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়েও আসতে পারবে না।

২. পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন পাহাড়-পর্বত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অদ্রূপ সমুদ্রের উপরিভাগেও বড় বড় জাহাজকে মাথা উঁচিয়ে চলতে দেখা যায়।

৩. অর্থাৎ বাতাসও আল্লাহর মুঠিতে। তিনি যদি বাতাসের প্রবাহ থামিয়ে রাখেন, তাকে চলতে না দেন, তবে পালতোলা নৌযানগুলো সমুদ্রের বুকে স্ব স্ব স্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মোটকথা, পানি ও বাতাস সবই তাঁর মুঠিতে।

৪. সামুদ্রিক সফরে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এটা খুবই জরুরী যে, মানুষ অনুকূল অবস্থায় শোকর আর প্রতিকূল অবস্থায় সবর করবে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত ও নেয়ামতকে চিনবে-বুঝবে।

৩৪. অথবা ওদের কৃতকর্মের কারণে তিনি সেগুলি বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন; আর অনেককে তিনি ক্ষমাও করতে পারেন[১]।

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝

৩৫. এবং যারা আমার নিদর্শনাদি সম্পর্কে* বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা নেই[২]।

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ۝

৩৬. অতএব, তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে (তা) শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে, তাই উত্তম ও চিরস্থায়ী- তাদের জন্য; যারা ঈমানদার ও যারা তাদের রবেরই উপর নির্ভর করে[৩]—

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

৩৭. এবং যারা কবীরা গোনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকে এবং তারা যখন ক্রোধান্বিত হয়, ক্ষমা করে দেয়[৪]—

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝

---

১. অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে ভ্রমণকারীদের কোন কোন আমলের কারণে জাহাজগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন, আর এই ধ্বংসের সময়েও কতককে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

☆ দ্বিতীয় তরজমা–'আয়াতসমূহে'।

২. অর্থাৎ জাহাজগুলি এজন্য ধ্বংস করা হবে, যাতে অপরাধীরা কতক আমলের প্রতিফল লাভ করে, আর বড় বড় কলহ-বিবাদকারীও বুঝে নেয় যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'যারা মনে করে, সবকিছুই নিজেদের চেষ্টা-তদবীরে সাধিত হয়, তখন তারাও অক্ষম হয়ে থাকবে।'– কোন কলা-কৌশলই অবলম্বন করা সম্ভব হবে না।

৩. অর্থাৎ উল্লিখিত কথাগুলো শোনার পর মানুষের উচিত, আল্লাহকে রাযী রাখার ফিকির করা এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবন ও নশ্বর আরাম-আয়েশের ধোঁকায় না পড়া। উত্তমরূপে এ কথা বুঝে নেওয়াও প্রয়োজন যে, ঈমানদাররা আখেরাতে আল্লাহর নিকট থেকে যে আরাম-আয়েশ লাভ করবে, তা এই দুনিয়ার আরাম-আয়েশের চেয়ে উত্তমও বটে এবং অবিনশ্বরও। তাতে কোন রকমের অসম্পূর্ণতা-ত্রুটি থাকবে না, ক্ষয় ও লয়ের আশঙ্কাও না।

৪. يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ– এর ব্যাখ্যা সূরা নিসার আয়াত (৩০–৩১) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ এর ব্যাখ্যায় গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

৩৮. এবং যারা স্বীয় রবের ডাকে সাড়া দেয়, নামায কায়েম করে; আর যাদের কর্মপদ্ধতি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করা[১] এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. এবং যাদের রীতি হল, তাদের উপর জুলুম হলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে[২]।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾

এখানে كَبَائِرَ الْإِثْمِ বলে সম্ভবত সেই বড় বড় গুনাহ উদ্দেশ্য, যা চিন্তা-বুদ্ধির অসদ্ব্যবহার দ্বারা সংঘটিত হয়– যথা: বেদআতী আকীদা-বিশ্বাস। আর অশ্লীলতা (فواحش) হল এমন গোনাহ, যা অসংযত কামভাবের কারণে সংঘটিত হয়। আর وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ আয়াতাংশে ক্রোধশক্তি দমন করার ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। والله اعلم

১. **পরামর্শের গুরুত্ব**

দীনী বিষয় হোক বা পার্থিব বিষয়, সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ মত কাজ করা আল্লাহর পছন্দ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের সাথে পরামর্শ করতেন। এবং সাহাবীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করতেন— যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কেও এবং অন্য মাসায়েল ও আহকাম সম্পর্কেও। বরং খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত পরিচালনার ভিত্তিই ছিল 'শুরা'র উপর।

পরামর্শের ক্ষেত্র

বলা বাহুল্য, পরামর্শের প্রয়োজন সেসব বিষয়েই হয়, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলির বিধান কুরআন ও হাদীছে বিবৃত হয়নি। যা কুরআন-হাদীছে বিবৃত আছে, তাতে রায় চাওয়ার ও পরামর্শের কোন প্রয়োজন হয় না। আর ছোট-বড় সকল কাজেই যদি পরামর্শ করতে হয়, তবে কোন কাজই চলবে না।

হাদীস দ্বারা জানা যায়, পরামর্শ এমন লোক থেকে নিতে হবে, যিনি বুদ্ধিমান ও সৎকর্মশীল (শুআবুল ঈমান, বর্ণনা ৭৫৪২)। নতুবা পরামর্শদাতার নির্বুদ্ধিতা বা বে-দীনির কারণে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

২. অর্থাৎ যেখানে ক্ষমা করা সংগত, সেখানে তারা ক্ষমা করে। যেমন এক ব্যক্তির আচরণে রাগান্বিত হল, আর সে অনুতপ্ত হয়ে স্বীয় দোষ স্বীকার করল, তখন ক্ষমা করে দিল। এমন ক্ষেত্রে ক্ষমা করাই প্রশংসনীয়।

আর যেখানে প্রতিশোধ নেওয়াই সংগত, সেখানে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যেমন: কোন ব্যক্তি অযথাই বাড়াবাড়ি করে চলেছে এবং জুলুম ও ক্ষমতাবলে পরাভূত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, অথবা উত্তর না দিলে তার ধৃষ্টতা বেড়ে যাচ্ছে কিংবা তার আচরণে ব্যক্তিগত অমর্যাদার কথা বাদ দিলেও দীনের অমর্যাদা বা মুসলমানদের অপমান হয়; এসব অবস্থায়

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই[১]। আর যে ক্ষমা ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে নেয়, তার ছওয়াব আল্লাহর যিম্মায়। নিশ্চয় তিনি জালেমদের পছন্দ করেন না[২]।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ۝

৪১. আর যারা মজলুম হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই[৩]।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ۝

৪২. অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে[৪] এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ওদেরই জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

৪৩. আর যে ধৈর্যধারণ করল এবং ক্ষমা করে দিল, তো নিশ্চয় এটি বড় হিম্মতের কাজ[৫]।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۝

তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তবে তা অপরাধীর বাড়াবাড়ির সমপরিমান হয়, অপরাধ অপেক্ষা অধিক শাস্তি দেয় না।

১. বদলা বা প্রতিশোধরূপে যে মন্দ করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে মন্দ নয়, শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দ দেখা যায়। শাব্দিক সাদৃশ্যতার জন্য এর উপর سيئة শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ জুলুম ও বাড়াবাড়ি আল্লাহর নিকট কোন অবস্থাতেই পছন্দ নয়। আর মানুষের পক্ষে যতটুকু প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি আছে, তাও ক্ষমা করে দেওয়া সর্বোত্তম স্বভাবের পরিচায়ক। তবে শর্ত এই যে, ক্ষমা করার ফল শুভ হতে হবে।

৩. অর্থাৎ মজলুম জালেম থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইলে এতে কোন অভিযোগ ও গোনাহ নেই। তবে মাফ করে দেওয়া শ্রেয় ও উত্তম।

৪. অর্থাৎ যারা প্রথমে জুলুম করে অথবা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়, অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

৫. অর্থাৎ ক্রোধ দমন করা এবং দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে জালেমকে মাফ করে দেওয়া দৃঢ় মনোবল ও বড় হিম্মতের কাজ। হাদীছে আছে, যে বান্দার উপর জুলুম হয়, সে যদি শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে তা ক্ষমা করে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং সাহায্য করবেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৬২৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৮৬১)

[রুকূ - ৫]

৪৪. যাকে আল্লাহ বিচ্যুত করেন, তো এর পর তার কোন অভিভাবক নেই[১]। আর আপনি অপরাধীদের দেখবেন, ওরা আযাব দেখে বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কি কোন উপায় আছে[২]?'

وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنۡ وَّلِيٍّ مِّنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيۡنَ لَمَّا رَاَوُا الۡعَذَابَ يَقُوۡلُوۡنَ هَلۡ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنۡ سَبِيۡلٍ ۚ﴿۴۴﴾

৪৫. এবং দেখবেন, ওদেরকে আগুনের সামনে এভাবে আনা হচ্ছে যে, ওরা অপমানে অবনত, (আর) গোপন নয়নে দেখছে[৩]। আর যারা মুমিন ছিল তারা বলবে, 'নিশ্চয় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা আজ কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে[৪]।' জেনে রাখ, পাপিষ্ঠরা থাকবে স্থায়ী শাস্তিতে।

وَتَرٰىهُمۡ يُعۡرَضُوۡنَ عَلَيۡهَا خٰشِعِيۡنَ مِنَ الذُّلِّ يَنۡظُرُوۡنَ مِنۡ طَرۡفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ الۡخٰسِرِيۡنَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ وَاَهۡلِيۡهِمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيۡنَ فِىۡ عَذَابٍ مُّقِيۡمٍ ﴿۴۵﴾

৪৬. আর ওদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য সহায়করা থাকবে না, যারা ওদের সাহায্য করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো পথ নেই[৫]।

وَمَا كَانَ لَهُمۡ مِّنۡ اَوۡلِيَآءَ يَنۡصُرُوۡنَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنۡ سَبِيۡلٍ ؕ﴿۴۶﴾

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যেই মানুষ সুবিচার ও ইনসাফ, ধৈর্য ও ক্ষমার মত উন্নত স্বভাব-চরিত্র হাসিল করতে পারে। তিনি এসব উত্তম চরিত্র অবলম্বনের তাওফীক না দিলে আর কে আছে, যে আমাদেরকে নৈতিক অধঃপতন ও মন্দ স্বভাবের গহীন খাঁদ থেকে উদ্ধার করতে পারে?

২. অর্থাৎ এমন হতে পারে কি যে, আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হবে? তা হলে এবার আমরা সেখান থেকে সাধু-সজ্জন হয়ে আখেরাতে হাযির হতাম!

৩. অর্থাৎ একজন ভীত-সন্ত্রস্ত অপরাধীর মত ভয়, অপমান ও অনুশোচনার কারণে ওরা অবনত দৃষ্টিতে দেখবে, কারো প্রতি পূর্ণ চোখ মেলে তাকাতে পারবে না।

৪. অর্থাৎ হতভাগারা নিজেদের সাথে নিজেদের সঙ্গী-সাথী ও পরিবারবর্গকে ডোবাল, সকলকে ধ্বংস ও বরবাদ করে ছাড়ল।

৫. অর্থাৎ তার জন্য দুনিয়াতে হেদায়াতের পথ এবং আখেরাতে মুক্তির পথ নেই।

৪৭. তোমরা আপন রবের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসার আগে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে রদ হওয়ার নয়[১]। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না এবং তোমাদের থাকবে না অস্বীকার করার উপায়*[২]।

اِسۡتَجِیۡبُوۡا لِرَبِّکُمۡ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ یَّاۡتِیَ یَوۡمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَکُمۡ مِّنۡ مَّلۡجَاٍ یَّوۡمَئِذٍ وَّ مَا لَکُمۡ مِّنۡ نَّکِیۡرٍ ﴿۴۷﴾

৪৮. এখন যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি আপনাকে ওদের পর্যবেক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল পৌঁছিয়ে দেওয়া[৩]। আমি যখন মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, তাতে সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর যদি তাদের উপর কোন অনিষ্ট পতিত হয় তাদেরই হাতের কৃতকর্মের কারণে, তখন মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে[৪]।

فَاِنۡ اَعۡرَضُوۡا فَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ عَلَیۡهِمۡ حَفِیۡظًا ؕ اِنۡ عَلَیۡکَ اِلَّا الۡبَلٰغُ ؕ وَ اِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنَّا رَحۡمَۃً فَرِحَ بِهَا ۚ وَ اِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَیِّئَۃٌۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡهِمۡ فَاِنَّ الۡاِنۡسَانَ کَفُوۡرٌ ﴿۴۸﴾

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা

لِلّٰهِ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ یَخۡلُقُ مَا یَشَآءُ ؕ یَهَبُ لِمَنۡ یَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ یَهَبُ

---

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন আযাব বিলম্বিত হয় এবং সরে যেতে থাকে, সেদিন এমন হবে না।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**–'তোমাদের জন্য থাকবে না কোন প্রতিরোধকারী'।

২. অর্থাৎ অস্বীকার করলে কোন ফায়দা হবে না। আর ইবনে কাছীর (র) এই অর্থ করেছেন যে, এমন কোন স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে তোমরা লুকিয়ে যাবে আর ধরা পড়বে না।

৩. অর্থাৎ আপনি এর যিম্মাদার নন যে, ওদের জোরপূর্বক মানিয়ে ছাড়বেন। আপনার দায়িত্ব আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়া। তা আপনি পালন করছেন। ওরা না মানলে জাহান্নামে যাক।

৪. অর্থাৎ ওদের বিমুখতায় আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিই হল আল্লাহ নে'য়ামত দান করলে, অনুগ্রহ করলে সে আনন্দ-উল্লাস করতে শুরু করে। আর যখন নিজ কীর্তিকলাপের ফলে কোন বিপদে পড়ে, তখন সকল নে'য়ামত ভুলে গিয়ে এমন অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় যে, কখনো যেন তার সুদিন আসেইনি। মোটকথা, প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশের অবস্থা হোক অথবা দুঃখ-কষ্টের অবস্থা, সীমার মধ্যে থাকতে পারে না।

তবে প্রকৃত মুমিনদের কথা ভিন্ন। তারা দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় প্রকৃত অনুগ্রহকারী আল্লাহর শোকর আদায় করে। কোন অবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ ও নে'য়ামতের কথা বিস্মৃত হয় না।

لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝

পুত্রসন্তান দান করেন;

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৫০. অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি নিশ্চয় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান[১]।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ

৫১. কোন মানুষের ক্ষেত্রে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তার সঙ্গে (সরাসরি) কথা বলবেন, তবে (তা হতে পারে) ইশারায় বা পর্দার আড়াল থেকে অথবা এভাবে যে, আল্লাহ কোন বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠাবেন, আর সে আল্লাহর হুকুমে তিনি যা চান তা পৌছিয়ে দেবে[২]।

---

১. অর্থাৎ অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, সকল অবস্থাই আল্লাহপ্রেরিত। আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই হুকুম চলে। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দান করেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন না। লক্ষ কর, কারো মোটেই সন্তান হয় না, কারো হয়। তবে কারো শুধু কন্যা, কারো শুধু পুত্র, আর কারো উভয়ই– যমজ বা ভিন্ন ভিন্ন।

এতে কারো কোন দাবি চলে না। ওই প্রকৃত মালিকই জানেন– কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ অবস্থায় রাখা সমীচীন এবং তিনিই নিজ ইলম ও হেকমত অনুযায়ী ব্যবস্থা করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাকে প্রতিহত করার সাধ্য অথবা তাঁর সৃষ্টি ও বণ্টনের সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই। অনুকূল ও প্রতিকূল সর্বাবস্থায় তাঁরই দিকে রুজু করা এবং সর্বদা নিজ দুর্বল হাকীকতকে স্মরণ রেখে অহংকার ও অকৃতজ্ঞতা করা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

২. স্বীয় প্রকৃতিগত কাঠামো ও বর্তমান শক্তি-সামার্থ্য নিয়ে কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে তার সামনা-সামনি হয়ে কথা বলবেন আর সে তা সইবে। এ জন্যই কোন মানুষের সঙ্গে আল্লাহর কথা বলা তিনটি উপায়ে হয়ে থাকে :

ওহী আগমনের তিন পন্থা

(ক) মাধ্যম ছাড়া পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহ তাআলার কথা বলা– অর্থাৎ নবীর শ্রবণশক্তি আল্লাহর কালাম শোনার সৌভাগ্য লাভ করে; কিন্তু এই অবস্থাতেও নবীর চোখ আল্লাহর দীদার লাভে অক্ষম থাকে। যেমন: হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর পর্বতে এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাত্রিতে এ উপায়ে আল্লাহর কালাম শুনেছিলেন।

(খ) ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কথা বলা; কিন্তু ফেরেশতা দৈহিক আকৃতি ধারণ করে চোখের সম্মুখে আসেন না; বরং সরাসরি নবীর অন্তরে আল্লাহর কালাম নাযিল করেন এবং নবী অন্তরের দ্বারাই ফেরেশতা ও তাঁর শব্দ অনুভব করেন, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তাতে মোটেই ভূমিকা থাকে না।

নিশ্চয় তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাবান[১]।	اِنَّهٗ عَلِیٌّ حَكِیْمٌ ۝
৫২. আর এভাবেই আমি নিজ আদেশে আপনার প্রতি এক ফেরেশতা পাঠিয়েছি☆[২]।	وَكَذٰلِكَ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ

আমার মতে আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীছে (বুখারী : ৩২১৫) একেই يأتيني مثل صلصلة الجرس বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়ে এই পন্থায় ওহী নাযিলের ক্ষেত্রেও ফেরেশতার আগমনের কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাপারেই হাদীছে বলা হয়েছে– وهو أشد علي (প্রাগুক্ত) এবং সম্ভবত কুরআনের ওহী অধিকাংশ সময় এ পন্থাতেই আসত। যেমন– فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ –এবং نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ –এর মধ্যে قلبك শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। بِإِذْنِ اللهِ

যেহেতু এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপনভাবে ভিতরে ভিতরেই সংঘটিত হত, পয়গম্বরের অস্তিত্বের বাইরে ফেরেশতার কোন পৃথক সত্তা দৃষ্টিগোচর হত না এবং এক ব্যক্তির আরেক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার ন্যায়ও কালাম হত না যে, পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রোতারাও বুঝতে পারে— এ জন্য মানুষের সঙ্গে আল্লাহর কালামের এই পন্থাকে আলোচ্য আয়াতে وحيا শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে وحي শব্দটি গোপন করা ও ঈষৎ ইঙ্গিত করার অর্থ বোঝায়।

(গ) তৃতীয় উপায় এই যে, ফেরেশতা আকৃতি ধারণ করত নবীর সম্মুখে আগমন করেন এবং এমনভাবে আল্লাহর কালাম ও সংবাদ পৌঁছিয়ে দেন, যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। হযরত জিবরাঈল (আ) এক দুই বার নিজের আসল আকৃতিতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করেন। তবে অধিকাংশ সময় সাহাবী হযরত দেহ্‌য়া কালবী (রা)-এর আকৃতিতে আসতেন। আবার কখনো কোন অপরিচিত মানুষের আকৃতিতে তশরীফ এনেছেন। হযরতের চক্ষু ফেরেশতাকে দেখত এবং কান তাঁর আওয়াজ শুনত, আর পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকেরাও কোন কোন সময় কথাবার্তা শুনত ও বুঝত।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীছে ওহী আগমনের যে দুই পন্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে এটি দ্বিতীয় পন্থা এবং আমার ধারণায় একেই আলোচ্য আয়াতে أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। আর যেহেতু পর্দার আড়াল থেকে কালাম করার পন্থাটি একেবারেই বিরল, সেজন্য আয়েশা (রা)-এর হাদীছে তা উল্লেখ করা হয়নি (শুধু প্রথম দুই পন্থার উল্লেখ করা হয়েছে)।

১. অর্থাৎ মানুষের সাথে সামনা-সামনি কথা বলার ব্যাপারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা প্রতিবন্ধক। তাই হেকমতের দাবি হল, মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– '...রূহ (তথা কুরআন) পাঠিয়েছি'।

২. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) এস্থলে 'রূহ' দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য করেছেন, অর্থাৎ জিবরাঈল আমীন। কোন কোন তাফসীরকারের এই অভিমত। কিন্তু বাহ্যত এখানে রূহ দ্বারা স্বয়ং কুরআন কারীমকে বোঝানো হয়েছে। তাকে 'রূহ' বলার কারণ এই যে, তার প্রভাবে মৃত

مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ﴿۵۲﴾

আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী[১]! কিন্তু আমি এই কুরআনকে এক নূর বানিয়েছি, যা দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি[২]। এবং আপনি নিশ্চয় প্রদর্শন করেন সরলপথ[৩]—

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾

৫৩. তথা আল্লাহর পথ[৪], যাঁর মালিকানাধীন আকাশমণ্ডলীর সবকিছু ও পৃথিবীর সবকিছু। জেনে রাখ, সকল বিষয় আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তন করে[৫]।

অন্তর জীবিত হয় এবং মানুষ শাশ্বত জীবন লাভ করে। লক্ষ করার বিষয়, যেসব জাতি কুফর, জুলুম ও বদ স্বভাবের মৃত্যু-গহ্বরে পতিত হয়েছিল, কুরআন তাদের মধ্যে কী বিস্ময়করভাবে নতুন প্রাণের সঞ্চার করল!

১. অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে ঈমান ও ঈমানী আমলের যে বিশদ বিবরণ এখন জানা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। যদিও আপনি মৌলিকভাবে ঈমানের গুণে সর্বদাই গুণান্বিত ছিলেন।

২. অর্থাৎ আমি যে সকল বান্দাকে ইচ্ছা করি, কুরআনের বদৌলতে সৌভাগ্য ও সফলতার পথে পরিচালিত করি।

৩. অর্থাৎ আপনি সকল মানুষকে কুরআন করীমের মাধ্যমে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সরলপথ প্রদর্শন করছেন, সে পথের উপর কেউ চলুক বা না চলুক।

৪. অর্থাৎ যার উপর চলে মানুষ এক আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সেটিই সরলপথ। যে ব্যক্তি এ পথ থেকে বিচ্যুত হল, সে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

৫. যখন সব কিছুর পরিণাম তাঁরই কাছে ন্যস্ত, তখন শুরুতেই এই পরিণামের কথা চিন্তা করে নেওয়া উচিত এবং নিজ থেকেই এমন পথের উপর চলা উচিত, যা সোজা তাঁরই দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। اَللّٰهُمَّ اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه

সূরা যুখরুফ

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৪৩ । ৮৯ আয়াত । ৭ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٨٩، رُكُوعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ﴿١﴾

১. হা-মীম।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾

৩. আমি একে বানিয়েছি আরবী ভাষার কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার[১]।

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾

৪. আর নিশ্চয় তা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পরিপক্ক কিতাব, যা আমার কাছে 'লওহে মাহফূজে' (সংরক্ষিত)[২]।

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾

৫. আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ কারণে 'যিক্‌র' (তথা কুরআন) প্রত্যাহার করে নেব যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়[৩]?

---

১. কারণ, আরবী তোমাদের মাতৃভাষা এবং তোমাদের মাধ্যমেই দুনিয়ার জাতিসমূহ এ কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ করবে।

২. অর্থাৎ কুরআন তার অলৌকিকতার কারণে ও উচ্চাঙ্গের জ্ঞানমালাসম্বলিত হওয়ার ফলে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট, আর পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণে নেহাত পরিপক্ক কিতাব। এর দলীল-প্রমাণাদি অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং হুকুম-আহকাম অপরিবর্তনশীল। কোন হুকুমই হেকমতশূন্য নয়। এতে রয়েছে ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে সফলতা অর্জনের দিকিনির্দেশনাসমূহ এবং এতে সমাহার ঘটেছে সকল জ্ঞানগর্ভ সৌন্দর্যমালার। বলা বাহুল্য, কুরআনের এ সমস্ত সৌন্দর্যের ব্যাপারে স্বয়ং কুরআনই সাক্ষী– آفتاب آمد دليل آفتاب (সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ।)

বি. দ্র. কুরআন ও সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করার পূর্বে লওহে মাহফূযে লেখা হয়েছে।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "তোমরা মান না বলে কি আমি বিধান পাঠানো মওকূফ করব"? অর্থাৎ এমন প্রত্যাশা রেখো না। আল্লাহর হেকমত ও রহমতের

৬. আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে বহু নবী পাঠিয়েছি।

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِيْنَ ۝

৭. কিন্তু ওদের নিকট যে নবীই আগমন করেছেন, তাকে নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে[১]।

وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৮. ফলে আমি এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছি। আর পূর্ববতীদের দৃষ্টান্ত তো গত হয়েছে[২]।

فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ ۝

৯. আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?' তবে অবশ্যই বলবে, 'তা সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)'—

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

১০. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পথসমূহ, যাতে তোমরা গন্তব্যে পৌছতে পার[৩]।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

দাবি হচ্ছে, তোমাদের দুষ্কৃতি ও বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হওয়া এবং দাওয়াত ও নসীহতের ধারা চালু থাকা। কেননা, বহু সৌভাগ্যবান মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে এবং কাফেরদের অভিযোগের পথ পূর্ণরূপে বন্ধ হচ্ছে।

১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী রাসূলদের সঙ্গেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সে কারণে নবুওয়াতের ধারা বন্ধ করা হয়নি।

২. অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতায় তোমাদের চেয়ে বেশি– এমন অস্বীকারকারীদের ধ্বংস করে দেওয়ার নজীর তোমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে এবং তার ঘটনাবলি ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তো ওরা যখন আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়নি, তখন তোমরা কী করে গর্ব করছ?

সামনে আল্লাহ তাআলার আজমত ও বড়ত্ব এবং কুদরত ও একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা এক পর্যায় পর্যন্ত কাফেররাও স্বীকার করত।

৩. অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত মানব বসতি রয়েছে, ততদূর তারা যেন এসব পথে চলে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে, একে অপরের কাছে পৌছার সুযোগ পায় এবং চলাফেরা করে পার্থিব ও পরকালীন সর্বপ্রকার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সফলতা লাভ করে।

১১. এবং যিনি আকাশ থেকে পরিমিত পানি বর্ষণ করেন[১]। অতঃপর আমি তা দ্বারা জীবিত করি মৃত ভূমিকে। এভাবেই তোমাদেরও বের করা হবে[২]।

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ⑪

১২. এবং যিনি সকল জোড়া সৃষ্টি করেছেন[৩] এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যার উপর তোমরা আরোহণ কর—

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ⑫

১৩. যাতে তোমরা তার পিঠের উপর চড়ে বস[৪], তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর তার উপর আরোহণ করে এবং বল, 'তিনি পবিত্র, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে বশে আনতে সক্ষম ছিলাম না[৫]।

لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ⑬

---

১. অর্থাৎ এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেন, যা তাঁর হেকমতের অনুকূল এবং তাঁর জ্ঞানে নির্ধারিত।

২. অর্থাৎ তিনি মৃত ধরাকে যেমন বৃষ্টির পানিতে জীবিত ও আবাদ করে দেন, তদ্রূপ তোমাদের মৃত শরীরে প্রাণ সঞ্চার করে কবর থেকে বের করবেন।

৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে যত বস্তুর জোড়া রয়েছে এবং মাখলুকের যত প্রকার ও সদৃশ বা অসদৃশ যত শ্রেণী রয়েছে, সব আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।

৪. অর্থাৎ স্থলভাগে কতক চতুষ্পদ প্রাণীর পিঠের উপর এবং সাগরে জলযানে আরোহন কর।

৫. অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তু কিংবা নৌযানে আরোহন করার সময় আল্লাহর এই অনুগ্রহ অন্তর দিয়ে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের এতই শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান বানিয়েছেন যে, নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও কৌশল খাটিয়ে এসবকে বশে আনতে পেরেছ। এ নিতান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ, নতুবা এমন এমন জিনিসকে নিয়ন্ত্রণে আনার শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে কোথায় ছিল?

তদুপরি অন্তরের এই উপলব্ধির সাথে যানবাহনে আরোহণের সময় মুখে এই দো'য়াও পড়া উচিত : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ

হাদীস শরীফে আরো যিকির-আযকার ও দো'য়ার উল্লেখ আছে, যা হাদীস ও তাফসীরের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।

১৪. 'আর আমাদেরকে অবশ্যই আপন রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে[১]।'

وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنۡقَلِبُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৫. ওরা আল্লাহ তা'আলার জন্য তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে অংশ (তথা সন্তান) সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয় মানুষ প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوۡا لَهٗ مِنۡ عِبَادِهٖ جُزۡءًا ؕ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَكَفُوۡرٌ مُّبِيۡنٌ ﴿ؕ۱۵﴾

[রুকূ - ২]

১৬. তবে কি তিনি স্বীয় মাখলুক থেকে কন্যা-সন্তানদের গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের নির্বাচিত করেছেন পুত্র- সন্তানদের জন্য[২]?

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخۡلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصۡفٰكُمۡ بِالۡبَنِيۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. ওদের কাউকে যখন সেই জিনিসের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যাকে সে 'রহমানের' জন্য নির্ধারিত করেছে*– তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে মর্মবেদনায়

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحۡمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا

---

১. অর্থাৎ এ সফরের দ্বারা আখেরাতের সফর স্মরণ কর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহণ করলে এই দো'য়াই পড়তেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৪২)

২. আল্লাহর নে'য়ামতসমূহ স্মরণ করে তাঁর শোকর আদায় করা উচিত ছিল; কিন্তু ওরা পরিষ্কার না-শোকরী করল এবং তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করল। তাঁর জন্য সন্তান স্থির করা– এর চেয়ে বড় ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে? আর তাও বান্দাদের মধ্য থেকে, অধিকন্তু তা কন্যাসন্তান!! প্রথমত— সন্তান পিতার অস্তিত্বেরই অংশবিশেষ হয়ে থাকে। সুতরাং মহান আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করার অর্থ হল, তিনি একাধিক অংশ দ্বারা গঠিত! অথচ এমন সত্তার জন্য নিত্যতা অবশ্যসম্ভাবী। (অতএব এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব)

দ্বিতীয়ত— সন্তান পিতার সমশ্রেণী ও সমগোত্র হয়ে থাকে। পিতা ও সন্তান উভয়ে এক শ্রেণীর না হলে সন্তান বা পিতার জন্য তা কলঙ্ক। অথচ সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সমশ্রেণী হওয়ার ধারণাও করা যায় না।

তৃতীয়ত— কন্যা শারীরিক ও বুদ্ধিগত শক্তির দিক দিয়ে সাধারণত পুত্র অপেক্ষা দুর্বল হয়ে থাকে। অতএব আল্লাহ যেন নিজের জন্য সন্তান-সন্ততি রাখতে গিয়ে দুর্বলতরটি রাখলেন। তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, নিজের ভাগে উত্তম বস্তু আর আল্লাহর ভাগে দুর্বল বস্তু স্থির কর?

* দ্বিতীয় তরজমা– 'যাকে সে 'রহমানের' সদৃশ সাব্যস্ত করেছে'।

وَهُوَ كَظِيْمٌ ۞

পিষ্ট হতে থাকে[১]।

اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ۞

১৮. তবে কি (আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করল) তাকে, যে অলঙ্কারের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং সে বিতর্কে স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম[২]?

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ؕ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ۞

১৯. আর ওরা ফেরেশতাদের –যাঁরা রহমানের বান্দা– নারী স্থির করেছে[৩]। ওরা কি তাঁদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছিল?* নিশ্চয় ওদের উক্তি লিখে রাখা হবে এবং ওদের জিজ্ঞাসা করা হবে[৪]।

---

১. অর্থাৎ যে কন্যাসন্তানদেরকে আল্লাহর জন্য নির্বাচন করছে, তারা ওদের ধারণায় এমন হীন যে, ওদেরকে কন্যাসন্তান হওয়ার সংবাদ শোনানো হলে কষ্ট ও ক্ষোভে চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ভিতরে ভিতরে জ্বলতে–পুড়তে থাকে।

এর পূর্ণ বিবরণ সূরা সাফফাত-এর শেষ রুকূতে (আয়াত ১৪৯-১৫৭) অতিবাহিত হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ কি সন্তান হিসাবে কন্যা পছন্দ করেছেন, যে স্বভাবত সাজসজ্জা ও অলঙ্কারের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং গয়না–অলঙ্কারাদির আনন্দেই ডুবে থাকে? এ তার বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার প্রমাণ। আর দুর্বল চিন্তাশক্তির কারণে সে বিতর্কের সময় বাকপটুতা দেখাতে পারে না। সেজন্য নারীদের বক্তব্যে একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়, তারা না নিজ দাবিকে যথেষ্ট যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, না অন্যদের দাবি যথাযথভাবে খণ্ডন করতে পারে। সর্বদা অসম্পূর্ণ কথা বলবে, আবার তাতে এমন অনর্থক কথা মিলিয়ে দেবে, যা বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশে কোন ভূমিকা রাখে না। বরং তা উদ্দেশ্য প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে।

আর বিতর্কের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বিতর্কে জোরালো বক্তব্যের আবশ্যকতা বেশি হয়। তাই এখানেই তাদের অক্ষমতা অধিক প্রকাশ হয়ে পড়ে। বস্তুত প্রত্যেক দীর্ঘ বক্তব্যের ব্যাপারে একই কথা। এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজনীয় বাক্যাবলি বলতে পারাটা বাকপটুতার কোন দলীল নয়।

৩. অর্থাৎ ওদের আরেকটি মিথ্যা এই যে, ফেরেশতাদের ওরা মেয়েদের অন্তর্ভূক্ত করে। অথচ তাঁরা নারী বা পুরুষ কোনটাই নয়, তাঁদের জাতই ভিন্ন।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– তাঁদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল?

৪. অর্থাৎ এই দাবির পিছনে যুক্তিগ্রাহ্য ও ধর্মীয়– কোন প্রমাণই তো ওদের নিকট নেই। তবে কি আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছিলেন, তখন ওরা দাঁড়িয়ে দেখছিল যে, তিনি

২০. ওরা বলে, 'যদি দয়াময় (আল্লাহ) চাইতেন, তবে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না[১]।' ওদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। ওরা কেবল অনুমানপ্রসূত উক্তিই করে থাকে[২]।

وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. আমি কি ওদেরকে এর পূর্বে কোনো কিতাব দিয়েছি যে, ওরা তা আঁকড়ে ধরে আছে?

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. বরং ওরা বলে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এক পথের উপর পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথ চলছি'[৩]।

بَلْ قَالُوْۤا اِنَّا وَجَدْنَاۤ اٰبَآءَنَا عَلٰۤى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰۤى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

তাঁদের পুরুষ নয়, নারী বানিয়েছেন? ঠিক আছে! ওদের এ কথা আমলনামায় লিখে নেওয়া হচ্ছে। আল্লাহর আদালতে যখন উপস্থিত হবে, তখন ওদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা এমন কথা কেন বলেছিলে এবং কী করে বলেছিলে?

১. আশ্চর্য! নিজেদের শিরেকী কীর্তিকলাপের বৈধতা প্রমানে এক যুক্তিও পেশ করছে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁকে ছাড়া অন্য সকল কিছুর পূজা-অর্চনা থেকে আমাদের বাধা দান করতেন। যেহেতু আমরা সর্বদা তা করছি, কিন্তু তিনি বাধা দিচ্ছেন না, সুতরাং প্রমাণিত হল- এ কাজ উত্তম এবং তাঁর নিকট পছন্দ।

২. অর্থাৎ এ কথা সত্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছু হতে পারে না। বরং প্রতিটি বিষয় তাঁর ইচ্ছায় হয়। কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে, সেই বিষয়টি আমাদের জন্য উত্তম। এমন হলে তো দুনিয়াতে কোন কাজ ও কোন জিনিসই মন্দ থাকে না, জগতের সবকিছু ভাল হয়ে যাবে- মন্দের বীজই খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, জালেম ও খুনী এই কথাই বলবে যে, আল্লাহ না চাইলে আমাকে এমন জুলুম ও নির্যাতন করতে দিতেন না। যখন করতে দিয়েছেন, বোঝা গেল, তিনি এ কাজে খুশী ও রাযী!!

আসল কথা হল, আল্লাহর পক্ষ হতে কোন বিষয়কে ঘটতে দেওয়া আর বিষয়টির প্রতি তাঁর রাযি-খুশী থাকা— এ দুটি এক নয়। একটি আরেকটির জন্য জরুরি নয়। এমন মনে করা এবং এ দু'য়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্যতা সাব্যস্ত করা কোন জ্ঞানের কথা নয়, কল্পনার তীর মাত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আনআ'ম এর ১৪৮নং আয়াত- سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا -এর তাফসীরে গত হয়েছে।

৩. ওদের আকল-বুদ্ধিপ্রসূত দলীলের অবস্থা তো শুনলে। তা ছাড়া কোন ধর্মীয় দলীল কি ওদের দাবির সপক্ষে আছে? যেমন আল্লাহর অবতারিত কোন কিতাব কি ওদের হাতে আছে, যার

২৩. এভাবেই, আমি আপনার আগে যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, সেখানকার বিত্তশালীরা বলেছে, 'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের একটি পথের উপর পেয়েছি আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ۝٢٣

২৪. (সতর্ককারী) বললেন, 'আমি যদি তোমাদের নিকট ওই পথের চেয়ে অধিক সরলপথ এনে থাকি, যার উপর তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছ—(তবুও কি তোমরা তাদেরই অনুসরণ করবে?)[১] ওরা বলতে থাকল, 'তোমাদের যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি[২]।'

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝٢٤

২৫. অতঃপর আমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। সুতরাং দেখুন, কেমন ছিল অস্বীকারকারীদের পরিণাম!

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٢٥

[রুকূ - ৩]

২৬. (স্মরণ কর), যখন ইবরাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের উপাসনা কর, তাদের থেকে আমি সম্পূর্ণ পৃথক—

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝٢٦

মধ্যে শিরককে ভাল বলা হয়েছে? বলা বাহুল্য, এরূপ কোন প্রমাণ ওদের নিকট নেই। অতএব বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া ওদের কাছে আর কিছু নেই। এটাই ওদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ, যা প্রত্যেক যুগের মুশরিকরা পেশ করে এসেছে। সামনে এ কথাই বলা হচ্ছে।

১. অর্থাৎ পয়গম্বর বললেন– তোমাদের বাপদাদাদের পথের চেয়ে উত্তম পথ বলে দিলেও কি তোমরা সেই পুরাতন পথেরই পথিক হয়ে থাকবে?

২. অর্থাৎ যাই হোক, আমরা তোমার কথা মানতে পারি না এবং পুরাতন পৈতৃক পথ পরিত্যাগ করতে পারি না।

২৭. 'তিনি ব্যতীত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তো, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন[১]।'

إِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ۝

২৮. আর তিনি (আল্লাহ) উক্ত বাণীকে তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে চিরস্থায়ী বাণী বানিয়ে দিলেন, যাতে তারা ফিরে আসে[২]।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

২৯. বস্তুত আমি এদের ও এদের পূর্বপুরুষদের জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি। অবশেষে এদের নিকট সত্য ও স্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী রাসূল* আগমন করলেন[৩]।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

৩০. ওদের নিকট যখন সত্য আসল, ওরা বলতে লাগল, 'এটা যাদু এবং আমরা একে অস্বীকার করি[৪]।'

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ শুধু এক আল্লাহর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে মনযিলে মকসূদের শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন।

বি. দ্র. এখানে এই কাহিনী বর্ণনা করে ইশারা করা হচ্ছে যে, দেখ– তোমাদের মহান আদর্শ নেতা স্বীয় পিতার পথ ভ্রান্ত হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছিলেন, তোমরাও তাই কর। আর যদি বাপদাদাদের অনুকরণ করতেই হয়, তবে সেই পিতার পথে চল, যিনি দুনিয়াতে সত্য ও সততার ঝাণ্ডা উড়িয়ে ছিলেন এবং নিজের সন্তান-সন্ততিকে এ ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, আমার পরে এক আল্লাহ ছাড়া কারো উপসনা করো না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– وَوَصّٰى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ (আর ইবরাহীম আ. এরই ওসিয়ত করে গিয়েছেন আপন পুত্রদের এবং ইয়াকুব আ.ও। –বাকারা, আয়াত ১৩২)

২. অর্থাৎ যাতে একে অন্য থেকে তাওহীদের বাণী ও এর দলীল-প্রমাণাদি শুনে (মন্দ পথ ছেড়ে) সৎপথের অনুসারী হতে থাকে।

* দ্বিতীয় তরজমা–'স্পষ্ট রাসূল'।

৩. অর্থাৎ পরিতাপের বিষয়, ওরা ইবরাহীমের উত্তরাধিকার গ্রহণ করল না এবং তাঁর ওসিয়তের উপর চলল না। বরং আল্লাহ যেসব পার্থিব উপকরণ দান করেছিলেন, তার স্বাদে বিভোর হয়ে আল্লাহর দিক থেকে একেবারে গাফেল হয়ে গেল। পরিশেষে ওদের গাফলতের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য আল্লাহ তাআলা সেই পয়গম্বরকে পাঠালেন, যাঁর পয়গম্বরী সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। তিনি সত্য দীন পৌঁছালেন, কুরআন পড়ে শোনালেন এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন।

৪. অর্থাৎ কুরআনকে যাদু বলতে শুরু করল এবং পয়গম্বরের কথা মানতে অস্বীকার করল।

৩১. ওরা আরো বলল, 'এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হল না কেন[১]?'

وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

৩২. তবে কি ওরা আপনার রবের রহমত বন্টন করছে[২]? আমি পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করে দিয়েছি এবং তাদের কতকের মর্যাদা কতকের উপর উন্নীত করেছি[★]। ফলে তাদের একে অপরকে অধীনস্ত বানায়[৩]। আর আপনার রবের রহমত তারা যা-কিছু সঞ্চয় করে তা থেকে উত্তম[৪]।

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৩৩. সকল মানুষ একই মতাবলম্বী হয়ে যাবে– এ আশঙ্কা যদি না থাকত, তবে যারা 'রহমান'কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে তাদের ঘরের জন্য দিয়ে দিতাম রূপার ছাদ এবং রূপার সিঁড়ি, যার উপর তারা আরোহণ করত।

وَلَوْ لَاۤ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ কুরআন যদি অবতীর্ণ করতেই হত, তবে মক্কা বা তায়েফের কোন বড় সরদারের নিকট অবতীর্ণ করা হত। এ কথা কী করে বিশ্বাস করা যায় যে, বড় বড় ধনী সরদারদের বাদ দিয়ে আল্লাহ রেসালাতের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন, যিনি সরদারী ও ধন-দৌলতের দিক দিয়ে কোন স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী নন।

২. অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদা বণ্টনের দায়িত্ব কি তোমাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করছ?

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'কতককে কতকের উপর কয়েক স্তরের মর্যাদা দান করেছি।'

৩. অর্থাৎ কাউকে ধনী, কাউকে ফকীর বানিয়েছেন। একজনকে বিপুল ধন-দৌলত দিয়েছেন, আরেকজনকে তার অপেক্ষা কম দিয়েছেন। কেউ অধীন, কেউ প্রধান।

৪. অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদা বাহ্যিক সম্পদ ও প্রতিপত্তি এবং পার্থিব বস্তুসামগ্রীর চেয়ে অনেক উর্ধের বিষয়। যখন আল্লাহ দুনিয়ার বস্তুসামগ্রী তাদের (কাফেরদের) ইচ্ছামত বণ্টন করেননি, তখন নবুওয়াত-রিসালাত তাদের ইচ্ছামত দিবেন— এটা কী করে সম্ভব?

সম্মুখে পার্থিব ধন-সম্পদ ও বস্তুগত আসবাবপত্র যে আল্লাহর নিকট গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ– তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৪. এবং তাদের ঘরের জন্য (দিতাম) রূপার দরজা ও রূপার পালঙ্ক, যার উপর তারা হেলান দিয়ে বসত।

وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. এবং স্বর্ণেরও[১]। এসব কিছুই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আখেরাত আপনার রবের নিকট মুত্তাকীদের জন্যই[২]।

وَزُخْرُفًا ۭ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾

[রুকূ - ৪]

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে, আমি তার জন্য এক শয়তান নিযুক্ত করি আর সে হয়ে যায় তার সাথী[৩]।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট পার্থিব ধন-সম্পদের কোনই মর্যাদা নেই। এমন কি, সম্পদপ্রাপ্তিও আল্লাহর কাছে নৈকট্য ও মর্যাদা লাভের কোন প্রমাণ নয়। এ তো এমন মূল্যহীন ও তুচ্ছ বস্তু যে, বিশেষ একটি কারণ না থাকলে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ঘরবাড়ির ছাদ, সিঁড়ি, দরজা, চৌকাঠ, তালা, ও খাট-পালঙ্ক– সবই সোনা–চাঁদির বানিয়ে দিতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে, কাফের হলেই এরূপ আসবাবপত্র পাওয়া যায়– এ কথা ভেবে লোকেরা ব্যাপকভাবে কুফরের পথ অবলম্বন করত, তাই এটি খোদায়ী মাসলাহাত বা কল্যাণ-নীতির পরিপন্থী হত। এ জন্য এমনটি করা হয়নি।

হাদীছে আছে, আল্লাহর নিকট যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হত, তবে তিনি কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। অতএব যে বস্তু আল্লাহর নিকট এত তুচ্ছ, তাকে আল্লাহর নিকট নেতৃত্ব ও মর্যাদা এবং নবুওয়াত ও রিসালাত লাভ করার মানদণ্ড সাব্যস্ত করা বড় নির্বুদ্ধিতা।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। কোথাও তো তিনি ওকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যেহেতু আখেরাতে ওর জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে, তাই দুনিয়াতে ওর খুব আরাম-আয়েশ (ও ধন-সম্পদ) পাওয়া দরকার। কিন্তু এমন হলে সকলে কুফরের পথই অবলম্বন করে বসবে।'

২. অর্থাৎ দুনিয়ার বস্তুরাজিতে সকলেই (কিছু না কিছু পরিমাণে) অংশীদার, কিন্তু আখেরাত চিরস্থায়ী নে'য়ামত ও সুখশান্তিসহ শুধু মুত্তাকীদের জন্য নির্ধারিত।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্য নসীহত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, ওর উপর একটা শয়তানকে বিশেষভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যে সর্বদা ওকে বিভ্রান্ত করে এবং ওর দিলে নানা রকম ওয়াসওয়াসা ঢালে। এই শয়তান দোযখে না পৌছানো পর্যন্ত ওর সঙ্গ ত্যাগ করে না।

৩৭. আর ওই শয়তানেরা সৎপথ থেকে ওদের বাধা দিয়ে রাখে। অথচ ওরা মনে করতে থাকে, ওরা সৎপথে আছে[১]।

وَاِنَّهُمۡ لَیَصُدُّوۡنَهُمۡ عَنِ السَّبِیۡلِ وَیَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ ۞

৩৮. অবশেষে সে যখন আমার নিকট আসবে, তখন (শয়তানকে) বলবে, 'হায়, আমার ও তোর মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের সমান দূরত্ব থাকত! (তুই) কত নিকৃষ্ট সঙ্গী[২]!'

حَتّٰۤی اِذَا جَآءَنَا قَالَ یٰلَیۡتَ بَیۡنِیۡ وَبَیۡنَکَ بُعۡدَ الۡمَشۡرِقَیۡنِ فَبِئۡسَ الۡقَرِیۡنُ ۞

৩৯. যেহেতু তোমরা অপরাধ করেছ, সুতরাং আজ এ বিষয়টি তোমাদের কোন উপকারে আসবে না যে, তোমরা আযাবে পরস্পরের শরীক[৩]।

وَلَنۡ یَّنۡفَعَکُمُ الۡیَوۡمَ اِذۡ ظَّلَمۡتُمۡ اَنَّکُمۡ فِی الۡعَذَابِ مُشۡتَرِکُوۡنَ ۞

৪০. আপনি কি বধিরদের শোনাতে পারবেন, অথবা পথ দেখাতে পারবেন অন্ধদের ও যারা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে আছে তাদের?

اَفَاَنۡتَ تُسۡمِعُ الصُّمَّ اَوۡ تَهۡدِی الۡعُمۡیَ وَمَنۡ کَانَ فِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۞

---

১. অর্থাৎ শয়তানেরা ওদেরকে নেকীর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু ওদের আকল-বুদ্ধি এতটা লোপ পেয়ে যায় যে, নিজেদের পথকেই সঠিক পথ মনে করে। আসলে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করার যোগ্যতাও ওদের অবশিষ্ট থাকে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে যখন হাযির হবে, তখন প্রকাশ পাবে, শয়তান কত মন্দ সঙ্গী ছিল। তখন অনুতাপ ও ক্রোধের সাথে কাফের বলবে, হায়! তোর ও আমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের সমান দূরত্ব হত এবং এক মুহূর্তও তোর সংস্পর্শে অতিবাহিত না হত। হতভাগা! তুই আমার থেকে দূর হ।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ দুনিয়াতে সে শয়তানের পরামর্শ মত চলে। কিন্তু পরকালে সে ওর সাথে সম্পর্কের জন্য অনুতাপ করবে। এ ধরনের শয়তান সাথী কারো ক্ষেত্রে জিন কারো ক্ষেত্রে মনুষ্য হয়ে থাকে।'

৩. দুনিয়ার নিয়ম হল, কোন বিপদে ছোট-বড় সকলে পতিত হলে তা কিছুটা হালকা মনে হয়। কথিত আছে, যে মুসিবতে সবাই শরীক, তা আনন্দ-উৎসবের মত লাগে। কিন্তু দোযখের মধ্যে সকল জিন ও মানুষ শয়তানেরা এবং অধীন ও প্রধান সকলে আযাবে শরীক হওয়ার কারণে কারো একটুও ফায়দা হবে না। আযাব এতটাই প্রচণ্ড হবে যে, এ ধরনের স্থূল কারণে সান্ত্বনালাভ ও কষ্টলাঘব হতে পারে না।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেররা বলবে, শয়তানেরা আমাদের আযাবে ফেলেছে, তবে মজার বিষয়, তারাও রক্ষা পায়নি। (আল্লাহ বলেন), কিন্তু শয়তান যদি শাস্তি পায় তাতে কাফেরের কী লাভ?' (সে তো আগুনে পুড়ছে।)

৪১. আমি যদি আপনাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নেই, তবু আমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নেব।

فَاِمَّا نَذۡهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنۡهُمۡ مُّنۡتَقِمُوۡنَ ﴿۴۱﴾

৪২. অথবা আপনাকে যদি তা (আযাব) দেখিয়ে দেই, যার প্রতিশ্রুতি আমি ওদের দিয়েছি- তবে ওদের উপর তো আমার পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

اَوۡ نُرِیَنَّكَ الَّذِیۡ وَعَدۡنٰهُمۡ فَاِنَّا عَلَیۡهِمۡ مُّقۡتَدِرُوۡنَ ﴿۴۲﴾

৪৩. অতএব আপনার নিকট ওহী মারফত যা পাঠানো হয়েছে, আপনি তা আঁকড়ে ধরে রাখুন। আপনি অবশ্যই সরল পথের উপর আছেন[১]।

فَاسۡتَمۡسِكۡ بِالَّذِیۡۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ ﴿۴۳﴾

৪৪. নিশ্চয় এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য বড় সম্মানের বিষয়[২]। আর

وَاِنَّهٗ لَذِكۡرٌ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَ ۚ

১. অর্থাৎ অন্ধদের সত্যের পথ দেখিয়ে দেওয়া, বধিরদের সত্যের আওয়াজ শুনিয়ে দেওয়া এবং যারা পরিষ্কার ভ্রান্তি ও গোমরাহীতে পড়ে আছে, তাদের অন্ধকার থেকে বের করত সত্যের আলোকোজ্জ্বল সড়কে পরিচালিত করা— এসব আপনার এখতিয়ারে নয়। হাঁ, আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারে আছে। তিনি ইচ্ছা করলে আপনার আওয়াজে প্রভাব ও আছর সৃষ্টি করে দেবেন।

যা হোক, আপনি এই চিন্তায় থাকবেন না যে, সকল মানুষ সত্যকে কেন কবুল করে না এবং কেন ওরা নিজেদের পরিণাম খারাপ করছে? ওদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। তিনিই ওদের কৃতকর্মের শাস্তি দেবেন। আপনার ওফাতের পরও দিতে পারেন, অথবা আপনাকে দেখিয়েও দিতে পারেন। কোন অবস্থাতেই ওরা আল্লাহর মুঠি থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না, আর আল্লাহও ওদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ

আপনার কর্তব্য হল- আপনার নিকট যে ওহী ও হুকুম প্রেরণ করা হয়, তার উপর দৃঢ়তার সাথে জমে থাকা এবং সর্বদা দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। দুনিয়া যে পথেই যাক আপনি আল্লাহর দয়ায় সঠিক পথে আছেন, যা থেকে এক পা এদিক-সেদিক সরার প্রয়োজন নেই এবং কোন প্রবৃত্তিপূজারীর কামনা-বাসনার দিকে ভ্রূক্ষেপ করারও দরকার নেই।

২. অর্থাৎ কুরআন করীম আপনার ও আপনার জাতির জন্য বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণ। এর চেয়ে বড় সম্মান ও গৌরবের বিষয় আর কী হবে যে, আল্লাহর কালাম এবং সমগ্র দুনিয়ার মুক্তি ও সফলতার শাশ্বত সনদ তাদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তারা এর সর্বপ্রথম শ্রোতা বলে সাব্যস্ত হয়েছে। যদি আকল-বুদ্ধি থাকে, তবে তাদের উচিত এই মহান

وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ۝

শীঘ্রই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে[১]।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ۝

৪৫. আমি আপনার পূর্বে আমার যে রাসূলদের পাঠিয়েছি, আপনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি কি 'রহমান' (আল্লাহ) ছাড়া অন্যান্য উপাস্য স্থির করেছি, যাদের উপাসনা করা হবে[২]?

[রুকূ - ৫]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

৪৬. নিশ্চয়ই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ফেরাওন ও তার সভাসদদের নিকট। অতএব মূসা বললেন, 'আমি বিশ্বজগতের রবের রাসূল'।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ۝

৪৭. তো, তিনি যখন ওদের নিকট আমার নিদর্শনাদি উপস্থাপন করলেন, তখনি ওরা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল[৩]।

নে'য়ামতের কদর করা এবং কুরআন– যা তাদের সকলের জন্য মহান উপদেশবানী– এর হেদায়েতসমূহের উপর আমল করে সর্বাগ্রে ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জন করা।

১. অর্থাৎ ভবিষ্যতে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসা করা হবে– তোমরা এই মহান নে'য়ামতের কতটুকু কদর করেছিলে এবং এই সম্মান ও মর্যাদার কী শুকরিয়া আদায় করেছিলে?

২. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের (আ) পথই আপনার পথ। শিরকের শিক্ষা কোন নবীই দেননি, আল্লাহ তাআলাও কোন নবীর শরী'য়তে এর বৈধতা রাখেননি যে, তাঁকে ছাড়া অন্যদের পূজা করা হবে।

আর 'পূর্ববতী নবীদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন'– এই কথার অর্থ হচ্ছে, যখন তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন জিজ্ঞেস করুন (যেমন : মি'রাজের রাতে হয়েছিল)। অথবা উদ্দেশ্য হল তাঁদের হাল-অবস্থা কিতাবাদিতে দেখুন।

যা হোক, বিচার-বিশ্লেষণ, যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধানের যত উপায়-মাধ্যম আছে, তা সব ব্যবহার করলে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, আসমানী কোন ধর্মেই শিরকের অনুমতি কখনো দেওয়া হয়নি।

৩. অর্থাৎ মু'জেযাসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করল।

৪৮. আমি ওদের যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা পূর্ববর্তী নিদর্শনের চেয়ে বড় হত।[১] এবং আমি ওদের শাস্তিতে পাকড়াও করেছিলাম, যাতে ওরা ফিরে আসে[২]।

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. আর ওরা বলল, 'হে যাদুকর[৩]! তুমি আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক- যেভাবে তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন*। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাব[৪]।'

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর আমি যখন ওদের উপর থেকে আযাব দূর করে দিতাম, তখনই ওরা ওয়াদা ভঙ্গ করত[৫]।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾

---

১. অর্থাৎ আমার কুদরতের এবং মূসার সত্যতার একাধিক নিদর্শন দেখালাম, যার একটি অপরটির চেয়েও বড় ছিল।

২. অর্থাৎ অবশেষে ওইসব নিদর্শন পাঠালেন, যেগুলি এক ধরনের আযাবও ছিল। যেমন: সূরা আরাফে (১৩৩) গত হয়েছে-

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ

উদ্দেশ্য ছিল, তারা যাতে ভীত হয়ে নিজেদের আচরণ থেকে ফিরে আসে।

৩. ওদের ভাষায় আলেমকে ساحر (যাদুকর) বলা হত। কারণ, ওদের নিকট যাদুই ছিল বিরাট ইলম। ওরা হযরত মূসার (আ) সামনে যখন কাকুতি-মিনতি ও তোষামদ করত, তখন এমন শব্দ ব্যবহার করত যা বাহ্যত সম্মান প্রকাশক ছিল বটে। তবে সম্ভবত তাদের দুষ্ট মনে এদিকেও ইশারা ছিল যে, আমরা তোমাকে এখনো নবী মনে করি না- শুধু একজন পারদর্শী যাদুকর মনে করি।

* দ্বিতীয় তরজমা- '... তোমার রব তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তার উসীলা দিয়ে আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক'।

৪. অর্থাৎ আপনার প্রভু দো'য়ার যে তরীকা আপনাকে শিখিয়েছেন এবং আপনার সঙ্গে যা কিছুর অঙ্গীকার করেছেন, সে অনুসারে আপনি আমাদের জন্য দো'য়া করুন, যাতে এ আযাব দূর হয়ে যায়। যদি আপনার দো'য়ায় এরূপ হয়ে যায়, তবে আমরা অবশ্যই পথে এসে যাব এবং আপনার কথা মেনে নেব।

৫. অর্থাৎ যখনই কষ্ট দূর হত এবং বিপদের ঘনঘটা কেটে যেত, তখনি নিজেদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যেত, যেন কোন ওয়াদা করেইনি।

৫১. আর ফেরাওন নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমারই হাতে নয়? এবং এই যে নহরগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত। তোমরা কি দেখছ না[১]?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾

৫২. 'আচ্ছা, আমি কি এই ব্যক্তি থেকে উত্তম নই, যে হীন এবং যে স্পষ্ট করে বলতেও পারে না[২]?

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾

৫৩. 'তো, তাকে স্বর্ণের বালা দেওয়া হল না কেন, অথবা কেন তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দলে-দলে আগমন করলেন না[৩]?

فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. মোটকথা, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। সুতরাং ওরা ওর কথাই মেনে নিল। বস্তুত ওরা ছিল নাফরমান সম্প্রদায়[৪]।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾

---

১. ওই অঞ্চলের রাজ্যসমূহে মিসরের রাজা অতি বড় বলে বিবেচিত হত। খাল-নালা সে-ই তৈরি করেছিল। খাল কেটে নীল নদীর পানি নিজ বাগ-বাগিচায় আনার ব্যবস্থা করেছিল। এ কারণে সে বলছে– এ সকল উপায়-উপকরণ থাকতে আমাদের কী প্রয়োজন– মূসার ন্যায় মামুলী লোকের সম্মুখে পরাভূত হওয়ার?

২. অর্থাৎ মূসার নিকট না আছে ধন-সম্পদ, না রাজ্য, না মর্যাদা, না কোন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। এমন কি, কথা বলতে গেলেও তার জিহ্বা তাকে সঙ্গ দেয় না।

৩. কথিত আছে, ফেরাওন নিজে বহু মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার পরিধান করত এবং কোন কর্মচারী বা মন্ত্রীর প্রতি তুষ্ট হলে তাকেও সোনার অলঙ্কার পরাত। তাছাড়া তার সম্মুখে ফৌজ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তার কথার অর্থ এই যে, আমরা যেখানে কাউকে সম্মান দিতে এরূপ করে থাকি (অর্থাৎ অলঙ্কার পরিধান করাই)— সেখানে আল্লাহ কাউকে নিজ প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠালে তার হাতে সোনার বালা এবং তার সঙ্গে ফেরেশতা বাহিনী থাকবে না?

৪. অর্থাৎ ফেরাওন নিজের প্রবঞ্চনাকর কথাবার্তা দ্বারা জাতিকে বোকা বানিয়ে দিল। ফলে ওই আহমকরা তারই কথা মেনে নিল। আসলে ওদের স্বভাবের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী প্রথম থেকেই প্রোথিত ছিল। একটু বাহানা পাওয়ামাত্র তা-ই সবেগে জেগে উঠল।

৫৫. অতঃপর ওরা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করে তুলল[১], আমি ওদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং ওদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।

فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ۟

৫৬. আর ওদের বানিয়ে দিলাম এক অতীত জাতি ও পরববর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত[২]।

فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ۟

[রুকূ - ৬]

৫৭. যখন মারয়াম-পুত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, তখনি এর কারণে আপনার সম্প্রদায় হৈ-চৈ করতে লাগল।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ۟

৫৮. এবং বলল, 'আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না তিনি[৩]? ওরা আপনার সামনে এ উদাহরণ শুধু

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ

---

১. অর্থাৎ এমন কাজকর্ম করল, যার কারণে সাধারণত আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হয়।

২. অর্থাৎ ওদের ঘটনা পরবর্তীতে আগমনকারী জাতিসমূহের জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

৩. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা যখন করা হত, আরবের মুশরিকরা এতে খুব শোরগোল করত এবং নানা রকমের আজে-বাজে কথা বলত। কোন কোন হাদীছে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন— إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর উপাসনা তোমরা কর, তা দোযখের ইন্ধন। -আম্বিয়া : ৯৮), তখন ওরা বলতে শুরু করল— খ্রিস্টানরা তো হযরত ঈসার ইবাদত করে। এখন বলুন, আপনার ধারণায় আমাদের উপাস্যরা ভাল, না ঈসা আলাইহিস সালাম? বলা বাহুল্য, আপনি ঈসাকেই ভাল বলবেন। তো তিনিই যখন আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত এবং এ হিসেবে দোযখের ইন্ধন, তখন আমাদের উপাস্যরাও তা হলে কী আসে যায়? (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৫৯)

অন্যান্য বর্ণনায় আছে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন— ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير (আল্লাহ ছাড়া যারই উপাসনা করা হয়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।) তখন ওরা বলল— তবে কি ঈসার মধ্যেও কোন মঙ্গল নেই? (মুসনাদ আহমদ, হাদীস : ২৯১৮; মুজামে কাবীর তবারানী, হাদীস : ১২৭৪০)

অথচ জানা কথা, উক্ত আয়াতে এবং হুযূরের এই বাক্যে সেসব উপাস্য উদ্দেশ্য, লোকেরা যাদের পূজা করে, কিন্তু তারা তাদের নিষেধ করে না এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না। (অতএব স্পষ্ট বিষয় যে, হযত ঈসা তার অন্তর্ভুক্ত নন)। কিন্তু এই অভিযোগকারীদের

বিতর্কের জন্য পেশ করেছে। বরং ওরা তো কলহপ্রিয় সম্প্রদায়।	لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝
৫৯. তিনি তো কেবল একজন বান্দা, যাঁর প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তাঁকে বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য এক দৃষ্টান্ত[১]।	اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

উদ্দেশ্য তো ছিল, শুধু কলহ সৃষ্টি করা এবং অযথা তর্ক করত সত্যকে প্রতিরোধ করা। এ জন্য ওরা জেনে-বুঝেই এমন অর্থ করত, যা বক্তার উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

কখনো বলত– বুঝেছি, খ্রিস্টানরা যেমন হযরত ঈসার উপাসনা করে, আপনিও তেমন আমাদের দ্বারা নিজের পূজা করাতে চান। ওরা হয়ত কখনো এ কথাও বলে থাকবে যে, স্বয়ং কুরআন হযরত ঈসার এই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে– اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (নিশ্চয় ঈসার অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের অবস্থার ন্যায়– তিনি তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'হও', ফলে তিনি হয়ে গেলেন। –আলে ইমরান : ৫৯) এখন বলুন, আমাদের উপাস্যরা উত্তম, না ঈসা (আ)? কেন তাঁর প্রশংসা করেন, আর আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলেন?

আল্লাহ জানেন, আরও কি কি আজে-বাজে কথা ওরা বলত। এ সমস্ত বিষয়ের উত্তর সামনে দেওয়া হচ্ছে।

১. অর্থাৎ কেবল এই এক বিষয়েই কলহ করছে তা নয়, ওদের স্বভাবই কলহপ্রিয়। তাই সরল-সহজ কথাও ওদের মগজে ঢোকে না, অযথাই অবান্তর কথাবার্তা এবং নিরর্থক বিতর্কের সৃষ্টি করতে থাকে।

ওদের বোঝা উচিত, কোথায় সেই শয়তানেরা, যারা লোকের দ্বারা নিজেদের পূজা করায় এবং এতে আনন্দিত হয়। অথবা কোথায় পাথরের সেই নিস্প্রাণ মূর্তিসমূহ, যারা কাউকে কুফর ও শিরেকী কাজে বাধা দানের কোন শক্তি রাখে না, আর কোথায় আল্লাহর ওই মকবূল বান্দা (ঈসা আ), যাঁর প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেছেন। যিনি নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলে স্বীকার করেছেন এবং নিজ উম্মতকে এ কথার দিকে আহ্বান করতেন যে– اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (নিশ্চয় আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব, অতএব তাঁর ইবাদত কর। এ-ই সরল পথ।)— এই মকবূল বান্দাকে কি حصب جهنم বলা যেতে পারে? অথবা ওই শয়তানরা ও পাথরের মূর্তিগুলো তাঁর সমকক্ষ হতে পারে?

স্মরণ রাখতে হবে, কুরআনে করীম কোন বান্দাকেই খোদায়ী মর্যাদা দেয় না। কী করে দেবে? শিরকের বিরুদ্ধেই তো তার সমস্ত সংগ্রাম। হাঁ, নৈকট্যপ্রাপ্ত ও মকবূল বান্দাকে কুরআন পাথরের ও দূরাত্মাদের সমান করে দেবে– এও হতে পারে না।

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতাদের সৃষ্টি করতে পারি, যারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হবে[১]।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ۝٦٠

৬১. নিশ্চয় তিনি তো কিয়ামতের নিদর্শন[২]। অতএব তাতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটিই সরল পথ।

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٦١

৬২. শয়তান যেন তোমাদের (সৎপথ থেকে) নিবৃত্ত করতে না পারে। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু[৩]।

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝٦٢

৬৩. যখন ঈসা নিদর্শনাদি নিয়ে আগমন করলেন, তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে এসেছি[৪] এবং এজন্য এসেছি, যাতে তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছ তন্মধ্যে কিছু বিষয় তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে দেই[৫]।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ

---

১. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ফেরেশতাসুলভ কিছু গুণাবলি ছিল বটে (যেমন: সূরা মায়েদা, আলে-ইমরান ও কাহাফের তাফসীরে ইঙ্গিত করা হয়েছে।) কিন্তু এতটুকু ব্যাপার হলেই কোন ব্যক্তি উপাস্য হয়ে যায় না। আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে তোমাদের বংশ থেকেও এমন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করতে পারি, অথবা তোমাদের পরিবর্তে আসমান থেকে ফেরেশতাদের এনে পৃথিবীকে আবাদ করতে পারি– আমার সকল শক্তিই রয়েছে।

২. হযরত ঈসা (আ)-এর প্রথম আগমন বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের জন্য খোদায়ী কুদরতের এক নিদর্শন ছিল। কারণ, তিনি বিনাবাপে জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি বিস্ময়কর মুজেযাসমূহ প্রদর্শন করেন। আর তাঁর পুনর্বার আগমন হবে কিয়ামতের নিদর্শন। তাঁর আগমনে লোকেরা জানতে পারবে, কিয়ামত অতি সন্নিকটে।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের বিষয়ে সন্দেহ করো না এবং ঈমান ও তাওহীদের যে সরলপথ আমি বলে দিচ্ছি তা অবলম্বন কর। নতুবা তোমাদের চিরশত্রু শয়তান এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৪. الحكمة- দ্বারা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয়াদি উদ্দেশ্য।

৫. অর্থাৎ আমি দীনী বিষয়াদি বর্ণনা করছি। অথবা অর্থ এই যে— যেসব বিষয় মূসার (আ) শরী'য়ত হারাম সাব্যস্ত করেছিল, তন্মধ্যে কিছু বিষয়কে আমি হালাল ঘোষণা করছি। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (এবং এজন্য এসেছি, যাতে

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান[১]।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ— তিনিই আমার রব ও তোমাদের রব। অতএব তাঁরই ইবাদত কর। এ-ই সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝

৬৫. অতঃপর ওদের মধ্যকার বিভিন্ন দল বিভেদ সৃষ্টি করল[২]। সুতরাং অপরাধীদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তির দুর্ভোগ।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৬৬. ওরা কেবল কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে, যাতে তা ওদের উপর এমন আকস্মিকভাবে এসে পড়ে যে, ওরা টেরও না পায়[৩]।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۝

৬৭. বন্ধুরা সেদিন একে অন্যের শত্রু হবে– খোদাভীরুগণ ছাড়া[৪]।

তোমাদের জন্য সেসব বস্তুর কতক হালাল করে দেই, যা তোমাদের উপর পূর্বে হারাম করা হয়েছিল। –আলে-ইমরান, ৫০)

১. এ-ই ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা। লক্ষ করার বিষয়, কত স্পষ্টভাবে তিনি এক আল্লাহর প্রভুত্ব ও উপাস্যতার বিষয় বয়ান করেছেন এবং এই তাওহীদ ও পরহেজগারী এবং রাসূলের আনুগত্যকেই সরলপথ সাব্যস্ত করেছেন।

২. অর্থাৎ মতবিরোধ সৃষ্টি হল— ইহুদীরা তাঁকে অস্বীকার করল, আর নাসারারা স্বীকার করল। এর কিছুকাল পর নাসারারা কয়েক দলে বিভক্ত হয়– কেউ হযরত ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে, কেউ তাঁকে তিন আল্লাহর এক আল্লাহ বলে, কেউ অন্য কিছু বলে। মোটকথা, হযরত ঈসা (আ)–এর আসল শিক্ষার উপর কেউ-ই থাকল না।

৩. এমন প্রকাশ্য বর্ণনা ও সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও যারা মানে না, তারা আর কিসের অপেক্ষায় আছে? তাদের অবস্থা দেখে এ কথাই বলা যায় যে, আকস্মিকভাবে কিয়ামত এসে তাদের মাথার উপর উপস্থিত হলে তবেই মানবে। অথচ তখন মানলেও কোন উপকার হবে না।

৪. সেদিন বন্ধু থেকে বন্ধু পলায়ন করবে। কারণ আশঙ্কা আছে, তার কারণে সে ধৃত হতে পারে। দুনিয়ার সমস্ত বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিন্ন হয়ে যাবে। মানুষ আফসোস করে বলবে, অমুক দুরাচারীর সঙ্গে কেন বন্ধুত্ব করেছিলাম? তার প্ররোচনায় আজ বিপদে পড়লাম। সেদিন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুও স্বীয় বন্ধুর চেহারা দেখতে চাবে না। অবশ্য যাদের ভালবাসা ও বন্ধুত্ব আল্লাহর খাতিরে ছিল এবং যার ভিত্তি আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া ছিল, তা কাজে আসবে।

[রুকূ - ৭]

৬৮. হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না[১]।	يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. (মুত্তাকীরাই এমন লোক), যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাঁরা ছিল আজ্ঞাবহ[২]।	اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ বেহেশতে প্রবেশ কর– তোমরা সম্মানে ভূষিত হবে।	اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. তাদের কাছে (খাদেমরা) আসা-যাওয়া করবে সোনার থালা ও পানপাত্র নিয়ে[৩]। এবং সেখানে ওই সবকিছু রয়েছে, যা অন্তর কামনা করে এবং যাতে চক্ষু জুড়ায়[৪]। আর তোমরা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾
৭২. এই সেই জান্নাত, তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে– তোমরা যেসব আমল করতে তার বিনিময়ে[৫]।	وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে প্রচুর ফলমূল, যা থেকে তোমরা খেতে থাকবে[৬]।	لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾

---

১. অর্থাৎ ভবিষ্যতের কোন ভয় নেই, অতীতের কোন দুঃখ নেই।

২. (آمنوا)– অর্থাৎ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছে এবং (كانوا مسلمين)- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আজ্ঞাবহ থেকেছে।

এখান থেকে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য স্পষ্ট হয়, যেমন 'হাদীছে জিবরাঈল'-এ এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

৩. অর্থাৎ বেহেশতী বালকেরা তা নিয়ে আসা-যাওয়া করবে।

৪. যেসব নেয়ামত দ্বারা বেহেশতীদের নয়ন জুড়াবে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দীদার বা দর্শন। (رزقنا الله بفضله ومنه)

৫. অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর মীরাছ তোমরা ফেরত পেলে, তোমাদের আমলাদির বদৌলতে ও আল্লাহর অনুগ্রহে।

৬. অর্থাৎ বেছে বেছে তা থেকে আহার করবে।

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা চিরকাল থাকবে দোযখের আযাবে।	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ۝
৭৫. ওদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং ওরা হতাশ হয়ে তাতেই পড়ে থাকবে[১]।	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝
৭৬. আমি ওদের উপর জুলুম করিনি, বরং ওরাই ছিল জুলুমকারী[২]।	وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّٰلِمِينَ ۝
৭৭. ওরা ডেকে বলবে, 'হে মালেক! আপনার রব আমাদের খতম করে দিক[৩]।' সে বলবে, 'তোমাদের তো চিরকাল থাকতে হবে[৪]।'	وَنَادَوْا يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ۝
৭৮. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে[৫]।	لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ۝
৭৯. তবে কি ওরা কোন কিছু স্থির করে ফেলেছে? তাহলে আমিও স্থির করব[৬]।	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۝

১. অর্থাৎ আযাব কখনো মুলতবীও হবে না, লাঘবও করা হবে না। আর এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই— এ কথা চিন্তা করে দোযখীরা একদম নিরাশ হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমি ভাল-মন্দের সকল দিক বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং পয়গম্বরদের পাঠিয়ে হুজ্জত পূর্ণ (ওযরের পথ বন্ধ) করে দিয়েছিলাম। ওদের জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ওযর-আপত্তির অবকাশ রাখিনি। তা সত্ত্বেও ওরা মানেনি এবং নিজেদের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়নি। এমন লোকদের শাস্তি দেওয়া হলে তাকে কি জুলুম বলা যায়।

৩. দোযখের তত্ত্বাবধানকারী ফেরেশতার নাম 'মালেক'। দোযখীরা তাঁকে ডেকে বলবে, আমরা মরছিও না, নিষ্কৃতিও পাচ্ছি না। আপনার প্রভুকে বলে আযাব দিয়ে আমাদের একেবারে খতম করে দিন। অর্থাৎ মুক্তির ব্যাপারে হতাশ হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে।

৪. অর্থাৎ চিৎকার করে কোন ফায়দা নেই। তোমাদের এই অবস্থাতেই চিরকাল থাকতে হবে। কথিত আছে, দোযখীরা হাজার বছর ধরে চিৎকার করার পর তিনি এই উত্তর দেবেন।

৫. অর্থাৎ এ শাস্তির কারণ তোমাদেরই অপরাধ। তা এই যে, তোমাদের অধিকাংশই সত্য বর্জন করতে (আর অন্য অনেকে অন্ধের ন্যায় সত্য বর্জনকারীদের অনুসরণ করেছিলে)।

৬. আরবের কাফেররা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করত এবং বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য কৌশল ওদের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিত (আয়াতে সেদিকেই ইশারা)।

৮০. ওরা কি মনে করে, আমি ওদের গোপন কথা ও শলা-পরামর্শ জানি না? কেন জানব না, অথচ আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ওদের নিকট লিখতে থাকে[১]।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. আপনি বলুন, 'যদি 'রহমানের' সন্তান থাকে, তবে আমিই প্রথম উপসনাকারী হব[২]।'

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, "কাফেররা সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করে বলল, তোমাদের অবহেলার কারণে এই নবীর দাওয়াত প্রসার লাভ করেছে। অতএব সিদ্ধান্ত নিল, ভবিষ্যতে কেউ তার ধর্ম গ্রহণ করলে তারই আত্মীয়-স্বজনরা তাকে মারতে মারতে আমাদের ধর্মে ফিরিয়ে আনবে। আর বহিরাগত কেউ শহরে এলে তাকে মুহাম্মদ এর নিকট বসতে বারণ করে দেবে।"—ওরা এ কথা স্থির করল, অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা ফয়সালা করলেন,ওদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবেন এবং স্বীয় দীন ও পয়গম্বরকে বিজয় দান করবেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছাই প্রবল হল।

১. অর্থাৎ ওদের মনের গোপন কথা আমি জানি এবং গোপন পরামর্শ শুনি । আর রাজত্ব পরিচালনার নিয়মানুসারে আমার ফেরেশতারা ওদের সকল আমল ও কর্ম লিপিবদ্ধ করতে থাকে। এ সমস্ত ফাইল কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা স্থির করার চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে? আপনি বলে দিন, অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া হোক, যদি আল্লাহর সন্তানসন্ততি থাকে, তবে তাঁর সন্তানসন্ততির পূজা আমিই প্রথম করব। কেননা, আমি দুনিয়াতে সবার চেয়ে বেশি আল্লাহর ইবাদতকারী। আর আল্লাহর সঙ্গে যার যতটুকু সম্পর্ক, তা অনুসারে তাঁর সন্তানসন্ততির সঙ্গেও সম্পর্ক হওয়া উচিত। অতএব আমি اول العابدين হওয়া সত্ত্বেও যখন কোন সত্তাকে তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করি না, তখন তোমরা এত বড় খোদার হক আদায়কারী কোত্থেকে হলে যে, তাঁর মনগড়া সন্তানসন্ততির হক পর্যন্ত চিনে ফেলেছ?!!

অন্যান্য ব্যাখ্যা

কোন কোন মুফাস্সিরের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য হল—তোমাদের দাবি অনুযায়ী খোদার যদি সন্তান থাকে, তবে মনে রেখো, আমি ওই এক আল্লাহর ইবাদত করি, যিনি সর্বপ্রকার সন্তানসন্ততি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।— কেউ কেউ এখানে عابد এর অর্থ করেছেন- 'অস্বীকারকারী' অর্থাৎ, আমি ওই ভ্রান্ত আকীদার সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী। আবার কেউ বা বলেছেন, এখানে- ...ان كان- এর ان টি ' না বাচক'। অর্থাৎ রহমানের কোন সন্তান নেই, আর আমি তাঁর প্রথম ইবাদতকারী।

তবে এগুলো শক্তিশালী ব্যাখ্যা নয়। এ ছাড়া আরো মতামত রয়েছে। সব এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। والله اعلم

سُبۡحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ﴿۸۲﴾

৮২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব এবং আরশের অধিপতি ওরা যা বলে তা থেকে পবিত্র[১]।

فَذَرۡهُمۡ یَخُوۡضُوۡا وَ یَلۡعَبُوۡا حَتّٰی یُلٰقُوۡا یَوۡمَهُمُ الَّذِیۡ یُوۡعَدُوۡنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. অতএব আপনি ওদেরকে স্ব অবস্থায় ছেড়ে দিন, ওরা আজে-বাজে কথায় ও খেল-তামাশায় মেতে থাকুক– যে পর্যন্ত না নিজেদের সেই দিবসের সম্মুখীন হয়, যার প্রতিশ্রুতি ওদের দেওয়া হয়েছে[২]।

وَ هُوَ الَّذِیۡ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِی الۡاَرۡضِ اِلٰهٌ ؕ وَ هُوَ الۡحَكِیۡمُ الۡعَلِیۡمُ ﴿۸۴﴾

৮৪. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানেও মা'বূদ এবং যমীনেও মা'বূদ। আর তিনিই প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ[৩]।

وَ تَبٰرَكَ الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ۚ وَ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ۚ وَ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. বড় বরকতময় তিনি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যকার সব কিছুর মালিক। আর তাঁরই নিকট রয়েছে কিয়ামতের ইলম[৪] এবং তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে[৫]।

وَ لَا یَمۡلِكُ الَّذِیۡنَ یَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنۡ شَهِدَ بِالۡحَقِّ

৮৬. ওরা তাঁর পরিবর্তে যাদের ডাকে, তারা সুপারিশেরও ইখতিয়ার রাখে না। তবে যে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে আর তারা

---

১. অর্থাৎ এ লোকেরা তাঁর সঙ্গে যা কিছু সম্পৃক্ত করে, যথা– সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি, তা থেকে আল্লাহ তাআলার সত্তা বহু উর্ধ্বে এবং পাক-পবিত্র। তাঁর সত্তার মধ্যে অন্য কারো পিতা বা পুত্র হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই।

২. অর্থাৎ গাফলত ও মূর্খতার উন্মাদনায় ডুবে যা কিছু অবান্তর কথা বলছে, বলতে দিন। আরো কিছুদিন দুনিয়ার খেল-তামাশায় অতিবাহিত করুক। পরিশেষে সেই প্রতিশ্রুত দিনের আগমন হবে, যেদিন ওদেরকে সকল ঔদ্ধত্য ও দুষ্কৃতির স্বাদ আস্বাদন করানো হবে।

৩. আসমানেও ফেরেশতা ও সূর্য-চন্দ্র উপাস্য হতে পারে না এবং পৃথিবীতেও মূর্তি, প্রতিমা প্রভৃতি কেউই উপাস্য হতে পারে না। সমগ্র পৃথিবী ও আকাশবাসীদের উপাস্য একমাত্র সেই আল্লাহ, যিনি নিম্নদেশ থেকে উর্ধ্বজগতের মালিক এবং নিজ জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে সমস্ত সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র অধিপতি।

৪. অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে, তা একমাত্র ওই মালিকই জানেন।

৫. আর সেখানে পৌছার পর সকলের পাপ-পুণ্যের হিসাব হবে।

وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۝

(এ কথা) জানে, (তার বিষয় ভিন্ন)*[১]।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ۝

৮৭. আপনি যদি ওদের জিজ্ঞাসা করেন, কে ওদের সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। অতএব ওরা বিমুখ হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে[২]?

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ۝

৮৮. রাসূলের উক্তি- 'হে আমার রব! এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা ঈমান আনে না'– এ উক্তির শপথ! (আমি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করব)[৩]।'

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ۝

৮৯. অতএব আপনি ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম'[৪]। শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে[৫]।

---

* দ্বিতীয় তরজমা–'তবে (সুপারিশ করতে পারবে) শুধু তারা, যারা সত্যকে স্বীকার করেছে আর তারা জানত-বুঝত'।

১. অর্থাৎ তারা সুপারিশ বলতে শুধু এতটুকু করতে পারবে যে, তাদের জানামতে যে ব্যক্তি ইসলামের কলেমা বলেছে, তার ব্যাপারে এর সাক্ষ্য দিতে পারবে। ইসলামের কলেমা স্বীকার করেনি, এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশের একটি অক্ষরও উচ্চারণ করতে পারবে না।

আর এতটুকু সুপারিশও পুণ্যাত্মারা করবেন, যারা সত্যকে জেনেছেন এবং মুখে ও অন্তরে তা স্বীকার করেছেন– অন্য কারো জন্য অনুমতি নেই।

২. অর্থাৎ যখন সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ-ই, তখন উপসনার উপযুক্ত অন্য কেউ কী করে হতে পারে? ইবাদত বলে পরম দাসত্ব ও বিনয়কে। এ একমাত্র তাঁরই অধিকার হওয়া উচিত, যিনি পরম মর্যাদা, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আশ্চর্যের বিষয়, ওরা মূল কথাগুলি স্বীকার করে, কিন্তু তার ফলাফলকে অস্বীকার করে।

৩. অর্থাৎ নবীর এই উক্তি আল্লাহ শুনেছেন এবং তাঁর অন্তরের এই অনুযোগ ও দরদভরা আওয়াজের শপথ করে আল্লাহ বলছেন, আমি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করব এবং নিজ রহমতে তাঁকে বিজয়ী ও সফল করব।

৪. অর্থাৎ আপনি দুঃখ করবেন না এবং এদের জন্য বেশি মাথা ঘামাবেন না। তাবলীগের দায়িত্ব আদায় করে এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলে দিন– আচ্ছা, না মানলে আমাদের 'সালাম' নাও।

৫. অর্থাৎ পরিশেষে ওরা জানতে পারবে, কী ভ্রান্তিতেই না ওরা ছিল। সে মত কিছুটা তো ওরা দুনিয়াতেই বুঝতে পেরেছে। আর আখেরাতে পুরাপুরি বুঝতে পারবে।

সূরা দুখান

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৪৪ । ৫৯ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

آياتها ٥٩، ركوعاتها ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ۚ

১. হা-মীম।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

২. সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ—

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○

৩. আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে[১]। আমি তো সতর্ককারী[২]।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ

৪. সে রাতেই প্রত্যেক পরিপক্ক বিষয় (লওহে মাহফূজ থেকে ফেরেশতাদের কাছে) স্থানান্তর করা হয়–

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۗ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ

৫. আমার আদেশক্রমে[৩]। নিশ্চয় আমি তো প্রেরণকারী[৪]—

---

১. 'বরকতময় রাত' বলতে শবে কদর উদ্দেশ্য। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন— إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (কদর, আয়াত ১) আর শবে কদরটি রমযান মাসের একটি রাত ছিল। কেননা, আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (বাকারা, আয়াত ১৮৫)

এ রাতে কুরআন কারীম লওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ করা হয়। এর পর ক্রমান্বয়ে তেইশ বছরে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। আর নবীজির প্রতি কুরআন নাযিলের সূচনাও এ রাতেই হয়।

২. অর্থাৎ সতর্ক করা আমার চিরাচরিত নিয়ম। এই নীতি অনুযায়ী আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি।

৩. অর্থাৎ সারা বছর সম্পর্কে তাকদীরের হেকমতপূর্ণ ও অটল ফয়সালাসমূহ এই মহা মর্যাদাশীল রাতেই 'লওহে মাহফূজ' থেকে নকল করে সেইসব ফেরেশতার নিকট সোপর্দ করা হয়, যাঁরা সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন বিভাগের কাজে নিয়োজিত আছেন।

কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে রাতে এটি হয় তা শাবানের ১৫তম রাত, যাকে 'শবে বরাত' বলা হয়। (তাফসীরে বাগাভী ৪/১৪৮-১৪৯) তো হতে পারে, শবে বরাতে এই কাজের সূচনা হয় এবং শবে কদরে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪. অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদেরকে তাঁদের উপযোগী কাজে প্রেরণ করেন। সে অনুযায়ীই জিবরাঈল (আ) কে কুরআন দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করেছেন।

৬. আপনার রবের মেহেরবানীতে —নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[১]—

رَحۡمَةً مِّنۡ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ۙ۝۶

৭. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও[২]।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَیۡنَهُمَا ۘ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّوۡقِنِیۡنَ ۝۷

৮. তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। (তিনি) তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের রব[৩]।

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ؕ رَبُّكُمۡ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الۡاَوَّلِیۡنَ ۝۸

৯. কিন্তু ওরা সন্দেহে লিপ্ত, খেল-তামাশায় মত্ত[৪]।

بَلۡ هُمۡ فِیۡ شَكٍّ یَّلۡعَبُوۡنَ ۝۹

১০. অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যেদিন আকাশে দেখা দেবে এক স্পষ্ট ধোঁয়া—

فَارۡتَقِبۡ یَوۡمَ تَاۡتِی السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِیۡنٍ ۙ۝۱۰

---

১. অর্থাৎ সমগ্র জগতের হাল-অবস্থা তিনি জানেন এবং জগদ্বাসীদের ডাক শুনেন। সে জন্যই প্রয়োজনের সময় বিশ্বজগতের জন্য সর্বশেষ নবীকে কুরআনসহ মহান রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

২. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কোন কিছুতে বিশ্বাস করার যোগ্যতা থাকে, তবে বিশ্বাস করার সর্বপ্রথম বিষয় হচ্ছে আল্লাহর সর্বব্যাপী রুবুবিয়ত বা প্রভুত্ব, যার আলামত ও নিদর্শনসমূহ সৃষ্টিজগতের অণু-পরমাণুতে দিবালোকের থেকে বেশি স্পষ্ট।

৩. অর্থাৎ যাঁর হাতে জীবন-মৃত্যু ও অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের চাবিকাঠি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানবগোষ্ঠী যাঁর প্রতিপালনাধীন, তিনি ছাড়া আর কারো উপসানা বৈধ হতে পারে কি? কখনো না। এ এমন সুস্পষ্ট সত্য, যার মধ্যে দ্বিধা-সন্দেহের মোটেই অবকাশ নেই।

৪. অর্থাৎ এসব প্রকাশ্য নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণের দাবি এই ছিল যে, এ লোকেরা সত্যকে মেনে নেবে। কিন্তু এরা মানছে না, বরং তাওহীদ প্রভৃতির ন্যায় সত্য আকীদাসমূহ সম্পর্কে সন্দেহে রয়েছে এবং দুনিয়ার খেল-তামাশায় লিপ্ত আছে। আখেরাতের ফিকির নেই বলে সত্যসন্ধানী হয় না এবং চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে না। এরা এই ধোঁকার মধ্যে আছে যে, সর্বদা এভাবেই থাকবে, কখনো আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে না। এ জন্যই এরা নসীহতের কথাকে হাসি-তামাশায় উড়িয়ে দেয়।

১১. যা লোকদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে; এ এক যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।	يَّغْشَى النَّاسَ ۖ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
১২. 'হে আমাদের রব! আমাদের উপর থেকে এই আযাব দূর করে দিন, আমরা অবশ্যই ঈমান আনব[২]।'	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ۝

১. دخان مبين- কী? 'ধোঁয়া' দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য কী? এতে পূর্ববর্তী মনীষীদের দুটি উক্তি রয়েছে।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে একটি ধোঁয়া উত্থিত হবে, যা সমগ্র মানবজাতিকে ঘিরে নেবে। নেক মানুষের উপর তার সামান্য প্রতিক্রিয়া হবে, ফলে সর্দির মত হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদের মস্তিষ্কে তা ঢুকে সংজ্ঞাহারা করে দেবে। সেই ধোঁয়াই এখানে উদ্দেশ্য। (তাফসীরে বাগাবী ৪/১৫০)

সম্ভবত এই ধোঁয়া আকাশসমূহের সেই মূলধাতু, যার কথা এই আয়াতে আছে– ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (অতঃপর তিনি আকাশের দিকে অভিনিবেশ করলেন, আর তা ছিল ধোঁয়ারূপে— হা-মীম সাজদাহ: ১১)। অর্থাৎ আকাশ গলে তার প্রথম অবস্থার দিকে ফিরে যাবে, আর এটা (ধোঁয়ায় ছেয়ে যাওয়া) হবে তার সূচনাপর্ব। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. আর ইবনে মাসউদ (রা) জোর দাবি করেন যে, আলোচ্য আয়াতে সেই ধোঁয়া উদ্দেশ্য নয়, যা কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম। বরং কুরায়শদের অবাধ্যতা ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দো'য়া করেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের আমলে মিসরবাসীদের ন্যায় কুরায়শরাও যেন সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। ফলে এমন দুর্ভিক্ষ হল, যাতে মক্কাবাসীরা মৃত জন্তুর মাংস, চামড়া ও হাড় খেতে বাধ্য হয়। সম্ভবত সেই সময়েই 'ইয়ামামা' এলাকার সরদার ছুমামা ইবনে উছাল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে যে শস্যদ্রব্য মক্কায় রপ্তানি হত, তা বন্ধ করে দেন।

মোটকথা, মক্কাবাসীরা অনাহারে মরতে লাগল। আর সাধারণত, দারুণ খাদ্যাভাব এবং একটানা অনাবৃষ্টির সময় যমীন ও আসমানের মাঝখানে ধোঁয়ার মত দেখা যায়। তাছাড়া দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টির ফলে বাতাসে ধূলাবালি উত্থিত হয়ে আকাশে ধোঁয়ার মত দৃশ্য তৈরি হয়। তাকেই এখানে ধোঁয়া বলে প্রকাশ করা হয়েছে। (বুখারী, হাদীস : ৪৮০৯)

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী يَغْشَى النَّاسَ আয়াতাংশে-الناس বলতে মক্কাবাসীরা উদ্দেশ্য। এ যেন একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল (যেমন فَارْتَقِبْ দ্বারা বুঝে আসে), যা পরবর্তীকালে পূর্ণ হয়।

২. অর্থাৎ উক্ত আযাবে আক্রান্ত হয়ে ওরা বলবে, আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, আমরা ভবিষ্যতের জন্য তওবা করছি। এখন আমাদের বিশ্বাস হয়েছে, আর দুষ্কৃতি করব না, বরং পাক্কা মুমিন হয়ে থাকব।—সম্মুখে এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

১৩. ওদের ভাগ্যে উপদেশ গ্রহণ কবে জুটবে*? অথচ ওদের নিকট তো স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল এসেছেন?	اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ⑬
১৪. তারপরও ওরা তাঁকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল এবং বলতে লাগল, '(সে তো) শেখানো লোক, উম্মাদ[১]।'	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ⑭
১৫. আমি অল্পকালের জন্য এই শাস্তি দূর করে দিচ্ছি। তোমরা পুনরায় (তাই) করবে[২]।	اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ⑮

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তখন উপদেশ গ্রহণ কী করে ওদের উপকারে আসবে?

১. অর্থাৎ উপদেশ ও নসীহতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ এখন আর কোথায়? যখন আমার পয়গম্বর প্রকাশ্য নিদর্শনাদি এবং সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন, তখন তো তোমরা মাননি। তখন তোমরা বলতে, ইনি উন্মাদ! কখনো বলতে, অন্য কারো কাছে শিখে তিনি এ কিতাব রচনা করেছেন। আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর তাফসীর অনুসারে।

আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ :

আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হল— মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষের কষ্টে অতীষ্ঠ হয়ে দরখাস্ত করল, আমাদের থেকে এই বিপদ দূর করে দিন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আবু সুফিয়ান প্রমুখ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে আরয করল, আপনি তো নিজেকে রহমত (দয়ার নবী) বলে থাকেন। আর আপনারই জাতি দুর্ভিক্ষ ও খরায় ধ্বংস হচ্ছে। আমরা আপনাকে দয়া ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি এই বিপদ দূর হওয়ার জন্য দো'য়া করুন। এমনটি হলে আমরা ঈমান এনে ফেলব। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'য়া করলেন। বৃষ্টি হল (দালায়েলুন নবুওয়াহ : ২/৩২৬)। ছুমামা (রা) যে খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তার পথও তিনি খুলে দেওয়ালেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওরা ঈমান আনল না। সে জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন– اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ ওরা এসব বিষয় ও নিদর্শন দেখে মানবে কই? কিছুতেই মানবে না। ওরা এসবের হাজারো রকম ভুল ব্যাখ্যা করবে। যে বিষয়টি দিবালোকের চেয়েও উজ্জ্বল ছিল– অর্থাৎ নবীজির (স) পয়গম্বরী, ওরা তো তাই মানল না। কেউ তাঁকে পাগল বলতে শুরু করল, কেউ বলল– অমুক রোমান গোলামের নিকট থেকে কিছু বিষয় শিখে এসে তা নিজ ভাষায় প্রকাশ করছে। অতএব এহেন জিদ্দী গোঁড়ারা ঈমান আনবে– এমন আশা কীভাবে করা যেতে পারে?

২. অর্থাৎ আমি যদি অল্প সময়ের জন্য আযাব দূর করে দিই, তবু ওরা সেই কাজই করবে, যা এ যাবৎ করে আসছে।

১৬. যেদিন আমি গুরুতরভাবে পাকড়াও করব, সেদিন নিশ্চয় প্রতিশোধ নেব[১]।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝

১৭. নিশ্চয় আমি এদের পূর্বে ফেরাওনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং ওদের নিকট আগমন করেছিলেন একজন সম্মানিত রাসূল[২]—

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۝

১৮. (এই বার্তা নিয়ে) যে, 'তোমরা আল্লাহর বান্দাদের আমার কাছে সোপর্দ কর[৩]। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

১৯. 'এবং (এই বার্তা নিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না। আমি তোমাদের নিকট এসেছি সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে[৪]।

وَاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

২০. 'আর তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাত করবে– এ থেকে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করছি[৫]।

وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۝

আর ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাফসীর অনুযায়ী অর্থ এই যে, ঠিক আছে, আমি অল্প সময়ের জন্য আযাব সরিয়ে নিচ্ছি। তখন দেখবে, ওরা তাই করছে যা পূর্বে করত।

১. ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে গুরুতর ধর-পাকড় কিয়ামতে হবে। মর্ম এই যে, আখেরাতের আযাব টলার নয়। আর ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতে 'গুরুতর পাকড়াও' বলতে বদর যুদ্ধ উদ্দেশ্য, যে যুদ্ধে ওদের থেকে চরম প্রতিশোধ নেওয়া হয়। (তাফসীরে তবারী ২১/২৭; তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪/১৫১)

২. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে ওদের এই পরীক্ষা করা হয় যে, ওরা আল্লাহর পয়গাম গ্রহণ করে কি না।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের তোমরা নিজেদের বান্দা বানিয়ো না। বরং বনী ইসরাঈলকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দাও এবং আমার কাছে সোপর্দ কর। আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যাব।

৪. سُلْطَانٌ مُبِيْنٌ–দ্বারা হযরত মূসা (আ)-এর মু'জেযাসমূহ উদ্দেশ্য– যথা 'লাঠি', 'উজ্জ্বল হাত' প্রভৃতি।

৫. ওদের হুমকি-ধমকির উত্তরে এ কথা বলেছেন। অর্থাৎ আমি তোমাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। তিনি আমার সহায়তায় আছেন এবং তাঁরই হেফাজতের উপর আমার ভরসা।

২১. 'আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও[১]।'	وَاِنۡ لَّمۡ تُؤۡمِنُوۡا لِیۡ فَاعۡتَزِلُوۡنِ ﴿۲۱﴾
২২. অনন্তর মূসা তাঁর রবের কাছে এই দোয়া করলেন, 'এরা তো অপরাধী সম্প্রদায়'।	فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوۡمٌ مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩. (আল্লাহ বললেন,) 'তাহলে আমার বান্দাদের নিয়ে তুমি রাতে বেরিয়ে পড়। তোমাদের অবশ্যই পশ্চাদ্ধাবন করা হবে[২]।	فَاَسۡرِ بِعِبَادِیۡ لَیۡلًا اِنَّكُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ ﴿۲۳﴾
২৪. 'আর সমুদ্রকে স্থির অবস্থায় ছেড়ে যাও। নিশ্চয় ওরা এমন বাহিনী, যাদের ডুবিয়ে দেওয়া হবে[৩]।'	وَاتۡرُكِ الۡبَحۡرَ رَهۡوًا ؕ اِنَّهُمۡ جُنۡدٌ مُّغۡرَقُوۡنَ ﴿۲۴﴾
২৫. ওরা রেখে গিয়েছিল— কত উদ্যান ও ঝরনা!	كَمۡ تَرَكُوۡا مِنۡ جَنّٰتٍ وَّعُیُوۡنٍ ﴿۲۵﴾
২৬. কত ক্ষেত-খামার ও উত্তম ঘর-বাড়ি	وَّزُرُوۡعٍ وَّمَقَامٍ كَرِیۡمٍ ﴿۲۶﴾
২৭. এবং আরাম-আয়েশের অনেক উপকরণ, যার ভিতর ওরা আনন্দ-ফুর্তি করত।	وَّنَعۡمَۃٍ كَانُوۡا فِیۡهَا فٰكِهِیۡنَ ﴿۲۷﴾

---

১. অর্থাৎ আমার কথা যদি না মান, তবে আমাকে কষ্ট দিয়ে নিজেদের পাপের বোঝা অন্তত ভারী করো না– مرا بخیر تو امید نیست بد مرساں ('তোমাদের থেকে আমি ভাল তো আশা করি না, তবে অন্তত আমার ক্ষতি করো না।')— আর হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ আমার জাতিকে নিয়ে যাব, তোমরা পথরোধ করো না।'

২. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, এরা নিজেদের পাপাচার থেকে ফিরে আসার নয়। এখন আপনি আমার ও এদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।

সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা মঞ্জুর হল। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নির্দেশ হল, ফেরাওনীদের না জানিয়ে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের মধ্যেই মিসর থেকে চলে যাও। কারণ, দিন হওয়ার পর যখন ওরা জানতে পারবে, তখন তোমাদের পিছনে ধাওয়া করবে। কিন্তু মনে রেখো, পথে সাগর পড়বে। ভয় পেয়ো না। তার উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে পানি দু'ভাগ হয়ে সরে যাবে এবং মাঝখানে শুষ্ক পরিষ্কার পথ তৈরি হবে। সে পথেই তুমি স্বজাতিকে নিয়ে চলে যাবে।

৩. অর্থাৎ তুমি এই ফিকির করো না যে, সাগরের মধ্যে আল্লাহর কুদরতে যে পথ তৈরি হবে, তা যেন না থাকে। বরং তাকে আপন অবস্থাতেই রেখে চলে যেয়ো। কারণ, এই পথ দেখেই তো ফেরাওনের বাহিনী সমুদ্রে নামার সাহস করবে। সে মত শুষ্ক পথ দেখে ওরা সকলে নামার পর আল্লাহর হুকুমে সাগরের পানি চতুর্দিক থেকে এসে মিলিত হল। ফলে গোটা কাফের বাহিনী সাগরের পানিতে ডুবে মরল।

২৮. এমনই (হয়েছিল)। আর আমি সেসব বস্তুর উত্তরাধিকারী অন্য এক সম্প্রদায়কে বানিয়ে দিলাম[১]।

كَذٰلِكَ ۖ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

২৯. তা, ওদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কাঁদেনি[২] এবং ওদের অবকাশও দেওয়া হয়নি।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۝

[রুকূ - ২]

৩০. নিশ্চয়ই আমি বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করেছি লাঞ্ছনাদায়ক আযাব থেকে—

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

৩১. ফেরাওন থেকে[৩]। সে তো ছিল উদ্ধত, সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত[৪]।

مِنْ فِرْعَوْنَ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৩২. আর নিশ্চয়ই আমি জেনেশুনে বিশ্ববাসীর মোকাবিলায় তাদের মনোনীত করেছিলাম[৫]।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের হস্তগত করে দিলাম- যেমনঃ সূরা শু'আরাতে (৫৯) রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, ফেরাওনের ডুবে মরার পর মিসর বনী ইসরাঈলের দখলে চলে আসে। আর যদি এটা প্রমাণিত না হয়, তবে অর্থ এই হবে যে, ফেরাওনীরা যে ধরনের বিষয়-সম্পদ ছেড়ে গিয়েছিল, সে রকম ধন-সম্পদ আমি বনী ইসরাঈলকেও দিয়েছিলাম। واللہ اعلم

২. বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে তখন আকাশের সেই দরজাটি কাঁদে, যার মধ্য দিয়ে তার রিযিক নাযিল হত, অথবা যার মধ্য দিয়ে তার নেক আমল উপরে উত্থিত হত। আর পৃথিবীর যে স্থানে সে নামায পড়ত, সেই স্থানটিও কাঁদে- হায়! এই সৌভাগ্য আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেল! অপর দিকে কাফেরের নিকট তো নেক আমলের মূল্যই নেই, সুতরাং ওর জন্য আসমান বা যমীন কাঁদবে কেন? বরং হয়ত এজন্য আনন্দিত হয় যে, নাপাক দূর হয়েছে- خس کم جہاں پاک (তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৩৭; মুসনাদে আবু য়া'লা, হাদীস : ৪১৩৩; তাফসীরে তবারী : ২১/৪২)

৩. ফেরাওনের অস্তিত্বই একটি মূর্তিমান আপদ ছিল।

৪. অর্থাৎ সে বড়ই অহংকারী ও অবাধ্য ছিল।

৫. অর্থাৎ যদিও বনী ইসরাঈলের সকল দুর্বলতা আমার জানা ছিল, তবু তাদের আমি সেই কালের সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। আর কোন কোন দিক দিয়ে এমন

৩৩. এবং তাদের এমন নিদর্শনাদি দিয়েছিলাম, যাতে ছিল স্পষ্ট অনুগ্রহ[১]।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. নিশ্চয় এই লোকেরা বলে থাকে—

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না[২]।

اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. 'আচ্ছা, আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে আস তো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৩]।'

فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এরা উত্তম না তুব্বার সম্প্রদায়[৪] এবং এদের পূর্বে যারা ছিল তারা? আমি ওদের ধ্বংস করে দিয়েছি। নিশ্চয় ওরা ছিল অপরাধী[৫]।

اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি যে, আজ পর্যন্ত কোন জাতির ভাগ্যে তা ঘটেনি– যেমন: তাদের মধ্যে অসংখ্য নবীর আবির্ভাব ঘটেছে।

১. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তা দেওয়া হয়েছে (সরাসরি না)। উদাহরণস্বরূপ: মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি।

২. মাঝে প্রসঙ্গত হযরত মূসা (আ)-এর জাতির উল্লেখ এসে গিয়েছিল। এখান থেকে পুনরায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাতির কথা বর্ণিত হচ্ছে। ওরা বলে যে, মৃত্যুই হল আমাদের সব কিছুর সমাপ্তি। মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। বর্তমান জীবন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জীবন নেই। কোথায় হাশর? কিসের হিসাব-কিতাব?!

৩. অর্থাৎ পয়গম্বর ও মুমিনদের লক্ষ করে ওরা বলে, তোমরা যদি তোমাদের এই আকীদায় সত্য হও যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে— তবে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের একটু জীবিত করে দেখিয়ে দাও। তা হলে আমরা বিশ্বাস করব।

৪. ইয়ামানের বাদশাহর উপাধি ছিল 'তুব্বা'। সাবা, হাযরামাওত প্রভৃতি তার শাসনাধীন ছিল। 'তুব্বা' উপাধিধারী অনেকেই গত হয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন, এখানে কোন্ তুব্বা উদ্দেশ্য। যা হোক, আয়াত দ্বারা এতটুকু বোঝা গেল যে, তার জাতি খুব শক্তিধর ও পরাক্রমশালী ছিল, যারা নিজেদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস হয়েছিল।

ইবনে কাছীর (র)-এর মতে قَوْمُ تُبَّعٍ দ্বারা সাবা জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যাদের আলোচনা সূরা সাবা-তে গত হয়েছে।

৫. (الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ)– পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যথা: আদ, ছামূদ প্রভৃতি। এসব জাতিকে আল্লাহ তাআলা গোনাহর পরিণামে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তোমরা কি ওদের চেয়ে শ্রেয় অথবা

৩৮. আমি আসমানসমূহ, যমীন ও এদের মাঝে যা আছে তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ۝

৩৯. আমি তো এই উভয়কে যথার্থ কারণেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না[১]।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

৪০. নিশ্চয় বিচার-দিবস তাদের সবার নির্ধারিত কাল[২]।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

৪১. যেদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসবে না এবং ওদের সাহয্যও করা হবে না[৩]—

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۝

৪২. তবে সে ছাড়া, যার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন[৪]। নিশ্চয় তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ۝

[রুকূ - ৩]

৪৩. নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে—

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ۝

৪৪. পাপীর খাদ্য[৫]।

طَعَامُ الْاَثِيْمِ۝

ওদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী যে, তোমাদের তিনি ধ্বংস করবেন না কিংবা ধ্বংস করতে পারবেন না?

১. অর্থাৎ এত বড় কারখানা (বিশ্বজগত) কোন খেল-তামাশার বস্তু নয়; বরং তা বিরাট হেকমতের কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলাফল একদিন অবশ্যই প্রকাশ হবে। সেই ফলাফলই আখেরাত বা পরকাল।

২. অর্থাৎ সেদিন সকলের হিসাব একই সময়ে হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ (বন্ধু ছাড়া) অন্য কোনো দিক থেকেও সাহায্য আসবে না।

৪. অর্থাৎ যার উপর আল্লাহর দয়া হবে, শুধু সে-ই রক্ষা পাবে, যেমনঃ হাদীছে এসেছে— إِلَّا أَنْ يَّتَغَمدَنِي الله برحمة (বুখারী, হাদীস ৬৪৬৩)

৫. সামান্য কোন সাদৃশ্যের জন্য দোযখের এই বৃক্ষকে 'যাক্কুম' বলা হয়েছে, (এর অর্থ এই নয় যে, তা দুনিয়ার যাক্কুমের মতই)। বরং দোযখের যাক্কুমের অবস্থা আল্লাহই জানেন। যেমনঃ জান্নাতের কিছু নে'য়ামতের সঙ্গে দুনিয়ার নে'য়ামতের শুধু নামগত সাদৃশ্য আছে, (যদিও উভয়ের প্রকৃত অবস্থা মোটেই এক নয়), জাহান্নামের বিষয়টাও সে রকমই।

৪৫. (তা) গলিত তামার মত;* পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে-

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝

৪৬. যেমন ফোটে তীব্র গরম পানি।

كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۝

৪৭. ওকে ধর এবং টেনে-হেঁচড়ে দোযখের মাঝখানে নিয়ে যাও[১]।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝

৪৮. অতঃপর ওর মাথার উপর ঢাল ফুটন্ত পানির আযাব[২]।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝

৪৯. (এসব) আস্বাদন কর। তুমিই তো সেই সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি[৩]।

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝

৫০. এটা সেই বস্তু, যার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষন করতে[৪]।

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ۝

৫১. নিশ্চয় আল্লাহভীরুগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে[৫]—

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝

৫২. উদ্যানরাজি ও ঝরনামালার মধ্যে।

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

★ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তেলের গাদের মত'।

১. এই হুকুম দেওয়া হবে ফেরেশতাদের, যাঁরা অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নিয়োজিত।

২. সেই পানি মস্তিষ্ক দিয়ে ঢুকে নীচে নেমে আসবে এবং নাড়িভূঁড়ি পুড়িয়ে-গলিয়ে বেরিয়ে আসবে। (أعاذنا الله منها)

৩. অর্থাৎ তুমি তো সেই ব্যক্তি, দুনিয়াতে যে বড় সম্মানিত ও অভিজাত বলে গণ্য হত এবং নিজেকে সরদার-প্রধান হিসাবে প্রমাণ করত। এখন সেই সম্মান ও সরদারী কোথায় গেল?

৪. অর্থাৎ আজকে এই (কঠিন) দিনও দেখতে হবে– এ বিশ্বাস তোমাদের ছিল নাকি? তোমরা তো বরং এই ধোঁকায় ছিলে যে, এভাবেই হেসে-খেলে দুনিয়ার জিন্দেগী কেটে যাবে, অবশেষে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর কিছুই থাকবে না। এখন তোমরা দেখে নিলে, পয়গম্বরগণ যা-কিছু বলতেন সবই সত্য ছিল।

৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, আখেরাতে তারা নিরাপদে-শান্তিতে থাকবে। কোন প্রকারের ভয় ও চিন্তা তাদের কাছেও আসতে পারবে না।

৫৩. তারা চিকন ও পুরু রেশমী পোশাক পরিধান করে একে অন্যের মুখোমুখি হয়ে বসে থাকবে[১]।

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এমনই (হবে)। আর আমি তাদের বিয়ে করাব ডাগর চোখবিশিষ্ট হুরদের সঙ্গে[২]।

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. সেথায় তারা সব রকমের ফলের ফরমায়েশ করবে নিশ্চিন্ত মনে[৩]।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. প্রথম মৃত্যু ছাড়া তারা সেখানে আর কোন মৃত্যু আস্বাদন করবে না[৪]। আর তিনি তাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন,

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আপনার রবের অনুগ্রহে। এ-ই মহা সাফল্য[৫]।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

৫৮. আমি তো কুরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে[৬]।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯ অতএব আপনি অপেক্ষা করুন। ওরাও অপেক্ষা করছে[৭]।

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

---

১. অর্থাৎ তাদের পোশাক হবে মিহি ও পুরু রেশমের। এবং এক জান্নাতী দ্বিতীয়জনের প্রতি বিমুখ হবে না, বরং তারা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ন্যায় মুখোমুখী হয়ে বসবে।

২. অর্থাৎ হুরদেরকে জান্নাতীদের জোড়া বানিয়ে দেবেন।

৩. অর্থাৎ যে ফল খেতে মন চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা উপস্থিত করে দেওয়া হবে। কোন চিন্তা থাকবে না– পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে পানাহার করবে।

৪. অর্থাৎ যে মৃত্যু পূর্বে এসেছে, তা-ই একমাত্র মৃত্যু। ভবিষ্যতে আর কখনো মৃত্যু আসবে না, অনন্তকাল এইসুখ-সম্ভোগের মধ্যেই থাকবে। তাদেরও ক্ষয় নেই, তাদের ভোগসামগ্রীরও লয় নেই।

৫. এর চেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে যে, আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং অনন্ত কালের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে থাকবে।

৬. অর্থাৎ তারা যাতে নিজেদের মাতৃভাষায় সহজে বুঝে নেয় এবং স্মরণ রাখে।

৭. অর্থাৎ যদি না-ই বোঝে, তবে আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। ওদের মন্দ পরিণাম শীঘ্রই আসছে। ওরা তো এ অপেক্ষায় আছে যে, আপনার উপর কোন দুর্ঘটনা পতিত হোক, কিন্তু আপনি অপেক্ষা করুন যে, ওদের কী দশা হয়।

সূরা জাছিয়া

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৪৫ । ৩৭ আয়াত । ৪ রুকূ । মক্কী

آياتها ٣٧، ركوعاتها ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ①

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২. (এ) কিতাবের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ③

৩. নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে রয়েছে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন[১]।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ④

৪. এবং তোমাদের সৃষ্টিতে ও যেসব জীব-জন্তু তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন তাতেও বহু নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাসী লোকদের জন্য[২]।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ

৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে (বা: আবর্তনে) এবং আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিযিক অবতীর্ণ করেন[৩], অতঃপর এর দ্বারা পৃথিবীকে তার

---

১. অর্থাৎ মানুষ যদি ঈমান আনতে চায়, তবে এই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এদের পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে পারে। তাহলে তাকে স্বীকার করতেই হবে যে, অবশ্যই এদের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকর্তা কেউ আছেন, যিনি পরিপূর্ণ হেকমত ও নিপুনতার সাথে এগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং অসীম কুদরতের মাধ্যমে এদের সংরক্ষণ করছেন– البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، فكيف لا يدل هذا النظام العجيب على الصانع اللطيف الخبير!

২. অর্থাৎ মানুষ যদি স্বয়ং নিজের সৃষ্টি এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর সৃষ্টি-রহস্য, গঠন-আকৃতি নিয়ে চিন্তা করে, তবে আল্লাহ-পরিচিতি ও বিশ্বাসের স্তরে পৌছার মত হাজারো নিদর্শন সে দেখতে পাবে।

৩. অর্থাৎ আকাশের দিক থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, যা রিযিকের উৎস।

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ
اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

মৃত্যুর পর জীবিত করেন– তাতে এবং বাতাসের (দিক) পরিবর্তন করার মধ্যেও নিদর্শনাদি রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য[১]।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ
فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ
يُؤْمِنُوْنَ ۝

৬. এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনাকে যথাযথভাবে শোনাই। অতএব আল্লাহ ও তাঁর আয়াতগুলি বাদ দিয়ে আর কোন্ কথার প্রতি ওরা ঈমান আনবে[২]?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য—

يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ
مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ
بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

৮. যে আল্লাহর আয়াতগুলি তার সামনে পঠিত হতে শোনে, তারপরও সে অহংকারবশত জিদ করে, যেন সে তা শুনেইনি[৩]। অতএব ওকে যাতনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اِتَّخَذَهَا
هُزُوًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৯. সে যখন আমার কোন আয়াত সম্পর্কে অবগত হয়, তা নিয়ে পরিহাস করে। এমন লোকদেরই জন্য রয়েছে অপমানকর আযাব[৪]।

---

১. অর্থাৎ কিছুমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি খাটালেই বুঝতে পারবে, এসব বিষয় ওই মহাশক্তিশালী, মহাপ্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ছাড়া আর কারো আয়ত্তে নেই। ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহকে ছাড়া দ্বিতীয় কে আছে? এবং তাঁর বাণীসমূহ বাদ দিয়ে কার বাণী মানার মত আছে? যখন মহা অধিপতির এমন সত্য ও সুস্পষ্ট বাণীও কোন হতভাগা কবুল না করে, তখন প্রশ্ন হচ্ছে, সে আর কোন্ জিনিসের অপেক্ষায় আছে যা সে কবুল করবে?

৩. অর্থাৎ জিদ ও অহংকারের কারণে সে আল্লাহর বাণী শোনে না। ওর অহংকার ওকে মূর্খতা পরিত্যাগের অনুমতি দেয় না। ফলে সত্য শুনেও এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেইনি।

৪. অর্থাৎ সে যেমন আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং অপমানজনক ব্যবহার করে, তদ্রূপ ওর শাস্তিও অত্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাকর হবে, যা সম্মুখে বর্ণিত হচ্ছে।

১০. ওদের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম। আর ওরা যা কামাই করেছিল তা ওদের কোনোই উপকারে আসবে না এবং তারাও না, যাদেরকে ওরা আল্লাহর পরিবর্তে অভিভাবক বানিয়েছিল[১]। ওদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُمۡ مَّا كَسَبُوۡا شَيۡـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِيَآءَ ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ ؕ﴿۱۰﴾

১১. এ (কুরআন) হেদায়াত। আর যারা স্বীয় রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, ওদের জন্য রয়েছে মুসিবতের যাতনাদায়ক শাস্তি*[২]।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِيۡمٌ ﴿۱۱﴾

[রুকূ - ২]

১২. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যেন তাতে তাঁর হুকুমে জাহাজসমূহ চলাচল করতে পারে[৩] এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর শোকর আদায় কর[৪]।

اَللّٰهُ الَّذِىۡ سَخَّرَ لَـكُمُ الۡبَحۡرَ لِتَجۡرِىَ الۡفُلۡكُ فِيۡهِ بِاَمۡرِهٖ وَلِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ ۚ﴿۱۲﴾

---

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি প্রভৃতি কোন কিছুই তখন ওদের উপকারে আসবে না। তদ্রূপ ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাস্য বা বন্ধু-সাহায্যকারী বানিয়ে রেখেছিল এবং যাদের থেকে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করেছিল, তারাও সেদিন ওদের কোন কাজে আসবে না।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'কঠোরতর যাতনাদায়ক শাস্তি'।

২. অর্থাৎ এই কুরআন আজিমুশ্‌শান হেদায়াত, যা মানুষকে সর্বপ্রকার ভাল-মন্দ বোঝানোর জন্য এসেছে। যারা তা মানবে না, তারা যেন কঠিন, নিকৃষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

৩. অর্থাৎ তিনি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল সৃষ্টিকে তোমাদের এমন আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন যে, তোমরা অনায়াসে তাতে জলযান ও জাহাজসমূহ নিয়ে বিচরণ কর এবং মাইলের পর মাইল গভীর সমুদ্র অতিক্রম কর।

৪. অর্থাৎ যাতে সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য কর, মাছ ইত্যাদি শিকার কর ও সমুদ্রতল থেকে মণিমাণিক্য আহরণ কর। আর যাতে এসব উপকার ও ফায়দা হাসিল করার সময় প্রকৃত দাতাকে ভুলে না যাও, বরং তোমাদের উপর তাঁর হক কী তা জেনে মুখে ও অন্তরে– এক কথায় সর্বান্তকরণে তাঁর শোকর আদায় কর।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

১৩. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সেসবকে তাঁর তরফ থেকে তোমাদের উপকারে লাগিয়ে দিয়েছেন[১]। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য[২]।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১৪. আপনি ঈমানদারদের বলে দিন, 'তারা যেন ওইসব লোককে ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহর দিনসমূহের প্রত্যাশা করে না[৩], যাতে তিনি এক সম্প্রদায়কে স্বীয় কৃতকর্মের বিনিময়ে শাস্তি দেন[৪]।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا

১৫. যে সৎকর্ম করেছে, নিজের উপকারের জন্যই (করেছে), আর যে মন্দকর্ম করেছে, তো (এর অনিষ্ট) তার উপরই বর্তাবে[৫]।

---

১. অর্থাৎ তিনি নিজ হুকুমে ও কুদরতে সব কিছুকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এ তাঁরই মেহেরবানী যে, এমন বিরাট বিরাট সৃষ্টি মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

২. অর্থাৎ মানুষ চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, এ বিষয়টি তার আয়ত্তে ছিল না। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর নিরঙ্কুশ কুদরতে এ সমস্ত কিছু আমাদের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে আমাদেরও কারো কাজে লাগা উচিত। আর সেই কাজ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, সেই প্রকৃত দাতা ও নিরঙ্কুশ অনুগ্রহকারীর (অর্থাৎ আল্লাহর) আজ্ঞাবহ হয়ে তাঁর আনুগত্যে নিজেদের অস্থায়ী জীবনের মুহূর্তগুলি ব্যয় করি, যাতে সম্মুখে গিয়ে আমাদের পরিণাম শুভ হয়।

৩. আল্লাহর দিনসমূহ বলতে ওই সব দিন উদ্দেশ্য, যে দিনগুলিতে তিনি নিজ দুশমনদের কোন বিশেষ শাস্তি প্রদান করেন; কিংবা নিজ আজ্ঞাবহ বান্দাদের কোন বিশেষ নে'য়ামত ও অনুগ্রহ দান করেন। আর– لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ দ্বারা সেই কাফেররা উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ আর তাঁর আযাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। (আর এদের ক্ষমা করার অর্থ সামনে আসছে-অনুবাদক)

৪. অর্থাৎ মুমিনরা নিজেরা যেন উক্ত কাফেরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তা না করে, বরং তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়। তিনি দুষ্কর্মের কারণে উক্ত কাফেরদের যথেষ্ট শাস্তি দেবেন এবং ধৈর্য ও সবর এবং ক্ষমা ও মার্জনার জন্য মুমিনদের যথাযোগ্য পুরস্কার দান করবেন।

৫. অর্থাৎ যে সৎকর্ম করে, তার ফায়দা সে নিজেই লাভ করে। তাতে আল্লাহর কী ফায়দা? আর যে মন্দকাজ করে, সে নিজের জন্য মন্দ বীজ বপন করে। একজনের মন্দকর্মের কুফল অন্যজন ভোগ করবে না।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُوۡنَ ۝

অতঃপর তোমরা নিজেদের রবেরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[১]।

وَ لَقَدۡ اٰتَیۡنَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ الۡکِتٰبَ وَ الۡحُکۡمَ وَ النُّبُوَّۃَ وَ رَزَقۡنٰہُمۡ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلۡنٰہُمۡ عَلَی الۡعٰلَمِیۡنَ ۝

১৬. নিশ্চয় আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন বস্তুসামগ্রী দিয়েছিলাম[২] আর তাদের করেছিলাম বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাশালী[৩]–

وَ اٰتَیۡنٰہُمۡ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ ۚ فَمَا اخۡتَلَفُوۡۤا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَہُمُ الۡعِلۡمُ ۙ بَغۡیًۢا بَیۡنَہُمۡ ؕ اِنَّ رَبَّکَ یَقۡضِیۡ بَیۡنَہُمۡ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ فِیۡمَا کَانُوۡا فِیۡہِ یَخۡتَلِفُوۡنَ ۝

১৭. এবং তাদের দান করেছিলাম দীনের সুস্পষ্ট বিষয়াদি[৪]। কিন্তু ওদের নিকট জ্ঞান আসার পরই ওরা বিভেদ সৃষ্টি করেছে– পরস্পরের জেদের কারণে। নিশ্চয় আপনার রব কিয়ামতের দিন ওদের মাঝে সেসব বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন, যাতে ওরা মতভেদ করত[৫]।

মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, নিজ লাভ-ক্ষতির ফিকির করা এবং এ কথা মাথায় রেখে আমল করা যে, এর লাভ বা ক্ষতি তার নিজের উপরই বর্তাবে।

১. অর্থাৎ সেখানে পৌছার পর সব ভাল-মন্দ সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং প্রত্যেকে নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

২. অর্থাৎ তাদের তাওরাত প্রদান করি এবং الحكم- তথা: রাজত্ব বা বিচার-ক্ষমতা বা জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা অথবা দীনের সমঝ-বুঝ দান করি। আর বিপুল সংখ্যক পয়গম্বর তাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত করি। এসব তো ছিল আধ্যাত্মিক খাদ্য। বাহ্যিক খাদ্যের কথা বললে তাও প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়, এমন কি, মান্না ও সাল্ওয়া অবতীর্ণ করা হয়।

৩. অর্থাৎ সেই যুগে সমগ্র জগতের উপর সমস্ত দিক দিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়। আর যেহেতু তাদের কোন কোন শ্রেষ্ঠত্ব সর্বকালের হিসাবেই, তাই 'সেই যুগে' বলার প্রয়োজন হয় না।

৪. بينات...– অর্থাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বিধিবিধান দান করি। অথবা অর্থ এই যে, এমন প্রকাশ্য মু'জেযাসমূহ দান করি, যা দীনের সত্যতার দলীল-প্রমাণ।

৫. অর্থাৎ পরস্পরের জিদ ও স্বার্থপরতার কারণে আসল কিতাব ছেড়ে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়, যাদের চূড়ান্ত মীমাংসা কিয়ামতের দিন করা হবে। সেদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে, ওদের উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তিপূজা বৈ আর কিছু ছিল না।

১৮. অতঃপর আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতএব আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না[১]।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

১৯. ওরা তো আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার কোনো উপকারে আসবে না[২]। এবং জালেমরা একে অপরের বন্ধু, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু[৩]।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ۝

২০. এ (কুরআন) মানুষের জন্য প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষামালা ও পথের দিশা এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের জন্য রহমত[৪]।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ۝

২১. যারা অসৎ কার্যকলাপ করেছে, ওরা কি মনে করে, আমি ওদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমলাদি করেছে তাদের সমান করে

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

---

১. অর্থাৎ এসব মতভেদ ও দলাদলির গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে আপনাকে আমি দীনের সহীহ পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছি। অতএব আপনার ও আপনার উম্মতের কর্তব্য, এই পথের উপর সদা অবিচল থাকা। কখনো ভুলেও জাহেল ও মূর্খদের কামনা-বাসনার পথে না চলা। উদাহরণস্বরূপ: ওদের কামনা এই যে, আপনি ওদের বিরূপ সমালোচনা এবং জুলুম ও অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে দাওয়াত ও তাবলীগ ছেড়ে দেন, অথবা মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ মতভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি হোক, যেরূপ বিরোধে কাফেররা নিজেরা লিপ্ত আছে। এমতাবস্থায় ওদের (এ জাতীয়) সকল কামনা-বাসনাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া উচিত।

২. অর্থাৎ ওদের প্রতি যদি ঝুঁকে পড় (ওদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর), তবে আল্লাহর নিকট এতে তোমাদের কোন লাভ হবে না।

৩. অর্থাৎ ন্যায়পরায়ন ও সততাপ্রিয় মুসলমান জালেম ও পথভ্রষ্ট কাফেরদের বন্ধু হতে পারে না। তারা তো আল্লাহর অনুগত দাস এবং আল্লাহই তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাঁরই পথে চলা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা মুসলমানদের কর্তব্য।

৪. অর্থাৎ এই কুরআন অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদিতে ভরপুর। তা মানব জাতিকে উপকারী কথা ও সাফল্যের পথ বলে দেয়। আর যে ভাগ্যবানেরা এর হেদায়াত ও নসীহতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এর অনুসরণ করে, তাদের জন্য এই কুরআন বিশেষভাবে রহমত ও বরকতপূর্ণ।

الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحۡيَاهُمۡ وَمَمَاتُهُمۡ ؕ سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ ﴿۲۱﴾

দেব, ফলে তাদের সকলের জীবন ও মৃত্যু হবে একই রকম? ওরা যে ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ[১]!

[রুকূ - ৩]

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ وَلِتُجۡزٰى كُلُّ نَفۡسٍۭ بِمَا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُوۡنَ ﴿۲۲﴾

২২. আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথার্থ উদ্দেশ্যে এবং এ জন্য, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হয়, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[২]।

---

১. **পাপাচারী ও পুণ্যবান– এই উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না**

অর্থাৎ যে জানে যে, আল্লাহ তাআলার প্রতিটি কার্য হেকমতপূর্ণ হয়ে থাকে, এমন বুদ্ধিমান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে যে, একটা পাপাচারী লোক ও একজন পুণ্যবান মানুষ— উভয়ের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা একই রকম আচরণ করবেন এবং দুজনেরই পরিণাম সমান করে দেবেন? মোটেই না। এ জীবনেও উক্ত দুজন সমান হতে পারে না, মৃত্যুর পরেও না। যেমন পবিত্র জীবন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে লাভ করে থাকে এবং যে সাহায্য ও মান-মর্যাদা প্রাপ্তির ওয়াদা দুনিয়াতে তার সঙ্গে করা হয়েছে, একটা কাফের, পাপাচারী কী করে তা লাভ করতে পারে? ওর জন্য তো দুনিয়াতে সংকীর্ণতার জীবন এবং আখেরাতে অভিশাপ ও ক্ষতিগ্রস্ততার জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই।

মোটকথা, এ দাবি একেবারে ভ্রান্ত এবং এ ধারণা সম্পূর্ণ অর্থহীন যে, আল্লাহ তাআলা পুণ্যাত্মা ও পাপীদের জীবন ও মৃত্যুকে সমান করে দেবেন। তাঁর হেকমতের দাবি আদৌ এমন নয়। বরং এটা আবধারিত যে, উভয়ের আমলাদির যথাযথ ফলাফল প্রকাশ পাবেই পাবে এবং প্রত্যেকের পুণ্য বা পাপের প্রতিক্রিয়া মোটামুটিভাবে দুনিয়াতেও পরিলক্ষিত হবে, আর আখেরাতে তো সম্পূর্ণরূপে দেখা যাবেই।

২. অর্থাৎ তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে অযথা সৃষ্টি করেননি; বরং অত্যন্ত হেকমতের সাথে এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে আসমান-যমীনের হাল-অবস্থায় গভীর চিন্তা করে মানুষ বুঝতে পারে যে, প্রতিটি বস্তুই সঠিকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাতে মানুষ অনুভব করে নিতে পারে যে, অবশ্যই একদিন এই বিশাল বিশ্বজগতের কোন বিরাট ফল প্রকাশ পাবে। একেই আখিরাত বলা হয়– যেখানে প্রত্যেকে নিজ কৃর্তকমের ফল ভোগ করবে এবং যেরূপ বীজ সে বপন করেছিল সেরূপ ফসলই লাভ করবে।

কবি বলেন :

گندم از گندم بروید جو ز جو — از مکافات عمل غافل مشو

('গম থেকে গম, যব থেকে যব পাবে। কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে, গাফেল কখনো হয়ো না।')

২৩. আচ্ছা, আপনি কি ওকে দেখেছেন, যে স্বীয় প্রভু বানিয়েছে নিজ প্রবৃত্তিকে এবং আল্লাহ ওকে জেনেশুনে পথভ্রষ্ট করেছেন[১], ওর কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং ওর চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতএব আল্লাহর পর কে ওকে সৎপথে আনবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না[২]?

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. ওরা বলে, 'জীবন বলতে আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটাই। আমরা মরি ও বাঁচি। এবং কালই আমাদের মৃত্যু ঘটায়[৩]।' বস্তুত এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা শুধু অনুমানের ঘোড়া ছোটায়[৪]।

وَقَالُوا۟ مَا هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানতেন, ওর যোগ্যতা নষ্ট-ভ্রষ্ট এবং সে এরই যোগ্য যে, সরলপথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করবে। অথবা على علم-এর অর্থ এই যে, সেই হতভাগা ইলম থাকা সত্ত্বেও এবং বোঝা-শোনার পরও পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি একমাত্র প্রবৃত্তিকে নিজের শাসক ও উপাস্য স্থির করে নেয়, তার প্রবৃত্তি যেদিকে যেতে চায় সেদিকেই সে ছুটে যায় এবং সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করার মানদণ্ড হিসাবে প্রবৃত্তিকেই বেছে নেয়— তাকে আল্লাহ তাআলাও তার অবলম্বিত পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ছেড়ে দেন। এরপর তার অবস্থা এই হয়ে যায় যে, কানে নসীহতের কথা শোনে না, অন্তর দ্বারা সত্য কথা বোঝে না, চোখে সত্যের আলো দেখতে পায় না।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ যাকে স্বীয় কৃতকর্মের কারণে এমন অবস্থায় পৌছিয়ে দেন, তো এমন কোন্ শক্তি আছে যা তাকে সুপথে আনবে?

৩. অর্থাৎ এ পার্থিব জীবন ছাড়া দ্বিতীয় কোন জীবন নেই। এ-ই একমাত্র জগৎ, যেখানে আমরা মরি ও বাঁচি। বৃষ্টি হওয়ার পর যেমন যমীনে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, আর খরা হলে তা শুকিয়ে মরে যায়, মানুষের অবস্থাও ঠিক এমনই। একসময় আসে যখন সে জন্ম গ্রহণ করে, এরপর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। পরিশেষে কালের গতি তাকে খতম করে দেয়। জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাই দুনিয়াতে চলতে থাকে, সামনে অন্য কিছুই নেই।

৪. (সাধারণভাবে) دهر বলে زمانہ বা কালকে। তা তো ক্রিয়াশীল নয়। কারণ, তার মধ্যে না আছে বোধশক্তি, না বুদ্ধি, না আছে ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং ওরা دهر বলে (কাল নয়), নিশ্চয় অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে থাকবে, যা অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু দুনিয়াতে তার শক্তি ক্রিয়াশীল।

২৫. যখন ওদেরকে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, তখন ওদের কোনো যুক্তি থাকে না কেবল এ কথা ছাড়া যে, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[১]।'

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِاٰبَآئِنَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. আপনি বলুন, 'আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তোমাদের একত্র করবেন কিয়ামত দিবসে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে না[২]।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

[রুকূ - ৪]

২৭. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন বাতিলপূজারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে[৩]।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

যখন এ কথা, তাহলে আল্লাহকেই 'মৃত্যুদানকারী' বলা ও স্বীকার করা উচিত। কারণ, তাঁর অস্তিত্ব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-ক্রিয়াশীলতা প্রকৃতিগত দলীল-প্রমাণ এবং জ্ঞানগত ও ধর্মীয় নিদর্শনাদির আলোকে প্রমাণিত, আর কালের ঘুর্ণিচক্র ও রাতদিনের পরিবর্তন তাঁরই মুঠিতে (সুতরাং তিনিই জীবন-মৃত্যু দানকারী)। এই অর্থেই হাদীছে (বুখারী : ৬১৮২) বলা হয়েছে, دهر হল আল্লাহ। সুতরাং دهر কে মন্দ বলতে নেই। কেননা, মানুষ যখন دهر কে মন্দ বলে, এ জন্যই বলে যে, সে কালের ঘটনাপ্রবাহকে তারই ক্রিয়া বলে মনে করে। অথচ কালের সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ে হয়ে থাকে। অতএব কালকে মন্দ বলায় প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলার শানে বেয়াদবী করা হয়। (أعاذنا الله منه)

১. অর্থাৎ যখন কুরআনের আয়াতসমূহ অথবা পুনরুত্থানের দলীল-প্রমাণ ওদের শোনানো হয়, তখন বলে, আমরা কোন যুক্তি-প্রমাণ মানি না। কথা একটাই, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্য হও, তবে আমাদের পরলোকগত বাপদাদাদের জীবিত করে দেখিয়ে দাও। তখনই আমরা স্বীকার করব যে, মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার বিষয়টি সত্য।

২. অর্থাৎ যিনি একবার জীবিত করেছেন, এরপর মৃত্যু দান করেছেন— তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার জীবিত করে সকলকে এক স্থানে একত্র করা অসম্ভব হবে কেন?

৩. সেদিন ওরা লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে বুঝতে পারবে, কী ভুলের মধ্যেই না ওরা ছিল।

২৮. এবং আপনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নতজানু অবস্থায় দেখবেন[১]। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে নিজ আমলনামার দিকে ডাকা হবে (এবং বলা হবে), 'তোমরা যা করতে, আজ তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে[২]।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰۤى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২৯. 'এটি আমার লিখিত দফতর, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য বলছে[৩]। তোমরা যা-কিছু করতে, আমি তা লেখাতে থাকতাম[৪]।'

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৩০. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের রব নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন । এ-ই সুস্পষ্ট সাফল্য[৫]।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝

৩১. আর যারা অস্বীকার করেছে (তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে,) 'তোমাদের কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছ, আর তোমরা ছিলে অপরাধী সম্প্রদায়[৬]।'

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۝

---

১. ভয় ও আতঙ্কে এ অবস্থা হবে।

২. অর্থাৎ আমলনামার দিকে ডাকা হবে যে, আস, এ অনুযায়ী হিসাব দাও। আজ প্রত্যেককে ওই সব আমলেরই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা সে দুনিয়াতে কামাই করেছিল।

৩. অর্থাৎ তোমরা যেসব কাজ করেছিলে, এই আমলনামা তা সবই ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছে, বিন্দুমাত্র কম-বেশী বলছে না।

৪. আমার জ্ঞানে তো সবকিছু পূর্ব থেকেই আছে, কিন্তু নিয়ম রক্ষার্থে আমার ফেরেশতারা লেখার জন্য নিয়োজিত ছিল। তাদেরই লিখিত নিখুঁত রিপোর্ট আজ তোমাদের সম্মুখে রয়েছে।

৫. অর্থাৎ তাদের তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যেথায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের রহমত এবং সব রকমের মেহেরবানী তারা লাভ করবে।

৬. অর্থাৎ উপদেশ ও হেদায়াত প্রদান এবং তোমাদের ওযর-আপত্তির পথ বন্ধ করার জন্য আমার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করা হয়েছিল। কিন্তু তোমাদের অহংকারের মাথা

৩২. যখন বলা হত, 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই'—তখন তোমরা বলতে, 'আমরা জানি না, কিয়ামত কী? আমাদের কেবল একটা ধারণার মত হয়, আমাদের বিশ্বাস হয় না[১]।'

وَاِذَا قِيۡلَ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيۡبَ فِيۡهَا قُلۡتُمۡ مَّا نَدۡرِىۡ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنۡ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِيۡنَ ﴿۳۲﴾

৩৩. আর ওদের সামনে ওরা যেসব মন্দ কাজ-কর্ম করেছে তা প্রকাশ পাবে এবং যে বিষয় নিয়ে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা ওদের ঘিরে ফেলবে[২]।

وَبَدَا لَهُمۡ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوۡا وَحَاقَ بِهِمۡ مَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ﴿۳۳﴾

৩৪. আর বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদের ভুলে যাব, যেভাবে তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে[৩]। তোমাদের আবাস হল দোযখ, আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَقِيۡلَ الۡيَوۡمَ نَنۡسٰٮكُمۡ كَمَا نَسِيۡتُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هٰذَا وَمَاۡوٰٮكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ نّٰصِرِيۡنَ ﴿۳۴﴾

৩৫. তার কারণ এই যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিদ্রূপের বস্তু বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদের প্রতারিত

ذٰلِكُمۡ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذۡتُمۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتۡكُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ۚ فَالۡيَوۡمَ لَا

নত হয়নি। পরিশেষে তোমরা পাকা অপরাধী সাব্যস্ত হলে। অথবা وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ —এর এ অর্থ করা যায় যে, তোমরা শুরু থেকেই অপরাধ করায় অভ্যস্ত ছিলে।

১. অর্থাৎ আমরা জানি না, কিয়ামত কী জিনিস। তোমরা কিয়ামতের যেসব অদ্ভুত অবস্থা বর্ণনা কর, তাতে আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। হ্যাঁ, শুনে শুনে কিছুটা দুর্বল সম্ভাবনা অথবা অস্পষ্ট ধারণার মত হয় আর কি!

২. অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে, ওদের সমস্ত দুষ্কর্ম এবং তার ফলাফল প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর যে আযাব প্রভৃতির হুমকি নিয়ে ওরা ঠাট্টা করত, স্বয়ং তা ওদের উপর এসে পড়বে।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা আজকের দিনটি স্মরণ রাখনি, কাজেই আজ আমিও তোমাদের দয়া-মায়ার সঙ্গে স্মরণ করব না। চিরকাল এভাবেই তোমাদের আযাবে ফেলে রাখব, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে দুনিয়ার মজায় মত্ত রেখেছিলে।

করেছিল[১]।' অতএব আজ দোযখ থেকে ওদের বেরও করা হবে না এবং ওদের বলা হবে না (আল্লাহকে) রাযী-খুশী করতে[২]।

يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৩৬. অতএব সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আকাশসমূহের রব, পৃথিবীর রব, তথা বিশ্বজগতের রব।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৩৭. এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বড়ত্ব তাঁরই, আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৩]।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاۤءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

---

১. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার আনন্দে মত্ত হয়ে ধারণাই করনি যে, বিচারের এই পর্ব কোনদিন অতিক্রম করতে হবে এবং আল্লাহর সম্মুখেও হাযিরা দিতে হবে। কখনো একটু আধটু খেয়াল এসে থাকলেও এ কথা ভেবে অন্তরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলে যে, দুনিয়াতে যেমন আমরা মুসলমানদের উপর প্রবল, সেখানেও আমাদের প্রাবল্য ও জয়-জয়কার থাকবে।

২. অর্থাৎ ওদের দোযখ থেকে বেরও করা হবে না এবং এখন ওরা আল্লাহকে রাযী-খুশী করার চেষ্টা করবে– এ সুযোগও দেওয়া হবে না।

৩. মানুষের উচিত– তাঁরই অভিমুখী হওয়া, তাঁর অনুগ্রহ ও নে'য়ামতসমূহের মূল্যায়ন করা, তাঁর হেদায়াত মত চলা, সকলকে ছেড়ে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের ফিকির করা এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও আজমতের সম্মুখে সর্বদা স্বেচ্ছায় অনুগত হয়ে থাকা, কখনো অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের কল্পনাও অন্তরে না আনা।

হাদীছে কুদসীতে আছে– الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، [গৌরব আমার চাদর এবং আজমত আমার পোশাকতুল্য। অতএব যে কেউ এই দুটির কোনটি আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইবে, আমি তাকে উঠিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করব।] (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৮৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৫৬৭১)

اللّٰهُمَّ اجعلنا مطيعين لأمرك وجنبنا غضبك وقنا عذاب النار، إنك سميع مجيب الدعوات،

تم سورة الجاثية بعونه وصونه فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة.

সূরা আহকাফ

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৪৬ । ৩৫ আয়াত । ৪ রুকূ । মক্কী

آياتها ٣٥، ركوعاتها ٤

পারা-২৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ①

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২. (এ) কিতাবের অবতারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

৩. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের মাঝখানে যা কিছু আছে, সব সৃষ্টি করেছি যথাযথভাবেই এবং এক নির্ধারিত সময়ের জন্যই[১]। কিন্তু যারা কাফের, তারা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে[২]।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ

৪. আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক, আমাকে দেখাও তো– তারা পৃথিবীর কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশমণ্ডলী(-র সৃষ্টি) তে তাদের কি কোনো অংশ আছে[৩]?

---

১. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এবং এই বিশ্বকারখানা আল্লাহ তাআলা অযথা সৃষ্টি করেননি; বরং কোনো বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পয়দা করেছেন। আর এই কারখানা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যথারীতি চলতে থাকবে, যতক্ষণ না এর ফল প্রকাশিত হয়। নির্ধারিত সময় আসার পর ফলাফল প্রকাশ— একেই আখেরাত বলা হয়।

২. অর্থাৎ ওরা মন্দ পরিণামের ভয় করে না এবং আখেরাতের প্রস্তুতি নেয় না। যখন আখেরাতের কথা বলা হল, তখন এক কানে শুনল, অপর কান দিয়ে বের করে দিল।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তো আকাশ, পৃথিবী ও সমগ্র বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা ঈমানদারীর সাথে বল তো, পৃথিবীর কোনো টুকরা অথবা আকাশের কোনো অংশ

তোমরা আমার নিকট এর পূর্বের কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও[১]।'

اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَاۤ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৫. ওদের চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ডাকে, যারা কিয়ামতের দিন পর্যন্তও ওদের ডাকে সাড়া দেবে না, বরং ওদের ডাক সম্বন্ধে তাদের কোন খবরও নেই[২]।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৬. আর যখন মানুষদের (হাশরের মাঠে) একত্র করা হবে, তখন তারা ওদের (মুশরিকদের) দুশমন হবে এবং ওদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে[৩]।

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝

অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে কি? অথবা সৃষ্টি করতে পারে কি? নিশ্চয় না। তাহলে ওই উপাস্যদের আল্লাহর মত, বরং আল্লাহর চেয়েও বেশি কেন ডাকা হয়?

১. অর্থাৎ সৃষ্টিতে তাদেরও অংশ আছে— এ দাবিতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কোনো আসমানী কিতাব থেকে প্রমাণ দেখাও, অথবা এমন কোনো মৌলিক নীতির আলোকে তা প্রমাণ কর, যা পূর্ব থেকে জ্ঞানী-গুণীদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত। যদি তোমাদের দাবীর সমর্থনে ধর্মীয় বা জ্ঞানগত— কোনই প্রমাণ না থাকে, তবে তা কেমন করে স্বীকার করা যায়?

২. অর্থাৎ এর চেয়ে বড় বোকামী ও গোমরাহী আর কী হতে পারে যে, আল্লাহকে ছেড়ে এমন নির্জীব বা অক্ষম সৃষ্টিকে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ডাকা হয়, যারা নিজ ইচ্ছায় কারো ডাকে সাড়া দিতে পারে না; বরং পূজারীদের ডাক সম্বন্ধে তাদের অবহিত থাকাও জরুরী নয়। পাথরের মূর্তির তো কথাই নেই, ফেরেশতা ও পয়গম্বরও কেবল সে কথাই শুনতে পারেন এবং সে কাজই করতে পারেন, যার অনুমতি ও শক্তি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।

৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন সাহায্যের অনেক বেশি প্রয়োজন হবে, তখন এই বেচারা উপাস্যরা নিজ পূজারীদের সাহায্য করা তো দূরে থাক, উলটা দুশমন হয়ে ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, দারুণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং এ কথা পর্যন্ত বলে বসবে— مَا كَانُوْۤا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ('এই লোকগুলো তো আমাদের পূজা করত না।') চিন্তা করে দেখ, তখন মুশরিকদের কেমন অনুতাপ ও আফসোস করতে হবে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۞

৭. যখন ওদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, তখন কাফেররা তাদের কাছে সত্য এসে যাওয়ার পরও এর ব্যাপারে বলে, 'এ তো সুস্পষ্ট যাদু[১]।'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ

৮. ওরা কি বলে, 'তিনি তা (কুরআন) রচনা করেছেন[২]?' আপনি বলুন, 'যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহর মোকাবেলায় আমার জন্য কিছুই করার ক্ষমতা রাখ না[৩]। তোমরা যেসব কথা বল, তা সম্পর্কে তিনি ভাল করেই অবগত। আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে

---

১. অর্থাৎ এ লোকগুলোর এখন পরিণামের কোনো ফিকির নেই। তাই কোনো নসীহত ও হেদায়াতের প্রতি কান দেয় না; বরং যখন কুরআনের আয়াত পড়ে শোনানো হয়, তখন তাকে যাদু বলে উড়িয়ে দেয়।

২. অর্থাৎ যাদু বলার চেয়ে ওদের এই দাবি অধিক মারাত্মক ও সাংঘাতিক যে, কুরআন মাজীদ তিনি (নবীজি) নিজে রচনা করে এনেছেন, যার অর্থ দাঁড়ায়– আল্লাহর প্রতি তিনি ভয়াবহ অপবাদ আরোপ করেছেন। (আল্লাহর পানাহ!)

৩. অর্থাৎ আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা চরম অপরাধ। অসম্ভব হলেও ধরা যাক, আমি যদি এমন ধৃষ্টতা করি, তবে আমি যেন জেনে-শুনে নিজেকে আল্লাহর গযব ও তাঁর কঠোর শাস্তির জন্য পেশ করছি। চিন্তা করে দেখ, যে ব্যক্তি সারা জীবন বান্দাদের নামেও মিথ্যা বলেনি এবং সামান্য সামান্য ব্যাপারেও যে আল্লাহর ভয়ে ভিত থাকে— সে কি হঠাৎ করে অযথাই আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে নিজেকে এমন বিরাট বিপদ ও মুসীবতে ফেলবে, যা থেকে রক্ষা করার কোনো শক্তি দুনিয়ায় নেই? ধরে নাও, আমি যদি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তোমাদেরকে আমার অধীন করেও নিই, তবু নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারদের উপর আল্লাহর যে গযব ও ক্রোধ আপতিত হয়, তা থেকে কি তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে? আমার চল্লিশ বছর জীবনের অবস্থা ও ঘটনাবলি থেকে এতটুকু তো তোমরাও বোঝ যে, আমি এমন নির্ভয় ও দুঃসাহসী নই এবং এরূপ নির্বোধও নই যে, কিছু মানুষকে খুশী করে আল্লাহ পাকের আক্রোশ ক্রয় করে নেব।

যা হোক, যদি আমি (العياذ بالله) মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হই, তবে এর শাস্তি আমার উপরই পতিত হবে।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑧

তিনিই যথেষ্ট[১]। এবং তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[২]।'

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ۭ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑨

৯. আপনি বলুন, 'আমি কোন অভিনব রাসূল নই[৩] এবং আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল ওই হুকুমের অনুসরণ করি যা আমার নিকট ওহী করা হয় এবং আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারীমাত্র[৪]।'

---

১. অর্থাৎ যেসব কথা তোমরা বলে বেড়াচ্ছ, আল্লাহ তাআলা তা উত্তমরূপে জানেন। অতএব অহেতুক ও নিরর্থক ধ্যাণ-ধারণা ছেড়ে নিজ পরিণামের ফিকির কর। যদি আল্লাহর সত্য রাসূলকে মিথ্যা ও প্রতারক বল, তবে এর পরিণতি কী হবে তা বুঝে নাও। আল্লাহর নিকট আমার ও তোমাদের কোনো কথাই গোপন নয়। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে স্বীয় সঠিক ও সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী আচরণ করবেন। সুতরাং আমি তাঁকেই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী মানছি। তিনি নিজ বাণী ও কার্যের দ্বারা স্পষ্ট করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন যে—কে সত্যের উপর আছে এবং কে মিথ্যা বলছে ও প্রতারণা করছে।

২. অর্থাৎ তোমরা এখনো ফিরে এলে ক্ষমা পাবে। আর এও তাঁর মেহেরবানী ও সহনশীলতা যে, পাপাচার সম্বন্ধে অবগতি এবং পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তোমাদের তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে দেন না।

৩. অর্থাৎ আমার আহ্বানে এত বিস্মিত হচ্ছ কেন? আমি তো কোনো নতুন জিনিস নিয়ে আসিনি, আমার পূর্বেও দুনিয়াতে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা জারী ছিল। আমি এ কথাই বলছি যে, সেই রাসূলগণের পরে আমাকে আল্লাহ তাআলা রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাঁর সংবাদ পূর্ববর্তী রাসূলগণ দিয়ে এসেছেন। এই হিসাবেও এ কোনো নতুন বিষয় নয়। বরং বহু পুরাতন সুসংবাদসমূহের বাস্তবায়ন আজ দেখা যাচ্ছে। অতএব আমার কথা মানতে বাধা কোথায়?

৪. অর্থাৎ আমার কাজের শেষ ফলাফল কী হবে? আল্লাহ তাআলা আমার সঙ্গে কী আচরণ করবেন এবং তোমাদের সঙ্গে কী করবেন? এ ব্যাপারে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমার ও তোমাদের পরিণাম তথা দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কী কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে– এ সম্বন্ধে এখন আমি বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না। তবে একটি কথা বলতে পারি, আমার কাজ হচ্ছে শুধু খোদায়ী ওহীর অনুসরণ ও খোদায়ী হুকুম পালন করা এবং কুফর ও নাফরমানীর ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে সতর্ক করে দেওয়া। সামনে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ও তোমাদের সঙ্গে কী করা হবে– এর বিস্তারিত বিবরণ বর্তমানে আমি জানি না; বরং এ বিতর্কে যাওয়ার আমার কোনো দরকারও নেই। বান্দার কর্তব্য হচ্ছে, ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকে মালিকের আদেশ-নির্দেশ পালন করে যাওয়া। এর বেশি কিছু নয়।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১০. বলুন, তোমরা বল তো, যদি কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অমান্য কর, অথচ বনী ইসরাঈলের এক সাক্ষী এরূপ কিতাবের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে (তার প্রতি) ঈমান এনেছে, কিন্তু তোমরা অহংকার করছ—(তাহলে তোমাদের চেয়ে বড় জালেম আর কে?)। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদের পথপ্রদর্শন করেন না[১]।

---

১. সে যুগে আরবের জাহেল মুশরিকদের উপর বনী ইসরাঈলের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খুবই প্রভাব ছিল। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের আলোচনা শুরু হল, তখন মুশরিকরা এ বিষয়ে বনী ইসরাঈলের আলেমদের মতামত জানতে চাইল। উদ্দেশ্য ছিল, কিতাবিরা নবীজিকে অস্বীকার করে বসলে মুশরিকদের পক্ষে এ কথা বলার সুযোগ আসত যে, দেখ– জ্ঞানীলোক ও আহলে কিতাবও তাঁর কথাকে মিথ্যা বলে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য হাসিলে মুশরিকরা সর্বদা ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের মুখেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করালেন।

শুধু এতটুকুই নয় যে, তারাও কুরআনের ন্যায় তাওরাতকে আসমানী কিতাব এবং নবীজির মত হযরত মূসাকে পয়গম্বর বলত, যার ফলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দাবি এবং কুরআনের ওহী হওয়ার দাবি কোনো অভিনব জিনিস থাকল না—বরং কতক ইহুদী আলেম পরিষ্কারভাবে স্বীকার করল এবং সাক্ষ্য দিল যে, আমাদের কিতাবে এই (আরব) দেশে এক মহামর্যাদাশালী রাসূলের আগমন-বার্তা রয়েছে এবং এ কিতাব (কুরআন) সেই কিতাবই মনে হচ্ছে, যার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। ইহুদী আলেমদের এ সাক্ষ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে ছিল, যা হাজারো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সত্ত্বেও আজো তাওরাত ইত্যাদি আসমানী কিতাবে বর্তমান রয়েছে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বনী ইসরাঈলের সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষী (হযরত মূসা আলাইহিস সালাম) হাজারো বছর পূর্বে নিজে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, বনী ইসরাঈলের নিকটআত্মীয় ও নিকটবংশধর (তথা বনী ইসমাঈল) থেকে তাঁরই ন্যায় এক রাসূলের আবির্ভাব হবে। ইরশাদ হয়েছে—إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানকারী, যেমন পাঠিয়েছিলাম ফেরাওনের নিকট এক রাসূল। –মুযযাম্মিল, আয়াত ১৫) এ কারণেই কিছু সংখ্যক ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যের অনুসারী ইহুদী পণ্ডিত যথা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দেখামাত্র ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বলে ওঠেন—إن هذا الوجه ليس بوجه كاذب (এই চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না)। তাঁরা কুরআনের ন্যায় প্রকাশ্য অলৌকিক কিতাবের সত্যতারও সাক্ষ্য প্রদান করেন।

[রুকূ - ২]

১১. কাফেররা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলে, 'তা (দীনে ইসলাম) যদি উত্তম হত, তাহলে তার দিকে তারা আমাদের আগে অগ্রসর হতে পারত না[১]।' আর ওরা যখন তার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করল না, তখন অবশ্যই বলবে, 'এ তো এক পুরনো মিথ্যা[২]।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ⑪

১২. এর পূর্বে (এসেছিল) মূসার কিতাব পথের দিশারী ও রহমতস্বরূপ। আর এটি (তার) সমর্থনকারী কিতাব[৩], যা আরবী ভাষায় (নাযিল হয়েছে), যাতে তা অপরাধীদের সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদের জন্য হয় সুসংবাদ।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ⑫

আয়াতের সারাসার

তো, যখন মূসা আলাইহিস সালাম হাজারো বছর পূর্বে নবীজির নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনলেন, ইহুদী আলেমরা এর সত্যতা স্বীকার করল, কতিপয় ইহুদী পণ্ডিত মৌখিক ও আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান করত ইসলাম গ্রহণ করলেন—তখন এ সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা (হে মুশরিকরা) যদি নিজেদের অহংকার ও হঠকারিতার কারণে ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে এর চেয়ে বড় জুলুম ও অপরাধ আর কী হবে? আর এমন জালেম ও অপরাধীর মুক্তি ও সফলতার আশা কী করে করা যেতে পারে?

১. অর্থাৎ ওরা বলে, দুর্বল ও দীন-হীন লোকেরা এবং দাস-দাসীরাই মুসলমান হয়। যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হত, তবে উত্তম লোকেরা এর প্রতি ধাবিত হত এবং একে হাসিল করায় আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান, মর্যাদাবান ও ধনবান ব্যক্তিরা এসব দাস-দাসীর পিছনে থাকত না।

২. অর্থাৎ সকল যুগেই কিছু লোক এমন কথা বলে এসেছে।

সম্ভবত هَذَا اِفْكٌ قَدِيْم এ কথা ওরা وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ও مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ এর উত্তরে বলে থাকতো।

৩. অর্থাৎ এ পুরাতন মিথ্যা নয়; বরং বহু পুরাতন সত্য। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সহস্র বছর পূর্বে তাওরাত কিতাবও একই মৌলিক শিক্ষাই দিয়েছিল, যার অনুসরণ পরবর্তী নবী ও ওলীরা করে গেছেন। এবং তাওরাত কিতাবই পরবর্তী লোকদেরকে নিজ শিক্ষা ও সুসংবাদ দ্বারা সততা ও হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করেছে এবং রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করেছে। এখন এই যুগে তাওরাতের সত্যায়ন করে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

মোটকথা, উভয় কিতাব একে অপরের সমর্থন করে এবং ঠিক এই অবস্থা অপরাপর আসমানী কিতাবগুলিরও।

১৩. যারা বলেছে, 'আমাদের রব আল্লাহ' অতঃপর অবিচল থেকেছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না[১]।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

১৪. তারা জান্নাতবাসী, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে- তারা যেসব আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ[২]।

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১৫. আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি[৩]। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে তাকে প্রসব করেছে[৪]। আর

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

১. এ ধরনের আয়াত সূরা حم السجدة তে (আয়াত : ৩০) রয়েছে। তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ নিজেদের নেককর্মের ফলে আল্লাহ তাআলার রহমতে অনন্তকাল বেহেশতে থাকবে।

৩. পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা নিজ হকের সঙ্গে মাতাপিতার হক বর্ণনা করেছেন। কেননা, প্রকৃত অস্তিত্বদানকারী তো আল্লাহই, কিন্তু উপায়-উপকরণের জগতে মাতাপিতাই সন্তানের অস্তিত্বের বাহ্যিক কারণ এবং তারা আল্লাহ তাআলার 'শানে রুবুবিয়্যতের' বিশেষ প্রকাশস্থল হয়ে থাকে। এখানেও প্রথমে إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ...الخ আয়াতে আল্লাহ তাআলার হকসমূহের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াতে মাতাপিতার হক বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, সে যেন মাতাপিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এবং তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা, মহব্বত ও খেদমতকে নিজের সৌভাগ্য মনে করে।

অন্যত্র (লুকমান : ১৫) বলা হয়েছে, যদি মাতাপিতা মুশরিক হয়, তবুও তাদের সঙ্গে দুনিয়াতে সদ্ব্যবহার করতে হবে, বিশেষত মায়ের সেবা-শুশ্রূষা। কেননা, কয়েক কারণে মাতার হক পিতার উর্ধ্বে, যেমন বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ গর্ভ যখন কয়েক মাসের হয়ে যায়, তখন তার ভার অনুভূত হতে থাকে। এ অবস্থায় এবং প্রসবের সময় মাতা কত কষ্টই না সহ্য করে। এরপর শিশুকে স্তন্য পান করায় এবং একাধারে কয়েক বছর তার সব রকমের সেবা-যত্ন করে। নিজের আরাম-আয়েশকে সন্তানের জন্য উৎসর্গ করে দেয়। পিতাও বিভিন্নভাবে এসব কষ্টের ভাগী হয় এবং সন্তানের লালন-পালনের উপকরণের ব্যবস্থা করে।

অবশ্যই এসব কাজ স্বভাবের তাড়নায় হয়ে থাকে বটে। কিন্তু এই মানব স্বভাবেরই দাবি, সন্তান যেন মাতাপিতার উক্ত স্নেহ-মমতাকে উপলব্ধি করে এবং তাদের পরিশ্রমের ও স্বীয় আরামের চেয়ে সন্তানের আরামকে অগ্রগণ্য রাখার যে চেষ্টা, তার মূল্যায়ন করে।

বি. দ্র. হাদীছে (বুখারী : ৫৯৭১) মায়ের খেদমতের ব্যাপারে তিনবার নির্দেশ দান করে পিতার খেদমতের নির্দেশ একবার দেওয়া হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে পিতার

وَحَمۡلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوۡنَ شَهۡرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرۡبَعِیۡنَ سَنَۃً ۙ قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰىهُ وَاَصۡلِحۡ لِیۡ فِیۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۚؕ اِنِّیۡ تُبۡتُ اِلَیۡکَ وَاِنِّیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ۝

তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ ত্রিশ মাস[১]। অবশেষে সে যখন পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে পৌঁছল এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হল[২], তখন বলতে লাগল— 'হে আমার রব! আমাকে তাওফীক দান করুন আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করার, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন এবং (তাওফীক দিন) নেক আমল করার, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যেও নেকির যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিন। আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং আমি আদেশ মান্যকারীদের একজন[৩]।

উল্লেখ মাত্র একবার–والديه শব্দের মধ্যে করা হয়েছে, কিন্তু মায়ের উল্লেখ তিন শব্দে তিনবার করা হয়েছে—প্রথমে والديه শব্দে, পরে حملته أمه বাক্যে, অতঃপর وضعته শব্দে।

১. সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রের হিসাবে ত্রিশ মাসের কথা বলা হয়েছে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ছেলে যদি হৃষ্টপুষ্ট হয়, তবে তার দুধ ছাড়তে একুশ মাস এবং মাতৃগর্ভে নয় মাস, মোট ত্রিশ মাস সময় লাগে।'

অথবা এরূপ বলা যায়, মাতৃগর্ভে কমপক্ষে ছয় মাস এবং দুধ ছাড়াতে সাধারণত দুই বছর, সর্বমোট ত্রিশ মাস। দুগ্ধপানের সময় এর চেয়ে বেশি কদাচিৎ হয়ে থাকে।

২. চল্লিশ বছর বয়সে সাধারণত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও নৈতিক শক্তি পরিপক্ক হয়ে যায়। এ জন্যই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে নবুওয়াত চল্লিশ বছরের পূর্বে দান করা হত না।

৩. অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ও নেক মানুষের স্বভাব এই যে, তার প্রতি এবং তার মাতাপিতার প্রতি আল্লাহ তাআলার যেসব অনুগ্রহ হয়েছে, সে আল্লাহর কাছে সেসবের শোকর আদায় করার তাওফীক চায় এবং ভবিষ্যতে নেক আমল করার তাওফীকও প্রার্থনা করে। অধিকন্তু নিজের সন্তানসন্ততির জন্যও নেকীর দো'য়া করে। আর আল্লাহর হক ও বান্দাদের হক আদায়ে যে ত্রুটি হয়েছে, তা থেকে সে তওবা করে এবং বিনীতভাবে নিজ দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ করে।

বি. দ্র. সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এ কারণে বড় সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, স্বয়ং তিনি, তাঁর মাতাপিতা ও সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত লাভ করেন। সাহাবীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আর কারো ভাগ্যে জুটেনি।

১৬. এরাই তারা, যাদের উত্তম আমলগুলি আমি কবূল করি আর তাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করি। তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত- তাদের সঙ্গে যে সত্য ওয়াদা করা হত তা অনুসারে[১]।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ اَحۡسَنَ مَا عَمِلُوۡا وَنَتَجَاوَزُ عَنۡ سَيِّاٰتِهِمۡ فِيۡٓ اَصۡحٰبِ الۡجَنَّةِ ؕ وَعۡدَ الصِّدۡقِ الَّذِيۡ كَانُوۡا يُوۡعَدُوۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতাপিতাকে বলে, 'ধিক্ তোমাদের[২]! তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাচ্ছ যে, আমাকে (কবর থেকে) বের করা হবে, অথচ আমার পূর্বে বহু সম্প্রদায় গত হয়েছে[৩]?' তখন তারা উভয়ে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে (এবং বলে), 'দুর্ভোগ তোর! তুই ঈমান আন। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য[৪]।' তখন সে বলে, 'এসব পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়[৫]—

وَالَّذِيۡ قَالَ لِوَالِدَيۡهِ اُفٍّ لَّكُمَاۤ اَتَعِدٰنِنِيۡۤ اَنۡ اُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ الۡقُرُوۡنُ مِنۡ قَبۡلِيۡ ۚ وَهُمَا يَسۡتَغِيۡثٰنِ اللّٰهَ وَيۡلَكَ اٰمِنۡ ٭ۖ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚۖ فَيَقُوۡلُ مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿۱۷﴾

---

১. অর্থাৎ এমন বান্দাদের নেকীসমূহ কবুল করা হয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হয়; আর আল্লাহর সত্য ওয়াদা অনুযায়ী তাদের স্থান হল জান্নাতে ।

২. এখানে ভাগ্যবান সন্তানের মোকাবেলায় বেআদব, নাফরমান ও নালায়েক সন্তানের আলোচনা করা হচ্ছে। মাতাপিতা তাকে ঈমানের কথা বুঝাচ্ছেন; কিন্তু সে বোঝে না, বরং অত্যন্ত অভদ্রতার সাথে সম্বোধন করে তাদের কষ্ট দিচ্ছে।

৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার হুমকি-ধমকিতে আমি ভয় করি না। দেখ, কত জাতি ও সম্প্রদায় আমার পূর্বে গত হয়েছে। তাদের কেউ কি এখন পর্যন্ত পুনর্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে? বস্তুত মানুষ সর্বদাই উক্ত কথা শুনে এসেছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত এ কথার সত্যতা পাওয়া গেল না। সুতরাং আমি কী করে বিশ্বাস করতে পারি?

৪. অর্থাৎ ওর ধৃষ্টতা ও গোস্তাখির জন্য একদিকে তারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে এবং দো'য়া করে, যেন সে সত্যকে গ্রহণ করার তাওফীক পায়। অন্যদিকে ওকে বোঝায় আর বলে— হতভাগা, তোর সর্বনাশ হবে! এখনো ফিরে আয়। দেখ, আল্লাহর ওয়াদা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের যে সংবাদ তিনি দিয়েছেন, তা যথাসময়ে পূর্ণ হবেই হবে, তখন এই অস্বীকৃতির মজা টের পাবি।

৫. অর্থাৎ এরূপ কাহিনী বহু শুনেছি। পুরাতন কালের কিচ্ছা-কাহিনী এভাবেই খ্যাতি লাভ করে। আসলে এগুলির কোন বাস্তবতা নেই।

১৮. তো এমন ব্যক্তিরাই তারা, যাদের ব্যাপারে (আযাবের) কথা অবধারিত হয়ে গেছে[১]; এরা সেসব জিন ও মানব সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যারা এদের পূর্বে গত হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল চরম ক্ষতিগ্রস্ত[২]।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

১৯. প্রত্যেকের জন্য স্বীয় কৃতকর্ম অনুসারে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন স্তর[৩]। আর (আল্লাহ এটা এজন্য করেছেন), যাতে তাদেরকে তাদের কাজ-কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল দেন। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না[৪]।

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

২০. যেদিন কাফেরদের আগুনের নিকট হাযির করা হবে (সেদিন বলা হবে), 'তোমরা তোমাদের সুখ-সম্ভার নিজেদের দুনিয়ার জীবনেই নিঃশেষ করেছ এবং তা দ্বারা খুব মজা লুটেছ[৫]। অতএব আজ বিনিময়স্বরূপ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ

---

১. 'আযাবের কথা' বলতে আল্লাহ তাআলার এই উক্তি (সাজ্‌দাহ : ১৩) উদ্দেশ্য—لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ। বর্তমান আয়াতের মর্ম হল, জিন ও মানুষের বহু দল যেমন এদের পূর্বে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে, এ হতভাগারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

২. আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় প্রত্যেক মানুষের অন্তরে স্বভাবগতভাবে ঈমান ও সৌভাগ্যের যে বীজ বপন করেছিলেন, তাও ওই হতভাগারা বিনষ্ট করে দিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ করার স্থলে অবহেলা ও বোকামির কারণে পুঁজিও নষ্ট করে বসে, তবে এর চেয়ে ক্ষতি আর কী হতে পারে?

৩. অর্থাৎ আমলের বিভিন্নতার কারণে জান্নাতবাসীদের একাধিক স্তর রয়েছে; তদ্রূপ দোযখীদেরও।

৪. অর্থাৎ কোনো নেকীর ছওয়াব কম করা হবে না, কোনো পাপের শাস্তি সংগত পরিমাণের বেশি দেওয়া হবে না।

৫. কাফেরের কোনো সৎকর্মে ঈমানের রূহ থাকে না, সৎকর্মের শুধু আকৃতি ও খোলস থাকে। এমন ক্ষণস্থায়ী সৎকর্মের প্রতিদানও ক্ষণস্থায়ী, যা ইহজগতেই ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, রাজত্ব, স্বাস্থ্য, সম্মান ইত্যাদিরূপে লাভ হয়। একেই বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদের বাহ্যিক নেককাজের ফল দুনিয়াতেই গ্রহণ করেছিলে এবং সেখানকার আরাম-আয়েশের মাধ্যমে তা উপভোগ করেছিলে। ঈমান আনলে আখেরাতে যে আরাম-আয়েশ পেতে, তার স্থলেও যেন দুনিয়াতেই মজা লুটেছ। এখন আখেরাতের সুখ-সম্ভোগে তোমাদের কোনো অংশ নেই।

تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ۝

তোমাদের অপমানকর আযাব দেওয়া হবে, কেননা তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা নাফরমানী করতে[১]।

[রুকূ - ৩]

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۚ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۝

২১. আপনি আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন[২], যখন তিনি আহকাফ অঞ্চলে[৩] নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করত বলেছিলেন —আর তাঁর পূর্বে ও পরে আরো সতর্ককারীগণ গত হয়েছিলেন— 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি[৪]।'

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যারা আখেরাত চায়নি, শুধু দুনিয়াই চেয়েছে, তাদের সমস্ত সৎকর্মের প্রতিদান এই দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়েছে।'

১. অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে মিথ্যা অহমিকা ও নাফরমানির শাস্তিস্বরূপ লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর আযাব দেওয়া হবে। তোমাদের জন্য এই একটা জিনিসই এখানে অবশিষ্ট রয়েছে।

সামনে এমন কিছু শক্তিশালী ও অহংকারী সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই যাদেরকে চরম পরিণাম ভোগ করতে হয়েছিল।

২. অর্থাৎ হযরত হূদ আলাইহিস সালাম এর কথা, যিনি 'আদ' জাতীর বংশীয় ভাই ছিলেন।

৩. أرض القرآن পুস্তকের সংকলক (আল্লামা সুলাইমান নদভী র.) এ কিতাবে بِلاد الأحقاف শিরোনামের অধীনে লেখেন—'ইয়ামামা, আম্মান, বাহরাইন, হাযরামাওত ও পশ্চিম ইয়ামানের ঠিক মাঝে 'আদ্-দাহনা' বা 'রুবউন খালী' নামে যে বিরাট মরুভূমি রয়েছে, তা যদিও বসবাসযোগ্য নয়, কিন্তু তার প্রান্তসমূহে কোথাও কোথাও কিছু বসতি জমি আছে। বিশেষত সেই অংশে, যা হাযরামাওত থেকে নাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও এখন তা আবাদ নয়, কিন্তু প্রাচীন কালে এই হাযরামাওত ও নাজরানেরই মধ্যবর্তী অংশে 'আদে-ইরাম' নামক বিখ্যাত জাতির বসবাস ছিল, যাদের আল্লাহ তাআলা নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করে দেন।'

৪. অর্থাৎ, হূদ আলাইহিস সালামের আগে ও পরে বহু সতর্ককারী আগমন করেছেন। তাঁরা সকলে সেই কথাই বলে গিয়েছেন, যা হযরত হূদ (আ) বলেছেন- অর্থাৎ এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং কুফর ও অবাধ্যতার খারাপ পরিণামকে ভয় কর।–হতে পারে, আদ সম্প্রদায়ের মধ্যেও হযরত হূদ (আ) ছাড়া আরো সতর্ককারী এসেছিলেন। والله اعلم

২২. ওরা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ, যাতে আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পার? তাহলে, তুমি আমাদের যে জিনিসের ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের নিকট হাযির কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও[১]।'

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۝

২৩. তিনি বললেন, 'জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আমি তোমাদের নিকট তা পৌঁছে দিচ্ছি যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু আমি তোমাদের এক মূর্খ সম্প্রদায় দেখতে পাচ্ছি[২]।'

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ۝

২৪. অতঃপর ওরা যখন আযাবকে একখণ্ড মেঘরূপে ওদের উপত্যকাগুলোর দিকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন বলতে লাগল, 'এ তো মেঘ, যা আমাদের বৃষ্টি দান করবে[৩]।' (হুদ বললেন) 'না, বরং এ তো সেই জিনিস, যার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়ো করেছিলে– (এ তো) বাতাস, যার মধ্যে আছে যাতনাদায়ক আযাব[৪]—

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۚ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

১. অর্থাৎ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার নই। যদি তুমি তোমার হুমকি-ধমকিতে সত্য হও, তবে দেরি কেন? যা মুখে বল, তা করে দেখাও।

২. অর্থাৎ এ ধরনের দাবি তোমাদের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। আমি আল্লাহর পয়গম্বর, আমার মাধ্যমে যে পয়গাম পাঠানো হয়েছে, তাই আমি পৌছাচ্ছি। এর বেশি আমি জানিও না, তা আমার এখতিয়ারেও নেই। আর কাফের লোকগুলি কখন পার্থিব শাস্তির যোগ্য হবে এবং কখন পর্যন্ত ওদের অবকাশ দেওয়া উচিত, এসব একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন।

৩. অর্থাৎ সামনে থেকে মেঘ আসতে দেখা গেল। ওরা ভাবল, সকল নদীনালা পানিতে ভরে যাবে। তাই বলতে লাগল, আকাশে বর্ষণযোগ্য ভারী মেঘ দেখা দিয়েছে, এখন উদ্দেশ্য হাসিল হবে। বস্তুত তখন দীর্ঘ খরার কারণে ওদের পানির প্রয়োজন ছিল অত্যধিক।

৪. অর্থাৎ এ বর্ষণযোগ্য মেঘ নয়, বরং আল্লাহর আযাবের ঘূর্ণিঝড়। এ সেই জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।

২৫. 'যা আপন রবের নির্দেশে সবকিছু উপড়ে ফেলবে।' অতঃপর ওরা এমন হয়ে গেল যে, ওদের ঘরগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী লোকদের শাস্তি দিয়ে থাকি[১]।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَٰكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝٢٥

২৬. নিশ্চয় আমি ওদের এমন এমন বিষয়ের ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যার ক্ষমতা তোমাদেরকে (সমপরিমাণে) দেইনি[২] এবং ওদের দিয়েছিলাম কান, চোখ ও অন্তর। কিন্তু ওদের কান, চোখ ও অন্তর ওদের কোন কাজে আসেনি[৩]। কারণ, ওরা আল্লাহর আয়াতগুলি অস্বীকার করত। আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই ওদের পরিবেষ্টন করে নিল[৪]।

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٢٦

---

১. সাতরাত-আটদিন বিরামহীনভাবে এমন ভয়ঙ্কর ঝড় বইতে থাকে, যার সামনে গাছপালা, মানুষ ও পশুপাখী খড়কুটার চেয়ে বেশি ছিল না। বাতাস প্রত্যেক বস্তু উপড়িয়ে ফেলল এবং চতুর্দিকে ধ্বংসলীলা চালাল। পরিশেষে ঘরবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু থাকল না।

দেখতে পেয়েছ কি! আল্লাহর অবাধ্য, অপরাধীদের অবস্থা এ-ই হয়। অতএব এসব ঘটনার কথা শুনে সতর্ক হও। নতুবা তোমাদেরও এ অবস্থাই হতে পারে।

২. অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, দলবল ও শারীরিক শক্তি যে পরিমান ওদের দেওয়া হয়েছিল, তা তোমাদের দেওয়া হয়নি। কিন্তু ওদের উপর যখন আযাব এল, তখন কোনো কিছুই কাজে আসল না। সুতরাং তোমরা কী নিয়ে গর্ব করছ?

৩. অর্থাৎ নসীহত শোনার জন্য কান, কুদরতের নিদর্শনাদি দেখার জন্য চোখ এবং অনুধাবন ও উপলব্ধির জন্য অন্তর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো শক্তিকেই ওরা কাজে লাগায়নি। অন্ধ, মূক ও আকলশূণ্য হয়ে ওরা পয়গম্বরদের বিরোধিতায় নামল। পরিণাম এই হল যে, এসব শক্তি-সামর্থ্য থাকতেই আল্লাহর আযাব এসে ওদের ঘিরে নিল, কোনো বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ শক্তিই তা থেকে রক্ষা করতে পারল না।

৪. অর্থাৎ যে আযাব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত, তাই ওদের উপর পতিত হল।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'ওদের অন্তর, কান ও চোখ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ পার্থিব কাজকামে ওরা বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু যে বুদ্ধিতে পরকালও দুরুস্ত হত, তার উদ্রেক ওদের মধ্যে হল না।'

[রুকূ - ৪]

২৭. নিশ্চয় আমি তোমাদের আশপাশের বিভিন্ন জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি[১] এবং নানাভাবে (আমার) আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি, যাতে ওরা ফিরে আসে[২]।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۝

২৮. তো, ওরা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাস্য বানিয়েছিল, তারা ওদের সাহায্য করল না কেন[৩]? বরং তারা ওদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল[৪]। বস্তুত তা ছিল ওদের মিথ্যা কথা এবং ওদের মনগড়া বিষয়[৫]।

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ 'আদ' ছাড়াও 'ছামূদ জাতি', 'লূতের জাতি' প্রভৃতি জাতিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, যাদের বসবাস তোমাদের আশপাশেই ছিল।

এ আয়াতে মক্কাবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন সফরে উক্ত জাতিগুলির আবাসস্থলের পাশ দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হত।

২. কিন্তু এতভাবে বোঝানোর পরও ওরা ফিরে এল না।

৩. অর্থাৎ যেসব মূর্তি সম্পর্কে ওরা বলত, 'আমরা তাদের ইবাদত এজন্য করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বানিয়ে দেয় এবং উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদা লাভ করিয়ে দেয়— তারা এই বিপদের সময় এগিয়ে এল না কেন? এখন তাদের ডাক তো!

৪. অর্থাৎ আজ তাদের কোথাও পাত্তা নেই। না আযাবের সময় তাদের ডাকা হয়। তাহলে তারা গেল কোথায় যে, এমন বিপদের সময়েও কাজে আসছে না?

৫. অর্থাৎ স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূর্তি-প্রতিমাকে খোদা বানানো এবং তাদের কাছে বড় বড় আশা করা নিতান্তই মিথ্যা ও অবান্তর কথা। মিথ্যার কোন ভিত্তি নেই; সুতরাং তা চলবে কিভাবে?

যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতগুলিতে মানুষের দম্ভ ও অবাধ্যতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সামনে এর বিপরীতে জিনদের আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার বৃত্তান্ত শোনানো হচ্ছে। এ ঘটনা দ্বারা জানা যায়, যে (জিন) জাতি স্বভাবগতভাবে চরম নাফরমান ও অবাধ্য, তাদেরই কতক আল্লাহর কালাম শুনে মোমের মত বিগলিত হয়ে যায়।

وَاِذۡ صَرَفۡنَاۤ اِلَیۡکَ نَفَرًا مِّنَ الۡجِنِّ یَسۡتَمِعُوۡنَ الۡقُرۡاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوۡهُ قَالُوۡۤا اَنۡصِتُوۡا ۚ فَلَمَّا قُضِیَ وَلَّوۡا اِلٰی قَوۡمِهِمۡ مُّنۡذِرِیۡنَ ﴿۲۹﴾

২৯. (স্মরণ করুন), যখন আমি জিনের একটি দলকে আপনার অভিমুখী করে দিলাম, যারা কুরআন শুনতে লাগল। তারা যখন তার নিকট হাযির হল, পরস্পরকে বলল, 'চুপ থাক'। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে[১]।

---

১. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জিনেরা কিছু কিছু আসমানী খবরাদি জানতে পারত। যখন তাঁর নিকট ওহীর আগমন শুরু হয়, তখন থেকে এই ধারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং জিনদের উপর অতিমাত্রায় উল্কাবৃষ্টি হতে শুরু করে। এতে জিনদের ধারণা হয়, নিশ্চয় নতুন কিছু ঘটে থাকবে, যার কারণে আসমানী খবরাদির ব্যাপারে কঠিন পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এরই সন্ধানে জিনদের বিভিন্ন দল পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে বের হয়ে পড়ে। তাদের একটি দল আরবের 'বতনে নাখলা' নামক স্থানের দিকে আসে। তখন সেখানে ঘটনাক্রমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। আল্লাহ তাআলা জিনদের এই দলকে কুরআন শোনার প্রতি নিবিষ্ট করে দিলেন।

কুরআনের আওয়াজ তাদের নিকট বিস্ময়কর, প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী মনে হয় এবং তার আজমত ও মাহাত্ম্য অন্তরে বিরাট প্রভাব ফেলে। তারা পরস্পর বলে ওঠে– চুপ থাক এবং মনযোগের সাথে এই পবিত্র কালাম শোন। পরিশেষে কুরআনে কারীম তাদের অন্তরকে অভিভূত করে ফেলে। তারা বিলক্ষণ বুঝতে পারে, এ-ই সেই নতুন বিষয়, যার কারণে জিন সম্প্রদায়ের জন্য আসমানী সংবাদ শোনার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যা হোক, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পড়ে ফারেগ হলেন, তখন জিনেরা ঈমান ও বিশ্বাস নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল এবং স্বজাতিকে নসীহত করল।

নবীজি (সা) এ ঘটনা ওহী মারফত জেনেছিলেন

জিনদের বিস্তারিত বিবরণ সূরা জিন-এর মধ্যে আসবে। হাদীস থেকে জানা যায়, এ ঘটনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আগমন ও কুরআন শোনার বিষয় জানতে পারেননি। একটি গাছ আল্লাহর হুকুমে তাঁকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত খবর দেয় এবং পরে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত হাল তাঁকে জানানো হয়। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন– قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ (আপনি বলুন, আমার প্রতি এ ওহী করা হয়েছে যে, জিনের একটি দল মন দিয়ে কুরআন শুনেছে।) [সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৫০]

এরপর জিনেরা বিপুল সংখ্যায় মুসলমান হয় এবং হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ও দীন শেখার জন্য তাদের প্রতিনিধিরা তাঁর নিকট হাযির হয়। বিভিন্ন বর্ণনাদৃষ্টে খাফাজী (রা)

৩০. তারা বলল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে[১], যা তার পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থনকারী[২] এবং যা সত্য ও সরলপথ প্রদর্শন করে[৩]।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৩১. 'হে আমাদের জাতি! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন[৪]। তাহলে তিনি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন[৫] এবং তোমাদের রক্ষা করবেন যাতনাদায়ক আযাব থেকে।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

দাবি করেছেন, ছয়বার জিনেরা হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। বিভিন্ন বর্ণনায় তাদের সংখ্যা বা অন্যান্য ব্যাপারে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। একেকবার একেক সংখ্যা ইত্যাদি ছিল।

১. **বিশেষভাবে مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى -বলার তাৎপর্য**

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে হযরত মূসা (আ)-এর কিতাব (তাওরাত) যে পরিমানে আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধসম্বলিত ছিল, আর কোন কিতাব তেমন ছিল না। এ কিতাবানুসারেই বনী ইসরাঈলের নবীদের আমল চলত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও বলেছেন, আমি তাওরাতকে পরিবর্তন করতে আসিনি; বরং তাকে পূর্ণতা দানের জন্য এসেছি এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর সময় থেকে জিনদের মধ্যেও তাওরাতই বিখ্যাত কিতাব ছিল। এ জন্য এখানে তারা তাওরাতের উল্লেখ করেছে। স্বয়ং তাওরাতের মধ্যেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষদ্বাণী এসেছে, তার শব্দ এই যে– (হে মূসা!) 'আমি তোমার ন্যায় এক নবীর আবির্ভাব ঘটাব।'

২. তখন কুরআনের যে অংশ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করেছিলেন, তাতে সম্ভবত এ ধরনের বিষয় ছিল। অথবা অন্য কোন উপায়ে তারা কুরআনের এ গুণের কথা জেনেছে।

৩. অর্থাৎ কুরআন সত্য আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সরলপথ দেখায়।

৪. অর্থাৎ যিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন তাঁর কথা মান্য কর এবং তাঁর রেসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

৫. অর্থাৎ কাফের অবস্থায় যে গোনাহ করেছে, ইসলামের বরকতে তা সবই মাফ হয়ে যাবে। অতঃপর (হিসাব-কিতাবের) নতুন খাতা শুরু হবে।

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এখানে ذنوب মাফ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দাদের হুকূক (বা পাওনা) মাফ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না।

৩২. 'আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া ওর কোনো সাহায্যকারী হবে না[১]। এমন লোকেরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. ওরা কি ভেবে দেখেনি, যেই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলি সৃষ্টি করে ক্লান্ত হননি[২]— তিনি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, তিনি তো সব বিষয়ে শক্তিমান[৩]।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. যেদিন কাফেরদের আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে (সেদিন বলা হবে), 'এ কি সত্য নয়?' ওরা বলবে, 'আমাদের রবের শপথ, অবশ্যই সত্য[৪]।' তিনি বলবেন, 'অতএব আযাব আস্বাদন কর, কেননা তোমরা অস্বীকার করতে[৫]।'

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۭ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۭ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۭ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

---

১. অর্থাৎ নিজেও পলায়ন করে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না, অন্যকেও বাঁচাতে পারবে না।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) فِي الْأَرْضِ —এর শর্তের কারণে লেখেন, 'উপর থেকে ফেরেশতারা (শয়তানদের) মার দেন, ফলে ওরা পৃথিবীর দিকেই পলায়ন করে।' (তো পলায়নের সুযোগ থাকলে যমীনেই থাকত)।

২. এর দ্বারা ইহুদীদের একটি আকীদা খণ্ডন করা হয়েছে, যারা বলত, ছয়দিনে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেন, এরপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন (আল্লাহর পানাহ!)।

৩. অর্থাৎ চূড়ান্ত আযাব মৃত্যুর পরে হবে । তো, ওরা যেন এই সন্দেহে না থাকে যে, মরে আবার জীবিত হয় কী করে?— বস্তুত আল্লাহর পক্ষে এ কোনো কঠিন বিষয় নয়। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেও ক্লান্ত হননি, তাঁর পক্ষে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা মুশকিল হবে কেন?

৪. অর্থাৎ তখন জিজ্ঞাসা করা হবে, দোযখের অস্তিত্ব এবং তার আযাব কি সত্য নয়? ওরা লাঞ্ছিত হয়ে সকলে স্বীকার করবে, অবশ্যই সত্য, (আমরা তা অস্বীকার করে বড় ভুল করেছি।)

৫. অর্থাৎ তখন বলা হবে, বেশ এখন সেই অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের স্বাদ আস্বাদন করতে থাক।

৩৫. অতএব আপনি অবিচল থাকুন, যেমন অবিচল থেকেছেন দৃঢ় হিম্মতওয়ালা রাসূলগণ এবং ওদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না[১]। যেদিন ওরা সেই জিনিস দেখবে, যার ওয়াদা ওদের সাথে করা হচ্ছে—সেদিন ওদের মনে হবে, ওরা দিনের এক মুহূর্তের বেশী থাকেনি[২]। (সব বিষয়) পৌঁছে দেওয়া হল। এখন কেবল নাফরমান লোকেরাই ধ্বংস হবে[৩]।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَٰغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَٰسِقُونَ ۝

---

১. অর্থাৎ কাফেররা যেহেতু অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে —আখেরাতে তো হবেই, হতে পারে দুনিয়াতেও— সুতরাং ওদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না; বরং এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত 'উলুল আযম' পয়গম্বরদের মত সবর করতে থাকুন।

'উলুল আযম' কারা?

কোনো কোনো পূর্ববর্তী মনীষী বলেছেন, সাধারণ অর্থে সকল রাসূলই 'উলুল আযম'। তবে পাঁচজন পয়গম্বরকে বিশেষভাবে 'উলুল আযম' বলা হয়— হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (তাফসীরে তবারী ২১/১৭৭)

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো মনে হচ্ছে, আযাব আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু আখেরাতে টের পাবে যে, খুব তাড়াতাড়িই এসে গেছে। দুনিয়াতে একটি মুহূর্তই থেকেছে বলে মনে হবে। অথবা কবরে অবস্থানের সময়কাল এক মুহূর্ত বলে মনে হবে। কারণ, চলে যাওয়া সময়কাল স্বল্পই মনে হয়, বিশেষত কঠোরতা ও বিপদের সময়ে (বিগত) আরাম-আয়েশের মেয়াদ খুবই কম মনে হয়।

৩. অর্থাৎ আমি উপদেশবাণী পৌছিয়ে দিয়েছি এবং সকল ভাল-মন্দ বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন যারা মানবে না, তারাই ধ্বংস ও বরবাদ হবে। আমার পক্ষ থেকে হুজ্জত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর আমি কাউকে বিনা দোষে পাকড়াও করি না। তাকেই ধ্বংস করি, যে নিজে ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

تم سورة الأحقاف بفضل الله وحسن توفيقه ، فلله الحمد والمنّة

সূরা মুহাম্মদ

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৪৭। ৩৮ আয়াত। ৪ রুকূ। মাদানী

آياتها ٣٨، ركوعاتها ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

১. যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে[১], আল্লাহ ওদের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

২. আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং ওই কিতাবের উপরও ঈমান এনেছে, যা মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে—আর তা-ই সত্য, তাদের রবের পক্ষ থেকে (আগত)— আল্লাহ তাদের থেকে তাদের মন্দ কর্মগুলো অপসারিত করবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন[৩]।

---

১. যেমন কাফের সরদার-প্রধানদের অভ্যাস ছিল, তারা জান-মাল দ্বারা ও সর্বপ্রকারে এই চেষ্টা করত।

২. অর্থাৎ যেসব আমলকে ওরা নেক মনে করছে, তা ঈমানের অভাবে কবুল হবে না; বরং তার মধ্যে কতক উলটা ক্রোধের কারণ হবে– যথা: ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদানের জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করা।

৩. অর্থাৎ (দুনিয়ায়) মন্দকর্মের অভ্যাস ছাড়িয়ে আল্লাহ তাদের অবস্থা শুধরিয়ে দেন। ফলে দিন দিন তারা সৎকর্মে উন্নতি করতে থাকে। আর আখেরাতে তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করত তাদের ভাল অবস্থায় রাখবেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আগের যুগে সকল মানুষ একই শরী'য়ত পালনে আদিষ্ট ছিল না। কিন্তু বর্তমানে (অর্থাৎ নবীজির সা. আবির্ভাবের পর) সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য একই বিধান, এখন সত্য ধর্ম একটিই। আর ভাল ও মন্দ কাজ মুসলিমগণও করে, কাফেররাও করে। কিন্তু সত্য দীন মানার সুফল এই যে, মুসলিমগণের সৎকর্ম গৃহীত হয়, মন্দকর্ম মার্জনা করা হয়। পক্ষান্তরে দীন না মানার কারণে কাফেরদের শাস্তি এই যে, ওদের পুণ্যকর্ম বরবাদ হয় তবে পাপ সাব্যস্ত হয়।'

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الۡبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الۡحَقَّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ؕ كَذٰلِكَ یَضۡرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمۡثَالَهُمۡ ۝

৩. তার কারণ এই যে, যারা কাফের তারা মিথ্যার অনুসরণ করেছে। আর যারা ঈমানদার, তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে (আগত) সত্যের অনুসরণ করেছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের অবস্থাদি বর্ণনা করেন[১]।

فَاِذَا لَقِیۡتُمُ الَّذِیۡنَ كَفَرُوا فَضَرۡبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَثۡخَنۡتُمُوۡهُمۡ فَشُدُّوا الۡوَثَاقَ ٭ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعۡدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰی تَضَعَ الۡحَرۡبُ اَوۡزَارَهَا ۚ۟ۛ

৪. তোমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখি হও, তখন (ওদের) গর্দানে আঘাত কর। অবশেষে ওদের যখন খুব করে হত্যা করে নেবে, তখন (অবশিষ্টদের) কষে বাঁধবে। অতঃপর হয় অনুগ্রহ করবে, না হয় মুক্তিপন গ্রহণ করবে[২]–, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র-শস্ত্র

---

১. অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরিষ্কার ও বিস্তারিতভাবে তাদের ভাল-মন্দ অবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক করেন, যাতে বাতিলপূজার অকল্যাণ ও খারাবি এবং সত্য অনুসরণের বরকত তারা পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে।

২. হক ও বাতিলের লড়াই তো হতেই থাকে। যখন মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন মুসলমানদের উচিত পূর্ণ মজবুতি ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করা । বাতিলের দর্প তখনি ব্যাহত হবে, যখন বড় বড় পাষণ্ডদের হত্যা করা হবে এবং ওদের দলগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হবে। সুতরাং লড়াইয়ের সময় অলসতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে প্রশ্রয় দেবে না এবং আল্লাহর দুশমনদের হত্যা করতে একটুও পিছপা হবে না।

যুদ্ধে অবতীর্ণ কাফেরদের ব্যাপারে করণীয়

যথেষ্ট রক্ত প্রবাহের পর যখন তোমাদের দাপট প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ওদের শক্তি ভেঙ্গে পড়বে, তখন—

১. ওদের বন্দীও করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে, তাঁর হাতে কায়েদী থাকবে, যতক্ষণ না পৃথিবীর বুকে [খোদাদ্রোহীদের] বিরুদ্ধে খুব করে রক্তপাত করে নেন। –আনফাল : ৬৭)

হতে পারে, বন্দীদশা ওদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ এনে দেবে।

২. অথবা কল্যাণকর মনে হলে মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহপূর্বক ওদের মুক্ত করে দেবে। হতে পারে, অনেকে এই অনুগ্রহ ও উদারতায় তোমাদের প্রতি মুগ্ধ হবে এবং তোমাদের দীনের প্রতি আগ্রহী হতে শুরু করবে।

ذَٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

রেখে দেয়[১]। এ (তো শুনলে)। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই ওদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করতে চান[২]। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তিনি কিছুতেই তাদের আমলাদি বিনষ্ট করবেন না।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۚ

৫. শীঘ্রই তিনি তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছাবেন, তাদের অবস্থা ভাল রাখবেন[৩]—

---

৩. আর এও করতে পার যে, মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে এই বন্দীদের ছেড়ে দেবে। এতে কয়েক ধরনের ফায়দা আছে।

যুদ্ধবন্দীদের বিধান

যা হোক, যুদ্ধবন্দীদের তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে চাইলে দুটি উপায়ই আছে– মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া, অথবা মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া। রাষ্ট্রনায়ক এ দুটির যেটিকে শ্রেয় মনে করবেন, তা অবলম্বন করতে পারেন। হানাফী ইমামগণ থেকেও এরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে। দেখুন– শামী ও ফাতহুল কাদীর ইত্যাদি।

অবশ্য বন্দীদের দেশে পাঠানো যদি কল্যাণকর না হয়, তবে তিন উপায়ের যে কোনোটি অবলম্বন করা যায়– যিম্মি বানিয়ে প্রজা হিসাবে রাখা, অথবা দাস-দাসী হিসাবে ব্যবহার করা অথবা হত্যা করে ফেলা। বিভিন্ন হাদীস থেকে বোঝা যায়, বন্দীদের হত্যা বিশেষ অবস্থাতেই করা হয়েছে। (অর্থাৎ) যখন তারা এমন সাংঘাতিক অপরাধ করেছে, যার শাস্তি হত্যা থেকে কম হতে পারে না, তখন হত্যা করা হয়েছে। অবশ্য দাস-দাসী বা প্রজা বানিয়ে রাখতে কোনো বাধা নেই।

১. অর্থাৎ এই লড়াই-হত্যা ও বন্দীকরণের ধারা অব্যহত থাকবে, যতক্ষণ না লড়াই তার অস্ত্র নামিয়ে রাখে এবং যুদ্ধ থেমে যায়।

২. অর্থাৎ কোন আসমানী আযাব পাঠিয়ে আদ, ছামূদ প্রভৃতির ন্যায় এই কাফেরদের ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর রয়েছে; কিন্তু জিহাদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বান্দাদের পরীক্ষা নিতে চেয়েছেন। তিনি দেখেন, কয়জন মুসলমান আল্লাহর জন্য জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত? এবং কাফেরদের মধ্য থেকে কারা এ সকল সতর্কতামূল ব্যবস্থা দ্বারা জাগ্রত হয়? এবং আল্লাহ যে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ন্যায় একেবারে ধ্বংস না করে তাদের অবকাশ দিয়েছেন, এর দ্বারা তারা উপকৃত হয় কি না?

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, দুনিয়াতে বাহ্যত তাদের সফল মনে না হলেও আসলে তারা সফল। আল্লাহ তাআলা তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না; বরং পরিণামে তাদের

وَيُدۡخِلُهُمُ الۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ۞

৬. এবং তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যা তিনি তাদের চিনিয়ে দিয়েছেন[১]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ اَقۡدَامَكُمۡ ۞

৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে[২] তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম দৃঢ় করে দেবেন[৩]।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَاَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ۞

৮. আর যারা কাফের হয়েছে, ওরা ধ্বংস হোক এবং তিনি ওদের আমলগুলি বিনষ্ট করে দেবেন[৪]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَرِهُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاَحۡبَطَ اَعۡمَالَهُمۡ ۞

৯. তার কারণ এই যে, ওরা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি ওদের আমলগুলি নিষ্ফল করে দিয়েছেন[৫]।

মেহনত ফলপ্রসূ করবেন। তাদের তিনি জান্নাতের দিকে পথ দেখাবেন এবং পরকালের সমস্ত ঘাঁটি ও স্থানে তাদের ভাল রাখবেন।

১. অর্থাৎ তারা ওই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার অবস্থা তারা নবীদের মুখে এবং নিজেদের সঠিক বোধশক্তির দ্বারা জানতে পেরেছিল। এবং জান্নাতে পৌঁছে প্রত্যেক জান্নাতী নিজেই নিজ আবাসস্থল চিনে নেবে। যেখানে তার থাকার স্থান, সেদিকেই তার দিল আকৃষ্ট হবে।

বি. দ্র. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) عَرَّفَهَا لَهُمۡ এর অর্থ করেছেন– طَيَّبَهَا لَهُمۡ, অর্থাৎ জান্নাতকে তাদের জন্য সুঘ্রাণে মোহিত করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ তাঁর দীন ও পয়গম্বরের সাহায্য করলে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর তাওফীকে জিহাদে তোমাদের পদস্খলন হবে না এবং আল্লাহর আনুগত্যে অবিচল থাকবে। ফলে পুলসিরাতেও তোমাদের পদস্খলন হবে না। (মোটকথা, দুনিয়া-আখেরাতে তোমরা দৃঢ়পদ থাকবে।)

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে স্বয়ং তিনিই কাফেরদের মুসলমান বানিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু তাঁর এ ইচ্ছা নেই, বরং পরীক্ষা করার ইচ্ছা। অতএব বান্দার পক্ষ থেকে দীনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, তবেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সফলতা দান করা হবে।'

৪. অর্থাৎ মুমিনদের তো দৃঢ়পদ করে দেওয়া হয়, এর বিপরীতে কাফেরদের কদম উপড়ে ফেলা হয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের সাহায্য করা হয়, অপরদিকে কাফেরদের আমলাদি বরবাদ করে দেওয়া হয়।

৫. অর্থাৎ ওরা যখন আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয়কে অপছন্দ করেছে, তখন আল্লাহ ওদের কাজকর্মকে কেন পছন্দ করবেন? আর জানা কথা, যে জিনিস আল্লাহর নিকট পছন্দ নয়, তা শুধুই নিষ্ফল।

১০. ওরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তা হলে দেখতে পেত, ওদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ ওদের সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছেন। আর এই কাফেরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে[১]।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ۝١٠

১১. তা এজন্য যে, আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু আর কাফেরদের কোন বন্ধু নেই[২]।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١

[রুকূ - ২]

১২. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের এমন জান্নাতরাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর যারা কাফের, তারা ভোগ করছে ও খাচ্ছে, যেমন গবাদি পশুরা খায়। আর আগুন ওদের ঠিকানা[৩]।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝١٢

---

১. অর্থাৎ দেখে নাও, দুনিয়াতেই পূর্ববর্তী কাফেরদের কিরূপ পরিণাম হয়েছে এবং কীভাবে ওদের সকল পরিকল্পনা নিষ্ফল করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কাফেরদের কি তদ্রূপ শাস্তি হতে পারে না?

২. অর্থাৎ আল্লাহ পুণ্যবান মুমিনদের বন্ধু, যিনি বিপদকালে তাদের সাহায্য করেন। কাফেরদের এমন বন্ধু কে আছে, যে আল্লাহর মোকাবেলায় ওদের উপকার করতে পারে? উহুদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলেছিল- لنا العزى ولا عزى لكم (আমাদের আছে উয্যা দেবতা, তোমাদের উয্যা নেই।) উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের বলেছিলেন, তোমরা ঘোষণা কর- الله مولانا ولامولى لكم (আল্লাহ আমাদের বন্ধু, তোমাদের কোন বন্ধু নেই।) [বুখারী, ৪০৪৩]

৩. অর্থাৎ ওরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে রত এবং লালসার কারণে চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত অন্ধভাবে খেয়ে চলেছে! কাল এ খাবার-দাবারের, সুখ-সম্ভোগের কী পরিণাম প্রকাশ পাবে— তার কোন চিন্তা নেই। ঠিক আছে, কয়েক দিন আনন্দোল্লাস করে নিক। অতঃপর ওদের জন্য তৈরি রয়েছে আগুনের ঘর ।

১৩. কত জনপদ আছে, যেগুলি অধিক শক্তিশালী ছিল আপনার এই জনপদ থেকে, যা (-র অধিবাসীরা) আপনাকে বের করে দিয়েছে। আমি ওদের (অর্থাৎ সেই জনপদগুলির অধিবাসরীদের) ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন ওদের কোন সাহায্যকারী ছিল না[১]।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝

১৪. আচ্ছা, যে আপন রবের সুস্পষ্ট পথের উপর আছে, সে কি এমন লোকদের সমান হতে পারে, যাদের দৃষ্টিতে স্বীয় মন্দকর্ম শোভন করে তোলা হয়েছে এবং যারা স্বীয় কামনা-বাসনার অনুসরণ করে[২]?

أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ۝

১৫. জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি পরহেয্গারদের দেওয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে— তাতে আছে দুর্গন্ধমুক্ত পানির নহররাজি[৩];

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۖ فِيْهَآ أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ

---

১. অর্থাৎ মক্কাবাসীদের চেয়ে বেশি দুর্বার ও শক্তিশালী যেসব জাতি ছিল, ওদের আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং কেউই ওদের সাহায্য করতে পারেনি। অতএব এরা কোন্ ভরসায় উল্লাস করছে?

বি. দ্র. قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ দ্বারা মক্কা শরীফ উদ্দেশ্য। সেখানকার লোকেরা নবীজির বিরুদ্ধে এমন কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হল যে, তাঁকে প্রিয় জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। হাদীছে আছে, বিদায় নেওয়ার সময় তিনি মক্কা শরীফকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– আল্লাহর কসম, সমস্ত নগরীর মধ্যে তুমি আল্লাহর নিকট ও আমার নিকট প্রিয়তম নগরী। আমার জাতি যদি আমাকে বের করে না দিত, তবে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪২৬৭; তাফসীরে তবারী : ২১/১৯৮)

২. অর্থাৎ এক ব্যক্তি পূর্ণ আস্থা এবং সঠিক বুঝ ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে সত্যের উজ্জ্বল ও প্রশস্ত পথে নির্দ্বিধায় চলছে; আর অপর ব্যক্তি অন্ধকারে পড়ে হোঁচট খাচ্ছে, সে সাদা ও কালো এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছে না, এমন কি স্বীয় নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কারণে মন্দকে ভাল জ্ঞান করছে এবং কামনা-বাসনার পিছনে পড়ে আছে— এ দুজনের মর্যাদা ও পরিণাম কি সমান হতে পারে? কস্মিনকালেও না। কেননা, এ আল্লাহ তাআলার হেকমত ও ইনসাফের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

৩. অর্থাৎ দীর্ঘকাল পড়ে থাকার কারণে অথবা কোনো কিছুর মিশ্রণে তার ঘ্রাণ পরিবর্তিত হয়নি। মধুর চেয়ে সুস্বাদু ও দুধের চেয়ে সাদা সেই পানিতে কোনো রকম পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি।

এমন দুধের নহরমালা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি[১]; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহরসমূহ[২] ও পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ[৩]। এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে সব রকমের ফলমূল[৪] ও তাদের রবের ক্ষমা[৫]। (এরূপ জান্নাতে অনন্তকাল বসবাসের সৌভাগ্য লাভকারীরা কি) তাদের সমান, যারা চিরকাল আগুনে থাকবে এবং যাদের পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। ফলে তা ওদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে[৬]?

وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ۝

১৬. ওদের মধ্যে কতক এমন, যারা আপনার দিকে কান পাতে (আপনার কথা শোনে)। অতঃপর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যায়, তখন যাদের ইলম দেওয়া হয়েছে

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتّٰىٓ إِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۟

১. অর্থাৎ দুনিয়ার দুধের সাথে তুলনা করো না। এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাদে কোনো পার্থক্য আসেনি।

২. অর্থাৎ জান্নাতের শরাবের মধ্যে আছে খাঁটি স্বাদ ও মজা। তাতে না আছে নেশা, না দুর্বলতার উপাদান, না তিক্ততা, না মাথা ঘুরানি, না অন্য কোনো দোষ-ত্রুটি।

৩. অর্থাৎ স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন মধু, যাতে ময়লা তো দূরের কথা, ফেনা পর্যন্ত নেই।

জান্নাতের নহরমালাতে আছে সকল বৈশিষ্ট্যের সমাহার

এখানে চার প্রকার নহরের কথা রয়েছে। তার মধ্যে পানি এমন জিনিস, যার দ্বারা মানুষের জীবন রক্ষা পায়। আর দুধ পুষ্টিকর খাদ্যের কাজ দেয়। শরাব আনন্দ-স্ফূর্তির বস্তু, আর মধুকে شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ (মানুষের জন্য মহৌষধ) বলা হয়েছে।

৪. এতে পানীয় দ্রব্যাদির পর খাদ্য দ্রব্যাদির উল্লেখ করা হল।

৫. অর্থাৎ সকল গোনাহ-খাতা মাফ করত জান্নাতে দাখিল করবেন। সেখানে পৌছার পর তাদের গোনাহ-খাতার উল্লেখও হবে না, যা তাদের মনোকষ্টের কারণ। এমন কি ভবিষ্যতে কোনো কথায় ধর-পাকড়ও হবে না।

৬. অর্থাৎ ফুটন্ত পানি যখন দোযখীদের পান করানো হবে, নাড়িভুঁড়ি গলে বের হয়ে পড়বে। (আল্লাহ এ থেকে আমাদের পানাহ দিন)।

তাদের বলে, 'ইনি এইমাত্র কী বললেন[১]?' এরাই তারা, যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে[২]।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۝١٦

১৭. আর যারা সৎপথ অবলম্বন করেছে, তিনি তাদের হেদায়াত আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের দান করেছেন পরহেজগারী[৩]।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۝١٧

১৮. ওরা শুধু কিয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, ওদের উপর তা আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক। তো, তার লক্ষণসমূহ এসে গেছে। তবে তা যখন ওদের উপর এসে পড়বে, তখন ওরা উপদেশ গ্রহণের সুযোগ পাবে কোথায়[৪]?'

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝١٨

---

১. পূর্বা-পর সম্পর্ক

ইতিপূর্বে মুমিন ও কাফেরদের অবস্থার আলোচনা ছিল। কাফেরদের মধ্যে এক শ্রেণী আছে, যাদের মুনাফিক বলা হয়। অর্থাৎ যারা প্রকাশ্যে ইসলামের দাবি করে, কিন্তু অন্তরে ইসলাম-বিরোধী। আলোচ্য আয়াতে এই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াতের মর্ম এই যে— এ লোকেরা বাহ্যত পয়গম্বরের কথা শোনার জন্য কান পাতে; কিন্তু তাঁর কথার প্রতি এদের না আছে আন্তরিক মনোযোগ, না আছে বোঝার ও স্মরণ রাখার চেষ্টা। তাই তো মজলিস থেকে যখন এরা উঠে যায়, তখন জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যক্তি (অর্থাৎ পয়গম্বর আলাইহিস সালাম) এক্ষণ কী বয়ান করলেন? মনে হয়, এই জিজ্ঞাসা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইঙ্গিতে এ কথা বলা যে, আমরা তার কথাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না এবং তা মনোযোগ দিয়ে শুনিও না।

২. অর্থাৎ এমন অসভ্য আচরণের ফল এই হয় যে, আল্লাহ তাআলা ওদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। এরপর আর পুণ্যকাজের তাওফীক হয় না। শুধু প্রবৃত্তিরই অনুসরণ চলতে থাকে।

৩. অর্থাৎ সত্য পথে চলার ফল এই যে, মানুষ উত্তরোত্তর হেদায়াতের মধ্যে উন্নতি করতে থাকে এবং তার দীনী সমঝ-বুঝ ও পরহেজগারী বাড়তে থাকে।

৪. অর্থাৎ কুরআনের নসীহত, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শিক্ষামূলক ঘটনাবলি এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও দোযখের সতর্কবাণী— সবই শুনেছে। এখন মানার জন্য আর কীসের অপেক্ষা? তবে কি ওরা কিয়ামত-মুহূর্তের অতর্কিত আগমনের অপেক্ষা করছে? যদি তাই হয়, তবে কিয়ামতের কতক লক্ষণ তো এসে গেছে। আর যখন কিয়ামত সত্য সত্যই এসে উপস্থিত হবে, তখন ওরা বোঝার এবং মানার সুযোগ পাবে কোথায়? অর্থাৎ তখনকার বোধোদয় ও মানা দ্বারা কোনোই ফায়দা হবে না। তাতে নাজাত লাভ হবে না।

১৯. অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজ গোনাহর জন্য এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের জন্য[১]। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের নিবাস সম্পর্কে জানেন[২]।

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿۱۹﴾

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আমাদের প্রিয় নবীর আবির্ভাবই কিয়ামতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন। সকল নবী সর্বশেষ নবীর অপেক্ষায় থাকতেন। তিনি যখন এসে পড়েছেন, (বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে)। এখন শুধু কিয়ামতই বাকী।'

হাদীসে (মুসলিম, ৮৬৭) আছেঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন- أنا والساعة كهاتين (আমি ও কিয়ামত এই দুটির ন্যায়।) অর্থাৎ আমি কিয়ামতের এতটুকু পূর্বে এসেছি, যতটুকু মধ্যমা অঙ্গুলি শাহাদাত অঙ্গুলি থেকে দীর্ঘ আছে। মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি, এখানে তার অবকাশ নেই।

১. প্রত্যেকের গোনাহ তার মর্যাদা অনুপাতে হয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে সর্বোত্তম দিকটির পরিবর্তে তুলনামূলক অনুত্তম দিকটি অবলম্বন করা, যদিও তা জায়েয ও বৈধতার মধ্যেই পড়ে— কোন কোন সময় নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে গোনাহ বলে বিবেচিত হয়। এ অর্থেই حسنات الأبرار سيئات المقربين বলা হয় (অর্থাৎ সাধারণ পুণ্যবানদের জন্য যা ছওয়াবের কাজ, তার কতক নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য কখনো ত্রুটি বিবেচিত হয়।)

হাদীছে (মুসলিম : ২৭০২) আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈনিক একশত বার এস্তেগফার পড়তেন।

আয়াতের সম্বোধন কার প্রতি?

বি. দ্র. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এই সম্বোধন প্রত্যেক শ্রোতার প্রতিই। আর যদি সম্বোধন একমাত্র নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হয়ে থাকে, তবে فاعلم -এর অর্থ এই যে, এই ইলমের উপর আপনি সর্বদা অবিচল থাকুন এবং এস্তেগফার করতে থাকুন।

পূর্বের সাথে সামঞ্জস্য

আর পূর্বের সাথে فاعلم এর সম্পর্ক এভাবে যে, (ইতিপূর্বে কিয়ামতের উল্লেখ হয়েছে।) আর কিয়ামত এসে পড়ার পর ঈমান, তওবা প্রভৃতি গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব তার আগমনের পূর্বেই সঠিক মারেফত হাসিল করা এবং ঈমান ও এস্তেগফারের উপর অবিচল থাকা মানুষের জন্য জরুরী।

২. অর্থাৎ তোমরা যত আড়ালেই ঘোরাফেরা কর না কেন, শেষ পর্যন্ত তোমরা বেহেশত বা দোযখে পৌছবেই, আর তাই তোমাদের আসল নিবাস।

[রুকূ - ৩]

২০. ঈমানদাররা বলে, 'কোন সূরা নাযিল করা হল না কেন[১]?' অতঃপর যখন একটি পরিপক্ক সূরা অবতীর্ণ করা হল[২] এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ করা হল, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে আপনি তাদের দেখলেন, তারা আপনার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেভাবে তাকায় মৃত্যুভয়ে মূর্ছাগত ব্যক্তি। অতএব ধ্বংস ওদের জন্য[৩]।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۟

২১. (তাদের থেকে প্রকাশ পায়) আনুগত্য ও ন্যায়সংগত কথা। অতঃপর যখন (জিহাদের) বিষয় চূড়ান্ত হয়, তখন তারা আল্লাহর নিকট সত্যবাদী প্রমাণিত হলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে[৪]।

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۫ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۫ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۟

---

১. অর্থাৎ এমন সূরা, যার মধ্যে জেহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. অর্থাৎ এমন সূরা, যা পরিপক্ক আহকামসম্বলিত। যা রহিত হওয়ার নয় এবং যা সময়মত অবতীর্ণ হয়।

৩. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মুসলমানরা একটি সূরা (নাযিলের) কামনা করত। অর্থাৎ কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কামনা করত, আল্লাহ তাআলা জেহাদের নির্দেশ দান করুন। তখন আমাদের দ্বারা যতদূর সম্ভব তাই করব। কিন্তু যখন জেহাদের নির্দেশ এল, মুনাফিক ও দুর্বলচিত্ত মুসলমানদের কাছে তা খুবই কঠিন মনে হল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত ও ম্লান চোখে পয়গম্বরের দিকে তাকাতে লাগল যে, হায়! আমাদের যদি এই নির্দেশের বাহিরে রাখতেন। আর ভীষণ ভয়ের মধ্যে চোখের আলো হ্রাস পায়, যেমন মৃত্যুর সময় চোখ নিষ্প্রভ হয়ে যায়'।

৪. অর্থাৎ বাহ্যত তারা আনুগত্য প্রকাশ করে এবং মুখে ইসলাম ও ইসলামের বিধান স্বীকার করে। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়। আসল কথা এই যে, কার্যত আল্লাহ তাআলা ও আল্লাহর রাসূলের হুকুম মানতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে সুন্দর ও যুক্তিসংগত কথা বলতে হবে। এরপর যখন জেহাদ প্রভৃতি দীনী কাজের জরুরত দেখা দেয়, তখন আল্লাহর সামনে সত্য প্রমাণিত হতে হবে। এটাই হবে তাদের জন্য কল্যাণকর।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝

২২. যদি তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ কর, তবে তোমাদের থেকে কি এই আশঙ্কা আছে যে*, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে[১]?

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'শরী'য়তের হুকুম না মানলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। আল্লাহর হুকুম পরিপূর্ণরূপে মানা উচিত। আর রাসূলও জানেন, কাপুরুষদের দ্বারা লড়াই করিয়ে কতটুকু আর ফায়দা? অবশ্য যখন অতি প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন (সকলেরই) লড়াই করা জরুরী হয়ে পড়ে। নতুবা কাপুরুষরা ছাড়াই অনেক লড়াইকারী রয়েছে।'

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'যদি তোমরা (আল্লাহর আনুগত্য থেকে)মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাদের থেকে এই প্রত্যাশাই করা যেতে পারে যে, তোমরা...'

১. অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহে মানুষ সাধারণত ভারসাম্য ও ইনসাফের উপর কায়েম থাকে না। তার কারণে দুনিয়ার লোভ আরো বেড়ে যায়। এরপর পদ ও সম্পদের স্বার্থে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। যার শেষ ফল হিসাবে সাধারণত দেখা দেয় ফেতনা-ফাসাদ ও পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ (জুলুম-নির্যাতনে) অতিষ্ঠ হয়ে জেহাদের কামনা করছ। যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিজয় দান করেন, তবে ফাসাদ করো না।'

বি. দ্র. বিজ্ঞ মুতারজিম تَوَلَّيْتُمْ শব্দটির অনুবাদ (حکومت مل جانا) 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ' করেছেন, বহু তাফসীরকারের মতামত এমনই। তবে কোন কোন তাফসীরকার تولى এর অর্থ করেছেন- মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আয়াতের মর্ম হল, যদি তোমরা আল্লাহর পথে জেহাদ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে দুনিয়াতে শান্তি-সুবিচার কায়েম হতে পারে না। আর যখন দুনিয়াতে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকবে না, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, বিপর্যয়, অশান্তি ও বেইনসাফীর রাজত্ব চলবে।

আর কেউ কেউ এই তাফসীর করেছেন যে, যদি তোমরা ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জাহেলি যুগের অবস্থা ফিরে আসবে। যেসব অনিষ্ট ও ফাসাদ সেই যুগে ছিল এবং সামান্য সামান্য কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হত, সেই সব চিত্র পুনরায় কায়েম হয়ে যাবে।

আর যদি বলা হয়, আয়াতে শুধু মুনাফিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, তবে এ অর্থও হতে পারে যে, তোমরা (হে মুনাফিকরা) যদি জেহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাদের থেকে তো এ প্রত্যাশ্যাই করা যায় যে, নিজেদের মুনাফিকী ও দুষ্কৃতির কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং যে সকল মুসলমানের সঙ্গে তোমাদের আত্মীয়তা রয়েছে, তাদের কথা মোটেই চিন্তা না করে প্রকাশ্যে কাফেরদের সাহায্যকারী হবে।

২৩. ওরাই এমন লোক, যাদের উপর আল্লাহ লা'নত করেছেন, অনন্তর ওদের বধির বানিয়ে দিয়েছেন এবং ওদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন[১]।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ۝

২৪. ওরা কি কুরআনে গভীরভাবে চিন্তা করে না, নাকি (ওদের) অন্তরের উপর তালা লেগে আছে[২]?

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۝

২৫. যারা পিছন ফিরে চলে গেছে তাদের সামনে সরলপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও, নিশ্চয় শয়তান ওদের কুমন্ত্রনা দিয়েছে এবং ওদেরকে দূর-দূরান্তের আশা দিয়েছে[৩]।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ؕ وَاَمْلٰى لَهُمْ ۝

২৬. তা এজন্য যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব অপছন্দ করে, তাদেরকে ওরা বলেছে, 'আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের কথা মানব।' আর আল্লাহ ওদের গোপন কথা-বার্তা জানেন[৪]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ۝

---

১. অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অহংকারে অন্ধ-বধির হয়ে জুলুম করতে শুরু করল। এরপর কারো নসীহতে কর্ণপাত করল না। আল্লাহর অভিশম্পাৎ ওদের অন্তরকে কঠিন করে দিল। আর এ সবকিছু ওদেরই অযোগ্যতা ও ভালর পরিবর্তে মন্দকে অবলম্বন করার কারণে হয়েছে।

২. অর্থাৎ মুনাফিকরা কি কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি ওদেরই দুষ্কৃতির কারণে ওদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে গেছে? ফলে ওদের জন্য কুরআনী নসীহতসমূহের বরকতময় ময়দানে ঢোকার পথই রয়নি। ওদের যদি কুরআন বোঝার তাওফীক হত, তবে অনায়াসে অনুভব করত যে, জেহাদের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কী পরিমাণ ফায়দা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ মুনাফিকরা ইসলামকে স্বীকার করা এবং ইসলামের সত্যতা (ওদের সামনে) স্পষ্ট হওয়ার পরও সময় এলে নিজেদের এই স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যায় এবং জেহাদে শরীক হয় না। আসলে শয়তান ওদের এ কথা বুঝিয়েছে যে, যুদ্ধে না গেলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকবে, অযথা জেহাদে গিয়ে মরলে কী লাভ? এ রকম আরো কত কথা বুঝিয়ে থাকবে এবং দীর্ঘ আশার বাণী শুনিয়ে থাকবে! ইরশাদ হয়েছে— وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

৪. মুনাফিকরা ইহুদী ও অন্য কাফেরদের বলেছে, আমরা যদিও বাহ্যত মুসলমান হয়ে গেছি, কিন্তু আমরা মুসলমানদের সঙ্গী হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ব না; বরং সুযোগ হলে তোমাদের সাহায্য করব এবং এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে তোমাদের কথাই মানব।

২৭. অতএব তখন (ওদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন ফেরেশতারা ওদের জান কবজ করবে ওদের মুখে ও পিঠে আঘাত করতে করতে[১]?

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝

২৮. তার কারণ এই যে, ওরা সেই পথের অনুসারী হয়েছে, যা আল্লাহকে নারাজ করে এবং ওরা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করেছে। ফলে তিনি ওদের আমলাদি নিষ্ফল করে দিয়েছেন[২]।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَآ أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُۥ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ۝

[রুকূ - ৪]

২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে ওরা কি ধারণা করে যে, আল্লাহ ওদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না[৩]?

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ ۝

৩০. আমি চাইলে আপনাকে ওদের দেখিয়ে দিতে পারি। আর নিশ্চয় আপনি ওদের চিনে থাকবেন ওদের চেহারা-লক্ষণ দ্বারা। এবং (ভবিষ্যতে) কথার ভঙ্গি দ্বারাও ওদের চিনতে পারবেন[☆৪]।

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ

---

১. অর্থাৎ তখন মৃত্যু থেকে কী করে রেহাই পাবে? নিঃসন্দেহে তখন মুনাফিকীর স্বাদ ভোগ করবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ পছন্দ করল না; বরং সেই পথের অনুসরণ করল, যার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট। এ জন্যই মৃত্যুর সময় এমন কঠিন দুর্দশার সম্মুখীন হল। আর আল্লাহ তাআলা ওদের কুফর ও অবাধ্যতার ফলে ওদের সকল আমল বরবাদ করে দিলেন। কোনো আমলই ওদেরকে পরকালে উপকার পৌঁছাল না।

৩. অর্থাৎ মুনাফিকরা নিজেদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি যে শত্রুতা-বিদ্বেষ পোষণ করে, ওদের কি এ ধারণা যে, তা অন্তরের মধ্যেই গোপন থেকে যাবে? আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দেবেন না? এবং মুসলমানরা ওদের ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হবে না? মোটেই না। ওদের ভিতরের নোংরামি অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং এমন এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে, যখন খাঁটি ও ভেজাল (মুমিন ও মুনাফিক) সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যাবে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আমি চাইলে আপনাকে ওদের দেখিয়ে দেব, ফলে আপনি অবশ্যই ওদের চিনে ফেলবেন ওদের লক্ষণ দ্বারা। আর (এখনও) আপনি ওদের চিনতে পারেন কথার ভঙ্গি দ্বারা।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সকল মুনাফিককে চিহ্নিত করে আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারেন এবং নাম নিয়ে নিয়ে অবগত করতে পারেন যে, মজলিসে অমুক অমুক ব্যক্তি

আর আল্লাহ তোমাদের আমলাদি সম্পর্কে জানেন[১]।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۝

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে আমি (প্রকাশ্যভাবেও) জেনে নেই যে, তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদকারী ও ধৈর্যশীল[২] এবং যাতে তোমাদের অবস্থাদি যাচাই করে নেই[৩]।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا۟ اَخْبَارَكُمْ ۝

মুনাফিক। কিন্তু এই মুহূর্তে এরূপ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হেকমতের অনুকূল নয়। তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উচ্চ পর্যায়ের অন্তদৃষ্টি দান করেছেন, তার আলোকে আপনি ওদের চেহারা দেখে ওদের চিনে নিতে সক্ষম এবং ভবিষ্যতে ওদের কথাবার্তার ধরনে আরো বেশি ওদের চিনতে পারবেন। কেননা, মুনাফিক ও মুখলেছ মানুষের কথার ঢংই ভিন্ন হয়ে থাকে। মুখলেছ ব্যক্তির কথাবার্তায় যে শক্তি-শওকত, পরিপক্বতা ও অকপটতার রং ফুটে ওঠে, মুনাফিক যতই চেষ্টা করুক ওর কথায় তা পয়দা হতে পারে না।

বি. দ্র. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) فَلَعَرَفْتَهُمْ কে لَوْ نَشَاءُ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেননি। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার একে لَوْ نَشَاءُ এর সঙ্গে যুক্ত করে لَاَرَيْنٰكَهُمْ এর ফলস্বরূপ ধরেছেন। তাদের মতে অর্থ এই যে, যদি আমি ইচ্ছা করি তবে আপনাকে ওদের দেখিয়ে দেব, ফলে আপনি ওদের চেহারা দেখে ওদের চিনে নেবেন। —অধমের মতে মুতারজিম (র) এর তাফসীরই অধিক সূক্ষ্ম। আল্লাহই ভাল জানেন।

কোনো কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু মুনাফিককে নাম নিয়ে নিয়ে ডাকেন এবং মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৩৪৮)

সম্ভবত 'কথার ধরন' ও 'চেহারা' প্রভৃতির দ্বারা তিনি ওদের চিনতে পারেন, অথবা আলোচ্য আয়াত নাযিলের পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোনো কোনো মুনাফেকের নাম নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টরূপে বলে দিয়ে থাকবেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. অর্থাৎ মানুষের নিকট কোন বিষয় গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে তোমাদের সকল কাজই প্রকাশ্য– তা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর।

২. অর্থাৎ জেহাদ প্রভৃতির যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা দ্বারা পরীক্ষা উদ্দেশ্য। এই কঠিন পরীক্ষাতেই প্রকাশ পায়– কারা আল্লাহ তাআলার পথে লড়াইকারী এবং কঠিন পরীক্ষায় অবিচল, আর কারা এমন নয়।

৩. অর্থাৎ যাতে প্রত্যেকের ঈমান ও আনুগত্যের পরিমাণ জানা যায় এবং সকলের অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি কার্যত পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩২. যারা কাফের হয়েছে, আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে এবং রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে তাদের সামনে সরলপথ প্রকাশিত হওয়ার পরও, ওরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি অবশ্যই ওদের কর্মকাণ্ড নিষ্ফল করে দেবেন[১]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ۝

৩৩. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর ও রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং নিজেদের আমলাদি বিনষ্ট করো না[২]।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

৩৪. যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে (লোকদের) বাধা দিয়েছে, অতঃপর কাফের অবস্থায়ই মরে গেছে, আল্লাহ কখনো ওদের ক্ষমা করবেন না[৩]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝

৩৫. অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না যে, (কাফেরদের) সন্ধির দিকে আহবান

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ

বি. দ্র. حَتّٰى نَعْلَمَ الخ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইলম অনিত্য ও আহরিত হওয়ার যে সন্দেহ হয়, তার বিস্তারিত উত্তর সুরা বাকারার ১৪৩নং আয়াতের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ ওরা নিজেদেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ তাআলার কী ক্ষতি? ওরা তাঁর দীনের ও পয়গম্বরেরও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান। তিনি ওদের সকল অভিসন্ধি পন্ড, সমস্ত কাজ ব্যর্থ এবং সকল চেষ্টা মাটি করে দেবেন।

২. অর্থাৎ জেহাদ এবং আল্লাহ তাআলার পথে অন্য যে কোনো মেহনত ও সাধনা তখনই মকবুল হয়, যখন তা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম অনুযায়ী হয়। অতএব কেবল নিজ স্বভাবের বশে অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় কাজ করো না। নতুবা আমল ব্যর্থ-বিনষ্ট হবে। অথচ যে নেক কাজ করা হয়েছে বা করা হচ্ছে, তা কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া মুসলমানের কাজ নয়।

মোটকথা, নেককাজ মাঝপথে ছেড়ে দিয়ো না, অথবা রিয়া তথা লোক দেখানোর মাধ্যমে এবং অহংকার ও আত্মগরিমা করে তা বরবাদ করো না। আর ধর্ম ত্যাগের তো প্রশ্নই আসে না। তা তো মুহূর্তে সমস্ত আমল নিষ্ফল, বিনষ্ট করে দেয়।

৩. আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কাফেরের ক্ষমা নেই, বিশেষত সেই কাফেরদের, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকে।

وَاَنۡتُمُ الۡاَعۡلَوۡنَ ۖۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمۡ وَلَنۡ يَّتِرَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ ۝٣٥

করবে*[১]। তোমরাই প্রবল থাকবে। আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের কাজকর্ম বরবাদ করবেন না[২]।

اِنَّمَا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا لَعِبٌ وَّلَهۡوٌ ؕ وَاِنۡ تُؤۡمِنُوۡا وَتَتَّقُوۡا يُؤۡتِكُمۡ اُجُوۡرَكُمۡ وَلَا يَسۡـَٔلۡكُمۡ اَمۡوَالَكُمۡ ۝٣٦

৩৬. দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা মাত্র। আর তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দান করবেন এবং তোমাদের নিকট তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না[৩]।

★ দ্বিতীয় তরজমা–'..হীনবল হয়ো না এবং (কাফেরদের) সন্ধির দিকে আহবান করো না'।

১. কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দুর্বল ও ভীরু হতে নেই এবং যুদ্ধের কষ্টে ঘাবড়িয়ে সন্ধির দিকে অগ্রসর হতে নেই। এতে শত্রুদের সাহস বেড়ে যাবে এবং ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে মুসলমানদের পরাভূত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। অবশ্য কোনো সময় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ বিবেচনায় সন্ধি উপকারী মনে হলে তখন সন্ধি করতে ক্ষতি নেই, যেমন: সামনে সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে আসবে। যা হোক, সন্ধির কারণ নিজেদের ভীরুতা ও কাপুরুষতা হওয়া উচিত নয়।

২. অর্থাৎ ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। তোমরা যদি ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর আহকামের উপর অবিচল থাক, তবে আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি পরিশেষে তোমাদেরই বিজয়ী করবেন এবং কোনো অবস্থাতেই তোমাদের ক্ষতিতে থাকতে দেবেন না।

৩. অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একটা খেল-তামাশার মত। তোমরা যদি ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন কর এবং এই খেল-তামাশা থেকে একটু বেঁচে চল, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এর পূর্ণ বিনিময় দেবেন। আর তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদও চাইবেন না। তাঁর সম্পদের কী প্রয়োজন, তিনি তো নিজেই দাতা, যেমন তিনি বলেন– مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ، إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (আমি তাদের নিকট কোন জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহ তো রিযিকদাতা, শক্তিশালী, পরাক্রান্ত। –যারিয়াত, আয়াত ৫৭-৫৮)

আর চাইলেই বা কী? তিনিই তো সম্পদের প্রকৃত মালিক, সমস্ত ধন-সম্পদ তো তাঁরই। কিন্তু এ সত্ত্বেও দীনের পথে যখন তিনি ব্যয় করতে বলেন, তখন সমস্ত মাল চান না, বরং অতি অল্প অংশই চাওয়া হয়। তাও তাঁর নিজের জন্য নয়, বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য।

إِنْ يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۝

৩৭. যদি তিনি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চান, এবং তোমাদের পীড়াপীড়ি করেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দেবেন*[১]।

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ

৩৮. শোন! তোমরাই তো এমন লোক যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য তোমাদের ডাকা হচ্ছে[২]। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কতক কার্পণ্য করে। আর যে কার্পণ্য করে, সে নিজেকেই দেওয়া থেকে বিরত থাকে[৩]। আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী এবং তোমরাই মুখাপেক্ষী[৪]।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা জয় করিয়ে দেন। অল্প কিছুদিনই তাদের টাকা-পয়সা ব্যয় করতে হয়েছিল। এরপর যে পরিমাণ ব্যয় করেছিল, তদপেক্ষা শত গুণে তা ফিরে আসে। এ অর্থেই (কুরআনে কারীমের) কয়েক স্থানে আল্লাহকে করয দিতে বলা হয়েছে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'তা (কার্পণ্য) তোমাদের মনের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে দেবে।'

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যদি জোর তাগিদের সাথে ওই সব সম্পদ তলব করতে থাকেন, যা তিনিই তোমাদের দিয়ে রেখেছেন— তবে কয়জন 'মরদে খোদা' এমন আছে, যারা উদার মনে ও প্রফুল্ল মুখে 'লাব্বাইক' (হাযির আছি তোমার ডাকে) বলবে? অধিকাংশই তো কৃপণ ও সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেবে এবং সম্পদ ব্যয় করার সময় ওদের অন্তরের অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ বলা হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদের এক অংশ নিজেরই লাভের জন্য তাঁর পথে ব্যয় কর।

৩. অর্থাৎ তোমাদের দান করায় তোমাদের নিজেদেরই লাভ, না দিলে নিজেদেরই ক্ষতি। তোমাদের দেওয়া না দেওয়ায় আল্লাহর কোন লাভ-ক্ষতি নেই।

৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ সম্পদ ব্যয় করার জন্য যে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে, এতে মনে করো না যে, আল্লাহ বা তাঁর রাসূল চাচ্ছেন। না না, এ নির্দেশ তো তোমাদের মঙ্গলার্থে। এর পর একের স্থলে হাজার পাবে। নতুবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কিসের পরোয়া?'

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করে দেবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না[১]।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে হেকমত ও কল্যাণ বিবেচনায় বান্দাদের ব্যয় করার হুকুম দেন, তা হাসিল হওয়া তোমাদের উপর সীমাবদ্ধ নয়। মনে কর, তোমরা যদি কার্পণ্য কর এবং তাঁর হুকুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে দাঁড় করিয়ে দেবেন, যারা তোমাদের ন্যায় কৃপণ হবে না। বরং অত্যন্ত প্রশস্ত অন্তকরণে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করবে এবং তাঁর পথে অকাতরে ব্যয় করবে।

যা হোক, আল্লাহ তাআলার হেকমত ও উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় পূর্ণ হবেই। তোমরা দান করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে কেন?

قَوْمًا غَيْرَكُمْ-এর ব্যাখ্যা

হাদীছে আছে, সাহাবীগণ আরয করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্য সম্প্রদায় কারা, যাদের দিকে (আয়াতে) ইঙ্গিত করা হয়েছে? তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর উপর হাত রেখে বললেন, 'এর সম্প্রদায়'। এবং বললেন, 'খোদার কসম! ঈমান যদি সুদূর ছুরায়্যা (নক্ষত্রবিশেষ)-তে গিয়ে পৌছে, তবু পারস্যের লোকেরা সেখান থেকে তা নিয়ে আসবে।' (তাফসীরে তাবারী : ২১/২৩৩; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৩৭০৯)

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন

আলহামদুলিল্লাহ, সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম ঈমানের ক্ষেত্রে নিজেদের অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রমাণ দিয়েছেন যে, তাঁদের স্থলে অন্য জাতিকে আনার জরুরতই হয়নি। এতদসত্ত্বেও পারস্যবাসীরা ইসলামে দাখিল হয়ে ইলম ও ঈমানের এমন উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গিয়েছেন এবং এমন এমন মহান অমূল্য খেদমত করে গিয়েছেন, যা দেখে স্বীকার করতেই হয় যে, নিশ্চয়ই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই জাতিই প্রয়োজনের সময়ে আরবদের স্থান পূর্ণ করতে পারত। পূর্বাপর হাজার হাজার আলেমের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র ইমাম আজম আবূ হানীফা (র)-এর অস্তিত্বই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার যথেষ্ট প্রমাণ; বরং এই মহা সুসংবাদের সর্বোত্তম ও সর্বপ্রথম পাত্র ইমাম সাহেবই- رضي الله تعالى عنه وأرضاه (ইমাম আবু হানীফা র.-এর পূর্বপুরুষগণ পারসিক ও আজমী, যদিও তিনি জন্মসূত্রে ইরাকী। -অনুবাদক)

تم سورة محمد صلى الله عليه وسلم بتوفيقه وإعانته فلله الحمد والمنة

সূরা ফাত্হ

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৪৮ । ২৯ আয়াত । ৪ রুকূ । মাদানী

آياتها ٢٩، ركوعاتها ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ①

১. আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়[১]–

---

১. আলোচ্য সূরার বিভিন্ন আয়াতে কয়েকটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য ঘটনাগুলি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে:–

(ক) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ষষ্ঠ হিজরীতে) মদীনায় স্বপ্ন দেখেন যে, সাহাবীগণসহ তিনি মক্কা মুকাররমায় নিরাপদে প্রবেশ করেছেন এবং উমরা করত মাথা মুণ্ডন করেছেন ও কেউ কেউ চুল ছেঁটেছেন। তিনি স্বপ্নটি সাহাবীদের কাছে বয়ান করলেন। যদিও উমরার সময় তিনি নির্ধারণ করেননি, তবুও আগ্রহের আতিশয্যে অধিকাংশ সাহাবীর ধারণা হল, এ বছরই উমরার সৌভাগ্য হবে। ঘটনাক্রমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও উমরার ইচ্ছা করে ফেললেন।

(খ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেড় হাজার সাহাবীসহ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা হলেন এবং 'হাদী' বা কুরবানীর জন্তুও সঙ্গে নিলেন। এ সংবাদ মক্কায় পৌছলে কুরায়শরা পরামর্শ করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তারা তাঁকে মক্কায় ঢুকতে দেবে না। অথচ হজ ও উমরা করতে শত্রুদেরও বাধা প্রদান করা হত না।

যা হোক, মক্কার নিকটবর্তী 'হুদায়বিয়া' নামক স্থানে পৌছলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী বসে পড়ল এবং কিছুতেই আর উঠল না। তিনি বললেন حبسها حابس الفيل (আবরাহার হাতীকে যিনি বাধা দিয়েছিলেন, তিনিই একে আটকে দিয়েছেন) এবং বললেন, 'খোদার কসম! আল্লাহর সম্মানিত বিষয়সমূহের সম্মান রক্ষা পায় এমন যে কোন বিষয়ের দাবি মক্কাবাসীরা করলে আমি তা মঞ্জুর করব। পরিশেষে তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন (সেই স্থানকে বর্তমানে 'শুমাইছিয়া' বলা হয়।)

(গ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের নিকট দূত পাঠিয়ে বার্তা দিলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। সুতরাং আমাদের ঢুকতে দাও, উমরা করে আমরা চলে যাব।

এর উত্তর না আসায় তিনি হযরত উছমান (রা)-কে এ পয়গাম দিয়েই পাঠালেন এবং মক্কায় অবস্থানকারী পরাভূত ও নির্যাতিত মুসলমানদের সংবাদ পৌছালেন যে, শীঘ্রই মক্কায় ইসলাম জয়লাভ করবে। হযরত উছমানকে কুরায়শরা আটক করে রাখল। তাঁর প্রত্যাবর্তনে দেরি হওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটে গেল যে, হযরত উছমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় যুদ্ধের আশঙ্কা করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের

২. যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত গোনাহ ক্ষমা করেন[১],

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ

নীচে বসে সাহাবীদের থেকে জেহাদের বায়'আত (বা অঙ্গীকার) গ্রহণ করলেন। কুরায়শরা বায়'আতের সংবাদ শুনে ভীত হল এবং হযরত উছমানকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

(ঘ) এর পর মক্কার কতক সরদার সন্ধির উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয় এবং 'সন্ধিপত্র' লেখার সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হল এবং মুসলিমগণ উত্তেজিত হয়ে তলোয়ার দ্বারা বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা করতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের জেদ অনুযায়ী সকল বিষয় মেনে নিলেন এবং মুসলিমগণ সীমাহীন ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিলেন।

সন্ধিপত্রে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি শর্ত এই ছিল যে, মুসলমানদের নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বছর ফেরত চলে যাবেন এবং আগামী বছর অস্ত্রহীন অবস্থায় এসে উমরা করবেন। তাছাড়া উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর কোন যুদ্ধ হবে না। এই মেয়াদের মধ্যে কাফেরদের কেউ মুসলমানদের কাছে চলে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে; কিন্তু মুসলমানদের কেউ কাফেরদের কাছে গেলে তাকে ওরা ফেরত পাঠাবে না।

সন্ধির সকল বিষয় মীমাংসা হয়ে যাওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়াতেই কুরবানীর জন্তু যবেহ করলেন এবং মাথা মুণ্ডন করে ও কেউ কেউ চুল ছেঁটে মদীনার দিকে রওয়ানা করলেন।

(ঙ) মদীনায় যাওয়ার পথেই এই সূরা 'ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। আর এ সকল ঘটনা হিজরী ৬ সনের শেষের দিকে সংঘটিত হয়।

(চ) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুসলিমগণ হিজরী ৭ সনের প্রথম দিকে মদীনা থেকে চার মনযিল উত্তরে শামদেশের দিকে অবস্থিত ইহুদীদের এক জনপদ 'খায়বার' জয় করেন। হুদায়বিয়ার অভিযানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের ছাড়া আর কেউ এতে শরীক ছিল না।

(ছ) পরবর্তী বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে কাযা উমরা করার জন্য মক্কায় তশরীফ নিয়ে যান এবং নিরাপদে উমরা আদায় করেন।

(জ) সন্ধিপত্রে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার যে শর্ত ছিল, কুরায়শরা তা ভঙ্গ করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিযান করেন এবং অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে তা বিজয় করে নেন।

১. হুদায়বিয়ার সন্ধি বাহ্যত অপমান ও পরাজয়ের সন্ধি বলে মনে হয় এবং সন্ধির শর্তগুলো পাঠ করে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ-ই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের ফয়সালা কুরায়শ কাফেরদের অনুকূলে হয়েছে। সে জন্যই হযরত উমর ও অন্যান্য সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমও সন্ধির বাহ্যিক দিক লক্ষ্য করত খুবই চিন্তিত ও মর্মাহত ছিলেন। তাঁরা

ভাবছিলেন, চৌদ্দ পনের শত জীবন উৎসর্গকারী ইসলামী সিপাহীদের সম্মুখে কুরায়শ ও তাদের পক্ষাবলম্বীদের দল আর কী জিনিস! সমস্ত বিসংবাদের মীমাংসা তলোয়ারের মাধ্যমে কেন করা হয় না? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি ছিল সেইসব অবস্থা ও ফলাফলের দিকে, যেগুলি অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। আর আল্লাহ তাআলা কঠিন থেকে কঠিনতম ঘটনাবলি সইবার জন্য তাঁর হৃদয়কে খুলে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি অতুলনীয় অমুখাপেক্ষিতা এবং আল্লাহ-ভরসা ও ধৈর্যের সাথে ওদের প্রত্যেক শর্ত কবুল করেছিলেন এবং সাহাবীদেরকে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে বেশি জানেন' বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। অবশেষে আলোচ্য সূরা নাযিল হল এবং আল্লাহ তাআলা এই সন্ধি ও মীমাংসাকে فتح مبين বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা করলেন। সাহাবীরা এতেও বিস্মিত হলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কি বিজয়? উত্তরে বললেন, 'হাঁ, এ তো মহাবিজয়।'

এ সন্ধিকে فتح مبين সাব্যস্ত করার তাৎপর্য

সত্য কথা এই যে, সাহাবীদের জেহাদের বাইআত ও মামুলি হুমকি-ধমকির পরই অবাধ্য কাফেরদের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়া, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপেক্ষাসূচক মনোভাব ও ক্ষমাসুলভ আচরণ এবং বাইতুল্লাহ শরীফের তাজীমের খাতিরেই ওদের অর্থহীন দাবি-দাওয়াতে মোটেই উত্তেজিত না হওয়া– এ সবকিছু একদিকে আল্লাহর বিশেষ মদদ ও রহমতকে টেনে আনার কারণ হচ্ছিল, অন্যদিকে শত্রুদের অন্তর এসব দেখে ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও পয়গম্বর আলাইহিস সালামের পয়গম্বরীর মহিমা অনুধাবন করছিল। চুক্তিপত্র লেখার সময় যদিও স্থূল দৃষ্টিধারীদের নিকট কাফেরদের বিজয় হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু শান্তমনে গভীর চিন্তাকারীরা বিলক্ষণ বুঝছিল যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মীমাংসা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এর নাম 'সুস্পষ্ট বিজয়' (فتح مبين) রেখে ইশারা করে দিলেন যে, এই সন্ধি বর্তমানেও বিজয় এবং ভবিষ্যতেও আপনার পক্ষে অসংখ্য জাহেরী ও বাতেনী বিজয়ের দ্বার উন্মোচনকারী।

এ সন্ধির পর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কাফেররা মুসলমানদের মুখে ইসলামের কথা শুনে এবং পবিত্র মুসলমানদের হাল-অবস্থা ও চাল-চলন দেখে ইসলামের দিকে আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। ফলে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকে মক্কাবিজয় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দু বছর কালের মধ্যে এত বেশি সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন যে, ইতিপূর্বে কখনো এমনটি হয়নি। খালিদ ইবনে ওলীদ ও আমর ইবনে আসের মত প্রসিদ্ধ সাহাবীরা এ সময়ই ইসলামের ছায়াতলে আগমন করেন।

দৈহিক বিজয় নয়; বরং অন্তর বিজয়ই হুদায়বিয়া সন্ধির সর্ববৃহৎ বরকত ছিল

এ সময় মুসলমানদের দল চতুর্দিকে এতই বিস্তার ও প্রসার লাভ করে যে, মক্কা শরীফকে জয় করত শিরকের দুর্গন্ধময় আবর্জনা থেকে চিরতরে পবিত্র করে দেওয়া একেবারে সহজ হয়ে গেল। হুদায়বিয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মাত্র দেড় হাজার প্রাণোৎসর্গকারী মুজাহিদ ছিলেন; কিন্তু মাত্র দুই বছর পর পবিত্র মক্কার মহা বিজয়ের সময় দশ হাজার সাহসী যোদ্ধা তাঁর সহগামী ছিলেন।

আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেন[১], আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন[২]–	وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

সত্য কথা এই যে, শুধু মক্কা বিজয় ও খায়বার বিজয় নয়; বরং পরবর্তী সমস্ত ইসলামী বিজয়ের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি ভিত্তিপ্রস্তর ও সোনালী ভূমিকাস্বরূপ ছিল। আর এ সন্ধির ঘটনায় যে ধৈর্য, তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর সম্মানিত বিষয়াদির প্রতি যে তাজীম প্রকাশ পায়, তার বদৌলতে বিপুল ইলম ও পবিত্র মারেফত এবং বাতেনী মাকাম ও মর্তবার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে থাকবে, যা অনুমান করার সাধ্যও কারো নেই। তবে তার মোটামুটি ইঙ্গিত আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতগুলিতে দিয়েছেন।

আয়াতের মর্ম এই যে–

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যেমন কোনো বিরাট বিজয়ীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন, তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা এই মহাবিজয়ের প্রতিদানস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চারটি বিশেষ বিষয় দান করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হল غفران ذنوب (অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ মর্যাদা হিসাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে ত্রুটি বলে পরিগণিত হতে পারে– এমন সকল পূর্বাপর ত্রুটিসমূহ সর্বদার জন্য সম্পূর্ণরূপে মাফ।)

এরূপ ঘোষণা আল্লাহ তাআলা আর কোনো বান্দার জন্য দেননি। কিন্তু হাদীছে এসেছে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত পরিমাণ ইবাদত ও মেহনত করতেন যে, রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা মুবারক ফুলে যেত এবং এ অবস্থা দেখে মানুষের মনে মায়ার উদ্রেক হত। সাহাবীরা আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত মেহনত কী জন্য করেন, আল্লাহ তাআলা তো আপনার আগে-পরের সমস্ত ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। উত্তরে বলতেন– أفلا أكون عبدا شكورا (তবে কি আমি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?) (শুআবুল ঈমান, হাদীস : ১৪১৫; তারীখে ইবনে আসাকির হাদীস : ৯৭২) বলা বাহুল্য, আল্লাহ তাআলাও এমন সুসংবাদ সেই বান্দাকেই শোনান, যিনি তা শুনে নির্ভয় হয়ে যাবেন না, বরং আরো অধিক আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে শুরু করবেন। শাফাআত বিষয়ক দীর্ঘ হাদীছে আছে, সমগ্র সৃষ্টিকুল একত্র হয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নিকট যাবে, তখন তিনি বলবেন– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, যিনি সর্বশেষ নবী এবং যাঁর পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ-খাতা আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ ধরা যাক এই শাফাআতের মাকামেও যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তাও পূর্বের সেই সাধারণ ক্ষমার আওতাধীন রয়েছে)। তিনি ছাড়া এই মর্যাদা আর কারো জন্য নয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৩৫৯০)

১. অর্থাৎ শুধু ভুল-ত্রুটি ক্ষমাই নয়, বরং জাহেরী ও বাতেনী এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক যা কিছু নে'য়ামত ও অনুগ্রহ এখন পর্যন্ত আপনার প্রতি হয়েছে, তার চরম ও পরম পরিপূর্ণতা সাধন করা হবে।

২. অর্থাৎ তিনি আপনাকে হেদায়াত ও ইস্তেকামতের সরলপথের উপর চিরকাল কায়েম রাখবেন। মারেফত ও 'শুহুদ' (তথা অন্তর্দর্শনের) অনন্ত-অসীম মর্তবাসমূহে আরোহণ করা

৩. এবং যাতে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করেন প্রবলভাবে[১]।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

৪. তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঈমানদারদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় তাদের (পূর্ব) ঈমানের সাথে[২]। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল বাহিনী আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[৩]।

هُوَالَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

এবং দেহ-মনের উপর ইসলামের শাসন কায়েম করার ক্ষেত্রে আপনার জন্য কোন কিছু বাধা হতে পারবে না। আপনার হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের দ্বারা মানুষ পরম উৎসাহে ইসলামের সরলপথে আসবে। আর এভাবে আপনার আজর ও ছওয়াব এবং পুণ্যকর্মের ভাণ্ডারে অফুরন্ত বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহর এমন সাহায্য আসবে, যা কেউ রোধও করতে পারবে না, পরাভূতও করতে পারবে না। এবং তাঁরই সাহায্যে সর্বপ্রকার বিজয় ও সাফল্য আপনার পদচুম্বন করবে।

সূরা নাস্‌র -এ বলা হয়েছে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় এসে পড়বে এবং লোকেরা দলে দলে দীনে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করবে, তখন আপনি আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করবেন এবং তাঁর কাছে এস্তেগফার করতে থাকবেন। বলা বাহুল্য, হুদায়বিয়া-সন্ধির এই মহা বিজয়েও তিনি এস্তেগফার করে থাকবেন। সুতরাং এরই জওয়াবে যে لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ কথাটি ইরশাদ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

২. আল্লাহ তাআলা প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও তারা রাসূলের হুকুমের উপর দৃঢ়ভাবে আমল করেছেন। জেদী কাফেরদের মত তারা জেদ ধরেননি। এর বরকতে তাদের ঈমানের স্তর বৃদ্ধি পেল এবং বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি হল।

اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ

তারা প্রথমে জেহাদের বায়'আত করে প্রমাণ করেছিলেন, তাঁরা আল্লাহর রাহে লড়তে ও মরতে প্রস্তুত আছেন। এ ছিল তাদের ঈমানের একটি চিত্র। এরপর যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের জযবার বিরুদ্ধে আল্লাহর হুকুমে সন্ধি-প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন, তখন তাদের ঈমানের দ্বিতীয় চিত্র এই ছিল যে, নিজেদের জোশ-জযবা ও কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে আল্লাহ ও রাসূলের ফয়সালার সামনে আত্মসমর্পণ করলেন।

৩. অর্থাৎ তিনিই জানেন, কখন যুদ্ধের হুকুম তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর কখন যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা ও সন্ধি করা হেকমতপূর্ণ। অতএব তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হলে কখনই কাফেরদের সংখ্যাধিক্যের কারণে লড়াই থেকে পিছপা হবে না। কারণ, আসমান-যমীনের

লِيُدۡخِلَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا وَيُكَفِّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنۡدَ اللّٰهِ فَوۡزًا عَظِيۡمًا ۙ

৫. (আল্লাহ ঈমান বৃদ্ধির ব্যবস্থা এজন্য করেছেন), যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের এমন জান্নাতরাজিতে দাখিল করেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং যাতে তাদের থেকে তাদের গোনাহসমূহ দূর করে দেন[১]। আর এ-ই আল্লাহর নিকট বিরাট সাফল্য[২]।

লস্করসমূহের মালিক তিনিই, আর তিনি তোমাদের সংখ্যালঘুতা সত্ত্বেও নিজ অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী দ্বারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম- যেমন বদর, আহযাব, হুনাইন প্রভৃতি যুদ্ধে করেছিলেন। আর যদি তিনি সন্ধি করার ও যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার হুকুম দেন, তবে তাই পালন করবে। এ ধারণা করবে না যে, হায়রে! সন্ধি হয়ে গেল এবং কাফেররা বেঁচে গেল, ওরা শাস্তি পেল না। যুদ্ধের হুকুম হলে তো আমরা ওদের ধ্বংস করে ফেলতাম। কারণ, ওদের ধ্বংস হওয়া তোমাদের উপর মোটেই নির্ভরশীল নয়; তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর অন্যান্য বাহিনী দিয়েও ওদের ধ্বংস করতে পারেন।

যা হোক, পৃথিবী ও আকাশসমূহের বাহিনীগুলির মালিক যিনি, তিনি যদি সন্ধির হুকুম দেন তবে নিশ্চয় তাতেই কল্যাণ ও হেকমত নিহিত থাকবে।

১. যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের اِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِيۡنًا পড়ে শুনালেন, তখন তারা মুবারকবাদ জানিয়ে তাঁর খেদমতে আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ'! এই (সুসংবাদ) তো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কী?' তার উত্তরে এই আয়াতগুলি নাযিল হয় (বুখারী : ৪১৭২)। অর্থাৎ, আল্লাহ প্রশান্তি (সাকীনা) অবতীর্ণ করত মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি করেছেন, যাতে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে জান্নাতে দাখিল করেন এবং তাদের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতাসমূহ মাফ করে দেন।

হাদীছে আছে, যে সকল সাহাবী হুদায়বিয়ায় বাই'য়াত করেছিলেন, তাঁদের একজনও দোযখে দাখেল হবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৪৯৬; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪১৯৭)

বি. দ্র. আয়াতে মুমিন নারীদেরও উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাপকতা সৃষ্টির জন্য। আয়াতের মর্ম হল- পুরুষ হোক বা নারী, কারো মেহনত ও ঈমাননির্ভর আমল বিনষ্ট হয় না। আর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, হযরত উম্মে সালামা (রা) এই সফরে হুযূরের সঙ্গে ছিলেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৩১)

২. কোনো কোন নকল সূফী বা ভাবাচ্ছন্ন বুযুর্গ বলে থাকেন যে, বেহেশত কামনা করা অসম্পূর্ণ লোকদের কাজ। কিন্তু এখান থেকে জানা গেল, আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য এটাই (জান্নাতে প্রবেশ) বিরাট সৌভাগ্য।

৬. এবং যাতে তিনি শাস্তি দেন মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের[১], যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে[২]। ওদেরই উপর পড়ুক মন্দের ফের*[৩]। আর আল্লাহ ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, ওদের লা'নত করেছেন এবং ওদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম। আর (তা) কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ⑥

৭. আসমানসমূহ ও যমীনের সকল বাহিনী আল্লাহরই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৪]।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ⑦

---

১. অর্থাৎ মুমিনদের অন্তরে সন্ধির ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করে ইসলামের ভিত্তি মজবুত করে দিলেন এবং ইসলামের বিজয় ও উন্নতির দ্বার খুলে দিলেন। পরিণামে এটি কাফের ও মুনাফিকদের উপর বালা-মুসিবত পতিত হওয়ার এবং ওদের চরম শাস্তি পাওয়ার কারণ হল।

২. 'মন্দ ধারণা' এই যে, মদীনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় মুনাফিকরা (একমাত্র জুদ্দ বিন কায়স ছাড়া) মুসলমানদের সঙ্গে যায়নি, নানা বাহানা করে বসে থাকে। ওদের ধারণা ছিল– সংঘর্ষ অবশ্যই হবে, এই মুসলমানরা যুদ্ধে ধ্বংস হবে, একজনও জীবিত ফিরে আসবে না। কেননা, যাচ্ছে দেশ থেকে বহুদূরে, স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে, আরো শত্রুদের দেশে– আমরা কেন তাদের সঙ্গে গিয়ে নিজেদের ধ্বংস করব। আর মক্কার কাফেররা ধারণা করল, মুসলমানরা বাহ্যত উমরার নামে আসছে; কিন্তু ধোঁকা ও প্রতারণা দ্বারা আমাদের থেকে পবিত্র মক্কা ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা– 'ধ্বংসচক্র' অথবা :** 'কালের ঘূর্ণিচক্র'।

৩. অর্থাৎ ওদের উপর কালের ঘূর্ণিচক্র ও মুসিবতের পালা অবশ্যই আসবে। ওরা আর কতদূর সতর্কতা ও দূরদর্শিতা দেখাতে পারবে!

৪. অর্থাৎ তিনি শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করলে কে ওদের রক্ষা করতে পারবে? আল্লাহর লস্কর এক মুহূর্তে ওদের নিষ্পেষিত করে ফেলবে। তবে তিনি পরাক্রমশালী হওয়ার সঙ্গে হেকমতওয়ালাও বটে। অবকাশ না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে ফেলা হেকমতের দাবি নয়।

৮. আমি আপনাকে অবস্থাদি বর্ণনাকারী*, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি[১]–

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑧

৯. যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁকে সাহায্য কর ও সম্মান কর[২] এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক সকাল-সন্ধ্যায়[৩]।

لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑨

১০. যারা আপনার কাছে বায়'আত করে, বস্তুত তারা আল্লাহর কাছে বায়'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর[৪]।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ

---

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'সাক্ষ্যদাতা'।

১. অর্থাৎ আপনি আল্লাহর ফরমাবরদার (আজ্ঞাবহ) বান্দাদের সুসংবাদ দিয়ে থাকেন এবং নাফরমানদের সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। আর স্বয়ং নিজের অবস্থাদি বর্ণনা করে থাকেন– যেমন إِنَّا فَتَحْنَا থেকে এই আয়াত পর্যন্ত (উল্লিখিত) তিন প্রকার বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। আর আখেরাতে আপনি নিজ উম্মতের ব্যাপারে এবং নবীদের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হবেন।

২. تُعَزِّرُوْهُ ও تُوَقِّرُوْهُ শব্দদ্বয়ে যে সর্বনাম আছে তা দ্বারা যদি আল্লাহ উদ্দেশ্য হন, তবে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ –তাঁর দীন ও পয়গম্বরকে সাহায্য করা। আর এর দ্বারা রাসূল উদ্দেশ্য হলে অর্থ পরিষ্কার। কোন অস্পষ্টতা নেই।

৩. আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাক– নামাযের মধ্যে বা নামাযের বাইরে।

৪. সাহাবীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে বায়'আত করতেন। একেই বলা হয়েছে, নবীর হাতে বায়'আত করা যেন আল্লাহর নিকট বায়'আত করা। কেননা, বস্তুত নবী আল্লাহরই পক্ষ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং বায়'আতের মাধ্যমে তাঁরই হুকুম-আহকাম পালন করার দৃঢ় অঙ্গীকার করানো হয়। এ অর্থেই আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন– مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। –নিসা, আয়াত ৮০) আরেক স্থানে বলেছেন– وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ رَمَىٰ (আপনি মাটি নিক্ষেপ করেননি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন, বরং আল্লাহ তা নিক্ষেপ করেছেন। –আনফাল, আয়াত ১৭)।

নবীর হাতে বায়'আতের তাৎপর্য যখন এই, তখন তাঁর কাছে বায়আতকারীদের হাতের উপর আল্লাহ তাআলার দয়া-মায়া ও সাহায্য-সহযোগিতার হাত অবশ্যই থাকবে।

فَمَنۡ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنۡكُثُ عَلٰى نَفۡسِهٖ ۚ وَمَنۡ اَوۡفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيۡهُ اللّٰهَ فَسَيُؤۡتِيۡهِ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ۝١٠

অতঃপর যে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে তা ভঙ্গ করবে নিজেরই ক্ষতির জন্য। আর যে কেউ সেই বিষয় পূর্ণ করবে, যার অঙ্গীকার সে আল্লাহর সঙ্গে করেছে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই মহাপ্রতিদান দেবেন[১]।

[রুকূ - ২]

سَيَقُوۡلُ لَكَ الۡمُخَلَّفُوۡنَ مِنَ الۡاَعۡرَابِ شَغَلَتۡنَاۤ اَمۡوَالُنَا وَاَهۡلُوۡنَا فَاسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ۚ يَقُوۡلُوۡنَ بِاَلۡسِنَتِهِمۡ مَّا لَيۡسَ فِىۡ

১১. যেসব দেহাতী পশ্চাতে থেকে গেছে, তারা এখন আপনাকে বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদের ব্যস্ত রেখেছিল। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন[২]।' ওরা মুখে এমন কথা বলে,

---

বি. দ্র. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ইসলাম, কখনো জেহাদ, কখনো অন্য কোনো নেক কাজের জন্য সাহাবীদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করতেন। মুসলিম শরীফে (১৮৬৩) وعلى الخير -শব্দ এসেছে (অর্থাৎ, নেক কাজের জন্য বায়আত)। পীর সাহেবগণ লোকদের থেকে যে বায়আত নেন, তা যদি শরী'য়তসম্মতভাবে হয়, তবে তা এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে। হুদায়বিয়াতে এ মর্মে বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, আমরা আমরণ লড়ে যাব, জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করব না।

১. অর্থাৎ বায়'আতের সময় যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা যদি কেউ ভঙ্গ করে, তবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহ ও রাসূলের কিছুই ক্ষতি হবে না। সে-ই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি দৃঢ়তা দেখাবে এবং নিজ অঙ্গীকার দৃঢ়তার সাথে পূর্ণ করবে, সে এর বিনিময়ও পুরাপুরি পাবে।

২. মদীনা থেকে রওনা হওয়ার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য মুসলমানদেরও উৎসাহিত করেছিলেন। সম্ভবত লক্ষণাদি দ্বারা তিনিও যুদ্ধের অনুমান করেছিলেন। এতে যাদের অন্তরে ঈমান তখনো দৃঢ় হয়নি, সেই গ্রামবাসীরা জান বাঁচিয়ে বসে রইল এবং পরস্পরে বলতে লাগল, আমরা কি এমন সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হব, যারা (একদা) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাড়িতে (মদীনায়) এসে তার বহু সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করে গেল? এখন আমরা তাদের দেশে গিয়ে যুদ্ধ করব? অসম্ভব! তোমরা দেখে নিয়ো, সে ও তার সাথীরা এই সফর থেকে ফিরে আসতে পারবে না, সেখানে সকলে কচুকাটা হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ওদের মুনাফেকী ফাঁস করে দিয়েছেন এবং মদীনায় পৌঁছার আগেই পথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমাদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে ওরা

যা ওদের অন্তরে নেই[১]। আপনি বলুন, 'তো কে আছে, যে তোমাদের জন্য আল্লাহর মোকাবেলায় কিছু করার ক্ষমতা রাখে যদি তিনি তোমাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের উপকার করার ইচ্ছা করেন?' বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কর্ম-কাণ্ড সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত[২]।

قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

নিজেদের অনুপস্থিতির মিথ্যা ওযর ও হিলা-বাহানা করতে আসবে এবং বলবে– কী আর বলব, ঘর-সংসারের ঝামেলা থেকে আমরা অবকাশ পাইনি। আমাদের পিছনে ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ ছিল না। যা হোক, আমাদের দ্বারা অবশ্যই ত্রুটি হয়ে গেছে, এখন আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিন।

১. অর্থাৎ খোদ ওদের অন্তর জানে, এই ওযর একেবারে মিথ্যা। আর ওরা এস্তেগফারের দরখাস্তও করবে নিছক লৌকিকতার খাতিরে, আন্তরিকতার সঙ্গে নয়। কারণ, ওরা নিজ অন্তরে একে গোনাহও মনে করে না এবং আপনার প্রতি বিশ্বাসও রাখে না।

২. অর্থাৎ সব রকমের লাভ ও ক্ষতি আল্লাহর হাতে, তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের সামনে কারো কোনো ক্ষমতা চলে না। তোমরা (মুনাফিকরা) এই মুবারক সফরে শরীক হওয়ার ফায়দাসমূহ লাভ কর– এ তাঁর মর্জি ছিল না। এখন আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি– এটাও তিনি চান না। তোমরা হিলা-বাহানা তৈরি করার আগেই তিনি তোমাদের এসব মিথ্যা ওযর-আপত্তি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন।

যা হোক, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এ-ই ছিল যে, তোমাদেরই মন্দ কার্যকলাপ ও আচার-ব্যবহারের ফলে হুদায়বিয়া অভিযানের অফুরন্ত বরকত ও ফায়দা থেকে তিনি তোমাদের বঞ্চিত রাখবেন।

রইল তোমাদের এ কথা যে, নিজেদের ধন-সম্পদ ও ঘর-সংসারের হেফাজতের কারণে সফরে যেতে পারনি –তো বল দেখি, আল্লাহ যদি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রভৃতির ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা কি ঘরবাড়িতে থেকে তা প্রতিহত করতে পারবে? অথবা মনে কর, সফরে থাকাবস্থায় আল্লাহ যদি তোমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কিছু উপকার করতে চান, তবে কি তা কেউ প্রতিহত করতে পারবে? নিশ্চয় না। সুতরাং যখন লাভ ও ক্ষতি কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির মোকাবেলায় এসব জিনিসের পরোয়া করা নিতান্তই বোকামী ও গোমরাহী।

আর উল্লিখিত হিলা-বাহানার দ্বারা তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে ফেলবে– এমন ভেবো না। বরং স্মরণ রেখো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল আমল ও হাল-অবস্থা সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন।

১২. আসলে তোমরা এ ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনো ফিরে আসতে পারবে না। এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে শোভন করে তোলা হয়েছিল। আর তোমরা অতি মন্দ ধারণা করেছিলে। বস্তুত তোমরা ছিলে এক ধ্বংসোন্মুখ সম্প্রদায়[১]।

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰۤى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًاۢ بُوْرًا ۝

১৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, আমি (এমন) কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝

১৪. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[২]।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

১৫. যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে– যখন তোমরা গনীমতের মাল আনতে যাবে– 'আমাদেরও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও।' ওরা আল্লাহর কথা পরিবর্তন করে দিতে চায়। আপনি বলে দিন, 'তোমরা মোটেই আমাদের সঙ্গে যাবে না। আল্লাহ ইতিপূর্বে

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ

১. অর্থাৎ তোমাদের না যাওয়ার প্রকৃত কারণ তা নয়, যা তোমরা বলছ; বরং তোমাদের ধারণা এই ছিল যে, এবার পয়গম্বর ও মুসলমানেরা এ সফর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। আর এ-ই ছিল তোমাদের আন্তরিক কামনা। এবং এই ভ্রান্ত ধারণা ও জল্পনা-কল্পনা তোমাদের অন্তরে বসে গিয়েছিল। এ জন্যই তোমরা আলাদা থাকার মধ্যেই নিজেদের আত্মরক্ষা ও ফায়দা মনে করেছিলে। বস্তুত এটা তোমাদের ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ ছিল। আর আল্লাহ জানতেন, তোমরা অচিরেই বরবাদ ও ধ্বংস হবে।

২. অর্থাৎ তিনি যাকে ক্ষমা করতে না চান, আমি কী করে তাকে মাফ করাব? হাঁ, আল্লাহর দয়া হলে তোমাদের তওবার তাওফীক হবে এবং ক্ষমা পেয়ে যাবে। তাঁর রহমত নিঃসন্দেহে তাঁর রোষ থেকে অগ্রগামী।

قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

এরূপই বলে দিয়েছেন[১]। তখন ওরা অবশ্যই বলবে, 'বরং তোমরা তো আমাদের হিংসা কর[২]।' (তা নয়), বরং ওরা সামান্যই বোঝে[৩]।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ

১৬. যেসব দেহাতী পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, আপনি তাদের বলে দিন, 'অচিরেই তোমাদের এক কঠোর যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের প্রতি ডাকা হবে, হয় তোমরা ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে অথবা ওরা অনুগত হবে। অতএব তোমরা যদি নির্দেশ মান, তবে আল্লাহ তোমাদের উত্তম বিনিময় দেবেন[৪]। আর যদি

---

১. হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খায়বার অভিযানের নির্দেশ দেওয়া হয়, যেখানে বিশ্বাসঘাতক ইহুদীরা বাস করত। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করত আহযাব যুদ্ধে কাফের সম্প্রদায়সমূহকে উত্তেজিত করে মদীনায় আক্রমণ করিয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগেই সংবাদ দিয়ে দিলেন যে, হুদায়বিয়া অভিযানে যারা শরীক হয়নি –এমন দেহাতীরা এখন খায়বার অভিযানে আপনাদের সঙ্গে যেতে চাইবে। কারণ, সেখানে বিপদের আশঙ্কা কম এবং গনীমতের আশা বেশি। আপনি ওদের জানিয়ে দিন, তোমাদের এই অনুরোধের আগেই আল্লাহ তাআলা আমাদের বলে দিয়েছেন যে, তোমরা (এই সফরে) আমাদের সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারবে না। অতএব তোমরা কি আমাদের সঙ্গে যেতে পার? গেলে এর অর্থ এই হবে যে, আল্লাহর কথা যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। অথচ এটা কোনো রকমেই সম্ভব নয়।

২. অর্থাৎ আল্লাহ কিছুই বলেননি। তোমরা শুধু এটাই চাও যে, আমাদের কোন ফায়দা না হোক, সমস্ত গনীমতের মাল একমাত্র তোমাদের হস্তগত হোক।

৩. অর্থাৎ ওদের জ্ঞানবুদ্ধি খুব কম। মুমিনদের যুহদ ও অল্পেতুষ্টির কী অবস্থা– আহমকেরা তা বোঝে না। মুমিনরা কি ধন-সম্পদের প্রতি লোভী যে, তোমাদের হিংসা করবে? আর পয়গম্বর হিংসার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করবেন? (আল্লাহর পানাহ!)

৪. অর্থাৎ একটু ধৈর্য ধর। এই যুদ্ধে তো যেতে পারবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হবে। খুব কঠোর যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবিলা হবে। সেই সকল যুদ্ধ তাবৎ জারী থাকবে, যাবৎ ওই সম্প্রদায়গুলি মুসলমান হয়ে অথবা জিযয়া ইত্যাদি দিয়ে ইসলামের অনুগত না হবে। যদি সত্যিই তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের উৎসাহ থাকে, তবে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বাহাদুরীর পরিচয় দিয়ো। তখন আল্লাহর হুকুম মানলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের বিনিময় দান করবেন।

ফিরে যাও যেমন ইতিপূর্বে ফিরে গিয়েছিলে, তবে তিনি তোমাদের যাতনা-দায়ক শাস্তি দেবেন[১]।

تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑯

১৭. (জেহাদে না গেলে) অন্ধের কোনো গোনাহ নেই, খোড়ার কোনো গোনাহ নেই এবং অসুস্থ ব্যক্তিরও কোনো গোনাহ নেই[২]। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মান্য করবে, আল্লাহ তাকে এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। আর যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে তিনি যাতনাদায়ক শাস্তি দেবেন[৩]।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ⑰

[রুকূ - ৩]

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা আপনার কাছে সেই বৃক্ষের নীচে[৪] বায়'আত করছিল। আর তিনি

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ

قوم أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ

উল্লিখিত 'কঠোর যুদ্ধবাজ জাতি' বলতে বনু হানীফা প্রভৃতি গোত্র উদ্দেশ্য, যারা মুসাইলিমা কাযযাবের জাতি ছিল। অথবা হাওয়াযিন ও ছাকীফ প্রভৃতি উদ্দেশ্য, যাদের সঙ্গে 'হুনায়নে' যুদ্ধ হয়েছিল। অথবা সেই মুরতাদরা উদ্দেশ্য, যাদের বিরুদ্ধে হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ করেছিলেন। অথবা পারসী ও রোমক এবং কুর্দি প্রভৃতি জাতি উদ্দেশ্য, যাদের বিরুদ্ধে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে যুদ্ধ হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমান হয়ে যায়। আর গনীমতের মালও অনেক এসেছিল।

১. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন হুদায়বিয়া অভিযানে যেতে পিছপা হয়েছিলে, তদ্রূপ ভবিষ্যতে যদি উক্ত অভিযানসমূহ থেকেও পিছপা হও– তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। হতে পারে, আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তা আপতিত হবে।

২. অর্থাৎ এসব মাযুর ব্যক্তির উপর জেহাদ ফরয নয়।

৩. সকল ব্যাপারে ও সর্বক্ষেত্রে এটাই (আল্লাহর) সাধারণ নীতি।

৪. হুদায়বিয়ার একটি বাবলা গাছ।

قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

তাদের অন্তরে যা ছিল, তা জেনে নিয়েছেন[১]। ফলে তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের পুরস্কারস্বরূপ দিলেন– এক আসন্ন বিজয়,

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

১৯. ও প্রচুর গনীমতের মাল, যা তারা হস্তগত করবে[২]। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৩]।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

২০. আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের মালের, যা তোমরা হস্তগত করবে। আর তোমাদের জন্য এই গনীমত তরান্বিত করেছেন[৪] এবং তোমাদের থেকে মানুষের হাত প্রতিহত করেছেন[৫] (যাতে তোমরা শোকর

সম্ভবত لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ – এই ইরশাদের কারণেই উক্ত বায়আতকে 'বায়আতুর রিযওয়ান' বলা হয়। সূরার প্রারম্ভে এ বায়আতের বিস্তারিত বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

১. 'তাদের অন্তরে যা ছিল'– এর দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতিজনিত উদ্বেগ-শঙ্কা, অন্তরের তাওয়াক্কুল, মহৎ নিয়ত, সততা, আন্তরিকতা, ইসলামপ্রীতি প্রভৃতি উদ্দেশ্য।

বি. দ্র. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে مافي قلوبهم দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলিই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাফসীরকার আবু হাইয়্যান (র) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং এই সন্ধির শর্তাবলির কারণে মুসলমানদের অন্তরে যে দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষোভ ছিল, তা উদ্দেশ্য। পরবর্তী বাক্য فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ –এই অর্থের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। والله أعلم

২. فتحًا قريبًا– দ্বারা 'খায়বার-বিজয়' উদ্দেশ্য, যা হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হয়। এবং তাতে প্রচুর গনীমতের সম্পদও লাভ হয়, যার ফলে সাহাবীরা তৃপ্ত হয়ে যান।

৩. অর্থাৎ তিনি নিজ ক্ষমতাবলে ও হেকমতগুণে খায়বারের যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য হুদায়বিয়ার (সন্ধির) ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। আর এই ধরনের ব্যাপার মক্কা বিজয় ও হুনায়নেও সংঘটিত হয়েছিল।

৪. অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রচুর গনীমতের মাল লাভ হবে, তা থেকে এক অংশ এখনই খায়বার যুদ্ধে তোমাদের দিয়ে দিলেন।

৫. অর্থাৎ ব্যাপক যুদ্ধ হতে দেননি। তাছাড়া হুদায়বিয়া কিংবা খায়বারে কাফেরদের হাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে দেননি এবং তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের পরিবার-পরিজন ইত্যাদির উপর কেউ অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

কর) এবং যাতে এটা মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়[১] এবং যাতে তিনি তোমাদের সরলপথে পরিচালিত করেন[২]।

وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

২১. (তিনি তোমাদের জন্য রেখেছেন) আরো গনীমত, যা তোমরা (এখনো) হস্তগত করতে পারনি। (তবে) আল্লাহ তা নিজ আয়ত্তে রেখেছেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে শক্তিমান[৩]।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

২২. যদি কাফেররা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত, তবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। অতঃপর ওরা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পেত না[৪]।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾

২৩. এ-ই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চলে এসেছে। আর আপনি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবেন না[৫]।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

---

১. অর্থাৎ যাতে মুসলিমগণ বুঝতে পারে, আল্লাহর কুদরত কত বড় এবং তাঁর দরবারে তাদের মর্তবা কত উচ্চ! এবং যেন বোঝে, ঠিক এভাবে ভবিষ্যতের ওয়াদাসমূহও অবশ্যই পূর্ণ হবে।

২. অর্থাৎ এতে আল্লাহর ওয়াদাসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস হবে এবং তাঁর অসীম কুদরতের উপর ভরসা হবে। ফলে আরো অধিক আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর উৎসাহ পয়দা হবে। এটাই সরল পথ।

৩. অর্থাৎ এই বায়আতের বিনিময়ে তো খায়বার-বিজয় দান করেছেন। আর (أخرى তথা) মক্কা বিজয়– যা তখনো অর্জিত হয়নি– তাও যেন লাভ হয়েই গেছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার ওয়াদা করে ফেলেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণের জগতে মক্কা বিজয় ছিল এই হুদায়বিয়া সন্ধিরই ফসল।

৪. অর্থাৎ যুদ্ধ হলে তোমরাই বিজয় লাভ করতে এবং কাফেররা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করত। তখন কেউ সাহায্য করে বিপদ থেকে ওদের রক্ষা করতে পারত না। কিন্তু আল্লাহর হেকমতের দাবি ছিল, এখনকার মত সন্ধি হয়ে যাওয়া এবং এর মহৎ বরকত দ্বারা মুসলমানদের উপকার হওয়া (তাই আল্লাহ যুদ্ধ হতে দেননি)।

৫. অর্থাৎ হকপন্থী ও মিথ্যাপূজারীদের মধ্যে কোন চূড়ান্ত লড়াই হলে অবশেষে হকপন্থীদের বিজয়ী করা হয়, আর মিথ্যাপূজারীদের পরাজিত ও আল্লাহর রহমত থেকে বিদূরিত করা হয়।

২৪. আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি মক্কা শহরের মধ্যে ওদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত ওদের থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন– ওদের উপর তোমাদের প্রবল করার পর[১]। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন[২]।

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝

২৫. ওরাই তারা, যারা কাফের হয়েছে, তোমাদের মসজিদুল হারামে (যেতে) বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুকেও বাধা দিয়েছে যথাস্থানে পৌঁছতে[৩]। আর যদি কিছু ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী সম্পর্কে –যাদের তোমরা জান না– এ আশঙ্কা না থাকত যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদের পিষ্ট করে ফেলবে, ফলে তাদের কারণে তোমাদের

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ

আল্লাহর এই নিয়ম পূর্ব থেকে চলে আসছে, যার মধ্যে কোনোই পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম হয় না। তবে শর্ত এই যে, হকপন্থীদের সামগ্রিকভাবে পূর্ণরূপে হকের উপর কায়েম থাকতে হবে।

আর কোনো কোনো তাফসীরকার وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا- এর এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর নীতিকে অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ম ও তাকদীর অনুযায়ী যা হওয়ার ছিল, তা হতে না দেওয়ার সাধ্য কারো নেই।

১. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাগে পেলে শহীদ করে দেবে অথবা কোনো মুসলমানকে একাকী পেলে নির্যাতন করবে– এ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের কয়েকটা দল হুদায়বিয়াতে পৌঁছেছিল। কিছু হামলা করেওছিল। এমনকি, একজন মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে এবং উত্তেজনাকর বাক্যাবলি ব্যবহার করে। পরিশেষে সাহাবীরা ওদের জীবিত পাকড়াও করে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করেন। তিনি ওদের ক্ষমা করে দেন, কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

আলোচ্য আয়াতে এ ধরনের ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর بِبَطْنِ مَكَّةَ বলতে 'শহরের নিকটে' উদ্দেশ্য, যেন শহরের ভেতরে।

২. অর্থাৎ ওদের দুষ্কৃতি আর তোমাদের ক্ষমা ও ধৈর্য– সবকিছু আল্লাহ দেখছেন।

৩. অর্থাৎ হারাম শরীফের যে স্থানে নিয়ে গিয়ে যবেহ করার সাধারণ নিয়ম, সেই স্থানে কুরবানীর জন্তুগুলিকে ওরা পৌঁছতে দেয়নি। ফলে তা হুদায়বিয়াতেই আটকা পড়ে থাকে।

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

উপর অকল্যাণ পতিত হবে– (তবে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হত)। (কিন্তু তা করা হয়নি), যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করেন[১]। যদি তারা আলাদা হয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যকার কাফেদের আমি অবশ্যই যাতনাদায়ক আযাব দিতাম[২]।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

২৬. (স্মরণ করুন), যখন কাফেররা নিজেদের অন্তরে জিদকে স্থান দিল– জাহেলিয়াতের জিদ। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি ও মুমিনদের প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন[৩]

---

১. কিছু মুসলমান নর-নারী নির্যাতিত ও নিগৃহীত অবস্থায় মক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরা তাদের সম্পর্কে পুরাপুরি জানত না। তো যুদ্ধে তারা অজ্ঞাতসারে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে এখনই যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হত। কিন্তু এমনটি হলে তোমরা নিজেরাই এই জাতীয় ক্ষতির জন্য অনুতপ্ত হতে এবং কাফেরদের পক্ষে এ কথা বলার সুযোগ হত, দেখ! মুসলমানরা মুসলমানদেরও ছাড়ে না। এ সমস্যার কারণে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হয়, যাতে সেই মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে এবং এই অতুলনীয় ধৈর্য ও সহনশীলতার ফলে আল্লাহ তোমাদের প্রতি নিজ রহমত নাযিল করেন। অধিকন্তু কাফেরদের মধ্যে যারা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার ছিল, তাদেরকেও যুদ্ধের বিপদসংকুল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করে নিজ রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেন।

হযরহ শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ ঘটনার মধ্যে আগাগোড়া সমস্ত একগুঁয়েমি ও কাবা শরীফের অমর্যাদা হয়েছিল মুশরিকদের দ্বারাই। মুসলিমগণ তার মর্যাদা রক্ষা করেছিল। ওরা (মুশরিকরা) উমরাকারীদের বাধা দিয়েছিল এবং কুরবানীর জন্তুসমূহকে যথাস্থানে পৌছতে দেয়নি। অতএব সেই স্থানটি (মক্কা) মুসলমানদের হাতে সে সময়েই বিজিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু তখন মক্কায় অভিযান চালালে সেখানে গোপনভাবে বসবাসরত কিছু মুসলমান নর-নারী এবং ভবিষ্যতে মুসলমান হবে– এমন কিছু লোক পিষ্ট হয়ে যেত। পরিশেষে দু বছরের সন্ধির ফলে যত লোক মুসলমান হওয়ার ছিল, তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং যারা মুসলমান হওয়ার ছিল না, তারা স্পষ্ট হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা মক্কা বিজয় করিয়ে দিলেন।'

২. অর্থাৎ কাফেররা যদি মুসলমানদের থেকে পৃথক থাকত এবং মুসলমানরা ওদের মধ্যে মিলেমিশে না থাকত, তবে তোমরা দেখে নিতে, আমি মুসলমানদের হাতে কাফেরদের কেমন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করি।

৩. 'জাহেলিয়াতের জিদ' এই যে, এ বছর উমরা করতে দেব না এবং যে মুসলমান মক্কা থেকে হিজরত করে (মদীনায়) যাবে, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। আগামী বছর উমরা করতে

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۲۶﴾

এবং তাদেরকে তাকওয়ার 'বাণী'-র উপর অবিচল রাখলেন; আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও এর উপযুক্ত। আল্লাহ সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত[১]।

[রুকূ - ৪]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِیْنَ ۙ مُحَلِّقِیْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِیْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ

২৭. নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন, যা সম্পূর্ণ যথার্থ। (তা এই যে), আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে– তোমাদের কতক স্বীয় মাথা মুণ্ডাবে ও কতক (চুল) ছাঁটবে, তোমরা কোন ভয় করবে না[২]।

আসলে তিনদিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করা যাবে না এবং স্বাধীনভাবে অস্ত্রশস্ত্র আনবে না। সন্ধিপত্রে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখবে না এবং 'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ'এর স্থলে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিলেন এবং মুসলমানরা কঠিন দ্বিধা-সংকোচ ও অস্থিরতা সত্ত্বেও নবীজীর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত এই ফয়সালার ব্যাপারে তাঁদের অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেল।

১. অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহর ভয়ে নাফরমানীর পথ থেকে বেঁচে রইলেন এবং দৃঢ়তার সাথে কাবা শরীফর মর্যাদা কায়েম রাখলেন। আর তাঁরা তো এমনই করবেন। কারণ, তাঁরা দুনিয়াতে এক আল্লাহর খাঁটি ইবাদতকারী এবং কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর প্রকৃত ধারক-বাহক ছিলেন। যে পরিপক্ক একত্ববাদী এবং পয়গম্বরের ভক্ত-অনুরক্ত, সেই নিজ আবেগ ও অনুরাগকে প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর শা'আইর তথা নিদর্শনসমূহের মর্যাদা রক্ষার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারে। আর প্রকৃত তাওহীদ এ-ই যে, মানুষ তার একমাত্র মালিকের হুকুম শুনে নিজ মান-অপমানের চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করবে। সম্ভবত এ জন্যই হাদীসে (তিরমিযী, ৩২৬৫) كَلِمَةُ التَّقْوٰى এর তাফসীর لا إله إلا الله দ্বারা করা হয়েছে। কেননা, সকল তাক্ওয়া ও পবিত্রতার ভিত্তি এ কালিমাই। আর এরই ধারক-বাহক হওয়া এবং এর হক আদায় করার জন্য আল্লাহ সাহাবায়ে কেরামকে নির্বাচন করেছিলেন। কারণ, আল্লাহর ইলমে তাঁরাই ছিলেন এর যোগ্য-উপযুক্ত।

২. সূরার প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে, মদীনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং মাথা মুণ্ডন করে ও চুল ছেঁটে (এহরাম থেকে) হালাল হচ্ছেন। ঘটনাক্রমে সে বছরই হুযূরের উমরা করার ইচ্ছা হল। সাহাবীগণ ব্যাপকভাবে এই ধারণাই করলেন যে, সে বছরই তাঁরা মক্কায় যাবেন এবং উমরা আদায়

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾

বস্তুত আল্লাহ সেসব বিষয় জানেন, যা তোমরা জান না। অতএব তিনি তার পূর্বে এক আসন্ন বিজয় স্থির করে দিয়েছেন[১]।

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ

২৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে সরল পথ ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন[২], যাতে তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন[৩]।

করবেন। কিন্তু যখন সন্ধি সম্পূর্ণ হয়ে হুদায়বিয়া থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন কোনো কোনো সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আপনি তো বলেছিলেন যে, আমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করব এবং উমরা করব? তিনি বললেন, আমি কি এও বলেছিলাম যে, এ বছরই তা ঘটবে? তারা আরয করলেন, না। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে নিশ্চয় এমন হবেই হবে। তোমরা নিরাপদে মক্কায় পৌছে বাইতুল্লাহর তওয়াফ করবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ মাথা মুণ্ডন করে আর কেউ চুল ছেঁটে এহরাম খুলবে। মক্কায় যাওয়ার পর কোনো ধরনের ভয়-ভীতি হবে না। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে হুদায়বিয়ার পরবর্তী বছর এমনই হল। (তাফসীরে তবারী ২১/৩১৬-৩১৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২১৫)

আলোচ্য আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

তবে আয়াতে যে إن شاء الله বলা হল, এর উদ্দেশ্য ইমাম ইবনে কাসীর (র)-এর মতে 'তাহকীক' ও 'তাওকীদ' অর্থাৎ বিষয়টি জোরদার করা। আর ইমাম 'সীবাওয়াইহ' এর মতে এমন বাক্‌ভঙ্গি সেখানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে কোন বিষয় সংঘটিত করা উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু তা যে অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা প্রকাশ করা কোন কারণে ইচ্ছায় থাকে না।

১. অর্থাৎ, অতঃপর আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ঘটনাসমূহ ঘটতে থাকল। তিনি জানতেন যে, এক বছর পর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার মধ্যে বহু কল্যাণ রয়েছে, যা তোমাদের জানা নেই। এ জন্যই সেই বছর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেননি। আর এর বাস্তবায়নের পূর্বে অনতিবিলম্বে একটি বিজয় দান করলেন– অর্থাৎ খায়বার-বিজয়। অথবা হুদায়বিয়ার বিজয় উদ্দেশ্য, যাকে সাহাবীরা فتح مبين বলতেন, যেমন এই সূরার প্রথম টীকায় আমরা বিস্তারিত লিখেছি।

২. অর্থাৎ মৌলিক ও শাখাগত বিষয়াদি এবং আকীদা-বিশ্বাস ও বিধি-বিধানের হিসাবে এ দীনই সত্য এবং এ পথই সরল, যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন।

৩. এই দীনকে আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক জগতে শত শত বছর পর্যন্ত সকল ধর্মের উপর বিজয়ী রেখেছেন এবং মুসলমানরা সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী বিরাট শান-শৌকতের সাথে রাজত্ব করেছে। ভবিষ্যতেও কিয়ামতের নিকটবর্তী একটি সময়ে জগৎজুড়ে

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

আর সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট[১]।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সঙ্গে আছে, তারা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর[২], পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল[৩]। তুমি তাদের দেখবে রুকূ ও সেজদারত অবস্থায়; তারা অন্বেষণ করে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি[৪]। তাদের নিদর্শন তাদের চেহারায়- সেজদার প্রভাবে[৫]।

সত্য দীনের রাজত্ব কায়েম হবে। আর দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে তো ইসলাম ধর্ম সর্বযুগেই বিজয়ী রয়েছে এবং রইবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ এই দীনের সত্যতার সাক্ষী এবং তিনিই স্বীয় কর্মের মাধ্যমে (বাস্তব জগতে) এই দীনের সত্যতা প্রমাণ করে দেখাবেন।

২. অর্থাৎ কাফেরদের মোকাবেলায় খুব মজবুত ও শক্তিশালী। যার ফলে কাফেরদের উপর প্রভাব পড়ে এবং এতে কুফরের প্রতি তাদের ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً (এবং ওরা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। -তওবা, আয়াত ১২৩)- অন্যত্র (তওবা, ৭৩) বলেন- واغْلُظْ عَلَيْهِمْ (এবং ওদের প্রতি কঠোর হোন।) আরো বলেন- أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (তারা মুসলমানদের প্রতি কোমলহৃদয়, কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর। -মায়েদা, আয়াত ৫৪)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যে কঠোরতা ও নম্রতা স্বভাবগত, তা সর্বত্র সমানতালে চলে। আর যে কঠোরতা ও নম্রতা ঈমানের দ্বারা পরিশোধিত, সেই কঠোরতাও যথাস্থানে ও নম্রতাও যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়।'

বিজ্ঞ আলেমগণ লিখেছেন, শরী'য়তসম্মত কল্যাণ থাকলে কোনো কাফেরের প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করায় কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু দীন-ধর্মের ব্যাপারে ওরা যেন তোমাদের শিথিল মনে না করে।

৩. অর্থাৎ নিজের ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও মেহেরবান। তাদের সামনে বিনীত এবং তাদের সাথে বিনয় ও ভদ্রতার আচরণকারী। হুদায়বিয়াতে সাহাবীদের মধ্যে এই দুটি চরিত্রই প্রস্ফুটিত হচ্ছিল- أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

৪. অর্থাৎ তারা অধিক মাত্রায় নামায পড়ে। যখনই তাদের উপর নজর পড়বে, দেখবে- রুকূ' ও সেজদায় পড়ে আল্লাহর সামনে অত্যন্ত এখলাসের সাথে বন্দাত্বের দায়িত্ব আদায় করছে। তাতে রিয়া ও লোক দেখানোর নাম-গন্ধও নেই। আছে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের বাসনা।

৫. অর্থাৎ নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকায়, বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযে পড়ে থাকার ফলে তাদের চেহারার মধ্যে বিশেষ ধরনের নূর ও উজ্জ্বলতা রয়েছে। আল্লাহ-ভীতি, খুশূ'-খুযূ,

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ

তাদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তাওরাতে[১]। আর ইঞ্জিলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে: যেমন ক্ষেত*, যে নিজ চারা উৎপন্ন করল। অতঃপর তাকে শক্ত করল, তারপর তা মোটা হল। অতঃপর নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল[২] যে, চাষীদের আনন্দ দান করে[৩]। (তাঁদেরকে এসব গুণাবলি এজন্য দান করা হয়েছে), যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা

উত্তম নিয়ত ও এখলাসের কিরণমালা যেন ভেতর থেকে পরিস্ফুটিত হয়ে বহিরাঙ্গনকে আলোকিত করছে। চেহারার নূর এবং তাকওয়া-নির্ভর চাল-চলনের কারণে লোকের ভিড়েও সাহাবায়ে কেরামকে আলাদা করে চেনা যেত।

১. অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে (যেমন তাওরাতে- অনুবাদক) সর্বশেষ নবীর সাহাবীদের এ গুণাবলিই বর্ণিত হয়েছে। সেজন্য বহু নিরপেক্ষ আহলে কিতাব তাঁদের চেহারা ও আচার-ব্যবহার দেখামাত্র বলে উঠতেন- আল্লাহর কসম, এরা তো ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী বলেই মনে হচ্ছে।

★ দ্বিতীয় তরজমা- 'তাদের এ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে। তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে: যেমন ক্ষেত...'।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) এই উদাহরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন, 'অর্থাৎ প্রথমে এই দীনে একজন মানুষ ছিলেন। পরে দুজন হলেন। এরপর ধীরে ধীরে শক্তি বাড়তে থাকে- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে, তারপর খলীফাদের আমলে।'

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন, أَخْرَجَ شَطْأَهُ -তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খেলাফতকাল, فآزه এর মধ্যে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খেলাফতকাল, فَاسْتَغْلَظَ এর মধ্যে হযরত উছমান (রা)-এর খেলাফতকাল এবং فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِه এর মধ্যে হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতকালের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আর অন্য কোন কোন বুযুর্গ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا -কে যথাক্রমে চার খলীফার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন।

তবে সঠিক কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের পুরো জামাতের সামগ্রিক প্রশংসা ও স্তুতি। বিশেষত بيعة رضوان -এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের, যাঁদের আলোচনা সূরার প্রথম থেকে চলে আসছে। والله أعلم

৩. কৃষকরা যেহেতু কৃষি বিষয়ে পারদর্শী হয়ে থাকে, এজন্য বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে জিনিসকে তার অভিজ্ঞ-পারদর্শী ব্যক্তি পছন্দ করে, তাকে অন্যরাও অবশ্যই পছন্দ করবে।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۝

কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন[১]। আর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমার ও বিরাট ছওয়াবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[২]।

১. অর্থাৎ ইসলামী ফসলের এই সজীবতা, শোভা-সৌন্দর্য ও বসন্তকাল দেখে কাফেরদের অন্তর ক্রোধ ও হিংসায় জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়।

এই আয়াত থেকে কোনো কোনো আলেম এই (মাসলা) বের করেছেন যে, সাহাবীদের প্রতি যাদের অন্তর জ্বলে, তারা কাফের।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ প্রতিশ্রুতি তাদের দেওয়া হয়েছে, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবী এমনি ছিলেন। তবে না জানি মৃত্যু কী অবস্থায় হয়, এই ভয়ে শঙ্কিত হওয়ার ব্যবস্থা আয়াতে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এমন পরিষ্কার সুসংবাদ দেন না, যাতে তারা নির্ভয় হয়ে যায়। তবে প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে এতটুকু প্রশংসাও সৌভাগ্যের বিষয়।'

সূরা হুজুরাত

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৪৯ । ১৮ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

آياتها ١٨، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

১. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে অগ্রবর্তী হয়ো না[১] এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[২]।

---

১. অর্থাৎ যে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে হুকুম পাওয়ার আশা আছে, সে বিষয়ে অগ্রগামী হয়ে নিজ বিবেচনা অনুসারে ফয়সালা করো না; বরং আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা কর। আর যখন পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম কিছু ইরশাদ করেন, তখন চুপ করে মনোযোগ দিয়ে শোন। তিনি বলার আগে নিজে বলার দুঃসাহস করো না। তদ্রূপ তাঁর পক্ষ থেকে যে হুকুম পাওয়া যায়, সে অনুযায়ী বিনাপ্রশ্নে নির্দ্বিধায় আমল কর। নিজ স্বার্থ, কামনা ও মতামতকে তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে অগ্রগামী করো না; বরং নিজ কামনা-বাসনা ও আবেগ-অনুভূতিকে আসমানী হুকুম-আহকামের অনুসারী বানাও।

বি. দ্র. আলোচ্য সূরাতে মুসলমানদেরকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আদব ও তাঁর হকসমূহ এবং নিজ মুসলমান ভাইদের সঙ্গে প্রীতিমধুর সম্পর্ক কায়েম রাখার তরীকা শেখানো হয়েছে। আর এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, কী কী মূলনীতি মেনে চললে মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্ক মজবুত ও দৃঢ় থাকবে। এবং কখনো এতে সমস্যা ও ভাঙন পয়দা হলে তার প্রতিকারই বা কী? অভিজ্ঞতা বলে, অধিকাংশ বিবাদ-বিসংবাদ ও সংঘর্ষ সেখানে সংঘটিত হয়, যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপূজা বিদ্যমান থাকে। এর একমাত্র প্রতিকার এই যে, মুসলিমগণ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নির্দেশকে ব্যক্তিমত ও আত্মস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেবে। কেননা, তাঁদের আদেশ-নির্দেশ থেকে অধিক বরণীয় ও কল্যাণকর আর কিছু হতে পারে না।

এমনটি করাতে সাময়িকভাবে যত কষ্টই হোক না কেন, তার পরিণামে রয়েছে ইহ-পরকালের নিশ্চিত সম্মান ও সফলতা।

২. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের প্রকৃত আনুগত্য ও তাজীম তখনি সম্ভবপর হয়, যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে। যদি অন্তরে ভয় না থাকে, তবে ইসলামের দাবিকে সত্য প্রমাণ করার জন্য বাহ্যত আল্লাহ ও রাসূলের নাম বারবার মুখে আনবে এবং বাহ্যিকভাবে তাঁদের বিধি-বিধানকে সামনে রাখবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেসবকে নিজের আভ্যন্তরীণ কামনা-বাসনা ও স্বার্থ হাসিলের এক বাহানা ও ওসীলা বানাবে। তো স্মরণ থাকা দরকার, যা মুখে আছে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ۝

২. হে ঈমানদারগণ! নিজেদের আওয়াজ নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তাঁর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না, যেরূপ তোমরা একে অন্যের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, যাতে তোমাদের অজান্তে তোমাদের আমল নিষ্ফল না হয়ে যায়[১]।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

৩. যারা রাসূলুল্লাহর নিকট নিজেদের আওয়াজ নিচু রাখে তারাই এমন লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরগুলো যাচাই করে আদবের জন্য* মনোনীত করেছেন[২]।

আল্লাহ তা শুনেন এবং যা অন্তরে আছে তিনি তা জানেন। অতএব তাঁর কাছে উক্ত প্রতারণা চলতে পারে না। তাই মানুষের উচিত তাঁকে ভয় করে কাজ করা।

১. অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হট্টগোল করো না এবং তোমরা পরস্পরে যেমন একে অপরের সঙ্গে নিঃসংকোচে তর্জন-গর্জন করে কথা বল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তেমনভাবে কথা বলা আদবের খেলাফ। তাঁকে সম্বোধন করবে কোমলস্বরে, শ্রদ্ধাভরে, আদব ও ভদ্রতার সাথে। দেখার বিষয়, এক ভদ্র ছেলে নিজ পিতার সঙ্গে, উপযুক্ত শাগরেদ নিজ উস্তাদের সঙ্গে, খাঁটি মুরীদ তার পীর ও মুর্শেদের সঙ্গে এবং একজন সৈন্য তার অফিসারের সঙ্গে কীভাবে কথা বলে? পয়গম্বরের মর্যাদা তো এঁদের সকলের উর্ধ্বে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ না করুন, বেয়াদবী হয়ে গেলে এবং তিনি মনে কষ্ট পেলে– তাঁর অসন্তুষ্টির পর মুসলমানের স্থান কোথায়! এমতাবস্থায় সমস্ত আমল বিনষ্ট হওয়ার এবং সমস্ত মেহনত নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বি. দ্র. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর হাদীস পড়া ও শোনার সময়ও এরূপ আদবই অবলম্বন করতে হবে এবং তাঁর কবর শরীফের কাছে হাযির হলে সেখানেও এই আদব-সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তাকওয়ার জন্য'।

২. অর্থাৎ যারা নবীর মজলিসে বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে কথা বলে এবং নবীর আওয়াজের সামনে নিজেদের আওয়াজ নিচু রাখে, তারা এমন মানুষ, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা আদবের জন্য যাচাই করে নিয়েছেন এবং মেজেঘষে খাঁটি তাকওয়া ও পবিত্রতার জন্য তৈরি করে দিয়েছেন।

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ۝	তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান[১]।
اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۝	৪. যারা আপনাকে হুজরার পিছন থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশ বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে না।
وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝	৫. তারা যদি ধৈর্যধারণ করত আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত, তবে তাদের পক্ষে উত্তম হত। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[২]।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) তাঁর অমরগ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'-তে লেখেন, 'চারটি জিনিস আল্লাহর সর্ববৃহৎ নিদর্শনাদির অন্তর্ভুক্ত : (১) কুরআন, (২) পয়গম্বর, (৩) কাবা ও (৪) নামায। এগুলির ভক্তি-শ্রদ্ধা সেই ব্যক্তিই করবে, যার অন্তর তাকওয়া-পরহেজগারী দ্বারা সমৃদ্ধ। ইরশাদ হয়েছে– وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (আর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলির সম্মান করবে, তো এটি অন্তরের পরহেজগারীর বিষয়। –হজ, আয়াত ৩২)'—এখান থেকে বোঝা গেল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা যখন আদবের খেলাফ, তখন তাঁর আহকাম ও বাণীসমূহ শোনার পর সেগুলির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা কত ভয়াবহ অপরাধ হবে?

১. অর্থাৎ এমন ইখলাসের বরকতে এবং নবীজীর হক আদায় করার ফলে পিছনের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে যাবে এবং বিরাট বড় ছওয়াব লাভ করবে।

২. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

'বনু তামীম' নামক একটি গোত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তখন তিনি নিজ ঘরে তশরীফ রাখছিলেন। তারা বাইর থেকে يامحمد اخرج إلينا (হে মুহাম্মদ! বাইরে আসুন) বলে ডাকাডাকি শুরু করল। (তাফসীরে বাগাবী ৪/২১১)

এটা নির্বুদ্ধিতা ও অভদ্রতা ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। হয়ত তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল, অথবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সত্তা তো ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব সকল বিষয়ের কেন্দ্র। আর সময়ানুবর্তিতা না থাকলে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষেও কাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। (তাহলে নবীজীর সময়ানুবর্তিতা কেমন হবে? এ অবস্থায় তাঁকে ডাকাডাকি করার কী অর্থ?) তাছাড়া পয়গম্বরের আদব ও মর্যাদা রক্ষাও তো সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। (অতএব) তাদের উচিত ছিল, কারো দ্বারা মৌখিকভাবে ভিতরে খবর পাঠানো এবং তাঁর বাইরে তশরীফ আনা পর্যন্ত ধৈর্য ধরা। তিনি যখন বাইরে আগমন করে তাদের

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট যদি কোনো পাপী কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে কোন সম্প্রদায়ের উপর অজ্ঞতাবশত আক্রমন করে না বস; ফলে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য পরে অনুতপ্ত হতে হবে[১]।

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِيۡبُوۡا قَوۡمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰى مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِيۡنَ ⑥

৭. আর জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। তিনি যদি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্টে পড়বে[২]। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট

وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ فِيۡكُمۡ رَسُوۡلَ اللّٰهِ ؕ لَوۡ يُطِيۡعُكُمۡ فِىۡ كَثِيۡرٍ مِّنَ الۡاَمۡرِ لَعَنِتُّمۡ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيۡكُمُ

প্রতি মনোযোগ দিতেন, তখন তাঁকে সম্বোধন করা উচিত ছিল। এমন করা হলে তাদের পক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয় হত।

(والله غفور رحيم)–তবে নির্বুদ্ধিতা ও না-জানার কারণে কোনো বিষয় ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা তা নিজ মেহেরবানীতে ক্ষমা করেন। সুতরাং তাদের উচিত, নিজেদের ত্রুটির জন্য লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে এমন অসমীচীন পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা।

বস্তুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাজীম ও মহব্বতই সেই মৌলিক উৎস, যা মুসলিম জাতির সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি ও বিচ্ছিন্ন জযবাসমূহকে একীভূত করে এবং এটাই সেই ঈমানী বন্ধন, যার উপর ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ইমারত কায়েম রয়েছে।

১. অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ মিথ্যা সংবাদ দ্বারা শুরু হয়। এ জন্য প্রথমেই মতবিরোধ ও বিসংবাদের এই উৎসকে বন্ধ করার জন্য তালীম দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোনো সংবাদ যাচাই না করে অর্থাৎ সত্যাসত্য পরীক্ষা না করে গ্রহণ করো না। মনে কর, একটা বিভ্রান্ত লোক, যে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে, সে তার কোনো ভাবনা বা জযবা দ্বারা তাড়িত হয়ে কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তোমরা শুধু তার বর্ণনায় বিশ্বাস করে সেই সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে বসলে। পরে প্রকাশ পেল যে, সেই ব্যক্তি মিথ্যা বলেছিল। চিন্তা করে দেখ, তখন কতই না অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে এবং নিজেদের তাড়াহুড়ার জন্য কতই না লজ্জিত হতে হবে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এর ফলাফল কতই না খারাপ হবে।

২. অর্থাৎ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো সংবাদ বা অভিরুচি অনুযায়ী কাজ না করেন, তবে মন খারাপ করো না। সত্য মানুষের ইচ্ছা-আকাজ্ক্ষা বা মতামতের অনুগত হতে পারে না। এমন হলে আকাশ ও পৃথিবীরসমস্ত ব্যবস্থাপনাই এলোমেলো হয়ে যাবে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ (আর যদি সত্য ওদের খেয়াল-খুশীর অনুগত হত, তবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। –মুমিনূন, আয়াত ৭১)

ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন ও তোমাদের অন্তরে তা পছন্দনীয় করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপ ও নাফরমানীকে তোমাদের নিকট ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এরূপ লোকেরাই তো সৎপথপ্রাপ্ত–

الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۝

৮. আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে[১]। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[২]।

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৯. যদি মুসলমানদের দু'দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অন্য দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা সকলে সেই চড়াওকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ

মোটকথা, সংবাদাদি যাচাই করো এবং সত্যকে নিজেদের অভিরুচি ও মতের অনুগত করো না; বরং নিজেদের অভিরুচিকে সত্যের অনুগত রেখো। এতে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের মূল কর্তন হয়ে যাবে।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ গৃহীত না হলে মন খারাপ করো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ করেন আল্লাহ তাআলার হুকুমে, তাতেই তোমাদের মঙ্গল। তিনি যদি তোমাদের কথা মত চলেন, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থের কথা বলবে, তখন কার কথা রেখে কার কথা মানবেন?

১. অর্থাৎ তোমরা যদি এটাই চাও যে, পয়গম্বর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম তোমাদের প্রত্যেক কথা মেনে চলুন, তবে ভীষণ অসুবিধা হবে। কিন্তু আল্লাহর শোকর কর যে, তিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে অনুগত মুমিনদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং কুফর ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা ঢেলে দিয়েছেন। ফলে তারা এমন নিরর্থক বিষয়ের ধারেও যেতে পারে না। যে মজলিসে আল্লাহর রাসূল বিরাজমান, সেখানে অন্য কারো মত ও ইচ্ছার অনুসরণ কী করে হতে পারে!

আজ যদিও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু নবীজীর তালীম এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধিগণ নিশ্চয় বর্তমান আছেন ও থাকবেন।

২. অর্থাৎ তিনি সকলের যোগ্যতা সম্বন্ধে অবগত এবং প্রত্যেককে নিজ হেকমত অনুযায়ী এমন অবস্থা ও মর্যাদা দান করেন, যা তার যোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ।

فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَاَقۡسِطُوۡا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُقۡسِطِيۡنَ ⑨

আসে, তবে উভয় দলের মধ্যে ন্যায়ের সাথে মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন[১]।

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ فَاَصۡلِحُوۡا بَيۡنَ اَخَوَيۡكُمۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ⑩

১০. মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়[২]।

---

১. অর্থাৎ বিবাদ-বিসংবাদকে প্রতিরোধের এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি ঘটনাক্রমে মুসলমানদের দুটি দল পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তাদের মতবিরোধ দূর করার পূর্ণ চেষ্টা কর। এতে সফল না হলে এবং কোনো দল অপর দলের উপর চড়াও হতে থাকলে এবং অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করতেই সচেষ্ট হলে তোমরা চুপচাপ বসে থেকো না; বরং যাদের দ্বারা বাড়াবাড়ি হবে, সকল মুসলমান মিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না সেই দল নিজেদের বাড়াবাড়ি থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি রুজু হয়ে সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়। তখন তোমাদের উচিত, উভয় দলের মধ্যে সমতা ও ইনসাফের সাথে সন্ধি ও বন্ধুত্ব করে দেওয়া, কোনো এক দলের পক্ষপাতিত্ব করে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়া।

শানে নুযূল

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস অনুযায়ী আনসারদের দুটি দল 'আউস' ও 'খাযরাজ'-এর একটি হাঙ্গামা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত অনুসারে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৬৬– বুখারী ও মুসলিমে আউস ও খাযরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তাতে মুনাফিক দলের সাথে কতক সাহাবীর বিবাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে– والله أعلم)

যারা মুসলিম খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তাদের ক্ষেত্রেও এই আয়াতের প্রয়োগ হবে। তাই তো অতীত থেকেই পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম বিদ্রোহের বিষয়ে এ আয়াত দ্বারাই প্রমাণ পেশ করে এসেছেন। কিন্তু শানে নুযূল থেকে যেমনটি প্রকাশ পায়, এ নির্দেশ মুসলমানদের সকল ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ-বিসংবাদে প্রযোজ্য।

বিদ্রোহীদের সম্পর্কে শরয়ী আহকামের বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ সন্ধি হোক বা দ্বন্দ্ব উভয় অবস্থায় মনে রাখতে হবে যে, এখানে সন্ধি বা দ্বন্দ্ব দু'ভাইয়ের মধ্যে। অতএব শত্রুদের ন্যায় বা কাফেরদের ন্যায় আচরণ করা যাবে না। বরং যখন দু'ভাই পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন তাদের এ অবস্থায় ছেড়ে দিয়ো না; বরং পরস্পরের মধ্যে সংশোধনের পূর্ণ চেষ্টা করবে। আর এমন প্রচেষ্টা করার সময় আল্লাহকে ভয়

[রুকূ - ২]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا خَيۡرًا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنۡ يَّكُنَّ خَيۡرًا مِّنۡهُنَّ ۚ وَلَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ ؕ

১১. হে ঈমানদারগণ! পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের উপহাস না করে। হতে পারে, এরা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। এবং মেয়েরাও যেন অন্য মেয়েদের উপহাস না করে। হতে পারে, এরা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না[১]।

করতে থাকবে, যাতে কারো অন্যায় পক্ষপাতিত্ব অথবা প্রতিশোধমূলক মানসিকতার ভিত্তিতে কাজ না করা হয়।

১. পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ বন্ধ করার উপায়-পন্থা বাতলানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যদি ঘটনাক্রমে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে জোরদার ও কার্যকর উপায়ে তা প্রতিরোধ করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ ঝগড়া-বিবাদের পরিসমাপ্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ কমপক্ষে পরস্পরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব যাতে বেশি তীব্র না হয় সেই চেষ্টা করতে হবে।

সাধারণত দেখা যায়, দুই ব্যক্তি বা দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ হলে একে অপরের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করতে শুরু করে। সামান্য সুযোগ হাতে এল, অমনি হাসি-ঠাট্টা করতে আরম্ভ করল। অথচ তার জানা নেই যে, যাকে সে উপহাস করছে হয়ত সে আল্লাহর নিকট তার চেয়ে ভাল। বরং অনেক সময় সে নিজেও মতবিরোধের আগে তাকে ভাল মনে করত। কিন্তু জেদ ও স্বার্থের সময় অপরের চোখের ধূলিকণাও নজরে আসে, নিজের চোখের কড়িকাঠও নজরে আসে না। এভাবে ঘৃণা ও শত্রুতার পরিধি দিন দিন বাড়তে থাকে এবং অন্তরসমূহের মধ্যে দূরত্ব এতই বেড়ে যেতে থাকে যে, সন্ধি ও মিলনের কোনো আশাই অবশিষ্ট থাকে না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এসব বিষয়ই নিষেধ করে বলেছেন যে, একদল অপরদলকে উপহাসও করো না, একে অন্যের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও করো না, দোষান্বেষণও করো না, মন্দ নামে ও মন্দ উপাধিতে বিরোধী পক্ষকে উল্লেখ করো না। কারণ, এতে শত্রুতা ও ঘৃণা বৃদ্ধি পায় এবং ফেতনা-ফাসাদের আগুন প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

সুবহানাল্লাহ! কী মূল্যবান হেদায়াত। আজ মুসলমানেরা বুঝলে দেখতে পেত, তাদের সবচেয়ে বড় রোগের (অনৈক্য) পরিপূর্ণ এলাজ এই এক সূরা 'হুজুরাত'-এর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ⑪

ঈমানের পর 'পাপ' কতই না নিকৃষ্ট নাম[১]! আর যারা তওবা না করে, তারাই অন্যায়কারী[২]।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক অনুমান থেকে বেঁচে থাক; নিশ্চয় কতক অনুমান গোনাহ। এবং (কারো) গোপন বিষয় অন্বেষণ করো না এবং একে অপরের গীবত করো না[৩]।

---

১. অর্থাৎ কারো মন্দ নাম রটিয়ে মানুষ নিজেই পাপী হয়। সেই ব্যক্তির বদনাম হোক বা না হোক, সে নিজে অসভ্য, ফাসেক-ফাজের, মানুষকে কষ্ট প্রদানকারী, প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়ে যায়। চিন্তা করার বিষয়, 'মুমিন'- এই উত্তম উপাধির পর উক্ত অভদ্র নাম কি ভাল লাগতে পারে?

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, যখন এক ব্যক্তি ঈমান আনল ও মুসলমান হয়ে গেল, তখন তাকে ইসলামপূর্ব বিষয়াদির জন্য খোঁটা দেওয়া কিংবা তখনকার নিকৃষ্ট উপাধিতে স্মরণ করা- যথা ইহুদী বা নাসরানী প্রভৃতি বলে ডাকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তেমনি কোন ব্যক্তি নিজ ক্ষমতাবহির্ভূত কোনো দোষে লিপ্ত অথবা এক গোনাহ থেকে সে তওবা করেছে, এমতাবস্থায় তাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এর উল্লেখ করাও জায়েয নয়।

২. অর্থাৎ যা আগে হয়ে গেছে, এখন তা থেকে তওবা করে নাও। যদি এসব হুকুম ও নসীহত শোনার পরও পূর্বের অপরাধসমূহ থেকে তওবা না করল, তবে এরাই আল্লাহর নিকট প্রকৃত জালেম সাব্যস্ত হবে।

৩. এই বিষয়গুলো পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এক পক্ষ অপর পক্ষ সম্বন্ধে এমন কুধারণা করে বসে যে, সুধারণার কোনো অবকাশই থাকে না। প্রতিপক্ষের যে কোনো কথা হোক, তার অর্থকে নিজেদের বিরোধী মনে করে বসে। সেই কথাতে ভাল অর্থের হাজারো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একটি মাত্র দিক যদি মন্দের বের হয়ে আসে, তবে ওই মন্দ দিকটির প্রতিই মন ধাবিত হয় এবং সেই একটি মন্দ ও দুর্বল দিকটিকে অকাট্য ও নিশ্চিত সাব্যস্ত করে প্রতিপক্ষের প্রতি সমূহ অপবাদ ও দোষারোপ করতে শুরু করে। আর শুধু এটাই নয় যে, ঘটনাক্রমে প্রতিপক্ষের একটি বিষয় হাতে এসে গেল, আর বদগুমানী করে তার ভুল অর্থ করা হল। না, এখানেই ক্ষান্ত থাকা হয় না; বরং বিপক্ষের গোপন কথা জানার চেষ্টা করা হয়, যাতে করে রং-চং মাখিয়ে কথাটিকে বড় করা যায় এবং তার গীবত করে নিজেদের আসর গরম করা যায়।

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ۝

তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণাই কর[১]। আর আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল*, পরম মেহেরবান[২]।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই বেশি মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী[৩]।

কুরআন কারীম এ সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় নিষেধ করেছে। মুসলমানরা কুরআনের উপদেশ মোতাবেক আমল করলে, দুর্ভাগ্যবশত মতবিরোধ ঘটে গেলেও তা সীমা অতিক্রম করতে পারবে না এবং তার ক্ষতি অনেক সীমিত হয়ে যাবে; বরং কিছুদিনের মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অপবাদ দেওয়া, গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং পশ্চাতে মন্দ বলা কোন অবস্থাতেই ভাল নয়; কিন্তু যেখানে তাতে কোন দীনী ফায়দা থাকে এবং নিজের স্বার্থ না থাকে, সেখানে অনুমতি আছে। যেমন: হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। কেননা, এ ছাড়া হাদীসের হেফাজত করা অসম্ভব ছিল।

১. অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা এমন কদর্য ও ঘৃণ্য কাজ, যেমন কেউ নিজ মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কোনো মানুষ এটা পছন্দ করবে কি? নিশ্চয় না। বুঝে নাও, গীবত এর চেয়েও ন্যাক্কারজনক কাজ।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তওবা কবুলকারী'।

২. অর্থাৎ এসব নসীহত সে-ই পালন করবে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। তা না থাকলে কিছুই নেই। অতএব ঈমান ও ইসলামের দাবিদারদের উচিত, সত্যিকারভাবে সেই পরাক্রমশালীর গযবকে ভয় করা এবং এরূপ নিকৃষ্ট কার্যকলাপের নিকটবর্তী না হওয়া। আর পূর্বে কিছু ভুলত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকলে আল্লাহর নিকট খাঁটি অন্তরে তওবা করা উচিত। তিনি নিজ মেহেরবানীতে মাফ করে দেবেন।

৩. অধিকাংশ গীবত, অপবাদ, বিদ্রূপ ও দোষান্বেষণের কারণ গর্ব-অহংকার। অর্থাৎ মানুষের নিজেকে বড় এবং অন্যদের ছোট মনে করা। এ জন্যই তাকে বলা হচ্ছে যে, আসলে মানুষের বড়-ছোট বা মর্যাদাবান-অমর্যাদাবান হওয়া জাতি, গোত্র ও বংশ-গোষ্ঠীর ভিত্তিতে

আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত[১]।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۝

১৪. দেহাতীরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি। তোমরা বরং বল, 'আমরা মুসলমান হয়েছি'। আর ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি[২]। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ

নয়। বরং যে ব্যক্তি যত বেশি নেক স্বভাববিশিষ্ট, ভদ্র ও পরহেজগার, সে ততই আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

বংশের সারকথা তো এই যে, সমগ্র মানবগোষ্ঠী এক পুরুষ ও এক নারী অর্থাৎ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর সন্তান-সন্ততি। শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান এবং সিদ্দীকী, ফারুকী, উসমানী ও আনসারী– সকলেরই ধারা আদম ও হাওয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। এসব জাতি ও বংশ আল্লাহ তাআলা শুধু পরস্পর পরিচয়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন। অবশ্য কাউকে আল্লাহ তাআলা কোনো অভিজাত ও সম্মানিত পরিবারে পয়দা করে থাকলে এ একটি দানকৃত আভিজাত্য– যেমন: কাউকে সুন্দর বানিয়ে দেওয়া। কিন্তু এটা গৌরব ও অহংকার করার কারণ নয় যে, একেই কামাল (Perfection) ও ফযীলতের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হবে এবং অন্যদের নিচু মনে করা হবে। বরং শোকর করা উচিত যে, তিনি চেষ্টা ও পরিশ্রম ছাড়াই আমাদের এ নে'য়ামত দান করেছেন। আর শোকরের একটা দিক এটাও যে, গর্ব ও অহংকার থেকে বিরত থাকবে এবং উক্ত নে'য়ামতকে নিচু স্বভাব ও মন্দ-চরিত্র দ্বারা নষ্ট হতে দেবে না।

যা হোক, আভিজাত্য ও মান-সম্মানের আসল মাপকাঠি বংশ নয়, বরং তাকওয়া ও পরহেজগারী। বলা বাহুল্য, মুত্তাকী মানুষ অন্যদের ছোট মনে করতে পারে না।

১. অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহেজগারী আসলে দিলের বিষয়। যে ব্যক্তিকে বাহ্যত মুত্তাকী ও পরহেজগার দেখা যায়, আল্লাহই জানেন, সে প্রকৃতপক্ষে কেমন এবং ভবিষ্যতে কেমন থাকবে? إنما العبرة للخواتيم (শেষ অবস্থাই ধর্তব্য)।

২. ঈমান ও বিশ্বাস যখন পূর্ণরূপে অন্তরে বসে যায়, তখন গীবত ও দোষান্বেষণ প্রভৃতির অভ্যাস দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অন্যদের দোষ অন্বেষণে এবং তাদের গীবত করায় লিপ্ত হয়, বুঝে নিতে হবে, তার অন্তরে ঈমান এখন পর্যন্ত পূর্ণরূপে প্রোথিত হয়নি।

এক হাদীছে (তিরমিযী : ২১৫১) আছে– يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ('হে লোকসমাজ! যারা মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে ঈমান পৌঁছেনি, মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।' –ইবনে কাছীর ৮ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কেউ কেউ বলে, 'আমরা মুসলমান। অর্থাৎ আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। এতে দোষ নেই।' আর কেউ বলে, 'আমাদের পরিপূর্ণ

وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑭

রাসূলের অনুসরণ কর, তবে তিনি তোমাদের আমল থেকে কিছুই লাঘব করবেন না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[১]।'

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ⑮

১৫. ঈমানদার তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর সন্দেহে-সংশয়ে পড়েনি এবং আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা জেহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী[২]।

قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑯

১৬. আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দীনদারী সম্পর্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ জানেন– যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যা কিছু আছে যমীনে। এবং আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত[৩]।'

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ۭ قُلْ لَّا

১৭. তারা আপনার প্রতি এ অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান হয়েছে[৪]। আপনি বলুন,

---

বিশ্বাস রয়েছে।' তো বিশ্বাস যদি পূর্ণ থাকে, তবে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কোথায়? সত্যিই যার পূর্ণ ঈমান-ইয়াকীন রয়েছে, সে তো এমন দাবি করতে ভয় পায় ও লজ্জিত হয়।'

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াত থেকে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য প্রকাশ পায়। আর এটাই 'হাদীছে জিবরাঈল' প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত। আমরা মুসলিম শরীফের শরাহ ফাতহুল মুলহিম-গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।

১. অর্থাৎ এখনো যদি আনুগত্যের পথ অবলম্বন কর, তবে পিছনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তোমাদের কোনো আমলের ছওয়াবের মধ্যে কম করা হবে না।

২. অর্থাৎ খাঁটি মুমিনের শান এই যে, সে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং তাঁদের পথে সর্বতোভাবে জান ও মাল নিয়ে হাযির থাকে।

৩. অর্থাৎ সত্যিই যদি তোমাদের খাঁটি দীনদারী ও পূর্ণ বিশ্বাস থেকে থাকে, তবে তা বলে বেড়ানোর প্রয়োজন কী? ব্যাপারটি যাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তিনি নিজেই অবগত আছেন।

৪. কোনো কোনো গ্রাম্য লোক এসে বলত, আমরা তো বিনাযুদ্ধে নিজেরাই মুসলমান হয়ে গিয়েছি। এভাবে তারা যেন (রাসূলের প্রতি) অনুগ্রহ করেছে, এমন বুঝাতে চাইত। এর উত্তর সামনে দেওয়া হচ্ছে।

تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝١٧

'তোমরা ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করো না যদি তোমরা সত্যবাদী হও। বরং আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ প্রকাশ করছেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন[১]।'

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١٨

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সকল) গোপন বিষয় জানেন এবং আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড উত্তমরূপে দেখেন[২]।

---

১. অর্থাৎ যদি তোমরা ইসলাম ও ঈমানের দাবিতে সত্য হও, তবে এ তোমাদের অনুগ্রহ নয়; বরং আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলামের দ্বারা তোমাদের সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। যদি সত্য কথা বল, তবে ঘটনা এরূপই।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ভাল কাজ নিজে করে থাকলেও নিজের প্রশংসা নয়, বরং রবের প্রশংসা করা উচিত, যিনি সেই কাজ করিয়েছেন।'

যেন সূরার পরিসমাপ্তিতে সতর্ক করে দেওয়া হল যে, যদি কুরআনী হেদায়াত ও ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী তোমাদের আমল করার তাওফীক হয়, তবে অনুগ্রহ প্রকাশ করো না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও নে'য়ামতের শোকর আদায় কর, যিনি এমন তাওফীক সুলভে দান করলেন।

২. অর্থাৎ অন্তরের গোপন বিষয় ও প্রকাশ্য আমল– সবই আল্লাহ জানেন, তাঁর সামনে কথা বানিয়ো না।

সূরা ক্বাফ

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৫০ । ৪৫ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ①

১. ক্বাফ। মহামর্যাদাশালী কুরআনের কসম, (নিশ্চয় আপনাকে সতর্ককারীরূপে পাঠানো হয়েছে)।

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ②

২. ওরা তো এ কারণে বিস্মিত হয়েছে যে, ওদের নিকট ওদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছেন। তাই কাফেররা বলা শুরু করেছে, 'এ তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③

৩. 'যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব, (তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হব?) এ এক সুদূরপরাহত প্রত্যাবর্তন[১]।

১. অর্থাৎ কুরআনের মাহাত্ম্য ও মহামর্যাদা সম্বন্ধে বলে শেষ করা যাবে না। এ কিতাবের আগমন সকল আসমানী কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে এবং তার অলৌকিক শক্তি ও সীমাহীন জ্ঞান-গরিমা বিশ্ববাসীকে বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিয়েছে। এই মহামর্যাদাশালী কুরআন নিজেই সাক্ষী যে, এর ভিতর কোনো দোষ-ত্রুটি নেই, কোথাও আপত্তি তোলার কোন সুযোগ নেই।

কাফেররা তবুও একে কবুল করে না। কবুল না করার কারণ এই নয় যে, ওদের নিকট কুরআনের বিরুদ্ধে কোনো দলীল-প্রমাণ আছে। বরং নিতান্তই অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাহেতু এ কারণে ওরা অবাক হচ্ছে যে, ওদেরই গোত্র ও বংশের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ওদের প্রতি রাসূল হয়ে এসেছে এবং প্রধান সেজে সকলকে উপদেশ দেওয়া শুরু করেছে! আর কথাও এমন অদ্ভুত বলছে, যা কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। ওরা ভাবছে, আচ্ছা! আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, তখনো আমাদের পুনর্জীবিত করা হবে? এ প্রত্যাবর্তন তো আকল-বুদ্ধি থেকে সুদূরপরাহত এবং সম্ভাবনা ও স্বাভাবিকতা থেকে সম্পূর্ণ দূরবর্তী। (অথচ বিষয়টি আদৌ এমন নয়, যেমন সামনে আসছে)

৪. আমি জানি, মাটি ওদের কতটুকু ক্ষয় করে[১] এবং আমার নিকট রয়েছে এক সংরক্ষণকারী কিতাব[২]।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝

৫. বস্তুত ওরা সত্যকে অস্বীকার করেছে যখন তা ওদের নিকট এসেছে। অতএব ওরা গোলমেলে কথায় পড়ে আছে[৩]।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝

৬. ওরা কি নিজেদের উপরে আকাশ দেখে না যে, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি? আর তাতে নেই কোন ছিদ্র[৪]।

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

---

১. অর্থাৎ মানবের সমস্তটাই মাটি হয়ে যায় না, প্রাণ অক্ষত থাকে। আর শরীরের অংশসমূহ পচে গলে যেখানে যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, তা সবই আল্লাহর জানা আছে। সকল স্থান থেকে আসল অংশগুলো একত্র করে দেহ প্রস্তুত করে দেওয়া এবং তার মধ্যে প্রাণ ঢুকিয়ে দেওয়া তাঁর জন্য কোনই কঠিন নয়।

২. অর্থাৎ এখন আমার জানা হয়েছে তা নয়, বরং আমার জ্ঞান অনাদি। এমন কি, সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সকল বস্তুর সকল অবস্থা 'লওহে মাহফূজ' নামক এক কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত সেই কিতাব আমার নিকট বর্তমান আছে। অতএব 'অনাদি জ্ঞান'এর অর্থ যদি কারো বুঝে না আসে, তবে এতটুকু বুঝে নাও– যে দফতরে সবকিছু লিখিত আছে, তা আল্লাহ তাআলার সামনে বিদ্যমান আছে। অথবা وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ...- কে قَدْ عَلِمْنَا...- এর তাকিদ মনে কর।

এ কথা বলার কারণ এই যে, যে বিষয় কারো জ্ঞানে থাকে এবং তা লিপিবদ্ধও করে নেওয়া হয়, তা মানুষের নিকট খুব বেশি জোরালো মনে হয়। তো এখানে শ্রোতাদের বোধগম্য বিষয়াদির হিসাবে জানিয়ে দেওয়া হল যে, প্রত্যেক বিষয় আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং তাঁর নিকট লিপিবদ্ধও আছে, যার মধ্যে কিছুমাত্র কমবেশী হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ শুধু বিস্ময়ই নয়, বরং প্রকাশ্য অস্বীকার। ওরা নবীজীর নবুওয়াত, কুরআন ও পুনরুত্থান– সব বিষয়কে মিথ্যা বলেছে এবং অদ্ভুত এলোমেলো কথাবার্তা বলছে। বস্তুত যে ব্যক্তি সত্য বিষয়কে মিথ্যা বলে, সে এভাবেই সন্দেহ, অস্থিরতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঝঞ্ঝাটে পড়ে যায়।

৪. অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ– বাহ্যত তাতে না আছে কোনো খুঁটি, না কোনো স্তম্ভ। এত বিরাট বিশাল জড়বস্তু কেমন মজবুত, দৃঢ় ও শক্তভাবে মাথার উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ۝٧

৭. আর যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে সুদৃঢ় পাহড়-পর্বত স্থাপন করেছি এবং তাতে উৎপন্ন করেছি সব রকমের নয়নাভিরাম বস্তু—

تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨

৮. প্রত্যেক (আল্লাহ)-অভিমুখী বান্দার উপলব্ধি সৃষ্টি ও তাকে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে[১]।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَأَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩

৯. আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি বর্ষণ করেছি এবং তা দিয়ে উৎপন্ন করেছি উদ্যানরাজি ও এমন শস্য, যা কেটে ফেলা হয়[২]।

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠

১০. এবং উঁচু-উঁচু খেজুর গাছ, যাতে আছে থরে থরে খেজুরগুচ্ছ[৩]—

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١

১১. বান্দাদেরকে রিযিক প্রদানের জন্য। এবং তা দ্বারা সঞ্জীবিত করেছি মৃত ভূমি। এভাবেই ঘটবে পুনরুত্থান[৪]।

তদুপরি রাতের বেলায় যখন আকাশে প্রদীপ ও ফানুসের ন্যায় তারকা ও নক্ষত্ররাজি প্রজ্বলিত হয়, তখন তাকে কিরূপ সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত দেখায়!

আরো মজার ব্যাপার এই যে, লক্ষ লক্ষ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে– এই মহা ছাদে না কোনো ছিদ্র হয়েছে, না কোনো চিড় ধরেছে, না প্লাস্টার ভেঙ্গেছে, না রঙ নষ্ট হয়েছে। আখের এ কোন্ শক্তিধরের কুদরত, যিনি এ মহাবিস্ময়কর বিশাল বস্তু সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তার এরূপ হেফাজত করলেন?

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি রুজু করে, সে শুধু বাহ্যিক সৃষ্টিরাজির সীমার মধ্যেই আটকে থাকতে পারে না। বরং তার জন্য আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে উপলব্ধি ও লক্ষ করার বহু উপকরণ রয়েছে, যাতে সে সামান্য চিন্তা করলেই প্রকৃত বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারবে এবং ভুলে যাওয়া সবক তার স্মরণে এসে যাবে। আল্লাহই জানেন, এমনসব উজ্জ্বল নিদর্শনের বর্তমানেও কেন এই লোকেরা সত্যকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়?

২. حَبَّ الحصيد অর্থাৎ ওই ফসল, যার সাথে তার ক্ষেতও কেটে ফেলা হয়। কিন্তু বাগান ফল তোলার পরও অটুট থাকে।

৩. অধিক ও প্রচুর পরিমাণে হওয়ার কারণে গুচ্ছগুলি দেখতেও খুব সুন্দর লাগে।

৪. অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃত জমিকে জীবিত করে দেন। ঠিক এভাবে কিয়ামতের দিন মৃতদের জীবিত করে দেওয়া হবে।

১২. ওদের পূর্বে অস্বীকার করেছে নূহের জাতি, কূপবাসীরা ও ছামূদ সম্প্রদায়,

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ﴿١٢﴾

১৩. এবং আ'দ, ফেরাওন ও লূতের ভ্রাতৃবৃন্দ (সম্প্রদায়),

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوْطٍ ﴿١٣﴾

১৪. এবং 'আয়কা'ওয়ালারা ও তুব্বার সম্প্রদায়[১]। সকলেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর আমার ভীতি-প্রদর্শন সত্যে পরিণত হল[২]।

وَّأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? না, বরং ওরা নতুন সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দেহে রয়েছে[৩]।

أَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٥﴾

[রুকূ - ২]

১৬. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি, যেসব ওয়াসওয়াসা তার মনে আসতে থাকে[৪]। আর আমি ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশি নিকটবর্তী[৫]–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

---

১. এ জাতিসমূহের কাহিনী সূরা হিজর, ফুরকান, দুখান প্রভৃতির মধ্যে গত হয়েছে।

২. অর্থাৎ নবীদের অস্বীকার করার যে পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল, তাই সামনে এসে গেল।

৩. অর্থাৎ পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করার ব্যাপারে ওদের অযথাই সন্দেহ হচ্ছে। যিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করলেন, (তাঁর পক্ষে) দ্বিতীয়বারে সৃষ্টি করা কষ্টসাধ্য কেন হবে? ওরা কি এ ধারণা করে যে, তিনি প্রথমবারে দুনিয়া সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? সেই সর্বশক্তিমান সম্পর্কে এমন ধারণা-কল্পনা করা চরম মূর্খতা ও ধৃষ্টতা।

৪. অর্থাৎ তার প্রত্যেক কথা ও কর্ম সম্বন্ধে আমি অবহিত। এমন কি, যেসব ওসওয়াসা ও মন্দ খেয়াল বা চিন্তা তার অন্তরে উদয় হয়, তাও আমি জানি– أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (আচ্ছা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত–মুলক : ১৪)

৫. حبل الوريد দ্বারা ঘাড়ের রগ উদ্দেশ্য, যাকে শাহরগ বা স্কন্ধ-শিরা বলা হয় এবং যা কেটে দিলে মানুষ মরে যায়। সম্ভবত এ দ্বারা প্রাণ বা আত্মার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং

১৭. যখন দুই আহরণকারীর একজন ডানে বসে ও একজন বামে বসে (তার আমল) আহরণ করতে থাকে*[১]।

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ⑰

১৮. সে যে কোনো কথাই উচ্চারণ করে, (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তার নিকট থাকে এক সদাপ্রস্তুত প্রহরী[২]।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ⑱

অর্থ এই হবে যে, আমি (জ্ঞানের দিক দিয়ে) তার আত্মা ও নফসের চেয়েও নিকটবর্তী অর্থাৎ নিজের হাল-অবস্থা সম্পর্কে মানুষের যতটুকু জ্ঞান আছে, তা সম্পর্কে আমার জ্ঞান স্বয়ং তার চেয়েও বেশি। তাছাড়া–

علت اور منشا کو معلول اور ناشی کے ساتھ وہ قرب حاصل ہوتا ہے، جو معلول اور ناشی کو خود اپنے نفس سے بھی نہیں ہوتا۔

কার্যের সাথে কারণের ও উৎপন্নের সাথে উৎসের এমন নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা থাকে, যা কার্য ও উৎপন্নের নিজ সত্তার সাথেও থাকে না।

এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ আয়াতের (আহযাব, ৬) ব্যাখ্যায় গত হয়েছে (তা দ্রষ্টব্য)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, আল্লাহ ভিতর থেকেও অধিক নিকটবর্তী, আর শিরা তো প্রাণ থেকে বাইরে।'

কবি কত সুন্দর বলেছেন–

جاں نہاں در جسم واو در جاں نہاں ❁ اے نہاں اندر نہاں اے جان جاں۔

('হে আত্মগোপনকারী প্রাণ! গোপন প্রাণে দৃষ্টিপ্রদানকারী সত্তা, হে গোপনের গোপন! হে প্রাণের প্রাণ!')

* দ্বিতীয় তরজমা– '...দুই লিপিবদ্ধকারী লিপিবদ্ধ করতে থাকে, যাদের একজন ডানে ও অন্যজন বামে বসা থাকে'।

১. অর্থাৎ দুজন ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে সর্বদা তার উপর নজর রাখে এবং যখন যে কথা তার মুখ থেকে বের হয়, তা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে নেন। যিনি ডান দিকে, তিনি নেকী লেখেন, আর যিনি বাম দিকে তিনি বদী লেখেন।

২. অর্থাৎ (আমলাদি) লেখার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকেন।

বি. দ্র. উভয় ফেরেশতা কোথায় থাকেন এবং কথাবার্তা ছাড়া আর কী লেখেন, তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীসসমূহে পাওয়া যাবে।

১৯. মৃত্যু-যাতনা নিশ্চয়ই আসবে[১]। এ তা-ই, যা তুমি এড়িয়ে যেতে[২]।

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ۝

২০. এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এ সেই দিন, যা সম্বন্ধে সতর্ক করা হত[৩]।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ۝

২১. আর প্রত্যেক ব্যক্তি এ অবস্থায় আসবে যে, তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী[৪]।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ۝

২২. তুমি এ দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন আমি তোমার সামনে থেকে তোমার পর্দা অপসারিত করে দিয়েছি, ফলে তোমার দৃষ্টি আজ প্রখর[৫]।

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ۝

---

১. অর্থাৎ এই দেখ, এদিকে মোকদ্দমার ফাইল (আমলনামা) তৈরি হয়েছে, ওদিকে মৃত্যুর মুহূর্ত এসে পৌঁছেছে। আর মৃত্যুর পথযাত্রী মৃত্যুযাতনায় মূর্ছা যেতে লাগল এবং প্রাণ বের হওয়ার কষ্ট-যন্ত্রণায় হাবুডুবু খেতে লাগল। তখন সেইসব সত্য দৃষ্টিগোচর হতে শুরু করল, যার সংবাদ আল্লাহর রাসূলগণ দিয়েছিলেন, আর মৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পর্দা অপসারিত হতে শুরু করল। এই অবস্থার সম্মুখীন হওয়া অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। কারণ, একচ্ছত্র হেকমতওয়ালার বহু হেকমত এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

২. অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুকে খুব বেশি এড়াতে চেয়েছে এবং এই কঠিন সময় থেকে অনেক বেশি পলায়ন করতে চেয়েছে। কিন্তু এ অন্তিম মুহূর্তটি টলার ছিল না, শেষ পর্যন্ত শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এ মুহূর্তটি এড়ানোর কোনো হিলা-তদবীরই কাজে আসেনি।

৩. মৃত্যুর সময়েই ছোট কিয়ামত এসেছিল, এরপর বড় কিয়ামত উপস্থিত। শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হল, আর সেই ভয়ঙ্কর দিন এসে পড়ল, যার সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ সকল যুগে সতর্ক করেছিলেন।

৪. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে এ অবস্থায় হাযির করা হবে যে, এক ফেরেশতা হাশরের আদালতের দিকে তাকে হাঁকতে থাকবেন এবং দ্বিতীয়জন তার আমলনামা নিয়ে চলবেন, যার মধ্যে তার জীবনের সকল হাল-অবস্থা লিপিবদ্ধ থাকবে।

সম্ভবত এরাই সেই দুই ফেরেশতা, যাঁদের 'কিরামান কাতেবীন' বলা হয় এবং যাঁদের সম্পর্কে يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ বলা হয়েছে। অথবা হতে পারে, ওই দু'জন (المتلقيان) আলোচ্য আয়াতের দু'জন থেকে ভিন্ন। والله أعلم

৫. অর্থাৎ তখন বলা হবে, দুনিয়ার আনন্দ ও মোহে পড়ে তুমি আজকের দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে এবং তোমার চোখের সামনে ছিল কুপ্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার ঘন অন্ধকার। ফলে পয়গম্বর তোমাকে যা বোঝাতেন, তার কিছুই তোমার দৃষ্টিগোচর হত না। আজ আমি

২৩. আর ওর সঙ্গী (ফেরেশতা) বলবে, 'এ তা, যা আমার নিকট ছিল; এটা (উপস্থাপনের জন্য) প্রস্তুত[১]।'

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۟

২৪. তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক ওই কাফেরকে, যে চরম বিরোধী,

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۟

২৫. সৎকর্মে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, সংশয় সৃষ্টিকারী[২]–

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ۟

২৬. যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল। অতএব ওকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর[৩]।

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۟

২৭. ওর সঙ্গী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের রব! আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। কিন্তু সে ছিল চরম ভ্রষ্টতায় পতিত[৪]।'

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ۟

তোমার চোখ থেকে সেই পর্দা হটিয়ে দিয়েছি এবং দৃষ্টি খুব প্রখর করে দিয়েছি। এখন দেখে নাও, যেসব বিষয় বলা হয়েছিল, তা সত্য না মিথ্যা।

১. অর্থাৎ ফেরেশতা আমলনামা হাযির করবেন।

আর কেউ কেউ قرين দ্বারা শয়তানকে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ শয়তান বলবে, এ অপরাধী হাযির আছে, একে আমি বিভ্রান্ত করেছিলাম। আমি তাকে দোযখের জন্য তৈরি করে এনেছি। উদ্দেশ্য এই যে, বিভ্রান্ত তো আমি করেছিলাম, কিন্তু তাকে জোরপূর্বক পাপাচারে লিপ্ত করানোর মত শক্তি ও ক্ষমতা আমার ছিল না। সে নিজ ইচ্ছা ও এখতিয়ারে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে দুইজন ফেরেশতাকে এই নির্দেশ দেওয়া হবে যে, এমন লোকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। (أعاذنا الله منها)

৩. অর্থাৎ এসব লোকেরা জাহান্নামের কঠোরতম আযাবের যোগ্য।

৪. অর্থাৎ তার উপর আমার কোনো জবরদস্তি চলত না। হাঁ, আমি সামান্য প্ররোচনা দিয়েছিলাম, অমনি এই হতভাগা নিজ ইচ্ছায় বিভ্রান্ত হয়ে হেদায়াত ও সফলতার পথ থেকে দূরে চলে গেছে। শয়তান এ কথা বলে নিজ অপরাধ হালকা করতে চাইবে।

২৮. আল্লাহ বলবেন, 'আমার নিকট ঝগড়া-বিবাদ করো না, আমি পূর্বেই তোমাদের সতর্ক করেছিলাম[১]।	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۝
২৯. 'আমার নিকট কথার পরিবর্তন হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই[২]।'	مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

[রুকূ - ৩]

৩০. (স্মরণ কর), যেদিন আমি দোযখকে জিজ্ঞাসা করব, 'তুমি কি ভরে গেছ?' আর সে বলবে, 'আরও আছে কি[৩]?'	يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۝
৩১. আর জান্নাতকে খোদাভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে, তা দূরে রবে না[৪]।	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ۝
৩২. 'এ-ই তা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হত'—প্রত্যেক (আল্লাহ)-অভিমুখী, সদাসতর্ক ব্যক্তির জন্য,	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۝
৩৩. যে 'রহমান'কে না দেখে ভয় করেছিল এবং এসেছে বিনীত অন্তর নিয়ে।	مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۝

---

১. অর্থাৎ বক্ বক্ করো না। দুনিয়াতে সকলকেই ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন প্রত্যেককে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। যে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং যে প্ররোচনা দিয়েছে– প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের ফল ভোগ করবে।

২. অর্থাৎ আমার দরবারে অবিচার নেই। যা কিছু ফয়সালা হবে, সম্পূর্ণ হেকমত ও ইনসাফের সাথে হবে। 'আর কথার পরিবর্তন হয় না'– অর্থাৎ কাফেরকে ক্ষমা করা হবে না। অতএব, সবচেয়ে বড় কাফের শয়তানকে ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না।

৩. অর্থাৎ দোযখ ওই পরিমাণ লোক দ্বারা ভরবে না। এবং আক্রোশের আতিশয্যে সে আরো অধিক সংখ্যক কাফের ও নাফরমান চাইবে।

৪. অর্থাৎ জান্নাত তাদের থেকে দূরে থাকবে না, তারা অনেক নিকট থেকে তার সজীবতা ও মনোহর সৌন্দর্য দেখতে পাবে।

৩৪. 'তোমরা শান্তি-নিরাপত্তাসহ এতে প্রবেশ কর[১]। এ অনন্তকাল অবস্থান করার দিন[২]।'	ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿٣٤﴾
৩৫. সেখানে তাদের জন্য তারা যা চাইবে তা আছে এবং আমার নিকট আছে আরো অধিক[৩]।	لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾
৩৬. আমি এদের পূর্বে কত সম্প্রদায় ধ্বংস করেছি, যারা ছিল এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। অতঃপর ওরা শহরে-নগরে অনুসন্ধান করতে লাগল, পালানোর কোন জায়গা আছে কি[*][৪]?	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

১. অর্থাৎ যারা দুনিয়ায় আল্লাহকে স্মরণ রেখেছিল, গোনাহ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে তাঁর দিকে রুজু হয়েছিল, না দেখেও তাঁর ক্রোধ ও শক্তিমত্তাকে ভয় করেছিল এবং পাক-পবিত্র, অনুরাগী অন্তর নিয়ে হাযির হয়েছে– এমন লোকদের এই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এখন সেই শুভ মুহূর্ত এসে গেছে যে, তারা তাতে নিরাপদে ও শান্তি-সুখের সাথে প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের সালাম করবেন এবং তাদের প্রভুর সালাম পৌছাবেন।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সেইদিন যে যা পাবে, তা অনন্তকালের জন্য। ইতিপূর্বে কোন অবস্থা স্থায়ী ছিল না।

৩. অর্থাৎ তারা যা চাইবে তা-ই পাবে এবং তা ছাড়া সেসব নে'য়ামতও পাবে, যা তাদের কল্পনাতেও ছিল না– যেমন: আল্লাহর দীদার-এর ধারণাতীত স্বাদ। وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ এর উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, আমার নিকট অনেক আছে– জান্নাতী যতই চাক, তাকে সবই দেওয়া হবে। এত দেওয়ার পরও অনুগ্রহের ভাণ্ডার হ্রাস হবে না এবং আল্লাহর জন্য দিতে কোনো বাধাও থাকবে না। সুতরাং এমন বেশুমার ও বে-হিসাব দানকে অসম্ভব মনে করো না। والله سبحانه وتعالى أعلم

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'আর ওরা শহরে-নগরে ঘুরে বেড়িয়েছে। (কিন্তু আযাব আসার পর) পালানোর কোন জায়গা ছিল কি?'

৪. পূর্বে কাফেরদের পরকালীন শাস্তির আলোচনা ছিল। মাঝে এর মোকাবেলায় জান্নাতবাসীদের নে'য়ামতরাশির আলোচনা এসে গেল। এখন পুনরায় কাফেরদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ আমি অনেক দুষ্কৃতিকারী ও অবাধ্য সম্প্রদায়কে আখেরাতের আগে দুনিয়াতেই ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা শক্তি ও ক্ষমতায় বর্তমান কাফের সম্প্রদায়গুলো থেকে অনেক প্রবল ছিল এবং যারা বড় বড় শহর চষে বেড়িয়েছিল। কিন্তু যখন খোদায়ী আযাব এল, তখন ওরা পলায়ন করার জন্য পৃথিবীর কোথাও আশ্রয় পেল না।

৩৭. নিশ্চয় এতে তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যার অন্তর আছে অথবা যে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে[১]।

اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَذِکۡرٰی لِمَنۡ کَانَ لَہٗ قَلۡبٌ اَوۡ اَلۡقَی السَّمۡعَ وَ ہُوَ شَہِیۡدٌ

৩৮. আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি[২]। আর আমাকে স্পর্শ করেনি কোন ক্লান্তি[৩]।

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَہُمَا فِیۡ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ٭ۖ وَّ مَا مَسَّنَا مِنۡ لُّغُوۡبٍ

৩৯. অতএব ওরা যা কিছু বলে, আপনি তাতে ধৈর্য ধরুন এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন[৪]– সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

فَاصۡبِرۡ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَ سَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ قَبۡلَ طُلُوۡعِ الشَّمۡسِ وَ قَبۡلَ الۡغُرُوۡبِ

অথবা অর্থ এই যে, আযাবের সময় নিজেদের লোকালয়সমূহে খোঁজ-খবর নিতে লাগল– কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় কিনা! কিন্তু কোনো ঠিকানা পেল না।

وهذا هو الظاهر من الترجمة، والأول ما اختاره جمهور المفسرين. والله أعلم

(তরজমা থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বুঝে আসে। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণ প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন।)

১. অর্থাৎ উল্লিখিত শিক্ষামূলক বিষয়াদি ও ঘটনাবলিতে চিন্তা-ফিকির করে তারাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, যাদের বুকে বোঝার মত অন্তর আছে, ফলে তারা নিজেরাই কথা বুঝে নেয়; অথবা কমপক্ষে, বোঝাতে পারে এমন ব্যক্তির কথা তারা অন্তর দিয়ে কান লাগিয়ে শোনে। কেননা, এটাও একটা স্তর যে, মানুষ নিজে না জানলে অন্যের জানানো দ্বারা সতর্ক হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নিজেও বোঝে না, কারো কথাও মনোযোগের সাথে শোনে না, তার স্তর ইট-পাথরের চেয়ে উর্ধ্বে নয়।

২. এর আলোচনা ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে গত হয়েছে।

৩. যখন প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হননি, তখন দ্বিতীয়বার কেন ক্লান্ত হবেন? আর ধ্বংস ও নিপাত করা তো সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক সহজ!

৪. অর্থাৎ এমন সুস্পষ্ট কথাও যদি ওরা না বোঝে, তবে আপনি চিন্তিত হবেন না। বরং ওদের আজে-বাজে কথাবার্তার জন্য সবর করতে থাকুন এবং আপনার প্রতিপালকের স্মরণে নিবেদিত থাকুন, যিনি সমস্ত পৃথিবী ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি ও ধ্বংস করার শক্তি রাখেন।

৪০. এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন[১] এবং সেজদার পরেও[২]।	وَمِنَ الَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَاَدۡبَارَ السُّجُوۡدِ۝
৪১. আর তুমি মনোযোগ দিয়ে সেদিনের কথা শোন, যেদিন এক আহবানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহবান করবে[৩]–	وَاسۡتَمِعۡ یَوۡمَ یُنَادِ الۡمُنَادِ مِنۡ مَّكَانٍ قَرِیۡبٍ۝
৪২. যেদিন মানুষ নিশ্চিত মহানাদ শুনতে পাবে। তা-ই (কবর থেকে) বেরিয়ে পড়ার দিন[৪]।	یَّوۡمَ یَسۡمَعُوۡنَ الصَّیۡحَةَ بِالۡحَقِّ ؕ ذٰلِكَ یَوۡمُ الۡخُرُوۡجِ۝
৪৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই কাছে (সকলকে) ফিরতে হবে[৫]–	اِنَّا نَحۡنُ نُحۡیٖ وَنُمِیۡتُ وَاِلَیۡنَا الۡمَصِیۡرُ۝

---

১. এগুলো আল্লাহকে স্মরণের বিশেষ কিছু সময়। এ সময়গুলিতে দো'য়া ও ইবাদত খুব কবুল হয়। আর কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায়, প্রথমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তিনটি নামাযই ফরয ছিল। যথা : ফজর, আসর ও তাহাজ্জুদ।

যা হোক, এখনো এই তিন সময়ের বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। নামায অথবা যিকির ও দো'য়া প্রভৃতি দ্বারা এ সময়গুলিকে কাজে লাগানো উচিত। হাদীছে আছে– عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة (সকাল-সন্ধ্যা এবং রাতের কিছু অংশ তোমাদের কাজে লাগানো উচিত।) (বুখারী, হাদীস ৩৯)

কেউ কেউ বলেছেন, قبل طلوع الشمس দ্বারা ফজর এবং قبل الغروب দ্বারা জোহর ও আসর এবং من الليل দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায উদ্দেশ্য।

২. অর্থাৎ নামাযের পর কিছু তাসবীহ ও তাহলীল ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়া) আদায় করা উচিত। অথবা এর দ্বারা নফল নামায উদ্দেশ্য, যা ফরয নামাযের পর পড়া হয়।

৩. কথিত আছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি পাথরের উপর শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এজন্য নিকটবর্তী বলা হয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, তার আওয়াজ প্রত্যেক স্থানেই নিকটবর্তী মনে হবে এবং সকলে তা একই রকম শুনবে। অবশ্য সেদিন শিঙ্গা ফোঁকা ছাড়া আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আরো অনেক আহ্বানও হবে। কেউ কেউ এই আয়াতের দ্বারা সেসব আহ্বানকে উদ্দেশ্য করেছেন। কিন্তু বাহ্যত এখানে শিঙ্গার ফুৎকারই উদ্দেশ্য (অন্যান্য আহ্বান নয়)। আল্লাহই ভাল জানেন।

৪. অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হলে সকলেই মাটির (ভিতর) থেকে বের হয়ে আসবে।

৫. অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর হাতে এবং ঘুরেফিরে সকলকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, কেউ পালিয়ে রক্ষা পাবে না।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝

৪৪. যেদিন যমীন বিদীর্ণ হয়ে তাদের উপর থেকে সরে যাবে, তারা দ্রুত বের হয়ে পড়বে। তা আমার জন্য অতি সহজ একত্র করণ[১]।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

৪৫. ওরা যা কিছু বলে আমি তা উত্তমরূপে জানি, আর আপনি ওদের উপর জোর-জবরদস্তিকারী নন। সুতরাং আপনি কুরআন দ্বারা ওই ব্যক্তিকে উপদেশ দান করুন, যে আমার ভীতিপ্রদর্শনে ভীত হয়[২]।

---

১. অর্থাৎ পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মৃতরা তা থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে ছুটতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা পূর্বাপর সকলকে একই মাঠে সমবেত করবেন। এ কাজ তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

২. অর্থাৎ যারা হাশরের দিনকে অস্বীকার করে ও আজে-বাজে কথা বলে, আপনি তাদের বলতে দিন এবং তাদের ব্যাপার আমার হাতে সোপর্দ করুন। যা কিছু তারা বলে, আমার সবই জানা আছে। জোরপূর্বক প্রত্যেককে এসব হেদায়াতের কথা মানানো আপনার দায়িত্ব নয়। হাঁ, কুরআন শুনিয়ে শুনিয়ে আপনি বিশেষভাবে তাদের নসীহত ও উপদেশ করতে থাকুন, যারা আল্লাহর সতর্কীকরণে সতর্ক হয়। এই অবাধ্যদের পিছনে লেগে থাকার দরকার নেই।

تم سورة ق والحمد لله

সূরা যারিয়াত

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৫১ । ৬০ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

آياتها ٦٠، ركوعاتها ٣

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرۡوًا ۙ﴿۱﴾

১. বাতাসসমূহের কসম, যা (ধুলাবালি) উড়িয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

فَالۡحٰمِلٰتِ وِقۡرًا ۙ﴿۲﴾

২. অতঃপর (মেঘের) বোঝা বহনকারীদের।

فَالۡجٰرِيٰتِ يُسۡرًا ۙ﴿۳﴾

৩. অতঃপর মৃদুভাবে প্রবাহিতদের।

فَالۡمُقَسِّمٰتِ اَمۡرًا ۙ﴿۴﴾

৪. অতঃপর নির্দেশমত বণ্টনকারী বাতাস-সমূহের[১]!

اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَصَادِقٌ ۙ﴿۵﴾

৫. তোমাদের সঙ্গে যার অঙ্গীকার করা হয়, তা অবশ্যই সত্য।

وَّاِنَّ الدِّيۡنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۶﴾

৬. এবং নিশ্চয় ন্যায়বিচার সংঘটিত হবেই[২]।

---

১. প্রথমে প্রবল বাতাস ও ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয়। তাতে ধূলা প্রভৃতি ওড়ে এবং মেঘমালার সৃষ্টি হয়। এরপর তাতে পানির সৃষ্টি হয়। বাতাস এই বোঝা বহন করে চলে। তারপর বর্ষণের আগ মুহূর্তে মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয়। তারপর আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যে স্থানের জন্য বৃষ্টির যতটুকু অংশ নির্ধারিত হয়, বাতাস কর্তৃক তা বণ্টিত হয়। আল্লাহ এসব বাতাসের কসম করেছেন।

অপর কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে ذَارِيَاتِ দ্বারা বাতাসসমূহ, حَامِلَات দ্বারা মেঘমালা, جَارِيَاتِ দ্বারা নক্ষত্ররাজি এবং مقسمات দ্বারা ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য। এ তাফসীর অনুযায়ী مقسم به তথা যাদের শপথ করা হচ্ছে, তাদের ক্রমিকতা যেন নীচ থেকে উপরের দিকে হল (বাতাস সর্বনিম্নের বস্তু, আর ফেরেশতা উর্ধ্বের)। আর হযরত আলী (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, ذاريات ، حاملات ، جاريات ও مقسمات দ্বারা যথাক্রমে বাতাসসমূহ, মেঘমালা, নৌকা-কিস্তি ও ফেরেশতাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে রিযিক ইত্যাদি বণ্টন করে থাকে। (তাফসীরে তবারী ২১/৪৮১-৪৮২)

২. অর্থাৎ উপরোক্ত বাতাস, বৃষ্টি প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, আখেরাতের প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ইনসাফ (তথা ন্যায়বিচার) হওয়া অনিবার্য। যখন এ দুনিয়ায় বাতাসও উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রবাহিত হয় না, তখন এত বিশাল বিশ্বব্যবস্থাপনা কি এমনিই উদ্দেশ্যহীনভাবে চলছে? না। বরং নিশ্চয় এর কোনো বিরাট পরিণতি আছে। তাকেই আখেরাত বলা হয়।

৭. কসম জালবিশিষ্ট আকাশের*[১]! وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝

৮. নিশ্চয় তোমরা বিরোধপূর্ণ কথায় পড়ে আছ। اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝

৯. তা থেকে সে-ই বিমুখ থাকে, যাকে বিমুখ করে দেওয়া হয়েছে[২]। يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۝

১০. ধ্বংস হোক অনুমানকারীরা[৩], قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۝

১১. যারা গাফলতে পড়ে ভুলে রয়েছে[৪]। الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۝

১২. ওরা জিজ্ঞাসা করে, 'বিচারের দিন কবে হবে[৫]?' يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۝

১৩. (সেদিন), যেদিন ওদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'কসম বহু পথবিশিষ্ট আকাশের'।

১. অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর, মজবুত ও সমুজ্জ্বল আকাশের শপথ, যার মধ্যে নক্ষত্ররাজির জাল বিছানো রয়েছে বলে মনে হয় এবং যাতে তারকারাজি ও ফেরেশতাদের কক্ষপথ ও যাতায়াত পথ রয়েছে।

২. অর্থাৎ, কিয়ামত ও আখেরাতের বিষয়ে কাফেররা অযথা বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত। কারণ, তা সে-ই মানবে, যার প্রতিপালকের দরবারের সঙ্গে কিছুটা হলেও সম্পর্ক আছে। যে প্রভুর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং যাকে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথসমূহ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে আখেরাতকে স্বীকার ও গ্রহণ করা থেকে সর্বদা বিরত থাকবে। অথচ ওরা যদি শুধু আকাশের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে চিন্তা করত, তবে নিশ্চয় বুঝতে পারত, এ বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা নিতান্তই বোকামী।

৩. অর্থাৎ যারা দীনসম্পর্কিত বিষয়াদিতে অনুমান করে এবং শুধু নিজ নিজ ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতেই অকাট্য বিষয়াদি অস্বীকার করে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ওদেরকে আখেরাত ও আল্লাহ থেকে উদাসীন করে রেখেছে।

৫. অর্থাৎ অস্বীকৃতি ও উপহাসের ভঙ্গিতে ওরা জিজ্ঞাসা করে– আচ্ছা, জনাব! সেই বিচার দিবস কবে আসবে? এত দেরি হচ্ছে কেন?

১৪. (আর বলা হবে), তোমরা নিজেদের দুষ্কৃতির স্বাদ আস্বাদন কর। এটাই সে বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাইতে[১]।	ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. নিশ্চয় পরহেযগাররা থাকবে উদ্যানরাজি ও প্রস্রবনমালার মধ্যে–	اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾
১৬. তাদের রব তাদের যা দান করেছেন, তারা তা গ্রহণ করে[২]। তারা তো ইতিপূর্বে সৎকর্মশীল ছিল[৩]।	اٰخِذِيْنَ مَاۤ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾
১৭. তারা রাতের স্বল্প সময়ই ঘুমাত।	كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং রাতের শেষ প্রহরগুলিতে ক্ষমা প্রার্থনা করত[৪]।	وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আর তাদের ধন-সম্পদে ছিল সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতের হক[৫]।	وَفِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾
২০. পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন	وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

১. এখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওদের উত্তর দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ একটু সবর কর, সেই দিন শীঘ্রই আসবে, যখন তোমাদের আগুনে (নিক্ষেপ করে) উলট-পালট করা হবে এবং জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বলা হবে, এই নাও! এখন নিজেদের দুষ্কৃতি ও উপহাসের স্বাদ উপভোগ কর। যে দিনটি নিয়ে তাড়াহুড়া করতে, তা এসে গেছে।

২. অর্থাৎ তারা খুশিচিত্তে সেসব নে'য়ামত গ্রহণ করে, যা তাদের প্রতিপালক দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ দুনিয়া থেকে নেকীসমূহ সঞ্চয় করে এনেছে। আজ সেগুলির প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে। সামনে সেসব নেকীর কিছু বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

৪. অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটাত এবং সাহরীর সময়, রাত যখন শেষ হয়ে আসত, তখন নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত যে– আয় আল্লাহ! দাসত্বের হক আদায় করতে পারলাম না। যে ত্রুটি রয়ে গেল নিজ রহমতে তা মাফ করে দিন। মোটকথা, ইবাদতের আধিক্য তাদের গর্বিত করতে পারত না; বরং ইবাদতে যতই উন্নতি করতে থাকত, ততই ভয়-ভীতি বাড়তে থাকত।

৫. 'বঞ্চিত' অর্থাৎ যারা অভাবী, অথচ সওয়াল করে বেড়ায় না। আয়াতের মর্ম এই যে, তারা (যাকাত ছাড়াও) নিজেদের ধন-সম্পদে নিজেদের খুশীতে যাচনাকারী ও অভাবীদের জন্য অংশ নির্ধারিত করে রেখেছিল, যা নিয়মিত আদায় করত। যেন তা একটি জরুরী হক ছিল।

২১. এবং স্বয়ং তোমাদের মধ্যেও। সুতরাং তোমরা কি অনুধাবন করবে না[১]?

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾

২২. আর আকাশে আছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা করা হয় তা[২]।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. অতএব আসমান ও যমীনের রবের শপথ, এ কথা অবশ্যই সত্য, যেমন তোমাদের কথা বলা সত্য[৩]।

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

[রুকূ - ২]

২৪. আপনার নিকট কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে[৪]?

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾

---

১. অর্থাৎ রাত জাগরণ, ক্ষমাপ্রার্থনা ও অভাবীদের জন্য ব্যয় করা– এসব এই বিশ্বাসের সাথে হওয়া উচিত যে, আল্লাহ বর্তমান আছেন এবং তাঁর নিকট কারো পুণ্য বিনষ্ট হয় না। আর এটা সেই বিশ্বাস, যা আকাশ ও বিশ্বচরাচরের দিক-দিগন্তে এবং স্বয়ং মানুষের সত্তায় বিদ্যমান নিদর্শনাদিতে চিন্তা করলে অনায়াসে হাসিল করা যায়। কারণ, মানুষ যদি স্বয়ং নিজের ব্যাপারে অথবা পৃথিবীর অবস্থাদির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে অতিসত্বর এই সিদ্ধান্তে উপনিত হবে যে, প্রত্যেক পুণ্য ও পাপাচারের প্রতিফল কোন না কোনভাবে অবশ্যই প্রদান করা হবে– তাড়াতাড়ি বা দেরিতে।

২. অর্থাৎ আমরা খাব কোথা থেকে– এ ভয়ে যাচনাকারী ও অভাবীদের জন্য ব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে নেই, আর ব্যয় করে গরীব-দুঃখীদের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে নেই। কেননা, সকলের রিযিক এবং পুরস্কার ও ছওয়াব প্রদানের যে ওয়াদা তোমাদের সঙ্গে করা হয়েছে, তা আসমানওয়ালার কজায় রয়েছে। প্রত্যেকের জীবিকা অবশ্যই পৌঁছবে, কারো বাধাদানে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। আর দানকারীরা ছওয়াবও অবশ্যই পাবে। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটবে, তার হুকুম আসমান থেকেই অবতীর্ণ হয়।'

৩. অর্থাৎ তোমাদের কথা বলার মধ্যে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি এই কথার মধ্যে সন্দেহ নেই যে– নিশ্চিতরূপে জীবিকা পৌঁছবে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আখেরাত আসবেই আসবে এবং আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ– এ কথার সূত্র ধরে সামনে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদারীর ঘটনা শোনানো হচ্ছে, যা লূৎ আলাইহিস সালামের ঘটনার ভূমিকাস্বরূপ। উভয় ঘটনা থেকে এও প্রকাশ পাবে যে, দুনিয়ায় পুণ্যবানদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার আচরণ কেমন হয়? এবং মিথ্যারোপকারীদের সাথে তিনি কেমন আচরণ করেছেন?

৪. অর্থাৎ তাঁরা ফেরেশতা ছিলেন। ইবরাহীম (আ) প্রথমে তাঁদের মানুষ মনে করলেন এবং তাঁদের খুব সম্মান করলেন। আর আল্লাহর দরবারে তো ফেরেশতারা মর্যাদাশীল ও সম্মানিতই হন, যেমন তিনি বলেন– بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ (বরং তারা সম্মানিত বান্দা।)

২৫. যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হল এবং 'সালাম' বলল। তিনিও বললেন, 'সালাম'। (এরা তো) অপরিচিত লোক[১]।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝
২৬. অতঃপর তিনি দ্রুত আপন পরিবারের নিকট গেলেন এবং নিয়ে এলেন একটি মোটা-তাজা (ভাজা) বাছুর।	فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۝
২৭. আর তা তাদের সামনে রাখলেন। বললেন, 'আপনারা খাচ্ছেন না কেন[২]?'	فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۝
২৮. তো, তিনি তাদের থেকে শঙ্কা অনুভব করলেন। তারা বলল, 'আপনি শঙ্কিত হবেন না'। এবং তারা তাঁকে এক জ্ঞানী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল[৩]।	فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۝
২৯. তখন তাঁর স্ত্রী উঁচু স্বরে বলতে বলতে সামনে আসল এবং নিজের কপাল চাপড়িয়ে বলল, 'বৃদ্ধা-বন্ধ্যা (কি সন্তান জন্ম দেয়)[৪]?'	فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۝
৩০. তারা বলল, 'এমনই বলেছেন আপনার রব। নিশ্চয় তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ[৫]।	قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

---

১. অর্থাৎ সালামের উত্তরে সালাম দিলেন এবং মনে মনে বা উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন, 'এরা কিছুটা অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে।'

২. অর্থাৎ খুব যত্নের সাথে মেহমানদারী শুরু করলেন এবং অত্যন্ত ভদ্র-নম্রভাবে বললেন, 'কী মহোদয়গণ! আপনারা খাচ্ছেন না যে।' আসলে তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা, খাবেন কী করে! অবশেষে ইবরাহীম (আ) বুঝলেন, এরা মানুষ নন।

৩. এই কাহিনী সূরা হূদ ও সূরা হিজর-এ গত হয়েছে। সেখানে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৪. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবি হযরত সারা (আ) এক কোণায় দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনছিলেন। পুত্রের সংবাদ শুনে চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং বিস্ময়ের সাথে কপালে করাঘাত করে বলতে লাগলেন, (বেশ বেশ!) এক বুড়ি-বন্ধ্যা, যৌবনে যার সন্তান জন্মেনি, এখন বৃদ্ধ বয়সে সন্তান জন্মাবে?

৫. অর্থাৎ আমরা আমাদের পক্ষ থেকে বলছি না, বরং আপনার প্রভু এরূপই বলেছেন। তিনি জানেন, কাকে কখন কী জিনিস দেওয়া উচিত। (অতএব আপনি নবী-পরিবারের হয়ে এই সুসংবাদে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?)

পারা - ২৭

৩১. ইবরাহীম বললেন, 'হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! আপনাদের উদ্দেশ্য কী[১]?'	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝
৩২. তারা বলল, 'আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট পাঠানো হয়েছে,	قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝
৩৩. 'যাতে আমরা ওদের উপর (শক্ত) মাটির পাথর নিক্ষেপ করি[২],	لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ۝
৩৪. 'যা আপনার রবের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত[৩]।'	مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ۝
৩৫. অতঃপর, সেখানে যে ঈমানদাররা ছিল, আমি তাদের বের করে নিলাম।	فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
৩৬. আর আমি সেখানে একটি পরিবার ছাড়া মুসলমানদের আর কোন পরিবার পাইনি[৪]।	فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

বি. দ্র. বক্ষমান আয়াতসমূহের সামগ্রিক বিবরণ লক্ষ করলে বোঝা যায়, এই ছেলে ছিলেন হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, যাঁর সুসংবাদ পিতামাতা উভয়কে দেওয়া হয়েছিল।

১. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোন প্রয়োজনে আগমন করেছেন?' –তিনি অনুমান করে বুঝে থাকবেন যে, নিশ্চয় (সন্তানের সুসংবাদ ছাড়া) আরো কোনো জরুরী উদ্দেশ্যে তাঁদের আগমন হয়েছে (তাই এ প্রশ্ন করলেন)।

২. অর্থাৎ লূৎ (আ)-এর সম্প্রদায়কে শাস্তিদানের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি, যাতে শক্ত মাটির পাথর বর্ষণ করে ওদের ধ্বংস করে দেই।

مِنْ طِيْنٍ -এর উল্লেখ থেকে বোঝা গেল, এ শিলাবৃষ্টি ছিল না, যাকে কখনো পাথর বলে দেওয়া হয়।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই পাথরগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। আযাবের এ পাথরগুলো একমাত্র তাদের গায়েই লাগবে, যারা আকল-বুদ্ধি, দীন-ধর্ম ও স্বভাব-প্রকৃতির সীমা লজ্ঘন করে গেছে।

৪. অর্থাৎ সেই জনপদে একমাত্র হযরত লূতের পরিবারই ইসলামী পরিবার ছিল। আমি তাকে আযাব থেকে রক্ষা করি এবং অক্ষতভাবে সেখান থেকে বের করে আনি। অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম।

৩৭. আমি সেই জনপদে তাদের জন্য একটি নিদর্শন রেখে দিয়েছি, যারা যাতনাদায়ক আযাবকে ভয় করে[১]।	وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝٣٧
৩৮. এবং (নিদর্শন রেখেছি) মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাঁকে ফেরাওনের নিকট পাঠালাম সুস্পষ্ট প্রমাণসহ[২]।	وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝٣٨
৩৯. কিন্তু সে নিজ ক্ষমতার দর্পে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, '(এ) যাদুকর বা পাগল[৩]।'	فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝٣٩
৪০. অতএব আমি ওকে ও ওর বাহিনীগুলোকে পাকড়াও করলাম। এবং ওদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, আর সে ছিল অভিযুক্ত[৪]।	فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝٤٠
৪১. এবং (নিদর্শন রেখেছি) আ'দের ঘটনায়, যখন আমি ওদের উপর পাঠালাম অশুভ বাতাস।	وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۝٤١
৪২. তা যার উপর দিয়েই বয়ে যেত, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেই ছাড়ত[৫]।	مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۝٤٢

১. অর্থাৎ আজ পর্যন্ত সেখানে ধ্বংসের নিদর্শন বিদ্যমান আছে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে ওদের যে ধ্বংস করে দেওয়া হল, এতে আল্লাহভীরুদের জন্য শিক্ষার উপকরণ রয়েছে।

২. অর্থাৎ মু'জেযা ও দলীল-প্রমাণ দিয়ে।

৩. অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতার অহংকারে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং নিজ জাতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকদের সাথে নিয়ে ডুবল। ফেরাওন বলতে লাগল, 'মূসা হয় খুব চালাক যাদুকর, না হয় পাগল– এ দুইটার একটা না একটা হবেই।'

৪. অর্থাৎ আমি জুলুম করিনি, দোষ ওরই। কারণ, সে-ই কুফর ও অবাধ্যতা অবলম্বন করে, বোঝানোর পরও ফেরেনি। পরিশষে যা বপন করেছিল, তারই ফসল ঘরে তুলল।

৫. الرِّيْحُ الْعَقِيْمُ- অর্থাৎ আযাবের ঘূর্ণিঝড় এল, যা ছিল একেবারে কল্যাণ ও বরকতশূন্য। তা অপরাধীদের মূলোচ্ছেদ করল এবং যেসব জিনিসের উপর দিয়ে প্রবাহিত হল তা চুর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল।

৪৩. এবং (নিদর্শন রেখেছি) ছামূদের ঘটনায়, যখন ওদের বলা হয়েছিল, 'একটা সময় পর্যন্ত মজা লুটে নাও[১]।'	وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ۝
৪৪. অনন্তর ওরা আপন রবের আদেশ অমান্য করল। ফলে ওদের পাকড়াও করল বজ্র, আর ওরা দেখছিল।	فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝
৪৫. তারপর ওরা উঠে দাঁড়াতেও পারেনি এবং আত্মরক্ষাও করতে পারেনি[২]।	فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ۝
৪৬. এবং আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে (ধ্বংস করেছিলাম)। নিশ্চয় ওরা ছিল নাফরমান সম্প্রদায়[৩]।	وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

[রুকূ - ৩]

৪৭. আমি নিজ ক্ষমতায় আসমান নির্মাণ করেছি, আর নিশ্চয়ই আমার ক্ষমতা অতি বিস্তৃত[৪]।	وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝
৪৮. এবং আমি যমীনকে বিছিয়েছি। আর আমি কত সুন্দরভাবে বিছাতে জানি[৫]!	وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ হযরত সালেহ (আ) বললেন, 'আচ্ছা, আরো কিছুদিন দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করে নাও এবং দুনিয়ার উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে নাও। পরিশেষে খোদায়ী আযাবে পাকড়াও হবে।

২. অর্থাৎ ওদের দুষ্কৃতি দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে; শেষ পর্যন্ত খোদায়ী আযাব এসে ওদের পাকড়াও করে। একটি ভয়ঙ্কর শব্দ হল এবং দেখতে দেখতেই সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শক্তি-ক্ষমতা এবং অহংকারপূর্ণ দাবি ও কর্তৃত্ব– সব ধুলায় মিশে গেল। আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়ার পর কেউ একটুও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। প্রতিশোধ নিতে পারা এবং সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকা তো দূরের কথা।

৩. অর্থাৎ ওই সকল জাতির আগে নূহ (আ)-এর জাতি নিজ বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এরাও নাফরমানীর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

৪. অর্থাৎ আকাশের ন্যায় বিশাল-বিস্তৃত বস্তু তিনি নিজ কুদরতে পয়দা করেছেন। আর এর চেয়েও বড় বড় বস্তু পয়দা করা তাঁর জন্য কোন কঠিন নয়।

৫. মোটকথা, পৃথিবী ও আকাশ সবই আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই মুঠিতে। অতএব অবাধ্য অপরাধীরা ভেগে গিয়ে কোথাও আশ্রয় নিতে পারবে না। তাছাড়া বিশ্বস্রষ্টার বিস্ময়কর ও দুর্লভ সৃষ্টি-কৌশল নিয়ে যদি মানুষ চিন্তা করে, তবে তাঁরই বাধ্য হয়ে থাকবে।

৪৯. এবং প্রত্যেক বস্তু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর[১]।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. 'অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

৫১. 'আর আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য স্থির করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে স্পষ্ট সতর্ককারী[২]।'

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫২. এমনিভাবে- এদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট যে রাসূলই এসেছেন, (তাঁর ব্যাপারে) ওরা এ কথাই বলেছে, '(সে) যাদুকর বা পাগল[৩]।'

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. ওরা কি পরস্পরকে এ ওসিয়তই করে এসেছে? না, বরং ওরা চরম অবাধ্য লোক[৪]।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾

---

১. زوجين- অর্থাৎ নর ও মাদী- যেমন: ইবনে যায়েদ (র) বলেছেন। আর বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, সৃষ্টির প্রত্যেক শ্রেণীতে নর ও মাদী উভয় প্রকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। অথবা- زوجين দ্বারা বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী বস্তুনিচয় উদ্দেশ্য। যথা : রাত-দিন, আকাশ-পৃথিবী, আলো-আঁধার, কালো-সাদা, স্বাস্থ্য-ব্যাধি এবং কুফর ও ঈমান ইত্যাদি।

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এবং সমস্ত বিশ্ব এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁরই শাসনাধীন। অতএব বান্দার উচিত, সব দিক থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহরই দিকে অগ্রসর হওয়া। যদি তাঁর দিকে অগ্রসর না হয় ও রুজু না করে, তবে এটা খুবই ভয়ের বিষয়। তদ্রূপ যদি আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো সত্তার দিকে রুজু হয়, তবে এও ভয়ের বিষয়। এই উভয়টির ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করছি।

৩. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট সতর্কতা ও ভয়প্রদর্শন সত্ত্বেও যদি কাফেররা মনোযোগের সাথে না শোনে, তবে চিন্তিত হবেন না। এদের আগেও যেসব কাফের সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো পয়গম্বর এসেছেন, তারা তাঁকে যাদুকর বা উন্মাদ বলে তাঁর নসীহতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের কাফেররা এ বিষয়ে এমনই ঐক্যবদ্ধ যে, মনে হয়- একে অপরকে যেন এ মর্মে ওসিয়ত করে মরেছে যে, যে রাসূলই আগমন করবে তাকে যাদুকর বা পাগল বলে বর্জন করবে। এমন মনে হয়, তবে বাস্তবে এমন ওসিয়ত করেনি। তবে হাঁ, অবাধ্যতার ক্ষেত্রে সকলেই অংশীদার। আর এ অংশীদারিত্বই পরবর্তী অবাধ্যদের দ্বারা সেই কথাই বলায়, যা পূর্ববর্তী অবাধ্যরা বলেছিল।

৫৪. অতএব আপনি ওদের উপেক্ষা করুন। আপনার বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ নেই।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. আর নসীহত করতে থাকুন। কারণ, নসীহত ঈমানদারদের উপকারে আসে[১]।

وَّذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে[২]।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তাদের নিকট কোন জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহই তো রিযিকদাতা, শক্তিশালী, পরাক্রান্ত[৩]।

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾

---

১. অর্থাৎ আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব যথারীতি পালন করেছেন। এখন আর ওদের পিছনে লেগে থাকা ও দুঃখিত হওয়ার বেশি প্রয়োজন নেই। না মানার দায়-দায়িত্ব অবাধ্যদেরই উপর বর্তাবে। হাঁ, বোঝানো আপনার দায়িত্ব। সুতরাং এ ধারা জারি রাখুন। কারণ, যার ভাগ্যে ঈমান কবুল করা আছে, এ বোঝানো তার কাজে আসবে এবং যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে তারা বেশি উপকৃত হবে। আর কাফেরদের উপর আল্লাহর হুজ্জত পূর্ণ হবে। (অর্থাৎ সতর্ক-সাবধান করা হয়নি— এ অভিযোগ করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে —অনুবাদক।)

২. অর্থাৎ তাদেরকে সৃষ্টি করার 'শরঈ' উদ্দেশ্য হল বন্দেগী– আল্লাহর ইবাদত করা। এ জন্যই তাদের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই এমন যোগ্যতা রাখা হয়েছে যে, তারা ইচ্ছা করলে নিজ শক্তিতে বন্দেগীর পথে চলতে পারে। এমনিতে তো আল্লাহর তক্‌দীর ও 'তাকবীনী' (সৃষ্টিগত) ইচ্ছা হিসাবে প্রত্যক বস্তু তাঁর তাক্‌বীনী তথা সৃষ্টিগত হুকুমের সামনে অক্ষম ও অসহায়। তবে এমন এক সময় আসবে, যখন সকল বান্দা (অক্ষম হয়ে নয় বরং) স্বেচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টির এ শরঈ উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করবে।

যা হোক, আপনি বোঝাতে থাকুন। কেননা, বোঝানোর দ্বারাই উক্ত উদ্দেশ্যটি (বন্দেগী) হাসিল হতে পারে।

৩. অর্থাৎ বান্দাদের ইবাদত-বন্দেগীর দ্বারা আমার কোনো ফায়দা নেই, তাদেরই লাভ। আমি এমন মনিব নই যে, গোলামদের বলব, 'আমার জন্য কামাই করে আন, অথবা আমার সামনে খানা এনে রাখ। আমার সত্তা সম্পর্কে এমন ধেয়ান-ধারণার কোন অবকাশ নেই। আমি এ থেকে পবিত্র। আমি তাদের নিকট জীবিকা চাব?! আমি নিজেই তো তাদের

৫৯. বস্তুত এই পাপিদেরও পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে, যেমন এদের (অতীত) সহচরদের পাত্র পূর্ণ হয়েছিল* । সুতরাং এরা যেন আমার নিকট তাড়াহুড়া না করে[১] ।

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝٥٩

৬০. আর কাফেরদের জন্য আছে সেই দিনের দুর্ভোগ, যার ওয়াদা ওদের সাথে করা হচ্ছে[২] ।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝٦٠

জীবিকা দিয়ে থাকি। আরে, আমার ন্যায় শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী সত্তার জন্য তোমাদের খেদমতের কী প্রয়োজন?

ইবাদত-বন্দেগীর হুকুম তো শুধু এজন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা কথায় ও কর্মে আমার মহামান্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব স্বীকার করে আমার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার পাত্র হতে পার। কবি বলেন :

من نہ کردم خلق تا سودے کنم -- بلکہ تا بر بندگاں جودے کنم

(আমি বিশ্ব সৃষ্টি করিনি মুনাফা অর্জনের জন্য, বরং আমি তা সৃষ্টি করেছি বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করার জন্য।)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** '(এই) অপরাধীদের জন্য (আযাবের) অংশ রয়েছে, যেমন এদের (অতীত) সহচরদের (আযাবে) অংশ ছিল'।

১. অর্থাৎ এই জালেমরা যদি আল্লাহর বন্দেগীর দিকে না আসে, তবে বুঝে নাও যে, অন্য জালেমদের ন্যায় এদের নৌকাও (পানিতে) ভরে গেছে, এখন শুধু ভরাডুবির অপেক্ষা। অযথা শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। অপরাপর কাফেরদের উপর খোদায়ী শাস্তি যেমন আপতিত হয়েছে, এদের উপরও পতিত হবেই হবে।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। অথবা হতে পারে, তার পূর্বেই শাস্তির কোনো দিন এসে পড়বে, যেমন মক্কার মুশরিকরা বদরের জেহাদে চরমভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

تم سورة الذاريات ولله الحمد

সূরা তূর

সূরা ৫২ । ৪৯ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

آیاتها ۴۹ , رکوعاتها ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالطُّوْرِ ۝

১. কসম তূর-এর[১],

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۝

২. এবং কিতাবের, যা লিখিত আছে–

فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۝

৩. প্রশস্ত পত্রে[২]।

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۝

৪. এবং কসম আবাদ গৃহের[৩],

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۝

৫. এবং উঁচু ছাদের[৪],

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۝

৬. এবং উদ্বেলিত সমুদ্রের[৫]–

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

৭. আপনার রবের আযাব নিশ্চয় সংঘটিত হবেই।

---

১. الطور– অর্থাৎ 'তূর' পাহাড়, যার উপর আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

২. এই কিতাবের দ্বারা লওহে মাহফূজ, অথবা মানুষের আমলনামা, বা কুরআন কারীম উদ্দেশ্য। কিংবা তূরের প্রসঙ্গ যেহেতু এসেছে তাই তাওরাত উদ্দেশ্য হতে পারে। অথবা সমস্ত আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য। এ সকল সম্ভাবনাই আছে।

৩. সম্ভবত কা'বা শরীফ অথবা কাবাঘরের ঠিক বরাবর সপ্তম আকাশে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাবা উদ্দেশ্য, যাকে 'বাইতুল মামূর' বলা হয়, যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২০৭; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৫৬)

৪. অর্থাৎ আকাশের কসম, যা পৃথিবীর উপর একটি ছাদস্বরূপ। অথবা উঁচু ছাদ আকাশমণ্ডলীর উপরে অবস্থিত মহান আরশকে বলা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, আরশে আজীম জান্নাতের ছাদ। (তাফসীরে কুরতুবী ১৭/৬১)

৫. পৃথিবীর উত্তাল সমুদ্রসমূহ উদ্দেশ্য। অথবা আরশে আজীমের নীচে ও আকাশসমূহের উপরে অবস্থিত মহাসমুদ্র উদ্দেশ্য, যা বিবিধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। (তাফসীরে তবারী ২১/৫৭০)

৮. তার কোন প্রতিরোধকারী নেই[১]।	مَّا لَهٗ مِنۡ دَافِعٍ ۙ﴿۸﴾
৯. যেদিন আকাশ প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে[২],	يَّوۡمَ تَمُوۡرُ السَّمَآءُ مَوۡرًا ۙ﴿۹﴾
১০. এবং পাহাড়-পর্বত দ্রুত চলতে থাকবে[৩]–	وَّ تَسِيۡرُ الۡجِبَالُ سَيۡرًا ﴿ؕ۱۰﴾
১১. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের,	فَوَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿ۙ۱۱﴾
১২. যারা খেল-তামাশায় লিপ্ত থেকে বাজে কথা বলে যাচ্ছে*[৪]!	الَّذِيۡنَ هُمۡ فِيۡ خَوۡضٍ يَّلۡعَبُوۡنَ ﴿ۘ۱۲﴾
১৩. যেদিন ওদের ধাক্কা মেরে মেরে দোযখের দিকে নেওয়া হবে,	يَوۡمَ يُدَعُّوۡنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ؕ۱۳﴾
১৪. (সেদিন বলা হবে) 'এটাই সেই আগুন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে[৫]।'	هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيۡ كُنۡتُمۡ بِهَا تُكَذِّبُوۡنَ ﴿۱۴﴾
১৫. এ কি যাদু, না তোমরাই উপলব্ধি করতে পারছ না[৬]?	اَفَسِحۡرٌ هٰذَاۤ اَمۡ اَنۡتُمۡ لَا تُبۡصِرُوۡنَ ﴿ۚ۱۵﴾

১. অর্থাৎ উল্লিখিত সকল বস্তু, যাদের শপথ করা হয়েছে– এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। অতএব যারা তাঁর নাফরমানী করে, তাদের উপর নিশ্চয়ই আযাব আসবে এবং তাঁর আযাব প্রতিহত করবে এমন শক্তি কারও নেই।

২. অর্থাৎ আকাশ প্রকম্পিত হয়ে ফেটে যাবে।

৩. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত স্বস্থান ত্যাগ করত তুলার গুটিসমূহের ন্যায় উড়তে থাকবে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** '...যারা অসার কর্মকাণ্ডে রত, খেল-তামাশায় মত্ত'।

৪. অর্থাৎ আজ যারা খেল-তামাশায় লিপ্ত থেকে নানা রকম বাজে কথা বলছে এবং আখেরাতকে অস্বীকার করছে, ওদের জন্য সেদিন কঠিন দুর্ভোগ ও ধ্বংস রয়েছে।

৫. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ওদেরকে অত্যন্ত অপমানের সাথে ধাক্কা মেরে মেরে দোযখের দিকে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে পৌঁছার পর বলা হবে, এই সেই আগুন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

৬. অর্থাৎ তোমরা তো দুনিয়াতে নবীদের যাদুকর এবং তাঁদের ওহীকে যাদু বলতে। এখন একটু বল দেখি– এই যে দোযখ, যার সংবাদ নবীরা দিয়েছিলেন, এ কি সত্যিই যাদু বা চোখের ধাঁধাঁ? নাকি দুনিয়াতে যেমন বুঝতে না, এখনো বুঝতে পারছ না?

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর, তারপর সবর কর বা না কর– উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদেরকে তোমরা যা কিছু করতে তারই ফল দেওয়া হবে[১]।

اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৭. নিশ্চয় পরহেযগাররা থাকবে উদ্যানরাজি ও নে'য়ামতের মধ্যে–

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ﴿١٧﴾

১৮. তাদের রব তাদের যা দান করেছেন, তাতে তারা আনন্দিত থাকবে। এবং তাদের রব তাদের দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন[২]।

فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿١٨﴾

১৯. (তাদের বলা হবে), তৃপ্ত হয়ে খাও ও পান কর– তোমরা যেসব আমল করতে তার বিনিময়ে–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে বিছানো আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে[৩]। আর আমি ডাগর চোখবিশিষ্ট হূরদের সঙ্গে তাদের বিবাহ করাব।

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾

---

১. অর্থাৎ দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়ে যদি ঘাবড়ে যাও ও চিৎকার কর, তবে সাহায্য করার কেউ নেই। আর অসম্ভব হলেও ধরা হোক, যদি ধৈর্যধারণ করে চুপ করে থাক, তবুও তোমাদের প্রতি করুণা দেখানোর কেউ নেই। অতএব, দু'অবস্থাই সমান। এ জেলখানা থেকে তোমাদের বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। দুনিয়াতে যা কিছু করেছিলে, তারই শাস্তিস্বরূপ তোমাদের জন্য এই স্থায়ী বন্দিত্ব ও চিরকালীন শাস্তি।

২. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করত, তারা আখেরাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে এবং হরেক রকমের আরাম-আয়েশের উপকরণ তাদের জন্য হাযির থাকবে। আর এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ কী হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের দোযখের আযাব থেকে নিরাপদ রাখবেন?

৩. অর্থাৎ বেহেশতীদের মজলিসের চিত্র এই যে, সকল বেহেশতী বাদশাহদের মত নিজ নিজ আসনে পরস্পরের সামনে বসে থাকবে এবং তাদের আসনগুলোর বিন্যাস হবে খুবই আকর্ষণীয়ভাবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

২১. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকে তাদের সঙ্গে মিলিত করব এবং তাদের থেকে তাদের আমলাদি কিছুমাত্র হ্রাস করব না[১]। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ[২]।

---

১. **পূণ্যবানগণ ও তাদের বংশধরদের জন্য মহা সুসংবাদ**

অর্থাৎ কামেল পুণ্যবানদের সন্তান-সন্ততি ও তাদের সাথে সম্পর্কধারীরা যদি ঈমানের উপর কায়েম থাকে, সেই কামেল ব্যক্তিদের পথের অনুসরণ করে এবং যেসব দীনী খেদমত ওই কামেলগণ করেছিলেন, এরাও সেগুলির পূর্ণতা সাধনে সচেষ্ট থাকে– তবে আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় এদেরকে জান্নাতে কামেলদের সঙ্গে মিলিত করে দেবেন। যদিও এদের আমল ও হাল-অবস্থা কামেলদের চেয়ে নিম্নতর, তবুও সেই বুযুর্গদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য এই অনুসারীদেরকে অনুসরণীয়দের আশেপাশে রাখা হবে। আর কিছু বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায়, হয়ত কাউকে কাউকে ঠিক তাদেরই স্থানে ও স্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে। (কাশফুল আসতার, বর্ণনা ২২৬০)

এখানে এমন মনে করার অবকাশ নেই যে, কামেলদের কতক পুণ্যের ছওয়াব সন্তানদের দিয়ে দেওয়া হবে। না, বরং আল্লাহ এই কৃপা ও অনুগ্রহ করবেন যে, অসম্পূর্ণদের একটু উপরে তুলে কামেলদের স্তরে পৌছিয়ে দেওয়া হবে।

বি. দ্র. অধম আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছি, বুখারী শরীফের (৩৭৮৮) নিম্নোক্ত হাদীস তার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল মনে হয় :

قالت الأنصار (يارسول الله)! إن لكل قوم اتباعا وانّا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل اتباعنا منّا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللّٰهُمَّ اجعل اتباعهم منهم .

('আনসারগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ!] প্রত্যেক কওমের কিছু অনুসারী থাকে। আর আমরা তো আপনার অনুসরণ করেছি। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো'য়া করুন, তিনি যেন আমাদের অনুসারীদের আমাদের দলভুক্ত করে দেন।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! 'তাদের অনুসারীদের তাদের দলভুক্ত করে দিন।')

২. আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহর ফযল তথা দয়া ও কৃপার কথা বলা হয়েছে। আর এখানে তাঁর আদল বা ইনসাফের নীতি বলা হচ্ছে। অর্থাৎ ন্যায়বিচারের দাবি এই যে, মানুষ ভাল বা মন্দ যা কিছু করেছে, সে তা অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে। তবে আল্লাহ চাইলে দয়া- মেহেরবানী করবেন যে, কারো ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেবেন, অথবা কারো মর্তবা বুলন্দ করে দেবেন।

২২. আর আমি তাদের অবিরত এমন ফলমূল ও গোশত দিতে থাকব, যা তাদের মন কামনা করবে[১]।	وَاَمۡدَدۡنٰهُمۡ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحۡمٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩. সেথায় তারা পানপাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, যাতে না আছে অসার কথাবার্তা, না কোন গোনাহ[২]।	يَتَنَازَعُوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا لَّا لَغۡوٌ فِيۡهَا وَلَا تَاۡثِيۡمٌ ﴿۲۳﴾
২৪. আর তাদের কাছে আসা-যাওয়া করবে তাদের জন্য নিয়োজিত কিশোররা– যেন তারা আবৃত মোতি[৩]।	وَيَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ غِلۡمَانٌ لَّهُمۡ كَاَنَّهُمۡ لُؤۡلُؤٌ مَّكۡنُوۡنٌ ﴿۲۴﴾
২৫. এবং তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।	وَاَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ يَّتَسَآءَلُوۡنَ ﴿۲۵﴾
২৬. তারা বলবে, 'আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাকাবস্থায় ভীত ছিলাম।	قَالُوۡۤا اِنَّا كُنَّا قَبۡلُ فِيۡۤ اَهۡلِنَا مُشۡفِقِيۡنَ ﴿۲۶﴾
২৭. 'এখন আমাদের প্রতি আল্লাহ খাস্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লু-হাওয়ার আযাব* থেকে রক্ষা করেছেন।	فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيۡنَا وَوَقٰنَا عَذَابَ السَّمُوۡمِ ﴿۲۷﴾
২৮. 'আমরা ইতিপূর্বে তাঁকে ডাকতাম। নিশ্চয় তিনিই অনুগ্রহশীল, পরম মেহেরবান[৪]।'	اِنَّا كُنَّا مِنۡ قَبۡلُ نَدۡعُوۡهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡبَرُّ الرَّحِيۡمُ ﴿۲۸﴾

---

১. অর্থাৎ যত ধরনের আকর্ষণীয় গোশত আছে এবং যে যে ফল মনে চাইবে, সব অবিলম্বে অবিরত হাযির করা হবে।

২. অর্থাৎ পবিত্র সুরা পানের পালা যখন চলবে, জান্নাতবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করে একে অপরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি-টানাটানি করবে। কিন্তু এই সুরা শুধুই আনন্দদায়ক ও সুস্বাদু হবে। নেশা, বকাবকি, বুদ্ধি-বিলুপ্তি ইত্যাদি কোন কিছুর কারণ হবে না এবং গোনাহরও কোনো উপাদান তাতে থাকবে না।

৩. অর্থাৎ মোতি যেমন নিজ আচ্ছাদনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, ধূলাবালি কিছুই পড়ে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ঠিক এ অবস্থা হবে সেই সেবকদের।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আগুনের আযাব'।

৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা একে অপরের দিকে মুখ করে কথাবার্তা বলবে এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলবে– ভাই! আমরা দুনিয়াতে ভীত-শঙ্কিত ছিলাম, কি জানি মৃত্যুর পর কী পরিণাম

[রুকূ - ২]

২৯. অতএব আপনি নসীহত করুন। আপনি আপনার রবের কৃপায় গণক নন এবং উম্মাদও নন[১]।

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝

৩০. ওরা কি বলে, '(সে) একজন কবি, যার জন্য আমরা কাল-চক্রের প্রতীক্ষা করছি[২]?'

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝

৩১. আপনি বলুন, 'তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক। আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি[৩]।'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝

হয়। এ কথা সর্বদা মনে থাকত। আল্লাহর অনুগ্রহ দেখ, আজ তিনি আমাদের কেমন নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন যে, দোযখের ভাপও আমাদের গায়ে লাগেনি। আমরা ভয়-ভীতির সাথে এবং বুকভরা আশা নিয়ে আমাদের রবকে ডাকতাম। আজ লক্ষ করে দেখ, তিনি নিজ মেহেরবানীতে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে কতই না ভাল ব্যবহার করেছেন।

১. কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো পাগল বলত, কখনো গণক– অর্থাৎ তিনি জিন ও শয়তানদের নিকট থেকে সত্য-মিথ্যা কিছু সংবাদ নিয়ে তা প্রচার করে দেন। ওরা এও বুঝত না যে, আজ পর্যন্ত কোনো গণক ও পাগল কি এমন উচ্চাঙ্গের নসীহত ও হেকমতপূর্ণ নীতিমালা এরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে?

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, 'আপনি ওদের ভাল-মন্দ বোঝাতে থাকুন এবং পয়গম্বরসুলভ নসীহত করতে থাকুন। ওদের আবল-তাবল কথায় ভারাক্রান্ত হবেন না। আল্লাহর ফযল ও রহমতে যখন আপনি গণকও নন এবং উন্মাদও নন, বরং তাঁর পবিত্র রাসূল– তখন নসীহত করতে থাকাটাই আপনার যথাকর্তব্য।'

২. অর্থাৎ নবীজী আল্লাহর যেসব কথা শোনান ও নসীহত করেন, তা কবুল না করার কারণ কি এই যে, ওরা তাঁকে কেবল একজন কবিই মনে করে এবং ওরা প্রতীক্ষা করছে যে, অতীত কালের বহু কবি যেমন কালের ঘূর্ণিচক্রে আপনা আপনিই মরে খতম হয়ে গেছে, তেমনি তিনিও একদিন বিলীন হয়ে যাবেন? (ওরা কি ভাবে,) কোনো উন্নত ও সফল ভবিষ্যত তাঁর নেই, মাত্র কয়েক দিনের সাময়িক বাহবাই তাঁর প্রাপ্য?

৩. অর্থাৎ বেশ, তোমরা আমার পরিণামের অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের পরিণতির অপেক্ষা করছি। শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে যাবে– কে সফল, আর কে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।

৩২. ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি কি ওদের এই শিক্ষা দেয়, না ওরা অবাধ্য সম্প্রদায়[১]?	اَمۡ تَاۡمُرُهُمۡ اَحۡلَامُهُمۡ بِهٰذَاۤ اَمۡ هُمۡ قَوۡمٌ طَاغُوۡنَ ۚ﴿۳۲﴾
৩৩. অথবা ওরা কি বলে, ' সে নিজে এ কুরআন রচনা করেছে?' না, বরং ওরাই ঈমান আনে না।	اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلۡ لَّا یُؤۡمِنُوۡنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. অতএব ওরা তার মত কোন বাণী নিয়ে আসুক যদি ওরা সত্যবাদী হয়[২]।	فَلۡیَاۡتُوۡا بِحَدِیۡثٍ مِّثۡلِهٖۤ اِنۡ كَانُوۡا صٰدِقِیۡنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. ওরা কি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, না ওরাই সৃষ্টিকর্তা?	اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَیۡرِ شَیۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ ﴿۳۵﴾
৩৬. অথবা ওরা কি সৃষ্টি করেছে আসমানসমূহ ও যমীন? না, বরং ওরা বিশ্বাস করে না[৩]।	اَمۡ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ بَلۡ لَّا یُوۡقِنُوۡنَ ﴿۳۶﴾

১. অর্থাৎ পয়গম্বরকে পাগল বলে ওরা যেন নিজেদের খুব বুদ্ধিমান প্রমাণ করছে। তা, ওদের আকল-বুদ্ধি কি এ শিক্ষাই দিচ্ছে যে, একজন পরম সত্যবাদী, বিশ্বাসী, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সত্য পয়গম্বরকে– কবি, গণক বা উন্মাদ সাব্যস্ত করত উপেক্ষা করা হবে? ওরা যদি কবিদের ও গয়গম্বরদের বাণীর মধ্যে পার্থক্যটুকু করতে না পারে, তবে ওরা কেমন বুদ্ধিমান? আসল কথা এই যে, সব কিছুই বোঝে। কিন্তু শুধু দুরাচার ও অবাধ্যতার কারণে নানা কথা তৈরি করে।

২. অর্থাৎ ওদের কি এ ধারণা যে, পয়গম্বর যা কিছু শোনাচ্ছেন তা আল্লাহর কালাম নয়, বরং তা তিনি স্বীয় মন থেকে রচনা করেছেন। এবং মিথ্যার বেসাতি করে খোদার নামে চালিয়ে দিয়েছেন? বস্তুত মানার ইচ্ছা না থাকলে এরূপ হাজার বাহানা করা যায়! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে বিশ্বাস না রাখে ও তা স্বীকার করতে না চায়, সে এই ধরনেরই অর্থহীন সম্ভাবনা বের করে থাকে। নতুবা মানুষ মানতে চাইলে এতটুকু কথাই বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, তারা দুনিয়ার সমস্ত লোককে একত্র করেও এ কুরআনের তুলনা পেশ করতে পারবে না। আর খোদার পৃথিবীর ন্যায় পৃথিবী এবং তাঁর আকাশের ন্যায় আকাশ সৃষ্টি করা যেমন কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তদ্রূপ তাঁর কুরআনের ন্যায় কুরআন রচনা করে আনাও অসম্ভব।

৩. অর্থাৎ ওরা আল্লাহর পয়গম্বরের কথা মানে না কেন? ওদের উপর কি কোনো খোদা নেই, যাঁর কথা মানা ওদের জন্য জরুরী? কোনো স্রষ্টা ছাড়া ওরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি ওরা নিজেরা নিজেদের খোদা মনে করে? অথবা ওদের কি এ ধারণা যে, আসমান ও পৃথিবী ওদেরই সৃষ্টি। সুতরাং এ বিশ্বরাজ্যে যা ইচ্ছা, তাই করে বেড়াবে– তাতে বাধা প্রদানে কারো কোনো ক্ষমতা নেই?

৩৭. ওদের নিকট কি আপনার রবের ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, না ওরাই (সেগুলির) তত্ত্বাবধায়ক[১]?

اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمۡ هُمُ الۡمُصَۜيۡطِرُوۡنَ ؏

৩৮. অথবা ওদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে, যাতে (আরোহণ করে) ওরা শুনে আসে? তা হলে ওদের মধ্যকার শ্রবণকারী নিয়ে আসুক সুস্পষ্ট প্রমাণ[২]।

اَمۡ لَهُمۡ سُلَّمٌ يَّسۡتَمِعُوۡنَ فِيۡهِ ۚ فَلۡيَاۡتِ مُسۡتَمِعُهُمۡ بِسُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ؏

৩৯. তাঁর জন্য কি কন্যাসন্তানরা, আর তোমাদের জন্য পুত্রসন্তানরা[৩]?

اَمۡ لَهُ الۡبَنٰتُ وَلَكُمُ الۡبَنُوۡنَ ؏

৪০. অথবা আপনি কি ওদের নিকট পারিশ্রমিক চান, ফলে ওরা জরিমানার ভারে ভারাক্রান্ত[৪]?

اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ اَجۡرًا فَهُمۡ مِّنۡ مَّغۡرَمٍ مُّثۡقَلُوۡنَ ؏

এসব ধারণা বাতিল ও অহেতুক। ওরাও মনে মনে জানে, অবশ্যই খোদা রয়েছেন, যিনি ওদেরকে এবং সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। কিন্তু এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শরঈভাবে যে ঈমান ও বিশ্বাস কাম্য, তা থেকে ওরা বঞ্চিত।

১. অর্থাৎ ওদের কি এ ধারণা যে, পৃথিবী ও আকাশ খোদারই সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ ভাণ্ডারসমূহের মালিক ওদের বানিয়েছেন? অথবা তাঁর রাজ্য ও ভাণ্ডারসমূহের উপর ওরা কি জোরপূর্বক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য হাসিল করে নিয়েছে? অতএব ভাবছে, এমন কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের মালিক হয়ে ওরা কারো অনুগত ও অধীন হবে কেন?

২. অর্থাৎ ওদের কি এই দাবি যে, ওরা সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশের উপর আরোহণ করে এবং সেখান থেকে ফেরেশতাদের কথা শুনে আসে? যখন সেই দরবারে সরাসরি উপস্থিতির সুযোগ রয়েছে, তাহলে কোনো মানুষের অনুসরণের প্রয়োজন রইল কোথায়? তো, যার এই দাবি, সে নিজ সনদ ও প্রমাণ পেশ করুক।

৩. অর্থাৎ খোদাকে কি ওরা নিজেদের চেয়ে খাটো মনে করে, যেমন পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের উল্লিখিত বণ্টনের দ্বারা বুঝে আসে? এবং সেজন্য মনে হয়, তাঁর হুকুম-আহকাম ও হেদায়াতসমূহের সামনে মাথা নত করাকে নিজেদের অমর্যাদা মনে করে?

৪. অর্থাৎ এরা কি আপনার কথা এজন্য মানে না যে- খোদা না করুন- আপনি নসীহত ও তাবলীগের জন্য ওদের নিকট কোনো ভারী বিনিময় তলব করছেন, যার বোঝা বহনে ওরা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

৪১. কিংবা ওদের নিকট কি অদৃশ্যের (সংবাদ) আছে, ফলে ওরা (তা) লিখে রাখে[১]?

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৪২. ওরা কি কোন চক্রান্ত করতে চায়? তো যারা কাফের, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে[২]।

اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

৪৩. ওদের কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু আছে? ওরা যে শিরক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র[৩]।

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৪৪. ওরা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তবে বলবে, 'এ তো পুঞ্জীভূত মেঘ[৪]।'

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝

৪৫. অতএব আপনি ওদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন, যে পর্যন্ত না ওরা নিজেদের সেই দিনের সম্মুখীন হচ্ছে, যেদিন ওরা বজ্রাহত হবে*–

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ ওদের নিকট কি আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন এবং পয়গম্বরদের মত ওদেরকে নিজ গোপন বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করেন, যা এরা লিখে নেয়, যেমন নবীদের প্রতি প্রেরিত ওহী লিপিবদ্ধ করা হয়? আর এ কারণে কি ওদের জন্য আপনার অনুসরণ নিষ্প্রয়োজন?

২. অর্থাৎ যখন ওই সবের কোনোটাই নয়, তখন ওদের অভিসন্ধি কি এটা যে, ওরা পয়গম্বরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করবে এবং ছল-চাতুরী, প্রতারণা ও গোপন কৌশলাদি অবলম্বন করে সত্যকে পরাজিত করে দেবে? যদি তাই হয়, তবে স্মরণ রাখতে হবে, এ চক্রান্ত ওদেরই উপর উলটে পড়বে! শীঘ্রই ওরা দেখে নেবে, সত্য পরাজিত হয়, না ওরাই নিপাত যায়।

৩. অর্থাৎ ওরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য স্থির করে রেখেছে, যারা বিপদের সময় ওদের সাহায্য করবে এবং যাদের উপাসনা ওদের খোদা-বিমুখ করে রেখেছে? স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সবই ধারণা-কল্পনা ও ওয়াসওয়াসা। আল্লাহর কোনো শরীক ও তুলনা বা প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাধাদানকারী হবে– এ সকল সম্ভাবনা থেকে তিনি অতি পবিত্র।

৪. অর্থাৎ বাস্তবে ওই সবের কোনোটাই নয়, শুধু একটা জিনিসই আছে– জেদ ও শত্রুতা, যে কারণে ওরা প্রত্যেক সত্য বিষয়কে অস্বীকার করতে কোমর বেঁধে লেগেছে। ওদের অবস্থা তো এই যে, ধরুন– যদি ওদের দাবি অনুযায়ী আকাশ থেকে একটি খণ্ড ওদের উপর পতিত হয়, তবু এরও কোনো অপব্যাখ্যা করে বসবে। যেমন বলবে, এ আকাশ থেকে আসেনি, বরং মেঘের একটা টুকরা খুব গাঢ় ও জমাট হয়ে পতিত হয়েছে। যেমন: কোনো কোনো সময় বড় বড় শিলার টুকরা পতিত হয়!! সুতরাং যারা এরূপ গোঁড়া ও অবাধ্য, তাদের থেকে মানার কী আশা করা যায়?

* দ্বিতীয় তরজমা– 'মূর্ছা যাবে/চৈতন্য হারাবে'।

৪৬. যেদিন ওদের চক্রান্ত ওদের কোন কাজে আসবে না, আর ওরা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না[১]।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

৪৭. আর যারা অপরাধ করেছে তাদের জন্য ওই দিনের পূর্বেই আরো একটি আযাব রয়েছে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না[২]।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪৮. আপনি আপনার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধরুন, আপনি তো আমার দৃষ্টিতে আছেন[৩]। এবং আপন রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন যখন আপনি উঠে দাঁড়ান[৪]।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

৪৯. এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তারকারাজির অস্ত-গমনের সময়েও[৫]।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

---

১. অর্থাৎ এরূপ হঠকারীদের পিছনে পড়ার খুব একটা দরকার নেই। এদের চিন্তা ছেড়ে দিন, যাতে আরো কিছু দিন খেল-তামাশা করে নিতে ও কথাবার্তা বানিয়ে নিতে পারে। অবশেষে সেই দিন আসবেই, যেদিন আল্লাহর ক্রোধের বজ্র আঘাত হানবে, ফলে ওরা হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে বসবে এবং বাঁচার কোনো কৌশলই কাজে আসবে না, কোন দিক থেকে কোনো সাহায্যও পৌছবে না।— সম্ভবত এর দ্বারা আখেরাতের দিন উদ্দেশ্য।

২. অর্থাৎ ওদের অধিকাংশের খবর নেই যে, আখেরাতের আযাবের পূর্বে দুনিয়াতেও ওদের জন্য একটি শাস্তি রয়েছে, যা ওরা ভোগ করবেই করবে। সম্ভবত এ দ্বারা বদর প্রভৃতি যুদ্ধের শাস্তি উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে স্বীয় রবের (تکويني وتشريعي) সৃষ্টিগত ও বিধানগত নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন, যা শীঘ্রই আপনার ও ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। আর বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আপনার কোনোই ক্ষতি হতে পারবে না। কারণ, আপনি আমার হেফাজতে ও দৃষ্টিগোচরে আছেন।

৪. অর্থাৎ সবর ও সহনশীলতা এবং স্থিরতার সাথে সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকুন। বিশেষ করে যে সময় আপনি নিদ্রা থেকে ওঠেন, অথবা নামাযের জন্য দাঁড়ান, কিংবা মজলিস থেকে উঠে তাশরীফ নিয়ে যান– এসব অবস্থায় তাসবীহ প্রভৃতির অধিকতর তাগিদ রয়েছে।

৫. 'রাতের অংশ' বলতে সম্ভবত তাহাজ্জুদের সময় উদ্দেশ্য এবং তারকারাজির অস্তগমনের সময় দ্বারা ভোরের সময় উদ্দেশ্য। কারণ, ভোরের আলো এলেই তারাসমূহ অদৃশ্য হতে থাকে।

تم سورة الطور ولله الحمد و المنة

সূরা নজ্‌ম

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৫৩ । ৬২ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٦٢، رُكُوعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ

১. কসম তারকার, যখন তা পতিত হয়[১]!

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ

২. তোমাদের সঙ্গী পথ হারাননি এবং বিপথগামীও হননি[২]।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ

৩. এবং তিনি আপন খেয়াল-খুশী মত কিছু বলেন না।

اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ

৪. তা তো কেবল ওহী, যা (তাঁর কাছে) পাঠানো হয়[৩]।

---

১. অর্থাৎ অস্ত যায়।

২. صاحبكم (সঙ্গী) দ্বারা উদ্দেশ্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আয়াতের অর্থ এই যে, তিনি ভুল বুঝে পথ থেকে বিভ্রান্ত হননি এবং নিজের ইচ্ছায় জেনে-শুনে বিপথগামীও হননি। বরং আকাশের তারকারাজি যেমন উদয় হওয়ার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত গতিতে ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে, কখনো এদিক-সেদিক কক্ষচ্যুত হওয়ার কোনো উপায় নেই– তেমনি নবুওয়াতের সূর্যও সর্বদা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে চলছে, এক কদম এদিক-সেদিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমনটি হলে তাঁর আবির্ভাব যে উদ্দেশ্যে, তা হাসিল হবে না।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম হলেন নবুওয়াত-আকাশের নক্ষত্রমালা, যাঁদের আলো ও পরিভ্রমণে দুনিয়ার হেদায়াত হয়। আর দীপ্তিমান সূর্যের উদয় হয় সমস্ত তারকারাজি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর। তেমনি সমস্ত নবীর অস্তাগমনের পর আরবভূমি থেকে মুহাম্মদী সূর্যের উদয় হয়েছে। অতএব (আল্লাহর) কুদরতে বাহ্যিক নক্ষত্ররাজির ব্যবস্থাপনা যেমন অতি সুশৃংখল ও দৃঢ় যে, তাতে কোনো রকমের কক্ষচ্যুতি এবং একটির কক্ষে অন্যের অনুপ্রবেশের অবকাশ নেই– তেমনি এই বাতেনী নক্ষত্রমালা ও রূহানী চন্দ্র-সূর্যের ব্যবস্থাপনাও অতি পরিপক্ক ও দৃঢ়, কারণ এর সাথে গোটা বিশ্বের হেদায়াত ও সৌভাগ্য সম্পৃক্ত।

৩. অর্থাৎ নিজ খুশীতে কোন কাজ করা দূরে থাক, একটি হরফও নবীজীর পবিত্র মুখ থেকে এমন বের হয় না, যা নফসের খায়েশ তথা প্রবৃত্তির তাড়নাপ্রসূত। বরং দীনের ব্যাপারে তিনি যা কিছু ইরশাদ করেন, তা আল্লাহর পাঠানো ওহী এবং তাঁর হুকুম অনুযায়ীই ইরশাদ

৫. তাঁকে শিক্ষা দান করেছে অত্যন্ত শক্তিশালী,	عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰىۙ۝٥
৬. ক্ষমতার অধিকারী* (ফেরেশতা)[১]। (একদা) সে (নিজ আসনে) সমাসীন হল**।	ذُوْ مِرَّةٍؕ فَاسْتَوٰىۙ۝٦
৭. তখন সে ছিল ঊর্ধ্বদিগন্তে[২]।	وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰىؕ۝٧
৮. অতঃপর সে নিকটবর্তী হল এবং নেমে এল।	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰىۙ۝٨
৯. এমনকি (উভয়ের মধ্যে) দুই ধনুকের সমান ব্যবধান রয়ে গেল, বরং এর চেয়েও বেশি নিকটবর্তী হল।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰىۚ۝٩
১০. অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি পাঠালেন যা পাঠানোর ছিল[৩]।	فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰىؕ۝١٠

করেন। ওহীর মধ্যে 'ওহীয়ে মতলূ' (অর্থাৎ যা নামাযে ও নামাযের বাইরে তেলাওয়াত করা হয়) আছে। একে কুরআন বলা হয়। এবং 'গায়র মতলূ' (অর্থাৎ কুরআনের মত যা তেলাওয়াত করা হয় না, তা) আছে, যাকে হাদীস বলা হয়।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** সৌন্দর্যশালী/প্রজ্ঞার অধিকারী

১. অর্থাৎ ওহী প্রেরণকারী তো আল্লাহ তাআলা। কিন্তু যাঁর মাধ্যমে সেই ওহী রাসূলের নিকট পৌছে এবং যিনি বাহ্যত তাঁকে শিক্ষা দেন, তিনি হলেন শক্তিশালী ও সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট এক ফেরেশতা, যাঁকে জিবরাঈল আমীন বলা হয়। সূরা 'তাকবীর'-এ (১৯-২০) জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে– إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (নিশ্চয় এ কুরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার আনিত বাণী, যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন।)

** **দ্বিতীয় তরজমা–** নিজ আকৃতিতে আবির্ভূত হল।

২. 'ঊর্ধ্ব দিগন্ত' দ্বারা অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট পূর্ব দিগন্ত উদ্দেশ্য, যেদিকে সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়।

নবুওয়াতের প্রথমদিকে একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে একটি আসনে সমাসীন অবস্থায় দেখেছিলেন। তখন মনে হচ্ছিল, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পুরো আকাশ জুড়ে রয়েছে তাঁর অস্তিত্ব। এই অস্বাভাবিক ও ভীতিপ্রদ দৃশ্য প্রথমবার দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘাবড়িয়ে যান। তাতে সূরা 'মুদ্দাছছীর' অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬১)

৩. অর্থাৎ জিবরাঈল তাঁর আসল অবস্থান-স্থলের সাথে সম্পর্ক রাখা সত্ত্বেও নীচে অবতরণ করলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকটবর্তী হয়ে গেলেন যে,

১১. রাসূল যা দেখলেন, সে ব্যাপারে (তাঁর) অন্তর মিথ্যা বলেনি[১]। مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ⑪

১২. তবে কি তিনি যা দেখেছেন, সে বিষয়ে তোমরা তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করছ[২]? اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑫

উভয়ের মধ্যে দুই হাত বা দুই ধনুকের বেশি দূরত্ব ছিল না। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দা (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন। খুব সম্ভব, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা মুদ্দাচ্ছির-এর এই আয়াতগুলো– يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْذِرْ... الخ (হে বস্ত্রাবৃত রাসূল! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন।) অথবা ওহী দ্বারা অন্য বিধি-বিধানও উদ্দেশ্য হতে পারে।

বি. দ্র.

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ আয়াতে أو হরফটি বিজ্ঞ মুফাসসিরদের নিকট সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয়; বরং এ ধরনের বাক্য জোরের সাথে (زيادة) তথা 'বেশি'-কে নাকচ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এখানে সুনির্দিষ্ট করে এটা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, قوسين (দুই ধনুক) পরিমাণ দূরত্বই ছিল বা তার চেয়ে কম। বরং মূল উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, কোনোভাবেই তার চেয়ে বেশি ছিল না।

এ বিষয়ে মুফাসসিরদের আরো মতামত রয়েছে।

১. অর্থাৎ জিবরাঈলকে তিনি নিজ চোখে দেখছিলেন এবং ভিতর থেকে অন্তর বলছিল যে, চোখ ঠিক জিবরাঈলকেই দেখছে। কোন ভুল করছে না এবং এক বস্তুকে অন্য বস্তু ভাবছে না। অন্তরের এই যে কথা (ও সাক্ষ্য), এতে তাঁর অন্তর পূর্ণ সত্যবাদী ছিল। (মোটকথা, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ আস্থার সাথে ফেরেশতাকে চিনতে পারলেন)। আর আল্লাহ তাআলা এরূপেই পয়গম্বরদের অন্তরে ফেরেশতার পরিচয় উদয় করে দেন। কেননা, স্বয়ং রাসূলেরই যদি আস্থা না হয়, তবে অন্যদের আস্থা কীভাবে হাসিল হবে?

২. অর্থাৎ ওহী প্রেরণকারী আল্লাহ, আর তা আনয়নকারী ফেরেশতা। যাঁর আকৃতি-প্রকৃতি অত্যন্ত পবিত্র এবং বুঝশক্তি, স্মরণশক্তি প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই পরিপূর্ণ। অধিকন্তু এতটা নিকটবর্তী হয়ে তিনি ওহী পৌঁছিয়েছেন, পয়গম্বর তাঁকে নিজ চোখে দেখেছেন, তাঁর পরিষ্কার ও উজ্জ্বল অন্তর এর সমর্থন করেছে। তো যে জিনিস এমনভাবে দেখে-শুনে গ্রহণ করা হয়েছে, তার বিষয়ে তোমাদের কি এই অধিকার আছে যে, তাঁর সঙ্গে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করবে এবং বিবাদ-কলহে জড়াবে? কবি বলেছেন :

إذا لم تر الهلال فسلم ÷ لناس رأوه بالأبصار

(যদি তুমি নতুন চাঁদ দেখতে না পাও, তবে যে লোকেরা দেখেছে তাদের কথা মেনে নাও।)

১৩. নিশ্চয় রাসূল তাকে আরো একবার দেখেছেন,	وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ﴿۱۳﴾
১৪. 'সিদরাতুল মুনতাহা'-র নিকটে।	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿۱۴﴾
১৫. —তার নিকটে রয়েছে (শান্তিতে) বসবাসের স্থান জান্নাত[১]—	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ﴿۱۵﴾
১৬. যখন সেই বরই গাছটিকে আচ্ছাদিত করে রাখে যা কিছু (তাকে) আচ্ছাদিত করে রাখে[২]।	اِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشٰى ۙ﴿۱۶﴾

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'দ্বিতীয়বার জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেন মেরাজের রাতে সপ্তম আকাশের উপর, যেখানে কুলবৃক্ষ রয়েছে। এটি উর্ধ্ব ও নিম্নজগতের সীমা। নিম্ন জগতের যারা, তারা এর উপরে যান না এবং উর্ধ্ব জগতের যারা, তারা নীচে আসেন না। আর এর কাছে তিনি বেহেশত দেখলেন।'

বি. দ্র. জান্নাতের আঙ্গুর, আনার ইত্যাদির সাথে যেমন দুনিয়ার ফলমূলের তুলনা চলে না, শুধু নামের মিল থাকে– তেমনি সেই কুলবৃক্ষকেও এখানকার কুলবৃক্ষসমূহের সাথে তুলনা করা যায় না। সেই কুলবৃক্ষ কেমন, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

যা হোক, বৃক্ষটি উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের প্রান্তদেশে অবস্থিত। যে আমল ইত্যাদি নিম্নজগত থেকে উপরে ওঠে এবং যে হুকুম ইত্যাদি উর্ধ্বজগত থেকে অবতরণ করে– এ বৃক্ষ উভয়ের জন্যই সীমান্তের ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন বর্ণনা একত্র করলে তা থেকে বুঝে আসে, বৃক্ষটির মূল ষষ্ঠ আকাশে, আর শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশে বিস্তৃত (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১২৬৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৩)। والله أعلم

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নূর ও তাজাল্লীসমূহ বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করছিল। আর সেথায় ফেরেশতাদের আধিক্য এই পরিমাণ ছিল যে, প্রত্যেকটি পাতার সঙ্গে একজন ফেরেশতা দেখা যাচ্ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে– مايغشى ছিল সোনালী পতঙ্গমালা, অর্থাৎ অত্যন্ত চমৎকার রঙের, যা দেখলে অন্তর আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখন বৃক্ষটির যৌবন, ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য এমনি ছিল যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা কোনো সৃষ্টির পক্ষে সাধ্যাতীত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৩)

মেরাজে নবীজির (স) আল্লাহর দীদার লাভ করার প্রসঙ্গ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখের উক্তি (তিরমিযী, ৩২৭৯) অনুযায়ী মেরাজে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীদার লাভ করেন, সম্ভবত তার বয়ান এ আয়াতেরই দ্ব্যর্থবোধকতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। কেননা, পূর্বের আয়াতগুলি সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর হাদীসসমূহে (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৭) পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সেগুলির দ্বারা প্রভুদর্শন উদ্দেশ্য নয়, শুধু জিবরাঈল (আ)-দর্শন উদ্দেশ্য। ইবনে

আব্বাস (রা)-এর বিশিষ্ট শাগরিদদের অন্যতম মুজাহিদ (র) থেকে মুফাসসির ইবনে কাছীর (র) আলোচ্য আয়াতেরই অধীনে উদ্ধৃত করেন– كان أغصان السدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا فرأه محمد صلى الله عليه وسلم ورأى ربه بقلبه ('কুল গাছের শাখাগুলি ছিল মোতি, ইয়াকুত ও [মূল্যবান পাথর] যাবারজাদের তৈরী। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ দিয়ে তা দেখলেন এবং অন্তরের দ্বারা তাঁর রবকে দেখলেন।')

আর আলোচ্য দর্শন যেহেতু শুধু অন্তরের ছিল না, বরং অন্তর ও চক্ষু উভয়ই দীদারের অংশ লাভ করেছিল, যেমনঃ مازاغ البصر দ্বারা প্রকাশ পায়– সম্ভবত এ জন্যই ইবনে আব্বাস (রা) তবারানী শরীফের কিছু রেওয়ায়াতে (৫৭৬১) বলেছেন– رأه مرتين مرة بقلبه ومرة ببصره ('তিনি আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন– একবার তাঁর অন্তর দ্বারা, আরেকবার চোখের দ্বারা।')— এ হাদীছে দুবার দেখার অর্থ এই যে, একই সময়ে দু'ভাবে দেখেছেন, বাহ্যিক চোখেও এবং অন্তরের চোখেও।

হযরত ইবনে আব্বাসের কথা لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াতের পরিপন্থী নয়

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, এই দীদার সেই দীদার নয়, যাকে لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াতে নাকচ করা হয়েছে। কারণ, لا تدركه দ্বারা উদ্দেশ্য হল পরিবেষ্টন করে নেওয়াকে নাকচ করা। অর্থাৎ দৃষ্টিসমূহ তাঁকে সামগ্রিকভাবে দেখতে ও আয়ত্ত করতে পারে না। তদুপরি ইবনে আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হল, আল্লাহর দীদারের দাবি কি لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ আয়াতের পরিপন্থী? তখন তিনি বললেন– ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره ('আরে এটি তো তখনকার দর্শন, যখন আল্লাহ তাঁর আপন নূরের দ্বারা প্রকাশিত হন।' –তিরমিযী : ৩৫৬৩) বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী ও নূরের বিভিন্ন স্তর রয়েছে– কোন নূর চোখের জন্য অসহনীয়, কোনটি তেমন নেয়। আর রবের দর্শন উভয় স্তরেরই দর্শনকে বোঝায়।

এ জন্যই বলা যায়, আখেরাতে মুমিনরা যে স্তরের দীদার লাভ করবে– তা দুনিয়াতে কারো পক্ষে সম্ভব নয় (তা কেবল আখেরাতেই সম্ভব)। কারণ, আখেরাতে মানব-দৃষ্টিশক্তিকে ঐ তাজাল্লীকে সইবার মত তীক্ষ্ণ করে দেওয়া হবে। হাঁ, এক বিশেষ স্তরের দীদার ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াত অনুযায়ী (দুনিয়াতেই) মেরাজের রাতে আমাদের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাভ করেছিলেন। আর এ বৈশিষ্ট্য তিনি ছাড়া অন্য কারো লাভ হয়নি।

আল্লাহর আনওয়ার ও তাজাল্লীসমূহের উল্লিখিত পার্থক্য ও প্রকারভেদের প্রতি লক্ষ করত বলা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিগুলির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সম্ভবত মা আয়েশা রা. এক স্তরের দীদার অস্বীকার করেন এবং ইবনে আব্বাস রা. অন্য স্তরের দীদারের স্বীকৃতি দেন। আর ঠিক এভাবেই আবু যর (রা)-এর দুই হাদীস رَأَيْتُ نُوْرًا (আমি নূর দেখেছি।) এবং نُوْرٌ أَنَّى أَرَاهُ (একটি নূর– আমি তা কীভাবে দেখব?)— এ দুয়ের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। والله سبحانه وتعالى أعلم

১৭. (তাঁর) দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমাও অতিক্রম করেনি[১]। مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾

১৮. নিশ্চয় তিনি স্বীয় রবের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছেন[২]। لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

১৯. আচ্ছা, তোমরা কি 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ– اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾

২০. এবং তৃতীয় আরেকটা 'মানাত' সম্পর্কে[৩]? وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾

---

১. অর্থাৎ চোখ যা কিছু দেখল, সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ দেখল। দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে ডানে-বাঁয়েও যায়নি এবং দৃশ্যবস্তুর সীমা অতিক্রম করে সামনেও বাড়েনি। ঠিক সেই জিনিসের উপর নিবদ্ধ রয়েছে, যা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। বাদশাহদের দরবারে যে জিনিস দেখানো হয়, তা না দেখা এবং যা দেখানো হয় না, তার দিকে তাকানো– উভয়ই দূষণীয়। নবীজী এই উভয় থেকেই পবিত্র ছিলেন।

২. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ এর ব্যাখ্যায় যা কিছু দেখার আলোচনা করা হয়েছে, তা ছাড়া আরো কত নিদর্শন নবীজী দেখে থাকবেন তা আল্লাহই জানেন। কবির ভাষায়–

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد ز باغباں — بلبل چہ گفت وگل چہ شنید وصبا چہ کرد

'কার সাধ্য যে, মালীকে জিজ্ঞাসা করে– বুলবুলিরা কী বলে গেল, ফুল কী শুনতে পেল এবং প্রভাত-সমীরণ কী করল?'

৩. অর্থাৎ সেই অনন্ত-অসীম ও মহামহিম আল্লাহর বিপরীতে এসব নিকৃষ্ট ও দীন-হীন বস্তুগুলোর নাম নিতে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

বি. দ্র. 'লাত', 'উয্যা' ও 'মানাত' ওদের প্রতিমা ও দেবীদের নাম। এদের মধ্যে 'লাত' তায়েফবাসীদের কাছে খুবই সম্মানিত ছিল। তেমনি 'মানাত' ছিল আউস, খাযরাজ ও খুযাআ গোত্রের নিকট সম্মানিত। আর 'উযযা'-কে কুরায়শ ও বনী কেনানা প্রভৃতি সম্প্রদায় উল্লিখিত দু'টার চেয়ে বড় মনে করত। এদের নিকট মক্কার নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে বিদ্যমান 'উযযা' ছিল প্রথম, এরপর তায়েফের 'লাত' ছিল দ্বিতীয়, এর পর মক্কা থেকে অনেক দূরে মদীনার নিকটে 'মানাত' ছিল তৃতীয় পর্যায়ে। معجم البلدان গ্রন্থে আল্লামা ইয়াকূত এই পর্যায়ক্রম উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে, কুরায়শরা কাবা শরীফের তওয়াফ করার সময় এ শব্দাবলি বলত–

واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هؤلاء الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى

২১. তোমাদের জন্য কি পুত্রসন্তান আর তাঁর জন্য কন্যাসন্তান?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ ﴿٢١﴾

২২. তাহলে এটা তো খুবই অসঙ্গত বন্টন[১]!

تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾

২৩. এগুলো কিছু নামমাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা রেখে নিয়েছ, আল্লাহ এসবের সমর্থনে কোন সনদ অবতীর্ণ

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا

('লাত, উয্‌যা এবং তৃতীয় একটি মানাত– এগুলো অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এগুলোর সুপারিশ পাওয়ার আশা আছে।')

বিশেষ সতর্কীকরণ

তাফসীরের কিতাবাদিতে এখানে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের উসূল মোতাবেক সহীহ নয়। আর যদি বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি থেকেই থাকে, তবে তা হয়ত এতটুকুই যে– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমান ও কাফেরদের এক মিশ্র সমাবেশে এই সূরা পাঠ করেন। কাফেরদের অভ্যাস ছিল, লোকদের কুরআন শুনতে না দেওয়া এবং মাঝখানে হৈ চৈ শুরু করে দেওয়া। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন– وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (কাফেররা বলল, 'তোমরা এই কুরআন শোনার প্রতি কর্ণপাত করো না এবং তার পাঠের ক্ষেত্রে হট্টগোল সৃষ্টি কর, হয়ত এভাবে তোমরা জয়ী হবে।' –হা-মীম সেজদা, আয়াত ২৬) –তো যখন তিনি সূরা নাজ্‌মের এই আয়াত (১৯-২০) পড়লেন, তখন কোনো কাফের শয়তান তাঁর আওয়াজের সাথে আওয়াজ মিলিয়ে তাঁরই ভঙ্গিতে সেসব শব্দ উচ্চারণ করে, যা ওদের মুখে উচ্চারিত হত অর্থাৎ– تلك الغرانيق العلى

পরবর্তীতে এতটুকু বিষয়ই বিভিন্ন জনের মুখে বর্ণিত হতে হতে কী থেকে কী হয়ে যায়!! যা বাস্তবতা বিবর্জিত। ঘটনার কোন সত্যতা থাকলেও তা অতটুকুই, যা উপরে বর্ণিত হল। এর বেশি নয়। কারণ, নবীর মুখে শয়তানের অমন আধিপত্য (যা উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে) হতে পারে না এবং যে বিষয়ের অসারতা সামনে ঘোষণা করা হচ্ছে, নবী তার প্রশংসা করতে পারেন না।

১. معجم البلدان গ্রন্থে ইয়াকূত (র) লিখেছেন, কাফেররা এসব প্রতিমাকে খোদার কন্যা বলত। অথচ খোদা তো এমন, যিনি لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (তিনি কাউকে জন্মও দেননি এবং কারো থেকে জন্মপ্রাপ্তও হননি।) আর যদি তর্কের খাতিরে সন্তানের মতবাদ মেনে নেওয়া হয়, তবে বলতে হয়– এই বণ্টন কতই না অসার ও অসঙ্গত যে, তোমরা নিজেরা পুত্র-সন্তান নিয়ে নিলে, আর আল্লাহর ভাগে কন্যা-সন্তান দিয়ে দিলে।

مِّنۡ سُلۡطٰنٍ ؕ اِنۡ یَّتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهۡوَی الۡاَنۡفُسُ ۚ وَ لَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمُ الۡهُدٰی ﴿ؕ۲۳﴾

করেননি[১]। ওরা তো অনুসরণ করে কেবল অনুমানের ও নফসের কামনা-বাসনার। অথচ ওদের নিকট তো ওদের রবের পক্ষ থেকে পথের দিশা পৌঁছেছে[২]।

اَمۡ لِلۡاِنۡسَانِ مَا تَمَنّٰی ﴿۫ۖ۲۴﴾

২৪. মানুষ কি তাই পায়, যা সে কামনা করে?

فَلِلّٰهِ الۡاٰخِرَۃُ وَ الۡاُوۡلٰی ﴿۲۵﴾

২৫. বস্তুত আখেরাত ও দুনিয়া সবই আল্লাহরই হাতে[৩]।

[রুকূ - ২]

وَ كَمۡ مِّنۡ مَّلَكٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا تُغۡنِیۡ شَفَاعَتُهُمۡ شَیۡـًٔا اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ یَّاۡذَنَ اللّٰهُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَرۡضٰی ﴿۲۶﴾

২৬. আসমানসমূহে কত ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশ কোন উপকারে আসে না যতক্ষণ না আল্লাহই সেই ব্যক্তির জন্য অনুমতি দেন, যার জন্য তিনি চান ও পছন্দ করেন[৪]।

---

১. অর্থাৎ পাথর ও গাছের কিছু নাম রেখে দিয়েছে, যেসবের খোদা হওয়ার কোনো সনদ নেই; বরং এর বিপক্ষে দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এগুলোকে নিজেদের ধারণায় কন্যা বল বা পুত্র অথবা অন্য কিছু – এসব শুধু কথার কথা, বাস্তবতার সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই।

২. অর্থাৎ যদিও আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের আলো এসে গেছে এবং তিনি সরলপথ দেখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এই নির্বোধেরা অবান্তর ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনার অন্ধকারপুঞ্জে ফেঁসে রয়েছে। যা কিছু ধারণা-কল্পনা মাথায় এসে যায় এবং অন্তরে যা কিছু আসক্তি পয়দা হয়, তাই করে বসে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা, অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগানো ইত্যাদির সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক নেই।

৩. অর্থাৎ ওরা মনে করে, এসব প্রতিমা ওদের জন্য সুপারিশ করবে। এটা নিছক ধারণা ও কামনা-বাসনা। কিন্তু মানুষ যা কামনা করবে, তাই কি পাবে? না। স্মরণ রাখতে হবে, দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ আল্লাহর হাতে। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ প্রতিমা-পূজা করলে কী পাওয়া যায়? কিছুই না। পাওয়া যাবে তাই, যা আল্লাহ দেবেন।'

৪. অর্থাৎ এসব প্রতিমা তো দূরে থাক, আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সুপারিশও কোনো উপকার করতে পারে না। হাঁ, আল্লাহ-ই যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও হবেন, তার ক্ষেত্রে সুপারিশ অবশ্যই উপকারে আসবে। তবে বলাই বাহুল্য, তিনি না প্রতিমাদের সুপারিশের অনুমতি দিয়েছেন, আর না তিনি কাফেরদের প্রতি সন্তুষ্ট।

২৭. যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা ফেরেশতাদের নারীবাচক নাম রাখে।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
لَيُسَمُّونَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى ﴿٢٧﴾

২৮. অথচ ওদের এ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে। আর অনুমান সত্যের ব্যাপারে কোন কাজে আসে না[১]।

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ
إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ
الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

২৯. অতএব আপনি তাকে উপেক্ষা করুন, যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا
وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

৩০. ওদের জ্ঞানের সীমা ওই পর্যন্তই[২]। নিশ্চয় আপনার রবই বেশি জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই বেশি জানেন, কে পথপ্রাপ্ত হয়েছে[৩]।

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾

---

১. অর্থাৎ যাদের অন্তরে আখেরাতের বিশ্বাস নেই, তারা শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে নানা ধৃষ্টতা দেখায়– যেমন: ফেরেশতাদেরকে মেয়ে সাব্যস্ত করে খোদার কন্যা বলে। এটা ওদের নিছক মূর্খতা– নর বা নারী হওয়ার সঙ্গে ফেরেশতাদের কী সম্পর্ক? আর খোদার সন্তান-সন্ততি কিভাবে হয়? সত্য ও সঠিক বিষয়ের উপর কায়েম হতে চাইলে কি এরূপ অবান্তর আন্দাজ-অনুমান ও ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনা দ্বারা কাজ চলবে এবং আন্দাজ-অনুমান কি সত্য-সঠিক ও বাস্তব বিষয়াদির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে?

২. অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীই যার একমাত্র চিন্তা-ভাবনা এবং যে তাতে লিপ্ত হয়ে কখনো আল্লাহ ও আখেরাতকে স্মরণ করে না, আপনি তার বাজে কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। সে আল্লাহ তাআলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আপনি ওর দুষ্কৃতি ও বক্রতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। বোঝানো উচিত ছিল, আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এমন দুরাচারী লোকদের কাছে সত্য গ্রহণের আশা রাখা এবং তাদের চিন্তায় নিজেকে ফাঁসানো অর্থহীন। তাদের জ্ঞানের দৌড় তো নিছক দুনিয়ার নগদ লাভ-ক্ষতি পর্যন্ত। এর পরে কী আছে না আছে, সে পর্যন্ত ওদের বিদ্যা-বুদ্ধি পৌছে না। মৃত্যুর পর প্রকৃত মালিকের দরবারে হাযির হয়ে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুরও হিসাব দিতে হবে, তা ওরা কি বুঝবে? ওদের সকল বুদ্ধিগত চেষ্টা-সাধনা চতুষ্পদ জন্তুর মত শুধু পেট ভরা ও কামাগ্নি নির্বাপিত করার জন্যই।

৩. অর্থাৎ যে গোমরাহীতে পড়ে রইল এবং যে সুপথে এল– তাদের সকলকে এবং তাদের গুপ্ত যোগ্যতাসমূহ আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকে জানেন। সে অনুযায়ীই সবকিছু হবে।

৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহরই। ফলে যারা অসৎকর্ম করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন এবং সৎকর্মশীলদের দেবেন উত্তম প্রতিদান[১]–

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

৩২. যারা বেঁচে থাকে বড় বড় গোনাহ ও নির্লজ্জতার কাজকর্ম থেকে[২], তবে সামান্য বিচ্যুতি (-র ব্যাপার ভিন্ন)। নিশ্চয় আপনার রবের ক্ষমা অপরিসীম[৩]। তিনি তোমাদের ব্যাপারে খুব ভালভাবে অবগত, যখন তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন এবং যখন তোমরা স্বীয় মাতৃগর্ভে শিশুরূপে ছিলে।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ

হাজার চেষ্টা করুন, তাঁর ইলমের খেলাফ কিছুই সংঘটিত হবে না। আর তিনি নিজ সর্বব্যাপী ইলম অনুযায়ী প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক তার হাল-অবস্থা অনুযায়ী আচরণ করবেন। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে এ অবাধ্যদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিন।

১. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা আল্লাহর জানা আছে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তুর উপর তাঁরই আধিপত্য। অতএব তিনি যে পূণ্যকর্ম ও মন্দকর্মের প্রতিদান দেবেন, এতে কোন কিছু বাধা হতে পারবে না। বরং চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে, পৃথিবী ও আকাশসমূহের এ বিশাল জগত এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, এর পরিণামে জিন্দেগীর আরেকটি অবিনশ্বর ধারা কায়েম করা হবে, যেখানে পাপাচারীদেরকে পাপের প্রতিদান দেওয়া হবে এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে তাদের পুণ্যের পুরস্কারস্বরূপ উত্তম ব্যবহার করা হবে।

২. কবীরা ও সগীরা গোনাহর পার্থক্য সূরা নিসার তাফসীরে (আয়াত ৩১) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

لَمَمٌ এর বিষয়ে একাধিক উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, গোনাহর যেসব খেয়াল মনে আসে, কিন্তু কাজে পরিণত করা হয় না, তাই 'লামাম'। আবার কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সগীরা গোনাহ উদ্দেশ্য। কারো কারো মতে যে গোনাহর উপর জেদ করা হয় না, অথবা যা অভ্যাসে পরিণত করা হয় না, অথবা যে গোনাহ থেকে তওবা করে নেওয়া হয়– তাই 'লামাম'। আমাদের নিকট সর্বোত্তম তাফসীর তাই, যা বিজ্ঞ মুতারজিম সূরা নিসার ব্যাখ্যায় অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এখানে তরজমার মধ্যে অন্যান্য অর্থেরও অবকাশ রেখেছেন।

৩. এ জন্যই তিনি ছোটখাট গোনাহ ক্ষমা করে দেন এবং তওবা কবুল করেন, গোনাহগারকে নিরাশ হতে দেন না। যদি ছোট-বড় প্রত্যেক ত্রুটি ধরতে শুরু করেন, তবে বান্দার অবস্থা কী হবে?

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

সুতরাং তোমরা নিজেদের গুণকীর্তন করো না। তিনি বেশি জানেন, কে মুত্তাকী[১]।

[রুকূ - ৩]

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ۝

৩৩. আচ্ছা, আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে[২]?

وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ۝

৩৪. এবং সামান্য দান করেছে, অতঃপর ওর অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে[৩]।

---

১. অর্থাৎ যদি তাক্ওয়ার কিছু তাওফীক আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন, তবে আস্ফালন করো না এবং নিজেকে বুযুর্গরূপে জাহির করো না। তিনি সকলের বুযুর্গী ও পবিত্রতা সম্পর্কে উত্তমরূপে জানেন এবং তখন থেকে জানেন, যখন তোমরা অস্তিত্বের এই সীমার মধ্যে পা রাখনি। মানুষের জন্য নিজের গোড়ার কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়– যার সূচনা ছিল মাটি থেকে, এরপর মাতৃগর্ভের অন্ধকারপুঞ্জে নাপাক রক্ত দ্বারা লালিত-পালিত হতে থাকে। তারপর কত কত দৈহিক ও আত্মিক দুর্বলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখন পরিশেষে যদি আল্লাহ নিজ মেহেরবানীতে তাকে কোন বুলন্দ মাকামে পৌছিয়ে দেন, তবে আগে বেড়ে সেটিকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দাবি করার অধিকার তার নেই। যারা সত্যই মুত্তাকী হয়, তারা দাবি করতে লজ্জাবোধ করে এবং বোঝে, দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাওয়া মানবীয় সীমার বাইরে; কিছু না কিছু মলিনতা সকলকেই স্পর্শ করে। কিন্তু আল্লাহ যাকে হেফাজত করেন, তার কথা আলাদা।

২. অর্থাৎ নিজের গোড়ার কথা ভুলে গিয়ে স্রষ্টা ও প্রকৃত মালিকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ কিছুটা ঈমান আনতে শুরু করে, পরে আবার ওর দিল কঠিন হয়ে যায়।'

হযরত মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন, এ আয়াতগুলি 'ওলীদ বিন মুগীরার ব্যাপারে নাযিল হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা শুনে ইসলামের প্রতি ওর কিছুটা আকর্ষণ হচ্ছিল এবং কুফরের শাস্তিকে স্মরণ করে ইসলাম গ্রহণ করার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় অন্য এক কাফের ওকে বলল, 'এমন করবেন না, আমি আপনার সকল অপরাধ আমার মাথার উপর নিয়ে নিচ্ছি। আপনার পক্ষ থেকে আমি শাস্তি ভোগ করব, তবে শর্ত এই যে, আমাকে এত পরিমাণ মাল দিতে হবে।' এতে সে ওয়াদা করে এবং নির্ধারিত অর্থের কিছু অংশ পরিশোধও করে। অতঃপর অবশিষ্টটা দিতে অস্বীকার করে বসে। (তাফসীরে তবারী : ২২/৭২)

৩৫. ওর নিকট কি গায়বের ইলম আছে, ফলে সে দেখে[১]?	أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ۝
৩৬. ওকে কি তা জানানো হয়নি, যা আছে মূসার কিতাবে-	أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۝
৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যিনি (অঙ্গীকার) পূর্ণ করেছিলেন[২]?	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۝
৩৮. (তা এই) যে- কোন বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না[৩],	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝
৩৯. এবং এই যে, মানুষ তা-ই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা-মেহনত করে[৪],	وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝
৪০. আর এই যে, তার চেষ্টা-মেহনত তাকে অবশ্যই দেখানো হবে।	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۝
৪১. অতঃপর তাকে তার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে[৫]।	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ۝

এ প্রেক্ষাপটে وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى এর অর্থ এই হবে যে, সে কিছু অর্থ দিল। এরপর হাত গুটিয়ে নিল।

১. অর্থাৎ সে কি গায়বের কথা জেনে এসেছে যে, ভবিষ্যতে সে কুফরের শাস্তি পাবে না এবং তার জায়গায় অন্যকে দিয়ে নিজে মুক্ত হয়ে যাবে?

২. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) নিজের কথা, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন এবং আল্লাহর হুকুম পূর্ণরূপে আদায় করেছেন। তাঁর আহকাম পালন করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি।

৩. অর্থাৎ মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় এ কথা ছিল যে, আল্লাহর নিকট কোন অপরাধী অন্যের (পাপের) বোঝা বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজ নিজ জবাবদিহি করতে হবে।

৪. অর্থাৎ মানুষ চেষ্টা করে যা কিছু কামাই করে, তা-ই তার। কেউ অন্য কারো পুণ্য নিয়ে নেবে- এ হতে পারে না। অবশ্য কেউ যদি আপন খুশীতে নিজের কতক পুণ্য অন্যকে দিয়ে দেয় এবং আল্লাহ তা মঞ্জুর করে নেন, তবে তা ভিন্ন কথা, যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস ও ইলমুল ফিক্‌হ থেকে জানা যেতে পারে।

৫. অর্থাৎ প্রত্যেকের চেষ্টা-সাধনা তার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

৪২. আর এই যে, আপনার রবেরই নিকট শেষ ঠিকানা[১]।	وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى
৪৩. এবং এই যে, তিনিই হাসান ও কাঁদান,	وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى
৪৪. এবং এই যে, তিনিই মারেন ও বাঁচান।	وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا
৪৫. এবং এই যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া–নর ও নারী[২]।	وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى
৪৬. এক বিন্দু বীর্য থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।	مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى
৪৭. আর এই যে, দ্বিতীয়বার জিন্দা করা তাঁরই দায়িত্বে[৩]।	وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى
৪৮. এবং এই যে, তিনিই সম্পদশালী বানান ও ভাণ্ডার দান করেন[৪]।	وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى

১. অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-গবেষণা এবং অস্তিত্বধারী যাবতীয় বস্তুরাজি আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয় এবং সকলকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে যেতে হবে। সেখান থেকেই প্রত্যেকে পাপ-পুণ্যের ফল লাভ করবে।

২. অর্থাৎ এ জগতে সমস্ত বিপরীতমুখী অবস্থা তিনিই সৃষ্টি করেছেন, ভাল ও মন্দের স্রষ্টা তিনিই। আনন্দ ও দুঃখের অবস্থা প্রদান, হাসানো-কাঁদানো, মৃত্যু দেওয়া ও জীবিত করা এবং কাউকে নর আর কাউকে নারী বানানো তাঁরই কাজ।

৩. অর্থাৎ যিনি এক ফোঁটা পানি থেকে নর ও নারী সৃষ্টি করে দিলেন, (তাঁর পক্ষে) দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি কঠিন? এখানে এক সৃষ্টি দ্বারা দ্বিতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করা হল।

৪. অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ, ধন-ভাণ্ডার, জমা-জমি সবই তাঁর দান।

আর কেউ কেউ أقنى এর অর্থ أفقر করেছেন। অর্থাৎ তিনিই কাউকে ধনী বানান ও কাউকে গরীব বানান। এ অর্থ উপরের বর্ণনাভঙ্গির সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কারণ, বিপরীতমুখী বিষয়াদির আলোচনা চলে আসছে। আর যদি প্রথম অর্থ নেওয়া হয়, তবে أقنى-এর বিপরীতে إهلاك (বা ধ্বংস করা) কে রাখা হবে, যার উল্লেখ সামনে (আয়াত ৫০) আসছে। মর্ম এই দাঁড়াবে যে, ধন-ভাণ্ডার ও অর্থ-সম্পদ দান করে তিনিই আগে বাড়ান। আর তিনিই বড় বড় সম্পদশালী ও শক্তিশালীদের ধ্বংস ও বরবাদ করেন।

৪৯. এবং এই যে, তিনিই শে'রার রব[১]। وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾

৫০. আর এই যে, তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে[২], وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾

৫১. ও ছামূদ সম্প্রদায়কে। অতঃপর (কাউকে) অবশিষ্ট রাখেননি। وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

৫২. এবং পূর্বে (ধ্বংস করেছেন) নূহের সম্প্রদায়কে। নিশ্চয় ওরা ছিল বড় জালেম ও সীমালঙ্ঘনকারী[৩]। وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

৫৩. আর উৎপাটিত জনপদগুলোকে তিনি তুলে নিক্ষেপ করলেন। وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾

৫৪. অতঃপর সেগুলিকে আচ্ছন্ন করল যা আচ্ছন্ন করার ছিল[৪]। فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতএব তুমি আপন রবের কোন্ কোন্ নেয়া'মত সম্বন্ধে সন্দেহ করবে[৫]? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

৫৬. এই (নবীও) অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় একজন সতর্ককারী[৬]। هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

---

১. شعرى একটি অনেক বড় নক্ষত্র। কতক আরববাসী এর পূজা করত এবং বিশ্বব্যবস্থায় এর বিরাট প্রভাব রয়েছে বলে মনে করত। এখানে বলা হচ্ছে যে, شعرى-এর প্রভুও আল্লাহ। দুনিয়ার সমস্ত উলট-পালট (পরিবর্তন) তাঁরই কুদরতের হাতে। شعرى বেচারাও সামান্য এক চাকরের ন্যায় তাঁর হুকুম মেনে চলে। তার মধ্যে স্বতন্ত্র শক্তি-প্রভাব কিছুই নেই।

২. প্রথম আদ বলতে হযরত হূদ আলাইহিস সালামের জাতি উদ্দেশ্য।

৩. ওরা শত শত বছর ধরে খোদার পয়গম্বর নূহ আলাইহিস সালামকে ভয়াবহ দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে, যার বৃত্তান্ত পাঠ করলে কলিজা ফেটে যায়। তাছাড়া ওরা পরবর্তীদের জন্য মন্দ পথ চালু করে যায়।

৪. অর্থাৎ পাথর-বৃষ্টি। (এতে লূৎ সম্প্রদায়ের জনপদগুলির কথা বলা হয়েছে।)

৫. অর্থাৎ এরূপ ফাসাদকারী জালেম ও অবাধ্যদের ধ্বংসসাধনও আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। তো এমন নেয়ামতরাজি দেখেও কি মানুষ নিজ রবকে অস্বীকার করতে থাকবে?

৬. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন (নিজ নিজ উম্মতকে) সতর্ক-সাবধান করে গিয়েছেন, ঠিক তেমনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরাধীদেরকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী।

৫৭. আসন্ন বস্তু (কিয়ামত) নিকটে এসে গেছে।	أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ ۝
৫৮. আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, যে তার সময় পরিষ্কার করে বলবে*১।	لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۝
৫৯. তোমরা কি এ কথাতেই বিস্ময় বোধ করছ?	أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۝
৬০. এবং হাস্‌ছ, আর কাঁদছ না?	وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۝
৬১. আর তোমরা ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত আছ[২]।	وَأَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝
৬২. অতএব আল্লাহর সামনে সেজদা কর এবং ইবাদত কর[৩]।	فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۝

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তা রোধ করতে পারে'।

১. অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যার সঠিক সময় আল্লাহ ছাড়া কেউই স্পষ্ট বলতে পারে না। আর যখন ওই নির্ধারিত সময় এসে পড়বে, তখন কোনো শক্তিই তা রোধ করতে পারবে না। হাঁ, আল্লাহই যদি চান, তবে তা টলে যাবে। কিন্তু তিনি তা চাইবেন না।

২. অর্থাৎ কিয়ামত এবং তার নিকটবর্তিতার সংবাদ শুনে যেখানে খোদার ভয়ে কাঁদতে শুরু করা এবং ঘাবড়ে গিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত ছিল, সেখানে তোমরা উলটা আশ্চর্যবোধ করছ এবং হাসছ! তদুপরি গাফেল ও নিশ্চিন্ত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছ?

৩. অর্থাৎ বুদ্ধিমানের পক্ষে এটা সমীচীন নয় যে, সে পরিণাম সম্পর্কে গাফেল হয়ে নসীহত ও উপদেশ বাণীর প্রতি হাসি-ঠাট্টা করবে। বরং তার উচিত ইবাদত-বন্দেগীর পথ অবলম্বন করা এবং অনুগত ও আজ্ঞাবহ হয়ে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দেওয়া।

বি. দ্র. রেওয়ায়াতসমূহে আছে, সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা করলেন এবং উপস্থিত সকল মুসলমান ও মুশরিকও সেজদায় পতিত হল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১০৭০)

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (র) লেখেন, 'সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্বর্গীয় আচ্ছাদনী সকলকে ঘিরে ফেলে। একটি অদৃশ্য প্রবল শক্তি যেন সকলকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সেজদাবনত করে দিল। শুধু এক হতভাগা, যার অন্তরের উপর কঠিন মোহর লেগে গিয়েছিল, সে সেজদা করল না। কিন্তু সেও জমি থেকে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে নিল এবং বলল, আমার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।'

تم سورة النجم ولله الحمد والمنة

সূরা ক্বামার

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৫৪ । ৫৫ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٥٥، رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

১. কিয়ামত নিকটে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে[১]।

---

১. شق القمر-এর ঘটনা

হিজরতের আগের ঘটনা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় উপস্থিত ছিলেন। কাফেররাও সেখানে সমবেত হয়েছিল। ওরা তাঁর কাছে কোনো নিদর্শন (মুজেযা) তলব করল। তিনি বললেন, 'আকাশের দিকে তাকাও।' অকস্মাৎ চাঁদ ফেটে দুই খণ্ড হয়ে গেল। এক খণ্ড পশ্চিমে ও দ্বিতীয়টি পূর্ব দিকে চলে গেল। মাঝখানে পাহাড় ছিল। অতঃপর যখন সকলে খুব ভাল করে এই মুজেযা দেখে নিল, তখন উভয় খণ্ড পরস্পর মিলে গেল। কাফেররা তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাঁদের উপর বা আমাদের উপর যাদু করেছে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬৭৫০; সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮০০, ২৮০২)

এই মুজেযাকে شق القمر বা চন্দ্রবিদারণ বলে। আর এটা ছিল কিয়ামতের একটি নমুনা ও নিদর্শন । কারণ, তখন সব কিছুই এভাবে ফেটে যাবে।

তাহাবী (র) ও ইবনে কাছীর (র) প্রমুখ এ ঘটনাসম্বলিত হাদীসকে متواتر বলেছেন। তদুপরি আজ পর্যন্ত কোনো জ্ঞানগত ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীল দ্বারা প্রমাণ করা যায়নি যে, এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব। আর শুধু বিস্ময়কর বলে এমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়কে খণ্ডন করা যায় না। বরং বিস্ময়কর হওয়াটা তো মুজেযা (বা অলৌকিকতার) জন্য অত্যাবশ্যক। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাবলিকে কেউ মুজেযা বলবে? ('আলমাহমুদ' পত্রিকায় معجزات وخوارق عادات 'মুজেযা ও অস্বাভাবিক বিষয়াদি' সম্পর্কে আমার স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ছেপেছে। তা দ্রষ্টব্য।)

সংশয় নিরসন

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, شق القمر যদি সংঘটিত হয়েই থাকে, তবে ইতিহাসে এর উল্লেখ নেই কেন? স্মরণ রাখতে হবে যে, এই ঘটনা রাতের বেলার। সূর্যোদয়ের স্থানের বিভিন্নতার কারণে কোনো কোনো দেশে তখন দিন, আর কোনো স্থানে অর্ধরাত। এবং লোকেরা সাধারণত ঘুমন্ত ছিল। আর কোথাও জাগ্রত থেকে থাকলে এবং খোলা আকাশের নীচে বসে থাকলে এ তো জরুরী নয় যে, সকলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর যমীনে চাঁদের যে আলো পড়েছে, তাতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কোন প্রভাব পড়বে না

২. ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, '(এ তো) এক গতানুগতিক যাদু[১]।'

وَإِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝

৩. ওরা অস্বীকার করেছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। আর প্রত্যেক বিষয়ের (সময়) সুনির্ধারিত[★][২]।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝

৪. নিশ্চয় ওদের নিকট এমনসব সংবাদ এসে পৌঁছেছে, যাতে আছে সাবধানবাণী[৩]–

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝

৫. পরিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ কথা। তবু সতর্ককারীরা (ওদের) উপকারে আসে না।

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝

৬. অতএব ওদের উপেক্ষা করুন[৪]।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ

যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে। তদুপরি অল্প সময়ের ব্যাপার ছিল। আমরা দেখি, কতবার চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং বেশ সময় বাকীও থাকে, কিন্তু লাখো মানুষের তার খবরও হয় না। আর সে যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় নক্ষত্ররাজির পরিবর্তন লক্ষ করার এত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এবং পঞ্জিকাসমূহের এত ব্যাপক প্রচলন ছিল না।

যা হোক, ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এই ঘটনার উল্লেখ না থাকায় একে অস্বীকার করা যায় না। তদুপরি 'তারিখে ফেরেশতা' প্রভৃতি গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দুস্তানের 'মালীবার'-এর মহারাজার ইসলাম গ্রহণের কারণ হিসাবে এই ঘটনাই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

১. অর্থাৎ ওরা বলে, 'নবুওয়াতের দাবিদারগণ পূর্বেও এ ধরনের যাদু করেছে। অতঃপর তারা যেমন নিঃশেষ হয়ে গেছে, এও নিঃশেষ হবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'প্রত্যেকটি বিষয় সুনির্ধারিত, (তা কার্যকর হবেই হবে)'।

২. অর্থাৎ ওদের আযাব যথাসময়ে আসবে। আর আল্লাহর জ্ঞানে ওদের যে গোমরাহী ও ধ্বংসের কথা স্থির হয়ে আছে, তা কোনোভাবেই পরিবর্তন হওয়ার নয়।

৩. অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে হররকমের অবস্থা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলি জানানো হয়েছে। ওরা গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে, এগুলোতে পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিরাট হুশিয়ারি রয়েছে।

৪. অর্থাৎ কুরআন কারীম পরিপূর্ণ হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াবলির সমষ্টি। কেউ যদি সদিচ্ছা নিয়ে তাতে দৃষ্টি বুলায়, তবে তা সব অন্তরের ভিতরে ঢুকে যেতে থাকবে। কিন্তু আফসোস! হেদায়াতের এত উপকরণ থাকতেও ওদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কোনো নসীহত ও পরামর্শ ওদের মধ্যে প্রভাব ফেলে না। যতই বোঝাও, পাথরের উপর দাগ পড়ে না।

যেদিন আহবানকারী (ফেরেশতা) এক অপ্রিয় জিনিসের দিকে আহবান করবে[১]–	يَوۡمَ يَدۡعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىۡءٍ نُّكُرٍ ۙ﴿۶﴾
৭. সেদিন চোখগুলি অবনমিত অবস্থায়[২] ওরা কবর থেকে এভাবে বের হয়ে আসবে, যেন ওরা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল–	خُشَّعًا اَبۡصَارُهُمۡ يَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ كَاَنَّهُمۡ جَرَادٌ مُّنۡتَشِرٌ ۙ﴿۷﴾
৮. দৌড়ে যেতে থাকবে সেই আহবানকারীর দিকে[৩]। কাফেররা বলবে, 'এ বড়ই কঠিন দিন[৪]।'	مُّهۡطِعِيۡنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوۡلُ الۡكٰفِرُوۡنَ هٰذَا يَوۡمٌ عَسِرٌ ﴿۸﴾
৯. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল। ওরা আমার বান্দাকে অস্বীকার করল এবং বলল, '(এ) উন্মাদ'। এবং তাঁকে হুমকি দেওয়া হল[৫]।	كَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ فَكَذَّبُوۡا عَبۡدَنَا وَقَالُوۡا مَجۡنُوۡنٌ وَّازۡدُجِرَ ﴿۹﴾

সুতরাং এমন পাষাণ-হৃদয় হতভাগাদের প্রতি আপনিও দৃষ্টিপাত করবেন না। আপনি তাবলীগ ও দাওয়াতের দায়িত্ব উত্তমরূপে পালন করেছেন। এখন আর ওদের পিছনে পড়ে থাকার প্রয়োজন নেই। ওদেরকে নিজেদের ঠিকানার দিকে যেতে দিন।

১. অর্থাৎ হিসাব দেওয়ার জন্য হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবে।

২. অর্থাৎ তখন ভয় ও আতঙ্কের কারণে লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে চোখগুলিকে অবনমিত করে রাখবে।

৩. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে কবর থেকে উঠে পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ তাআলার আদালতে হাযিরা দেওয়ার জন্য দ্রুতগতিতে দৌড়াতে থাকবে।

৪. অর্থাৎ সে দিনের ভয়ঙ্কর অবস্থা ও কঠিন পরিস্থিতি এবং নিজেদের পাপাচারের কথা চিন্তা করে ওরা বলবে, এ বড়ই কঠিন দিন, না জানি আজ কী হয়।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সামনে বলা হচ্ছে, কিয়ামত ও আখেরাতের আযাব তো যথাসময়ে আসবেই। অস্বীকারকারীদের অনেকে তার পূর্বে দুনিয়াতেই কঠিন দিনের সম্মুখীন হয়েছে।

৫. ওরা বলতে লাগল, হে নূহ! তুমি যদি নিজ কথাবার্তা থেকে ফিরে না আস, তবে তোমাকেও পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হবে। এভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করল।

আর কেউ কেউ وازدجر এর এ অর্থ করেছেন যে, এই ব্যক্তি জিন দ্বারা আক্রান্ত। জিনেরা এর আকল উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

১০. তখন তিনি নিজ রবকে ডেকে (বললেন), 'আমি অক্ষম হয়ে গিয়েছি, সুতরাং আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন[১]।'

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ⑩

১১. অতএব আমি আকাশের দ্বারগুলি খুলে দিলাম মুষলধারে বর্ষণশীল পানির দ্বারা।

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ⑪

১২. এবং ভূমি থেকে উৎসারিত করলাম ঝরনা-মালা। তারপর সব পানি মিলে গেল পূর্বনির্ধারিত একটি কাজের উদ্দেশ্যে[২]।

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫

১৩. আর আমি নূহকে আরোহণ করিয়ে দিলাম তখতা ও পেরেক-নির্মিত একটি নৌযানে–

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ⑬

১৪. যা আমার দৃষ্টির সামনে চলছিল[৩]। (আমি এ আযাব দিয়েছি) তাঁর পক্ষ থেকে বদলা নেওয়ার জন্য, যাঁর অবমূল্যায়ন করা হয়েছে[৪]।

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑭

১৫. আর আমি তা রেখে দিয়েছি নিদর্শনস্বরূপ*,

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً

---

১. অর্থাৎ শত শত বছর যাবৎ বোঝানোর পরও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন তিনি বদ-দো'য়া করলেন এবং বললেন, 'হে প্রভু! আমি এদের ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়েছি, হেদায়াত ও নসীহতের কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি। এখন আপনি নিজ দীন ও পয়গম্বরের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন এবং মাটির উপর কোনো কাফেরকে জীবিত রাখবেন না।'

২. অর্থাৎ মুষলধারে এই পরিমাণ পানি বর্ষিত হল, যেন আকাশের মুখগুলি খুলে গিয়েছিল এবং নীচ থেকে যমীনের পর্দা ফেটে গিয়ে এত বেশি পানি উথলে উঠেছিল, যেন সমস্ত পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রস্রবণের সমষ্টিতে পরিণত হল।

এরপর উপরের ও নীচের সমস্ত পানি মিলে সে কাজের জন্য একত্র হয়ে গেল, যা ইতিপূর্বেই আল্লাহর দরবারে সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ নূহ (আ)-এর জাতির ধ্বংস ও পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয়।

৩. অর্থাৎ ওই ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি ও মহাপ্লাবনের সময় নূহের নৌকা আমার হেফাজত ও তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত নিরাপদে চলছিল।

৪. অর্থাৎ যারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অবমূল্যায়ন ও আল্লাহ তা'আলার কথা অস্বীকার করল, তারা এ শাস্তি পেল।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'আমি তাকে বানিয়েছি এক নিদর্শন'।

অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী[১]?

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑮

১৬. সুতরাং (লক্ষ কর), কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ[২]?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ⑯

১৭. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী[৩]?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑰

১৮. আ'দ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল। অতএব (লক্ষ কর), কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ⑱

---

১. অর্থাৎ চিন্তাশীল লোকদের জন্য এ ঘটনার মধ্যে শিক্ষার বহু উপাদান রয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, আজ নৌকার অস্তিত্ব আমাদেরকে সেই নৌকার কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এটি আল্লাহ তাআলার মহাকুদরতের একটি নিদর্শন। আর কেউ কেউ বলেছেন, হুবহু সেই নৌকাটিই নূহ (আ)-এর পরও অনেক যুগ পর্যন্ত 'জূদী' পর্বতের উপর বিদ্যমান ও দৃশ্যমান ছিল, যা এ উম্মতের (কিছু) লোকেরাও দেখেছে।

২. অর্থাৎ দেখলে তো, আমার আযাব কেমন ভয়ঙ্কর ও সতর্কীকরণ কেমন সত্য!

৩. অর্থাৎ কুরআন থেকে নসীহত হাসিল করা একেবারে সহজ। কেননা, এর যে আয়াতগুলো উৎসাহ-প্রদান, ভয়-প্রদর্শন এবং সতর্কীকরণ ও সুসংবাদ প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা একেবারে স্পষ্ট, সহজ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী। তবে সেই বুঝবে, যে চিন্তা করার ও বোঝার ইচ্ছা করবে। (সহজ হওয়া সত্ত্বেও কারো যদি বোঝার ইচ্ছাই না থাকে, সে বুঝবে কীভাবে?)

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

আয়াতের এ অর্থ নয় যে, কুরআন একটি ভাষা-ভাষা জ্ঞানের কিতাবমাত্র, যার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম, গভীর ও নিগূঢ় বিষয়াবলি নেই। মহাজ্ঞানী ও মহাজ্ঞাতা আল্লাহর মহান কালাম সম্বন্ধে এমন ধারণা কী করে করা যায়? তবে কি ধরে নেওয়া হবে যে, যখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনি আপন অসীম ইলম ও জ্ঞান থেকে রিক্ত হয়ে যান? নিশ্চয়ই না। বস্তুত তাঁর কালামের মধ্যে এমন গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিহিত রয়েছে, যা অন্য কারো কালামে থাকা অসম্ভব। এ জন্যই হাদীছে এসেছে– لاتنقضي عجائبه (কুরআনের বিস্ময়কর ও নিগূঢ় বিষয়াদি কখনো শেষ হওয়ার নয়।) (শুআবুল ঈমান, হাদীস : ১৮৩২; ফাযায়েলুল কুরআন, ইবনে কাসীর, হাদীস : ৩; হাদীসটি মাওকূফ) এই উম্মতের আলেমগণ ও মিল্লাতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণ এই মহাগ্রন্থের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয়াদির অন্বেষণে এবং হাজার হাজার হুকুম-আহকাম বের করণে আপন জীবন ব্যয় করে দিয়েছেন, তবুও এর তলদেশ পর্যন্ত পৌছতে পারেননি।

১৯. আমি ওদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম এক দীর্ঘ দুর্দশার দিনে[১]–

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝

২০. যে বায়ু লোকদের এমনভাবে উপড়ে ফেলছিল, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের শিকড়[২]।

تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ۝

২১. অতএব (লক্ষ কর), কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۝

২২. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

[রুকূ - ২]

২৩. ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল[৩]।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۝

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ওরা খতম না হওয়া পর্যন্ত আপদ কাটল না। আর এই দিনটি অশুভ ছিল ওদেরই জন্য, সদা-সর্বদার জন্য নয়।' যেমনটি জাহেলদের মাঝে প্রসিদ্ধ।

সেই দিনটি যদি আযাব আগমনের কারণে সর্বদার জন্য অশুভ হয়ে যায়, তবে বরকতময় কোন দিনই থাকবে না। কেননা কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সেই আযাব সাত রাত ও আট দিন বিদ্যমান ছিল। (এখন আযাবের কারণে কোন দিন সর্বদার জন্য অশুভ হলে সব দিনই অশুভ সাব্যস্ত হবে।) এবার বলুন, তাহলে সপ্তাহের কোন্ দিনটি অমঙ্গল থেকে খালি থাকবে?

২. 'আদ জাতি'র লোকেরা বলিষ্ঠ ও বিশাল ছিল। কিন্তু প্রবল বায়ু ওদের এমনভাবে মাটির উপর আছড়িয়ে ফেলছিল, যেমন খেজুর গাছের কাণ্ড শিকড় থেকে উপড়িয়ে মাটির উপর নিক্ষেপ করা হয়।

৩. অর্থাৎ ওরা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করল। আর একজন নবীকে অস্বীকার করা মানে সকল নবীকে অস্বীকার করা। কেননা, দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে সকল নবীই একে অপরের সমর্থক।

২৪. ওরা বলল, 'আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার একজন মানুষের কথা মত চলব? তা হলে তো আমরা ভ্রান্তি ও পাগলামিতে নিপতিত হব[১]।

فَقَالُوٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّفِیْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿۲۴﴾

২৫. 'আমাদের সকলের মধ্য থেকে তারই উপর নসীহত অবতীর্ণ করা হল? না, বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক[২]।'

ءَاُلْقِیَ الذِّكْرُ عَلَیْهِ مِنْۢ بَیْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿۲۵﴾

২৬. আগামী কালই ওরা জানতে পারবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক[৩]।

سَیَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿۲۶﴾

২৭. আমি ওদের পরীক্ষার জন্য উটনী পাঠাচ্ছি[৪]। অতএব তুমি ওদের পর্যবেক্ষণ করতে থাক এবং ধৈর্য ধর[৫]।

اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿۲۷﴾

২৮. আর ওদের জানিয়ে দাও যে, পানি ওদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। পানির প্রত্যেক অংশে (কেবল তার হকদার) উপস্থিত হবে[৬]।

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَیْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿۲۸﴾

---

১. অর্থাৎ এই লোকটি আকাশের কোনো ফেরেশতা নয়, বরং আমাদের মতই একজন মানুষ। আর সে একা, তার সঙ্গে কোনো দলবল নেই। অথচ সে আমাদের বশীভূত করতে ও সকলকে নিজের অধীন বানিয়ে নিতে চায়। এ কখনই হবে না। আমরা যদি এ ফাঁদে পড়ি, তবে আমাদের বিরাট ভুল ও বোকামী, বরং পাগলামি হবে। সে তো আমাদের এ ভয় দেখায় যে, তাকে না মানলে আগুনে পতিত হব। অথচ ঘটনা এই যে, আমরা তার অনুসারী হয়ে গেলে আমরা নিজেরাই যেন নিজেদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব।

২. অর্থাৎ পয়গম্বরীর জন্য একমাত্র তিনিই আছেন? এ সবই মিথ্যা। অহেতুক বড়াই করছে যে, খোদা আমাকে তাঁর রাসূল বানিয়েছেন এবং সমগ্র জাতিকে আমার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন!

৩. অর্থাৎ অতিসত্বর ওরা জানতে পারবে, দু'দলের মধ্যে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী কে?

৪. অর্থাৎ ওদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি পাথর থেকে উটনী বের করে পাঠাচ্ছি। এর দ্বারা পরীক্ষা করা হবে যে, কে আল্লাহ ও রাসূলের কথা মানে আর কে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

৫. অর্থাৎ দেখতে থাকুন, কী ফল প্রকাশ পায়।

৬. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সেই উটনী পানির যে ঘাটে যেত, সকল জন্তু সেখান থেকে ভেগে যেত। তখন আল্লাহ তাআলা (পানি পানের) পালা ঠিক করে দিলেন– একদিন উটনী যাবে, দ্বিতীয় দিন অন্য সব জন্তু যাবে।'

২৯. অতঃপর ওরা নিজেদের সহচরকে ডাকল। আর সে হাত চালাল এবং কেটে ফেলল[১]।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ۝

৩০. অতএব (লক্ষ কর), কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কীকরণ?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۝

৩১. আমি ওদের উপর একটিমাত্র গুরুগর্জন পাঠালাম। ফলে ওরা খোঁয়াড় নির্মাণকারীর দলিত-মথিত বেড়ার ন্যায় হয়ে গেল[২]।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

৩২. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

৩৩. লূতের সম্প্রদায় সতর্ককারীদের অস্বীকার করেছিল[৩]।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ۝

৩৪. আমি ওদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় পাঠিয়েছিলাম– তবে লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদের শেষ রাতে রক্ষা করেছিলাম–

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۝

৩৫. আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যে শোকর করে, তাকে আমি এভাবেই বিনিময় দান করি[৪]।

نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ۝

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এক ব্যভিচারী মেয়ে ছিল, ওর চতুষ্পদ জন্তু ছিল অনেক। সে নিজের এক বন্ধুকে উত্তেজিত করে দিল, ও উটনীর পায়ের রগ কেটে দিল।'

২. ফেরেশতা একটি চিৎকার দিলে ওদের কলিজা ফেটে যায় এবং ওরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন ক্ষেতের চারপাশে কাঁটার বেড়া লাগিয়ে দেওয়া হয়, আর কিছু দিন পর তা পদদলিত হয়ে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে যায়।

৩. অর্থাৎ ওরা হযরত লূৎ আলাইহিস সালামকে অস্বীকার করল। আর এক নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সকল নবীকেই অস্বীকার করা।

৪. অর্থাৎ লূত (আ.) শেষ রাতে নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে বের হয়ে গেলেন, আমি তাঁদের গায়ে আযাবের একটু আঁচও লাগতে দেইনি। আর এটাই আমার নীতি। সত্যের অনুসারী ও কৃতজ্ঞ বান্দাদের আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৩৬. লূত নিশ্চয়ই আমার পাকড়াও সম্পর্কে ওদের সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু ওরা সর্বপ্রকার সতর্কীকরণ নিয়ে সন্দেহ করতে লাগল[১]।

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৭. আর ওরা লূতকে তাঁর মেহমানদের বিষয়ে ফুসলাতে চাইল। তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করে দিলাম, (আর বললাম,) 'এখন আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং আমার সতর্কীকরণ (-এর পরিণাম)[২]।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

৩৮. আর ভোরবেলায় ওদের উপর এমন শাস্তি আপতিত হল, যা স্থির হয়ে থাকল।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

৩৯. 'এখন আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও আমার সতর্কীকরণ (-এর পরিণাম)[৩]।

فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

৪০. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

[রুকূ - ৩]

৪১. ফেরাওনের লোকদের কাছেও সতর্ককারীরা এসেছিল[৪]।

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

---

১. অর্থাৎ তাঁর কথার মধ্যে অযথা সন্দেহ ও বিবাদ সৃষ্টি করল এবং তা অস্বীকার করল।

২. অর্থাৎ যে ফেরেশতারা সুন্দর বালকের আকৃতি ধারণ করে আগমন করেছিলেন, ওরা তাঁদের মানুষ মনে করল এবং নিজেদের চারিত্রিক অনৈতিকতার কারণে তাঁদেরকে কব্জায় নিতে চাইল। তখন আমি ওদের অন্ধ করে দিলাম। ফলে এদিক সেদিকে ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল, কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। আমি বললাম, 'নাও! প্রথমে এ আযাবের স্বাদ আস্বাদন কর।'

৩. অন্ধ করে দেওয়ার পর ওদের বসতিগুলো উলটিয়ে দেওয়া হয় এবং উপর থেকে পাথর বর্ষিত হয়। ছোট আযাবের পর এ ছিল বড় আযাব।

৪. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ), হারূন (আ) ও সতর্ককারী নিদর্শনাদির আগমন হয়েছিল।

৪২. ওরা আমার সকল নিদর্শন অস্বীকার করল। তাই আমি ওদের এমন পাকড়াও করলাম, যেমন পাকড়াও হয় পরাক্রমশালী শক্তিমানের[১]।	كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝
৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি ওই সকল কাফের থেকে ভাল, না কি তোমাদের জন্য (আসমানী) কিতাবসমূহে মুক্তির সনদপত্র আছে?	اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ۝
৪৪. না কি ওরা বলে, 'আমরা আত্মরক্ষায় সক্ষম এক সংঘবদ্ধ দল[২]?'	اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝
৪৫. এই দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে[৩]।	سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝
৪৬. বস্তুত কিয়ামত হচ্ছে ওদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত অতি ভয়ঙ্কর, অনেক তিক্ত[৪]।	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝

১. অর্থাৎ খোদার পাকড়াও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, যাঁর পাকড়াও থেকে বের হয়ে কেউই পালাতে পারে না। দেখে নাও! কীভাবে তিনি সমস্ত ফেরাওনী লোকদের লোহিত সাগরে ডুবিয়ে দিলেন– একজনও বেঁচে বের হতে পারেনি।

২. অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলি শুনিয়ে বর্তমান লোকদের বলা হচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি পূর্বেকার কাফেরদের চেয়ে ভাল যে, কুফর ও ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও এদের ধ্বংস করা হবে না? অথবা আল্লাহর দরবার থেকে কি মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ইচ্ছামত দুষ্কৃতি করতে থাক, তোমাদের শাস্তি হবে না? অথবা এরা কি এমন ভাবছে যে, আমাদের জনবল অনেক বেশি ও সংঘবদ্ধ, আমরা সকলে যখন একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসব, তখন অন্য সকলের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব এবং কাউকেই আমাদের মোকাবেলায় বিজয়ী হতে দেব না?

৩. অর্থাৎ অতি শীঘ্রই এদের দলবলের অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যাবে, যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে পিঠ দেখিয়ে পলায়ন করবে। 'বদর' ও 'আহযাব' যুদ্ধে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এই আয়াত পঠিত হচ্ছিল।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ার পরাজয় আর কী? ওদের পরাজয়ের আসল সময় তো হবে তখন, যখন কিয়ামত মাথার উপর এসে দাঁড়াবে! তা হবে অতি কঠিন বিপদের সময়।

৪৭. নিশ্চয় অপরাধীরা ভ্রান্তি ও পাগলামিতে পড়ে আছে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ۝٤٧

৪৮. যেদিন ওদেরকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে উপুড় করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে (সেদিন ওদের বলা হবে,) 'আস্বাদন কর জাহান্নামের যন্ত্রণা[১]।'

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝٤٨

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি[২]।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ۝٤٩

৫০. আমার কাজ তো চোখের পলক ফেলার মত এক মুহূর্তেই হয়ে যায়[☆][৩]।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۝٥٠

৫১. নিশ্চয় আমি তোমাদের সমমনা লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী[৪]?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝٥١

৫২. ওরা যা কিছু করেছে, তার সবই আমলনামাসমূহে লিখিত আছে[৫]।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۝٥٢

---

১. অর্থাৎ এখন ওরা গাফলতের নেশায় ডুবে আছে। এই গাফলত ও উদাসিনতা মস্তিষ্ক থেকে তখন বের হবে, যখন ওদের টেনে-হেঁচড়ে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আর বলা হবে, 'নাও! এখন এর একটু মজা ভোগ কর।

২. অর্থাৎ আসন্ন প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর জ্ঞানে প্রথম থেকে নির্ধারিত রয়েছে। দুনিয়ার বয়স ও কিয়ামতের সময়ও তাঁর জ্ঞানে স্থিরীকৃত আছে। কিয়ামত তার আগে বা পরে হতে পারে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'আমার আদেশ তো একটি মাত্র কথার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়ে যায়– চোখের পলক ফেলার মত (দ্রুত)।

৩. অর্থাৎ আমি চোখের পলকে যা ইচ্ছা করে ফেলি। কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে বা নষ্ট করতে মোটেই দেরি হয় না, কোন কষ্টও হয় না।

৪. অর্থাৎ তোমাদের সমমনা বহু কাফেরকে পূর্বে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব তোমাদের মধ্যে কি চিন্তাশীল কেউ নেই, যে ওদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে?

৫. অর্থাৎ আমল করার পর প্রত্যেক ভাল-মন্দ আমল ওদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। যথাসময়ে ঐ সমস্ত আমলনামা সামনে আনা হবে।

৫৩. এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ রয়েছে[১]।

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ۞

৫৪. নিশ্চয় পরহেযগাররা থাকবে উদ্যানরাজি ও প্রস্রবনসমূহে–

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۞

৫৫. যথাযোগ্য স্থানে*, সর্বশক্তিমান শাহানশাহর সান্নিধ্যে[২]।

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۞

---

১. অর্থাৎ তার পূর্বে ছোট-বড় প্রত্যেক বস্তু বিস্তারিতভাবে লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সমস্ত খাতা-পত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে, ছোটখাট কোনো জিনিসও এদিক সেদিক হতে পারবে না।

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'পছন্দসই স্থানে।'

২. অপরাধীদের পর এখানে মুত্তাকীদের পরিণাম বর্ণিত হচ্ছে। তারা নিজেদের সততার বদৌলতে আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদা অনুযায়ী এমন পছন্দসই স্থানে থাকবে, যেখানে ওই অদ্বিতীয় রাজাধিরাজের (মহান আল্লাহর) সান্নিধ্য হাসিল হবে।

اللّٰهُمَّ إنك مليك مقتدر، ماتشاء من أمر يكون، فاسعدني في الدارين، وكن لي ولاتكن علي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار.

تم سورة القمر ولله الحمد والمنة

সূরা রহমান

সূরা ৫৫ । ৭৮ আয়াত । ৩ রুকূ । মাদানী

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ

آياتها ٧٨، ركوعاتها ٣

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সীমাহীন মেহেরবান (আল্লাহ) — اَلرَّحْمٰنُ ۝

২. কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন[১]। — عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝

৩. মানুষ সৃষ্টি করেছেন। — خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝

৪. (অতঃপর) তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন[২]। — عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

৫. সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসাবের অধীন[৩]। — اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

১. পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার দানসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান এবং তাঁর নে'য়ামতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ নে'য়ামত ও রহমত। মানুষের শক্তি-সামর্থ্য এবং তার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি লক্ষ করুন, অপর দিকে কুরআনের অনন্ত-অসীম জ্ঞান-সমুদ্রকে দেখুন। নিঃসন্দেহে এমন দুর্বল সৃষ্টিকে (অর্থাৎ মানুষকে) আকাশ ও পর্বতের চেয়ে অধিক ভারী জিনিসের বাহক বানিয়ে দেওয়া পরম দয়াময়েরই কাজ হতে পারে, নতুবা কোথায় মানুষ আর কোথায় আল্লাহর কালাম!

বি. দ্র. সূরা নাজম-এ আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন- عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى (তাঁকে শিক্ষা দান করেছে অত্যন্ত শক্তিশালী ফেরেশতা)। আর এখানে স্পষ্ট করে দিলেন যে, কুরআনের আসল শিক্ষাদাতা হচ্ছেন আল্লাহ, যদিও ফেরেশতার মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন হয়েছে।

২. অস্তিত্ব দান করা আল্লাহর বিরাট নে'য়ামত, বরং নে'য়ামতসমূহের মূল। এই অস্তিত্ব দান আবার দু'রকম- দেহের অস্তিত্ব দান ও গুণের অস্তিত্ব দান। আল্লাহ তাআলা মানুষের দেহ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে ভাব প্রকাশের গুণও রেখেছেন, অর্থাৎ তাকে শক্তি দান করেছেন- যেন সে নিজ মনের ভাবকে স্পষ্টতার সঙ্গে এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং অন্যের কথাও বুঝতে পারে। এই গুণেরই মাধ্যমে সে কুরআন শেখে ও শেখায় এবং ভাল ও মন্দ, হেদায়াত ও গোমরাহী, ঈমান ও কুফর এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কথাসমূহ স্পষ্টভাবে বোঝে ও বোঝায়।

৩. অর্থাৎ উভয়ের উদয় ও অস্ত, কমা ও বাড়া অথবা এক অবস্থায় স্থির থাকা, অধিকন্তু তাদের দ্বারা ঋতু ও মৌসুমের পরিবর্তন এবং নিম্নজগতে বিভিন্নভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার- এ সব

৬. আর তৃণলতা ও বৃক্ষ (তাঁর উদ্দেশ্যে) সেজদা করে[১]।	وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۝
৭. তিনি আকাশকে উঁচুতে স্থাপন করেছেন এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড*।	وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝
৮. যাতে তোমরা তুলাদণ্ডে (অর্থাৎ মাপে) সীমালঙ্ঘন না কর[২]।	اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ۝

কিছু এক বিশেষ হিসাব ও নিয়ম এবং পরিপক্ক ব্যবস্থার অধীনে হয়। এ সীমার বাইরে পা রাখার এবং নিজ মালিক ও স্রষ্টার দেওয়া ব্যবস্থাপনা লঙ্ঘন করার সাধ্য তাদের নেই। তিনি নিজ বান্দাদের যে সমস্ত সেবার দায়িত্ব এ দুয়ের কাছে সোপর্দ করে দিয়েছেন, তাতে তারা ত্রুটি করতে পারে না, বরং সর্বদা বান্দাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে।

১. অর্থাৎ উর্ধ্বজগতের ন্যায় নিম্নজগতও নিজ মালিকের অনুগত ও আজ্ঞাবহ। ছোট ছোট কাণ্ডহীন গাছ, মাটির উপর ছড়িয়ে পড়া লতা-গুল্ম এবং (কাণ্ডবিশিষ্ট) উঁচু গাছ-বৃক্ষ– সবাই তাঁর (তাকবীনি) তথা সৃষ্টিগত হুকুমের সামনে সেজদাবনত। এ জন্যই বান্দারা তাদেরকে আপন কাজে লাগালে তারা অস্বীকার করতে পারে না।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'ইনসাফ কায়েম করেছেন'।

২. পূর্ব থেকে দুই দুই বস্তুর একত্রে আলোচনা চলে আসছে (যেমন– চন্দ্র-সূর্যের)। এখানেও আকাশের উচ্চতার সাথে সামনে যমীনের নিম্নতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝে 'মীযান' (তথা তুলাদণ্ডের) উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, ওজন করার সময় তুলাদণ্ডকে আকাশ ও যমীনের মধ্যে ঝোলাতে হয়।

এ ব্যাখ্যা এই হিসাবে যে, 'মীযান' দ্বারা এখানে বাহ্যিক ও বস্তুগত তুলাদণ্ড (মাপার যন্ত্র) উদ্দেশ্য। যেহেতু এর সাথে বহু লেন-দেন এবং দেনা-পাওনার হেফাযত জড়িত, সে জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, মীযান স্থাপনের এ উদ্দেশ্য তখনি হাসিল হতে পারে, যখন নেওয়ার সময়ও মাপে বেশি না নেওয়া হয় এবং দেওয়ার সময়ও মাপে কম না দেওয়া হয়; তুলাদণ্ডের উভয় পাল্লা ও (ওজনের) পাথরের মধ্যে কমবেশী না করা হয়, ওজন করার সময় চালাকি করে দণ্ড ঝুঁকিয়ে না দেওয়া হয়; বরং কমবেশী না করে সততার সাথে একেবারে ঠিকঠিক ওজন করা হয়।

وضع الميزان– এর আরেক ব্যাখ্যা

পূর্ববর্তী অধিকাংশ মনীষীরা এখানে وَضَعَ الْمِيْزَان-এর অর্থ করেছেন– ন্যায়বিচার কায়েম করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুকে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে কায়েম করেছেন (এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যায়-নিষ্ঠার জোর নির্দেশ দিয়েছেন)।

৯. তোমরা ইনসাফের সাথে সঠিক ওজন কর এবং মাপে কম দিয়ো না।

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

১০. আর পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টিকুলের জন্য বিছিয়ে দিয়েছেন[১]।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝

১১. তাতে আছে ফলমূল এবং খেজুর বৃক্ষ, যার ফল আচ্ছাদনবিশিষ্ট*।

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝

১২. এবং আছে খোশাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল[২]।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

১৩. অতএব তোমরা (হে মানুষ ও জিন) তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে[৩]?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

যদি সত্য ও ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা না হয়, তবে বিশ্বের সমস্ত ব্যবস্থাপনা চুরমার হয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহর বান্দাদের জন্যও সুবিচার ও সত্যের পথে স্থির থাকা এবং ইনসাফের খেলাফ না করা, কারো উপর বাড়াবাড়ি না করা, কারো প্রাপ্য নষ্ট না করা– একান্ত প্রয়োজন। হাদীছে এসেছে, আদল তথা সুবিচারের দ্বারাই পৃথিবী ও আসমান কায়েম রয়েছে। (সহহি ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৫১৯৯)

১. যাতে তার উপর আরামে চলাফেরা করতে পারে এবং কাজকর্ম জারী রাখতে পারে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আবরণবিশিষ্ট খেজুর গাছ'।

২. অর্থাৎ মাটি থেকে ফলমূলও উৎপন্ন হয় এবং শস্য-ফসলও। শস্যের মধ্যে আবার দু'রকম বস্তু– শস্যদানা, যা মানুষের খাদ্য এবং ভূসি (বা খোসা), যা জীবজন্তুর খাদ্য। জমি থেকে এমন কিছু বস্তুও উৎপন্ন হয়, যা খাওয়ার কাজে আসে না; কিন্তু তাদের সুঘ্রাণ ইত্যাদি দ্বারা ফায়দা হাসিল করা হয়।

৩. অর্থাৎ হে জিন ও মানুষ! উপরের আয়াতগুলিতে তোমাদের রবের যেসব মহা নে'য়ামত ও কুদরতের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে, তার কোন্ কোন্‌টি তোমরা অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাবে? এসব নে'য়ামত ও নিদর্শনের কোনো একটিকেও কি অস্বীকার করা যায়?

উলামায়ে কেরাম একটি সহীহ হাদীছের আলোকে লিখেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতটি শুনবে, তখন উত্তরে বলবে– لا بشيء من نعمك ربّنا نكذب ، فلك الحمد (হে আমাদের রব! আমরা আপনার কোনো নে'য়ামতকেই অস্বীকার

১৪. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে।	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝
১৫. আর জিন সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে[১]।	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝
১৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়া'মত অস্বীকার করবে[২]?	فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

করি না, সকল প্রশংসা ও মহিমা আপনারই জন্য।) [মুসনাদে বায্যার, হাদীস ৫৮৫৩; তাফসীরে তবারী ২২/১৯০)

বি. দ্র. যদিও জিন জাতির আলোচনা পূর্বে স্পষ্টভাবে হয়নি, কিন্তু (১০ নং আয়াতে) أنام শব্দটির মধ্যে তারা শামিল আছে। আর وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (আমি জিন ও মানুষকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। –যারিয়াত, ৫৬) আয়াতে উভয় জাতিকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি আলোচ্য আয়াতের পরপরই মানুষ ও জিনদের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি আয়াতের পরে سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ এবং يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ আয়াত দু'টিতে সুস্পষ্টভাবে জিন ও মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এসব বিষয় প্রমাণ করে যে, এখানে এ উভয় জাতিকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ সকল মানুষের পিতা আদম (আ)-কে মাটি থেকে এবং জিনদের পিতাকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

২. آلاء শব্দের তরজমা সাধারণত নে'য়ামত করা হয়েছে। কিন্তু ইবনে জারীর (র) কতক পূর্ববর্তী মনীষী থেকে এর অর্থ 'কুদরত' বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যেস্থানে যে অর্থ অধিকতর সংগত মনে হবে, তা অবলম্বন করতে হবে। এখানে এবং পূর্ববর্তী আয়াতে উভয় অর্থ হতে পারে। কারণ, মানুষ ও জিনকে অস্তিত্বের সৌভাগ্য দান করা এবং নির্জীব-নির্বুদ্ধি বস্তু থেকে বুদ্ধিমান বানিয়ে দেওয়া আল্লাহর বিরাট নে'য়ামত বটে এবং তাঁর কুদরতের নিদর্শনও বটে।

একই আয়াত বার বার আনার তাৎপর্য

فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ বাক্যটি এ সূরার মধ্যে ৩১ বার এসেছে। প্রত্যেক বার (এতে) কোনো বিশেষ নে'য়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, অথবা আল্লাহর আজমত ও কুদরতের নিদর্শনসমূহ থেকে কোনো বিশেষ নির্দশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এ ধরনের পুনরাবৃত্তি আরব-অনারবদের কথাবার্তায় ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। অনেক দিন পূর্বে القاسم নামক পত্রিকায় বান্দা (মুফাসসির) কর্তৃক قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তাতে আরব কবিদের কাব্য থেকে পুনরাবৃত্তির কিছু

১৭. (তিনি) উভয় মাশরিক (উদয়াচল) ও উভয় মাগরিব (অস্তাচল) এর মালিক[১]।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ

১৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

১৯. তিনি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন, যা মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয়।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۙ

২০. সে দুটির মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, ফলে একটি অন্যটির উপর চড়াও হতে পারে না[২]।

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۚ

২১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

২২. সে দুটি থেকে বের হয়ে আসে মুক্তা ও প্রবাল।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ

উপমা-দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে এবং পুনরাবৃত্তির দর্শনের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে সেই দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই।

১. শীত ও গ্রীষ্মে যে দুই দিগন্ত থেকে সূর্যোদয় হয় এবং যে দুই দিগন্তে সূর্যাস্ত হয়, তা-ই যথাক্রমে দুটি মাশরিক ও দুটি মাগরিব (বা উদয়াচল ও অস্তাচল)। এ দুটি মাশরিক ও মাগরিবের পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, যার ফলে মৌসুম ও ঋতুর পরিবর্তনসহ অন্যান্য পরিবর্তন আসে। পৃথিবীবাসীদের হাজারো ফায়দা ও উপকার এসব পরিবর্তনের সাথে জড়িত। অতএব এসব পরিবর্তনও আল্লাহর অনেক বড় নে'য়ামত এবং তাঁর বিরাট কুদরতের নিদর্শন।

বি. দ্র. আলোচ্য আয়াতের পূর্বে এবং পরেও অনেক দূর পর্যন্ত দুই দুই বস্তুর একত্রে আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য এখানে দুটি মাশরিক ও দুটি মাগরিবের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২. অর্থাৎ মিঠা ও লোনা পানি একে অন্যের উপর চড়াও হয়ে পানির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি দূর করে দেয় না, অথবা উভয়টি মিলে দুনিয়া ডুবিয়ে দেয় না।

এ আয়াতের বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা ফুরকানের শেষের দিকে (আয়াত ৫৩) গত হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

২৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

২৪. আর সমুদ্রে চলমান পর্বতসম উঁচু জাহাজগুলি তাঁরই[১]।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

২৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

[রুকূ - ২]

২৬. পৃথিবীর বুকে যা-কিছু আছে, সবই নশ্বর।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

২৭. আর অবিনশ্বর রইবে একমাত্র আপনার রবের মহিমময় ও সম্মানিত সত্তা।

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

২৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

২৯. আসমানসমূহ ও যামীনে যারা আছে, তারা (সবাই) তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। প্রত্যেক দিন তিনি থাকেন বিশেষ কোন শানে[২]।

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝

---

১. অর্থাৎ নৌকা ও জাহাজ তো বাহ্যত তোমাদের তৈরী, কিন্তু স্বয়ং তোমাদের আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদের সেসব শক্তি ও উপকরণ দান করেছেন, যা দিয়ে তোমরা জাহাজ তৈরি করে থাক। অতএব তোমরা ও তোমাদের তৈরি বস্তুনিচয়ের মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাই এবং এসব তাঁরই নে'য়ামত ও কুদরতের নিদর্শন।

বি. দ্র. ...وَلَه الجوار–এই বাক্যটি পূর্বের বাক্য يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ الخ-এর বিপরীতে এসেছে। উভয়ের সারমর্ম হল– সাগরের নিম্নদেশ থেকে সেইসব নে'য়ামত (মনিমুক্তা) বের হয় এবং উপরে এসব নে'য়ামত (জলযান) বর্তমান রয়েছে।

২. অর্থাৎ আসমান-যমীনের সকল মাখলুক মুখের ও অবস্থার ভাষায় আপন প্রয়োজনাদি আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে। কেউ মুহূর্তের জন্য তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। আর তিনিও আপন হেকমত অনুযায়ী সকলের প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। সর্বদা তাঁর স্বতন্ত্র কাজ থাকে

৩০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
৩১. হে দুই ভারী দল! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য অবসর হব[১]।	سَنَفۡرُغُ لَکُمۡ اَیُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝
৩২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
৩৩. হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের যদি আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে বেরিয়ে যাও! কিন্তু শক্তি ছাড়া তোমরা বেরিয়ে যেতে পারবে না[২]।	یٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ ۝
৩৪. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে[৩]?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝

এবং প্রত্যহ থাকে তাঁর নতুন শান! কাউকে মৃত্যু দান করা আর কাউকে জীবন দান করা, কাউকে সুস্থ করা আর কাউকে অসুস্থ করা, কাউকে উন্নতি দান করা আর কাউকে অবনতির সম্মুখীন করা, কাউকে প্রদান করা আর কারো থেকে ছিনিয়ে নেওয়া– এ সবই আল্লাহর কর্ম ও শান। আর এসবের আলোকে অন্যান্য কর্ম ও শানের কথাও বুঝে নিন।

১. অর্থাৎ দুনিয়ার সকল ধান্দার ও ব্যস্ততার শীঘ্রই অবসান হবে। এরপর আল্লাহ দ্বিতীয় পর্ব শুরু করবেন। তখন দুই ভারী দল তথা জিন ও মানুষের হিসাব-কিতাব হবে– অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং কৃতজ্ঞদের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব থেকে কেউ পালিয়ে যেতে চাইলে শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া কী করে পালাবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর কে আছে? তাছাড়া বের হয়ে যাবে কোথায়? তাঁর রাজত্ব ছাড়া দ্বিতীয় রাজত্ব কোন্‌টি, যেখানে আশ্রয় নেবে?

৩. অর্থাৎ এভাবে খুলে খুলে বোঝানো এবং সমস্ত ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অবহিত করা অতি বড় নে'য়ামত। এই নে'য়ামতের কি কদর করবে না এবং আল্লাহর এমন বিরাট কুদরতকে অস্বীকার করবে?

৩৫. তোমাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হবে স্বচ্ছ অগ্নিশিখা ও ধোঁয়ামিশ্রিত (অগ্নিশিখা)। তখন তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না[১]।	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾
৩৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নেয়া'মত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে[২]?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾
৩৭. যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং (রক্ত) গোলাপের মত হয়ে যাবে, যেন লাল চামড়া[৩]– (তখন এক ভয়াবহ অবস্থা হবে)।	فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?	فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾
৩৯. সেদিন কোন মানুষ বা জিনকে তার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না[৪]।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

---

১. অর্থাৎ যখন অপরাধীদের উপর আগুনের উজ্জ্বল শিখা এবং ধোঁয়ামিশ্রিত শিখা ছুড়ে মারা হবে, তখন কেউই তা রোধ করতে পারবে না এবং ওরা এই শাস্তির কোনো প্রতিশোধও নিতে পারবে না।

২. অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াও ফরমাবরদারদের জন্য নে'য়ামত। এবং শাস্তির কথা বর্ণনা করা, যাতে লোকেরা শুনে অপরাধ থেকে বিরত থাকে, এটাও স্বতন্ত্র নে'য়ামত। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক আয়াতে নে'য়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনোটা এখনই নে'য়ামত, আর কোনোটা সম্পর্কে সতর্ক করা নে'য়ামত, কারণ, এর ফলে তা থেকে বান্দা বিরত থাকবে।'

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আসমান ফেটে যাবে এবং তা লালবর্ণের চামড়ার মত হয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ গোনাহ সম্পর্কে জানার জন্য কোনো মানুষ বা জিনকে প্রশ্ন করা হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই সব কিছু জানেন। হাঁ, অভিযোগ গঠন ও তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে আইনী প্রশ্ন করা হবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (আপনার রবের কসম, আমি অবশ্যই ওদের সকলকে জিজ্ঞাসা করব। –হিজর : ৯২)

অথবা অর্থ এই যে, কবর থেকে ওঠার সময় প্রশ্ন করা হবে না। পরবর্তীতে প্রশ্ন করা ভিন্ন ব্যাপার। তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

৪০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৪১. (সেদিন) অপরাধীদের স্বীয় লক্ষণ দ্বারা চেনা যাবে[১], তারপর ওদের পাকড়াও করা হবে মাথার অগ্রভাগের চুল ও পা ধরে[২]।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۝

৪২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৪৩. এ সেই দোযখ, যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করত[৩]।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

৪৪. ওরা আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছোটাছুটি করবে[৪]।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۝

৪৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত (বা : কুদরত) অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

[রুকূ - ৩]

৪৬. যে ব্যক্তি আপন রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান[৫]।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝

---

১. অর্থাৎ চেহারার কাল রঙ ও চোখের নীল রঙ দ্বারা অপরাধীদের সহজেই চেনা যাবে। যেমন মুমিনদের চেনা যাবে তাদের সেজদা ও ওযুর চিহ্ন এবং নূরের দ্বারা।

২. অর্থাৎ কারো চুল আর কারো পায়ের গোছা ধরে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। অথবা অর্থ এই যে, প্রত্যেক অপরাধীর হাড় ও পাঁজর ভেঙে কপালকে পায়ের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে এবং শিকল প্রভৃতি দ্বারা বেঁধে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

৩. অর্থাৎ তখন বলা হবে, এ সেই দোযখ, যাকে তোমরা দুনিয়ায় অস্বীকার করতে।

৪. অর্থাৎ কখনো আগুনের, কখনো ফুটন্ত পানির আযাব হবে।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় যার অন্তরে এই ভয় সদা জাগ্রত ছিল যে, একদিন রবের সামনে দাঁড়াতে হবে এবং পাই পাই হিসাব দিতে হবে, আর এই ভয়ের কারণে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে

৪৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৮. উদ্যান দুটি বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট[১]।

ذَوَاتَاۤ اَفۡنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

৫০. সে দুটিতে আছে দুটি প্রবহমান ঝরনা[২]।

فِیۡهِمَا عَیۡنٰنِ تَجۡرِیٰنِ ﴿٥٠﴾

৫১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

৫২. সে দুটিতে থাকবে প্রত্যেক ফলের দু' দু' প্রকার।

فِیۡهِمَا مِنۡ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوۡجٰنِ ﴿٥٢﴾

৫৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৪. তারা হেলান দিয়ে সমাসীন থাকবে বিছানার উপর, যার আস্তর হবে পুরু রেশমের[৩]। এবং সেই উদ্যান দুটির ফল ঝুঁকে থাকবে[৪]।

مُتَّکِـِٕیۡنَ عَلٰی فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنۡ اِسۡتَبۡرَقٍ ؕ وَ جَنَا الۡجَنَّتَیۡنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾

রয়েছে এবং পূর্ণরূপে তাকওয়ার পথে চলেছে– তার জন্য আখেরাতে দু'টি বিরাট বাগান রয়েছে, যেগুলির গুণাবলি সামনে বর্ণিত হয়েছে।

১. অর্থাৎ বাগান দুটিতে বিভিন্ন রকমের ফল থাকবে এবং বৃক্ষসমূহের ডাল-পালা ফলেফুলে ভরা ও ছায়াদার হবে।

২. ঝরনা দুটির প্রবাহ কখনো বন্ধ হবে না এবং শুকিয়ে যাবে না।

৩. বিছানার আস্তর যখন মোটা রেশমের হবে, তখন উপরের পরত যে কীরূপ হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

৪. ফলে তা হাতে নিতে মোটেই কষ্ট হবে না। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে– যে কোনো অবস্থায় অনায়াসে তা ভোগ করতে পারবে।

৫৬. সেগুলিতে রয়েছে আনতনয়না রমণীরা, যাদেরকে জান্নাতবাসীদের পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে আর না কোন জিন[১]।

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝٥٦

৫৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٧

৫৮. তারা যেন ইয়াকুত ও প্রবাল[২]।

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝٥٨

৫৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٥٩

৬০. সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কী[৩]?

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝٦٠

৬১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦١

৬২. সে দুটি ছাড়া আরো দুটি উদ্যান আছে[৪]।

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝٦٢

৬৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝٦٣

৬৪. (উদ্যান দুটি) গাঢ় সবুজ, যেন কালো[৫]।

مُدْهَآمَّتٰنِ ۝٦٤

---

১. অর্থাৎ না তাদের নিষ্পাপতাকে কেউ ক্ষুণ্ন করেছে, না তারা নিজেদের স্বামী ছাড়া কারো প্রতি চোখ তুলে দেখেছে।

২. অর্থাৎ তারা ইয়াকুত-প্রবালের মত সুন্দর বর্ণের, আকর্ষণীয়।

৩. অর্থাৎ নেককর্মের প্রতিদান নেক ছওয়াব ছাড়া আর কী হতে পারে? জান্নাতবাসীরা দুনিয়াতে আল্লাহর পরম ইবাদত করেছিল, তারা যেন তাঁকে (আল্লাহকে) নিজ চোখে দেখত। সুতরাং আল্লাহও তাদের পরম প্রতিদান দিলেন– فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ (কেউ জানে না, তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কত কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে। –সেজদা, আয়াত ১৭) হয়ত এতে দীদারে ইলাহীর দৌলতের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

৪. সম্ভবত প্রথম দুটি বাগান নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য। আর এ দুটি উদ্যান أصحاب يمين (যারা ডানহাতে আমলনামা পাবে) তাদের জন্য।

৫. সবুজ রঙ যখন খুব গাঢ় হয়, কালোর মত হয়ে যায়।

৬৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾
৬৬. সে দুটিতে রয়েছে দুটি উচ্ছলিত ঝরনা।	فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾
৬৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾
৬৮. সে দুটিতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার[১]।	فِیْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾
৬৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾
৭০. উদ্যানগুলোতে রয়েছে সচ্চরিত্রা, সুন্দরী স্ত্রীরা[২]।	فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾
৭১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
৭২. (তারা) তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর[৩]।	حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾
৭৪. তাদেরকে জান্নাতবাসীদের পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে আর না কোন জিন।	لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾
৭৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?	فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾

---

১. কিন্তু এখানকার আনার ও খেজুরের মত মনে করা যাবে না। জান্নাতের ফলমূলের স্বরূপ যে কী, তা আল্লাহই জানেন।

২. অর্থাৎ উত্তম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী সুন্দরী স্ত্রীগণ।

৩. এ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য ঘরে থাকার মধ্যেই নিহিত।

৭৬. তারা (জান্নাতীরা) হেলান দিয়ে সমাসীন থাকবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর মূল্যবান গালিচার উপর।

مُتَّكِـِٔينَ عَلٰى رَفۡرَفٍ خُضۡرٍ وَّعَبۡقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

৭৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নে'য়ামত অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾

৭৮. বড় বরকতময় আপনার রবের নাম, যিনি মহিমময়, সম্মানিত[১]।

تَبٰرَكَ اسۡمُ رَبِّكَ ذِی الۡجَلٰلِ وَالۡاِكۡرَامِ ﴿٧٨﴾

---

১. অর্থাৎ তিনি আপন কৃতজ্ঞ বান্দাদের এমনসব অনুগ্রহ ও নে'য়ামত দান করলেন। আর চিন্তা করলে বোঝা যায়, সমস্ত নে'য়ামতের মধ্যে আসল সৌন্দর্য আসে তাঁরই পবিত্র নামের বরকতে এবং তাঁরই নাম জপলে এসব নে'য়ামত হাসিল হয়। অতএব এ থেকে বোঝা উচিত, যাঁর নামে এত বরকত, স্বয়ং তাঁর সত্তার মধ্যে না জানি কত বরকত-সৌন্দর্য, কত কী আছে!

ونسئل الله الكريم الوهّاب ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا من أهل الجنتين الأولين . آمين

সূরা ওয়াকে'আ

সূরা ৫৬ । ৯৬ আয়াত । ৩ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٩٦، ركوعاتها ٣

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (বড় ভয়াবহ অবস্থা হবে!) যখন সংঘটিত হবে মহাঘটনা–

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ

২. তার সংঘটিত হওয়ার মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই*[১]।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۘ

৩. (তা) অধঃপতিতকারী, সমুন্নতকারী[২]–

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۙ

৪. যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ

৫. এবং পাহাড়-পর্বত ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে,

وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ

৬. ফলে তা পরিণত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়[৩]।

فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ

৭. আর তোমরা বিভক্ত হবে তিন শ্রেণীতে[৪]।

وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۙ

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** তার সংঘটনকে অস্বীকার করার কেউ থাকবে না।

১. অর্থাৎ কিয়ামত যখন সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কোন মিথ্যাবিষয় ছিল না। তাকে কেউ টলাতেও পারবে না, ঠেকাতেও পারবে না। আর তখন لا يبعث الله من يموت প্রভৃতি মিথ্যা দাবিসমূহ খতম হয়ে যাবে। এবং কোনো ব্যক্তি মিথ্যা সান্ত্বনাবাণী দ্বারা সেদিনের ভয়াবহ দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে চাইলে তাও হবে না।

২. অর্থাৎ এক দলকে নীচে নামিয়ে আনবে (লাঞ্ছিত করবে) এবং এক দলকে উপরে ওঠাবে। বড় বড় অহংকারীকে, দুনিয়ায় যাদের সম্মানী ও প্রধান মনে করা হত, নিম্নতম স্থানের দিকে নিয়ে যাবে এবং দোযখে পৌঁছে দেবে। পক্ষান্তরে বহু বিনয়ীকে, যাদের দুনিয়ায় দীন-হীন ও নীচু বলে মনে করা হত, ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে জান্নাতের উচ্চতম স্থানসমূহে সমাসীন করবে।

৩. অর্থাৎ পৃথিবীতে ভীষণ প্রকম্পন হবে এবং পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলির মত উড়তে থাকবে।

৪. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর সমগ্র মানবজাতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেওয়া হবে– দোযখী, সাধারণ বেহেশতী এবং বিশিষ্ট নৈকট্যধারী, যারা বেহেশতের উচ্চতম স্তরসমূহে সমাসীন হবেন।

৮. অতএব ডান দিকের লোকেরা, কতই না ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা[১]!

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝

৯. আর বাম দিকের লোকেরা, কতই না হতভাগা বাম দিকের লোকেরা[২]!

وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ مَآ أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۝

১০. আর অগ্রবর্তীরা তো অগ্রবর্তীই!

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝

১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত–

أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

১২. নে'য়ামতের উদ্যানরাজিতে[৩]!

فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

১৩. (তাদের) বেশিসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ۝

সামনে তিন শ্রেণীরই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এর পর তাদের হাল-অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে।

১. অর্থাৎ যারা মহান আরশের ডানদিকে থাকবেন; (রূহজগতে) প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় তাদেরকে আদম (আ)-এর ডান পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামাও ডান হাতে দেওয়া হবে, আর ফেরেশতাগণও তাদেরকে ডানদিক থেকে গ্রহণ করবেন। সেদিন তারা যে কল্যাণ, বরকত ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তা বলে শেষ করার নয়। মেরাজের রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁদের ক্ষেত্রেই দেখেছিলেন যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিজের ডানদিকে তাকিয়ে হাসছেন এবং বামদিকে তাকিয়ে কাঁদছেন।

২. হযরত আদম (আ)-এর বাঁ পাঁজর থেকে ওদের বের করা হয়েছিল। ওদের আরশের বাঁ দিকে দাঁড় করানো হবে, আমলনামা বাঁ হাতে দেওয়া হবে এবং ফেরেশতাগণ বাঁ দিক থেকে ওদের ধরবেন। ওদের অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্যের কোনো সীমা নেই।

৩. অর্থাৎ যাঁরা মুজাহাদা করে ইলমী ও আমলী গুণাগুণে এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীতে 'আসহাবে ইয়ামীনদের' ছাড়িয়ে গিয়েছেন– তাঁরা আল্লাহ তাআলার রহমত, নৈকট্য ও সম্মান-মর্যাদার স্তরগুলিতেও সকলের আগে থাকবেন। (তাঁরা হচ্ছেন নবী-রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদগণ; তাঁরা তাদের মহামর্যাদাশালী রবের সামনে অবস্থান করবেন, যেমন বলেছেন মুফাসসির ইবনে কাছীর (র))।

১৪. আর অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে[১]।	وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؈
১৫. (তারা সমাসীন হবে) সারিবদ্ধভাবে রাখা আসনসমূহে[☆ ২],	عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ؈
১৬. সেগুলির উপর হেলান দিয়ে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে[৩]।	مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ؈
১৭. তাদের কাছে আসা-যাওয়া করবে চির কিশোরেরা[৪]–	يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ؈

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'أولين বলা হয়েছে 'পূর্ববর্তী উম্মতদের এবং آخرين দ্বারা উদ্দেশ্য এই উম্মতে মুহাম্মদী। অথবা أولين ও آخرين দ্বারা এ উম্মতেরই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীরা উদ্দেশ্য; অর্থাৎ এই উম্মতে প্রথমদিকে السابقون অনেক বেশি হয়েছেন, পরবর্তীতে কম হচ্ছেন।'

বি. দ্র. অধিকাংশ মুফাসসির আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে উক্ত উভয় অর্থের কথা বলেছেন। হাফেজ ইবনে কাছীর (র) দ্বিতীয় অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'-তে তবারানী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থ থেকে হাসান সনদে সাহাবী আবু বাকরাহ (রা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে, যার মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেছেন– هما جميعا من هذه الأمّة (কুরআনে উল্লেখিত দু'টি দলই এ উম্মতের)। (মুসনাদে তয়ালেসী, বর্ণনা ৮৮৬; মাজমাউয্ যাওয়াইদ, হাদীস ১১৪৪৩)

ইবনে কাছীর (র) আয়াতের এক তৃতীয় অর্থ করেছেন, যা অধমের নিকট পছন্দনীয়।তা এই যে, প্রত্যেক উম্মতের প্রথম ভাগে (সংশ্লিষ্ট) নবীর সাহচর্য অথবা নবী-যুগের নিকটবর্তীতার বরকতে السابقون-এর সংখ্যা যে পরিমাণে হয়েছে, পরবর্তী যুগসমূহে সে রকম হয়নি। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (সর্বোত্তম আমার যুগের মানুষ, এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ।) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৬৫১) —হাঁ, আবু বাকরাহ বর্ণিত হাদীস যদি সহীহ (ও প্রমাণযোগ্য) হয়, যেমন রূহুল মাআনীতে আছে– তবে নিঃসন্দেহে আয়াতের অর্থের ব্যাপারে তাই অগ্রগণ্য।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'সোনার তারে বোনা আসনসমূহে'।

২. যা স্বর্ণের তার দিয়ে বোনা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আসন-ব্যবস্থা এই হবে যে, কোনো একজনের পিঠ অন্য কারো দিকে থাকবে না।

৪. অর্থাৎ খেদমতের জন্য এমন বালকেরা থাকবে, যারা চিরকাল একই রকম থাকবে।

১৮. পানপাত্র, সোরাই ও স্বচ্ছ শরাবের পেয়ালা নিয়ে।	بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ﴿۱۸﴾
১৯. তার কারণে তাদের মাথাব্যথাও হবে না এবং তারা মাতালও হবে না[১]।	لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ﴿۱۹﴾
২০. এবং (আসা-যাওয়া করবে) তাদের পছন্দনীয় ফলমূল নিয়ে।	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ﴿۲۰﴾
২১. এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত পাখির গোশত নিয়ে[২]।	وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۙ﴿۲۱﴾
২২. আর (তাদের জন্য থাকবে) ডাগর চোখবিশিষ্ট হুরেরা,	وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۙ﴿۲۲﴾
২৩. যেন আবৃত মতি[৩]।	كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ﴿۲۳﴾
২৪. (এসব পাবে) তারা যেসব আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ।	جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۴﴾
২৫. তারা সেখানে কোন বাজে ও গোনাহর কথা শুনবে না-	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۙ﴿۲۵﴾
২৬. কিন্তু শুনবে একটিমাত্র বাণী- 'সালাম' 'সালাম'[৪]।	اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿۲۶﴾

---

১. অর্থাৎ এমন স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ সুরার কুদরতী প্রস্রবনসমূহ প্রবহমান থাকবে, যা পানে মাথা ব্যথাও হবে না, প্রলাপও বকবে না। কারণ, তাতে নেশা হবে না, শুধু নির্ভেজাল স্বাদ ও আনন্দ হবে।

২. অর্থাৎ যখন যে ফল পছন্দ হবে এবং যে গোশত মনে চাইবে, বিনা পরিশ্রমে ও অনায়াসে তা লাভ করবে।

৩. অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মুক্তার মত, যার উপর মাটি ও ধূলির কোন পরশই লাগেনি।

৪. অর্থাৎ সেখানে বাজে ও নিরর্থক কথাবার্তা হবে না। কেউ কোনো মিথ্যা কথা বলবেও না, কারো উপর মিথ্যা অপবাদও আরোপ করা হবে না। সকল দিক থেকে কেবল সালাম আর সালামের শব্দই আসবে। অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা একে অপরকে এবং ফেরেশতাগণ জান্নাতীদের সালাম করবেন। সর্বোপরি দয়ালু রবের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছবে, যা অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদার বিষয়।

আর সালামের এই আধিক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জান্নাতে তোমরা সমস্ত বিপদাপদ ও মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। কোনো রকমের কষ্টও হবে না, মৃত্যু বা ধ্বংসও আসবে না।

২৭. ডান দিকের লোকেরা, কতই না ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা!	وَاَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡیَمِیۡنِ ﴿۲۷﴾
২৮. (তারা থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছে[১],	فِیۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ﴿۲۸﴾
২৯. সারি সারি কলাগাছ,	وَّ طَلۡحٍ مَّنۡضُوۡدٍ ﴿۲۹﴾
৩০. বিস্তৃত ছায়া[২],	وَّ ظِلٍّ مَّمۡدُوۡدٍ ﴿۳۰﴾
৩১. প্রবহমান পানি,	وَّ مَآءٍ مَّسۡکُوۡبٍ ﴿۳۱﴾
৩২. ও প্রচুর ফলমূলের মধ্যে,	وَّ فَاکِہَۃٍ کَثِیۡرَۃٍ ﴿۳۲﴾
৩৩. যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না[৩]।	لَّا مَقۡطُوۡعَۃٍ وَّ لَا مَمۡنُوۡعَۃٍ ﴿۳۳﴾
৩৪. আর উঁচু বিছানাসমূহে[৪]।	وَّ فُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَۃٍ ﴿۳۴﴾
৩৫. আমি সেই রমণীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি।	اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰہُنَّ اِنۡشَآءً ﴿۳۵﴾
৩৬. এবং তাদের বানিয়েছি কুমারী,	فَجَعَلۡنٰہُنَّ اَبۡکَارًا ﴿۳۶﴾
৩৭. (স্বামীদের কাছে) প্রিয়, সমবয়স্কা-	عُرُبًا اَتۡرَابًا ﴿۳۷﴾
৩৮. ডান দিকের লোকদের জন্য[৫]।	لِّاَصۡحٰبِ الۡیَمِیۡنِ ﴿۳۸﴾

---

১. যেগুলি নানা রকমের সুস্বাদু ফলে ভরা থাকবে।

২. অর্থাৎ রোদও থাকবে না, গরম বা ঠাণ্ডাও লাগবে না। অন্ধকারও হবে না। প্রাতঃকালে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে সময়টা যেমন হয়, তেমন ভারসাম্যপূর্ণ ছায়া ছেয়ে থাকবে। আর সেই ছায়া এত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হবে যে, অতি দ্রুতগামী ঘোড়া একশ বছর বিরামহীনভাবে দৌড়াতে থাকলেও তা শেষ হবে না। (সহীহ বুখারী, ৪৮৮১)

৩. বহু রকমের ফল থাকবে, যা পূর্বে কেউ খায়নি। দুনিয়ার মৌসুমি ফলের মত নয় যে, মৌসুম শেষে ফুরিয়ে যাবে; বরং তা সব সময়ই থাকবে এবং তা সংগ্রহ করতে কোনো বাধা-বিপত্তিরও সম্মুখীন হতে হবে না।

৪. অর্থাৎ খুব পুরু ও উঁচু বিছানাসমূহ- দেখতেও উঁচু, মর্যাদার দিক থেকেও উঁচু।

৫. অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যেসব হূর ও দুনিয়ার রমণীদের পাবে, তাদের জন্ম ও বর্ধন খোদার কুদরতে এমন হবে যে, তারা চিরকাল সুন্দরী ও যুবতী থাকবে এবং তাদের কথা ও ব্যবহারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রতি ভালবাসা জন্মাবে ও আকর্ষণ পয়দা হবে। আর তাদের সকলকে সমবয়স্কা রাখা হবে এবং তাদের স্বামীদের সঙ্গেও চিরকাল বয়সের মিল অক্ষুণ্ন থাকবে।

[রুকূ - ২]

৩৯. (তাদের) বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের থেকে।
ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

৪০. এবং বহুসংখ্যক পরবর্তীদের থেকে[১]।
وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ

৪১. আর বাম দিকের লোকেরা, কত হতভাগা বাম দিকের লোকেরা!
وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۬ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ؕ

৪২. (ওরা থাকবে) উত্তপ্ত বাষ্প ও ফুটন্ত পানিতে।
فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۙ

৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায়–
وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۙ

৪৪. যা ঠান্ডাও নয়, আরামদায়কও নয়[২]।
لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ

৪৫. ওরা ইতিপূর্বে আরাম-আয়েশে মত্ত ছিল।
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۚ

৪৬. এবং ঘোরতর পাপে অনড় থাকত[৩]।
وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۚ

৪৭. ওরা বলত, 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থি হয়ে যাব, তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হব?
وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۬ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ

---

১. অর্থাৎ 'আসহাবুল ইয়ামীন' পূর্ববর্তীদের মধ্যে অনেক হয়েছেন, আর পরবর্তীদের মধ্যেও তাদের সংখ্যা অনেক হবে।

২. অর্থাৎ দোযখের আগুন থেকে কাল ধোঁয়া উঠবে। তার ছায়ায় ওদের রাখা হবে, যার দ্বারা কোনো দৈহিক বা আত্মিক আরাম পাওয়া যাবে না, শীতলতাও লাভ হবে না। আর তা সম্মানের ছায়াও হবে না, বরং তার উত্তাপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় ভাজা হতে থাকবে। বস্তুত এটা ওদের পার্থিব স্বাচ্ছন্দেরই পরিণাম, যার অহংকারে ওরা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল।

৩. ঘোরতর পাপ হচ্ছে কুফর ও শিরক এবং নবীদের অস্বীকার করা। অথবা মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে এই কথা বলা যে, মৃত্যুর পর আদৌ কোনো জীবন নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ (ওরা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, 'যে মরে যায়, আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।' –নাহ্ল, আয়াত ৩৮)

৪৮. 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষেরাও[১]?'

أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝

৪৯. আপনি বলে দিন, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে–

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝

৫০. অবশ্যই একত্র করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্ধারিত সময়ে [২]।'

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

৫১. অতঃপর তোমরা, হে পথভ্রষ্ট অস্বীকারকারীরা!

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۝

৫২. অবশ্যই 'যাক্কুম' বৃক্ষ থেকে খাবে।

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ۝

৫৩. এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে[৩]।

فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝

৫৪. অতঃপর তার উপর ফুটন্ত পানি পান করবে।

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۝

৫৫. আর পানও করবে এমনভাবে, যেভাবে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত উট পান করে[৪]।'

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ۝

৫৬. এ হচ্ছে ইনসাফের দিনে ওদের আপ্যায়ন[৫]।

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝

৫৭. আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তা সত্ত্বেও কেন তোমরা বিশ্বাস কর না[৬]?

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝

---

১. যারা আমাদেরও বহু আগে মরে গেছে। ওদের উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, এটা কোন বোধগম্য ও বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে, যার সময় আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত আছে।

৩. অর্থাৎ যখন ক্ষুধায় অস্থির হয়ে যাবে, খাওয়ার জন্য এ বৃক্ষ পাবে এবং এর দ্বারাই পেট ভরতে হবে।

৪. অর্থাৎ গরমে তৃষ্ণার্ত উট যেমন প্রচণ্ড পিপসায় এক নিঃশ্বাসে পানি পান করতে থাকে, দোযখীদেরও এই অবস্থা হবে। কিন্তু সেই গরম পানি যখন মুখের নিকট নেওয়া হবে, তার কারণে মুখ পুড়ে যাবে, আর পেটে পৌছামাত্র নাড়িভুঁড়ি গলে বের হয়ে পড়বে। أعاذنا الله منه

৫. অর্থাৎ ইনসাফের দাবি এটাই যে, ওদের আপ্যায়ন এভাবেই করা হোক।

৬. অর্থাৎ এ বিষয়টি কেন স্বীকার কর না যে, প্রথমবারও তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন?

৫৮. আচ্ছা বল তো, তোমরা যে বীর্য স্খলন কর–	أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ۝٥٨
৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই (তার) স্রষ্টা[১]?	ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ۝٥٩
৬০. আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছি[২] এবং আমি অক্ষম নই–	نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝٦٠
৬১. এ ব্যাপারে যে, তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের মতই অন্য লোকদের নিয়ে আসি এবং তোমাদের এমন স্থানে (পুনরায়) জীবিত করি, যা তোমরা জান না[☆৩]।	عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦١
৬২. আর তোমরা তো প্রথম সৃষ্টির কথা জান, সুতরাং কেন স্মরণ কর না[৪]?	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝٦٢
৬৩. আচ্ছা বল তো, তোমরা যা বপন কর–	أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ۝٦٣
৬৪. তা থেকে ফসল তোমরা উৎপন্ন কর, না আমিই উৎপন্নকারী[৫]?	ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ۝٦٤

১. অর্থাৎ মায়ের জরায়ুতে বীর্য দ্বারা মানুষকে কে সৃষ্টি করেন? সেখানে তো তোমাদের কারো বাহ্যিক হস্তক্ষেপও চলে না। সুতরাং আমাকে ছাড়া কে আছে, যে পানির ফোঁটা থেকে এমন সুন্দর আকৃতি তৈরি করেন এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন?

২. অর্থাৎ জীবন দান করা এবং মৃত্যু প্রদান করা সবই আমার কব্জায়। যখন অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের লাগাম আমার হাতে, তখন মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা কী কঠিন?

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করি, যা তোমরা জান না'।

৩. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ তোমাদের অন্য জগতে নিয়ে যেতে এবং তোমাদের স্থলে এখানে অন্য সৃষ্টি আবাদ করে দিতে আমি সক্ষম।'

৪. অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টির কথা স্মরণ করে দ্বিতীয়টিও বুঝে নাও।

৫. অর্থাৎ বাহ্যত জমিতে বীজ তোমরা বপন কর। কিন্তু মাটির অভ্যন্তরে তার পরিচর্যা করা, তার পর অঙ্কুরিত করে তাকে শস্য-শ্যামল ফসলে পরিণত করা কার কাজ? এ ক্ষেত্রে তো বাহ্যিক দাবিও তোমরা করতে পার না যে, তা তোমাদের তৈরি করা।

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে তাকে (দলিত-মথিত) খড়কুটায় পরিণত করতে পারি। ফলে তোমরা নানা কথা বানাতে থাকবে–	لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. (একবার বলবে) : আমরা তো ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।	اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. (আরেকবার বলবে) : বরং আমরা তো হতভাগা[১]।	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. আচ্ছা বল তো, যে পানি তোমরা পান কর–	اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. মেঘ থেকে তা কি তোমরা বর্ষণ কর, না আমিই বর্ষণকারী[২]?	ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবনাক্ত করে দিতে পারি। অতএব কেন তোমরা শোকর কর না[৩]?	لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

---

১. অর্থাৎ ফসল পয়দা করার পর তা সংরক্ষণ করা ও তাকে অক্ষত রাখাও আমারই কাজ। আমি ইচ্ছা করলে কোনো বিপদ পাঠিয়ে দিতে পারি, ফলে এক মুহূর্তেই সমস্ত ফসল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এর পর তোমরা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদবে এবং পরস্পরে কথা বানাতে শুরু করবে যে- মিয়া, আমাদের তো বড় ক্ষতি হয়ে গেল; বরং প্রকৃতপক্ষে একেবারে শূন্যহাত হয়ে গেছি।

২. অর্থাৎ বৃষ্টিও আমার হুকুমে আসে এবং জমির ভাণ্ডারসমূহে সেই পানি আমিই সংরক্ষণ করি। তোমাদের এই শক্তি নেই যে, তোমরা পানি তৈরি করে নেবে, অথবা তোষামোদ বা জোর করে মেঘ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

৩. অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে মিঠা পানিকে লোনা বানিয়ে দিতে পারি, ফলে তা পানের অযোগ্য হয়ে যাবে এবং ফসলের কাজেও আসবে না। এর পরও তোমরা আমার এই অনুগ্রহ স্বীকার কর না যে, আমি মিঠা পানির কত কত ভাণ্ডার তোমাদের হাতে দিয়ে রেখেছি।

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করে বলতেন– الحمد لله الذي سقاناه عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجًا بذُنُوبنا (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রহমতে আমাদের সুপেয় মিঠা পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের পাপের কারণে তা বিস্বাদ ও লবণাক্ত করেননি। -ইবনে কাছীর ৪/৩১৭-৩১৮)।

৭১. আচ্ছা বল তো, যে আগুন তোমরা প্রজ্বলিত কর–

اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝

৭২. তার বৃক্ষ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমিই (তার) স্রষ্টা[১]?

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝

৭৩. আমিই তাকে বানিয়েছি স্মারক[২] ও মরু-প্রান্তরে বসবাসকারীদের জন্য ব্যবহার-উপযোগী[৩]।

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝

৭৪. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নাম নিয়ে তাসবীহ পাঠ করুন[৪]।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

[রুকূ - ৩]

৭৫. আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করে বলছি[৫];

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۝

১. আরবে এমন কিছু সবুজ গাছ আছে, যাতে ঘষা দিলে আগুন বের হয়। যেমনঃ আমাদের দেশে বাঁশ। এর বিবরণ ইতিপূর্বে সূরা ইয়াসীনে (আয়াত ৮০) গত হয়েছে। অর্থাৎ এসব বৃক্ষে কে আগুনের ব্যবস্থা রেখেছে– তোমরা, না আমি?

২. অর্থাৎ এই আগুন দেখে দোযখের আগুন স্মরণ করা উচিত। কারণ, এও তারই অংশ ও সামান্য নমুনা। আর চিন্তাশীলরা এই কথাও উপলব্ধি করতে পারে যে, যে খোদা সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন বের করতে পারেন, তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম।

৩. মরুভূমির বাসিন্দাদের এবং পথচারীদের আগুনের খুবই প্রয়োজন হয়, বিশেষ করে শীতকালে। তদুপরি আগুন দ্বারা সকলেরই প্রয়োজন মিটে।

বি. দ্র. কোনো কোনো রেওয়ায়াতের আলোকে আলিমগণ বলেছেন, এ আয়াতগুলিতে প্রত্যেক প্রশ্নবোধক বাক্য তেলাওয়াতের পর بل أنتَ يارب (আমরা নই, বরং আপনি হে প্রভু!) বলা মুস্তাহাব।

৪. যিনি এমন এমন উপকারী জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ অনুগ্রহে আমাদের উপকৃত করেছেন, তাঁর শোকর আদায় করা উচিত। আর কাফেরদের মনগড়া মিথ্যা বিষয়াদি থেকে তাঁর ও তাঁর মুবারক নামের পবিত্রতা বয়ান করা উচিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ এমন পরিষ্কার নিদর্শনাদি দেখার পরও তাঁর কুদরত ও একত্ববাদকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে না।

৫. অন্য অর্থ এই যে, আমি পয়গম্বরদের অন্তরে আয়াতসমূহের অবতরণের শপথ করছি। (موضح) অথবা– আসমান থেকে পৃথিবীর বুকে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে কুরআনের আয়াতসমূহের অবতরণের শপথ করছি।

৭৬. –আর এ এক মহাশপথ, যদি তোমরা বোঝ– وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عَظِيۡمٌۙ

৭৭. নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন। اِنَّهٗ لَقُرۡاٰنٌ كَرِيۡمٌۙ

৭৮. এক সুরক্ষিত কিতাবে (লিপিবদ্ধ)। فِىۡ كِتٰبٍ مَّكۡنُوۡنٍۙ

৭৯. তা তারাই স্পর্শ করে, যাদের পাক-পবিত্র বানানো হয়েছে[১]। لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الۡمُطَهَّرُوۡنَؕ

৮০. (তা) বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ[২]। تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ওই কিতাব হাতে স্পর্শ করেন। আর ওই কিতাব এই কুরআনই, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ।'

আর কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে لَا يَمَسُّه এর ضمير বা সর্বনাম দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। সুতরাং অর্থ এই যে, এ কুরআনকে পাক-পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করে। অর্থাৎ যারা পরিষ্কার অন্তর এবং পবিত্র স্বভাব-চরিত্রবিশিষ্ট, তারাই কুরআনের জ্ঞানরাশি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদি সঠিকভাবে উপলব্ধি ও উদ্ঘাটন করতে পারে। অথবা (অর্থ এই যে)– এই কুরআনকে পাক-পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ ওযু ছাড়া এতে হাত লাগানো জায়েয নয়, যেমন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে (সুনানে কুবরা বাইহাকী ১/৮৮)। অতএব لَا يَمَسُّه এর لا অক্ষর নিষেধবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরা হবে।

২. অর্থাৎ এ কোনো যাদু-টোনা নয়, গণকদেরও আজেবাজে কথাবার্তা নয়, (কবিদের) কাব্যিক ছন্দও নয়; বরং মহাপবিত্র ও মর্যাদাশালী কিতাব, যা বিশ্বপ্রভু বিশ্ব মানবতার হেদায়াত ও তরবিয়তের জন্য অবতীর্ণ করেছেন।

যে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্ররাজির সুদৃঢ় ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন, এ নক্ষত্ররাজি এক অটল নীতির অধীনে দৈনন্দিন অস্তগমনের দ্বারা সেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ববাদ এবং তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মহাপ্রদর্শনী করে থাকে। এবং তাদের অবস্থা নীরবে সাক্ষ্য দেয় যে, যে মহান সত্তা ও অদৃশ্য ক্ষমতাধরের হাতে আমাদের লাগাম রয়েছে, তিনিই একা পৃথিবী, মেঘ, পানি, আগুন, বায়ু, মাটি ও বিশ্বচরাচরের অণু-পরমাণুর মালিক ও স্রষ্টা।

এরূপ সমুজ্জ্বল আসমানী নিদর্শনাদি দেখার পরও কি ওই সকল বিষয়ের সত্যতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে, যা পূর্ববর্তী রুকূতে বর্ণিত হয়েছে? এবং একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এই মহা আসমানী ব্যবস্থাপনা অবলোকন করার পর এতটুকু কথা বুঝতে পারে না যে, যে বিশ্বপ্রভু স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরত ও রহমতের দ্বারা এই বাহ্যিক বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার আয়োজন করেছেন, তিনিই আরেকটি আধ্যাত্মিক সৌরজাগতিক ব্যবস্থাপনাও কায়েম করেছেন, অর্থাৎ কুরআন কারীম ও তার আয়াতসমূহ, অথবা বলুন– সমগ্র আসমানী কিতাব

৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে অবহেলা কর?	اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾
৮২. এবং একে অস্বীকার করাকেই নিজেদের উপজীব্য বানাও[১]?	وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾
৮৩. যখন (কারো) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়,	فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর তখন তোমরা তাকিয়ে থাক,	وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾
৮৫. এবং আমি তোমাদের চেয়ে তার বেশি নিকটবর্তী থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না–	وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তো, যদি তোমরা কারো কর্তৃত্বাধীন না হও*,	فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. তবে কেন (সেই ব্যক্তির) প্রাণকে ফিরিয়ে আন না যদি তোমরা সত্যবাদী হও[২]?	تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

ও সহীফা। আর আল্লাহ পাকই আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্রমালার অস্তগমনের পর (অর্থাৎ অন্যান্য আসমানী কিতাব ও সহীফার পর) কুরআনের সূর্যকে উদিত করেছেন এবং স্বীয় সৃষ্টিকে অন্ধকারে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। আজ পর্যন্ত এই সূর্য সমুজ্জ্বল রয়েছে। কার সাধ্য যে, একে পরিবর্তন করে কিংবা অদৃশ্য করে দেয়? তবে এর আলো ও দীপ্তি এবং কিরণমালা ওইসব অন্তরেই পরিপূর্ণরূপে আলো ছড়ায়, যেগুলি মেঝে-ঘসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (পরিশুদ্ধ) করে নেওয়া হয়।

১. অর্থাৎ কুরআন কি এমন বস্তু, যার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে তোমরা আলস্য ও শিথিলতা করবে এবং যার সাথে তোমাদের শুধু এতটুকু সম্পর্কই থাকবে যে, তাকে ও তার বর্ণিত সত্য বিষয়াদিকে অস্বীকার করবে? যেমন বৃষ্টি দেখে তোমরা বলে থাক যে, অমুক নক্ষত্র অমুক অক্ষে এসে গিয়েছিল বলে বৃষ্টি হয়েছে। এভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ও রহমতকে অস্বীকার কর। অনুরূপ এই রহমত-বৃষ্টির কদর না করা, যা কুরআনের আকারে নাযিল হয়েছে এবং বলে দেওয়া যে, তা আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি– এটা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা! একটি নে'য়ামতের কৃতজ্ঞতা কি এই যে, তাকে মিথ্যা বলা হবে?

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** '... হিসাব-নিকাশের আওতা-বহির্ভূত হও'।

২. অর্থাৎ এমন নিশ্চিন্ত ও নিঃসঙ্গ চিত্তে তোমরা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার কর, যেন তোমরা কারো আয়ত্তের মধ্যে নও, অথবা যেন কখনো তোমাদের মরতে ও আল্লাহর নিকট যেতেই হবে না।

৮৮. এখন যদি সেই (মৃত) ব্যক্তি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে,

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ﴿۸۸﴾

৮৯. তবে (তার জন্য রয়েছে) আরাম, উত্তম রিযিক ও নে'য়ামতের উদ্যান।

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿۸۹﴾

৯০. আর যদি সে ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়,

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ﴿۹۰﴾

৯১. তো আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ডান দিকের লোকদের ব্যাপারে*১।'

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ﴿۹۱﴾

৯২. আর যদি সে অস্বীকারকারী, পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়,

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ﴿۹۲﴾

আচ্ছা (যদি তাই হয়), তবে যখন তোমাদের কোনো প্রিয়জনের প্রাণ বের হতে শুরু করে, শ্বাস কণ্ঠনালীতে আটকে যায়, মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রণা চলতে থাকে এবং তোমরা পাশে বসে তার অসহায় অবস্থা দেখতে থাক, অন্যদিকে আল্লাহ বা ফেরেশতাগণ তোমাদের চেয়ে তার বেশি নিকটবর্তী থাকেন, যদিও তোমরা দেখতে পাও না– তো যদি তোমরা অন্য কারো আয়ত্তাধীন না হও, তবে তখন কেন প্রিয়জনের জানকে ফেরত আন না এবং কেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে নিজেদের থেকে পৃথক হতে দাও? দুনিয়ায় ফিরিয়ে এনে তাকে আসন্ন আযাব থেকে কেন বাঁচিয়ে নাও না? যদি নিজেদের দাবিতে সত্য হও, তবে এমনটি করে দেখাও।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'তবে (তাকে বলা হবে), তোমার জন্য রয়েছে প্রশান্তি। (তুমি তো) ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত'।

১. অর্থাৎ তোমরা এক মিনিটের জন্যও মৃত্যুকে ঠেকাতে পার না। প্রত্যেককে নিজ ঠিকানায় পৌঁছতেই হবে। এখন যদি মৃত ব্যক্তি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে সে সর্বোচ্চ স্তরের রূহানী ও দৈহিক আরাম-আয়েশের উপাদান-উপকরণ লাভ করবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি 'আসহাবে ইয়ামীন' এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবুও কোনো ভয় নেই।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, '...فسلام لك– অর্থাৎ তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকুন।'

অথবা অর্থ এই যে, আসহাবে ইয়ামীনের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সালাম পৌঁছবে। অথবা এ অর্থ যে– তাকে বলা হবে, তোমার জন্য ভবিষ্যতে আছে শান্তি আর শান্তি এবং তুমি 'আসহাবে ইয়ামীন' এর অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো হাদীছে আছে, মৃত্যুর আগেই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে এ সুসংবাদ প্রদান করা হয়। তদ্রূপ পাপীদেরকে ওদের দুরাবস্থার সংবাদও প্রদান করা হয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮৭৬৯)

৯৩. তবে (তার জন্য আছে) ফুটন্ত পানির আপ্যায়ন, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾

৯৪. এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া[১]। وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯৫. নিশ্চয় এ কথাই বিশ্বাসযোগ্য[*][২]। اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾

৯৬. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নাম নিয়ে তাস্‌বীহ পাঠ করুন[৩]। فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

---

১. অর্থাৎ এটাই হবে ওর পরিণাম, আর মৃত্যুর পূর্বে তার সংবাদ ওকে শুনিয়ে দেওয়া হবে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** নিশ্চয় এ-ই পরিপূর্ণ নিশ্চিত কথা।

২. অর্থাৎ তোমাদের অস্বীকার করায় কিছুই আসে যায় না। এখানে (কুরআনে) মুমিন ও পাপীদের সম্পর্কে যা কিছু সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, এমনটি হবেই হবে। সুতরাং অনর্থক দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতারিত করো না, বরং আসন্ন সময়ের (আখেরাতের) প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

৩. অর্থাৎ তাসবীহ ও তাহমীদে রত থাকুন, কারণ এটিই আখেরাতের বড় প্রস্তুতি। তাছাড়া এই নেক কাজে রত হলে অস্বীকারকারীদের কষ্টদায়ক আজেবাজে কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং ওদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহেরও খণ্ডন হয়।

সূরার সমাপ্তিতে সেই হাদীসটি উল্লেখ করতে মন চাচ্ছে, যার দ্বারা ইমাম বুখারী (র) তাঁর কিতাব সমাপ্ত করেছেন– (বুখারী, হাদীস : ৬৬৮২)

عن أبي هريرة رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ .

(আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'টি বাক্য উচ্চারণে অতি সহজ, ওজনে অতি ভারী এবং দয়াময়ের নিকট অতি প্রিয়। তা হচ্ছে : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)

সূরা হাদীদ

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৫৭ । ২৯ আয়াত । ৪ রুকূ । মাদানী

آيَاتُهَا ٢٩، رُكُوعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সব আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে[১], আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মত্যু ঘটান। আর তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান[২]।

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

৩. তিনিই আদি, অন্ত[৩], প্রকাশ্য ও গুপ্ত। আর তিনি প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত[৪]।

---

১. অর্থাৎ মুখের ভাষায় বা অবস্থার ভাষায় (অর্থাৎ ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাষায়), অথবা উভয় উপায়ে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে।

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থানে তাঁরই হুকুম ও ক্ষমতা চলে। জীবন দান ও মৃত্যু প্রদানের ক্ষমতা তাঁরই হাতে। আর তাঁর সৃষ্টিগত (তাক্বীনি) কার্যক্রম কেউ ব্যাহত করতে পারে না।

৩. যখন কেউ ছিল না, তখন তিনি বর্তমান ছিলেন। আর কেউ না থাকলেও তিনি বর্তমান থাকবেন।

৪. الظاهر والباطن
প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশ তাঁরই অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত। অতএব তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশমান ও সুস্পষ্ট না হলে আর কারটা হবে? আরশ থেকে ফরশ (বা পৃথিবী) পর্যন্ত এবং পরমাণু থেকে সূর্য পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব– তাঁর অস্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ।

কিন্তু সেই সাথে তাঁর সত্তার ও সিফাতের (বা গুণাবলির) প্রকৃত স্বরূপ মানবীয় আকল-বুদ্ধি উদ্ঘাটন করতে পারে না। তাঁর কোনো একটি সিফাত বা গুণের প্রকৃতি পরিপূর্ণরূপে কেউ অনুধাবন করতে পারে না, না নিজ অনুমান বা বিজ্ঞতা দিয়ে তার কাইফিয়ত (বা রূপ) বর্ণনা করতে পারে। এ হিসাবে বলা যেতে পারে, তাঁর চেয়ে বেশি বাতেন ও গোপন কেউই নেই। যা হোক, তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত এবং তিনি সব রকমের হাল-অবস্থা সম্বন্ধে অবগত।

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ‌ؕ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى الۡاَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنۡزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيۡهَا‌ؕ وَهُوَ مَعَكُمۡ اَيۡنَ مَا كُنۡتُمۡ‌ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ۝

৪. তিনিই সেই সত্তা, যিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন[১]। তিনি জানেন– যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা তা থেকে বের হয়[২] এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতরণ করে ও যা কিছু তাতে আরোহণ করে[৩]। তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। এবং তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা উত্তমরূপে দেখেন[৪]।

لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرۡجَعُ الۡاُمُوۡرُ ۝

৫. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। আর সকল বিষয় আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে[৫]।

তিনি এমন জাহের তথা পরাক্রমশালী যে, তাঁর উপরে কোনো শক্তি নেই। আর তিনি এমন বাতেন যে, তাঁর থেকে দূরে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে তাঁর দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। এ জন্যই হাদীছে (মুসলিম : ২৭১৩) রয়েছে–

وأنتَ الظاهر فليس فوقك شيء وأنتَ الباطن فليس دونك شيء

(আপনি 'জাহের', আপনার উর্ধ্বে কিছু নেই। আর আপনি 'বাতেন', আপনার অজ্ঞাত কিছু নেই।')

১. এর ব্যাখ্যা সূরা 'আরাফ'-এর ৫৪ নং আয়াতের অধীনে গত হয়েছে।

২. উদাহরণস্বরূপ, বৃষ্টির পানি ও বীজ মাটির ভিতরে গমন করে এবং ফসল, গাছ প্রভৃতি ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে। এর বিশদ আলোচনা সূরা সাবা-তে (আয়াত ২) গত হয়েছে।

৩. আকাশের দিক থেকে অবতরণ করে– ফেরেশতা, আহকাম, তাকদীরের ফয়সালা ও বৃষ্টি প্রভৃতি। আর আকাশে ওঠে– বান্দাদের আমল ও আল্লাহর ফেরেশতা।

৪. অর্থাৎ তিনি কোনো সময় তোমাদের কাছ থেকে গায়েব (অনুপস্থিত) নন; বরং যেখানেই তোমরা থাক এবং যে অবস্থাতেই থাক, তা তিনি উত্তমরূপে জানেন এবং তোমাদের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন আমল দেখেন।

৫. অর্থাৎ তাঁর রাজত্ব থেকে তোমরা বের হয়ে যেতে পারবে না। সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই একচ্ছত্র আধিপত্য এবং শেষ পর্যন্ত সকল বিষয়ের মীমাংসা তাঁর দরবারেই হবে।

৬. তিনি রাতকে প্রবেশ করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের মধ্যে[১]। এবং তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত[২]।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তিনি তোমাদের যে সম্পদে প্রতিনিধি বানিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর[৩]। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও ব্যয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান[৪]।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦

৮. আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদের আহ্বান করছেন, যাতে তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন; আর তিনি তো তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। যদি তোমরা মুমিন হও (তবে তা থেকে ফিরে যাবে কীভাবে?)[৫]।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

---

১. অর্থাৎ কখনো দিনকে কমিয়ে রাতকে বড় করে দেন এবং কখনো এর উলটো রাতকে ছোট করে দিনকে বড় করেন।

২. অর্থাৎ মনে যেসব নিয়ত ও ইচ্ছা পয়দা হয়, অথবা খতরা (খারাপ ধারণা) ও ওয়াসওয়াসা আসে, সে সবও তিনি জানেন।

৩. অর্থাৎ যে সম্পদ তোমাদের হাতে আছে তার মালিক আল্লাহই। তোমরা শুধু আমানতদার ও খাজাঞ্চি (রক্ষক)। অতএব যেখানে সেই মালিক ব্যয় করতে বলবেন, সেখানে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ব্যয় কর। আর এও মনে রেখো যে, পূর্বে এ সম্পদ অন্যদের হাতে ছিল, তোমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছ। বলা বাহুল্য, তোমাদেরও স্থলাভিষিক্ত অন্যদের বানানো হবে।

সুতরাং যখন জানা গেল, এ জিনিস পূর্ববর্তীদের নিকটও চিরকাল রয়নি, তোমাদের কাছেও থাকবে না– তখন এমন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসে এতটা মন লাগানো সমীচীন নয় যে, জরুরী ও সংগত স্থানেও ব্যয় করতে পিছিয়ে থাকবে।

৪. সুতরাং যাদের মধ্যে এই গুণ ও স্বভাব (ঈমান ও বদান্যতা) নেই, তাদের কর্তব্য নিজেদের মধ্যে এটি পয়দা করা। আর যাদের মধ্যে আছে, তারা এর উপর সর্বদা অবিচল থাকবে ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করবে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে অথবা বিশ্বাস ও মারেফতের পথে অবিচল থাকতে বাধা কিসের? (বস্তুত কোনই বাধা নেই।)

هُوَ الَّذِیۡ یُنَزِّلُ عَلٰی عَبۡدِہٖۤ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ لِّیُخۡرِجَکُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰہَ بِکُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ⑨

৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতি করুণাময়, পরম মেহেরবান[১]।

وَ مَا لَکُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لِلّٰہِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ

১০. তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই[২]।

আর এ ব্যাপারে তোমরা অলসতা করবে কীভাবে, যখন আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে কোনো অভিনব ও অসংগত বিষয়ের প্রতি নয়, বরং তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তার প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন? আর সেই পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস তোমাদের ফিত্‌রত তথা মূল স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রাখা হয়েছে এবং তোমরা দুনিয়াতে আসার পূর্বেই তাঁর রুবুবিয়্যতের স্বীকৃতি দিয়েছ। এবং এই স্বীকারোক্তির কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া আজ পর্যন্ত বনী আদমের অন্তরে পাওয়া যায়। তদুপরি দলীল-প্রমাণাদি ও রাসূল-প্রেরণের মাধ্যমে এই শাশ্বত স্বীকৃতি-অঙ্গীকার স্মরণও করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁদের উম্মতদের থেকে এই ওয়াদাও নিয়েছেন যে, তারা সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে (যদি তাঁর আবির্ভাব হয়ে যায়)। আর তোমাদের মধ্যেও এমন বহু লোক রয়েছে, যারা স্বয়ং নবীজীর মুবারক হাতে হাত রেখে আনুগত্য করা, আল্লাহর পথে ব্যয় করা ইত্যাদি ঈমানী বিষয় মেনে চলার পাক্কা অঙ্গীকার করেছে।

অতএব এতসব কার্যকারণের উপস্থিতিতে যে আল্লাহকে মানতে চায়, তার না মানার এবং যে তাঁকে মেনে নিয়েছে তার এ থেকে ফিরে যাওয়ার অবকাশ কোথায়?

১. অর্থাৎ তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং (এর) সত্যতার নিদর্শনাদি দান করেছেন, যাতে এসবের দ্বারা তোমাদেরকে কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও ইলমের আলোতে নিয়ে আসেন। বস্তুত এটি আল্লাহর বড় দয়া ও মেহেরবানী। যদি তিনি দয়া-মায়াহীন হতেন, তবে উক্ত আঁধারে ফেলে রেখে তোমাদের ধ্বংস করে দিতেন অথবা ঈমান আনার পরও পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ ক্ষমা করতেন না।

২. অর্থাৎ সম্পদের মালিক মরে যায়, কিন্তু আল্লাহর মালিকানা (স্বত্ব) থেকে যায়। আর এমনিতেও ধন-সম্পদ চিরকাল তাঁরই। ফের তাঁর সম্পদ থেকে তাঁরই নির্দেশ মত ব্যয় করা বোঝা মনে হবে কেন? খুশী ও স্বেচ্ছায় না দিলেও অবশেষে অনিচ্ছায় সম্পদ তাঁরই হাতে পৌঁছবে। দাসত্বের দাবি হল, খুশী মনে সম্পদ পেশ করে দেওয়া এবং তাঁর পথে ব্যয় করতে দারিদ্র্যের ভয় না করা। কেননা, যমীন-আসমানের সকল ভাণ্ডারের মালিক আল্লাহই।

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟

তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা)-বিজয়ের[১] পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, তারা (ও পরবর্তীরা) সমান নয়। এরূপ লোকেরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে। আর আল্লাহ প্রত্যেককে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন[২]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত[৩]।

[রুকূ - ২]

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَ

১১. এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, অতঃপর তিনি তার জন্য তা কয়েক গুণ করে দেবেন এবং

তাঁর পথে খুশী মনে যে ব্যয় করবে, সে কি ভুখা থাকবে? ولاتخش من ذي العرش إقلالا ('আরশওয়ালা দান কমিয়ে দেবেন– এ আশঙ্কা করো না।')

১. (বিজ্ঞ মুতারজিম র. الفتح দ্বারা মক্কা-বিজয় উদ্দেশ্য করেছেন। তবে) কেউ কেউ এ দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি বুঝেছেন এবং কোন কোন হাদীস দ্বারা এরই সমর্থন হয়। (তাফসীরে তবারী ২২/৩৯৮)

২. অর্থাৎ আল্লাহর পথে যে কোনো সময় ব্যয় করা ও জেহাদ করাই ভাল। আল্লাহ তাআলা এর উত্তম বিনিময় দুনিয়া ও আখেরাতে দেবেন। কিন্তু যে সামর্থ্যবানেরা 'মক্কা বিজয়' বা 'হুদায়বিয়া'র আগে খরচ করেছে ও জেহাদ করেছে, তারা বড় মর্যাদা লাভ করেছে। পরবর্তী মুসলিমগণ তাদের সমমর্যাদায় পৌঁছতে পারে না।

কারণ, তা এমন একটা সময় ছিল, যখন সত্যগ্রহণকারী ও সত্যের পক্ষে লড়াইকারী খুবই কম ছিল এবং দুনিয়া কাফের ও বাতেলপূজারীদের দ্বারা ভরপুর ছিল। সুতরাং সে সময় জান-মাল কুরবানী করার প্রয়োজন বেশি ছিল এবং বাহ্যত মুজাহিদদের পক্ষে ধন-সম্পদ, গনীমতের মাল ইত্যাদির আশাও খুবই কম ছিল। এ অবস্থায় ঈমান আনা ও খোদার পথে জান-মাল উৎসর্গ করা বড়ই সাহসী ও পাহাড় অপেক্ষা বেশি দৃঢ়পদ লোকদের কাজ ছিল।

فرضي الله عنهم ورضوا عنه ورزقنا الله اتباعهم وحبهم . آمين

৩. অর্থাৎ কার আমল কোন্ পর্যায়ের এবং তাতে ইখলাসের পরিমাণ কতখানি– তা সবই আল্লাহর জানা আছে। তিনি এই ইলম অনুযায়ী প্রত্যেকের সঙ্গে যথা আচরণ করবেন।

لَهٗۤ اَجۡرٌ كَرِیۡمٌ ﴿۱۱﴾

সে লাভ করবে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান[১]?

یَوۡمَ تَرَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ یَسۡعٰی نُوۡرُهُمۡ بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ بِاَیۡمَانِهِمۡ بُشۡرٰىكُمُ الۡیَوۡمَ جَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۲﴾

১২. (স্মরণ কর), যেদিন তুমি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমনদার নারীদের দেখবে– তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানে দৌড়াচ্ছে[২]। (তাদের বলা হবে,) 'আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতরাজির সুসংবাদ, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত, যাতে তোমরা অনন্তকাল থাকবে। এ-ই মহাসাফল্য'[৩]।

یَوۡمَ یَقُوۡلُ الۡمُنٰفِقُوۡنَ وَ الۡمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوا انۡظُرُوۡنَا نَقۡتَبِسۡ مِنۡ نُّوۡرِكُمۡ ۚ قِیۡلَ ارۡجِعُوۡا وَرَآءَكُمۡ فَالۡتَمِسُوۡا نُوۡرًا ؕ فَضُرِبَ بَیۡنَهُمۡ بِسُوۡرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ

১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা ঈমানদারদের বলবে, 'আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের নূর থেকে কিছু আলো নিয়ে নিই।' (ওদের) বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং (সেখানে) আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর তাদের মাঝখানে দরজাবিশিষ্ট একটি প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।

---

১. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ঋণ' প্রদানের অর্থ এই যে, এখন তোমরা জেহাদে ব্যয় কর। এর পর তোমরাই ধন-সম্পদ লাভ করবে, ভোগ করবে' এবং (পরকালে বড় বড় মর্তবা পাবে।) কয়েক গুণ পাওয়ার অর্থ এটাই। নতুবা প্রভু ও দাসের মধ্যে কোনো সুদ ও প্রবৃদ্ধির ব্যাপার নেই– যা দিলেন তাও তাঁর, যা দিলেন না তাও তাঁর।'

২. হাশরের ময়দান থেকে যখন পুলসিরাতে যাবে, তখন ভীষণ অন্ধকার হবে। এই সময় মুমিনদের ঈমান ও সৎকর্মের আলো সঙ্গে থাকবে। সম্ভবত ঈমানের আলো সামনে ও সৎকর্মের আলো ডানে থাকবে। কারণ, ঈমানের স্থান সামনের অন্তর আর সৎকর্ম ডান দিকে জমা হয়। যার ঈমান ও আমল যে স্তরের হবে, তার আলো সে পর্যায়েরই হবে। আর খুব সম্ভব এ উম্মতের আলো তাদের নবীর ওসীলায় অন্য উম্মতদের আলো থেকে বেশি উজ্জ্বল হবে।

কোনো কোনো রেওয়ায়াত দ্বারা বাঁ দিকেও আলো থাকার কথা জানা যায় (মুসতাদরাকে হাকিম, বর্ণনা ৩৮২৬)। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য এই যে, আলোর প্রভাব সব দিকেই পৌছবে।

৩. কেননা, জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান। অতএব যে সেখানে পৌছে গেল, তার সব মনোবাঞ্ছা হাসিল হয়ে গেল।

بَاطِنُهٗ فِيۡهِ الرَّحۡمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنۡ قِبَلِهِ الۡعَذَابُ ؕ

তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে আযাব[১]।

يُنَادُوۡنَهُمۡ اَلَمۡ نَكُنۡ مَّعَكُمۡ ؕ قَالُوۡا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمۡ فَتَنۡتُمۡ اَنۡفُسَكُمۡ وَتَرَبَّصۡتُمۡ وَارۡتَبۡتُمۡ وَغَرَّتۡكُمُ الۡاَمَانِىُّ

১৪. মুনাফিকরা তাদের ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না[২]?' তারা বলবে, 'হাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের পথভ্রষ্ট করেছ। আর তোমরা প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশা-আকাঙ্খা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিল,

---

১. অর্থাৎ মুমিনদের ও কাফেরদের মাঝখানে প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, যার মধ্যে দরজা থাকবে। সেই দরজা দিয়ে মুমিনরা জান্নাতের দিকে অগ্রসর হয়ে মুনাফিকদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। দরজার ভিতরে প্রবেশ করে তারা জান্নাতের মনোরম অবস্থা দেখবে, আর দরজার অপর দিকে খোদায়ী আযাবের দৃশ্য দেখা যাবে।

২. ব্যাখ্যা এই যে, যারা প্রকাশ্যেই কাফের ছিল, তারা পুলসিরাতের উপর সামান্যও চলতে পারবে না; বরং প্রথমেই ওদের ধাক্কা দিয়ে দোযখের দরজাসমূহ দিয়ে তাতে ফেলে দেওয়া হবে। আর যারা কোনো নবীর সাচ্চা বা কাঁচা উম্মত ছিল, তাদের পুলসিরাত পার হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে।

তাতে ওঠার পূর্বেই এক ঘন অন্ধকার লোকদের আচ্ছাদিত করে ফেলবে। তখন ঈমানদারদের সঙ্গে আলো থাকবে। আর মুনাফিকরা সেই আলোতে পিছনে পিছনে যেতে চাইবে। কিন্তু মুমিনরা দ্রুত আগে বেড়ে যাবে। তাই তাদের আলো মুনাফিকদের থেকে দূরে চলে যেতে থাকবে। তখন ওরা ডেকে বলবে, মিয়ারা! একটু থাম, আমাদের অন্ধকারে ফেলে তোমরা যেয়ো না। একটু অপেক্ষা কর, যাতে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারি। দুনিয়াতে আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই থাকতাম এবং আমরাও বাহ্যত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। এখন এ মুসীবতের সময় আমাদের আঁধারে ফেলে রেখে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বন্ধুত্বের দাবি কি এ-ই? তখন উত্তরে বলা হবে, পিছনে প্রত্যাবর্তন করে আলো তালাশ কর। যদি পাও, সেখান থেকে নিয়ে আস। এ কথা শুনে ওরা পিছনে যাবে। এমন সময় দুই দলের মধ্যে প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে।

ارجعوا وراءكم– অর্থাৎ আলো কামাই করতে হয় দুনিয়ায়। তা তো পিছনে ফেলে এসেছ। অথবা 'وراءكم' দ্বারা উদ্দেশ্য সেই স্থান, পুলসিরাতে আরোহণের আগে যেখানে আলো বণ্টন করা হয়েছিল।

حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑭

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর হুকুম এসে পড়ল। বস্তুত সেই বড় প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল[১]।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ۗ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑮

১৫. অতএব আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফেরদের থেকেও না। তোমাদের (সকলের) ঠিকানা দোযখ। তা-ই তোমাদের সঙ্গী। আর (তা) কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[২]!

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ

১৬. ঈমানদারদের জন্য কি এর সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর বিগলিত হবে– আল্লাহর স্মরণ ও যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার সামনে[৩]?

---

১. অর্থাৎ নিঃসন্দেহে দুনিয়ায় তোমরা বাহ্যত আমাদের সঙ্গে ছিলে এবং মুখে ইসলামের দাবিও করতে। কিন্তু তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এই ছিল যে, দুনিয়ার কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসে পড়ে তোমরা নেফাকের রাস্তা অবলম্বন করেছিলে। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছিলে।

তারপর তোমরা তওবা করনি; বরং প্রতীক্ষায় ছিলে যে, কবে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর কোনো মুসিবত আসবে। তদুপরি তোমরা দীন সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বহু রকম সন্দেহের জলাভূমিতে ফেঁসে রইলে। তোমরা এ ধোঁকাতেই ছিলে যে, এসব মুনাফিকী কার্যকলাপের কোনোই প্রতিফল ভোগ করতে হবে না; বরং এমন আশা ও ধারণা করছিলে যে, কিছু দিনের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানরা খতম হয়ে যাবে। পরিশেষে আমরাই বিজয়ী হব। রইল আখেরাতের বিষয়, তো তোমরা ভেবেছিলে, সেখানেও কোনো না কোনো উপায়ে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।

তোমরা এমনসব ধারণা-কল্পনায় মগ্ন ছিলে, এরই মধ্যে আল্লাহর হুকুম এসে গেল এবং মৃত্যু এসে আঘাত হানল। আর ওই মারাত্মক প্রতারক (শয়তান) তোমাদের প্রতারিত করে এমনি পথভ্রষ্ট করেছে যে, এখন আর নিষ্কৃতির কোন পথ নেই।

২. অর্থাৎ অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া হোক, আজ যদি তোমরা মুনাফিকরা ও প্রকাশ্য কাফেররা কিছু মুক্তিপণ ইত্যাদি দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচতে চাও, তবে তা মোটেই মঞ্জুর হবে না। তোমাদের সবাইকে এখন এই জাহান্নামেই থাকতে হবে, এই দোযখের আগুনই তোমাদের ঠিকানা এবং এ-ই তোমাদের সঙ্গী। আর কারো সঙ্গ পাওয়ার আশা রেখো না।

৩. অর্থাৎ সময় এসে গেছে– এখন মুমিনদের অন্তর কুরআন, আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর সত্য দীনের সামনে ঝুঁকে যাওয়া এবং নম্র হয়ে ক্ষমা প্রার্থনায় মগ্ন হওয়া উচিৎ।

وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ۝

এবং তারা ওদের মত হবে না, যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর ওদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল; ফলে ওদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল। আর ওদের অনেকেই (চরম) নাফরমান[১]।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۝

১৭. জেনে রাখ, আল্লাহ ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আমি তো তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার[২]।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ۝

১৮. যে পুরুষেরা ও নারীরা দানশীল এবং তারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, নিশ্চয় তাদের জন্য তা কয়েক গুণ করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদাকর প্রতিদান[৩]।

---

১. অর্থাৎ ঈমানের মর্ম তো হচ্ছে অন্তরের বিনম্র, বিগলিত হওয়া এবং নসীহত ও আল্লাহর যিকিরের প্রভাব দ্রুত কবুল করা। শুরুতে পয়গম্বরদের সুহবতে কিতাবধারীরা এসব বিষয় অর্জন করত। কালের গতিধারায় উদাসীনতা তাদের অন্তরের উপর ছাপ ফেলতে থাকে। ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে যায়, পূর্বের অবস্থা আর রইল না। অধিকাংশই দারুণ অবাধ্যতা ও নাফরমানী শুরু করল।

এখন মুসলমানদের পালা এসেছে, তারা যেন আপন পয়গম্বরের সুহবতে থেকে দিলের নম্রতা, পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আল্লাহর স্মরণে অন্তর বিগলিত হওয়া– ইত্যাদি গুণাবলিতে গুণান্বিত হয় এবং সেই বুলন্দ মাকামে পৌঁছে যায়, যেখানে ইতিপূর্বে কোনো উম্মত পৌঁছতে পারেনি।

২. মৃত জমির মত আরবের লোকেরা মূর্খ ও পথহারা ছিল। এখন আল্লাহ ঈমান ও ইলমের রূহ দ্বারা তাদের জীবিত করেছেন এবং তাদের মধ্যে সকল গুণ পয়দা করে দিয়েছেন। অতএব কেউ যতই মৃত হোক না কেন, তার নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। খাঁটি তওবা করে নিলে আল্লাহ তার দেহে পুনরায় জীবাত্মা সঞ্চার করে দেবেন।

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাঁটি নিয়তে তাঁর পথে ব্যয় করবে এবং আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী না হবে, তারা যেন আল্লাহকে ধার দেয়। অতএব তারা নিশ্চিত থাকুক, তাদের প্রদত্ত ধন-সম্পদ বিনষ্ট হবে না; বরং অনেক গুনে বৃদ্ধি করে তাদের ফেরত দেওয়া হবে।

১৯. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই সাচ্চা ঈমানদার এবং আপন রবের নিকট (লোকদের ব্যাপারে) সাক্ষ্য প্রদানকারী। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ও আলো[১]। আর যারা কাফের হয়েছে ও আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, ওরা জাহান্নামী[২]।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۹﴾

[রুকূ - ৩]

২০. জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলাধুলা, রঙ-তামাশা, সাজ-সজ্জা, পরস্পর অহংকার করা এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্য অন্বেষণ করার নাম। (পার্থিব জীবন তো এমন) যেমন বৃষ্টি, যার (দ্বারা উদ্‌গত) শস্য কৃষকদের মুগ্ধ করে। অতঃপর তা তেজস্বী হয়*, তারপর তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অতঃপর তা (দলিত) খড়কুটা হয়ে যায়। আর আখেরাতে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ

১. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) বাহ্যত الشهداء কে الصديقون এর সাথে যুক্ত করে অর্থ করেছেন– যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে (এবং এই বিশ্বাসের প্রভাব তাদের আমল ও অবস্থাদির মধ্যে প্রকাশ পাবে), তারাই পাক্কা ঈমানদার এবং আল্লাহর দরবারে তারা সাক্ষীরূপে অন্য লোকদের অবস্থাদি বর্ণনা করবে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে বলেন– وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (এমনিভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা [অন্য সব] মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী হতে পার এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন)। আখেরাতে এমন সাচ্চা ঈমানদারদের নিজ নিজ আমল ও ঈমানের স্তর অনুযায়ী ছওয়াব ও আলো দান করা হবে।

(আলোচ্য আয়াতের তাফসীর আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে; কিন্তু সংক্ষিপ্ততার বিবেচনায় এখানে সেগুলি উল্লেখ করা যাচ্ছে না।)

২. অর্থাৎ দোযখ আসলে ওদেরই জন্য তৈরি করা হয়েছে।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'শুকিয়ে যায়'।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۞

আর দুনিয়ার জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়[১]।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞

২১. তোমরা অগ্রগামী হও আপন রবের ক্ষমা ও সেই বেহেশতের দিকে[২], যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার ন্যায়[৩], যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের জন্য। এ আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল[৪]।

---

১. মানুষের প্রথম জীবনের চাহিদা খেলাধুলা, তারপর রঙ-তামাশা, তারপর সাজ-সজ্জা ও ফ্যাশন, তারপর মান-সম্মান বাড়ানো ও নাম-যশ হাসিল করা, তারপর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ফিকির এবং চিন্তা-ভাবনা যে, আমার বাড়ি-ঘর তৈরি হোক এবং আমার ছেলেমেয়েরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করুক।

কিন্তু এসব জাঁকজমক নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। যেমনঃ ফসলের সৌন্দর্য-শ্যামলিমা মাত্র কয়েক দিনের জন্য হয়ে থাকে, তারপর হলুদ, পীত বর্ণ ধারণ করে এবং মানুষ ও পশুপাল তা দলন-মর্দন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। সেই সৌন্দর্য ও শ্যামলিমার নামনিশানাও থাকে না। ঠিক এই অবস্থাই দুনিয়ার জীবনের ও তার আসবাবপত্র ও সাজসজ্জার। অতএব, তা প্রকৃতপক্ষে একটা প্রতারণার উপকরণ ও ধোঁকার বেশাতি। মানুষ এর সাময়িক বসন্ত-সৌন্দর্যে প্রতারিত হয়ে নিজের পরিণাম ধ্বংস করে দেয়, অথচ মৃত্যুর পর এসব জিনিস কোনো কাজের নয়।

সেখানে অন্য বস্তু কাজে আসবে। অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এ জিনিস কামাই করে নিয়ে গেল, সে সফলকাম হল। পরকালে তার জন্য রয়েছে মালিকের সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী। আর যে ব্যক্তি ঈমানের দৌলত থেকে মাহরুম রইল এবং কুফর ও পাপের বোঝা নিয়ে গেল, ওর জন্য থাকবে কঠিন আযাব। আর যে ব্যক্তি ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমলাদিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি করেছে, তার জন্য সত্বর বা দেরিতে ধাক্কা খাওয়ার পর ক্ষমা রয়েছে। পূর্বেরটা ছিল দুনিয়ার সার-নির্যাস, আর এটি হল আখেরাতের।

২. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে সেসব উপকরণ (আমলাদি) হাসিল করে নাও, যার দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হবে এবং বেহেশত লাভ হবে। এ ব্যাপারে অলসতা ও দেরি করা সমীচীন নয়।

৩. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে মেলালে তার সমান হবে জান্নাতের প্রস্থ। অতএব এর দৈর্ঘ কী, তা আল্লাহই জানেন।

৪. অর্থাৎ ঈমান ও আমল নিঃসন্দেহে জান্নাত লাভের উপকরণ, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তা লাভ হয় আল্লাহর দয়ায়। তাঁর দয়া না হলে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিই অসম্ভব, জান্নাত লাভ করা তো আরো পরের বিষয়।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۟

২২. পৃথিবীতে ও স্বয়ং তোমাদের প্রাণের উপর যে বিপদই পতিত হয়, আমি তাকে সৃষ্টি (ও সংঘটিত) করার পূর্বেই একটি কিতাবে তা লিপিবদ্ধ থাকে[১]। নিশ্চয় এ আল্লাহর পক্ষে সহজ[২]।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۟

২৩. (তোমাদের উক্ত বিষয়ে অবহিত করা হল), যাতে যা তোমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও, এবং যা তিনি তোমাদের দান করেন তার কারণে উল্লসিত না হও[৩]। আর আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে–

---

১. যমীনে যে সর্বগ্রাসী বিপদ আসে যথা দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি এবং স্বয়ং তোমাদের উপর যে মুসিবত আপতিত হয় যথা রোগ-শোক প্রভৃতি– এ সবই আল্লাহর অনাদি জ্ঞানে পূর্ব নির্ধারিত এবং লওহে মাহফূজে লিখিত। সে মত দুনিয়ায় এগুলো প্রকাশ পাবেই পাবে। অণু পরিমাণও কমবেশী বা আগ-পাছ হতে পারে না।

২. অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর পক্ষে স্বকীয়; কোনো পরিশ্রম দ্বারা তাঁকে তা হাসিল করতে হয়নি। সুতরাং নিজস্ব সর্বব্যাপী ইলম অনুযায়ী সকল বিপদ ও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই কিতাবে (লওহে মাহফূজে) তা লিপিবদ্ধ করে রাখা তাঁর জন্য কোন কঠিন নয়।

৩. অর্থাৎ উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তোমাদের এজন্য অবহিত করা হল, যাতে তোমরা উত্তমরূপে জেনে নাও যে, যে কল্যাণ তোমাদের জন্য নির্ধারিত, তা অবশ্যই আসবে, আর যা নির্ধারিত নয়, তা কখনো হস্তগত হবে না। যা কিছু আল্লাহ তাআলার অনাদি জ্ঞানে সাব্যস্ত রয়েছে, তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং কোন উপকারী জিনিস হস্তগত না হলে তার জন্য দুঃখিত, অস্থির ও পেরেশান হওয়া উচিত নয়। আর যা ভাগ্যগুণে হস্তগত হয়, তাতে উদ্ধত ও অহংকারী হতে নেই; বরং বিপদে ও অসফল হলে সবর ও ধৈর্য ধরা চাই এবং আরাম ও সফলতার সময় শোকর ও হাম্‌দ (আল্লাহর প্রশংসা) করা উচিত।

বি. দ্র. পূর্বে اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত হয়ে পরকাল সম্বন্ধে গাফেল হওয়া উচিত নয়। আর বর্তমান আয়াতে অবহিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে পড়ে ভারসাম্যের সীমা যেন লঙ্ঘন না করা হয়।

২৪. যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং লোকদের কার্পণ্য করতে শেখায়[১]। আর যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিল, তো নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার অধিকারী[২]।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

২৫. নিশ্চয় আমি নিদর্শনাদি দিয়ে আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়-নীতির উপর কায়েম থাকে[৩]। এবং আমি নাযিল করেছি লোহা[৪]। তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি ও মানুষের বহুবিধ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

---

১. অধিকাংশ অহংকারী ধনী ব্যক্তিদের অবস্থা এটাই হয়ে থাকে যে, তারা খুব গর্ব ও বড়াই তো করে, কিন্তু খরচ করার সময় তাদের পকেট থেকে পয়সা বের হয় না। কোনো সৎকর্মে ব্যয় করার তাওফীক তাদের হয় না এবং অন্যদেরও এ সবই শেখায়। বস্তুত, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আগে বেড়ে ব্যয় করা আল্লাহর উপর ভরসাকারী ও সাহসী ব্যক্তিদেরই কাজ, যারা টাকা-পয়সার সাথে মহব্বত রাখে না এবং তারা জানে, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সবই একচ্ছত্র মালিকের (অর্থাৎ আল্লাহর) পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

২. অর্থাৎ তোমাদের ব্যয় করা-না করায় তাঁর কোনো লাভ-ক্ষতি হয় না। তাঁর সত্তা তো অমুখাপেক্ষী ও বে-নিয়ায। সমস্ত উত্তম গুণাবলি পূর্ণরূপে তাঁর সত্তায় বিদ্যমান। তোমাদের কোনো কর্মের দ্বারা তাঁর কোনো সৌন্দর্যে বৃদ্ধি ঘটে না। যা কিছু লাভ-ক্ষতি, সবই তোমাদের। ব্যয় করলে তোমরা নিজেরাই উপকৃত হবে, না করলে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. الميزان– বলতে সম্ভবত ওজন করার পাল্লাকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ, হুকুক (বা পাওনা-দাওনা) আদায়করণে ও লেনদেনে ইনসাফ কায়েম করায় তার ভূমিকা রয়েছে। আয়াতের অর্থ হল– আল্লাহ তাআলা আসমানী কিতাব এজন্য অবতীর্ণ করেছেন, যাতে মানুষ আকীদা-বিশ্বাস এবং আখলাক ও আমলাদিতে ইনসাফের সরল রাস্তা অবলম্বন করে, শিথিলতা ও বাড়াবাড়ির রাস্তায় না চলে। আর তুলাদণ্ড এজন্য দান করেছেন, যাতে বেচাকেনা ইত্যাদি লেনদেনের ক্ষেত্রে ইনসাফের প্রতি লক্ষ রাখা হয়, কম-বেশ না করা হয়।

আর হতে পারে, তুলাদণ্ড দ্বারা শরী'য়তকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, শরী'য়ত দ্বারা অন্তর ও দেহের সমস্ত আমলের ভাল-মন্দ জানা যায় ও পরিমাপ করা যায়।

৪. অর্থাৎ তিনি নিজের কুদরতের দ্বারা লোহা সৃষ্টি করেছেন এবং মাটির নীচে তার খনি রেখে দিয়েছেন।

اللهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

উপকারিতা[১]। আর (তা এজন্যও নাযিল করা হয়েছে), যাতে আল্লাহ জেনে নেন, কে তাঁকে দেখা ছাড়াই তাঁর ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে[২]। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী[৩]।

[রুকূ - ৪]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

২৬. নিশ্চয় আমি নূহ ও ইবরাহীমকে প্রেরণ করেছিলাম এবং উভয়ের বংশধরদের মধ্যে রেখেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা[৪]। অতঃপর তাদের মধ্যে কতক পথপ্রাপ্ত হয়েছে, আর তাদের বহুসংখ্যক ছিল নাফরমান[৫]।

---

১. লোহা দ্বারা যুদ্ধের সরঞ্জাম (অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি) তৈরি হয় এবং তা মানুষের আরো বহু কাজে ও উপকারে আসে।

২. অর্থাৎ, যারা আসমানী কিতাব পেয়েও সৎপথে আসবে না এবং দুনিয়ায় ইনসাফের প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখবে না, তাদের শায়েস্তা করার এবং জালেম ও বক্র অবাধ্যদের উপর আল্লাহ-রাসূলের বিধানের কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রয়োজন হবে। আর এই প্রয়োজনেই হাতে তরবারী তুলে নিতে হবে এবং দীনী জেহাদে সেই লোহারই সাহায্য নিতে হবে। তখন প্রকাশ পাবে, কারা আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা, যারা না দেখে, আল্লাহর মহব্বতে এবং আখেরাতের অদৃশ্য প্রতিদান ও ছওয়াবের উপর বিশ্বাস করে আল্লাহর দীন ও রাসূলদের সাহায্য করে।

৩. অর্থাৎ জেহাদের শিক্ষা ও উৎসাহ এজন্য দেওয়া হয়নি যে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও সহায়তার মুখাপেক্ষী। আচ্ছা, সেই শক্তিধর ও শক্তিশালী সত্তা দুর্বল সৃষ্টির সাহায্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী হবেন কেন? হাঁ, তা দ্বারা তোমাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির পরীক্ষা উদ্দেশ্য- যাতে যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের উচ্চ মর্যাদায় পৌছানো যায়।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত ও কিতাবের জন্য এই দু'জনের বংশধরদের বাছাই করেছিলেন যে, তাঁদের পর এ দৌলত তাঁদের সন্তান-সন্ততির বাইরে যাবে না।

৫. অর্থাৎ যাদের প্রতি তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে, অথবা এভাবেও বলা যায় যে, এই দু'জনের সন্তান-সন্ততির মধ্যে- কতক সৎপথে ছিল, তবে অধিকাংশই নাফরমান প্রমাণিত হয়েছে।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۟ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ

২৭. অতঃপর তাদের পশ্চাতে আমি আমার আরো রাসূল ক্রমাগত পাঠিয়েছিলাম[১]; আর আরো পরে ঈসা ইবনে মারয়ামকে পাঠালাম ও তাঁকে ইন্‌জীল দিলাম[২]। এবং তাঁর অনুসারীদের অন্তরে নম্রতা ও দয়া রেখে দিলাম[৩]। রইল বৈরাগ্য, তা তারা নিজেরা উদ্ভাবন করেছিল; আমি তা তাদের উপর ফরয করিনি। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য (তারা তা উদ্ভাবন করেছিল)। তবে তারা তার যত্ন সেভাবে নেয়নি, যেভাবে যত্ন নেওয়া উচিত ছিল[৪]।

---

১. অর্থাৎ পরবর্তী রাসূলগণ ওই পূর্ববর্তীগণেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। মৌলিকভাবে সকলের শিক্ষাই এক ছিল।

২. অর্থাৎ অবশেষে বনী ইসরাঈলের নবীদের خاتم তথা তাদের শেষ নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে ইনজীল দিয়ে প্রেরণ করেন।

৩. অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আ)-এর সঙ্গী-সাথীরা, যারা সত্যিই তাঁর পথের অনুসারী ছিল, তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা কোমলতা দান করেছিলেন। তারা আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে ভালবাসা ও স্নেহ-মমতাপূর্ণ আচরণ করত এবং তারা একে অপরের সঙ্গেও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করত।

৪. على آثارهم- অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আ)-এর অনুসারীরা পরবর্তীতে বেদীন বাদশাহদের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে এবং দুনিয়ার ঝক্কি-ঝামেলায় ঘাবড়ে গিয়ে এক বেদআত 'বৈরাগ্য' উদ্ভাবন করল, যার নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। তাদের নিয়ত তো ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তা সঠিকরূপে পালন করতে পারেনি।

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এই ফকিরী ও দুনিয়া বর্জনের প্রথা খ্রিস্টানরা চালু করেছিল। তারা জঙ্গলে গিয়ে বসে পড়ল। বিবাহ করত না। সংসার জীবন পরিহার করে চলত। কামাইও করত না, সামাজিক জীবন-যাপনও করত না। তারা শুধু ইবাদতেই রত থাকত, সৃষ্টির সঙ্গে মেলামেশা করত না। অথচ আল্লাহ তাআলা বান্দাদের এ নির্দেশ দেননি (যে, এভাবে দুনিয়া বিসর্জন দিয়ে বসে থাক)। তারা নিজেরা দুনিয়া বিসর্জনের নাম তো ধারণ করল, কিন্তু এক পর্যায়ে ছদ্মবেশে দুনিয়া কামাই করল, তা ছিল বড়ই ভয়াবহ কথা।'

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۷﴾

আর তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে তাদের বিনিময় প্রদান করলাম। আর তাদের বহুসংখ্যক নাফরমান[১]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾

২৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তাহলে তিনি নিজ রহমত থেকে তোমাদেরকে দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তোমাদের দান করবেন এমন নূর, যা নিয়ে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[২]।

বৈরাগ্যের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

ইসলামী শরী'য়ত স্বাভাবিক ভারসাম্য লঙ্ঘনকারী এই বৈরাগ্যের অনুমতি দেয়নি। হাঁ, কোনো কোনো হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা এই উম্মতের বৈরাগ্য।' (কিতাবুল জিহাদ, ইবনুল মুবারক, হাদীস : ১৫-১৬; সুনানে সাঈদ বিন মানসূর, হাদীস : ২৩০৯)– কেননা মুজাহিদ নিজের সমস্ত আরাম-আয়েশ ও বন্ধুত্ব-সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর পথে বের হয়ে যায়।

বি. দ্র. 'বেদআত বলা হয় এমন কাজকে, যার মূল কুরআন ও সুন্নাত এবং 'খাইরুল কুরূন' (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ ও সাহাবা-তাবেয়ীন-তাবে তাবেয়ীনের যুগ) এর মধ্যে পাওয়া যায় না, অথচ তা দীন ও ছওয়াবের কাজ মনে করে করা হয়।

১. অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই নাফরমান। এ জন্যই ওরা সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে না, অথচ ওদের অন্তর জানে যে, তিনি শেষ নবী।

২. অর্থাৎ এই রাসূলের আনুগত্য কর। তাহলে এ নে'য়ামতগুলি পাবে– (১) পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, (২) প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে (৩) নূর (আলো) নিয়ে চলা-ফেরা করবে। অর্থাৎ ঈমান ও তাক্ওয়া দ্বারা তোমাদের গোটা অস্তিত্ব নূরানী হয়ে যাবে, আর আখেরাতে এই নূরই তোমাদের সামনে ও ডান দিকে চলবে।

বি. দ্র. আমার ধারণা, আয়াতের সম্বোধন সেই সব আহলে কিতাবের প্রতি, যারা হুযূরের প্রতি ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছিল। অতএব وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ এর অর্থ হবে– ঈমানের উপর অবিচল ও কায়েম থাকা। আর আহলে কিতাবের দ্বিগুণ ছওয়াব লাভের বিষয়ে সূরা কাসাস-এ (আয়াত : ৫৪) আলোচনা করা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

২৯. (এ এজন্য জানিয়ে দেওয়া হল), যাতে কিতাবীরা মনে না করে যে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কিছুই হাসিল করতে পারবে না☆। বস্তুত মর্যাদা☆☆ আল্লাহরই হাতে, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল[১]।

لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۟

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'যাতে কিতাবীরা জেনে নেয় যে, আল্লাহর অনুগ্রহের কিছুমাত্র তাদের ইখতিয়ারাধীন নয়'।

☆☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'অনুগ্রহ'

১. অর্থাৎ কিতাবধারীরা পূর্ববর্তী নবীদের হাল-অবস্থা শুনে অনুতাপ করে বলত, 'আফসোস, আমরা তাঁদের থেকে দূরে রয়ে গেলাম। এখন আমাদের জন্য সেই সব মর্তবা পাওয়া অসম্ভব, যা নবীদের সাহচর্যে হাসিল হয়।'

এমন লোকদের এখানে বলা হচ্ছে, এই রাসূলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। তাঁর সাহচর্যে থেকে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ কামালিয়াত ও মর্যাদা হাসিল করা সম্ভব। আর আল্লাহর দয়া বন্ধ হয়ে যায়নি।

অগ্রগন্য তাফসীর

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) আয়াতের এই তাফসীর করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সলফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে, এখানে لئلا يعلم এর অর্থ لكي يعلم –অর্থাৎ যাতে আহলে কিতাবের (যারা ঈমান আনেনি) তারা জেনে নেয় যে, আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ তাদের কব্জায় নয়। তা একমাত্র আল্লাহর হাতেই, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যেমন: আহলে কিতাবের মধ্যে যারা সর্বশেষ নবীর উপর ঈমান এনেছে, তাদের প্রতি তিনি এই অনুগ্রহ করেছেন যে, তারা দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে, অতীত গোনাহসমূহ তিনি মাফ করবেন ও তাদের নূর দান করবেন। কিন্তু যারা ঈমান আনেনি, তারা এসব নে'য়ামত থেকে মাহরূম (বঞ্চিত) থাকবে।

সূরা মুজাদালাহ

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৫৮ । ২২ আয়াত । ৩ রুকূ । মাদানী

آيَاتُهَا ٢٢، رُكُوعَاتُهَا ٣

পারা-২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

১. অবশ্যই আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করছিল এবং অভিযোগ করছিল আল্লাহর নিকট[১]। আর আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

১. **শানে নুযূল**

ইসলামের পূর্বে পুরুষ যদি নিজ স্ত্রীকে বলত, 'তুমি আমার মা', তবে আজীবনের জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যেত। তারপর তাদের পুনর্মিলনের কোন উপায় থাকত না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আউস ইবনে সামিত রা. তাঁর স্ত্রী খাওলা বিনতে ছালাবাকে (রা.) এই কথাই বলে বসলেন। স্ত্রী নবীজির খেদমতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা এখনো কোন বিশেষ হুকুম দেননি। আমার ধারণা, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা কী করে মিলিত হবে?'

এতে তিনি কেঁদে-কেটে বলতে শুরু করলেন– 'ঘর ধ্বংস হবে, বাচ্চারা পেরেশান হবে।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্বামী এই কথা দ্বারা তালাকের ইচ্ছা করেননি।' অতঃপর আল্লাহর নিকট কেঁদে-বিলাপ করে বললেন, 'আল্লাহ! আমি আমার একাকিত্ব ও বিপদের সময় তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি। এই বাচ্চাদের যদি আমার কাছে রাখি তবে ওরা না খেয়ে মরবে, তার নিকট রেখে দিলে অযত্নে নিঃশেষ হয়ে যাবে। 'আয় আল্লাহ! তুমি স্বীয় নবীর মুখে আমার সমস্যার সমাধান করে দাও।'

এতে এই আয়াতগুলি নাযিল হয় এবং 'জিহার' এর হুকুম অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে তবারী ২২/৪৪৬)

'জিহার' কী?

হানাফী মাযহাবে জিহার হল— নিজ স্ত্রীকে চিরকালীন হারাম নারী যেমন মা, বোন প্রভৃতির এমন অঙ্গের সাথে তুলনা করা, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার জন্য নিষেধ। যেমন বলল– اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ (তুমি আমার জন্য এমন, যেমন আমার মায়ের পিঠ।) জিহারের আহকামের বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

সর্বদ্রষ্টা[১]।

২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের মা বলে বসে, স্ত্রীরা তাদের মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। বস্তুত তারা একটি মন্দ ও মিথ্যা কথা বলে[২]। আর নিশ্চয় আল্লাহ অত্যধিক মার্জনাকারী, অতি ক্ষমাশীল[৩]।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۭ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔيْ وَلَدْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

৩. যারা নিজেদের স্ত্রীদের মা বলে বসে, তার পর আবার সেই কাজ করতে চায়, যা (মুলতবি করার জন্য) ওই কথা বলেছিল— (তাদের জন্য জরুরী) একটি দাস মুক্ত করা– একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে[৪]।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۭ

১. অর্থাৎ আল্লাহ তো সব কিছুই শোনেন, দেখেন। যে কথাবার্তা আপনার ও সেই নারীর মধ্যে হয়েছে, তা কেন শুনবেন না? নিশ্চয় তিনি সেই বিপদগ্রস্ত নারীর ফরিয়াদ শুনেছেন এবং সর্বদার জন্য এ ধরনের বিপদ থেকে মুক্তির পথ বলে দিয়েছেন, যা সামনে আসছে।

২. অর্থাৎ স্ত্রী তো তাকে জন্ম দেয়নি। সুতরাং সে কী করে তার প্রকৃত মা হতে পারে? এবং শুধু এতটুকু কথায় স্ত্রী সর্বদার জন্য প্রকৃত মায়ের ন্যায় হারাম হয়ে যাবে কেমন করে? হাঁ, মানুষ যখন নিজের নির্বুদ্ধিতাহেতু একটি মিথ্যা ও অসংগত কথা বলে বসে, তখন তার প্রতিকার এই যে, সে কাফফারা দেবে। কাফফারা আদায়ের পরই সে স্ত্রীর নিকট যাবে, তার আগে নয়। স্ত্রী তারই আছে। জিহারের কারণে তালাক হয়ে যায়নি।

৩. অর্থাৎ জাহেলিয়াতের যুগে যারা এহেন আচরণ করেছে, তা ক্ষমার্হ। এখন হেদায়াত এসে যাওয়ার পর এরূপ করো না। যদি ভুলে করেই বস, তবে তওবা করে আল্লাহর নিকট থেকে মাফ করিয়ে নাও। আর স্ত্রীর নিকট যাওয়ার পূর্বে কাফ্‌ফারা আদায় কর।

৪. অর্থাৎ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي বলেছিল সহবাস বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। এরপর সহবাস করতে চাইলে প্রথমে একটি গোলাম আযাদ করবে, তারপর একে অপরকে স্পর্শ করবে।

বি. দ্র. হানাফী মাযহাবে কাফ্‌ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস এবং সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজকাম সবই নিষিদ্ধ। কোনো কোনো হাদীছে আছে– أمره أن لا يقربها حتى يكفر (কাফ্‌ফারা আদায় না করে স্ত্রীর নিকট গমন করতে নিষেধ করেছেন।) [জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৯৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২০৬৫)

ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

এর দ্বারা তোমাদের সতর্ক করা হবে[১]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত[২]।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৪. এখন যদি কেউ (দাস) না পায় (অর্থাৎ তা মুক্ত করার সামর্থ্য না থাকে), তবে তাকে একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে হবে[৩]– একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যদি কেউ (এরও) সামর্থ্য না রাখে, তবে ষাট জন অভাবীকে খাওয়াতে হবে[৪]। এ নির্দেশ এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি (পাক্কা) ঈমানওয়ালা হয়ে যাও[৫]। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক আযাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

৫. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, অচিরেই ওদের অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছিল ওদের পূর্ববর্তীদের। আর আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত-সমূহ অবতীর্ণ করেছি। এবং কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর আযাব[৬]—

---

১. অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান দেওয়া হয়েছে তোমাদের সতর্কতা ও নসীহতের উদ্দেশ্যে, যাতে পুনরায় এরূপ ভুল না কর এবং অন্যরাও তা থেকে বিরত থাকে।

২. অর্থাৎ তিনি তোমাদের হাল-অবস্থা মোতাবেক আহকাম প্রেরণ করেন এবং তোমরা সেসবের উপর কতদূর আমল কর, তার খবর রাখেন।

৩. অর্থাৎ মাঝখানে বাদ দিতে পারবে না।

৪. দাস মুক্ত করার সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখবে। আর রোযা রাখতে অক্ষম হলে খানা খাওয়াবে। বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

৫. অর্থাৎ জাহেলী যুগের বিষয়াদি বর্জন করে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অনুসারে চল, যা কামেল মুমিনের চরিত্র।

৬. অর্থাৎ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা মুমিনদের কাজ নয়। রইল কাফেররা, যারা আল্লাহর সীমারেখার পরোয়া করে না এবং নিজেদের মন মতো সীমা নির্ধারণ করে (বিধান

৬. যেদিন আল্লাহ ওদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর ওদেরকে ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন[১]। আল্লাহ তা গণনা করে রেখেছেন, আর ওরা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সব বিষয়ের সাক্ষী[২]।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۟

[রুকূ - ২]

৭. তুমি কি ভেবে দেখনি যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহ জানেন? (কোথাও) তিনজনের এমন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি তাদের চতুর্থজন না হন এবং পাঁচজনেরও এমন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি তাদের ষষ্ঠজন না হন। এবং এর চেয়ে কম বা বেশি সংখ্যকেরও এমন পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি তাদের সাথে না থাকেন, তারা যেখানেই থাকুক[৩]।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَاۤ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا

বানায়)— ওদের কথা বাদ দিন। ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত রয়েছে। এমন লোকেরা পূর্বকালেও লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। আল্লাহর সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াতসমূহ শোনার পর তা অস্বীকার করতে থাকা এবং খোদায়ী বিধি-বিধানের সম্মান ও তাজীম না করা আসলে নিজেদেরকে অপমানকর আযাবে ফাঁসানো ছাড়া আর কিছু নয়।

১. অর্থাৎ যেসব কাজ করেছিল, তার ফলাফল সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। একটি আমলও অনুপস্থিত থাকবে না।

২. অর্থাৎ নিজেদের পুরো জীবনের কার্যকলাপের অনেক কিছু ওদের স্মরণ নেই অথবা সেগুলোর দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, কিন্তু আল্লাহর কাছে তা সব এক এক করে সংরক্ষিত রয়েছে। কিয়ামতের দিন পুরো আমলনামা খুলে সামনে রেখে দেওয়া হবে।

৩. অর্থাৎ শুধু কাফেরদের কার্যকলাপই নয়, আল্লাহর জ্ঞানে তো আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তু রয়েছে। কোন মজলিস, কোন কানাঘুষা এবং কোন গোপন থেকে গোপনতর পরামর্শ এমন হতে পারে না, যেখানে আল্লাহ তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের মাধ্যমে বর্তমান না থাকেন। কোথাও তিন ব্যক্তি গোপন পরামর্শ করলে তারা যেন না ভাবে যে, তাদের কথাবার্তা চতুর্থ কেউ শুনছে না। অনুরূপ, পাঁচ জনের কমিটি যেন না ভাবে যে, ষষ্ঠ শ্রোতা নেই। ভালভাবে বুঝে নাও যে, তিনজন বা পাঁচজন হোক অথবা এর চেয়ে কম-বেশী এবং যেখানেই থাকুক, যে কোন অবস্থায় থাকুক— আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক স্থানে নিজের সর্বব্যাপী জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আছেন, কোন সময়ই তাদের থেকে পৃথক নন।

ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

অতঃপর তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ ۙ

৮. আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদের (আপনার মজলিসে) কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারপরও ওরা তাই করে যা নিষেধ করা হয়েছে? ওরা তো গোনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাঘুষা করে[১]। আর ওরা যখন আপনার নিকটে আসে, আপনাকে এমন বাক্য দ্বারা সালাম করে, যার দ্বারা আল্লাহ আপনাকে

তিন ও পাঁচ সংখ্যা উল্লেখ করার তাৎপর্য

পরামর্শের মধ্যে যদি শুধু দুই ব্যক্তি থাকে, তবে মতভেদ হলে কোন এক মতকে প্রাধান্য দেওয়া কঠিন হয়। এ জন্যই সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পরামর্শে বেজোড় সংখ্যা রাখা হয়। আর একজনের পর প্রথম বেজোড় সংখ্যা তিনজনের; অতঃপর পাঁচ। সম্ভবত এ জন্য এই দুই সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরে وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ বলে ব্যাপকতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য হযরত উমর (রা) যে ছয় সদস্যবিশিষ্ট খেলাফত কমিটি গঠন করেছিলেন (অথচ 'ছয়' বেজোড় নয়), তার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সে সময় এ ছয়জনই খেলাফতের সর্বাপেক্ষা যোগ্য ও অধিকারী ছিলেন, যাঁদের মধ্য থেকে কাউকেই বাদ দেওয়া যেত না। আরো কথা এই যে, সেই ছয়জনের মধ্য থেকে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপার ছিল। সুতরাং যারই নাম আসত, তাকে বাদ দিয়ে রায় দেওয়ার জন্য পাঁচজনই থাকে। তবুও সতর্কতাহেতু হযরত উমর (রা) সমান সমান সংখ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে এক পক্ষকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর নাম বলে দিয়েছিলেন।

১. নবীজির মজলিসে বসে মুনাফেকরা কানাঘুষা করত, মজলিসে উপস্থিত মুসলমানদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাদের দোষ ধরত। একে অন্যের কানে এমনভাবে কথা বলত এবং চোখে ইশারা-ইঙ্গিত করত যে, খাঁটি মুসলমানদের মনে কষ্ট হত। আর নবীজির কথা শুনে বলত, 'এই কঠিন কাজ আমাদের দ্বারা কী করে হতে পারে?'

পূর্বে সূরা নিসার মধ্যে (আয়াত ১১৪) এ ধরনের কানাঘুষা নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু এই কষ্টদাতা, নির্লজ্জ লোকগুলো নিজেদের আচরণ ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়নি। এতে আলোচ্য আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

সালাম করেননি এবং ওরা মনে মনে বলে, 'আমরা যা বলছি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন?' দোযখই ওদের জন্য যথেষ্ট, যাতে ওরা দাখিল হবে। আর (তা) কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল[১]!

وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۝

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন পরস্পরে কানাঘুষা কর, তখন গোনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাঘুষা করো না, বরং সৎকর্ম ও পরহেযগারীর কথা বলাবলি করো[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا۟ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তো অন্য নবীদের সাথে আপনাকে এসব দো'য়া দিয়েছেন– سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি) এবং سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى (শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি) এবং মুমিনদের মুখে আপনাকে এই দো'য়া দিয়েছেন— السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته কিন্তু কতক ইহুদী যখন তাঁর নিকট আসত, তখন السلام عليكم এর স্থলে চাপা মুখে السام عليكم বলত, যার অর্থ 'তোমার মৃত্যু হোক।' অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে যে দো'য়া করেছিলেন, তার মোকাবেলায় ওরা এ বদদো'য়া করত। অতঃপর পরস্পর বলত, 'ইনি যদি সত্যই রাসূল হন, তবে এ কথায় আমাদের উপর তৎক্ষণাৎ আযাব আসে না কেন?' (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ৬৫৮৯; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৩৪৬)

এর উত্তরে বলা হয়েছে حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ অর্থাৎ তাড়াহুড়া করো না। এমন আযাব আসবে, যার পর অন্য আযাবের প্রয়োজন হবে না।

বি. দ্র. হাদীসে ইহুদীদের সম্বন্ধে এসেছে, ওরা السلام এর স্থলে السام বলত। সম্ভবত কতক মুনাফেকও এমন বলে থাকবে। কেননা, মুনাফেকরা সাধারণত ইহুদীই ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখন কোন ইহুদী এই শব্দ বলত, তখন তিনি উত্তরে শুধু وعليك বলতেন। একবার আয়েশা সিদ্দীকা (রা) السام عليك-এর উত্তরে ইহুদীকে عليك السام واللعنة বললে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উত্তম চরিত্র– মাধুর্য হেতু এ উত্তর পছন্দ করেননি। (সহহি বুখারী, হাদীস ৬৩৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৬৫)

২. অর্থাৎ খাঁটি মুসলমানদের উচিত মুনাফেকদের স্বভাব অবলম্বন করা থেকে আত্মরক্ষা করা। তাই মুমিনদের কানাঘুষা ও সলাপরামর্শ যেন জুলুম-নির্যাতন, বাড়াবাড়ি-সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহ-রাসূলের অবাধ্যতার জন্য না হয়; বরং তা হওয়া উচিত নেকী, তাকওয়া ও সংগত বিষয়াদির প্রচারের উদ্দেশ্যে। যেমন: সূরা নিসা-এর ১১৪ আয়াতে গত হয়েছে– لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ (মানুষের বহু পরামর্শে কোনই কল্যাণ নেই, তবে যে ব্যক্তি দান-খয়রাত বা সৎকাজ অথবা মানুষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করার নির্দেশ দেয় [তার কথা ভিন্ন])

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাঁর নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে[১]।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১০. এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; (তা এ জন্য করে) যাতে ঈমানদারদের দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু সে তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। আর ঈমানদারদের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত[২]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا

১১. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের বলা হয়, 'মজলিসে (অন্যদের) বসার জায়গা করে দাও[৩]'– তখন জায়গা করে দিয়ো, আল্লাহ তোমাদের প্রশস্ততা দান করবেন[৪]। আর যখন

---

১. অর্থাৎ সকলকে আল্লাহর সামনে সমবেত হয়ে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়েরও হিসাব দিতে হবে। তাঁর কাছে কারো প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কোনো কিছু গোপন নয়। সুতরাং তাঁকে ভয় করে নেকী ও পরহেজগারীর কথা বল।

২. অর্থাৎ মুনাফেকদের কানাকানি এ উদ্দেশ্যেই হয়, যেন মুসলিমগণ কিছুটা দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হয় এবং এ কথা ভেবে যেন বিচলিত হয়ে পড়ে যে, এই লোকগুলো না জানি আমাদের বিরুদ্ধে কী ষড়যন্ত্র করছে। বস্তুত এ কাজটা শয়তান ওদের দ্বারা করাচ্ছিল। কিন্তু মুসলমানদের মনে রাখা উচিত, শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। ওর কব্জায় কী আছে? লাভ-ক্ষতি তো সবই আল্লাহর হাতে। ওরা যতই পরামর্শ ও অভিসন্ধি করুক না কেন, তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের আল্লাহর উপর ভরসা রাখা উচিত।

বি. দ্র. মজলিসে এক ব্যক্তিকে রেখে দুজনের কানাকানি করাকে হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে তৃতীয় ব্যক্তি দুঃখিত হবে (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩০৩৭)। এই মাসলাটিও আলোচ্য আয়াতের অধীনে কোন এক পর্যায়ে দাখিল হতে পারে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মজলিসে দুই ব্যক্তি কানাকানি করলে তৃতীয়জন চিন্তায় পড়বে যে, আমার দ্বারা কী আচরণ হল যে, তারা চুপে চুপে বলছে?'

৩. অর্থাৎ এভাবে বস যে, জায়গা প্রশস্ত হয়ে যায় এবং অন্যদেরও বসার সুযোগ হয়।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সংকীর্ণতা দূর করে দেবেন এবং তাঁর রহমতের দ্বারসমূহ খুলে দেবেন।

فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝۱۱

বলা হয়, 'উঠে যাও', তখন উঠে যেয়ো[১]। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ উন্নীত করবেন[২]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত[৩]।

---

১. হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'এগুলি মজলিসের আদব। কেউ এসে জায়গা না পেলে সকলের উচিত একটু একটু সরে যাওয়া, যাতে স্থানের সংকুলান হয়ে যায়। অথবা নিজের স্থান থেকে উঠে দাঁড়াবে এবং অন্য স্থানে গিয়ে বসবে। আর যদি কর্তৃপক্ষ কাউকে একেবারে চলে যেতে বলে, তবে চলে যাবে। এতটুকু নড়াচড়া করায় অহংকার (বা কার্পণ্য) করা উচিত নয়। সদাচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হন।

বি.দ্র.

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকটবর্তী হতে চাইত, ফলে কখনো মজলিসে সংকীর্ণতা দেখা দিত। এমন কি, কোন কোন সময় বড় বড় সাহাবী হুযূরের সন্নিকটে স্থান পেতেন না। এ জন্য উক্ত বিধানগুলো দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রত্যেকে আপন মর্যাদানুপাতে ফায়দা হাসিল করার সুযোগ পায় এবং সুব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায়।

এখনো এ ধরনের ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে সভাপতির নির্দেশ মানা উচিত। ইসলাম বিশৃঙ্খলা ও দুর্ব্যবস্থাপনার শিক্ষা দেয় না; বরং অশেষ শৃঙ্খলা ও ভদ্রতা শেখায়। আর সাধারণ মজলিসের ব্যাপারে যখন এ হুকুম, তখন জেহাদের ময়দানে ও যুদ্ধের সারিতে তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

২. অর্থাৎ খাঁটি ঈমান ও সহীহ ইলম মানুষকে আদব ও সভ্যতা শিক্ষা দেয় এবং বিনয়ী বানায়। আলেম ও ঈমানদারগণ কামালাত ও মর্তবাসমূহে যত উন্নতি লাভ করেন, ততই তাঁরা বিনয়ী হন। এ জন্যই আল্লাহ তাদের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেন। হাদীছে আছে– مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ (যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয়, তাকে আল্লাহ উপরে তোলেন।) [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮; মুজামে আউসাত তবারানী, বর্ণনা ৪৮৯১– ولفظ مسلم : ماتواضع أحدٌ لله إلا رَفَعَهُ اللهُ)

অপরদিকে অহংকারী, বদ-দীন বা জাহেল-অভদ্র মানুষ কোন কিছুই সহজভাবে নিতে পারে না। তারা এতটুকু ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দেয় যে, আমাকে কেন এখান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসাল! কিংবা মজলিস থেকে উঠে যেতে কেন বলল? আফসোস, আজ বহু বুযুর্গ, আলেম নামধারী ব্যক্তিরাও এরূপ কাল্পনিক মর্যাদার নামে অশেষ ঝগড়া-ফাসাদ শুরু করে দেন– إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

৩. অর্থাৎ প্রত্যেককে তিনি তার কাজ ও যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দান করেন। আর কারা সত্যিই ঈমানদার ও ইলমওয়ালা— তা তিনিই জানেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সঙ্গে চুপিসারে কথা বলতে চাও, তখন চুপিসারে কথা বলার পূর্বে কিছু সদকা দিবে। এটি তোমাদের পক্ষে উত্তম ও খুবই পবিত্র পন্থা। আর যদি (সদকা করার কিছু) না পাও, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[১]।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩. তোমরা কি এতে ভয় পেয়ে গেলে যে, চুপিসারে কথা বলার পূর্বে দান-খয়রাত করতে হবে? তো, যখন তোমরা (তা) করলে না এবং আল্লাহও তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন, অতএব এখন নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চল। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত[২]।

---

১. মুনাফেকরা নবীজির কানেকানে বেহুদা কথাবার্তা বলত, যাতে মানুষের মধ্যে নিজেদের বড়ত্ব প্রকাশ করতে পারে। আর মুসলমানদেরও কেউ কেউ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা তাঁর কানে কানে বলতে গিয়ে এত সময় নিত যে, অন্যরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেত না। অথবা কোন সময় তাঁর নির্জনতা কাম্য হত, কিন্তু এতেও তা বাধার কারণ হত। কিন্তু তিনি স্বভাবসুলভ ভদ্রতার কারণে কাউকে মানা করতেন না।

তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, কোন সচ্ছল ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে, সে এর আগে কিছু দান-খয়রাত করে আসবে। এতে কয়েকটি ফায়দা ছিল— গরীবদের সাহায্য, দানকারীদের নফসের সংশোধন, মুখলেস ও মুনাফেকের মাঝে পার্থক্যকরণ, একান্তে কথা বলতে আগ্রহীর সংখ্যা কমে যাওয়া প্রভৃতি। তবে যার নিকট দান করার কিছু না হত, তার জন্য এ শর্ত মাফ ছিল।

যখন এ হুকুম নাযিল হল, মুনাফেকরা কৃপণতার কারণে উক্ত কাজ ত্যাগ করল। আর মুসলমানরাও বুঝল, একান্তে বেশি কথা বলা আল্লাহর নিকট পছন্দ নয়, সে জন্যই এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

অবশেষে পরবর্তী আয়াত দ্বারা এ হুকুম মুলতবী করা হয়।

২. অর্থাৎ সদকা করার হুকুম দ্বারা যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হাসিল হয়ে গেছে। অতএব উক্ত সাময়িক নির্দেশ উঠিয়ে নেওয়া হল। তবে যেসব হুকুম কখনো মুলতবী হওয়ার নয়, সেগুলি পালনে নিবেদিত প্রাণে সচেষ্ট থাকবে। যেমন: নামায, যাকাত ইত্যাদি। এতেই নফসের যথেষ্ট সংশোধন হয়ে যাবে।

[রুকূ - ৩]

১৪. আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করেছে, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত[১]? ওরা তোমাদেরও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সেই সম্প্রদায়েরও অন্তর্ভুক্ত নয়[২]। আর ওরা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে কসম খায়[৩]।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

১৫. আল্লাহ ওদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন[৪]। ওরা যা করে, নিশ্চয় তা অতি মন্দ[৫]।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১৬. ওরা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। আর এভাবে ওরা (মানুষকে) আল্লাহর পথে বাধা দেয়। অতএব ওদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

১৭. ওদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

বি. দ্র. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا আয়াতাংশ থেকে বোঝা যায় যে, উক্ত হুকুমের উপর ব্যাপকভাবে আমল করার অবকাশ হয়নি। কোন কোন হাদীছে আছে, হযরত আলী (রা) বলেন, উম্মতের মধ্যে শুধু আমি এ হুকুমের উপর আমল করেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ৩২৭৮৮)

১. এরা হচ্ছে মুনাফেক, আর قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ বলতে ইহুদীরা উদ্দেশ্য।

২. অর্থাৎ মুনাফেকরা তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, ওরা অন্তরে কাফের। আর পূর্ণরূপে ওদেরও (অর্থাৎ ইহুদীদেরও) অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, বাহ্যত মুখে নিজেদের মুসলমান বলত। সুতরাং ওরা এদিকেও নয়, সেদিকেও নয়।

৩. অর্থাৎ ওরা মিথ্যা বিষয়ের উপর শপথ জেনে-শুনেই করে, অজ্ঞতা ও গাফলতের কারণে নয়। মুসলমানদের নিকট ওরা কসম করে বলে, আমরা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তোমাদের মত খাঁটি ঈমানদার। অথচ ঈমানের সাথে ওদের দূরতম সম্পর্কও নেই।

৪. এ কথাটিই অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (নিশ্চয় মুনাফেকরা দোযখের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। -সূরা নিসা, আয়াত ১৪৫)

৫. অর্থাৎ এখন ওদের নজরে পড়ছে না এবং ওরা অনুধাবন করছে না, কিন্তু মুনাফেকী কাজকর্ম করে আসলে ওরা নিজেদের জন্য অতি মন্দ বীজ বপন করছে।

مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾

মোকাবেলায় ওদের কোন উপকারে আসবে না। ওরা জাহান্নামী। ওরা তাতেই চিরকাল পড়ে থাকবে[১]।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. (শাস্তি সেদিন হবে), যেদিন আল্লাহ ওদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। আর তখন ওরা তাঁর সামনে কসম খাবে যেমন তোমাদের সামনে কসম খায়। এবং ওরা মনে করবে, (মুক্তির) একটা উপায় পেয়ে গেছে[২]। শুনে রাখ! ওরাই প্রকৃত মিথ্যাবাদী[৩]।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. শয়তান ওদের বশীভূত করে ফেলেছে এবং ওদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে[৪]। ওরা শয়তানের দল। শুনে রাখ! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত[৫]।

---

১. অর্থাৎ মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে ওরা মুসলমানদের হাত থেকে নিজেদের জান-মাল রক্ষা করে এবং নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে বন্ধুত্বের বেশে অন্যদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আসতে বাধা দেয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ লোকগুলো এভাবে কোনই মর্যাদা পেতে পারে না; বরং এরা কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাবে ধৃত হবে। আর যখন শাস্তির সময় আসবে, তখন আল্লাহর হাত থেকে কেউ এদের বাঁচাতে পারবে না। ধন-সম্পদও কোন কাজে আসবে না, সন্তানসন্ততিও না। অথচ এসবের হেফাজতের জন্যই আজ মিথ্যা কসম খেয়ে বেড়াচ্ছে।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে ওরা যে অভ্যাসে লিপ্ত, তা আখেরাতেও দূর হবে না। যেভাবে তোমাদের সামনে মিথ্যা বলে বেঁচে যায় এবং মনে করে যে, আমরা বড়ই সতর্ক এবং বড় কৌশলী চাল চালছি, তেমনি আল্লাহর সামনেও মিথ্যা শপথ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে (এবং বলবে), 'পরওয়ারদেগার! আমরা তো এমন ছিলাম না, তেমন ছিলাম।' সম্ভবত সেখানেও মনে করবে যে, এতটুকু বলে দিলেই রেহাই পাওয়া যাবে।

৩. নিশ্চয় প্রকৃত ও বড় মিথ্যাবাদী তারাই, যারা আল্লাহর সামনেও মিথ্যা বলতে লজ্জিত হয় না।

৪. শয়তান যাকে পুরাপুরি বাগে পেয়ে বসে, তার মন-মস্তিষ্ক এভাবেই বিকৃত হয়ে যায়। খোদা বলেও যে কোন সত্তা আছেন, তাও ওর মনে থাকে না। আচ্ছা, ও আল্লাহর আজমত, মর্যাদা ও মর্তবা কী বুঝবে? ওর মধ্যে এর যোগ্যতা কই? সম্ভবত হাশরের ময়দানেও ওকে মিথ্যা বলার ক্ষমতা এজন্য দেওয়া হবে, যাতে ওর নির্লজ্জতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় যে, এই বিকৃত লোকটার এতটুকু বুঝও নেই যে, আল্লাহর সামনে মিথ্যা চলতে পারে না।

৫. অর্থাৎ শয়তানের দলের পরিণাম নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ। না দুনিয়াতে ওদের অভিসন্ধি-অভিপ্রায় শেষ সফলতার মুখ দেখতে পারে, না আখেরাতে কঠিন শাস্তি থেকে ওদের মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে।

২০. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, ওরা সবচেয়ে লাঞ্ছিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝

২১. আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, 'আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।' নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী[১]।

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

২২. আপনি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে এমন পাবেন না যে, তারা ওই সব লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, হোক না ওরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। এমন লোকদেরই অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন[২] এবং নিজের রূহ (তথা অদৃশ্য ফয়েয) দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন[৩]। তিনি তাদের এমন উদ্যানরাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচারীরা, যারা সত্য ও সততার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও চরম লাঞ্ছিত। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, পরিশেষে সত্যই বিজয়ী হবে এবং তাঁর পয়গম্বরগণই প্রাধান্য ও বিজয়-মাল্যে ভূষিত হবেন।

এর ব্যাখ্যা পূর্বে কয়েক স্থানে গত হয়েছে।

২. অর্থাৎ তিনি তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং পাথরে খোদাই করা লেখার ন্যায় স্থায়ী করে দিয়েছেন।

৩. অর্থাৎ তিনি তাদের গায়বী নূর দান করেছেন, যার ফলে তাদের অন্তর এক বিশেষ ধরনের আত্মিক জীবন লাভ করে।

অথবা بروح منه - এর অর্থ এই যে, তিনি রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٢٢﴾

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট[১]। তারাই আল্লাহর দল। শুনে রাখ! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে[২]।

---

১. অর্থাৎ তারা আল্লাহর খাতিরে সকল (কাফেরদের) প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট, তার আর কী চাই?

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচারীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে না, হোক ওরা তাদের পিতা বা পুত্র, তারাই সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্যই এই মর্যাদা।'

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের শান এ-ই ছিল যে, আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপারে তাঁরা কোনো বস্তুর বা কোনো ব্যক্তির পরোয়া করতেন না। এ কারণেই আবু উবায়দা (রা) নিজের পিতাকে হত্যা করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) নিজ পুত্র আবদুর রহমান (যিনি তখনো অমুসলমান)-এর মোকাবেলায় বের হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। মুসআব ইবনে উমায়র (রা) আপন ভাই উবায়দ ইবনে উমায়রকে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) স্বীয় মামা আস ইবনে হিশামকে এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রা), হামযা (রা), উবায়দা ইবনে হারেছ— নিজ নিজ আত্মীয় উতবা, শাইবা ও ওলীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। আর মুনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন, আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি হুকুম দেন তবে আমার পিতার মাথা কেটে আপনার খেদমতে পেশ করি।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন।

فرضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه ورزقنا الله حبهم واتباعهم وأماتنا عليه. آمين.

تمت سورة المجادلة فلله الحمد والمنة .

সূরা হাশ্‌র

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৫৯ । ২৪ আয়াত । ৩ রুকূ । মাদানী

آيَاتُهَا ٢٤ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[১]।

هُوَ الَّذِىْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি কিতাবীদের মধ্যকার কাফেরদের স্বীয় বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন[২] প্রথম (সৈন্য)

---

১. সামনে আল্লাহ তাআলার এই মহাপরাক্রম ও প্রজ্ঞারই নিদর্শনাদি থেকে একটি ঘটনা বিবৃত হচ্ছে।

২. **সংশ্লিষ্ট ঘটনা :** মদীনার পূর্বদিকে কয়েক মাইল দূরে 'বনী নযীর' নামে এক ইহুদী সম্প্রদায় বাস করত। এরা ধন-সম্পদ ও জনবলে অত্যন্ত বলীয়ান ছিল। নিজেদের মজবুত দুর্গসমূহের কারণে ওদের গৌরব ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন শুরুতে ওরা তাঁর সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করল যে, 'আমরা আপনার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না।'

কিন্তু সন্ধি সত্ত্বেও ওরা মক্কার কাফেরদের সাথে যোগাযোগ আরম্ভ করে। এমনকি, ওদের এক বড় সরদার কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন আরোহীসহ মক্কায় গিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের সামনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরায়শদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অবশেষে কয়েক দিন পর আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমে মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা) উক্ত বিশ্বাসঘাতককে খতম করে দেন। এর পরও বনী নযীরের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের ধারা অব্যাহত থাকে। একবার ওরা প্রতারণাপূর্বক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকজন সঙ্গীসহ ডেকে নিয়ে অতর্কিতে হত্যা করতে চেয়েছিল। একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বসা ছিলেন, উপর থেকে গম পেষার ভারি চাক্কির পাট ফেলে দেয়। গায়ে পড়লে মানুষের বাঁচার কথা নয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার রহমতে নবীজি রক্ষা পান।

অবশেষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের সাথে লড়াইয়ের এরাদায় মুসলমানদের সমবেত করলেন। অতঃপর যখন মুসলিমগণ অত্যন্ত দ্রুততা ও ক্ষীপ্রতার সাথে ওদের ঘরবাড়ি ও দুর্গগুলো অবরোধ করে ফেললেন, তখন ওরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। ফলে সাধারণ যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। ওরা ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধির আবেদন করল।

مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ

সমাবেশেই[১]। তোমরা কল্পনাও করতে না যে, ওরা বের হবে। আর ওরা ধারণা করত, ওদের দুর্গসমূহ আল্লাহর হাত থেকে ওদের রক্ষা করবে। কিন্তু ওদের উপর আল্লাহ (-র শাস্তি) এমন দিক থেকে এল, যা ওরা ধারণাও করেনি। এবং তিনি ওদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন[২]—(ফলে) ওরা নিজেদের বাড়ীঘর

পরিশেষে সাব্যস্ত হয় যে, ওরা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে ও জানের নিরাপত্তা পাবে এবং মাল-সামান যা বহন করে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাবে। অবশিষ্ট ঘরবাড়ি, জমাজমি, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি মুসলমানদের কব্জায় এল।

আল্লাহ তাআলা গনীমতের মালের ন্যায় উক্ত সম্পদ বণ্টন করাননি, বরং তা একমাত্র নবীজির এখতিয়ারে রাখলেন। তিনি অধিকাংশ সম্পত্তি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এতে আনসারদের উপর থেকে মুহাজিরদের ব্যয়ভার হালকা হল। ফলে মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণীর ফায়দা হয়। তদ্রূপ, নবীজি নিজ পরিবার-পরিজন ও মেহমানদের বার্ষিক খরচও এ থেকেই নিতেন, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন।

এই সূরার মধ্যে এ কাহিনীই আলোচিত হয়েছে।

১. অর্থাৎ একটি অভিযানেই ওরা ঘাবড়ে গেছে এবং প্রথম আক্রমণেই ঘরবাড়ি ও দুর্গসমূহ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে, কোনই দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি।

বি. দ্র. أَوَّلِ الحشر— কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উক্ত সম্প্রদায়ের জন্য এভাবে নির্বাসিত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম ছিল। ইতিপূর্বে ওরা কখনো এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়নি। অথবা أَوَّلِ الحشر-এ এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই ইহুদীদের ক্ষেত্রে প্রথম হাশর (বা সমাবেশ) হল মদীনা ত্যাগ করে খায়বার প্রভৃতি স্থানে চলে যাওয়া। আর সম্ভবত দ্বিতীয় হাশর হবে, যা হযরত উমর (রা)- এর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ অন্য ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে এরাও খায়বার থেকে শামদেশের দিকে বহিষ্কৃত হয়। সর্বশেষ হাশর অর্থাৎ কিয়ামতের সমাবেশও শামে অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য শামকে أرض المحشر-ও বলা হয়।

২. অর্থাৎ ওদের সাজ-সরঞ্জাম, মজবুত কিল্লা ও সামরিক কলাকৌশল দেখে তোমাদেরও ধারণা ছিল না যে, এত তাড়াতাড়ি ও এত সহজে ওরা অস্ত্র রেখে দেবে। এবং ওদেরও ধারণা ছিল না যে, এমন মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র মানুষেরা এমনভাবে ওদের সর্বনাশ করে ফেলবে। ওরা এ স্বপ্নে বিভোর ছিল যে, মুসলিমগণ (যাদের মাথার উপর আল্লাহর হাত রয়েছে) আমাদের কিল্লা পর্যন্ত পৌঁছার সাহসই করবে না। ফলে ওরা আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে।

بِاَيۡدِيۡهِمۡ وَاَيۡدِى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ فَاعۡتَبِرُوۡا يٰۤاُولِى الۡاَبۡصَارِ۝

ধ্বংস করতে লাগল নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতেও[১]। অতএব শিক্ষা গ্রহণ কর হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ![২]

وَلَوۡ لَاۤ اَنۡ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمُ الۡجَلَاۤءَ لَعَذَّبَهُمۡ فِى الدُّنۡيَا ؕ وَلَهُمۡ فِى الۡاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۝

৩. আল্লাহ যদি ওদের ব্যাপারে নির্বাসিত হওয়ার কথা না লিখে দিতেন, তবে অবশ্যই তিনি দুনিয়ায় ওদের (অন্য) শাস্তি দিতেন। আর ওদের জন্য আখেরাতে রয়েছে আগুনের আযাব[৩]।

কিন্তু ওরা দেখে নিয়েছে, কোন শক্তি আল্লাহর হুকুম রোধ করতে পারেনি। ওদের উপর আল্লাহর আযাব ঐ দিক থেকে পৌঁছেছে, যেদিক থেকে পৌঁছার কল্পনাও ওরা করেনি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ওদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন এবং নিরস্ত্র মুসলমানদের ত্রাস ঢুকিয়ে দিলেন। একে তো নিজেদের সরদার কা'ব ইবনে আশরাফের আকস্মিক হত্যার কারণে পূর্ব থেকেই ভীত-সন্ত্রস্ত হচ্ছিল। এখন মুসলমানদের অতর্কিত আক্রমণে ওরা দিশাহারা হয়ে গেল।

১. অর্থাৎ সম্পদের লোভ ও (মুসলমানদের প্রতি) প্রচণ্ড ক্রোধের কারণে ঘরবাড়ির দরজা-জানালা ও তক্তা ইত্যাদি খুলে ফেলতে লাগল, যাতে যেসব আসবাব-পত্র নিয়ে যাওয়া যায় তার কিছুই থেকে না যায় এবং মুসলমানদের হস্তগত না হয়। এ কাজে মুসলিমগণও ওদের সাথে শরীক হয়। একদিকে ওরা নিজেরা ভেঙ্গে ফেলছিল, অন্যদিকে মুসলিমগণ। আসলে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, মুসলমানদের হাতে ওদের এই যে ধ্বংস সাধিত হল, তা ওদেরই দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতার ফল ছিল।

২. অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য এ ঘটনায় শিক্ষার বহু বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন– কুফর, জুলুম, দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম কেমন হয়। আর এও প্রমাণ করে দিলেন যে, শুধু বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভরসায় আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ ওদের কিসমতে নির্বাসিত হওয়ার শাস্তিই লিখেছিলেন। যদি তা না হত, তবে অন্য কোন শাস্তি দুনিয়ায় দেওয়া হত। যেমন: বনু কুরাইজার মত ওদের হত্যা করা হত। মোটকথা, কোন অবস্থাতেই কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই পেত না। এ আল্লাহ তাআলার হেকমত যে, হত্যার স্থলে শুধু নির্বাসিত হওয়ার শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু এই যে শাস্তি লাঘব করা, এটা শুধু দুনিয়াতে। আখেরাতের চিরকালীন কঠোর শাস্তি এই কাফেরদের থেকে কোনক্রমেই অপসারিত হওয়ার নয়।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যখন উক্ত ইহুদী সম্প্রদায় শামদেশ থেকে পালিয়ে মদীনায় এসেছিল, তখন ওদের মুরব্বীরা বলেছিল, 'একদিন তোমাদের এখান থেকেও নির্বাসিত হয়ে ফের শামে যেতে হবে।' সে মত নববী যুগে বহিষ্কৃত হয়ে (কতক

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৪. তার কারণ এই যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর কেউ যদি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে আল্লাহর শাস্তি তো অত্যন্ত কঠোর[১]।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৫. তোমরা যেসব খেজুর গাছ কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলোকে আপন কাণ্ডের উপর খাড়া রেখে দিয়েছ, সব আল্লাহরই হুকুমে (করেছ)[২]; (যাতে তিনি মুমিনদের ইজ্জত দান করেন) এবং যাতে অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন[৩]।

শামে চলে যায় এবং কতক) খায়বারে থেকে যায়। অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর শাসনামলে খায়বার থেকেও বহিষ্কৃত হয়ে শামে ফিরে যায়।

১. অর্থাৎ এমন বিরুদ্ধাচারীদের এরূপ কঠোর শাস্তিই দেওয়া হয়।

২. যখন বনী নযীরের লোকেরা কিল্লার ভিতরে আশ্রয় নিল, তখন হুযূর সা ওদের গাছপালা কাটার এবং বাগ-বাগিচা বিনাশ করার হুকুম দিলেন, যাতে এগুলোর মায়ায় ওরা বাইরে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয় আর প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় বৃক্ষের বাধাও না থাকে। সে মত কিছু বৃক্ষ কাটা হল। আর কিছু রেখে দেওয়া হল, যাতে বিজয়ের পর মুসলমানদের কাজে আসে। তখন কাফেররা দোষারোপ করে বলল, তারা নিজেরা তো ফাসাদ করতে মানা করে, অথচ গাছপালা কর্তন করা ও পোড়ানো কি ফাসাদ নয়? এর জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হল। (তাফসীরে তবারী, ২২/৫১০)

অর্থ এই যে, এ সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হয়েছে। আল্লাহর হুকুম পালন করাকে ফাসাদ বলতে পার না। কারণ, তাঁর প্রতিটি হুকুম গভীর হেকমত ও কল্যাণপূর্ণ হয়ে থাকে। যেমন এ হুকুমের কতক হেকমত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ যাতে তিনি মুসলমানদের ইজ্জত দান করেন এবং কাফেরদের লাঞ্ছিত করেন। যেমন, কিছু গাছ যে অক্ষত রাখা হয়েছিল, এতে ছিল মুসলমানদের উপকারিতা এবং কাফেরদের আক্রোশের উপকরণ। কেননা, ওরা এ কথা ভেবে জ্বলবে যে, মুসলমানরা এগুলো ভোগ করবে ও এ থেকে উপকৃত হবে। তদ্রূপ কতক গাছ যে কাটা হয়েছিল, তাতেও মুসলমানদের আরেক উপকারিতা ও কাফেরদের ক্ষোভ-ক্রোধের উপাদান ছিল। কারণ, এ দ্বারা মুসলমানদের পরাক্রম ও শক্তি প্রকাশ পেল এবং কাফেররা দেখল যে, মুসলিমগণ আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে কীভাবে হস্তক্ষেপ করছে। অতএব উভয় কাজ জায়েয ও হেকমতপূর্ণ।

৬. আল্লাহ ওদের থেকে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে দিলেন, তার উপর তোমরা ঘোড়াও হাঁকাওনি, উটও না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা প্রবল করে দেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিমান[১]।	وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১. হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'গনীমত' ও (فيء) 'ফাই' এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যুদ্ধের মাধ্যমে যে সম্পদ হস্তগত হয় তা 'গনীমত', আর যুদ্ধ ছাড়া যা হাতে আসে তা 'ফাই'। গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর নিয়ায (যার বিশদ আলোচনা ১০ পারার শুরুতে [আনফাল : ৪১] গত হয়েছে।) বাকি চার অংশ যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর 'ফাই' এর সবই মুসলমানদের (সর্বজনীন কল্যানকর কাজকামের) জন্য বাইতুল মালে জমা থাকবে এবং জরুরী কাজে খরচ হবে।'

فيء– এর বিধান

যদি সামান্য যুদ্ধের পর কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধির দিকে এগিয়ে আসে এবং মুসলিমগণ তা গ্রহণ করে নেয়, তবে এ ক্ষেত্রে যে ধন-সম্পদ সন্ধির ফলে হাসিল হবে, তাও 'ফাই' এর অন্তর্ভুক্ত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সময়ে 'ফাই' এর সম্পদ একমাত্র নবীজীর ইখতিয়ার ও ক্ষমতাধীন থাকত। এখন হতে পারে, এ ছিল মালিকানাস্বরূপ ইখতিয়ার, যা তাঁরই জন্য বিশেষিত ছিল, যেমনঃ আলোচ্য আয়াতে على رسوله শব্দাবলি থেকে প্রকাশ পায়। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, তা ছিল শুধু শাসকস্বরূপ ইখতিয়ার (অর্থাৎ তিনি তার মালিক ছিলেন না, তবে শাসক হিসেবে তা তাঁর ক্ষমতাধীন ছিল)। যা হোক, আল্লাহ তাআলা এ ধন-সম্পদ সম্পর্কে সামনের আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তা– ওয়াজিবরূপে বা মুস্তাহাবরূপে–অমুক অমুক ক্ষেত্রে ব্যয় করা হোক।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ফাই এর সম্পদ ইমাম (বা রাষ্ট্রপ্রধান)-এর ইখতিয়ার ও তত্ত্বাবধানে থাকবে। কিন্তু এই ইখতিয়ার মালিকস্বরূপ নয়, শুধু শাসকস্বরূপ। তিনি এ সম্পদ নিজের নিরপেক্ষ বিবেচনা ও পরামর্শক্রমে মুসলমানদের জরুরী ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করবেন।

গনীমতের বিধান

গনীমতের সম্পদের বিধান 'ফাই' থেকে ভিন্ন। তার পঞ্চমাংশ আলাদা করার পর অবশিষ্ট সবই যোদ্ধাদের হক (বা প্রাপ্য)। যেমন: আল্লাহ তাআলার এ বাণী দ্বারা বোঝা যায়– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ الخ; তবে যোদ্ধারা নিজেদের খুশীতে নিজেদের অধিকার ছেড়ে দিলে ভিন্ন কথা। অবশ্য শায়খ আবু বকর রাযী হানাফী (র) 'আহকামুল কুরআন'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, গনীমতের এই বিধান অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর স্থাবর সম্পত্তির

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ

৭. আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে দিলেন, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের[১] এবং আত্মীয়স্বজন[২], এতীম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য— যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তন না করে[৩]। রাসূল তোমাদের যা দেন

ব্যাপারে ইমাম (বা রাষ্ট্র প্রধান)-এর ইখতিয়ার আছে— তিনি কল্যাণকর মনে করলে সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন, আর তা কল্যাণকর মনে না করলে সর্বসাধারণের কল্যাণকর কাজের জন্য রেখে দেবেন। যেমন: হযরত উমর (রা) ইরাকের কিছু ভূমির ক্ষেত্রে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর পরামর্শ অনুযায়ী এ রকমই করেছিলেন।

এ কর্মপদ্ধতি অনুসারে শায়খ আবু বকর রাযী (র) এর মত হল— وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ الخ অস্থাবর ধন-সম্পদ ও সূরা হাশরের আয়াতগুলি স্থাবর সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এর ব্যাখ্যা হচ্ছে– সূরা হাশরের ৬নং আয়াত وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ -এ 'ফাই' এর বিধান এবং ৭নং আয়াত مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى— এ গনীমতের বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর আভিধানিকভাবে 'গনীমত'-কে 'ফাই' শব্দে ব্যক্ত করা যায়। والله تعالى أعلم بالصواب

১. পূর্বের আয়াতে শুধু বনী নযীরের ধন-সম্পদের উল্লেখ ছিল। বর্তমান আয়াতে 'ফাই' এর ধন-সম্পদ সম্পর্কে সাধারণ নীতি বর্ণিত হচ্ছে। অর্থাৎ 'ফাই' এর সম্পদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কব্জায় এবং রাসূলের পর ইমামের (বা শাসকের) কব্জায় থাকবে। কারণ, খরচের দায়িত্ব তাঁরই। আর (فلله)-আল্লাহর উল্লেখ এখানে বরকতের জন্য করা হয়েছে। নতুবা তিনি তো সব কিছুরই মালিক। এমনও হতে পারে, কাবা শরীফের খরচ ও আল্লাহর ঘর মসজিদসমূহের খরচ এর অন্তর্ভুক্ত।

২. অর্থাৎ নবীজির আত্মীয়-স্বজনের জন্য। তাই তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন যুগে এ সম্পদ থেকে তাঁদেরও দান করতেন। আর তাঁদের জন্য গরীব হওয়ার শর্ত নেই। তাঁর আপন চাচা হযরত আব্বাস (রা) কে ধনী হওয়া সত্ত্বেও অংশ দিয়েছেন।

হানাফী বিশেষজ্ঞগণ বলেন, শাসকের উচিৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে অপর অভাবীদের উপর অগ্রাধিকার দান করা।

৩. এসব খাত এ জন্য বর্ণনা করা হল, যাতে সর্বদা এতীম, অভাবী, নিঃস্ব ও মুসলমান সর্বসাধারণের খবরাখবর নেওয়া হতে থাকে এবং যাতে সাধারণ দীনি প্রয়োজনাদি পূরণ হতে থাকে। ধন-সম্পদ যেন শুধু ধনী লোকদের বিনিময়-বস্তু হয়ে তাদের হাতে সীমিত না হয়ে যায় যে, শুধু বড় লোকেরা ধনের স্বাদ ভোগ করবে এবং গরীবেরা ক্ষুধায় মরবে।

وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তা গ্রহণ কর এবং তোমাদের যা নিষেধ করেন তা বর্জন কর[১]। আর আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা[২]।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

৮. (সম্পদ) অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্যও, যারা নিজেদের বাড়ীঘর ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে; তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তাঁরাই প্রকৃত সত্যবাদী[৩]।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ

৯. এবং তাদের জন্যও, যারা মুহাজিরদের পূর্বে এই নিবাসে ও ঈমানে অবস্থান গ্রহণ করেছে[৪]; আর তারা তাকে ভালবাসে যে হিজরত করে তাদের নিকট এসেছে[৫] এবং নিজেদের অন্তরে সেই জিনিসের জন্য সংকীর্ণতা অনুভব করে না, যা মুহাজিরদের দেওয়া হয় এবং স্বয়ং

---

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ইত্যাদি আল্লাহর হুকুমে পয়গম্বর যেভাবে বন্টন করেন, তা তোমরা খুশী মনে ও আগ্রহসহ গ্রহণ কর। যা প্রদান করা হয়, গ্রহণ কর এবং যা নিতে মানা করা হয়, তা থেকে বিরত থাক। আর এমনিভাবে তাঁর সমস্ত বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ মেনে চল।

২. অর্থাৎ রাসূলের নাফরমানী আল্লাহরই নাফরমানী। আর আল্লাহকে এজন্য ভয় করে চল, যাতে রাসূলের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ তাআলা কোনো কঠোর শাস্তি আরোপ না করে দেন।

৩. অর্থাৎ এমনিতে তো উল্লিখিত সম্পদ মুসলমান সর্বসাধারণের প্রয়োজনাদি ও কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হয়। কিন্তু তাতে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার রয়েছে সেই সকল আত্মোৎসর্গকারী সাচ্চা মুসলমানের, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং রাসূলের মহব্বত ও আনুগত্যে নিজেদের বাড়ীঘর ও ধন-দৌলত সব কিছু ছেড়ে একেবারে শূন্য হাতে দেশ থেকে বের হয়ে এসেছেন, যাতে আল্লাহ ও রাসূলের কাজে স্বাধীনভাবে সাহায্য করতে পারেন।

৪. الدار – এই নিবাস দ্বারা উদ্দেশ্য মদীনা শরীফ এবং এই লোকগণ হচ্ছেন মদীনার আনসার, যাঁরা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাসকারী ছিলেন এবং ঈমান ও মারেফতের রাস্তায় অত্যন্ত মজবুতীর সঙ্গে কায়েম হয়ে গিয়েছিলেন।

৫. অর্থাৎ তাঁরা মহব্বতের সাথে মুহাজিরদের খেদমত করেন। এমনকি, নিজেদের ধন-সম্পদ ইত্যাদিতে তাদেরকে সমান অংশীদার বানাতে প্রস্তুত রয়েছেন।

بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

নিজেদের উপর (মুহাজিরদের) অগ্রাধিকার দেয় যদিও তাদের অভাব থাকে[১]। আর যাদের নিজ নফসের লোভ থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম[২]।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

১০. এবং তাদের জন্যও, যারা তাদের পরে এসেছে[৩]। তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের সেই ভাইদেরও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমানে দাখিল হয়েছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি অতি দয়ার্দ্র, পরম মেহেরবান[৪]।'

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুহাজিরদের যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, অথবা 'ফাই' এর সম্পদ ইত্যাদি থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু দান করেন, সেসব দেখে আনসারগণ সংকীর্ণমনা হন না এবং হিংসাও করেন না; বরং তাঁরা খুশী হন এবং প্রত্যেক ভাল কিছুতে তাঁদেরকে নিজেদের উপর অগ্রগণ্য রাখেন। নিজেরা ক্ষুধা ও কষ্ট স্বীকার করেও মুহাজিরদের উপকার করতে একটুও দ্বিধা করেন না।

নিজেদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া— এমন বে-নজীর উদাহরণ আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন্ জাতি কোন্ জাতির জন্য দেখাতে পেরেছে?

২. অর্থাৎ বড় সফল ও সৌভাগ্যশালী তারা, যাদেরকে আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্য স্বীয় অন্তরের লোভ, লালসা ও কার্পণ্য থেকে হেফাজত করেছে। লোভী ও বখিল মানুষ নিজ ভাইদের জন্য স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের স্বার্থ অগ্রগণ্য করতে পারে না এবং অন্যদেরকে ফুলে-ফলে সজ্জিত হতে দেখে কখনও খুশী হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ যারা উল্লিখিত মুহাজির ও আনসারদের পরে জন্মগ্রহণ করেছে, অথবা তাঁদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথবা পূর্ববর্তী মুহাজিরদের পরে হিজরত করে মদীনায় এসেছে।

৪. অর্থাৎ তারা পূর্ববর্তীদের জন্য মাগফেরাতের দো'য়া করেন এবং কোন মুসলমান ভাই সম্পর্কে দিলের মধ্যে বৈরিতা ও বিদ্বেষ রাখেন না।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, এ আয়াত ওই সকল মুসলমানের ব্যাপারেই, যারা পূর্ববর্তীদের হক (বা অবদান) স্বীকার করে, তাঁদের অনুসরণ করে এবং তাঁদের প্রতি বৈরিতা রাখে না।

ইমাম মালিক (র) আলোচ্য আয়াতের আলোকেই বলেন, 'যে ব্যক্তি সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং তাঁদের সমালোচনা করে, তার জন্য 'ফাই'-এর সম্পদে কোন অংশ নেই।'

[রুকূ - ২]

১১. আপনি কি তাদের দেখেননি যারা মুনাফিক? ওরা কিতাবীদের মধ্যে নিজ কাফের ভাইদের বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না। আর যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব[১]। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী[২]।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ⑪

১২. যদি ওরা (কিতাবী কাফেররা) বহিষ্কৃত হয়, তবে এরা (মুনাফিকরা) ওদের সাথে বের হবে না এবং যদি ওদের সাথে যুদ্ধ হয়, তবে এরা ওদের সাহায্য করবে না[৩]। আর যদি ওদের সাহায্য করেও, তবে পিঠ দেখিয়ে পালাবে। অতঃপর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না[৪]।

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ⑫

---

১. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও অন্য মুনাফিকরা ইহুদী গোত্র 'বনী নযীর'কে গোপনে এই সংবাদ পাঠিয়েছিল যে, তোমরা ভয় করো না এবং নিজেদের একা ভেবো না। যদি মুসলমানরা তোমাদের বহিষ্কার করে, তবে আমরাও তোমাদের সাথে বের হব। আর যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হও, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। এ আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এর বিপরীতে আমরা তোমাদের বিষয়ে কারো কথা মানব না, গ্রাহ্য করব না।

২. অর্থাৎ এ কথা মন থেকে বলছে না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য শুধু কথা বানাচ্ছে।

৩. সে মত সত্যই যুদ্ধের পালা এল এবং 'বনী নযীর' অবরুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এমন নাযুক পরিস্থিতিতে কোন মুনাফিক ওদের সাহায্যে এল না। আর পরিশেষে যখন ওরা বহিষ্কৃত হল, মুনাফিকরা আরামে নিজেদের ঘরবাড়িতে চুপ করে বসে রইল।

৪. অর্থাৎ অসম্ভব হলেও ধরে নেওয়া যাক, মুনাফিকরা যদি ওদের সাহায্যে বেরও হয়, তবে ফলাফল এ-ই হবে যে, মুসলমানদের মোকাবেলায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। তার পর কিতাবীদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, স্বয়ং এই মুনাফিকদের সাহায্যেও কেউ আসবে না।

১৩. নিশ্চয় মুনাফিকদের অন্তরে তোমাদের ভয় আল্লাহর চেয়ে বেশি। তার কারণ এই যে, ওরা এমন সম্প্রদায়, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই[১]।

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. ওরা সকলে মিলেও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না, তবে সুরক্ষিত জনপদসমূহের অভ্যন্তরে বা প্রাচীরের আড়ালে থেকে[২]। পরস্পরের মধ্যে ওদের বিরোধ প্রচণ্ড[৩]। তুমি ওদের ঐক্যবদ্ধ মনে কর, অথচ ওদের অন্তর বিভক্ত। তা এজন্য যে, ওরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়[৪]।

لَا یُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِیْعًا اِلَّا فِیْ قُرًی مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَیْنَهُمْ شَدِیْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِیْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰی ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১. অর্থাৎ ওদের যদি আল্লাহর আজমতের উপলব্ধি থাকত এবং অন্তরে তাঁর ভয় থাকত, তবে কুফর ও নেফাক অবলম্বন করত না। হাঁ, ওরা মুসলমানদের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে ভয় করে। এ জন্যই তাদের মোকাবেলায় ওরা টিকতে পারে না, যুদ্ধের ময়দানেও দৃঢ়পদ থাকতে পারে না।

২. যেহেতু ওদের অন্তর মুসলমানদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, এ জন্য ওরা ময়দানে এসে (সম্মুখ-) যুদ্ধ করতে পারে না। হাঁ, ঘনবসতিতে দুর্গের অভ্যন্তরে থেকে অথবা প্রাচীর ও গাছপালার আড়ালে থেকে লড়াই করতে পারে।

আমাদের এক মুরব্বী বলতেন, ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদের তলোয়ার-যুদ্ধে অপারগ হয়ে নানা ধরনের সমরাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল আবিষ্কার করেছে বটে, তবে এখনো যদি কোন সময় সম্মুখ-যুদ্ধের পালা এসে যায়, তবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুনিয়াবাসী বক্ষমান আয়াতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। আর সেই সম্প্রদায়ের কথা তো বাদই, যাদের নিকট বড় বাহাদুরী হল ছাদের উপর চড়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা এবং এসিড নিক্ষেপের যন্ত্রাদি চালনা করা!!

৩. অর্থাৎ ওরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে অত্যন্ত তেজস্বী ও কঠোর। যেমন: ইসলাম পূর্বকালে 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয়ের যুদ্ধে দেখা গেছে। কিন্তু মুসলমানদের মোকাবেলায় ওদের সমস্ত বাহাদুরী ও অহংকার বাতাসে উড়ে যায়।

৪. অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওদের বাহ্যিক ঐক্য দেখে প্রতারিত হবেন না। ওদের অন্তর বিভক্ত– প্রত্যেকে নিজ স্বার্থ ও কামনার দাস এবং চিন্তাধারায় একে অন্য থেকে ভিন্ন। এ অবস্থায় প্রকৃত ঐক্য কী করে সম্ভব? যদি আকল-বুদ্ধি থাকে, তবে বুঝতে পারবে, এ বাহ্যিক ঐক্য কিছুই না। ঐক্য তাকে বলে, যা মুমিনদের মধ্যে পাওয়া যায়। কারণ, সমস্ত

১৫. (ওদের অবস্থা) ওদের পূর্বেকার (কাফের-মুনাফিক) লোকদের মত, যারা নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[১]।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৬. (ওদের অবস্থা) শয়তানের মত– যখন সে মানুষকে বলল, 'তুমি কাফের হও'। অতঃপর যখন সে কাফের হল, তখন শয়তান বলল, 'তোমা হতে আমি সম্পূর্ণ পৃথক। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সমগ্র জগতের রব।'

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৭. অতএব ওদের উভয়ের পরিণাম এই যে, উভয়ে জাহান্নামে যাবে, যাতে চিরকাল থাকবে। আর এ-ই পাপীদের শাস্তি[২]।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝

স্বার্থ ও কামনা থেকে মুক্ত হয়ে তারা সকলে এক আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরে আছে এবং তাদের জীবন-মরণ সেই একক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত রয়েছে।

১. অর্থাৎ এই তো কিছুকাল পূর্বে ইহুদী সম্প্রদায় 'বনু কাইনুকা' স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতার স্বাদ ভোগ করেছে। ওরা যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, তখন মুসলমানরা একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর ওদের বহিষ্কার করল। আর এর পূর্বে নিকট অতীতেই মক্কার কাফেররা বদর যুদ্ধে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে।

ঠিক একই পরিণতি 'বনু নযীর' গোত্রের হয়েছে যে, দুনিয়ায় ওরা মুসলমানদের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। আর আখেরাতের ভয়ঙ্কর শাস্তি তো আপন জাগায় রয়েছেই।

২. অর্থাৎ শয়তান প্রথমে মানুষকে কুফর ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। যখন মানুষ ওর প্ররোচনার ফাঁদে ফেঁসে যায়, তখন সে বলে, 'আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তোমার কাজে অসন্তুষ্ট। আমার তো আল্লাহর ভয় লাগে।' (শয়তানের এ কথাও রিয়া ও প্রতারণামূলক হয়ে থাকবে।) ফল এই হয় যে, সে নিজেও দোযখের ইন্ধন হয় এবং মানুষকেও ইন্ধন বানায়।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'শয়তান আখেরাতে এ কথা বলবে। আর বদরের যুদ্ধের দিনেও সে এক কাফেরের আকৃতি ধারণ করে কাফেরদের যুদ্ধ করাচ্ছিল। অবশেষে সে ফেরেশতাদের দেখতে পেয়ে পলায়ন করে। এ ঘটনার আলোচনা সূরা 'আনফাল'-এ হয়েছে। ঠিক এ দৃষ্টান্ত মুনাফিকদেরও।'

[রুকূ - ৩]

১৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করে চল। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিত, সে আগামী কালের জন্য কী অগ্রিম পাঠিয়েছে[১]। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত[২]।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৯. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ ওদের আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। ওরাই নাফরমান[৩]।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

২০. দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীরা সমান নয়। যারা বেহেশতবাসী, তারাই সফলকাম[৪]।

لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

২১. আমি যদি এই কুরআন কোন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ

ওরা 'বনু নযীর'কে সাহায্য-সহযোগিতার গ্যারান্টি দিয়ে দিয়ে যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছিল। অবশেষে যখন ওরা মুসীবতে ফেঁসে গেল, তখন মুনাফিকরা আলগ হয়ে গেল। কিন্তু ওরা এভাবে আল্লাহর আযাব থেকে কি রক্ষা পেতে পারে? কস্মিনকালেও না। উভয়েরই ঠিকানা দোযখ।

১. অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে ইবাদত-বন্দেগী ও সৎকর্মের ভাণ্ডার তৈরি কর এবং চিন্তা করে দেখ, কালকের (পরকালের) জন্য কী সম্পদ অগ্রিম পাঠিয়েছ, যা মৃত্যুর পর আখেরাতে তোমাদের কাজে আসবে?

২. অর্থাৎ তোমাদের কোনো কাজ আল্লাহ থেকে গোপন নয়। অতএব তাঁকে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন কর এবং পাপাচার থেকে বেঁচে থাক।

৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহর ব্যাপারে নিজেদের কর্তব্য ভুলে গেছে এবং তাঁর স্মরণ থেকে গাফেল হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে স্বয়ং তাদের সত্তার বিষয়ে গাফেল ও বেখবর করে দিয়েছেন। ফলে, তারা আসন্ন বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কোনো ফিকির করেনি; বরং অবাধ্যতায় নিমজ্জিত হয়ে চিরকালীন ক্ষয়-ক্ষতি ও চিরস্থায়ী ধ্বংসে পতিত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ মানুষের উচিত, সে যেন নিজেকে বেহেশতের অধিকারী বানায়। যার একমাত্র উপায় হচ্ছে কুরআন করীমের হেদায়াত মাথা পেতে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করতে থাকা।

تَرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝

তবে আপনি দেখতেন– সেটি আল্লাহর ভয়ে বিনীত, বিদীর্ণ হয়ে গেছে[১]। এই দৃষ্টান্তগুলি আমি মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে[২]।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) গুপ্ত ও প্রকাশ্য (সকল) বস্তুর পরিজ্ঞাতা। তিনি বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (তিনি) অধিপতি, পবিত্র, (সকল

---

১. অর্থাৎ পরিতাপ ও আফসোসের বিষয় যে, মানুষের অন্তরে কুরআনের কোন প্রভাব নেই। অথচ কুরআনের প্রভাব এমনি শক্তিশালী যে, যদি পাহাড়সম কঠিন জিনিসের উপর তা অবতীর্ণ করা হত এবং ওই জিনিসের মধ্যে অনুধাবনের শক্তি বর্তমান থাকত— তবে সেটিও আল্লাহর সামনে অবনত হয়ে পড়ত এবং ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে টুকরা টুকরা হয়ে যেত।

আমার মরহুম পিতা এক দীর্ঘ কবিতার মধ্যে নিম্নের তিনটি ছন্দ লিখেছিলেন–

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو ÷ کان بہرے ہوگئے دل بدمزہ ہونے کو ہے

آ و سنوائیں تمہیں وہ نغمۂ مشروع بھی ÷ پارہ جسکے لحن سے طور ہدی ہونے کو ہے

حیف گرتا ثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو ÷ کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے

(বেদআতী মাহফিলের গান শুনে শুনে তোমার কান বধির হয়ে গেছে, তোমার রুচি বিকৃত হয়ে গেছে। আস, আমি তোমাকে কুরআনের মহান সুর শুনিয়ে দিই, যে সুর শুনে কঠিন পাহাড় তূরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তোমার জন্য হাজারো দুঃখ, যদি তোমার দিলে কুরআন শুনে আছর না হয়, যা শুনে পর্বতের সেই পাষাণ পাথরও خاشعا متصدعا (ভয়ে কম্পিত ও চৌচির) হয়ে যায়।)

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কাফেরদের অন্তর বড় কঠিন। কারণ, এ কালাম শুনেও ওরা ঈমান আনে না। যদি পাহাড় বুঝত, তবে সেও অবনমিত হয়ে যেত।'

বি. দ্র. এ তো হল আল্লাহর কালামের আজমতের বর্ণনা। সামনে বক্তার (অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহর) আজমত ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা।

الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

দোষ থেকে) মুক্ত[১], নিরাপত্তা দানকারী[২], রক্ষাকর্তা, পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী, মহিমান্বিত। আল্লাহ ওদের শির্‌ক থেকে পবিত্র[৩]।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২৪. তিনিই আল্লাহ, যিনি স্রষ্টা, অস্তিত্বদানকারী[৪], রূপদাতা[৫]। সকল উত্তম নাম তাঁরই[৬]। আসমানসমূহ ও যমীনে যা-কিছু আছে, সব তাঁর তাসবীহ পাঠ করছে[৭]। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৮]।

---

১. السلام অর্থাৎ সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে পবিত্র এবং সকল দোষ ও খুঁত থেকে পাক। কোন খারাবীই তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছেনি, পৌঁছবেও না।

২. المؤمن এর অনুবাদ করা হয়েছে 'নিরাপত্তা দানকারী'। কোন কোন মুফাসসিরের নিকট এর অর্থ مصدق অর্থাৎ বক্তব্য ও কর্ম দ্বারা নিজের ও নিজ পয়গম্বরের সমর্থনকারী, অথবা মুমিনদের ঈমানের সত্যায়নকারী।

৩. অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কার্যাবলিতে কেউ অংশীদার হতে পারে না।

৪. خالق ও بارئ এর মাঝে কী পার্থক্য, তার প্রতি আমরা সূরা 'বনী ইসরাঈল'-এর আয়াত وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ الخ এর ব্যাখ্যায় কিছুটা ইঙ্গিত করেছি।

৫. যেমন: বীর্যের মধ্যে মানুষের আকৃতি দান করেন।

৬. الاسماء الحسنى - অর্থাৎ সেসব নাম, যেগুলি সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুণাবলি ও কামালাতকে নির্দেশ করে।

৭. অর্থাৎ অবস্থার ভাষায়, অথবা মুখের ভাষায়ও, যা আমরা বুঝি না।

৮. খোদায়ী সকল গুণ ও কামাল (বা পূর্ণতা) সমন্বিত হয়েছে عزيز ও حكيم সিফাত দুটিতে। কারণ, عزيز শক্তির পরিপূর্ণতা ও حكيم ইলমের পরিপূর্ণতাকে নির্দেশ করে। আর যত গুণাবলি ও কামাল রয়েছে, সবই কোন না কোনভাবে ইলম (জ্ঞান) ও কুদরতের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বিভিন্ন বর্ণনায় সূরা হাশরের এই ৩টি আয়াতের (২২-২৪) বহু ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, বর্ণনা ২০৩০৬; জামে তিরমিযী, বর্ণনা ২৯২২) মুমিনদের উচিত, সকাল ও সন্ধ্যায় এ আয়াতগুলি নিয়মিত তেলাওয়াত করা।

تم سورة الحشر ولله الحمد والمنة

সূরা মুমতাহিনা

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৬০ । ১৩ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

آيَاتُهَا ١٣، رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ

১. হে ঈমানদারগণ[১]! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানিয়ো না যে, ওদের

---

১. **শানে নুযূল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা**

মক্কার কুরায়শদের সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধি হয়েছিল, যার উল্লেখ সূরা 'ফাত্হ'-এ রয়েছে। সেই সন্ধি দু'বছর কায়েম থাকে। তারপর কাফেরদের পক্ষ থেকে তা ভঙ্গ করা হয়। তখন হুযূর (স) নীরবে সৈন্য জমা করে মক্কা অভিযানের এরাদা করেন। তাঁর প্রস্তুতি সম্বন্ধে অবগত হলে মক্কার কাফেররাও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেবে, এতে হারাম শরীফে যুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়বে— এ কথা ভেবে বিষয়টি প্রচার করতে নিষেধ করা হয়।

হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রা.) নামক এক সাহাবী (যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজেরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) 'মক্কাবাসীদের এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যবাহিনী রাতের আঁধারে দুর্বার স্রোতের ন্যায় তোমাদের উপর আছড়ে পড়বে।' ওহীসূত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জেনে ফেললেন এবং হযরত আলী প্রমুখ কয়েকজন সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন, 'মক্কার পথে সফররত জনৈকা মহিলাকে একটি পত্রসহ অমুক স্থানে পাবে। তোমরা তার কাছ থেকে পত্রটি উদ্ধার করে নিয়ে আসবে।' নির্দেশমত তাঁরা দ্রুতবেগে গিয়ে মহিলাকে ঠিক সেই স্থানে পেয়ে যান। মহিলা বহু বাদানুবাদ করার পর তাদের নিকট পত্র সোপর্দ করতে বাধ্য হয়। পত্র পড়ে জানা গেল, তা হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কাফেরদের প্রতি লেখা এবং পত্রে মুসলমানদের অভিযানের উল্লেখ রয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কেমন কাজ?' বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কুফরও অবলম্বন করিনি, ইসলামও ত্যাগ করিনি। সত্য কথা এই যে, আমার পরিবার-পরিজন মক্কায় রয়েছে, সেখানে তাদের সহায়তা করার কেউ নেই। আমি কাফেরদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করে চাইলাম যে, ওরা এর বিনিময়ে আমার পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর রাখুক এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করুক। (আমি ভেবেছি, এতে আমার কিছুটা ফায়দা হয়ে যাবে, কিন্তু ইসলামের কোন ক্ষতি হতে পারবে না।) বিজয় ও সাহায্যের যেসব ওয়াদা আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কারো বাধায় বাধাগ্রস্ত হবে না। (যেমন: পত্রেও এ কথা লেখা ছিল যে, 'খোদার কসম, যদি

وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ

নিকট বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে[১], অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে ওরা তা অস্বীকার করেছে[২]। ওরা রাসূলকে ও তোমাদের শুধু এ কারণে বহিষ্কার করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ[৩]। যদি তোমরা আমার পথে জেহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই বের হয়ে থাক, (তবে ওদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ কীভাবে?!)[৪]। তোমরা গোপনে ওদের নিকট বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ আমি বেশ জানি–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাও তোমাদের উপর আক্রমণ করেন, তবু আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর সঙ্গে যেসব ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।') (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৮৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৪৯৪)

নিঃসন্দেহে হাতিব (রা.) থেকে বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন ইরশাদ করলেন, لَا تَقُوْلُوْا لَهٗ اِلَّا خَيْرًا 'ভাল ছাড়া তোমরা তাকে অন্য কিছু বলো না।' আরো বললেন, 'হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তোমাদের কি জানা আছে, আল্লাহ তাআলা বদরে অংশগ্রহণকারীদের গোনাহ-খাতা ক্ষমা করে দিয়েছেন?' (বুখারী, হাদীস : ৬২৫৯, ৪৮৯০)

আলোচ্য সূরার বড় অংশ এ ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

১. অর্থাৎ মক্কার কাফেররা আল্লাহর শত্রু, তোমাদের শত্রু। ওদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা এবং ওদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ বার্তা পাঠানো ঈমানদারদের পক্ষে সমীচীন নয়।

২. এ কারণে ওরা আল্লাহর শত্রু সাব্যস্ত হল।

৩. অর্থাৎ ওরা পয়গম্বর ও তোমাদের নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে, শুধু এ কারণে যে, তোমরা এক আল্লাহকে– যিনি তোমাদের সকলেরই প্রভু, মান। এর চেয়ে বড় শত্রুতা ও জুলুম আর কী হতে পারে? আশ্চর্য, এমন শত্রুতা পোষণকারী লোকদের প্রতি তোমরা বন্ধুত্বের হাত বাড়াও!

৪. অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি ও আমার পথে জেহাদ করার জন্য যদি তোমরা দেশ ত্যাগ করে থাক এবং একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তোমরা আর সকলকে শত্রু বানিয়ে থাক, তবে এই শত্রুদের সাথেই বন্ধুত্ব করার কী মতলব? যাদের নারায করে তোমরা আল্লাহকে রাযী করেছিলে, এখন কি তাদের রাযী করে আল্লাহকে নারায করতে চাও?

তোমরা যা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর[১]। আর তোমাদের মধ্যে যে এ কাজ করে, সে সরলপথ হারিয়ে ফেলেছে[২]।	وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○
২. ওরা যদি তোমাদের বাগে পায়, তবে তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি নিজেদের হাত ও জিহ্বা মন্দভাবে প্রসারিত করবে এবং মনে-প্রাণে চাইবে যে, তোমরাও কাফের হয়ে যাও[৩]।	اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ○
৩. তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানসন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা উত্তমরূপে দেখেন[৪]।	لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

---

১. অর্থাৎ মানুষ কোন কাজ সমস্ত দুনিয়া থেকে গোপনে করতে চাইল, তবে সে কি আল্লাহ থেকেও তা গোপন করে ফেলতে পারবে? দেখ, হাতিব কী পরিমাণ চেষ্টা করল, যাতে পত্রের কথা কেউ না জানতে পায়! কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন এবং সময়ের আগেই রহস্য ফাঁস হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যদি কেউ এমন কাজ করে এবং এমন মনে করে যে, আমি তা গোপন রাখতে সফল হব— তবে এটা কঠিন আত্মপ্রবঞ্চনা ও মারাত্মক ভ্রান্তি।

৩. অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই কাফেরদের কাছে তোমরা কোন মঙ্গল আশা করো না। তোমরা যতই আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব প্রকাশ কর না কেন, ওরা কখনো মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। তোমাদের পরম আন্তরিকতা সত্ত্বেও ওরা তোমাদের বাগে পেলে কোন প্রকারের অনিষ্ট ও শত্রুতা করতে ত্রুটি করবে না। মুখে, হাতে সব রকমে তোমাদের কষ্ট দেবে এবং চাইবে যে, ওরা নিজেরা যেমন সত্যকে অস্বীকার করেছে, তোমাদেরও অস্বীকারকারী বানিয়ে দেয়। এখন তোমরাই বল, এহেন দুরাত্মা, দুষ্কৃতিকারীরা কি এর যোগ্য যে, তোমরা ওদের নিকট বন্ধুত্বসুলভ পয়গাম পাঠাবে?

৪. হাতিব (রা) নিজ পরিবার-পরিজনের খাতিরে পত্রটা লিখেছিলেন। তাই আল্লাহ সতর্ক করে বলছেন, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা সকলের সবকিছু সূক্ষ্মভাবে দেখেন এবং সে মোতাবেকই মীমাংসা করবেন। তাঁর মীমাংসাকে কারো পুত্র, নাতি ও নিকট আত্মীয় ব্যাহত করতে পারবে না।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ

৪. নিশ্চয় তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যখন তারা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন— 'আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক[১]। আমরা তোমাদের মানি না[২]। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য প্রকাশ্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন[৩]।' তবে ব্যতিক্রম আপন পিতার প্রতি ইবরাহীমের এই উক্তি— 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; আর আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমার জন্য কোন কিছুর ক্ষমতা রাখি না[৪]'।

অতএব এ কোন বুদ্ধিমত্তার কথা নয় যে, একজন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের খাতিরে আল্লাহকে নারায করবে। স্মরণ রেখো, আল্লাহর সন্তুষ্টি সবার আগে ও উপরে– তিনি রাযী হলে তাঁর অনুগ্রহে সকল কাজ ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু তিনি অসন্তুষ্ট থাকলে কেউ-ই কোন উপকারে আসবে না।

১. অর্থাৎ যারা যারা (যুগে যুগে) মুসলমান হয়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দলভুক্ত হতে থেকেছেন, তারা সকলে নিজ নিজ সময়ে কথায় ও কাজে এই সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন।

২. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার কর এবং তাঁর বিধানের পরোয়া কর না। আমরাও তোমাদের তরীকা (নীতি-আদর্শ) অস্বীকার করি এবং তোমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করি না।

৩. অর্থাৎ এই শত্রুতা ও বৈরিতা তখনই খতম হতে পারে, যখন তোমরা শিরক পরিত্যাগ করে সেই একক মনিবের দাস হয়ে যাবে, আমরা যাঁর দাস।

৪. অর্থাৎ শুধু দো'য়াই করতে পারি, কোন লাভ-লোকসানের মালিক আমি নই। আল্লাহ যা কিছু আপতিত করতে চাইবেন, তা আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হিজরত করেন। তারপর নিজ জাতির প্রতি আর তাকাননি। তোমরাও তাই কর। এক ইবরাহীমই (আ) পিতার জন্য দো'য়া চেয়েছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা ছিল। তোমাদের জানা হয়েছে, অতএব তোমরা কাফেরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো না।'

(ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীরা বলেছিলেন,) 'হে আমাদের রব! আমরা আপনারই উপর ভরসা করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে[১]।'

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

৫. 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না[২] এবং হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন[৩]। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান[৪]।'

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৬. নিশ্চয় তাঁদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে; (অর্থাৎ) তার জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে, আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার অধিকারী[৫]।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

বি. দ্র. পিতার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দো'য়া চাওয়ার ঘটনা সূরা বারাআত-এ গত হয়েছে। তার আয়াত ১১৪ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ আমরা সকলকে ছেড়ে আপনার উপর ভরসা করেছি এবং স্বজাতিকে ত্যাগ করে আপনার দিকে রুজু হয়েছি। আর আমরা উত্তমরূপে এও জানি যে, সকলকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

২. অর্থাৎ আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার স্থল ও হাতিয়ার বানাবেন না। আর আমাদের এমন অবস্থায় রাখবেন না, যা দেখে কাফেররা খুশী হবে, ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করবে এবং এ ফলাফল বের করার সুযোগ পেয়ে যাবে যে, আমরা নই বরং কাফেররাই সত্যের উপর রয়েছে।

৩. অর্থাৎ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করুন এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন।

৪. আপনার শক্তিমত্তা ও হেকমতের কারণে এ আশাই করি যে, শত্রুদের মোকাবেলায় আপনি নিজ আজ্ঞাবহ বান্দাদের পরাজিত ও পর্যদুস্ত হতে দেবেন না।

৫. অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য, অন্য কথায় যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের ও আখেরাত কায়েম হওয়ার আশা রাখে, তাদের জন্য উচিত- ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের আদর্শ অনুসরণ করা। দুনিয়াবাসী তোমাদের যতই গোঁড়া ও সংকীর্ণ বলুক, তোমরা মুসলমানরা সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ো না, যা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ একত্ববাদী ইবরাহীম (আ) নিজ কর্মপন্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। ভবিষ্যতের শাশ্বত সফলতা এই পথে চলেই হাসিল হতে পারে। যদি

[রুকূ - ২]

৭. আশা আছে যে, আল্লাহ তোমাদের ও যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ পূর্ণ সক্ষম এবং আল্লাহ অত্যধিক মার্জনাকারী, পরম মেহেরবান[১]।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮. যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে বহিষ্কারও করেনি, আল্লাহ তোমাদের তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন[২]।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

এই পথের বিপরীতে চল এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব গড়, তবে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা কারো বন্ধুত্ব বা শত্রুতার পরোয়া করেন না। তিনি তো সকল কামাল (গুণ) ও সব রকম খুবীর (সৌন্দর্যের) মালিক, তাঁর কোনই ক্ষতি হতে পারে না।

১. অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত ও রহমতের শান এই যে, আজ যারা নিকৃষ্টতম শত্রু, কাল তাদের মুসলমান বানিয়ে দেন। এভাবে তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। সে মত মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাই হয়েছে— প্রায় সকল মক্কাবাসী মুসলমান হয়ে যায় এবং যারা একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি চালাত, এখন তারাই পরস্পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে লাগল!

আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অসহযোগ-জেহাদ মাত্র কয়েক দিনের জন্য, তারপর এর প্রয়োজন থাকবে না। অতএব বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমাদের উচিত, অসহযোগ অবস্থার উপর মজবুতির সাথে কায়েম থাকা এবং কারো দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গিয়ে থাকলে আল্লাহর নিকট নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান।

২. মক্কায় কিছু লোক এমনো ছিল, যারা (তখনো) মুসলমান হয়নি বটে, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা ও বিদ্বেষও পোষণ করত না। তারা দীনের ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধও করেনি এবং তাদের নির্যাতন করতে ও বহিষ্কার করতে জালেমদের সহযোগিতাও করেনি। এ ধরণের অমুসলিমদের সাথে ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে ইসলাম বারণ করে না। যেহেতু তারা তোমাদের সাথে নম্রতা ও উদারতার আচরণ করে, তাই ইনসাফের দাবি এই যে, তোমরাও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং দুনিয়াকে দেখিয়ে দাও যে, ইসলামী চরিত্রের মাপকাঠি কত উন্নত!

৯. আল্লাহ তো তোমাদের কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কার-করণে সহযোগিতা করেছে। আর যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই পাপী[১]।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيٰرِكُمْ وَظٰهَرُوا عَلٰى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ⑨

১০. হে ঈমানদারগণ! যদি ঈমানদার নারীরা হিজরত করে তোমাদের কাছে এসে যায়, তবে তাদের পরীক্ষা করবে। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন[২]। তারপর যদি

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ

ইসলামের শিক্ষা এটা নয় যে, কাফেরদের এক সম্প্রদায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকলে নির্বিচারে সকল কাফেরকে একই লাঠিতে হাঁকতে শুরু করবে। এমন করাটা ইনসাফ ও হেকমতের খেলাফ। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-যুবক ও শত্রু-মিত্রের মধ্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী পার্থক্য করা জরুরী।— এর কিছুটা আলোচনা সূরা মায়েদা ও আলে-ইমরানের তাফসীরে গত হয়েছে।

১. অর্থাৎ এমন জালেমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা নিঃসন্দেহে কঠিন জুলুম ও পাপের কাজ।

পূর্বাপর সামঞ্জস্য : এই পর্যন্ত কাফেরদের দু দল (শত্রুতা পোষণকারী ও উদারতায় বিশ্বাসী)-এর সাথে আচরণ-ব্যবহার করার পদ্ধতি কী হতে পারে, তার আলোচনা হয়েছে। সামনে বলা হচ্ছে, যে সকল মহিলা 'দারুল হরব' থেকে 'দারুল ইসলাম'-এ আসবে অথবা 'দারুল হরব'-এ থেকে যাবে, তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা উচিত।

অবতণের প্রেক্ষাপট

ঘটনা এই যে, 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'-তে মক্কাবাসীদের একটি শর্ত এই ছিল যে, ওদের কেউ মুসলমানদের নিকট এলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে মক্কা থেকে কতিপয় পুরুষ মদীনায় এলে তাদের ফেরত পাঠানো হয়। তারপর কয়েকজন মহিলা এল। এখন এদের ফেরত পাঠালে কাফেরদের ঘরে মুসলমান মেয়েদের হারামে লিপ্ত হতে হত। এ বিষয়ের সমাধানে সামনের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৭১১)

মনে হয়, এরপর এ ধরনের মহিলাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে কাফেররা পীড়াপীড়ি করেনি, নতুবা সন্ধি কায়েম থাকত না।

২. অর্থাৎ অন্তরের অবস্থা তো আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তোমরা সেই মহিলাদের যাচাই করে নাও যে, সত্যিই তারা মুসলমান কি না এবং ইসলামের খাতিরেই দেশ ত্যাগ করে এসেছে কি না; কোন পার্থিব বা নফসানী উদ্দেশ্য (বা ব্যক্তিগত স্বার্থ) হিজরতের কারণ

مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿١٠﴾

তোমরা জানতে পার যে, তারা (সত্যিই) ঈমানদার, তবে তাদের কাফেরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ো না। এই নারীরা সেই কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং সেই কাফেররাও এই নারীদের জন্য বৈধ নয়। আর সেই কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা ওদের দিয়ে দাও। আর এই নারীদের বিবাহ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দেবে[১]। আর তোমরা কাফের নারীদের সম্ভ্রম ধরে রেখো না (অর্থাৎ তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না)। এবং তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং সেই কাফেররা যা ব্যয় করেছে, ওরা তা চেয়ে নিক। এ আল্লাহর ফয়সালা। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[২]।

হয়নি তো? কোন কোন বর্ণনায় আছে, হযরত উমর (রা) উক্ত মহিলাদের যাচাই করতেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে তাদের থেকে বায়'আত নিতেন। আর কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বায়'আত করে নিতেন। সামনের আয়াত— يَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ -এ এর উল্লেখ রয়েছে।

১. অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি মুসলমান হয়, আর দ্বিতীয়জন কাফের, তবে দেশের পার্থক্যের কারণে (অর্থাৎ একজন দারুল ইসলামে ও অপরজন দারুল হরবে হওয়ার কারণে) তাদের বিবাহ-সম্পর্ক কায়েম থাকতে পারে না। অতএব কোন কাফেরের স্ত্রী যদি মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে, তবে যে মুসলিম তাকে বিয়ে করবে তার কর্তব্য হবে, যে পরিমাণ মহর সেই কাফের স্বামী এই মহিলাকে দিয়েছিল, তা ফেরত দেওয়া। আর এখন মহিলার জন্য যে মহর সাব্যস্ত হবে, তাও পৃথকভাবে মহিলাকে দিতে হবে। এ শর্তাবলিতে কোন মুসলমান তাকে বিয়ে করতে পারবে।

২. প্রথম অবস্থার হুকুমের বিপরীতে এখানে দ্বিতীয় অবস্থার বিধান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আর যদি কোন মুসলমানের স্ত্রী কাফের রয়ে যায়, তবে স্বামী তাকে ছেড়ে দেবে। অতঃপর যে কাফের এই নারীকে বিয়ে করবে, সে ঐ মুসলমান স্বামীর দেওয়া মহর ফেরত দেবে। এভাবে উভয় পক্ষ একে অপর থেকে নিজের পাওনা আদায় করবে।

এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর মুসলিমগণ দেওয়া-নেওয়া উভয়টির জন্য তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কাফেররা দিতে রাজী হল না। তখন সামনের আয়াত নাযিল হল।

১১. যদি তোমাদের স্ত্রীদের কেউ তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়, তারপর তোমাদের পালা আসে– তবে যাদের স্ত্রী চলে গেছে তাদেরকে তারা যতটা ব্যয় করেছিল, তার সমপরিমাণ (অর্থ) দিয়ে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখ[১]।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾

১২. হে নবী! যখন মুমিন নারীরা আপনার নিকট এই মর্মে বায়'আত করার জন্য আসে যে, তারা কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না[২], নিজেদের হাত-পায়ের মাঝে রচনা করে (অর্থাৎ জেনেশুনে) কোন অপবাদ রটাবে না[৩]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا

---

১. অর্থাৎ কোন মুসলমানের স্ত্রী চলে গেল এবং (নতুন) কাফের স্বামী মুসলমান স্বামীর দেওয়া দেনমহর ফেরত দিল না, সে ক্ষেত্রে যে কাফেরের স্ত্রী মুসলমানদের নিকট চলে আসল, দেনমহর বাবদ যে অর্থ দেওয়ার ছিল, তা কাফেরকে না দিয়ে সেই মুসলমানকে দেবে, যার হক (পাওনা) নষ্ট হয়েছে। হাঁ, মুসলমানের হক আদায় করে অবশিষ্ট কিছু থাকলে তা (সেই কাফেরকে) ফেরত দেবে।

কোন কোন আলেম লিখেছেন, যদি কোন মুসলমান কাফেরের দেওয়া (মহরের) অর্থ ফেরত দিতে না পারে, তবে তা বাইতুল মাল থেকে দেওয়া হবে।

আল্লাহু আকবার! কী পরিমাণ সাম্য ও ইনসাফের শিক্ষা! কিন্তু এ অনুযায়ী আমল করবে সেই ব্যক্তিই, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে এবং তাঁর প্রতি সত্যিকার ঈমান রাখবে।

বি. দ্র. বিজ্ঞ মুতারজিম (র) فعاقبتم এর দুটি তরজমা করেছেন– ১. 'অতঃপর তোমরা হস্তগত কর' ২. 'অতঃপর তোমাদের পালা আসে।' আমরা দ্বিতীয় তরজমার আলোকে উপরোক্ত ব্যাখ্যা করেছি। প্রথম তরজমা হিসাবে কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, عاقبتم– দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গনীমতের মাল হাসিল হওয়া। অর্থাৎ গনীমতের মাল থেকে সেই মুসলমানের ব্যয় করা অর্থ আদায় করতে হবে।

২. যেমন জাহেলি যুগে প্রচলন ছিল যে, সামাজিক লজ্জা-শরমের কারণে কন্যাদের জীবন্ত দাফন করে ফেলত এবং কোন কোন সময় অভাব-অনটনের ভয়ে পুত্রদেরও মেরে ফেলত।

৩. لَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ.. -এর অর্থ, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবি করা, অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অথবা কোন বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে মিথ্যা কসম খাওয়া। আরেক অর্থ হল, পরপুরুষের ঔরষজাত সন্তানকে নিজ স্বামীর ঔরষজাত বলে চালিয়ে দেওয়া, অথবা অন্য

يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ ۚ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

এবং কোন ভাল কাজে আপনার নাফরমানী করবে না— তখন তাদের বায়'আত করে নিন[১] এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, মেহেরবান[২]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩. হে ঈমানদারগণ! এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত[৩]। ওরা আখেরাত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কাফেররা নিরাশ হয়ে পড়েছে কবরবাসীদের থেকে[৪]।

মহিলার সন্তান নিয়ে ফাঁকিবাজি করে নিজের বলে দাবি করা। হাদীসে আছে, যে কেউ একজনের সন্তানকে অন্যের দিকে নিসবত (সম্পৃক্ত) করবে, তার জন্য বেহেশত হারাম। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২২৬৩)

১. পূর্বে বলা হয়েছিল, মুসলমান মহিলাদের (যারা হিজরত করে আসে) যাচাই করে নেবে। এখানে বলা হচ্ছে, তাদেরকে যাচাই করার অর্থ হচ্ছে, এ আয়াতে উল্লেখিত বিধি-বিধান যদি তারা গ্রহণ করে নেয়, তবে তারা ঈমান এনেছে বলে ধরতে হবে।

একে 'বায়আতের আয়াত' বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মহিলারা বায়আত করতে আসলে তিনি এগুলির স্বীকৃতি নিতেন। তবে বায়আতের সময়ও কোন মহিলার হাত তাঁর হাত মুবারককে স্পর্শ করেনি।

২. অর্থাৎ পূর্বে এসব বিষয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে অথবা ভবিষ্যতে আহকাম পালনে কিছু ত্রুটি হয়ে গেলে তার জন্য আপনি তাদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ আপনার বরকতে তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন।

৩. সূরার শুরুতে যে কথা বলা হয়েছে, সমাপ্তিতে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, মুমিনের শান এই নয় যে, যার প্রতি আল্লাহ নারায, তার সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক করবে। যার প্রতি আল্লাহর আক্রোশ থাকবে, তার প্রতি আল্লাহর বন্ধুদেরও আক্রোশ থাকা উচিত।

৪. অর্থাৎ কাফেররা এ আশা রাখে না যে, কবর থেকে কেউ উঠবে এবং ফের পরজীবনে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হবে। তদ্রূপ মক্কার এই কাফেররাও (পুনরুত্থানের) আশা করে না।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসিরের নিকট مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ শব্দটি كفار-এর بيان অর্থাৎ যেসব কাফের কবরে চলে গেছে, তারা যেমন সেখানকার হাল-অবস্থা দেখে আল্লাহর মেহেরবানী ও সন্তুষ্টি লাভ করা থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে, তেমনি এ কাফেররাও আখেরাতের দিক থেকে হতাশ হয়ে গেছে।

সূরা সাফ্ফ

সূরা ৬১ । ১৪ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

آيَاتُهَا ١٤ ، رُكُوْعَاتُهَا ٢

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা-কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাস্‌বীহ পাঠ করে। আর তিনিই সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

২. হে ঈমানদাররা! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না?

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৩. এ আল্লাহর কাছে বড় অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বল যা কর না।

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৪. নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর[১]।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

---

১. কোন বিষয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করতে ও দাবি দাওয়া করতে ভয় করা উচিত। কারণ, দাবি করার পর তার বাস্তবায়নে অসুবিধা হতে পারে। মুখে কোন কথা বলে দেওয়া সহজ, কিন্তু তার বাস্তবায়ন তত সহজ নয়। যে ব্যক্তি মুখে অনেক কিছু বলে, কিন্তু কিছু করে না— এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও নারায হন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এক স্থানে মুসলিমগণ সমবেত ছিলেন। তারা বলতে আরম্ভ করলেন, কোন্ কাজ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দ, তা যদি আমরা জানতে পারতাম, তবে আমরা তাই করতাম। এতে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৬৬০৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৪৫৯৪)

অর্থাৎ শোন! সামলিয়ে কথা বল। আচ্ছা, যদি করতেই পার তবে নাও, আমি বলে দিচ্ছি। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহর পথে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সিসা-ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং যুদ্ধের ময়দানে এরূপ সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে, যেন তারা একটি সিসা-ঢালা, নিশ্ছিদ্র মজবুত প্রাচীর।

এখন এ মাপকাঠিতে নিজেদের যাচাই করে দেখে নাও। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে, যারা এ মাপকাঠিতে পরিপূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্র

৫. (স্মরণ কর), যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাকে কষ্ট দাও কেন? অথচ তোমরা জান, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল[১]।' এরপরও যখন ওরা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহও ওদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ নাফরমান লোকদের সুপথ দেখান না[২]।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

এমনো পাওয়া যাবে, যেখানে কতকের মৌখিক দাবিকে তাদের আমল মিথ্যা প্রমাণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, উহুদ যুদ্ধে সেই সিসাঢালা প্রাচীর কায়েম থাকল কই? আর যখন জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হল, তখন কেউ কেউ এও বলল– رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا ('হে আমাদের রব! কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলেন, কেন আমাদের আরো কিছুকাল পর্যন্ত অবকাশ দিলেন না?' –সূরা নিসা, আয়াত নং ৭৭)

যা হোক, মুখে বেশি দাবি করো না। বরং আল্লাহর রাহে কুরবানী পেশ কর, এর দ্বারাই সর্বোচ্চ সফলতা লাভ হবে। মূসার জাতিকে দেখবে, তারা মুখে বড়াই ও অহংকারের অনেক কথা বলত, কিন্তু কার্যত তারা অগ্রসর ছিল না। যখনই কোন কাজের সুযোগ আসত, অমনি পিছিয়ে যেত এবং অত্যন্ত কষ্টদায়ক কথা বলতে শুরু করত। এর পরিণতি যা হয়েছে, তা সামনে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রমাণ ও সুস্পষ্ট মুজিযা দেখে তোমরা অন্তরে বিশ্বাস কর যে, আমি আল্লাহর সত্য নবী। এর পরও তোমরা অনুচিত ও অপ্রীতিকর আচরণ করে কেন আমাকে কষ্ট দাও? এমন আচরণ তো কোন সাধারণ নসীহতকারী ও হিতাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গেও করা উচিত নয়। অথচ তা তোমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে করছ। তোমাদের বিভিন্ন বে-আদবীসুলভ আচার-আচরণ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। যেমন– কখনো নির্জীব বাছুর বানিয়ে পূজা করতে শুরু করলে এবং সেটাকে তোমাদের ও মূসার খোদা বলতে আরম্ভ করলে, আবার যখন 'আমালেকা' সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করার হুকুম হল, তখন বলতে লাগলে, 'আমরা তো কখনো যাব না, তুমি ও তোমার খোদা গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসে আছি'– ইত্যাদি যতসব নোংড়া কথাবার্তা বললে।

এসব কারণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে হযরত মূসা (আ) বললেন– رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (হে আমার রব! আমার কর্তৃত্ব কেবল আমার নিজ সত্তা ও আমার ভাইয়ের উপর। অতএব আপনি আমাদের ও এই নাফরমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন। –মায়েদা, আয়াত ২৫)

২. নিয়ম হল, অসৎকর্ম করতে করতে অন্তর কঠিন ও কালো হতে থাকে, এমন কি এক পর্যায়ে সৎকর্ম করার যেগ্যতাই আর থাকে না। ঠিক এ অবস্থা ওদেরও হল। যখন প্রত্যেক কথায় রাসূলের সঙ্গে বিবাদ করতে থাকল এবং সর্বদা বক্র পথেই চলতে থাকল, তখন অবশেষে ওরা বিতাড়িত হল এবং আল্লাহ ওদের অন্তরকে (এমন) বক্র করে দিলেন যে, সরল কথাও বোঝার যোগ্যতা রইল না। এমন জেদী নাফরমানদের সাথে আল্লাহর এ নীতিই চলে আসছে।

৬. (স্মরণ কর), যখন ঈসা ইবনে মারয়াম বললেন, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, (আমি এসেছি) আমার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থনকারী হয়ে[১] এবং এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ-দাতারূপে, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, যাঁর নাম আহমদ[২]।'

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

১. অর্থাৎ মূল তাওরাত, যা আল্লাহর তরফ থেকে অবতারিত, আমি তার সমর্থন করি এবং তার বিধি-বিধান ও সংবাদসমূহে বিশ্বাস রাখি। আর আমার যা কিছু শিক্ষা ও আদর্শ, তা প্রকৃতপক্ষে ওইসব মৌল নীতমালারই অধীন, যা তাওরাতে বাতানো হয়েছে।

বি. দ্র. ইবনে কাছীর প্রমুখ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ الخ –এর এই অর্থ করেছেন যে, আমার অস্তিত্বই তাওরাতের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কারণ, আমি সেই সকল বিষয়ের বাস্তবরূপ হয়ে এসেছি, যেগুলির সংবাদ তাওরাত শরীফে দেওয়া হয়েছিল।

২. অর্থাৎ আমি পূর্ববর্তী নবীর সমর্থন করি এবং ভবিষ্যত-নবীর সুসংবাদ শোনাই।

এমনিতে তো পূর্ববর্তী সমস্ত নবী সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আগমনের সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন। কিন্তু যে স্পষ্টতা, বিস্তৃতি ও যত্নের সাথে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তা আর কারো দ্বারা হয়নি। সম্ভবত যুগের নিকটবর্তিতার কারণে এ বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কারণ, তাঁর পরে শেষ যমানার নবী ছাড়া আর কোনো নবী আসার ছিলেন না।

তাওরাত-ইনজীলে বিকৃতি

তবে এ কথা সত্য যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের অমার্জনীয় অপরাধ ও ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপের ফলে আজ দুনিয়ার মানুষের হাতে আসল তাওরাত ও ইন্‌জীলের এমন কোনো সহীহ কপি নেই, যার দ্বারা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি যে, পূর্ববর্তী নবীগণ বিশেষত হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম সর্বশেষ নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কী ভাষায় ও কী বর্ণনাভঙ্গিতে সুসংবাদ দিয়েছিলেন? অতএব মাসীহ আ: কর্তৃক সুসংবাদ প্রদান সম্পর্কে কুরআন করীমের এই স্পষ্ট ও পরিষ্কার বর্ণনাকে শুধু এ কারণে মিথ্যা বলার অধিকার আদৌ কারো নেই যে, তা বিকৃত বাইবেলের মধ্যে নেই। তবে একেও শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মুজেযা বলতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা এই বিকৃতকারীদের এতটা শক্তি দেননি, যাতে তারা শেষ পয়গম্বরসম্পর্কিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে যে, তার কোন নিদর্শনই অবশিষ্ট থাকবে না।

বিকৃতি সত্ত্বেও বর্তমান বাইবেলে নবীজির সুসংবাদ

বর্তমান বাইবেলের বহু স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ প্রায় স্পষ্টভাবে আছে এবং বুদ্ধিমান ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের জন্য তাতে তাবীল ও অস্বীকৃতির মোটেই

অতঃপর যখন তিনি সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে ওদের নিকট আগমন করলেন, তখন ওরা বলতে লাগল, 'এ স্পষ্ট যাদু[১]।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭. ওর চেয়ে বড় জালেম আর কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, অথচ ওকে ইসলামের দিকে আহবান করা হয়[২]? আর আল্লাহ জালেম লোকদের সুপথ দেখান না[৩]।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অবকাশ নেই। আর 'ইউহান্না'র ইনজীলে পারক্লীত সম্পর্কে সুসংবাদ এতই স্পষ্ট যে, এর অনায়াসলব্ধ অর্থ আহমদ (প্রশংসিত) ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। আহলে কিতাবের কোন কোন আলেমকেও অগত্যা এ কথার স্বীকৃতি বা আধা স্বীকৃতি দিতে হয়েছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ পূর্ণরূপে 'রূহুল কুদস'-এর উপরও হয় না এবং সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো উপরও হতে পারে না।

আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামের আলেমগণ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমুহের উপর স্বতন্ত্র কিতাবাদি লিখেছেন এবং 'তাফসীরে হক্কানী'-এর বিজ্ঞ সংকলক 'পারক্লীত'সম্পর্কিত সুসংবাদ এবং বাইবেলের বিকৃতি বিষয়ে সূরা সাফ্ফ-এর তাফসীরে অত্যন্ত বিস্তারিত বাহাছ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

১. অর্থাৎ যখন হযরত মাসীহ প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে আসলেন, অথবা তিনি যাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন সেই হযরত আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে আগমন করলেন, তখন লোকেরা এসব নিদর্শনকে যাদু বলে অভিহিত করতে লাগল।

২. অর্থাৎ যখন ওদের (কিতাবীদের) মুসলমান হতে বলা হয়, তখন সত্যকে গোপন করে ও মিথ্যা কথা বানিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করে। খোদাকে মনুষ্য বানানো বা মানবকে খোদা বানানোর মিথ্যাচার তো আছেই, উপরন্তু ওরা আসমানী কিতাবসমূহে বিকৃতি সাধন করে এবং যে বিষয়গুলি সত্যিই তাতে বর্তমান ছিল তা অস্বীকার করে, আর যেসব কথা ছিল না তা তাতে সংযোজন করে। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কী হতে পারে?

৩. এহেন জালেমদের ভাগ্যে হেদায়াত কী করে জুটতে পারে?

আর হতে পারে, لا يهدي এর মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, এ জালেমরা যতই অস্বীকার করুক, বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা করুক, আল্লাহ ওদের সফল হতে দেবেন না। অর্থাৎ হুযূর (স) সম্পর্কিত যেসব সংবাদ ওরা গোপন করতে বা মিটিয়ে ফেলতে চায়, তা কিছুতেই গোপন করা বা মিটিয়ে ফেলা যাবে না। এ জন্যই তো হাজারো কাট-ছাট সত্ত্বেও আজো শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদের এক বিরাট ভাণ্ডার (বাইবেলে) বর্তমান রয়েছে।

৮. ওরা নিজেদের মুখ দিয়ে আল্লাহর আলো নিবিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণ করবেনই, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে[১]।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

৯. তিনিই সেই সত্তা, যিনি আপন রাসূলকে পথের দিশা ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে[২]।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

[রুকূ - ২]

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার পথনির্দেশ করব, যা তোমাদের রক্ষা করবে যাতনাদায়ক আযাব থেকে?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

১১. (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জেহাদ করবে। এ-ই তোমাদের পক্ষে উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

---

১. অর্থাৎ কাফেরদের যতই খারাপ লাগুক, আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণ করেই ছাড়বেন। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করা এমন, যেমন কোন আহমক সূর্যের আলো ফুঁ মেরে নেবাতে চায়। ঠিক এ অবস্থাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধবাদীদের ও তাদের চেষ্টা-তদবীরের।

বি. দ্র. সম্ভবত بأفواههم শব্দ দ্বারা এখানে এদিকেও ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, উক্ত সুসংবাদসমূহ অস্বীকার করা ও গোপন করার জন্য যা-কিছু মিথ্যা কথা বানায়, তা সফল হওয়ার নয়। তিনি 'পারক্লীত' নন বলে ওরা যতই চ্যাচাক, আল্লাহ তাআলা এ কথা মানিয়ে ছাড়বেন যে, তার مصداق (সঠিক প্রয়োগপাত্র) তিনি (আখেরী নবী) ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

২. এই আয়াতের বিষয়বস্তুর উপর সূরা 'বারাআত' (আয়াত ৩৩) এর ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

১২. তা হলে তিনি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের এমন উদ্যান-রাজিতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত[১] এবং (প্রবেশ করাবেন) উৎকৃষ্ট বাড়ি-ঘরে, যা বসবাসের উদ্যান-রাজিতে অবস্থিত[২]। এ-ই মহা সাফল্য।

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۲﴾

১৩. এবং (দান করবেন) আরো একটি জিনিস, যা তোমরা মনে-প্রাণে চাও। (তা হচ্ছে) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়[৩]। আর আপনি ঈমানদারদের সুসংবাদ দিন[৪]।

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

---

১. অর্থাৎ এই দীনকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করা তো আল্লাহর কাজ, কিন্তু তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, ঈমানের উপর সম্পূর্ণ অবিচল থেকে তাঁর পথে জান-মাল নিয়ে জেহাদ করা। এ এমন ব্যবসা, যার মধ্যে কখনো কোন ক্ষতি নেই। দুনিয়াতে মানুষ হাজারো ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং তাতে নিজেদের সমস্ত সম্পদ বিনিয়োগ করে দেয়, শুধু এ আশায় যে, তা থেকে লাভ হবে এবং এভাবে আসল পুঁজি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। অতঃপর নিজে ও পরিবার-পরিজন অভাব-অনটনের কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু মুমিনরা যদি নিজেদের জান ও মালের পুঁজি উক্ত মহান তেজারতে লাগায়, তবে শুধু কয়েক দিনের দারিদ্র্য থেকে নয়, বরং আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক আযাব ও ধ্বংসকর ক্ষতি থেকে চিরদিনের জন্য নিরাপদ হয়ে যাবে। মুসলমানদের বুঝা উচিত যে, এ ব্যবসা দুনিয়ার সকল ব্যবসা থেকে উত্তম, যার লাভ পরিপূর্ণ মাগফেরাত ও শাশ্বত জান্নাতের আকারে অর্জিত হবে। এর চেয়ে বড় সফলতা আর কী হতে পারে?

২. অর্থাৎ এ উৎকৃষ্ট ঘর-বাড়ি সেই বাগ-বাগিচার অভ্যন্তরে হবে, যেখানে মুমিনগণ বসবাস করবেন। এ তো আখেরাতের সফলতা। সামনে দুনিয়ার সর্বোচ্চ ও পরম সফলতা বর্ণিত হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ আসল ও বড় সফলতা তো তাই, যা আখেরাতে লাভ হবে এবং যার সামনে সাত রাজার ধনও কিছু নয়। তবে দুনিয়াতেও এমন একটি জিনিস তোমাদের দান করা হবে, যা তোমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই অতি প্রিয়। তা কী? نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ (আল্লাহর তরফ থেকে এক বিশেষ সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় ও সফলতা। বস্তুত এর একটি অন্যটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।)

দুনিয়া দেখে নিয়েছে, কুরূনে উলা তথা সর্বোত্তম যুগের মুসলমানদের সঙ্গে এ ওয়াদা কত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। আজো যদি মুসলিম জাতি সত্যিকার অর্থে ঈমান ও আল্লাহর পথে জেহাদের উপর অবিচল হয়ে যায়, তবে সেই সফলতাই তাদের পদচুম্বনের জন্য উপস্থিত থাকবে।

৪. কারণ, এ সুসংবাদ শোনানোও একটি স্বতন্ত্র নে'য়ামত।

১৪. হে ঈমাদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও[১], যেমন ঈসা ইবনে মারয়াম তাঁর 'হাওয়ারীদের' (তথা সঙ্গীদের) বলেছিলেন, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে?' হাওয়ারীরা বলেছিল, 'আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী[২]।' তার পর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল ও একদল কাফের হল। অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে, ফলে তারাই বিজয়ী হল[৩]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর দীন ও তাঁর পয়গম্বরের সাহায্যকারী হয়ে যাও। মুমিনরা আল্লাহর ফযল ও তাওফীকে এই হুকুম এমনভাবে পালন করেছেন যে, তাঁদের এক জামাতের নামই হয়ে গেছে 'আনসার'।

২. حواريين (মাসীহ আ.-এর সাহাবীগণ) ছিলেন অল্প কিছু লোক, যারা বংশের দিক থেকে তেমন অভিজাত বলে গণ্য হতেন না। তাঁরা হযরত মাসীহর প্রতি ঈমান আনেন এবং বড় কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর দাওয়াতকে নানা শহর ও অঞ্চলে প্রসার করেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর তাঁর শিষ্যগণ খুবই মেহনত করেন। ফলে, তাঁর দীনের প্রসার হয়। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরেও তাঁর খলীফাগণ আরও বেশি মেহনত করেন।'

৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'দল হয়ে গেল, এক দল ঈমানের উপর কায়েম হল, দ্বিতীয় দল অস্বীকার করল। অতঃপর মাসীহ (আ)-এর পরে তারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ শুরু করল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ বাদানুবাদ ও গৃহযুদ্ধে কাফেরদের উপর মুমিনদের বিজয় দান করেন। হযরত মাসীহর নামধারী নাসারারা ইহুদীদের উপর প্রবল থাকে। আর নাসারাদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ার পর তাদের যে কিছু সংখ্যক লোক সহীহ আকীদার উপর কায়েম থাকে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখেরী যমানার নবীর মাধ্যমে অন্যদের উপর বিজয়ী করেন– হুজ্জত ও দলীল-প্রমাণাদির দিক দিয়েও এবং শক্তি ও রাজত্বের দিক দিয়েও।

সূরা জুমুআ

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৬২ । ১১ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

آياتها ١١، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা-কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে— যিনি বাদশাহ, পরম পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হেকমত (প্রজ্ঞা)। আর তারা ইতিপূর্বে অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল[১]।

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ

৩. এবং (তাঁকে আবির্ভূত করেছেন) তাদের মধ্যকার আরো লোকদের জন্য, যারা এখনো

---

১. امیین (নিরক্ষর) বলতে আরবের লোকেরা উদ্দেশ্য, যাদের মধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুই ছিল না, কোন আসমানী কিতাবও ছিল না। মামুলি লেখাপড়াও খুব কম মানুষ জানত। তাদের মূর্খতা ও বর্বরতা ছিল সর্বজনবিদিত। আল্লাহকে একেবারে ভুলে গিয়ে মূর্তিপূজা, কল্পনা-পূজা ও দুরাচার-পাপাচারের ন্যায় অধর্মকে 'ইবরাহীমের মিল্লাত' বলে সাব্যস্ত করেছিল এবং প্রায় সমস্ত জাতি স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল।

হঠাৎ করে আল্লাহ তাআলা এ জাতির মধ্য থেকেই একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটালেন, যাঁর বিশেষ উপাধি হচ্ছে 'উম্মী নবী'। কিন্তু উম্মী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বজাতিকে আল্লাহর সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব পাঠ করে শোনান এবং দুর্লভ ও বিস্ময়কর উলূম ও মাআরেফ, হেকমত ও জ্ঞান-বুদ্ধির কথা শিখিয়ে এমন বিজ্ঞ ও সভ্য বানান যে, দুনিয়ার বড় বড় জ্ঞানী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং আলেম ও আরেফ তাদের সামনে ছাত্রের ন্যায় নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য হয়।

বি. দ্র. এ ধরনের আয়াত সূরা বাকারা (আয়াত ১২৯) ও আলে-ইমরানে (আয়াত ১৬৪) গত হয়েছে। সেখানকার ব্যাখ্যাসমূহ দ্রষ্টব্য।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি[১]। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[২]।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

৪. এ আল্লাহর অনুগ্রহ। তা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল[৩]।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

৫. যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি– তাদের উদাহরণ এমন যেমন গাধা, যে অনেক কিতাব বহন করে

---

১. অর্থাৎ এই রাসূল পরবর্তীতে আগমনকারী সেইসব মানুষেরও রাসূল, যারা ইহকাল, পরকাল ও আসমানী শরী'য়তসমূহের পরিপূর্ণ ও সঠিক ইলম রাখে না। ফলে তারাও নিরক্ষর আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেমন: পারস্য, রোম, চীন ও ভারত উপমহাদেশ প্রভৃতি দেশের লোকেরা, যারা পরবর্তী সময়ে নিরক্ষরদের দীনে ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'আল্লাহ তাআলা এই দীনের বাহকরূপে প্রথমে আরবদের পয়দা করেন। পরবর্তী সময়ে অনারব দেশসমূহেও এমন কামেল লোকের আবির্ভাব হয়।'

হাদীছে রয়েছে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি সালমান ফারসী (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যদি দীন বা দীনী ইলম ثريا (ঊর্ধ্বাকাশের নক্ষত্রবিশেষ)-এ গিয়ে পৌছে, তবু এর জাতি পারস্যবাসী সেখান থেকেও তা নিয়ে আসবে।' (ফাতহুল বারী : ৮/৬৪৩) শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) প্রমুখ স্বীকার করেছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর স্বার্থক উদাহরণ হচ্ছেন হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা আন-নুমান রাহিমাহুল্লাহু তাআলা।

২. যাঁর মহা শক্তিমত্তা ও হেকমত এ মহামর্যাদাশালী পয়গম্বরের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত কালের জন্য আরব ও অনারবদের তালীম ও তাযকিয়ার (শিক্ষা-দীক্ষার) ব্যবস্থা করেছেন।

৩. অর্থাৎ তিনি রাসূলকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহামর্যাদা দান করেছেন এবং এ উম্মতকে এমন মহামর্যাদাশালী রাসূল প্রদান করেছেন। فلله الحمد والمنة على ما أنعم মুসলমানদের উচিত, এই বিরাট অনুগ্রহ ও মর্যাদার কদর করা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালীম ও তাযকিয়ার (শিক্ষা-দীক্ষার) দ্বারা গুরুত্বের সাথে উপকৃত হওয়া।

মুসলমানদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে সামনে ইহুদীদের উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে, যারা নিজেদের কিতাব ও পয়গম্বরদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ গাফলতি ও ত্রুটি করেছে।

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

চলেছে[১]। সেই লোকদের দৃষ্টান্ত খুবই নিকৃষ্ট[২], যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে[৩]। আর আল্লাহ জালেম লোকদের সুপথ দেখান না[৪]।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৬. আপনি বলুন, 'হে ইহুদীরা! তোমাদের যদি এই দাবি হয় যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য মানুষেরা নয়- তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

---

১. অর্থাৎ ইহুদীদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার রাখা হয়েছিল এবং ওরা তার যিম্মাদার সাব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু ওরা তার শিক্ষা ও হেদায়েতের কোন পরোয়া করেনি— তা সংরক্ষণও করেনি, অন্তরেও স্থান দেয়নি। তার উপর আমল করে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভেও ধন্য হয়নি।

বলা বাহুল্য, যে তাওরাতের ধারক ও বাহক ওদের বানানো হয়েছিল, তা ছিল হেকমত ও হেদায়াতের এক রাব্বানী জ্ঞান-ভাণ্ডার। কিন্তু ওরা যেহেতু তার দ্বারা উপকৃত হয়নি, সুতরাং ওরা এ দৃষ্টান্তের উপযোগী যে-

نہ محقق شدی نہ دانشمند ÷ چار پائے بروکتابے چند

('বিজ্ঞ-বিচক্ষণও হয়নি, বুদ্ধিমানও হয়নি। চতুষ্পদ জন্তু একটা, যার উপর আছে কিতাবের বোঝা।')

একটা গাধার উপর ইলম ও হেকমতের বহুসংখ্যক কিতাব রেখে দিলে সে ভারে নুয়ে পড়া ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। কারণ, সে তো কেবল কাঁচা ঘাসের তালাশে থাকে। তার পিঠে কি মুক্তা-মাণিক্য আছে, না কাঁকর-পাথর— তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। আর সে যদি শুধু এতেই গৌরব করা শুরু করে যে, 'দেখ, আমার পিঠে কত উত্তম ও মূল্যবান কিতাবাদি বোঝাই করা হয়েছে, অতএব আমি বড় আলেম ও সম্মানিত' —তবে এটা অধিকতর বোকামী হবে।

২. অর্থাৎ সে জাতি কতই না নিকৃষ্ট, যার উদাহরণ হচ্ছে উক্ত গাধা, যার পিঠে কিছু কিতাব রেখে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাঁর আশ্রয়ে রাখুন।

৩. আল্লাহ তাআলা তাওরাত প্রভৃতি কিতাবে শেষ যমানার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং তাঁর রিসালাতের উপর যে দলীল-প্রমাণ কায়েম করেছিলেন— তা অস্বীকার করাই আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করা।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এমন অবাধ্য, একগুঁয়ে ও বেইনসাফ লোকদেরকে হেদায়াতের পথে আসার তাওফীক দেন না।

৭. কিন্তু ওরা কখনো তা কামনা করবে না, সেসব কর্মের কারণে, যা ওরা স্বহস্তে অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ অপরাধীদের সম্পর্কে পূর্ণ অবগত[১]।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

১. অর্থাৎ উক্ত মূর্খতা, বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও ইহুদীদের দাবি এই যে, 'আর কেউ নয় একমাত্র তারাই আল্লাহর বন্ধু ও দোস্ত এবং তারাই জান্নাতের অধিকারী।' ব্যস্, দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ামাত্রই জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করবে।

কিন্তু সত্যিই যদি তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস থাকে এবং তারা নিজ দাবিতে সত্য হয়, তবে তাদের অবশ্যই উচিত ছিল, দুনিয়ার পুতিগন্ধময় জীবনের প্রতি বিরাগ হয়ে মাহবূবে হাকীকীর (প্রকৃত প্রেমাস্পদের) প্রতি আগ্রহ ও জান্নাতুল ফেরদাওসের আকাঙ্ক্ষার কারণে মৃত্যু কামনা করা। কেননা, যে ব্যক্তির ইয়াকীন হয়ে যায় যে, আল্লাহর কাছে তার মহামর্যাদা রয়েছে এবং সেখানে কোন কষ্ট ও অমর্যাদার আশঙ্কা নেই, সে নিশ্চয়ই সানন্দে মৃত্যুবরণ করতে চাইবে এবং সে মৃত্যুকে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মিলন-সেতু মনে করবে আর তার মুখে এই শব্দাবলিই উচ্চারিত হবে–

غدا نلقى الأحبة ÷ محمدا وحزبه

('আগামী কাল প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে– তাঁরা হচ্ছেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ।')

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ واقترابها ÷ طيبة وبارد شرابها

('কত চমৎকার সেই জান্নাত ও তার নৈকট্যে পৌছা। তা কত উত্তম নিবাস এবং তার পানীয় কতই না শীতল।')

حبيب جاء على ناقة

('এক প্রেমিক বন্ধু, উষ্ট্রারোহী প্রেমের ক্ষুধা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।')

يابني: لا يبالي أبوك، سقط على الموت، أم سقط عليه الموت

('হে প্রিয় বৎস! তোমার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হল, না মৃত্যু তার উপর পতিত হল– এতে তার কোনো পরোয়া নেই।')

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব হচ্ছে প্রকৃত ওলী-বুযুর্গদের কথা, যাঁরা দুনিয়ার কোনো কষ্টে বা বিপদে পড়ে নয়, বরং একমাত্র প্রভু-মিলন ও জান্নাত-প্রাপ্তির আগ্রহে মৃত্যু কামনা করতেন। আর তাঁদের কাজকর্ম ও চাল-চলন সাক্ষ্য দিত যে, মৃত্যু তাঁদের কাছে দুনিয়ার সকল স্বাদের চেয়ে অধিক সুস্বাদু। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– لودت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل 'আমার আকাঙ্ক্ষা, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হই, তার পর জীবিত হই, আবার শহীদ হই।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৭৯৭)

৮. আপনি বলুন, 'যেই মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়ন করছ, তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। এর পর তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে তোমরা যা করতে তা জানিয়ে দেবেন[১]।'

قُلۡ اِنَّ الۡمَوۡتَ الَّذِیۡ تَفِرُّوۡنَ مِنۡهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِیۡكُمۡ ثُمَّ تُرَدُّوۡنَ اِلٰی عٰلِمِ الۡغَیۡبِ وَالشَّهَادَۃِ فَیُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۟

এর বিপরীতে উল্লিখিত মিথ্যা দাবিদারদের কাজকর্ম ও চাল-চলনের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, তাদের চেয়ে মৃত্যু- ভয়ে অধিক ভীত আর কেউ নেই। তারা মৃত্যুর নাম শুনে ঘাবড়ায় ও পালায় । তাও এজন্য নয় যে, বেশি দিন বেঁচে থাকলে বেশি নেকী কামাই করতে পারবে। বরং শুধু এজন্য যে, দুনিয়ার লোভে তাদের পেট কখনো ভরে না এবং মনে মনে তারা বোঝে যে, এখান থেকে পরজগতে যাওয়ামাত্রই আপন কর্মের শাস্তিতে ধৃত হবে। মোটকথা, তাদের সামগ্রিক কর্ম ও আচরণ থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, তারা এক মুহূর্তের জন্যও মৃত্যু কামনা করতে পারে না।

এও সম্ভব ছিল যে, সেই যমানার ইহুদীরা কুরআনের এ দাবিকে (وَلَا یَتَمَنَّوۡنَهٗۤ اَبَدًا) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য মুখে মিছামিছি মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এ ক্ষমতাও দেননি। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, যদি কোনো ইহুদী মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে বসত, তবে তৎক্ষণাৎ সে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২২৫)

বি. দ্র. আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আরেকটি আয়াত সূরা বাকারায় (৯৪-৯৫) গত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পূর্ববর্তী মনীষীদের কারো কারো নিকট 'মৃত্যু কামনা' বলতে 'মুবাহালা' উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অবাধ্য ইহুদীদের বলা হয়েছিল যে, সত্যিই যদি তারা নিজেদের আল্লাহর বন্ধু বলে বিশ্বাস করে এবং মুসলমানদের বাতিল মনে করে, তবে তারা কামনা করুক– উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী, তারা মরে যাক! সত্য কথা হল, তারা কখনো এমনটি করবে না। কারণ, তারাও নিশ্চিত জানে যে, তারাই মিথ্যাবাদী ও চরম জালেম। ইবনে কাছীর (র), ইবনে কায়্যিম (র) প্রমুখ মনীষীগণ আয়াতের এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন।

১. অর্থাৎ মৃত্যুর ভয়ে কোথায় পালিয়ে যাবে? হাজার চেষ্টা কর, মজবুত কিল্লাসমূহে গেট বন্ধ করে বসে থাক, কোথাও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আর মৃত্যুর পর ফের আল্লাহরই আদালতে হাযির হতে হবে।

পূর্বাপর সামঞ্জস্য

ইহুদীদের বড় বিচ্যুতি এই ছিল যে, তারা আসমানী কিতাবাদির বোঝা বহন করা সত্ত্বেও তা দ্বারা উপকৃত হত না। দীনের অনেক কিছু বুঝত, কিন্তু দুনিয়ার খাতিরে সে অনুসারে আমল করত না। দুনিয়ার নানা ধান্দায় জড়িত হয়ে আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাতের চিন্তা ভুলে যেত। এ রকম করতে আমাদের মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে।

[রুকূ - ২]

৯. হে ঈমানদারগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন আল্লাহর স্মরণের দিকে দ্রুত ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ করে দাও[১]। এ-ই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর[২]।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

জুমার তাগিদও এ রকমই। তখন দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ো না; বরং পূর্ণ মনোযোগ ও নীরবতার সাথে খুতবা শোন ও নামায আদায় কর। হাদীছে আছে, যে কেউ খুতবার সময় কথা বলে, সে ঐ গাধার মত, যার উপর কিতাবের বোঝা চাপানো আছে। অর্থাৎ তার উদাহরণ ইহুদীদের মত হল। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২০৩৩, ফাতহুল বারী, ২/৪১৪)

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'প্রত্যেক' আযানের এই হুকুম নয়। কারণ, (অন্য নামাযের আযান হলে আরেক মসজিদে হলেও) জামাত তো ধরা যাবে। আর জুমা একই স্থানে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) হত বলে পরে আর কোথাও পাওয়া যেত না।'

আর আল্লাহর ذکر বা স্মরণের অর্থ খুতবা। আর নামাযও এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এমন সময়ে যেতে হবে, যাতে খুতবা শোনা যায়। সে সময় বেচাকেনা হারাম। আর فاسعوا-এর অর্থ পরিপূর্ণ যত্ন ও গুরুত্বসহ যাওয়া, আক্ষরিক 'দৌড়ানো' উদ্দেশ্য নয়।

نودي- দ্বারা কোন্ আযান উদ্দেশ্য? এবং জুমআর প্রথম আযানের হুকুম কি দ্বিতীয় আযানের মত?

আয়াতে نودي দ্বারা উদ্দেশ্য সেই আযান, যা আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার সময় ছিল। অর্থাৎ যে আযান ইমামের সামনে (খুতবার পূর্বক্ষণে) দেওয়া হয়। কারণ, এ আযানের পূর্বেকার আযান অর্থাৎ জুমআর প্রথম আযান তখন ছিল না। বরং তা পরবর্তীতে হযরত উছমান (রা)-এর আমলে সাহাবীদের 'ইজমা' দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু বেচাকেনার অবৈধতার ব্যাপারে এই আযানের হুকুমও পুরনো (তথা দ্বিতীয়) আযানের হুকুমের মতই (সুতরাং প্রথম আযানের সময় থেকেই বেচাকেনা অবৈধ)। কেননা, কোন কারণে একটি ক্ষেত্রে যে হুকুম হয়, কারণটি অন্য ক্ষেত্রে পাওয়া গেলে সেখানেও ওই হুকুম প্রযোজ্য হয়।

অবশ্য পূর্ববর্তী (অর্থাৎ দ্বিতীয়) আযানে এ হুকুম منصوص (কুরআন দ্বারা প্রমাণিত) ও অকাট্য, আর ইজমাসূত্রে যে আযান প্রচলিত হল, তাতে এ হুকুমটি হবে مجتهد فيه (ইজতেহাদী) ও ظَنّي (অর্থাৎ প্রমাণিত, তবে সম্পূর্ণ অকাট্য নয়।)। এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা সমস্ত ইলমী সংশয় দূর হয়ে যায়।

প্রত্যেকের উপরই কি سعى إِلَى ذِكْرِ اللهِ ফরয?

উল্লেখ্য, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا...الخ -তে যে হুকুম বর্ণিত হয়েছে, তা عام مخصوص منه البعض অর্থাৎ, হুকুমের যে ব্যাপকতা, তা থেকে কিছু অংশ ব্যতিক্রম থাকবে। কেননা ইজমা আছে, কতক মুসলমানের (যেমন: মুসাফির ও রোগীর) উপর জুমার নামায ফরয নয়।

২. চিন্তা করে দেখ, আখেরাতের লাভের সামনে দুনিয়ার ফায়দার কী মূল্য?

১০. অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়ে যায়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও[১]।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝١٠

১১. তারা যখন বানিজ্য বা কোনো খেল-তামাশা দেখে, সেদিকে ছুটে যায় এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে যায়। আপনি বলুন, 'আল্লাহর নিকট যা আছে, তা খেল-তামাশা ও বাণিজ্য থেকে উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা[২]।'

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ۝١١

---

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ইহুদীদের নিকট শনিবার ছিল ইবাদতের দিন। আর ঐ দিন সারা দিন বেচাকেনা অবৈধ ছিল। মুসলমানদের আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, নামাযের পর তোমরা জীবিকা অর্জন কর, তবে জীবিকার্জনের মধ্যেও আল্লাহকে ভুলো না।

২. একবার জুমার নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা পাঠ করছিলেন। এমন সময় একটি ব্যবসায়ী কাফেলা বাইর থেকে খাদ্যদ্রব্যাদি নিয়ে মদীনায় এল। সেই সাথে সকলের অবগতির উদ্দেশ্যে ঢোল বাজছিল। ইতিপূর্বে শহরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। তাই লোকেরা কাফেলা থামানোর জন্য দৌড়ে বের হয়ে গেল। (তারা হয়ত ধারণা করে থাকবেন, খুতবার হুকুম সাধারণ ওয়াজের মতই, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উঠেও যাওয়া যায়, আর নামায পুনরায় এসে পড়ে নেব। অথবা জুমার নামায হয়ে গিয়ে থাকবে, যেমন কারো কারো বক্তব্য হল, তখন জুমার নামায খুতবার পূর্বে হত। যা হোক, খুতবার হুকুম তাঁদের জানা ছিল না।)

যা হোক, অধিকাংশ মানুষ চলে গেল। হুজূর (স) এর নিকট চার খলীফাসহ মোট বারজন রয়ে গেলেন। এতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮৬৩; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৯৩৬; ফাতহুল বারী : ১/২৬৫)

যার মর্ম হল- তেজারত ও দুনিয়ার খেল-তামাশা এমন কী? সেই চিরস্থায়ী দৌলত অর্জন কর, যা আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে এবং যা পয়গম্বরের সুহবত ও যিকর-ইবাদতের মজলিসসমূহে হাসিল করা যায়। বাকী থাকল দুর্ভিক্ষের কারণে রিযিকের পেরেশানী, যার কারণে তোমরা উঠে চলে গেলে— তো মনে রেখো, রিযিক আল্লাহর হাতে এবং তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। রিযিক নিয়ে এই মালিকের গোলামের ভয় থাকা উচিত নয়।

উল্লিখিত সতর্কীকরণ ও নসীহতের পর সাহাবীদের সেই অবস্থা হয়েছিল, যা সূরা নূরের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে– رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ (তারা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না।)

বি. দ্র. لهو বলা হয় প্রত্যেক এমন বিষয়কে, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়, যেমন খেল-তামাশা। এখানে সম্ভবত সেই ঢোলের আওয়াজকে لهو শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

সূরা মুনাফিকুন

সূরা ৬৩ । ১১ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ ①

১. যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল[১]।' আল্লাহ জানেন, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, (এই) মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী[২]।

اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ③

২. ওরা নিজেদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে[৩], আর (অন্যদের) আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করছে। ওরা যা করছে, তা খুবই নিকৃষ্ট[৪]।

---

১. অর্থাৎ আমরা অন্তরে বিশ্বাস রাখি যে, আপনি সত্যিই রাসূল।

২. অর্থাৎ ওদের অন্তরে ওই বিশ্বাস রয়েছে– এটা মিথ্যা কথা। বাস্তবে ওরা আপনার রিসালাতে বিশ্বাসী নয়। শুধু নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুখে কথা বানায় এবং মনে মনে নিজেরাও জানে যে, মিথ্যা বলছে। শুধু যে এ বিষয়েই মিথ্যা বলছে তা নয়; বরং মিথ্যা বলা ওদের চারিত্রিক স্বভাবে পরিণত হয়েছে। কথায় কথায় ওরা মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়। যেমন: এ সূরাতেই একটি ঘটনা উল্লেখ করা হবে, যেখানে ওরা স্পষ্ট মিথ্যা বলেছে, অতঃপর ওহীসূত্রে ওদের মিথ্যা স্পষ্ট করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ মিথ্যা কসম খেয়ে বলে, আমরা মুসলমান। আর ইসলামের মুজাহিদদের হাত থেকে নিজেদের জান-মালের হেফাজতের জন্য এ কসমকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। যখনি ধরা খাওয়ার মত কোন বিষয় ওদের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে পাকড়াও হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তৎক্ষণাৎ মিথ্যা কসম খেয়ে নির্দোষ বনে যায়।

৪. অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, অপবাদ আরোপ ও দোষান্বেষণ করে করে অন্যদের ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং লোকেরা বাহ্যত ওদের মুসলমান মনে করে ধোঁকায় পড়ে। অতএব ওদের মিথ্যা কসমের ক্ষতি ও খারাবী ওদের নিজেদের পর্যন্তই সীমিত থাকে না; বরং অন্যদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এর চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ আর কী হবে?

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ۝

৩. তা এজন্য যে, ওরা ঈমান এনেছে, ফের কাফের হয়ে গেছে। ফলে ওদের অন্তর মোহর করে দেওয়া হয়েছে। অতএব ওরা (কিছুই) বোঝে না[১]।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ

৪. তুমি ওদের দেখলে ওদের দেহাবয়ব তোমার নিকট ভাল লাগে। আর ওরা কথা বললে তুমি ওদের কথা শোন[২]। ওরা (দেয়ালে) ঠেকানো কাঠের ন্যায়[৩]। ওরা প্রত্যেক

(কিন্তু এক ব্যক্তি যতক্ষণ বাহ্যত ইসলামের মৌলিক বিধানসমূহ স্বীকার করে, চাই মিথ্যা ও ধোঁকাবাজী করেই হোক, ততক্ষণ ইসলাম তাকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না)।

১. অর্থাৎ মুখে ঈমান আনল, কিন্তু অন্তরে অস্বীকৃতি থাকল। আর ঈমানের দাবিদার হয়েও কাফেরদের ন্যায় কার্যকলাপ করল। ওদের এই বেঈমানী ও চূড়ান্ত প্রতারণার প্রতিক্রিয়া এই যে, ওদের দিলের উপর সিল-মোহর লেগে গেল। ফলে তার ভিতর ঈমান ও নেকী, সত্য ও সততা প্রবেশের আদৌ অবকাশ থাকেনি। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় পৌছার পর এখন আর ওদের থেকে বুঝ-সমঝের কোন আশা করা যায় না। যখন মানুষের অন্তর তারই দুষ্কৃতি ও বে-ঈমানীর কাজকর্মের কারণে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে যায়, তখন আর ভাল-মন্দ বোঝার যোগ্যতা কী করে অবশিষ্ট থাকতে পারে?

২. অর্থাৎ ওদের অন্তরগুলো তো বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু দেহের আকার-আকৃতি সুঠাম ও সুন্দর দেখা যায়। ওরা কথা বললে খুব চমৎকার ও শ্রুতিমধুর শোনায়। ফলে শ্রোতা সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং কথার বাহ্যিক পারিপাট্যের কারণে সেদিকে মন ধাবিত হয়। কবি সুন্দরই বলেছেন–

از برون چون گور کافر پر خلل ÷ واندرون قہر خدائے عز وجل

از برون طعنہ زنی بر بایزید ÷ واز درونت ننگ میدارد یزید

('কাফেরের কবরের মত বাইরে সুন্দর, তার ভিতরে রয়েছে খোদা তাআলার কহর। বাইরে তো তুমি এজিদের দুর্নাম করে বেড়াও, কিন্তু তোমার মনের ভিতরে রয়েছে এজিদের খাসলত।')

৩. خشب مسندة- শুষ্ক ও অকেজো লাকড়ী, যা দেয়ালের সাথে খাড়া করে রাখা হয়েছে, একেবারে নিষ্প্রাণ ও বুদ্ধি-চেতনাহীন। দেখায় কত মোটা-সোটা, কিন্তু অন্য কিছুর উপর ভর ছাড়া এক মিনিটও খাড়া থাকতে পারে না। হাঁ, প্রয়োজনে শুধু জ্বালানির কাজে আসে। ঠিক এ অবস্থা এই মুনাফেকগুলোর– মোটা ও সুঠাম দেহ, সবই বাহ্যিক খোলসমাত্র। কিন্তু ভিতরে শূন্য, নিষ্প্রাণ (ঈমানহীন)। তাই শুধু দোযখের ইন্ধন হওয়ার যোগ্য।

يَحۡسَبُوۡنَ كُلَّ صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡ ؕ هُمُ الۡعَدُوُّ فَاحۡذَرۡهُمۡ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰی یُؤۡفَکُوۡنَ ۝

শোরগোলকে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে[১]। ওরাই শত্রু, অতএব ওদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন[২]। আল্লাহ ওদের ধ্বংস করুন! ওরা (সত্য থেকে) বিমুখ হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে?[৩]

৫. وَاِذَا قِیۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا یَسۡتَغۡفِرۡ لَكُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ لَوَّوۡا رُءُوۡسَهُمۡ وَرَاَیۡتَهُمۡ یَصُدُّوۡنَ وَهُمۡ مُّسۡتَکۡبِرُوۡنَ ۝

আর যখন ওদের বলা হয়, 'আস, তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ক্ষমা প্রার্থনা করবেন,' তখন নিজেদের মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি দেখতে পাও যে, ওরা অহংকার করে ফিরে যাচ্ছে[৪]।

৬. سَوَآءٌ عَلَیۡهِمۡ اَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ ؕ لَنۡ یَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِیۡنَ ۝

আপনি ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন বা না করেন, উভয়ই ওদের জন্য সমান। আল্লাহ ওদের মোটেই ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ নাফরমান লোকদের সুপথ দেখান না[৫]।'

---

১. অর্থাৎ ওরা ভীতু, কাপুরুষ, ভয়ে সন্ত্রস্ত। কোথাও কোন শোরগোল হলেই ওদের অন্তর কেঁপে ওঠে। মনে করে যে, আমাদের উপরই বিপদ এল। কঠিন পাপাচার ও বে-ঈমানীর কারণে সর্বদা ওদের দিল দুরু দুরু করতে থাকে— এই বুঝি আমাদের দাগাবাজি ফাঁস হয়ে গেল, অথবা আমাদের কার্যকলাপের শাস্তিস্বরূপ কোন মুসিবতে ফেঁসে গেলাম।

২. অর্থাৎ ওরাই ভয়ঙ্কর দুশমন, ওদের চক্রান্ত ও কূটকৌশল সম্পর্কে সতর্ক থাক।

৩. অর্থাৎ বাহ্যত ঈমান আনার পর ওদের এই বেঈমানী এবং সত্য ও সততার আলো প্রকাশ পাওয়ার পর আঁধারের প্রতি ওদের এই ভালবাসা— কতই না বিস্ময়কর!

৪. কোন কোন সময় যখন ওই মুনাফিকদের কোন দুষ্কৃতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা ফাঁস হয়ে যায়, আর লোকেরা বলে, আস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আল্লাহর নিকট থেকে নিজ গোনাহ মাফ করিয়ে নাও, হুযূরের ক্ষমা-প্রার্থনার বরকতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করে দেবেন— তখন অহমিকা ও অহংকারের কারণে ওরা তা করতে প্রস্তুত হয় না এবং কোন পরোয়া না করে কেবল ঘাড় নাড়ে ও মাথা দোলায়। বরং কোন কোন হতভাগা পরিষ্কার বলে ফেলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা-প্রার্থনার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।

৫. অর্থাৎ হয়ত আপনি দয়া-মায়ার আতিশয্যে বর্তমান হালতেই ওদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোনক্রমেই ওদের ক্ষমা করবেন না এবং এহেন

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

৭. ওরাই এমন লোক, যারা বলে, 'তোমরা তাদের জন্য ব্যয় করো না যারা রাসূলুল্লাহর নিকট থাকে, যে পর্যন্ত না তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়[১]।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারসমূহ তো আল্লাহর। কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না[২]।'

নাফরমানরা তাঁর দরবার থেকে হেদায়াতের তাওফীক লাভ করবে— এমন আশা আদৌ করা যায় না।

এ ধরনের একটি আয়াত সূরা বারাআতে (১৮০) গত হয়েছে। তার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

১. **শানে নুযূল**

এক সফরে দুই ব্যক্তির মধ্যে কলহ বাঁধে– একজন ছিলেন মুহাজির, দ্বিতীয়জন আনসার। উভয়ে নিজেদের সাহায্যার্থে নিজ নিজ দলের লোকদের ডাকল। এতে বেশ গণ্ডগোল হল। এ খবর মুনাফিক–সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর কানে গেল। তখন সে সুযোগ পেয়ে বলল, 'আমরা যদি এ (মুহাজির)দের নিজেদের শহরে জায়গা না দিতাম, তবে আমাদের সঙ্গে লড়াই করার সাহস পেত না। তোমরা (আনসাররা) তাদের সাহায্য-সহযোগিতা কর বলে এই লোকেরা রাসূলের কাছে জমে থাকে। সাহায্য করা ছেড়ে দাও, এখনি আর্থিক সংকটে পড়ে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এদিক ওদিক চলে যাবে।' হতভাগা এও বলল, 'এ সফর থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে যারা সেখানে ক্ষমতাধর, তাদের উচিত হবে— দীন-হীন লোকগুলোকে (শহর থেকে) বের করে দেওয়া। (অর্থাৎ আমরা যারা সম্মানিত, তারা এ লাঞ্ছিত মুসলমানদের বের করে দেব।)

যায়েদ বিন আরকাম (রা) নামে এক সাহাবী এ কথাগুলো শুনে ফেলেন এবং গিয়ে নবীজিকে শোনালেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রমুখকে ডেকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে কসম খেয়ে বলল, 'যায়েদ বিন আরকাম শত্রুতা বশত আমাদের নামে মিথ্যা বলেছে।' লোকেরা যায়েদকে তিরস্কার করতে লাগল। বেচারা অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। এমন সময় এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী প্রমাণ করলেন।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯০২, ৪৯০৫)

২. অর্থাৎ আহমকরা এতটুকু বোঝে না যে, সমগ্র আসমান ও যমীনের ভাণ্ডারসমূহের মালিক তো আল্লাহ-ই। সুতরাং যারা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পয়গম্বরের সুহবতে থাকে, তাদের কি তিনি না খাইয়ে মারবেন? আর লোকে যদি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়, তবে তিনিও কি নিজ রিযিকের সকল দরজা বন্ধ করে দেবেন?

সত্য কথা তো এই যে, যারা সেই আল্লাহওয়ালাদের জন্য ব্যয় করছে, তারা এই খেদমত আল্লাহর তাওফীকেই করতে পারছে। তাঁর তাওফীক না হলে নেক কাজে কেউ এক পয়সাও ব্যয় করতে পারবে না।

৮. ওরা বলে, 'আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে অবশ্যই সবলেরা সেখান থেকে দুর্বলদের বের করে দেবে'*, অথচ শক্তি-মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ও ঈমানদারদেরই। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না[১]।	يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۚ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۠ ﴿٨﴾

[রুকূ - ২]

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এরূপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত[২]।	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

☆ দ্বিতীয় তরজমা-'সম্মানিতরা হীন-লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে'।

১. অর্থাৎ মুনাফিকরা এটাও জানে না যে, শক্তিশালী ও সম্মানী কে। স্মরণ রেখো, প্রকৃত ও স্বতন্ত্র সম্মান তো আল্লাহরই। তারপর তাঁরই সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বদৌলতে এই সম্মান পর্যায়ক্রমে রাসূলের ও ঈমানদারদের।

রেওয়ায়াতে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর সেই কথা (অর্থাৎ ইজ্জতওয়ালারা দীন-হীনদের বের করে দেবে) যখন তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর কানে পৌঁছল (যিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন), তখন তিনি তলোয়ার নিয়ে বাপের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্বীকার না করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানী এবং তুমি অসম্মানী, তোমাকে জীবিত ছাড়ব না এবং মদীনাতেও প্রবেশ করতে দেব না।' শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়ে ছাড়লেন। رضي الله عنه (তাফসীরে তবারী ২২/৬৬৫-৬৬৬)

পূর্বা-পর সম্পর্ক

মুনাফিকদের দীনতা-হীনতা ও খারাবী বর্ণনার পর সামনে মুমিনদের কিছু হেদায়াত দান করা হচ্ছে। অর্থাৎ তারা যেন মুনাফিকদের মত দুনিয়ার জীবনে ফেঁসে গিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও আখেরাতের স্মরণ থেকে গাফেল না হয়।

২. অর্থাৎ স্থায়ী বিষয় বর্জন করে অস্থায়ী বিষয়ে মশগুল হওয়া এবং উত্তম জিনিসকে এড়িয়ে গিয়ে নিকৃষ্ট জিনিসে মত্ত হওয়া— মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতি ও লোকসানের কথা। ওই ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিই ভাল, যা আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ইবাদত থেকে গাফেল না করে। যদি দুনিয়ার ধান্দায় পড়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে গেল, তবে আখেরাতও হারাল, আর দুনিয়াতেও মনের শান্তি ভাগ্যে জুটল না। ইরশাদ হয়েছে- وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ

১০. আর আমি তোমাদের যা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর- এর পূর্বে যে, তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু হাযির হবে আর তখন সে বলবে, 'হে আমার রব! আমাকে কিছুকাল পর্যন্ত কেন অবকাশ দিলেন না? তা হলে আমি সদকা-খয়রাত করতাম এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম!'

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙفَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

১১. আর আল্লাহ কাউকে আদৌ অবকাশ দেবেন না যখন তার নির্ধারিত সময় এসে পড়বে[১]। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত[২]।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۝

مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় ওঠাব। –সূরা তোয়া-হা, আয়াত নং ১২৪)

১. وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ...الخ — এটা সম্ভবত মুনাফিকদের উক্তি لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ এর উত্তর। বলা হচ্ছে যে, খরচ করার মধ্যে স্বয়ং তোমাদেরই মঙ্গল। দান-খয়রাত যা কিছু করার, তাড়াতাড়ি করে নাও, নতুবা মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়ালে আফসোস করবে যে, আমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলাম না। মৃত্যুর মুহূর্তে বখীল তামান্না করে বলবে, 'আয় প্রতিপালক! আরো কিছু দিনের জন্য আমার মৃত্যুকে পিছিয়ে দিলে আমি খুব দান-খয়রাত করে নেক বান্দা হয়ে হাযির হতে পারতাম।' কিন্তু তখন অবকাশের সুযোগ কোথায়? যার যে পরিমাণ বয়স লিখে দেওয়া হয়েছে এবং (মৃত্যুর) যে সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, তা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর এক মুহূর্তের অবকাশ ও দেরি হতে পারে না।

বি. দ্র. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ তামান্নাকে কিয়ামতের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন। অর্থাৎ হাশরের মাঠে উক্ত ব্যক্তি বলবে, হায়! আমাকে যদি দুনিয়াতে পুনরায় ফেরত পাঠানো হয়, তবে আমি খুব দান-খয়রাত করে নেক হয়ে আসব।

২. তিনি এও জানেন যে, যদি তোমার মৃত্যু পিছিয়ে দেওয়া হয় অথবা হাশরের মাঠ থেকে তোমাকে দুনিয়াতে পুনরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে তুমি কী আমল করবে? তিনি সকলের আভ্যন্তরীণ যোগ্যতা সম্বন্ধে জানেন এবং সকলের জাহেরী ও বাতেনী আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত আছেন। সেই মোতাবেক তিনি সবার সঙ্গে আচরণ করবেন।

সূরা তাগাবুন

সূরা ৬৪ । ১৮ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ

آياتها ۱۸، ركوعاتها ۲

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই[১]। আর তিনি সব বিষয়ে শক্তিমান।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

২. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ ঈমানদার[২]। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা ভাল করেই দেখেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

---

১. দুনিয়ায় যদি কারো রাজত্ব থাকে, তবে তা আল্লাহরই প্রদত্ত। আর যদি কারো প্রশংসা করা হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে তা তাঁরই প্রশংসা।

২. অর্থাৎ তিনিই সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য সকলের উচিত ছিল তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং এই প্রকৃত অনুগ্রহকারীর আনুগত্য করা। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, কতক মানুষ কাফের এবং কতক ঈমানদার। আল্লাহ তাআলা যদিও মানুষের মধ্যে উভয় দিকে যাওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা রেখেছিলেন, কিন্তু প্রথমে সকলকেই (فطرت صحيحة) সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতির উপর পয়দা করেছিলেন। তারপর কেউ এ স্বভাবের উপর কায়েম রইল, আর কেউ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করল।

আর এ ইলম আল্লাহর সর্বদাই ছিল যে, কে নিজ এরাদা ও ইখতিয়ারে কোন্ দিকে যাবে এবং পরে সে অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী হবে। এবং আল্লাহ তাআলা নিজ ইলম অনুযায়ী তার ভাগ্যে লিখেও দিয়েছিলেন যে, এমনটি হবে। তবে আল্লাহর সর্বব্যাপী ইলম এ বিষয়কে আবশ্যক করে না যে, দুনিয়াতে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি ও ইখতিয়ার-ক্ষমতা বাকী থাকবে না। (বরং একদিকে আল্লাহর রয়েছে সর্বব্যাপী অনাদি ইলম, অপরদিকে মানুষকে দেওয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি)

এ বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমরা এ সম্পর্কে একটি আলাদা নিবন্ধ লেখার ইচ্ছা রাখি। [আল্লাহ সাহায্যকারী ও তাওফীকদাতা]।

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং তোমাদের আকৃতি বানিয়েছেন ও তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন[১]। আর তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে তা তিনি জানেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আর আল্লাহ অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞাত।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৫. তোমাদের নিকট কি ওদের সংবাদ পৌঁছেনি যারা ইতিপূর্বে কাফের হয়েছে? অতঃপর ওরা নিজেদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে। আর ওদের জন্য রয়েছে যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৬. তা (শাস্তি) এজন্য যে, ওদের নিকট ওদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি নিয়ে আগমন করতেন, তখন ওরা বলত, 'একজন মানুষ কি আমাদের হেদায়েত দান করবে?' অতঃপর ওরা কাফের হল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল[৩]।

ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْۤا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ؕ

---

১. মানুষের আকৃতি সকল জীব-জন্তুর চেয়ে উৎকৃষ্ট। দেখায়ও সুন্দর এবং যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্যেও সমস্ত জগত থেকে স্বতন্ত্র; বরং সকলের সার ও সমন্বিত রূপ। এ জন্যই সূফিয়ায়ে কেরাম তাকে (عالَم صغير) ছোট্ট জগত বলে আখ্যায়িত করেন।

২. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে আদ, ছামূদ প্রভৃতি বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। আর আখেরাতের আযাব তো স্বতন্ত্রভাবে আছেই। আয়াতে মক্কাবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আমাদের মত একজন মানুষকেই কি পথপ্রদর্শক বানিয়ে পাঠানো হল? কাউকে পাঠানো যদি জরুরিই ছিল, তবে আসমান থেকে কোন ফেরেশতা কেন পাঠানো হল না?

ওদের নিকট যেন মানবত্ব ও রেসালাতের মধ্যে বিরোধ ছিল (অর্থাৎ মানুষ হলে রাসূল হওয়া যায় না!)। এ জন্যই ওরা কুফর অবলম্বন করল এবং রাসূলদের কথা মানতে অস্বীকার করল।

বি. দ্র. রাসূলকে যে ব্যক্তি মানুষ বলে সে কাফের– আলোচ্য আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা চরম মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা। এর উলটা কেউ যদি বলে যে, আলোচ্য আয়াত সেই লোকদের কাফের হওয়াকে প্রমাণ করে, যারা মানবজাতির রাসূলগণের মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে— কেউ এমন দাবি করলে এ দাবি প্রথমোক্ত দাবি থেকে অধিক শক্তিশালী হবে।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ⑥

আর আল্লাহও পরোয়া করেননি। আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার উপযুক্ত[১]।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۭ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑦

৭. কাফেররা দাবি করে, ওরা আদৌ পুনরুত্থিত হবে না[২]। আপনি বলুন, 'কেন হবে না?! আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে, তারপর তোমাদেরকে তোমরা যা-কিছু করেছ তা জানানো হবে। আর এ আল্লাহর জন্য সহজ[৩]।'

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ⑧

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং যে নূর আমি নাযিল করেছি তার প্রতি[৪] ঈমান আন। আর আল্লাহ তোমাদের আমলাদি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত[৫]।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۭ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ

৯. (স্মরণ কর), যেদিন তিনি তোমাদের একত্র করবেন (অর্থাৎ) সমবেত হওয়ার দিনে। তা হবে হার-জিতের দিন[৬]। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে, তিনি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে

---

১. অর্থাৎ আল্লাহর কী পরোয়া? ওরা মুখ ফিরিয়ে নিল, ফলে আল্লাহ তাআলা ওদিক থেকে রহমতের দৃষ্টি উঠিয়ে নিলেন।

২. রিসালাতের ন্যায় মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকেও ওরা অস্বীকার করে।

৩. অর্থাৎ পুনর্জীবিত করা এবং সকলের হিসাব-নিকাশ নেওয়া আল্লাহর জন্য কোন মুশকিল নয়। পূর্ণ বিশ্বাস রাখ, এ হবেই হবে। কারো অস্বীকার করায় এই নির্ধারিত বিষয়টি টলতে পারে না। অতএব অস্বীকার না করে বরং আখেরাত সম্পর্কে ফিকির করাই সমীচীন।

৪. অর্থাৎ কুরআন কারীমের প্রতি ।

৫. অর্থাৎ ঈমানের সাথে সাথে নেক আমলও থাকতে হবে।

৬. অর্থাৎ সেদিন দোযখীরা হারবে এবং জান্নাতীরা জিতবে। হারার অর্থ এই যে, আল্লাহর দেওয়া শক্তিসমূহের অপব্যবহার করে আসল পুঁজিও হারিয়েছে। আর জেতার অর্থ এই যে, সেগুলির সদ্ব্যবহার দ্বারা একটি নেকীর স্থলে হাজারো গুণ বেশি ছওয়াব লাভ করবে। সামনে এরই কিছু বিবরণ আসছে।

وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

দেবেন[১] এবং তাদের দাখিল করবেন উদ্যানরাজিতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। এ-ই মহা সাফল্য[২]।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩

১০. আর যারা কাফের হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, ওরা দোযখের অধিবাসী, যাতে ওরা চিরকাল থাকবে। আর (তা) কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

[রুকূ - ২]

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪

১১. যে বিপদই আপতিত হয়, তা আপতিত হয় আল্লাহর হুকুমেই। আর যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তিনি তার অন্তরকে পথ প্রদর্শন করেন[৩]। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত[৪]।

---

১. অর্থাৎ যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, ঈমান ও সৎকাজের বদলে তা মাফ করে দেওয়া হবে।

২. কারণ, যে ব্যক্তি জান্নাতে পৌঁছে গেল, তার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দীদারের স্থানও এই জান্নাতই।

৩. দুনিয়াতে আল্লাহর ইচ্ছা ও এরাদার বাইরে কোন বিপদ ও কষ্ট আসতে পারে না। মুমিনের যখন এ বিশ্বাস রয়েছে, তখন সে এতে দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হবে কেন? বরং সর্বাবস্থায় প্রকৃত মালিকের ফয়সালায় রাযী থাকা উচিত এবং নিম্ন কবিতার সাথে একাত্ম থাকা সমীচীন–

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت ÷ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

'তোমার তরবারিতে নিপাত যাওয়ার সৌভাগ্য দুশমনের যেন না হয়। তোমার খঞ্জর পরখ করার জন্য বন্ধুদের মাথা পাতা রয়েছে।'

এভাবে আল্লাহ তাআলা মুমিনের দিলকে ধৈর্য ও আত্মসমর্পণের রাস্তা দেখান, যারপর তার সামনে মারেফত ও ইয়াকীনের বিরল ও বিস্ময়কর পথসমূহ উদ্ভাসিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্মিক বিশেষ অবস্থার দরজা।'

৪. অর্থাৎ যে কষ্ট ও মুসীবত তিনি নাযিল করেন, তা পরিপূর্ণ ইলম ও হেকমত মোতাবেক নাযিল করেন। আর তিনিই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে সত্যিকার ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং সন্তুষ্টি ও আত্মসমর্পণের পথে চলে এবং এও জানেন যে, কার অন্তর কোন অবস্থা ও কাইফিয়াতের অবতরণ-স্থল হওয়ার যোগ্য।

১২. তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং মান্য কর রাসূলের আদেশ। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌছে দেওয়া[১]।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

১৩. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আর আল্লাহরই উপর ঈমানদারদের নির্ভর করা উচিত[২]।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ۝

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক[৩]। আর যদি

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

১. অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ও কষ্ট-আরাম— সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চল। যদি এরূপ না কর, তবে তোমাদেরই ক্ষতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ভাল ও মন্দ বুঝিয়ে নিজ দায়িত্ব আদায় করে দিয়েছেন। তোমাদের আনুগত্য বা নাফরমানিতে আল্লাহর কোন লাভ-লোকসান নেই।

২. অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনার স্থল ও মাবূদ একমাত্র তাঁরই পবিত্র সত্তা। অন্য কারো সত্তা না উপাসনার উপযুক্ত, আর না ভরসার যোগ্য।

৩. অনেক সময় মানুষ স্ত্রী ও সন্তানাদির ভালবাসা ও চিন্তা-ফিকিরে ফেঁসে গিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর বিধান ভুলে যায়। এসব বিষয়ের পিছনে পড়ে বহু অনিষ্ট কামাই করে এবং বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। স্ত্রী-সন্তানাদির আবদার রক্ষা ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তা তাকে কখনো অবসর দেয় না। এ জালে পতিত হয়ে সে (অনেক সময়) আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে পড়ে।

বলা বাহুল্য, পরিবার-পরিজন যদি এত বড় ক্ষতি ও লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাদের কখনো বন্ধু বলা যায় না। বরং তারা তার নিকৃষ্টতম দুশমন। আর তারা যে (উক্ত ক্ষেত্রে) দুশমন– এর অনুভূতিও অনেক সময় মানুষের হয় না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, এই দুশমনদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো এবং এমন পন্থা অবলম্বন করো না, যার ফলাফল হল- তাদের দুনিয়া বানানোর খাতিরে নিজের দীন বরবাদ করা।

সকল স্ত্রী ও সব সন্তান একরকম নয়

তবে আয়াতের অর্থ এই নয় যে, দুনিয়াতে সকল স্ত্রী ও সকল সন্তান এ ধরনেরই হয়। আল্লাহর বহু বান্দি এমনও আছে, যারা নিজ নিজ স্বামীর দীনের হেফাজত করে এবং নেক কাজকামে তাদের সহযোগিতা করে। আর কত সৌভাগ্যশালী সন্তানসন্ততি এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের পিতামাতার জন্য باقيات صالحات (বা স্থায়ী সৎকর্ম) প্রমাণিত হয়। جعلنا الله منهم بفضله ومنه

তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও ও ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[১]।

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

১৫. তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা প্রতিদান[২]।

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

১৬. অতএব আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর, শোন, মান্য কর[৩] এবং ব্যয় কর– নিজেদেরই কল্যাণের জন্য[৪]। আর নিজ নফসের লালসা থেকে যাদের রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম[৫]।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

১. অর্থাৎ তারা যদি (স্বীয় কর্মের মাধ্যমে) তোমাদের জন্য কষ্ট-চিন্তার কারণ হয় এবং তাতে তোমাদের দীনী বা পার্থিব ক্ষতি হয়ে যায়, তবে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তোমরা প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করে দিয়ো না এবং তাদের প্রতি অসংগত কঠোরতা করো না। এমন করলে দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা এলোমেলো হয়ে যাবে। অতএব শরী'য়ত ও সাধারণ বিচার-বুদ্ধির আলোকে যতদূর সম্ভব, তাদের মূর্খতাপূর্ণ আচরণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ কর এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিকে কাজে লাগাও। তোমাদের এই সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণের কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করবেন এবং তোমাদের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করে তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, কে এই নশ্বর ও অস্থায়ী বিষয়াদিতে ফেঁসে গিয়ে আখেরাতের স্থায়ী ও অবিনশ্বর নে'য়ামতসমূহ ভুলে যায়, আর কে এই উপায়-উপকরণকে নিজ আখেরাতের পাথেয়রূপে গ্রহণ করে এবং সেখানকার বিরাট প্রতিদানকে এখানকার ভোগ-বিলাস ও প্রিয় জিনিসপত্রের উপর অগ্রাধিকার দেয়।

৩. অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে যতদূর সম্ভব এই পরীক্ষায় দৃঢ়পদ থাক এবং তাঁর কথা শোন ও মান।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করলে তোমাদেরই মঙ্গল হবে।

৫. অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই সফলতা লাভ করে, যাকে আল্লাহ তাআলা অন্তরের লোভ থেকে রক্ষা করেন এবং লালসা ও বখিলি থেকে হেফাজত করেন।

إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা কয়েকগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন[১]। আর আল্লাহ খুবই গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল[২]—

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

১৮. দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়[৩]।

---

১. অর্থাৎ যদি আল্লাহর পথে এখলাস ও সৎ নিয়তে হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় কর, তবে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করবেন।

এ ধরনের আয়াত পূর্বে কয়েক স্থানে গত হয়েছে। সেথায় আমরা বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

২. شكور- অর্থাৎ স্বল্প আমলের জন্য তিনি অনেক ছওয়াব দান করেন। আর তিনি حليم (ধৈর্যশীল), ফলে গোনাহর কারণে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আযাব পাঠান না। আবার বহু অপরাধীকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দেন এবং অনেকের শাস্তি লাঘব করেন।

৩. অর্থাৎ তিনিই বান্দার জাহেরী আমল ও অন্তরের নিয়ত সম্পর্কে অবহিত। আর তিনি তাঁর মহা শক্তিমত্তা ও হেকমত দ্বারা আমল-নিয়ত অনুপাতে বিনিময় দেবেন।

সূরা তালাক

সূরা ৬৫ । ১২ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوعَاتُهَا ٢

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে নবী! 'তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও, তো তাদের তালাক দিয়ো ইদ্দতের পূর্বমুহূর্তে[১] এবং ইদ্দতের হিসাব রেখো[২]। আর আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের রব। তোমরা তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না[৩] এবং তারাও যেন বের না হয়, তবে তারা

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে সমস্ত উম্মতের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি (কোনো প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে) আপন স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তার কর্তব্য, ইদ্দতের পূর্বে তালাক দেওয়া। সূরা বাকারায় (আয়াত ১২৮) রয়েছে, তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয (যেমনটি হানাফী মাযহাবের বক্তব্য।) অতএব হায়েযের পূর্বে তুহূরের (পবিত্রতার) অবস্থায় তালাক দেওয়া উচিত, যাতে পরবর্তী হায়েযের পুরোটা ইদ্দতে গন্য করা যায়।

ধরা যাক, যদি হায়েযের অবস্থায় তালাক দেওয়া হয়, তবে দুটি অসুবিধার কোন একটির সম্মুখীন হতে হবে: যে হায়েযের মধ্যে তালাক দেওয়া হল, সেই হায়েযকে গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে অথবা হবে না। প্রথমাবস্থায়, তালাক দেওয়ার পূর্বে হায়েযের যতটুকু সময় গত হয়েছে, তা ইদ্দত থেকে কম হয়ে যাবে এবং ইদ্দতের তিন হায়েয পূর্ণ হবে না। আর দ্বিতীয় অবস্থায়, বর্তমান হায়েয ছাড়া আরো তিন হায়েয হবে, ফলে এ হায়েয তিন (হায়েয) থেকে অতিরিক্ত হবে। এ জন্য শরী'য়তসম্মত তরীকা হচ্ছে, তুহূরের মধ্যে অর্থাৎ পবিত্রাবস্থায় তালাক দেওয়া। আর হাদীছের আলোকে এ কথাও প্রমাণিত যে, এই তুহূরের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস না করে থাকতে হবে। (বুখারী, হাদীস ৫২৫১)

২. অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য ইদ্দত স্মরণ রাখা উচিত। গাফলত ও ভুলের কারণে কোনো অসতর্কতা যেন না হয়ে যায়। তদ্রূপ, তালাক এমনভাবে দেবে যেন ইদ্দত গণনায় বেশ-কম না হয়, যেমন: উপরের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করত শরী'য়তের হুকুম-আহকামের পাবন্দী করা উচিত। এসব হুকুমের কিছু এই- হায়েয অবস্থায় তালাক না দেওয়া, একসাথে তিন তালাক না দেওয়া এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তার ঘর থেকে বের করে না দেওয়া, প্রভৃতি।

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ①

প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা[১]। এগুলি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে কেউ আল্লাহর সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে[২]। সে জানে না[৩], হয়ত আল্লাহ তালাকের পর নতুন কোন উপায় পয়দা করে দেবেন[৪]।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗ

২. অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকাল (পূরণের) নিকটে পৌঁছবে, তখন হয় নিয়ম মত তাদের রেখে দেবে অথবা নিয়ম মত তাদের ছেড়ে দেবে[৫] এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুজন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে[৬]। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে

---

১. অর্থাৎ স্ত্রীরা নিজেরাও আপন ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়ে চলে যাবে না। কারণ, ঘরে আবদ্ধ থাকার এ ব্যবস্থা শুধু বান্দার অধিকার নয় যে, তার ইচ্ছায় বাতিল হয়ে যাবে; বরং এ শরী'য়তের হুকুম। হাঁ, যদি স্ত্রীরা কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ আচরণ করে, যেমন ব্যভিচার করে, চুরি করে; অথবা– কোন কোন আলেমের মতে – যদি তারা বাগ্‌বিতণ্ডা করে ও সর্বদা অশান্তি সৃষ্টি করে রাখে— তবে তাদের বের করে দেওয়া জায়েয। আর যদি তারা বিনা কারণে বের হয়ে যায়, তবে স্বয়ং এ কাজ সুস্পষ্ট নির্লজ্জতার কাজ বলে গণ্য হবে।

২. অর্থাৎ পাপী হয়ে আল্লাহর দরবারে শাস্তির যোগ্য হয়।

৩. لَا تَدْرِيْ এর তরজমা 'সে জানে না' তৃতীয় পুরুষের শব্দ দ্বারা করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, এখানে সম্বোধন মূলত তালাকদাতার প্রতি, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নয়।

৪. অর্থাৎ হয়ত আবার উভয়ের মধ্যে মিল হয়ে যাবে এবং তালাকের কারণে অনুশোচনা হবে।

৫. অর্থাৎ 'রাজঈ' তথা প্রত্যাহারযোগ্য তালাকে যখন ইদ্দত শেষ হয়, তখন তোমাদের জন্য দুটি বিষয়ের যে কোন একটির ইখতিয়ার আছে। এক, হয় ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে দস্তুর মত ফিরিয়ে নিজ বিবাহে রাখবে। দুই, না হয় ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ভদ্রভাবে তাকে পৃথক করে দেবে। মোটকথা, রাখতে হয় বা ছাড়তে হয়— সর্বাবস্থায় মানবিকতা ও ভদ্রতার ব্যবহার করবে। এমন যেন না হয় যে, বিবাহে রাখা উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু অযথা ইদ্দত বিলম্বিত করার জন্য ফিরিয়ে নিলে। অথবা রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে কষ্ট দিলে এবং কটু কথা বললে।

৬. অর্থাৎ তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি বিবাহে রাখতে চায়, তবে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সময় দুজন সাক্ষী রাখবে, যাতে মানুষের অপবাদের সম্মুখীন না হতে হয়।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝

সঠিকভাবে সাক্ষ্য দিয়ো[১]। এর দ্বারা সেই ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে[২]। আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার জন্য (সঙ্কট থেকে) বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেবেন[৩]—

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

৩. এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দেবেন যা সে ধারণাও করবে না[৪]।

---

১. এতে সাক্ষীদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, সাক্ষ্য দানের সময় তারা যেন উলটা-পালটা কথা না বলে, বরং সত্য-সোজা কথা বলে।

২. ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগে স্ত্রীদের উপর বহু জুলুম-অত্যাচার হত। পুরুষেরা তাদের গরু-মহিষ বা অত্যন্ত হীন ও অক্ষম বন্দীদের ন্যায় মনে করত। কোন কোন পুরুষ স্ত্রীকে শত শত বার তালাক দিত, এর পরও তার কষ্টের শেষ ছিল না। পবিত্র কুরআন স্থানে স্থানে এসব বর্বর আচরণ ও নির্দয় ব্যবহারের জোরদার প্রতিবাদ করেছে, সেই সাথে বিবাহ ও তালাকের নীতিমালা ও সীমা-রেখা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছে। বিশেষত এ বিষয়ে অন্যান্য হেকমতপূর্ণ হেদায়াত ও নসীহত ছাড়াও অতীব جامع ومانع (ব্যাপক অর্থপূর্ণ) এবং সর্বদিক থেকে উপকারী একটি উসূল (মূলনীতি) এই দিয়েছে– فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ যার সারকথা এই যে, তাদের যদি রাখ তবে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে রাখ এবং যদি ছাড় তবু ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ছাড়।

তবে এসব অমূল্য নসীহতের দ্বারা সে ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারে, যার আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস আছে। কারণ, এ বিশ্বাসই মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহ-ভীতি পয়দা করে এবং এ ভয়ের কারণেই মানুষের এ চিন্তা হয় যে, যেমনিভাবে এক দুর্বল স্ত্রী সৌভাগ্য ও ঘটনাক্রমে আমাদের অধীনে এসে গেছে, তেমনি আমরা সকলেও এক মহাশক্তিশালী সত্তার মুঠিতে ও শাসনাধীনে আছি। এই একটি মাত্র চিন্তাই মানুষকে সর্বাবস্থায় জুলুম ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাবহ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যই আলোচ্য সূরার মধ্যে বিশেষভাবে তাকওয়া-পরহেযগারী ও খোদাভীতির বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করে চল, চাই যতই অসুবিধা ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হোক না কেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা সমস্ত অসুবিধা থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ থেকে মুক্তির উপায় করে দেবেন।

৪. تقوى তথা আল্লাহর ভয় হচ্ছে ইহ ও পরকালীন সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং সমস্ত সফলতার মাধ্যম। এর দ্বারাই সকল মুশকিল আসান হয়, ধারণা-চিন্তার বাইরে থেকে রিযিক লাভ হয়,

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَحَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا۝

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করে রেখেছেন একটা পরিমাণ[১]।

وَالّٰٓـِٔیْ یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔیْ لَمْ یَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ یَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ یُسْرًا۝

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা 'হায়েয' থেকে নিরাশ হয়ে যাবে— তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকলে— তাদের ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস। এবং যারা এখনো ঋতুমতী হয়নি, (তাদেরও এই বিধান)[২]। আর যারা গর্ভবতী, তাদের ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব করা[৩]। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার কাজের মধ্যে আসানী পয়দা করে দেবেন।

গোনাহ মাফ হয়, প্রতিদান বৃদ্ধি পায়, জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায় এবং এক ধরনের বিস্ময়কর আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা নসীব হয়, যার পর কোনো কষ্ট কষ্টই থাকে না এবং সকল পেরেশানী ভিতরে ভিতরেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এক হাদীছে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি সমস্ত দুনিয়ার মানুষ এই আয়াতখানিকে আঁকড়ে ধরে, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২১৫৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৬৬৯)

১. অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, শুধু দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করো না। আল্লাহর কুদরত এসব আসবাবের অনুগত নয়। যে কাজ তাঁর করার, তা পূর্ণ হয়েই থাকে। আর আসবাবও তাঁরই ইচ্ছার অধীন। তবে তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসের একটি সময়-সীমা আছে, সে অনুযায়ীই তার প্রকাশ ঘটে। এ জন্য কোন জিনিস পেতে দেরী হলে আল্লাহর উপর ভরসাকারীর পেরেশান হওয়া সমীচীন নয়।

২. অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দত কুরআনে তিন হায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। এখন যদি কারো সন্দেহ হয়, যার হায়েয আসা শুরুই হয়নি বা বয়োবৃদ্ধা হওয়ার দরুণ তা বন্ধ হয়ে গেছে, তার ইদ্দত কী হবে? তবে তার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, এমন নারীর ইদ্দত তিন মাস।

৩. (অধিকাংশ) আলিমদের নিকট গর্ভবতীর ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত, চাই প্রসব তালাকের এক মিনিট পরে হয়ে যাক অথবা দীর্ঘ সময় পরেই হোক। এ ব্যাপারে তালাকপ্রাপ্ত ও স্বামীবিয়োগিনী (বা বিধবা) উভয়ের একই হুকুম। হাদীছে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২১১০৮, ফাতহুল বারী ৮/৫২২)

৫. এ আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তিনি তার থেকে তার পাপগুলো দূর করে দেবেন এবং তাকে দান করবেন মহাপ্রতিদান[১]।	ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ۝
৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সেখানে বাস করাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস কর[২] এবং তাদের এ উদ্দেশ্যে কষ্ট	اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا

১. দু এক বাক্যের পর পর তাকওয়া ও আল্লাহ-ভীতির বিষয়টি বিভিন্নভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে কুরআনের পাঠক প্রতিবারেই সতর্ক হয় যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে তাকওয়ার প্রয়োজন অত্যধিক।

২. **তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর 'সুকনা-নফ্কা' (বাসস্থান ও খোরপোশ)**

তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তার ইদ্দতকাল পর্যন্ত থাকার জন্য বাসস্থান দেওয়া স্বামীর উপর জরুরী (একে 'সুকনা' বলা হয়।) আর যখন 'সুকনা' ওয়াজিব, তখন 'নাফাকা' বা খোরপোশও স্বামীর যিম্মায় থাকা উচিত। কারণ, স্ত্রীকে এতগুলো দিন তারই কারণে বাড়িতে আবদ্ধ ও বন্দী থাকতে হচ্ছে। কুরআন করীমের বর্তমান আয়াত– مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ এর মধ্যেও এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাকে নিজের সামর্থ্য ও অবস্থা অনুযায়ী নিজের বাড়িতে রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, সামর্থ্য অনুযায়ী রাখার মধ্যে এ বিষয়ও আছে যে, তার খোরপোশের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা স্বামীকে করতে হবে। তাইতো ইবনে মাসউদ (রা)-এর মুসহাফে এ আয়াত এরূপ ছিল– اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِّنْ وُّجْدِكُمْ (রূহুল মাআনী ২৮/১৩৯)

উক্ত হুকুম সব রকম তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর জন্য

হানাফী মাযহাবে সুকনা ও নফকার (বাসস্থান ও খোরপোশের) এ হুকুম সব রকম তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য প্রযোজ্য, শুধু প্রত্যাবর্তনযোগ্য (রাজ'ঈ) তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, (এ স্থলে) পূর্ব থেকে যে আলোচনা চলে এসেছে, অর্থাৎ হায়েয থেকে নিরাশ স্ত্রী, অল্পবয়স্কা স্ত্রী ও গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দতের বিষয়— এটি সব রকম তালাকপ্রাপ্তার জন্য। অতএব নফকা ও সুকনার বিষয় শুধু প্রত্যাবর্তনযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার (مطلقة رجعية) সাথে সীমাবদ্ধ হবে কেন?

একটি হাদীসের পর্যালোচনা

বাকি রইল ফাতেমা বিনতে কাইসের হাদীস, যাতে তিনি বলেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সুকনা ও নফকা দেওয়াননি। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৮০)

দিয়ো না যে, তাদের কোণঠাসা করে ফেলবে[১]। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে

عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ

এর উত্তর এই যে, প্রথমত—উমর ফারুক (রা), আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং অন্য সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁর এ কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং ফারুকে আজম তো এতদূর বলে দিয়েছেন যে, 'আমরা একজন স্ত্রীলোকের কথায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ (আদর্শ) ছাড়তে পারি না। আমাদের জানা নেই যে, এই স্ত্রীলোক কি ভুলে গেছে, না স্মরণে রেখেছে? (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৮০) বোঝা গেল যে, ফারুকে আজম (রা) কিতাবুল্লাহ থেকে এ কথাই বুঝেছেন যে, তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য নফকা ও সুকনা ওয়াজিব এবং এর সমর্থনে তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীসও বিদ্যমান ছিল। যেমন: তাহাবী (৪৫২৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ কিছু রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে হযরত উমর (রা) স্পষ্টই বর্ণনা করেছেন যে, 'এ কথা আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।' আর 'দারাকুতনী' এ বিষয়ে জাবের (রা)-এর একখানি স্পষ্ট হাদীসও উল্লেখ করেছেন। তবে এর বর্ণনাকারীদের কারো কারো ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে এবং হাদীসখানি কি 'মারফূ' ' না 'মাওকূফ'—এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এখানে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে কাইসের জন্য সুকনার (বাসস্থানের) ব্যবস্থা এজন্য করেননি যে, তিনি তাঁর শ্বশুরালয়ের মানুষের সঙ্গে বচসা করতেন ও শক্ত কথাবার্তা বলতেন, যেমনটি কিছু বর্ণনায় রয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ, বর্ণনা ২২৯৪) সে জন্যই তাকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন তিনি স্বামীর ঘর থেকে চলে যান। এখন যখন সুকনা থাকল না, তখন নফকাও বাদ গেল, যেমন স্বামীর সঙ্গে নাফরমানী করে ঘর থেকে বহির্গমনকারী স্ত্রী ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার নফকা বাদ যায় (আল্লামা রাযী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন)।

আর তিরমিযী শরীফ (১১৬৬) প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে আছে, তাকে আহারের জন্য খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেই পরিমাণ থেকে আরো অধিক চেয়েছিলেন, যা মঞ্জুর হয়নি। অতএব হাদীসের অর্থ এই হবে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে যা দেওয়া হচ্ছিল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অধিক নফকা মঞ্জুর করেননি (আল্লাহই সঠিক জানেন)।

তবে স্মর্তব্য যে, নাসায়ী (৩৪০৩), তবারানী (মুজামে কাবীর, হাদীস : ৯৩৮) ও মুসনাদে আহমদ-এর কোন কোন হাদীছে ফাতেমা বিনতে কাইস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিষ্কার ইরশাদ উল্লেখ করেছেন যে, সুকনা ও নফকা একমাত্র সেই তালাকপ্রাপ্ত মহিলার জন্য, যাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তবে এ জাতীয় বর্ণনাসমূহের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। 'হিদায়া'র তাখ্রীজ 'নাস্‌বুর রায়া'তে যাইলাঈ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ কষ্ট দিয়ো না, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

فَاَنۡفِقُوۡا عَلَيۡهِنَّ حَتّٰى يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ ۚ وَاۡتَمِرُوۡا بَيۡنَكُمۡ بِمَعۡرُوۡفٍ ۚ وَاِنۡ تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهٗۤ اُخۡرٰى ؕ

তাদের জন্য ব্যয় কর তারা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত[১]। অতঃপর যদি তারা তোমাদের খাতিরে দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের বিনিময় দিয়ো। আর (এ ব্যাপারে) পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতভাবে পরামর্শ করবে[২]। আর যদি তোমাদের পরস্পরে বিবাদ হয়, তবে তার জন্য অন্য কোন নারী দুধ পান করাবে[৩]।

لِيُنۡفِقۡ ذُوۡ سَعَةٍ مِّنۡ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنۡ قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهٗ فَلۡيُنۡفِقۡ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجۡعَلُ اللّٰهُ بَعۡدَ عُسۡرٍ يُّسۡرًا ۟

৭. সচ্ছল ব্যক্তি স্বীয় সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার রিযিক সীমিত করে দেওয়া হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা থেকেই ব্যয় করবে। আল্লাহ একজন ব্যক্তির উপর ততটুকুরই দায়ভার চাপান, যতটুকু তিনি তাকে দান করেছেন। আল্লাহ শীঘ্রই কষ্টের পর আসানী সৃষ্টি করে দেবেন[৪]।

---

১. গর্ভধারণের মেয়াদ কখনো অনেক দীর্ঘ হয়। অতএব বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, (গর্ভকাল) যতই দীর্ঘ হোক, সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাকে খোরপোশ দিতে হবে। এমন করা যাবে না যে, তিন মাস দিয়ে তা বন্ধ করে দিলে।

২. অর্থাৎ সন্তান প্রসবের পর যদি স্ত্রী তোমাদের খাতিরে সন্তানকে দুধ পান করায়, তবে যে পারিশ্রমিক অন্য কোন দুধদাত্রীকে দিতে, তা তাকে দাও এবং সঙ্গতভাবে দস্তুর অনুযায়ী পরস্পর পরামর্শ করে পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করে নাও, অযথা জিদ ও বক্রতা অবলম্বন করো না। বরং একে অন্যের সঙ্গে সৌজন্য ও ভদ্রতার ব্যবহার করবে। স্ত্রীও দুধ পান করাতে অস্বীকার করবে না, স্বামীও বিনা কারণে তাকে বাদ দিয়ে অন্য মহিলা দিয়ে পান করাবে না।

৩. অর্থাৎ যদি পরস্পর জিদাজেদি ও ঝগড়ার কারণে স্ত্রী দুধ পান করাতে রাযী না হয়, তবে বিষয়টি তারই উপর নির্ভরশীল নয়, অন্য কোন দুধদাত্রী পাওয়া যাবে। অতএব তার এতটা অহংকার করা উচিত নয়। আর যদি পুরুষ বাচ্চাকে অযথা তার মায়ের দুধ পান করাতে না চায়, তবে অন্য কোন নারী বাচ্চাকে দুধ পান করাবে। তখন তাকেও তো কিছু দিতে হবে। তাহলে বাচ্চার মাকেই তা দিতে সমস্যা কোথায়?

৪. অর্থাৎ সন্তানের লালন-পালনের ব্যয়ভার পিতার উপর। স্বচ্ছল পিতাকে তার সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অসচ্ছল পিতাকে তার অবস্থা মাফিক ব্যয় করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তির প্রাচুর্য না থাকে, নিতান্ত পরিমিত জীবিকা আল্লাহ তাকে দিয়ে থাকেন, তবে তা থেকেই সে

[রুকূ - ২]

৮. এমন কত জনপদ আছে, যেগুলি (অর্থাৎ তার অধিবাসীরা) আপন রব ও তাঁর রাসূলগণের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিল, ফলে আমি ওদের কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং ওদের এমন শাস্তি দিয়েছি যা পূর্বে দেখা যায়নি[১]।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۙ وَعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ⑧

৯. এভাবে ওরা নিজেদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল, আর ক্ষতিই ছিল ওদের কর্মের পরিণাম[২]।

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ⑨

১০. আল্লাহ ওদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি[৩]। অতএব আল্লাহকে ভয় করে চল হে বুদ্ধিমানেরা, যারা ঈমান এনেছ[৪]। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন 'যিক্র'[৫]—

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓأُولِى الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ اٰمَنُوا ۚ قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ⑩

নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আল্লাহ তাআলা কাউকেই তার সামর্থ্যের বাইরে ব্যয় করতে বাধ্য করেন না। যখন অসচ্ছল অবস্থায় তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করবে, তখন তিনি অসচ্ছলতা ও অভাবকে সচ্ছলতা ও আসানীতে পরিবর্তিত করে দেবেন।

১. অর্থাৎ শরী'য়তের আহকাম পরিপূর্ণরূপে পালন করে চল (বিশেষ করে স্ত্রীদের সম্পর্কে)। যদি নাফরমানী কর, তবে স্মরণ রেখো—কত কত বসতিকে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। যখন তার বাসিন্দারা অহংকার করে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তখন ওদের হিসাব নিয়েছি এবং এমন শক্ত হাতে নিয়েছি যে, একটি অসৎ কর্মও মাফ করিনি। অতঃপর ওদের এমন শাস্তিতে পাকড়াও করেছি, যা চোখ কখনো দেখেনি।

২. অর্থাৎ ওরা জীবনভর যে কারবার (দুরাচার-পাপাচার) করেছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত দারুণ লোকসান পোহাতে হয়েছে এবং ওদের যে পুঁজি ছিল তা সবই হারাতে হয়েছে।

৩. প্রথমে পার্থিব আযাবের উল্লেখ ছিল, এ হল পরকালীন আযাবের বর্ণনা।

৪. অর্থাৎ এসব সতর্কতামূলক ঘটনা শুনে বুদ্ধিমান ঈমানদারদের এ ভয় করতে থাকা উচিত যে, আমাদের দ্বারা যেন কখনো এমন অন্যায় আচরণ সংঘটিত না হয়, যদ্দরুণ আমরা আল্লাহর পাকড়াও-এর সম্মুখীন হই।

৫. অর্থাৎ কুরআন। অথবা ذكر যদি ذاكر এর অর্থে হয়ে থাকে, তবে উদ্দেশ্য হবেন স্বয়ং রাসূল।

১১. একজন রাসূল, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনান[১], যাতে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন[২]। আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তিনি তাদের দাখিল করবেন উদ্যানরাজিতে, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, যাতে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জন্য উত্তম রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন[৩]।

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

১২. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং তার অনুরূপ যমীনও–[৪] এগুলির

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ

---

১. مبينات- অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যেগুলির মধ্যে আল্লাহর বিধি-বিধান স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বয়ান করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ কুফর ও মূর্খতার অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান, ইলম ও আমলের আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

৩. জান্নাতের চেয়ে উত্তম রুযী কোথায় পাওয়া যাবে?

৪. অর্থাৎ যমীনও তিনি সাতটি তৈরি করেছেন, যেমন জামে তিরমিযী (৩৫৮৩) প্রভৃতি কিতাবের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এসব যমীনের ব্যাপারে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে— হয় সেসব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অথবা দৃষ্টিগোচর হয় বটে, তবে সেগুলি বিভিন্ন كواكب তথা গ্রহ নামে অভিহিত হয়। যেমন: মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকদের ধারণা এই যে, ওতে পাহাড়, সমুদ্র ও বসতি রয়েছে।

অবশ্য হাদীসে যে আছে— সেই যমীনগুলো এ পৃথিবীর নীচে আছে, (তাফসীরে তবারী ২৩/৮০-৮১) তা সম্ভবত কোন কোন অবস্থার দিক থেকে। আর কোন কোন অবস্থায় সেগুলোর অবস্থান এ পৃথিবীর উর্ধ্বে হয়ে যায়।

এখন রইল হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস,যার মধ্যে রয়েছে– آدمهم كآدمكم তো এর ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়। তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'-তে এ বিষয়ে জরুরত পরিমাণ আলোচনা করা হয়েছে। আর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র)-এর কিছু পুস্তিকাতে এ বিষয়ের কোন কোন দিককে খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۟

মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়[১]— যাতে তোমরা জানতে পার, আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে[২]।

১. অর্থাৎ বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাকবীনি আহকাম (তথা সৃষ্টিসম্পর্কিত ফয়সালাসমূহ) ও তাশরীঈ আহকাম (অর্থাৎ শরঈ বিধিবিধান) আসমানসমূহে ও যমীনগুলিতে অবতীর্ণ হতে থাকে।

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার এবং এগুলির মধ্যে ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত হুকুম-আহকাম জারি করার উদ্দেশ্য হল, যাতে আল্লাহ তাআলার (দুটি গুণ অর্থাৎ) ইলমের গুণ ও কুদরতের গুণ প্রকাশিত হয়। 'বাদাইউল ফাওয়াইদ'– গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) এটা স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহর বাকি সিফাতগুলি উক্ত দুই সিফাতের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্ক রাখে। সূফী-সাধকগণ যে একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন– كُنْتُ كنْزًا مخفيا فاحببتُ أن أُعرف (আমি ছিলাম গুপ্ত ভাণ্ডার, অতঃপর নিজেকে পরিচিত করতে চাইলাম।) যদিও এটা মুহাদ্দিছীনের নিকট সহীহ নয়, তবে এর বিষয়বস্তু সম্ভবত বর্তমান আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে সংগৃহীত

সূরা তাহরীম

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৬৬ । ১২ আয়াত । ২ রুকূ । মাদানী

آيَاتُهَا ١٢، رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ

১. হে নবী[১]! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি তা হারাম করেন কেন?

---

১. **শানে নুযূল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাদি**

সূরা 'আহযাব' এর তাফসীরে আলোচিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের দিকে-দিকে বিজয় দান করলেন, লোকেরা সচ্ছল ও পরিতৃপ্ত হল, তখন নবী-বিবিগণেরও খেয়াল হল যে, তাঁরা কেন সচ্ছল ও পরিতৃপ্ত হবেন না? সে মত তাঁরা সকলে মিলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক নফকার (খোরপোশের) দাবি শুরু করলেন। সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীছে (১৪৭৮) আছে– وهُنَّ حَوْلِي يَطْلُبْنَنِي النَّفَقَة এবং বুখারী শরীফের 'মানাকেব' অধ্যায়ে (হাদীস : ৩৬৮৩) রয়েছে– وَحَوْلَه نِسْوَةٌ يُكَلِّمْنَه وَيَسْتَكْثِرْنَه —এতে হযরত আবু বকর (রা) (স্বীয় কন্যা) আয়েশা (রা)-কে ও হযরত উমর (রা) (তাঁর কন্যা) হাফসা (রা)-কে শাসালেন। শেষ পর্যন্ত নবী-পত্নীগণ ওয়াদা করলেন, ভবিষ্যতে তাঁরা কখনো তাঁর নিকট এমন জিনিসের দাবি করবেন না, যা তাঁর কাছে নেই।

তবুও বিভিন্ন ঘটনা এমন ঘটতে থাকল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বিবিগণ থেকে এক মাসের জন্য 'ঈলা' (দূরে বাস) করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা 'আহযাব' -এ 'তাখয়ীর' (এখতিয়ার দান) এর আয়াত (২৮-২৯) নাযিল হয়ে এ ঘটনার পরিসমাপ্তি করে দিল।

মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র তবী'য়তকে পীড়া দেয়। আসল কথা কী, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর পত্নীদের যে ভালবাসা ও গভীর সম্পর্ক ছিল, তাতে স্বাভাবিকভাবেই বিবিদের পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেক বিবির কামনা ও প্রচেষ্টা ছিল, তিনি যেন বেশি থেকে বেশি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদৃষ্টি ও ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেন এবং এভাবে উভয় জাহানের ফুয়ূয ও বারাকাত লাভে ধন্য হন। পুরুষের জন্য এ হচ্ছে এক পরীক্ষার স্পর্শকাতর ক্ষেত্র, যেখানে সংযম, বিচক্ষণতা, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে তার পরীক্ষা হয়। এই স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সে রকমই অবিচলতা-দৃঢ়তা পাওয়া গেল, যেমনটি নবী-সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত থেকে আশা করা যেত।

আপনি স্বীয় স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চান[১]। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[২]।	تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, আসরের পর সকল বিবির নিকট স্বল্প সময়ের জন্য তশরীফ নিয়ে যাওয়া। একদিন হযরত যায়নাব (রা)-এর ঘরে একটু দেরি হয়ে যায়। পরে জানা গেল, তিনি পান করার জন্য মধু পেশ করায় সেখানে দেরি হয়। অতঃপর কয়েক দিন এ অবস্থা চলতে থাকে। এতে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত হাফসা (রা) এক কৌশল করলেন, যাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে মধুপান ত্যাগ করেন। তিনি তা ত্যাগ করলেন এবং হাফসা (রা)-কে বললেন, 'আমি যায়নাবের ঘরে মধু পান করেছিলাম, কিন্তু এখন কসম করছি, আর পান করব না।' হযরত যায়নাব (রা) এ কথা শুনলে অযথা মণঃক্ষুণ্ন হবেন ভেবে তিনি হাফসা (রা)-কে এ কথা কাউকে জানাতে নিষেধ করে দিলেন।

ঠিক এ ধরনের আরেকটি ঘটনা (নবী-পত্নী) মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর সাথে ঘটে (যাঁর গর্ভে নবী-পুত্র ইবরাহীম (রা)-এর জন্ম হয়েছিল।) এ ঘটনায়ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বিবিদের খাতিরে কসম করে বসেন যে, তিনি মারিয়ার নিকট যাবেন না। এ কথাও তিনি হাফসা (রা)-এর সামনে বলেছিলেন এবং অন্যদের কাছে তা প্রকাশ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

হযরত হাফসা (রা) এসব ঘটনা চুপে চুপে হযরত আয়েশা (রা)-কে জানিয়ে দিলেন এবং এও বলে দিলেন, আর কাউকে যেন না বলেন। ওদিকে আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা জানিয়ে দিলেন। তিনি হাফসা (রা)-কে বললেন, 'তুমি অমুক বিষয় আয়েশাকে জানিয়ে দিলে, অথচ তোমাকে নিষেধ করেছিলাম।' তিনি আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন- 'আপনাকে কে বলেছে?' সম্ভবত তাঁর ধারণা আয়েশা (রা) এর দিকে গিয়ে থাকবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৯১২, ৪৯১৩; ফাতহুল বারী : ৯/২৮৯; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : তাফসীরে তাবারী : ২৩/৮৮)

১. হালালকে নিজের জন্য হারাম করার অর্থ এই যে, ওই বস্তুকে হালাল ও মুবাহ বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নবীজি (সা) কসম করে ফেলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তা ব্যবহার করবেন না। কোন কল্যাণহেতু এমনটি করা শরী'য়তে জায়েয। তবে এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ শানের অনুকূল ছিল না যে, কতক বিবির সন্তুষ্টির জন্য এমন আদর্শ স্থাপন করবেন, যা ভবিষ্যতে উম্মতের জন্য সংকীর্ণতার কারণ হতে পারে। এজন্য আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিলেন যে, বিবিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, তবে এতদূর পর্যন্ত নয় যে, তাঁদের কারণে একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করে কষ্ট পোহাবেন।

২. এ কারণেই তিনি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। আর আপনার দ্বারা তো কোন গোনাহ হয়নি। শুধু এমন একটি কাজ হয়েছে, যা আপনার শান অনুপাতে অনুত্তম।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

২. আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় কসম থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তো তোমাদের অভিভাবক। এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান[১]।

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۚ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৩. (স্মরণ কর), যখন নবী তাঁর কোন এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বললেন। তার পর যখন সেই স্ত্রী তা (অন্যকে) বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে এটা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী তার কিছু জানালেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন। আর যখন তিনি সেই স্ত্রীকে তা জানালেন, সে বলল, 'আপনাকে এটা কে বলল?' তিনি বললেন, 'আমাকে বলেছেন সেই সত্তা, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত[২]।'

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজ ইলম ও হেকমত অনুযায়ী তোমাদের জন্য সংগত আহকাম ও হেদায়াত পাঠিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে, কেউ অসংগত বিষয়ে কসম খেয়ে ফেললে কাফ্ফারা (যার বিবরণ সূরা মায়েদার মধ্যে আছে) আদায় করে নিজ কসম ভাঙ্গতে পারে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'কেউ যদি নিজ ধন-সম্পদ সম্পর্কে বলে, এ আমার জন্য হারাম, তবে কসম হয়ে যাবে। অতএব কাফ্ফারা দিয়ে তা ব্যবহার করবে। খাদ্যদ্রব্য হোক, পোশাক-পরিচ্ছদ হোক বা দাসী হোক। (হানাফী মাযহাবে মাসআলা এটাই।)

২. সূরার শুরুতে আমরা মধু ও হযরত মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছি। বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মানুষ কোন বিষয় গোপন করার যতই চেষ্টা করুক, আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাইলে তা কখনো গোপন থাকতে পারে না। এখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম ব্যবহার ও উদার স্বভাবেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, কারও দ্বারা নিজ তবী'য়তের খেলাফ কাজ হয়ে গেলেও তিনি খুবই উদার আচরণ করতেন এবং ক্ষমা-সুন্দর উপায়ে বিষয়টি এড়িয়ে যেতেন। অভিযোগের স্থলেও দোষী ব্যক্তিকে পুরা দোষ দিতেন না।

عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ

'মুযেহুল কুরআন'-এ আছে, কেউ কেউ বলেন, '(হযরত মারিয়া কিবতিয়ার) গৃহে যাওয়া মওকূফ করার বিষয়টি নবীজি হযরত হাফসার নিকট বলেছিলেন এবং অন্য কাউকে তা জানাতে নিষেধ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি আরেকটি কথাও বলেছিলেন।

৪. যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তওবা কর, তবে (এ-ই করা উচিত, যেহেতু) তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে[১]। আর যদি তোমরা তাঁর উপর চড়াও হও, তবে (জেনে রাখ)– আল্লাহ, জিবরাঈল ও পুণ্যবান ঈমানদারগণ তাঁর বন্ধু; তা ছাড়া ফেরেশতাগণ (তাঁর) সাহায্যকারী[২]।

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَمَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝

কিন্তু হযরত হাফসা সব কথাই হযরত আয়েশাকে জানিয়ে দিলেন। কারণ, উভয় কথার মধ্যে দুজনেরই স্বার্থ ছিল। অতঃপর ওহীসূত্রে জ্ঞাত হয়ে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মারিয়া কিবতিয়ার) গৃহে না যাওয়ার কথাটি জানিয়ে দেওয়ায় বিবি হাফসাকে দোষারোপ করলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয় উল্লেখই করেননি। সেই দ্বিতীয় বিষয়টি কী ছিল? সম্ভবত এই ছিল যে, 'তোমার পিতা আয়েশা (রা)-এর পিতার পর খলীফা হবে।' الغيب عند الله (গায়বের খবর আল্লাহরই জানা)। যে বিষয় আল্লাহ ও রাসূল এড়িয়ে গেছেন, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কী? নবীজী তো এজন্যই এড়িয়ে গেছেন, যাতে নিষ্প্রয়োজনে সে বিষয়ের চর্চা না হয় এবং অন্যরা খারাপ না ভাবে।'

খেলাফতের উক্ত বিষয়টি কোন কোন যয়ীফ রেওয়ায়াতে এসেছে, যা কতক শিয়া আলেমও গ্রহণ করেছেন। (মুজামে কাবীর তবারানী, বর্ণনা ১২৬৪০; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪১৬)

১. এখানে আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তওবা কর তবে এ অবশ্যই তওবার ক্ষেত্র। কারণ, তোমাদের অন্তর ভারসাম্যের পথ থেকে সরে গিয়ে একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। অতএব ভবিষ্যতে এ ধরনের ভারসাম্যহীনতা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

২. স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক ব্যাপার কখনো প্রথমে খুব মামুলি ও নগণ্য মনে হয়। কিন্তু লাগাম ঢিল দিয়ে রাখা হলে পরিণামে অত্যন্ত জটিল ও মারাত্মক আকার ধারণ করে। বিশেষত স্ত্রী যদি কোন উঁচু বংশের হয়, তবে স্বভাবতই তার মধ্যে নিজ বাপ-ভাই ও বংশের গর্ববোধ থাকতে পারে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের সতর্ক করে বলে দিলেন— দেখ, তোমরা যদি এ রকমেরই আচরণ করতে থাক, তবে মনে রেখো, এতে পয়গম্বরের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং ধাপে ধাপে পুণ্যাত্মা মুমিনগণ যাঁর বন্ধু ও সহায়, তাঁর বিরুদ্ধে কোন মানবীয় কলাকৌশল সফল হতে পারে না। হাঁ, তোমাদের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

বি. দ্র. কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী صالح المؤمنين এর তাফসীরে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর নাম নিয়েছেন। সম্ভবত আয়াতগুলো আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাঁরা এ তাফসীর করেছেন।

৫. যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে এখনি তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে এমন স্ত্রী দান করবেন, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম- আজ্ঞাবহ, মুমিন, নামায আদায়কারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, রোযা পালনকারী, বিধবা ও কুমারী[১]।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا۝

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর[২]। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাববিশিষ্ট ও শক্তিশালী ফেরেশতাগণ[৩]। তারা আল্লাহ তাদের যে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা সে কাজই করে, যা তাদের আদেশ করা হয়[৪]।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ۝

---

১. অর্থাৎ দিলে এ ধারণা করো না যে, পুরুষের তো স্ত্রী লোকের প্রয়োজন হয়ই, আর আমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী কোথায় পাওয়া যাবে? অতএব আমাদের সব কথাই সয়ে নেওয়া হবে। স্মরণ রেখো, আল্লাহ চাইলে তোমাদের চেয়েও উত্তম বিবি তাঁর নবীর জন্য পয়দা করে দেবেন। তাঁর নিকট কোন জিনিসের অভাব নেই।

বি. দ্র. ثَيِّبَات (অকুমারী) এর কথা সম্ভবত এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ কোন কোন দিক থেকে কুমারীদের উপর অকুমারীদের প্রাধান্য দেয়।

২. নিজের সঙ্গে নিজ পরিবার-পরিজনকেও দীনের পথে আনা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। বুঝিয়ে-সুজিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আদর-স্নেহ করে, মার-ধোর করে, যেভাবে সম্ভব, দীনদার বানানোর চেষ্টা করবে। এতদসত্ত্বেও যদি তারা সৎপথে না আসে, তবে তাদের দুর্ভাগ্য, অভিভাবক নির্দোষ।

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة -এর তাফসীর সূরা বাকারা আয়াত নং ২৪- এ গত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ তাঁরা দয়াপরবশ হয়ে অপরাধীদের ছেড়ে দেবেন না, আর তাঁদের কঠোর পাকড়াও থেকে কেউ ছুটে পালাতেও পারবে না।

৪. অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিরোধিতা করেন না। তাঁর হুকুম-আহকাম পালনে তাঁদের অলসতা ও দেরিও হয় না এবং তাঁর হুকুম পালনে তাঁরা অক্ষমও নন।

৭. হে কাফেররা! আজকের দিনে বাহানা পেশ করো না। তোমাদের তারই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে[১]।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞

[রুকূ - ২]

৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নিকট তওবা কর আন্তরিক তওবা[২]। আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদের থেকে গোনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন উদ্যানরাজিতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত– সেই দিনে, যেদিন আল্লাহ নবী ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তাদের অপদস্থ করবেন না[৩]। তাদের আলো তাদের সামনে ও তাদের ডানদিক দিয়ে ধাবিত হবে[৪]। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের আলো পরিপূর্ণ করে দিন[৫] এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ সক্ষম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞

---

১. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামের আযাব সামনে দেখা যাবে, তখন কাফেরদের বলা হবে যে, তোমরা ওযর-আপত্তি করো না। আজ কোন ওযর-আপত্তি চলবে না; বরং তোমরা যা কিছু করতে, তারই পূর্ণ শাস্তি ভোগ করার দিন আজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনই জুলুম বা বাড়াবাড়ি নেই; বরং এ তোমাদেরই কৃতকর্ম, যা আযাবের আকারে দেখা যাচ্ছে।

২. আন্তরিক তওবা হচ্ছে এমনভাবে তওবা করা যে, দিলের মধ্যে ফের ওই গোনাহর ইচ্ছা না থাকে। তওবার পরে যদি অন্তরে আবার অসৎকর্মের খেয়াল আসে, তবে বুঝতে হবে যে, তওবার মধ্যে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে এবং দিল থেকে গোনাহর মূল এখনো বের হয়নি।

رزقنا الله منها حظًا وافرًا بفضله وعونه وهو على كلّ شيئ قدير

৩. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো কথাই নেই, তাঁর সাথীদেরও অপমানিত করবেন না; বরং অত্যন্ত সম্মানের সাথে শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌভাগ্যের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবেন।

৪. এর বিবরণ সূরা হাদীদ-এ (আয়াত ১২) গত হয়েছে।

৫. অর্থাৎ আমাদের নূর চিরস্থায়ী করুন, নিবতে দেবেন না, যেমন সূরা হাদীদে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের আলো নিবে যাবে এবং তারা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে।

৯. হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং ওদের প্রতি কঠোরতা করুন[১]। ওদের ঠিকানা দোযখ। আর (তা) কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[২]!

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۝

১০. আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : ওরা দুজন আমার বান্দাদের মধ্যে দুই নেককার বান্দার অধীনে ছিল। কিন্তু ওরা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে আল্লাহর মোকাবেলায় তাঁরা ওদের কোন উপকারে আসেননি। আর আদেশ হল, 'তোমরা প্রবেশকারীদের সাথে দোযখে প্রবেশ কর।'

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ۝

১১. আর আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য ফেরাওনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন[৩]:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ

মুফাসসিরগণ সাধারণত এ তাফসীরই লিখেছেন। কিন্তু হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا এর মর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, 'ঈমানের আলো দিলের মধ্যে থাকে, দিল থেকে বৃদ্ধি পেলে সমস্ত শরীরে ছড়ায়, তারপর গোশত ও চামড়ায় ছড়িয়ে যায়।'

১. নবীজির সৎস্বভাব ও নম্র ব্যবহার এতই বেশি ছিল যে, আল্লাহ তাআলা যেখানে অন্যদের ধৈর্য ধরতে বলেন সেখানে তাঁকে বলেন, 'কঠোরতা করুন।'

২. প্রথমে মুমিনদের নিবাসের কথা বলা হয়েছিল, এর বিপরীতে এখানে কাফের ও মুনাফিকদের বাসস্থানের কথা বলা হল।

৩. অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ) বড় নেক বান্দা ছিলেন। কিন্তু উভয়ের ঘরে তাঁদের সহধর্মিণীরা ছিল মুনাফিক। বাহ্যত তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু মনের দিক থেকে ওরা কাফেরদের সঙ্গী ছিল। পরিণামে আল্লাহ সাধারণ দোযখীদের সাথে ওদেরও দোযখে প্রবেশ করান। পয়গম্বরদের সঙ্গে আত্মীয়তা ও দাম্পত্যসম্পর্ক ওদের একটুও রক্ষা করতে পারেনি।

পক্ষান্তরে, ফেরাওনের স্ত্রী হযরত আছিয়া বিনতে মুযাহিম ছিলেন পাক্কা ঈমানদার ও কামেল ওলী, আর তাঁর স্বামী ছিল সবচেয়ে বড় আল্লাহদ্রোহী। এই পুণ্যাত্মা স্ত্রী স্বামীকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি, আর স্বামীর দুষ্কৃতি ও আল্লাহদ্রোহিতার ছোঁয়াও স্ত্রীর গায়ে লাগেনি।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, 'নিজের ঈমান দুরুস্ত কর; অন্যথায় স্বামীও বাঁচাতে পারবে না, স্ত্রীও না। এই নিয়ম সকলকে শুনিয়ে দেওয়া হল। এ ধারণা যেন না করা হয় যে,

فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِیْ عِنْدَكَ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِیْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهٖ وَ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ⑪

যখন সে বলল, 'হে আমার রব! আমার জন্য আপনার কাছে বেহেশতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করুন[১] এবং আমাকে ফেরাওন ও তার কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন জালেম লোকদের (হাত) থেকে[২]।'

وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِیْۤ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

১২. এবং (দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন) মারয়াম বিনতে ইমরান-এর, যিনি স্বীয় লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছিলেন[৩]। তখন আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিলাম আমার (পক্ষ থেকে) একটি রূহ[৪]।

(নাউযুবিল্লাহ) নবীজির বিবিদের জন্য এ কথা বলা হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে তো তা বলা হয়েছে, যা সূরা নূর-এ রয়েছে– اَلطَّیِّبٰتُ لِلطَّیِّبِیْنَ وَالطَّیِّبُوْنَ لِلطَّیِّبٰتِ —আর ধরা যাক, যদি এ রকম বক্র চিন্তা করাই হয়, তবে ফেরাওনের স্ত্রীর উদাহরণ কার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে? لاحول ولاقوة إلا بالله

১. অর্থাৎ আপনার নৈকট্য দান করুন এবং বেহেশতের মধ্যে আমার জন্য বাসস্থান তৈরি করুন।

২. অর্থাৎ ফেরাওনের কবল থেকে রক্ষা করুন এবং ওর জুলুম থেকে নিষ্কৃতি দান করুন।

হযরত মুসাকে তিনি প্রতিপালন করেছিলেন এবং তাঁর সহায়ক ছিলেন।

কথিত আছে, যখন ফেরাওনের নিকট প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেল, তখন সে বিবি আছিয়াকে শোয়ায়ে হাত-পা পেরেকের সাথে বেঁধে নানা রকম কষ্ট দিত। এই অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের মহল তাঁকে দেখানো হত, যার ফলে সমস্ত কষ্ট আসান হয়ে যেত। অবশেষে ফেরাওন তাঁকে শাস্তিরূপে কতল করে ফেলল এবং তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে প্রকৃত মালিকের নিকট পৌছে গেলেন।

সহীহ হাদীসের মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কামেল বান্দি বলে ঘোষণা করেছেন এবং হযরত মারয়ামের সঙ্গে তাঁর উল্লেখ করেছেন (বুখারী, হাদীস ৩৪১১)। হাজার হাজার রহমত বর্ষিত হোক এই পবিত্র আত্মার উপর।

৩. অর্থাৎ হালাল ও হারাম সব ক্ষেত্র থেকে হেফাজত করেছিলেন।

৪. অর্থাৎ ফেরেশতার মাধ্যমে একটি রূহ ফুঁকে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর জামার গ্রীবায় ফুঁ দিলেন, যার ফলে হযরত মারয়াম (আ) গর্ভবতী হলেন এবং হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাম পয়দা হলেন।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ۝

এবং সে আপন রবের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করল[১], আর সে ছিল ইবাদতকারীদের একজন[২]।

বি. দ্র. আল্লাহ তাআলা نفخ-কে নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। কারণ, প্রকৃত কর্তা ও সকল উপায়-উপকরণের স্রষ্টা তিনিই। প্রত্যেক নারীর গর্ভে যে বাচ্চা সৃষ্টি হয়, তার স্রষ্টা তিনি ছাড়া আর কে?

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে فرج-এর অর্থ করেছেন জামার গ্রীবা। তখন أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا -এর অর্থ হবে— তিনি কারো হাত নিজের জামার গ্রীবা পর্যন্ত পৌছতে দেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, চমৎকার ভঙ্গিতে তাঁর নিষ্পাপতা ও পবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত করা। যেমন আমাদের (উর্দূ) ভাষার প্রবচন আছে– فلاں عورت بہت پاکدامن ہے (অমুক নারীর আঁচল বড় পবিত্র, অর্থাৎ সে অত্যন্ত চরিত্রবান)। এবং আরবী ভাষায় বলা হয়– نقي الجيب طاهر الذيل - এর দ্বারা عفيف النفس (চরিত্রবান) উদ্দেশ্য হয়, কাপড়ের আঁচল উদ্দেশ্য হয় না। এই ব্যাখ্যা নেওয়া হলে فنفخنا فيه-এর فيه-তে যে সর্বনাম আছে, তা فرج শব্দের দিকে রুজু (راجع) হবে এর আভিধানিক অর্থ হিসাবে। والله أعلم بالصواب

১. রবের বাণী বলতে সেগুলি বোঝানো হয়েছে, যা ফেরেশতাদের মুখে সূরা আলে-ইমরানে (আয়াত ৪২-৪৭) বিবৃত হয়েছে। আর কিতাবসমূহ দ্বারা সকল আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য, কোন এক কিতাব নয়।

২. অর্থাৎ কামেল পুরুষদের মত বন্দেগী ও আনুগত্যে দৃঢ়পদ ছিলেন। অথবা অর্থ এই যে, তিনি অনুগত বান্দাদের বংশের ছিলেন।

সূরা মুল্‌ক

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৬৭ । ৩০ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٣٠، رُكُوعَاتُهَا ٢

পারা - ২৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۨ ①

১. বড় বরকতময় তিনি, যাঁর হাতে (সর্বময়) রাজত্ব এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান[১]—

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۨ ②

২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন– তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম[২]। আর তিনিই পরাক্রমশালী, অতি ক্ষমাশীল[৩]—

---

১. অর্থাৎ সমস্ত রাজত্ব তাঁর এবং গোটা বিশ্বে একমাত্র তাঁরই আধিপত্য চলে।

২. অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর ধারা তিনিই কায়েম করেছেন।

আমরা পূর্বে কিছুই ছিলাম না (একেই মনে করুন মৃতাবস্থা), এরপর তিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন। তারপর মৃত্যু ঘটান। মৃত্যুর পর আবার তিনি জীবন দান করবেন। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন– وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (তোমরা ছিলে প্রাণহীন, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। এরপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের জীবন্ত করবেন। অতঃপর তারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে– বাকারাহ : ২৮)

জীবন-মৃত্যুর এ ধারা চলছে আমাদের আমল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে যে, কে মন্দ কাজ করে, কে ভাল কাজ করে এবং কে ভাল থেকে আরো ভাল কাজ করে। প্রথম জীবনে (ইহকালে) এ পরীক্ষা নেওয়া হয়। আর দ্বিতীয় জীবনে (পরকালে) তার পরিপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করা হবে। যদি প্রথম জীবন না থাকত, তবে আমল কে করত? আর যদি মৃত্যু না আসত, তবে মানুষ শুরু ও শেষ সম্পর্কে উদাসীন ও নিশ্চিন্ত হয়ে আমল ছেড়ে দিত। অপরদিকে দ্বিতীয়বার জীবিত না করা হলে ভাল-মন্দের প্রতিফল কীভাবে পাওয়া যেত? (এসব কারণে আল্লাহ জীবন-মৃত্যুর উল্লিখিত ধারা চালু করেছেন)

৩. অর্থাৎ তিনি এমন পরাক্রমশালী, যাঁর পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। এবং তিনি অতি বড় মার্জনাকারীও।

৩. যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে[১]। তুমি 'রহমানে'র সৃষ্টিতে কোন তারতম্য দেখতে পাবে না[২]। তা, পুনরায় দৃষ্টি দাও। তুমি কি কোনো ত্রুটি দেখতে পাও[৩]?

الَّذِىۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِىۡ خَلۡقِ الرَّحۡمٰنِ مِنۡ تَفٰوُتٍ ؕ فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ ۙ هَلۡ تَرٰى مِنۡ فُطُوۡرٍ ۝

৪. অতঃপর দৃষ্টি ফেরাও বার বার, তোমার দৃষ্টি তোমার দিকে ফিরে আসবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে[৪]।

ثُمَّ ارۡجِعِ الۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنۡقَلِبۡ اِلَيۡكَ الۡبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيۡرٌ ۝

---

১. হাদীসে আছে, এক আকাশের উপর দ্বিতীয় আকাশ, দ্বিতীয়টির উপর তৃতীয়টি। এভাবে উপরে-নীচে সাত আকাশ রয়েছে। আর প্রত্যেক আকাশ থেকে দ্বিতীয়টির দূরত্ব পাঁচশ বছরের (তাফসীরে তবারী ২৩/৮০-৮১)। কুরআন-হাদীসে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, উপরে নীলাভ যে জিনিসটি আমাদের নজরে আসে, তা-ই আকাশ। হতে পারে, সাত আকাশের অবস্থান এর উপরে এবং এই নীলাভ জিনিসটি আকাশের শামিয়ানার কাজ করছে।

২. অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজ ব্যবস্থাপন ও সৃষ্টিনৈপুণ্যে কোথাও তারতম্য করেননি। মানুষ থেকে শুরু করে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পদার্থজগৎ, সৌরজগৎ, উর্ধ্বজগৎ, সাত আসমান—সব কিছুতে তিনি একই রকম অনন্য কলা-কৌশল ও সৃষ্টিনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এমন নয় যে, কোন কোন জিনিস হেকমত ও সুবিবেচনার আলোকে, আর কোন কোন জিনিস অযথা-উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। এমন ধারণা থেকে আল্লাহ পানাহ দিন। কারো এমন ধারণা হলে বুঝতে হবে, এটা তার জ্ঞানবুদ্ধির মারাত্মক ত্রুটি।

৩. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগৎ নীচ থেকে উপর পর্যন্ত একই নিয়ম, শৃঙ্খলা ও পরিপক্ক ব্যবস্থাপনার অধীনে গ্রথিত ও আবদ্ধ; কোথাও কোনো ছিদ্র বা ফাটল নেই। কোন সৃষ্টিনৈপুণ্যে কোন রকমের ত্রুটি পাওয়া যায় না; বরং প্রত্যেকটি জিনিসই তেমন, যেমন তার হওয়া উচিত ছিল।

আর যদি আলোচ্য আয়াতগুলি শুধু আকাশসম্পর্কিত হয়, তবে অর্থ হবে- হে দর্শক, উপরে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে দেখ। কোথাও কোনো উঁচুনিচু বা ছিদ্র ও ফাটল দেখতে পাবে না; বরং একটি স্বচ্ছ, সুসমঞ্জস, সম্মিলিত, শৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জিনিস দৃষ্টিগোচর হবে, যার মধ্যে কালের গতি ও সময়ের সুদীর্ঘ প্রবাহের ফলে আজ পর্যন্ত কোনো পার্থক্য আসেনি।

৪. অর্থাৎ এক-আধবার দেখায় চোখের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। এ জন্য পূর্ণ চেষ্টাসহ বারবার দেখ– কোথাও কোন ত্রুটি বা অসংগতি দেখা যায়? খুব যত্ন ও মনোযোগের সাথে দেখ, পুনরায় দেখ– আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় কোথাও অঙ্গুলি রাখার স্থান পাওয়া যায় কি? মনে রেখো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত, অক্ষম ও অবনমিত হয়ে ফিরে আসবে; কিন্তু খোদায়ী কারিগরি ও ব্যবস্থাপনায় কোন দোষ-ত্রুটি বের করতে পারবে না।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

৫. আমি সবচেয়ে নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালার দ্বারা[১] এবং সেগুলিকে শয়তানদের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র বানিয়েছি[২] এবং ওদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি[৩]।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

৬. আর যারা নিজেদের রবকে অস্বীকার করেছে, ওদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। আর (তা) কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল[৪]!

اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۝

৭. যখন তাতে ওদের নিক্ষেপ করা হবে, ওরা তার গর্জন শুনতে পাবে, আর তা টগবগ করতে থাকবে–

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝

৮. মনে হবে যেন ক্রোধে তা ফেটে পড়ছে[৫]। যখনই তাতে (ওদের) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, দোযখের রক্ষীরা ওদের জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেননি[৬]?'

---

১. অর্থাৎ আকাশের দিকে দেখ, রাতের বেলায় তারকারাজি ঝলমল করে। এতে আকাশ কী অপূর্ব ও চমৎকার দেখায়। এই কুদরতী প্রদীপসমূহের সাথে পৃথিবীর বহু কল্যাণ ও উপকারও সম্পৃক্ত রয়েছে।

২. এ বিষয়ে সূরা 'হিজর'সহ বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ দুনিয়াতে ওদের প্রতি উজ্জ্বল নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয়, আর আখেরাতে ওদের জন্য দোযখের আগুন প্রস্তুত রয়েছে।

৪. অর্থাৎ কাফেরদের বাসস্থানও শয়তানদের সাথে দোযখের মধ্যেই রয়েছে।

৫. অর্থাৎ তখন দোযখের গর্জন খুবই কর্কশ ও ভয়ঙ্কর হবে এবং সীমাহীন ক্রোধ ও উত্তেজনায় মনে হবে, যেন আক্রোশে ফেটে পড়ছে। (আল্লাহ তাআলা তাঁর মেহেরবানীতে তা থেকে আমাদের নাজাত দিন)।

৬. ফেরেশতাদের এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হবে ওদেরকে অধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করা। অর্থাৎ তোমরা যে এ মুসীবতে পড়লে, এ সম্বন্ধে কি তোমাদের কেউ সতর্ক করেনি? এবং ভয় প্রদর্শন করে বলেনি যে, কুফরের পথে চলো না; চললে সোজা দোযখে পতিত হবে, যেখানে এমন এমন আযাব হবে?

৯. ওরা বলবে, 'অবশ্যই, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলেন। কিন্তু আমরা অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো আছ মহা বিভ্রান্তিতে[১]।'

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝

১০. ওরা আরো বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম বা বুঝতাম, তবে আমরা দোযখীদের মধ্যে থাকতাম না[২]।'

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

১১. মোটকথা, ওরা নিজ অপরাধ স্বীকার করবে। তো, দূর হোক দোযখীরা[৩]!

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝

১২. যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে[৪], তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

১. অর্থাৎ ওরা লজ্জিত হয়ে আফসোস ও আক্ষেপের সাথে বলবে, সতর্ককারীরা অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মানিনি এবং সর্বদা তাঁদের অস্বীকার করে বলেছি যে, তোমরা সবাই মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তোমাদের পাঠাননি, তোমাদের প্রতি ওহীও অবতীর্ণ করেননি। বরং তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে নিদারুণ গোমরাহীতে গিয়ে পতিত হয়েছ।

২. অর্থাৎ এ খবরই ছিল না যে, সতর্ককারীগণই সত্য প্রমাণিত হবেন। আমরা যদি তখন কোন নসীহতকারীর কথা শুনতাম, অথবা জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সঠিক বিষয়টি বুঝতাম, তবে আজ দোযখীদের দলভুক্ত হতাম না এবং আপনারাও দোষারোপ করার সুযোগ পেতেন না।

৩. অর্থাৎ ওরা নিজেরাই স্বীকার করে নেবে, আমরা নিশ্চয় অপরাধী। আমাদের বিনা অপরাধে দোযখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না। কিন্তু তখনকার স্বীকারোক্তিতে কোন ফায়দা হবে না, বরং ইরশাদ হবে। فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيْرِ (দূর হোক দোযখীরা) অর্থাৎ ওদের জন্য রহমতের ছায়াতলে কোন জায়গা নেই।

৪. অর্থাৎ তারা আল্লাহকে দেখেনি, কিন্তু তাঁর প্রতি ও তাঁর গুণাবলিতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। আর তারা তাঁর মাহাত্ম্য ও পরাক্রমের কথা চিন্তা করে কম্পিত হয় এবং তাঁর আযাবকে স্মরণ করে সন্ত্রস্ত হয়। অথবা بالغيب এর অর্থ এই যে, তারা যখন লোকজনের সমাবেশ থেকে আলাদা হয়, তখন নির্জনে ও একাকী আপন প্রভুকে স্মরণ করে কম্পিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরসমূহে যা আছে সে সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞাত[১]।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑬

১৪. আচ্ছা, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেন না? তিনিই তো সুক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত[২]।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ⑭

[রুকূ - ২]

১৫. তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য ধরণীকে অবনত করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার কাঁধে চলাফেরা কর এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে আহার কর। আর তাঁরই নিকট (তোমাদের) পুনরুত্থান হবে[৩]।

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ⑮

১৬. তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ভূমিতে ধসিয়ে দিতে পারেন, আর তখন তা কাঁপতে থাকবে[৪]?

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوْرُ ⑯

---

১. অর্থাৎ যদিও তোমরা তাঁকে দেখ না, কিন্তু তিনি তোমাদের দেখছেন এবং তিনি তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয়, নির্জনে হোক বা লোকসমক্ষে, জানেন। বরং তোমাদের বক্ষ ও অন্তরে যেসব খেয়ালের উদ্রেক হয়, তারও খবর তিনি রাখেন। মোটকথা, তিনি তোমাদের থেকে গায়েব (অদৃশ্য), কিন্তু তোমরা তাঁর থেকে গায়েব (অদৃশ্য) নও।

২. অর্থাৎ তোমাদের এবং তোমাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তা— সকল কিছুর খালেক ও মালিক-মুখতার (একচ্ছত্র অধিকারী) তিনিই। আর খালেক ও মালিক যা কিছু পয়দা করেন, তা সম্পর্কে তাঁকে অবশ্যই পরিপূর্ণ জ্ঞাত হতে হবে, নতুবা পয়দা করাই সম্ভব নয়। সুতরাং এটা কেমন করে হতে পারে যে, যিনি সৃষ্টি করলেন তিনিই জানবেন না?

৩. অর্থাৎ তিনি যমীনকে (পৃথিবীপৃষ্ঠকে) তোমাদের জন্য হীন, অবনত ও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা যা চাও, তার উপর তাই করতে পার। পৃথিবীর বুকে ও তার পাহাড়-পর্বতের উপর চলাফেরা করতে এবং রুযী কামাই করতে পার। তবে স্মরণ রাখতে হবে, যিনি রুযী দিয়েছেন, তাঁর কাছেই পুনরায় ফিরে যেতে হবে।

৪. প্রথমে আল্লাহর নে'য়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাঁর আক্রোশ ও ক্রোধের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ— যমীনকে অবশ্যই তোমাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্মর্তব্য যে, এর উপর শাসনাধিকার সেই আসমান-

১৭. অথবা তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন[১]? তখন তোমরা জানতে পারবে, আমার সতর্কীকরণ কেমন[২]?

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝

১৮. তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল। অতএব (দেখ), কেমন ছিল আমার পাকড়াও[৩]?

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝

১৯. তারা কি নিজেদের উপরে পাখিদের দেখে না, যারা (কখনো) ডানা মেলে রাখে এবং (কখনো) গুটিয়ে রাখে। দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া আর কেউ তাদের ধরে রাখে না। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা[৪]।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ۝

ওয়ালারই, যিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন, যখন যমীন ভূমিকম্পের আঘাতে প্রকম্পিত হতে থাকবে এবং তোমরা তার ভিতরে চলে যেতে থাকবে (অর্থাৎ মাটির নীচে চাপা পড়বে)। অতএব সেই মালিক ও অধিপতিকে ভয় না পেয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়া, আর তিনি অবকাশ ও ঢিল দিলে অহংকারী ও বেপরোয়া হয়ে যাওয়া মানুষের জন্য মোটেই সমীচীন নয়।

১. অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে অবশ্যই চলাফেরা কর এবং রুযী কামাই কর, কিন্তু আল্লাহকে ভুলো না। তা হলে তিনি তোমাদের উপর প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করতে অথবা পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তখন তোমাদের কিছুই করার থাকবে না। সব দৌড়াদৌড়ি ও চেষ্টা-তদবীর নিষ্ফল সাব্যস্ত হবে।

২. অর্থাৎ যে আযাব সম্পর্কে তোমাদের ইতিপূর্বে সতর্ক করা হয়েছে, তা কেমন ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর— সেটা জানতে পারবে।

৩. অর্থাৎ আদ, ছামূদ প্রভৃতি জাতির যে পরিণতি হয়েছে, তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। ওদের কার্যকলাপে আমি চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। তো দেখে নাও— আমার অসন্তুষ্টি কেমন কঠিন আযাবের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল।

৪. ইতিপূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ হয়েছে। বর্তমান আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বস্তুনিচয়ের আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, আল্লাহর কুদরত লক্ষ করে দেখ যে, পাখিরা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে (শূন্যলোকে) কখনো ডানা মেলে, কখনো ডানা গুটিয়ে কীভাবে উড়তে থাকে! আর মাটির দিকে ওদের ভারী দেহের আকর্ষণ সত্ত্বেও ওরা নীচে পড়ে যায়

২০. আচ্ছা! দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদের সাহায্য করবে? নিশ্চয় কাফেররা শুধুই ধোঁকার মধ্যে আছে[১]।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۚ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ۚ

২১. আচ্ছা! এমন কে আছে, যে তোমাদের রিযিক দেবে যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন[২]? আর কিছু নয়, ওরা অবাধ্যতা ও সত্য-বিমুখতায় অনড় রয়েছে[৩]।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ

২২. আচ্ছা! যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে বেশি সুপথপ্রাপ্ত; নাকি ওই ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে[৪]?

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

না। বল তো দেখি, রহমান ছাড়া আর কার এই কুদরত আছে যে, ওদের শূন্যলোকে ধরে রাখবে? বস্তুত দয়াময় আল্লাহ নিজ রহমত ও হেকমতে তাদের গঠন-আকৃতিই এমন বানিয়েছেন এবং তাতে সেই শক্তি রেখেছেন যে, তারা স্বচ্ছন্দ্যে বায়ুর মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসে বেড়াতে পারে। তিনি প্রত্যেক বস্তুর যোগ্যতা সম্বন্ধে জানেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে আপন দৃষ্টিতে রাখেন।

পাখিকুলের দৃষ্টান্ত বর্ণনার মাধ্যমে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, আল্লাহ আকাশ থেকে আযাব পাঠাতে অবশ্যই সক্ষম। এবং কাফেররা নিজেদের কুফর ও দুষ্কৃতির কারণে শাস্তির যোগ্য বটে; কিন্তু দয়াময়ের দয়া যেমন পাখিদের শূন্যলোকে ধরে রেখেছে, আযাবও তাঁরই দয়ায় আটকে আছে। (অর্থাৎ নীচে ধরাপৃষ্ঠে নেমে আসছে না)।

১. অর্থাৎ কাফেররা কঠিন ধোঁকার মধ্যে রয়েছে যদি তারা মনে করে থাকে যে, তাদের বাতিল উপাস্যদের ও কাল্পনিক দেব-দেবীর বাহিনী তাদেরকে আল্লাহর আযাব ও আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবে। ভালভাবে বুঝে নাও, দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সাহায্য করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ যদি রিযিকের উপায়-উপকরণ বন্ধ করে দেন, তবে কার এমন শক্তি আছে যে, তোমাদের জন্য রিযিকের দ্বার খুলে দেবে?

৩. অর্থাৎ অন্তরে এরাও বোঝে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ ক্ষতিও রুখতে পারে না, লাভও পৌছাতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতার কারণে এরা তাওহীদ ও ইসলামের প্রতি অগ্রসর হতে পারছে না।

৪. অর্থাৎ বাহ্যিক সফলতার পথ পাড়ি দিয়ে মূল লক্ষস্থলে সে ব্যক্তিই পৌছবে, যে সরল পথে মানুষের মত সোজা হয়ে চলবে। যে ব্যক্তি বাঁকা পথে অধোমুখী হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে,

২৩. আপনি বলুন, 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা খুব সামান্যই শোকর কর[১]।'

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. বলুন, 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদের সমবেত করা হবে[২]।'

قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. ওরা বলে, 'এই প্রতিশ্রুতি কবে (পূরণ) হবে? (বল), যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৩]'।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. আপনি বলুন, '(এর) জ্ঞান তো আল্লাহরই নিকট আছে, আর আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারীমাত্র[৪]।'

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾

তার পক্ষে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারার আশা করা যায় না। এটা হল যথাক্রমে একজন একত্ববাদী ও একজন অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত। হাশরের মাঠেও উভয়ের চলনে এই পার্থক্যই দেখা যাবে।

১. অর্থাৎ আল্লাহ শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ ও বোঝার জন্য অন্তর দিয়েছেন, যাতে তাঁর শোকর আদায় করে এসব শক্তির সঠিক ব্যবহার করা হয় এবং তাঁর বন্দেগী ও আনুগত্যে ব্যয় করা হয়। কিন্তু এমন কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা খুবই কম। কাফেরদের দেখ, ওরা এই নে'য়ামতগুলির কেমন শোকর আদায় করছে? ওরা তাঁর দেওয়া শক্তিগুলিকে তাঁরই বিরোধিতায় ব্যবহার করছে।

২. অর্থাৎ জীবনের সূচনাও তাঁর থেকে হয়েছে, সমাপ্তিও তাঁর কাছে হবে। যেখান থেকে সবাই এসেছিল, সেখানেই প্রত্যাবর্তন হবে। সুতরাং এ বিষয় থেকে এক মুহূর্তও গাফেল না হওয়া উচিত ছিল এবং মালিকের সামনে যেন খালি হাতে যেতে না হয়, সর্বদা এই ফিকিরে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এমন বান্দা খুবই কম।

৩. অর্থাৎ আমাদের কখন একত্র করা হবে এবং কিয়ামত কবে আসবে? তা তাড়াতাড়ি ডেকে আন।

৪. অর্থাৎ তার সময় নির্ধারিত করে বলা আমার কাজ নয়, এর ইলম একমাত্র আল্লাহরই নিকটে। অবশ্য যে জিনিস নিশ্চিতরূপে আসবেই, তার কথা জানিয়ে দেওয়া এবং ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া আমার দায়িত্ব ছিল। এ দায়িত্ব আমি পালন করেছি।

২৭. অতঃপর ওরা যখন তা (আযাব) আসন্ন দেখবে, তখন কাফেরদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে এবং (ওদের) বলা হবে, 'এটাই সে বস্তু, যা তোমরা চাচ্ছিলে[১]।'

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো, যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদের ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন— তো যাতনাদায়ক আযাব থেকে কাফেরদের কে রক্ষা করবে[২]?'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾

২৯. আপনি বলুন, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করেছি[৩]।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

---

১. অর্থাৎ এখন তো তাড়াতাড়ি আনার জন্য শোরগোল করছে, কিন্তু যখন সেই আযাব নিকটবর্তী হবে তখন বড় বড় অবাধ্যদের মুখ বিকৃত ও চেহারা বিমর্ষ হয়ে যাবে।

২. কাফেররা কামনা করত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি অকাল মৃত্যুবরণ করতেন, তবে তাঁর কিচ্ছাই খতম হয়ে যেত।

এর উত্তরে বলা হচ্ছে– আচ্ছা ধর, তোমাদের কামনা মত আমাকে ও আমার সাথীদের যদি দুনিয়াতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, অথবা আমাদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী যদি আমাকে ও আমার সকল সাথীদের আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে সফল ও কৃতকার্য করে দেন— এ দুই অবস্থার যে কোনটিই হোক, তাতে তোমাদের কী লাভ? আমাদের পরিণতি দুনিয়াতে যা কিছু হোক, সর্বাবস্থায় আমাদের পরকাল উজ্জ্বল। কেননা, আমরা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করছি। কিন্তু তোমরা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা কর যে, কুফর ও অবাধ্যতার কারণে যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব নিশ্চিতরূপে আসবে, তার কবল থেকে তোমাদের কে বাঁচাবে? আমাদের নিয়ে আশঙ্কা ছাড়, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। কারণ, কাফের কোনভাবেই খোদায়ী আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না।

৩. অর্থাৎ যেহেতু তাঁর প্রতি আমাদের ঈমান রয়েছে, সুতরাং ঈমানের বদৌলতে আমাদের মুক্তি নিশ্চিত। আর যেহেতু আমরা প্রকৃতই তাঁর উপর ভরসা করি, সুতরাং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে আমাদের সফলতা নিশ্চিত– وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ (যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেনই। –তালাক : ৩)

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾

আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে[১]।'

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০. আপনি বলুন, 'আচ্ছা বল তো, যদি কোন ভোরে তোমাদের পানি ভূগর্ভে নেমে যায়, তবে কে তোমাদের পরিচ্ছন্ন পানি এনে দেবে[২]?'

কিন্তু তোমাদের মধ্যে ঈমান ও আল্লাহ-নির্ভরতা— কোনওটিই নেই। ফের তোমরা কিভাবে নিশ্চিন্ত আছ?

১. অর্থাৎ আমরা, (যেমন তোমাদের ধারণা), না তোমরা (যেমন আমাদের বিশ্বাস)।

২. অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর সমস্ত উপায়-উপকরণ আল্লাহরই কব্জায়। এক পানির কথাই চিন্তা করে দেখ, যা সকল কিছুর জীবনের উৎস। ধর, যদি কুয়া ও ঝরনা (প্রভৃতি পানির উৎস) শুকিয়ে পানি ভূগর্ভে চলে যায়, যেমন গ্রীষ্মকালে প্রায়ই হয়ে থাকে— তবে কার সাধ্য আছে যে, মোতির ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে এনে দেবে, যা তোমাদের জীবন ও স্থায়িত্বের জন্য যথেষ্ট হবে? কারো না। সুতরাং একজন তাওয়াক্কুলকারী মুমিনের জন্য উচিত, সর্বস্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের উপর ভরসা করা।

এখান থেকে এ কথাও বুঝে নাও, যখন হেদায়াতের সমস্ত ঝরনাধারা শুকিয়ে গেল, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকারে হেদায়াত ও মারেফতের চির-প্রবহমান প্রস্রবন চালু করে দেওয়া সেই একচ্ছত্র দয়াময়েরই কাজ, যিনি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত জীবজগতের জাহেরী ও বাতেনী জীবনের উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি হেদায়াতের এই স্থায়ী ঝরণা দুর্ভাগা, দুরাত্মাদের কামনা অনুযায়ী শুকিয়ে যায় (যদিও তা কস্মিনকালেও হতে পারে না)– তবে কে আছে এমন, যে সৃষ্টিকুলের জন্য এমন পাক-পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্মল পানির ব্যবস্থা করতে পারে?

সূরা কলম

سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৬৮ । ৫২ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آياتها ٥٢، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ

১. নূন। কসম কলমের এবং যা কিছু তারা লেখে তার!

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ

২. আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে আদৌ উন্মাদ নন[১]।

১. মক্কার মুশরিকরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উন্মাদ বলত (নাউজুবিল্লাহ)। কেউ বলত, শয়তানের আছরের ফলে তিনি একে একে সমগ্র জাতি থেকে পৃথক হয়ে এমন কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন, যা কেউ মানতে পারছে না। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে ওদের এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ওদের কথার উত্তরে বলছেন যে, যাঁকে আল্লাহ নিজ দয়া ও অনুগ্রহে এত এত মহান গুণাবলি দান করেছেন, যা প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অবোলকন করছে, যেমন: তাঁর হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য, উচ্চমানের ভাষাশৈলী, শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের অন্তরে তাঁর কথার শক্তিশালী প্রভাব ও আবেদন এবং এমন আকাশচুম্বী ও পবিত্র চরিত্রমাধুর্য— তাঁকে উন্মাদ বলা কি নিজ মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রমাণ নয়? দুনিয়ায় সত্যিই বহু উন্মাদ গত হয়েছে । অপরদিকে অনেক মর্যাদাশালী সমাজ-সংস্কারকও আগমন করেছেন, যাঁদেরকে প্রথমে স্বজাতি উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু যেসব ঐতিহাসিক জ্ঞান-সম্ভার পুস্তকের পাতায় সন্নিবেশিত রয়েছে, তা সাক্ষ্য দিচ্ছে ও ঘোষণা করছে যে, প্রকৃত উন্মাদ আর উন্মাদরূপে আখ্যায়িত ওই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে।

আজ আপনাকে (হে রাসূল) উন্মাদ আখ্যায়িত করা ঠিক তেমন, যেমন দুনিয়ার মর্যাদাশালী ও দৃঢ়সংকল্প সংস্কারকগণকে স্ব স্ব যুগের দুরাত্মা ও নির্বোধেরা উন্মাদ বলেছিল। কিন্তু ইতিহাস যেমন সেই সংস্কারকদের সুমহান জীবন ও কর্মকে স্থায়ীত্ব দান করেছে এবং উন্মাদ আখ্যাদানকারীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেনি— ঠিক তদ্রূপ কলম ও তা দিয়ে অঙ্কিত ইতিহাসের পাতাসমূহ আপনার সুখ্যাতি, শুভ-স্মৃতি, আপনার অতুলনীয় জীবনচরিত, উলূম ও মাআরেফ (জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধি-বিচক্ষণতা)-কে চিরভাস্বর করে রাখবে। আর আপনাকে যারা উন্মাদ বলে, তাদের অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমন এক সময় আসবে, যখন সারা দুনিয়া আপনার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বুদ্ধির প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে এবং আপনার পূর্ণতম মানব হওয়াকে সর্বসম্মত আকীদারূপে মেনে নেবে।

৩. আর নিশ্চয়ই আপনার জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান[১]।	وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝
৪. এবং নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী[২]।	وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

আচ্ছা, আল্লাহ পাক যাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সৃষ্টির সূচনালগ্নে স্বীয় নূরের কলম দিয়ে লওহে মাহফূজে অঙ্কিত করেছেন, উন্মাদ ও বিকারগ্রস্ত আখ্যায়িত করে তাঁর কণামাত্র নিশ্চিহ্ন করার সাধ্য কারো আছে কি? যে ব্যক্তি এরূপ করতে পারবে বলে ধারণা রাখে, সে-ই পয়লা নম্বরের উন্মাদ বা জাহেল।

১. অর্থাৎ আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনাকে ওরা উন্মাদ বলায় আপনার প্রতিদান বৃদ্ধি পায়। আর আপনার সত্তা থেকে মানবজাতি হেদায়াতের যে শাশ্বত ফয়েয লাভ করবে, তার অফুরন্ত পুরস্কার ও ছওয়াব নিশ্চয়ই আপনি পাবেন। উন্মাদ ও পাগলদের ভবিষ্যৎ কি কখনো এমন উজ্জ্বল ও শানদার হতে পারে? অথবা কোন পাগলের পরিকল্পনা এভাবে সফল হতে কেউ দেখেছে? অতএব আল্লাহর নিকট যাঁর এত বিরাট মর্যাদা, তাঁকে কতক আহমকের উন্মাদ বলায় কী আসে যায়?

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে উন্নত স্বভাব-চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, উন্মাদদের মধ্যে কি এমন নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলি কল্পনা করা যায়? একটা পাগলের কথা ও কর্মের মধ্যে কিছুতেই মিল ও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, তার কাজকর্মের সাথে তার কথাবার্তার সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, আপনার অবস্থা এই যে, আপনার যবান হচ্ছে পবিত্র কুরআন আর আপনার আমল ও স্বভাব-চরিত্র কুরআনের নীরব (ও বাস্তব) তাফসীর বা ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআন যেসব নেকি, যেসব গুণ ও কল্যানের প্রতি আহ্বান করে, তা জন্মগতভাবেই আপনার মধ্যে বর্তমান। অপরদিকে কুরআন যে সকল মন্দ স্বভাব, আচার-আচরণ ও কথা-কর্মকে নিষেধ করে, আপনি স্বভাবগতভাবেই তা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন।

জন্মগতভাবেই আপনার স্বভাব-প্রকৃতি এমন যে, আপনার কোন চাল-চলন বরং কোন কিছুই সংগতি ও ভারসাম্য থেকে এক ইঞ্চিও এদিক-সেদিক হয় না। আপনার চরিত্রমাধুর্যই অনুমতি দেয় না- অজ্ঞ ও নীচ লোকদের দোষারোপ ও নিন্দাবাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার। যে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র এত উন্নত এবং দৃষ্টিভঙ্গি এত মহান, তিনি কি কোন পাগলের পাগল বলার প্রতি মনোযোগ দেবেন? আপনি তো বরং যারা আপনাকে পাগল বলছে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা ও সহানুভূতিতে নিজেকে বিগলিত করছিলেন! যার ফলে আপনার সুযোগ হয় فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ এর সম্বোধন শোনার।

প্রকৃতপক্ষে নৈতিক চরিত্র ও মহানুভবতার সর্বোৎকৃষ্ট দিক হল- দুনিয়ার নীচ ও হীন লোকগুলোর সাথে আচার-ব্যবহারকালে আল্লাহ পাকের মহান সত্তা থেকে গাফেল ও আত্মবিস্মৃত না হওয়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে এ জিনিস (আল্লাহর স্মরণ) বর্তমান

৫. শীঘ্রই আপনি দেখে নেবেন এবং ওরাও দেখে নেবে—

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۙ

৬. যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত[১]।

بِاَيِّيكُمُ الْمَفْتُوْنُ

৭. নিশ্চয় আপনার রবই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন পথপ্রাপ্তদের[২]।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَاَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۪ وَهُوَاَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

৮. অতএব আপনি অস্বীকারকারীদের কথা শুনবেন না।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ

৯. ওরা চায়, আপনি নমনীয় হন, তাহলে ওরাও নমনীয় হবে[৩]।

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ

থাকবে, সমস্ত আচরণ-ব্যবহার ইনসাফ ও নৈতিক চরিত্রের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে। শায়খ জুনায়দ বাগদাদী (র) কতই না সুন্দর বলেছেন–

سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله تعالى، عاشر الخلق بخلقه و ذاهلهم بقلبه، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق

('আল্লাহ তাআলা তাঁর চরিত্রকে মহান বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাঁর আর কোনো চিন্তাই ছিল না। তিনি সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মহান চরিত্র নিয়ে মেলামেশা করেছেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন তাদের থেকে দূরে। অতএব তাঁর জাহের ছিল সৃষ্টির সাথে, আর বাতেন ছিল স্রষ্টার সঙ্গে।')

আর কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী ওসিয়ত করেছেন যে– عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق ('তুমি সৃষ্টির সঙ্গে চরিত্রমাধুর্য নিয়ে বাস করবে, আর স্রষ্টার দরবারে সততা নিয়ে থাকবে।')

১. অর্থাৎ অন্তরে তো ওরা প্রথম থেকেই বুঝতে পারছে, তবে শীঘ্রই উভয় দল স্বচক্ষে দেখে নেবে— কারা ছিল সতর্ক, বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী, আরা কারা ছিল বিকৃতমস্তিষ্ক, যার কারণে পাগলদের মত বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলত।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তো পূর্ণরূপে জানেন যে, কারা সৎপথে আসবে এবং কারা পথচ্যুত হবে। তবে ফলাফল যখন সামনে আসবে, তখন সকলেই দেখতে পাবে, কে সফলতার কোঠায় পৌঁছল এবং কে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিষ্ফল ও অকৃতকার্য রইল।

৩. অর্থাৎ কারা সৎপথে আসবে এবং কারা আসবে না- তা আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানে নির্ধারিত হয়ে আছে। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে কারো জন্য কোন বিবেচনা বা রেয়াত করার প্রয়োজন নেই। যে পথে আসার, সে আসবেই আসবে আর যে চিরতরে বঞ্চিত, সে কোনক্রমেই আসবে না।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ⑩

১০. এবং এমন কোনো ব্যক্তির কথাও শুনবেন না, যে অত্যধিক শপথকারী, লাঞ্ছিত[১]-

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ⑪

১১. পরনিন্দাকারী। যে চোগলখোরী করে বেড়ায়।

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ⑫

১২. যে ভাল কাজে অত্যধিক বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, বড় পাপী,

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ⑬

১৩. কঠোর স্বভাববিশিষ্ট। তদুপরি সে কুখ্যাত[২]–

মক্কার কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি মূর্তিপূজা সম্পর্কে আপনার কঠোর নীতি পরিহার করুন এবং আমাদের উপাস্যদের বাতিল বলা থেকে নিবৃত্ত হোন। আমরাও আপনার আল্লাহকে সম্মান করব এবং আপনার পথ-পদ্ধতি ও চিন্তাধারার বিরোধিতা থেকে বিরত থাকব।

নবীজিকে (স) এরূপ আদেশ দেওয়ার তাৎপর্য

যে মহান সংস্কারকের জন্মই হয়েছিল মহান চরিত্রমাধুর্য নিয়ে, তাঁর অন্তরে নেক নিয়তেই এমন চিন্তা আসা অসম্ভব ছিল না যে, একটু নম্রতা অবলম্বন করায় ও শিথিল হওয়ায় যদি কাজ উদ্ধার হয় এবং তারা হিদায়াতের উপর এসে যায়, তাহলে কিছু দিনের জন্য নমনীয়তা অবলম্বন করলে কী ক্ষতি? এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলছেন যে, আপনি এই মিথ্যাবাদীদের কথা মানবেন না। এদের উদ্দেশ্য শুধু আপনাকে নমনীয় করা। ঈমান আনা ও সত্যকে গ্রহণ করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আপনার আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য এই উপায়ে হাসিল হবে না। আপনি সকল দিক উপেক্ষা করে নিজ কর্তব্য পালন করতে থাকুন। কাউকে মানানো এবং পথে নিয়ে আসার যিম্মাদার আপনি নন।

বি. দ্র. مداهنت (দীনী ব্যাপারে নমনীয়তা ও দুর্বলতা) আর مدارات (বাহ্যিক ভদ্রতা-শিষ্টতা) এ দুয়ের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি দূষনীয়, দ্বিতীয়টি প্রশংসনীয়। فلاتغفل (সুতরাং উদাসীনতা নয়, সতর্কতা কাম্য।)

১. অর্থাৎ যার দিলে আল্লাহর নামের আজমত ও মর্যাদা নেই। ফলে সে মিথ্যা শপথ করাকে এক মামূলী বিষয় মনে করে। তাছাড়া যেহেতু মানুষ তার কথায় আস্থা রাখে না, এজন্য তাদের বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে বারবার সে শপথ করে, আর এভাবে মানুষের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়।

২. অর্থাৎ উক্ত বদস্বভাবগুলির সঙ্গে সে কলঙ্কিত ও মানুষের নিকট কুখ্যাতও বটে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এগুলো কাফেরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। মানুষের উচিত নিজের ভিতরটা দেখা এবং এসব বদস্বভাব বর্জন করা।'

কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষীর নিকট زنيم এর অর্থ জারজ সন্তান। যে কাফের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়, সে তেমনি ছিল।

১৪. এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী[১]।

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝

১৫. যখন ওকে আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, সে বলে, 'এগুলো তো পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী[২]।'

إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۝

১৬. শীঘ্রই আমি ওর নাক দাগিয়ে দেব[৩]।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

১৭. আমি ওদের পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগান-মালিকদের[৪]— যখন তারা শপথ করল যে, তারা ভোরে বাগানের ফল-ফসল কাটবে।

إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝

১৮. আর (এ কথা বলার সময়) তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলল না[৫]।

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝

---

১. দুনিয়াতে যদি কোন ব্যক্তি ভাগ্যবান বলে মনে হয়, যেমন সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী— তবে শুধু এতটুকুর জন্য তার কথা মানা যেতে পারে না। আসল জিনিস হচ্ছে মানুষের সৎস্বভাব ও নৈতিক চরিত্র। যার মধ্যে ভদ্রতা, সৌজন্য ও সৎস্বভাব নেই, তার বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আল্লাহওয়ালাদের কাজ নয়।

২. মূলত এ কথা বলে সে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে।

৩. কথিত আছে, ওলীদ ইবনে মুগীরা নামে এক কুরায়শ-সর্দার ছিল। ওর মধ্যে এসব দোষের সমাবেশ ঘটেছিল। আর নাকে দাগ দেওয়ার অর্থ লাঞ্ছিত-অপদস্থ করা। দুনিয়াতে বাহ্যতও কোন দাগ পড়ে থাকতে পারে, অথবা আখেরাতে পড়বে।

৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততির আধিক্য মকবূলিয়তের (আল্লাহর প্রিয় হওয়ার) আলামত নয়। না আল্লাহ তাআলার নিকট এসবের কোন মান-মর্যাদা আছে। সুতরাং মক্কার কাফেররা যেন তাতে গৌরব না করে। তা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওদের জন্য পরীক্ষা, যেমন পূর্বেও কতক লোকের এরূপ পরীক্ষা করা হয়েছিল।

৫. কয়েক ভাই উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা থেকে একটি বাগান লাভ করেছিল। বাগানের ফল-ফসলে বাড়ির সমস্ত লোকজন তৃপ্ত ছিল। জীবদ্দশায় পিতার অভ্যাস ছিল, যেদিন বাগানের ফল তোলা হত বা ফসল কাটা হত, সেদিন এলাকার গরীব-মিসকীন জমা হত এবং যথাসম্ভব তাদের কিছু কিছু দেওয়া হত। এতেই বরকত হত। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেদের খেয়াল হল, গরীব-মিসকীনদের না দিলে সবটাই নিজেদের কাজে লাগবে। সুতরাং পরামর্শক্রমে কৌশল স্থির করল যে, খুব সকাল সকাল বাগানে গিয়ে ফসল কেটে নিয়ে আসবে। গরীবরা টেরও পাবে না। যখন ফকীর-মিসকীন বাগানে যাবে, তখন কিছুই পাবে

১৯. অতঃপর সেই বাগানে আপনার রবের পক্ষ থেকে কোনো পরিভ্রমণকারী চক্কর দিয়ে গেল, আর তখন ওরা ছিল ঘুমে বিভোর।	فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. ফলে সকাল নাগাদ বাগানটি কাটা ক্ষেতের মত হয়ে গেল[১]।	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾
২১. আর প্রত্যুষেই তারা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে বলতে লাগল—	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾
২২. 'সকাল সকাল নিজেদের বাগানে চল, যদি তোমরা ফসল কাটতে চাও।'	أَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. তারা নিম্নস্বরে এ কথা বলতে বলতে চলল–	فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. যে, 'আজ যেন কোন মিসকীন তোমাদের নিকট বাগানে প্রবেশ করতে না পারে'।	أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾
২৫. এবং তারা ভোরে দ্রুতবেগে চলল, এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা সক্ষম[২]।	وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর যখন তারা বাগানটি দেখল, তখন বলল, 'আমরা তো পথ হারিয়ে ফেলেছি।	فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْا إِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. (পরে বলল) 'না না, আমরা বরং কপালপোড়া[৩]!'	بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾

না। আর ভাইয়েরা নিজেদের কৌশলের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, 'ইনশাআল্লাহ' পর্যন্ত বলেনি। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৩৭৯)

১. অর্থাৎ রাতের বেলায় ঘূর্ণিবায়ু এল, যাতে ছিল আগুন। অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমস্ত বাগান ও ফসল ধ্বংস হয়ে গেল।

২. অর্থাৎ এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এখন গিয়ে সমস্ত ফল-ফসল নিজেদের কব্জায় নিয়ে নেব।

৩. সেই বাগান ফল-ফসলসহ এমনি বিপর্যস্ত হয়ে যায় যে, সেখানে পৌছে তারা তা চিনতেই পারেনি; বরং মনে হল, পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে এসেছে। পরে ভাল করে লক্ষ করে বুঝল, জায়গা তো সেটাই, কিন্তু তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটেছে এবং আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে তারা মাহরূম (বঞ্চিত) হয়েছে।

২৮. তাদের মেঝজন বলল, 'আমি কি তোমাদের বলিনি, তোমরা কেন আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছ না[১]?'

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ۝

২৯. তারা বলল, 'আমাদের রব পবিত্র, আমরাই ছিলাম অপরাধী।'

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۝

৩০. অতঃপর তারা একে অপরের অভিমুখী হয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল[২]।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ۝

৩১. তারা বলল, 'হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরাই ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ۝

৩২. 'সম্ভবত আমাদের রব আমাদেরকে এই বাগানের পরিবর্তে আরো উত্তম বাগান দান করবেন। আমরা তো আমাদের রবের কাছে আশাবাদী[৩]।'

عَسٰى رَبُّنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَاۤ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ۝

৩৩. এরূপই হয় আযাব। আর নিশ্চয় আখেরাতের আযাব সবচেয়ে গুরুতর, যদি তারা বুঝত[৪]!

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ۝

---

১. তাদের মেঝজন সবচেয়ে সতর্ক ছিল। পরামর্শের সময় সম্ভবত সে ভাইদের সতর্ক করে বলেছিল যে, আল্লাহকে ভুলো না। এসবকে তাঁরই অনুগ্রহ জ্ঞান কর এবং অভাবীদের সেবায় ত্রুটি করো না। তার কথায় কেউ কান না দিলে সে চুপ হয়ে যায় এবং অন্য ভাইদের সহমত হয়ে যায়। এখন এই ধ্বংস দেখে সে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিল।

২. এখন তারা নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহ-অভিমুখী হল এবং সাধারণ বিপদের সময় যে নিয়ম, সে মত তারা একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকল এবং প্রত্যেকে অপরকে এই বিপদ ও ধ্বংসের কারণ ঠাওরাল।

৩. পরিশেষে সকলে একবাক্যে বলতে লাগল– সত্যই এটা আমাদের বাড়াবাড়ি যে, আমরা গরীব-মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছিলাম। আমরা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মুল পুঁজিও হারালাম (বাগান থেকে কিছুই পেলাম না)। যা কিছু হয়েছে, আমরাই এর জন্য দায়ী। তবে আমরা এখনো নিজেদের প্রতিপালক থেকে নিরাশ নই। অসম্ভব কী, তিনি নিজ রহমতে পূর্ব বাগানের চেয়েও উত্তম বাগান আমাদের দান করতে পারেন।

৪. অর্থাৎ তা তো ছিল দুনিয়ার আযাবের একটি ছোট্ট নমুনা, যা কেউ প্রতিহত করতে পারেনি। সুতরাং আখেরাতের মহাবিপদ কে প্রতিহত করতে পারবে? জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে মানুষ সহজেই এ কথা বুঝতে পারে।

[রুকূ - ২]

৩৪. নিশ্চয় খোদাভীরুদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে নে'য়ামতের উদ্যানরাজি[১]।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ النَّعِيمِ ۝

৩৫. আমি কি অনুগতদের অপরাধীদের সমান সাব্যস্ত করব?

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝

৩৬. তোমাদের কী হল? তোমরা কী রকম ফয়সালা করছ[২]?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

৩৭. তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে, যার মধ্যে তোমরা এ কথা পাঠ কর—

أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۝

৩৮. যে, তোমাদের জন্য সেখানে তোমরা যা পছন্দ কর তাই রয়েছে?

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۝

৩৯. নাকি তোমাদের পক্ষে আমার যিম্মায় কিয়ামত পর্যন্ত এ শপথ রয়েছে যে, তোমরা তা-ই পাবে যা তোমরা স্থির করবে?

أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ۝

৪০. আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করুন, ওদের মধ্যে কে এসব দাবির যিম্মাদার[৩]?

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ۝

---

১. অর্থাৎ দুনিয়ার বাগ-বাগিচা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন আর কী? জান্নাতের বাগ-বাগিচা এরচে' বহুগুণে উত্তম, যেখানে রয়েছে সব রকমের নে'য়ামত। আর তা একমাত্র মুত্তাকীদের জন্য।

২. মক্কার কাফেররা অহংকার ও গর্ববশত নিজেদের মনে মনে ভাবত, যদি কিয়ামতের দিন মুসলমানদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ হয়, তবে তা আমাদের প্রতি আরো বেশি হবে এবং দুনিয়াতে যেভাবে আল্লাহ আমাদের আরাম-আয়েশে রেখেছেন, সেখানেও তাই হবে।

উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, একজন হল আজ্ঞাবহ দাস, যে সর্বদা নিজ মনীবের হুকুম মান্য করার জন্য তৈরি থাকে। অপরজন হল অপরাধী, বিদ্রোহী। উভয়ের পরিণাম একই রকম হতে পারে কি? এ তো এমন কথা, যা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন রুচি-প্রকৃতি গ্রহণ করতে পারে না।

৩. অর্থাৎ মুসলিম ও অপরাধী উভয়কে সমান সাব্যস্ত করা স্পষ্টতই জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেক পরিপন্থী। তবে কি এর সমর্থনে তোমাদের নিকট কোন ধর্মীয় প্রমাণ আছে? যেমন : কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে কি তোমরা এ কথা পড়েছ যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করবে

৪১. নাকি ওদের শরীকরা আছে? তা হলে ওরা আপন শরীকদের উপস্থিত করুক, যদি ওরা সত্যবাদী হয়[১]।

اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ

৪২. (স্মরণ কর), যেদিন ساق '(সাক্‌') খোলা হবে এবং ওদের সেজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে, কিন্তু ওরা (করতে) পারবে না[২]—

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

তাই পাবে? এবং তোমাদের সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ করা হবে? অথবা আল্লাহ তাআলা কি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য এমন শপথ করেছেন যে, তোমরা যা কিছু মনে মনে স্থির করবে তাই তোমাদের দেওয়া হবে এবং যেভাবে আজ তোমরা আরাম-আয়েশে আছ, কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থাতেই তোমাদের রাখা হবে? যে ব্যক্তি এমন দাবি করতে চায় এবং তা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিজের উপর নেয়, তাকে সামনে নিয়ে আস। আমিও দেখব, সে এ কথা কোথা থেকে বলে?

১. অর্থাৎ ওদের কাছে যদি বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় কোন প্রমাণই না থাকে, শুধু মিথ্যা দেব-দেবীর ভরসায় এ দাবি করে থাকে যে, তারা ওদেরকে এমন এমন করে দেবে এবং এমন সব মর্তবা পাইয়ে দিবে (কেননা, তারা স্বয়ং আল্লাহর শরীক ও অংশীদার—) তবে এ দাবিতে ওদের সত্যতা তখনি প্রমাণিত হবে, যখন ওরা সেই শরীকদের আল্লাহর মোকাবেলায় ডেকে আনবে এবং তাদের দ্বারা নিজেদের মনগড়া কাজকাম করিয়ে নেবে। কিন্তু মনে রেখো, এই উপাস্যরা এই উপাসকদের চেয়েও বেশি অক্ষম ও অসহায়। তারা ওদের কী সাহায্য করবে? স্বয়ং নিজেদেরও কোনো সাহায্য তারা করতে পারবে না।

২. বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি মরফূ' হাদীছে বিষয়টির বর্ণনা এভাবে এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে নিজ ساق ('সাক্‌') প্রকাশ করবেন। ساق ('সাক্‌') এর (সাধারণ) অর্থ পায়ের গোছা। এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার কোন বিশেষ গুণ বা অবস্থা (তাজাল্লী), যাকে কোন বিশেষ উপযোগিতার কারণে ساق বলা হয়েছে। যেমন: কুরআন শরীফে (আল্লাহ তাআলার জন্য) يد (হাত) ও وجه (চেহারা) শব্দাবলির প্রয়োগ হয়েছে।

এ শব্দগুলির অর্থ ও তাৎপর্য 'মুতাশাবিহাত' (বিদিত নয় এমন শব্দাবলি) এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার সত্তা, অস্তিত্ব, হায়াত (জীবন) এবং তাঁর (بصر) দেখা, (سمع) শোনা প্রভৃতি সিফাতের ন্যায় উল্লিখিত বিষয়গুলির স্বরূপ অনুসন্ধান ছাড়াই তার প্রতি আমাদের ঈমান রাখতে হবে।

উক্ত হাদীছে এ কথাও আছে যে, ওই তাজাল্লী দেখে মুমিন নর-নারী সকলে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) লোক দেখানোর জন্য সেজদা করত, তার কোমর বাঁকা হবে না, তক্তার মত সোজা হয়ে থাকবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৯১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৮৩) আর লোক দেখানো সেজদাকারী ও মুনাফিকরাই যেখানে সেজদা করতে সক্ষম হবে না, তখন কাফেররাও যে অক্ষম থাকবে তা তো বলাই বাহুল্য।

৪৩. ওদের চোখগুলি থাকবে অবনত[১], ওদের আচ্ছন্ন করে রাখবে লাঞ্ছনা। অথচ (ইতিপূর্বে) ওদেরকে সেজদা করার জন্য ডাকা হত যখন ওরা সুস্থ ছিল[২]।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. অতএব আমাকে ও যারা এই বাণীকে অস্বীকার করে, তাদের স্ব অবস্থায় ছেড়ে দিন; আমি ওদের ধীরে ধীরে এমনভাবে (জাহান্নামের দিকে) নিয়ে যাব যে, ওরা টেরও পাবে না[৩]।

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর আমি ওদের অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় আমার কৌশল খুবই পরিপক্ক[৪]।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. আপনি কি ওদের নিকট কোন বিনিময় চান যে, ওরা জরিমানার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾

হাশরের মাঠে এরূপ এজন্য করা হবে, যাতে মুমিন-কাফের ও মুখলেস-মুনাফিক (-এর আসল রূপ) স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা লোকসমক্ষে পরিষ্কার হয়ে যায়।

বি. দ্র. 'মুতাশাবিহাত' এর বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) (তাফসীরে আযীযিতে) বর্তমান আয়াতের ব্যাখ্যায় মুতাশাবিহাত বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চমানের পর্যালোচনা করেছেন। তা দ্রষ্টব্য।

১. অর্থাৎ অনুতাপ ও লজ্জায় ওদের চোখ উপরের দিকে উঠবে না।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় সেজদার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তখন সুস্থ-সবল হয়েও কখনো এখলাসের সাথে সেজদা করেনি। এর প্রতিক্রিয়া এই যে, সেজদা করার যোগ্যতাই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন চাইলেও সেজদা করতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ ওদের শাস্তি হওয়া তো সুনিশ্চিত। তবে তা আসতে কিছু দিনের দেরি হচ্ছে এই যা। এজন্য আপনি দুঃখ করবেন না। ওদের ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি নিজে ওদের দেখে ছাড়ব। আমি ওদের ধীরে ধীরে দোযখের দিকে নিতে থাকব, যা ওরা টেরও পাবে না। ওরা বরং আপন অবস্থায় মগ্ন থাকবে আর ভিতরে ভিতরে ওদের সুখ-স্বপ্নের শিকড় ছিঁড়তে থাকবে।

৪. অর্থাৎ আমার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশল এমন পাকাপোক্ত যে, ওরা তা বুঝতেও পারবে না। সুতরাং ওরা তা রুখবে কেমন করে?

৪৭. নাকি ওদের নিকট গায়বের (ইলম) আছে, আর ওরা (তা) লিখে রাখে[১]?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝

৪৮. অতএব আপনি স্বীয় রবের আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরুন এবং মাছওয়ালার মত হবেন না[২] যখন তিনি (আল্লাহকে) ডাকলেন প্রচণ্ড রাগত অবস্থায়[*৩]।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۝

৪৯. যদি না তাঁর রবের অনুগ্রহ তাঁকে সামলাত, তবে তিনি অবশ্যই উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন অভিযুক্ত হয়ে[৪]।

لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝

---

১. অর্থাৎ আফসোস ও আশ্চর্যের কথা যে, এ লোকগুলো এভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তবু আপনার কথা মানছে না। তা, ওদের না মানার কারণ কি? আপনি কি ওদের কাছে প্রতিদান (বেতন, পারিশ্রমিক ইত্যাদি) চাচ্ছেন, যার চাপে ওরা পিষ্ট হচ্ছে? নাকি স্বয়ং ওদের নিকট অদৃশ্য জগতের খবরাদি ও আল্লাহর ওহী আসছে, যা হেফাজত করার জন্য কুরআনের মতই লিখে নিচ্ছে, এ জন্য আপনার অনুসরণের প্রয়োজন মনে করছে না?

যা হোক, না মানার কোন কারণ তো থাকা উচিত। যখন বাস্তবে ওদের উপর কোন বোঝাও চাপানো হচ্ছে না এবং এই কিতাবের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, তখন না মানার কারণ শত্রুতা ও অবাধ্যতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

২. অর্থাৎ আপনি কাফেরদের ব্যাপারে মাছের পেটে গমনকারী পয়গম্বর (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম)-এর মত অধৈর্য ও অস্থিরতা প্রকাশ করবেন না। তাঁর কাহিনী ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

★ **দ্বিতীয় তরজমা**–'চরম দুঃখ-ভারাক্রান্ত অবস্থায়'।

৩. অর্থাৎ স্বজাতির আচরণে চরম ক্রুদ্ধ ছিলেন। ক্রোধান্বিত হয়ে দ্রুত আযাবের জন্য দো'য়া বরং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসির مَكْظُوْم এর অর্থ করেছেন– দুঃখ-ভারাক্রান্ত। দুঃখ ছিল কয়েকটি— জাতির ঈমান না আনার দুঃখ, আযাব টলে যাওয়ার দুঃখ, (আল্লাহর) অনুমতি ব্যতীত শহর ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ, মাছের পেটে অবরুদ্ধ থাকার দুঃখ। এ অবস্থায় তিনি আল্লাহকে ডাকলেন এবং এই দো'য়া করলেন– لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ('আপনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি পবিত্র; নিশ্চয় আমিই অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।') ফলে আল্লাহ তাআলার দয়া হল এবং তিনি মাছের পেট থেকে নাজাত পেলেন।

৪. অর্থাৎ তাঁর তওবা কবুল হওয়ার পর আল্লাহর অধিকতর দয়া ও অনুগ্রহ যদি সাহায্যকারী না হত, তবে মাছের পেট থেকে তিনি যে নির্জন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সেখানেই অভিযুক্ত হয়ে পড়ে থাকতেন এবং তাঁর সেই কামালাত ও কারামাতও অবশিষ্ট রাখা হত না, যেগুলি আল্লাহর মেহেরবানীতে সেই পরীক্ষার সময়ও অক্ষুণ্ন ছিল।

৫০. অতঃপর তাঁর রব তাঁকে মনোনীত করলেন, এবং তাঁকে (কামেল) পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন[১]।

فَاجۡتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۵۰﴾

৫১. কাফেররা যখন যিক্‌র (তথা কুরআন) শোনে তখন মনে হয়, ওরা যেন ওদের (তীক্ষ্ণ) দৃষ্টির দ্বারা আপনার পদস্খলন ঘটিয়ে দেবে, আর ওরা বলে, 'এ তো এক পাগল[২]!'

وَاِنۡ یَّكَادُ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لَیُزۡلِقُوۡنَكَ بِاَبۡصَارِهِمۡ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكۡرَ وَیَقُوۡلُوۡنَ اِنَّهٗ لَمَجۡنُوۡنٌ ﴿۵۱﴾

৫২. অথচ তা (কুরআন) তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বৈ কিছু নয়[৩]।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۵۲﴾

---

১. অতঃপর তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিলেন এবং তাঁকে সর্বোচ্চ পুণ্যাত্মা ও শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। হাদীছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন না বলে যে, আমি (অর্থাৎ নবীজি) ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে শ্রেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৩৯৫)

২. অর্থাৎ কাফেররা কুরআন শুনে রাগে-ক্রোধে জ্বলে উঠে এবং এমন কড়া নজরে আপনার দিকে তাকায় যে, পারলে আপনাকে স্বস্থান থেকে হটিয়ে দেয়। তদুপরি ওরা শোরগোল করে বলে, এ ব্যক্তি তো পাগল হয়ে গেছে। এর কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

উদ্দেশ্য এই যে, এভাবে আপনাকে ঘাবড়ে দিয়ে ধৈর্য ও স্থিরতার মাকাম থেকে টলিয়ে দিতে চায়। তবে আপনি বরাবরের মত আপনার নীতির উপর অবিচল থাকুন। কোন ব্যাপারে ভীত-বিচলিত হবেন না, তাড়াহুড়া করবেন না এবং শিথিলতা অবলম্বন করবেন না।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসির لَيُزۡلِقُوۡنَكَ بِاَبۡصَارِهِمۡ এর এ অর্থ করেছেন যে, বদ-নজর লাগানোয় প্রসিদ্ধ– এমন কিছু লোককে কাফেররা উদ্বুদ্ধ করেছিল, তারা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বদ-নজরে আক্রান্ত করার চেষ্টা করে। যখন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, তখন ওদের একজন কাছে এসে জোরেশোরে বদ-নজরে আক্রান্ত করায় সচেষ্ট হল। তিনি তখন لاحول ولاقوة إلا بالله পড়লেন। এতে সে নিষ্ফল ও অকৃতকার্য হয়ে ফেরত চলে গেল।

নজর লাগা বা লাগানোর বিষয়ে আলোচনা করার স্থান এটা নয়। আর আজকাল যেখানে মেসমেরিজম একটি নিয়মিত শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে, তখন এ বিষয়ে অধিক তর্ক-বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন।

৩. অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে পাগলামী কথাবার্তা কোথায়? তোমরা যে কুরআনকে পাগলামীর ফসল বলছ, সেই কুরআন তো প্রকৃতপ্রস্তাবে সমস্ত বিশ্বজগতের জন্য সুমহান ওয়াজ-নসীহতের (শিক্ষা ও উপদেশের) একটি ভাণ্ডার। এর দ্বারাই মানবগোষ্ঠীর সংশোধন ও পৃথিবীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে। আর সেই লোকেরাই পাগল সাব্যস্ত হবে, যারা এই কালামের জন্য পাগল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেনি।

সূরা হা-ক্কা

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৬৯ । ৫২ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آياتها ٥٢، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَاقَّةُ ۝١

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

مَا الْحَاقَّةُ ۝٢

২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা[১]?

وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝٣

৩. আর আপনি কি জানেন, কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা[২]?

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤

৪. ছামূদ ও আ'দ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল সেই বিচূর্ণকারী (মহাপ্রলয়)-কে[৩]।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥

৫. তো ছামূদ সম্প্রদায়- ওদের ধ্বংস করা হয়েছিল প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দ্বারা[৪]।

---

১. অর্থাৎ কিয়ামত-মুহূর্তের আগমন সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আল্লাহর জ্ঞানে সাব্যস্ত ও নির্ধারিত হয়ে আছে। আর যখন তা আসবে তখন সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কোন রকমের দ্বিধা-সন্দেহ ও অস্পষ্টতা বাকি থাকবে না। সকল বিষয় পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে এবং মুহূর্তটির আগমনের ব্যাপারে বিতর্ককারীরা সকলে তখন পরাস্ত ও পরাজিত হবে। তোমরা কি জান, সেই মুহূর্তটির স্বরূপ কী এবং কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তখন সৃষ্টি হবে?

২. অর্থাৎ যে কোনো বড় থেকে বড় মানুষ যতই চিন্তা-ফিকির করুক, সেদিনের ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ দৃশ্যাবলি পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারবে না। তবে কিছুটা বোঝানোর উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্ত ও তুলনাস্বরূপ সম্মুখে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ হচ্ছে। তবে বুঝতে হবে যে, এগুলি 'কিয়ামতে কুবরা' (তথা প্রকৃত কিয়ামত) এর খুব সামান্য নুমনাই পেশ করে, পরিপূর্ণ নমুনা নয়। আর এই ছোট 'হাক্কাহ' (প্রলয়)গুলোর উল্লেখ সেই মহা 'হাক্কাহ'র (তথা কিয়ামতের) বর্ণনার জন্য ভূমিকাস্বরূপ।

৩. অর্থাৎ আদ ও ছামূদ জাতিদ্বয় সেই আসন্ন মুহূর্তকে (কিয়ামতকে) মিথ্যা বলেছিল, যা পৃথিবী, আসমান, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত ও মানব- সবকিছুকে নিষ্পেষিত করে ছাড়বে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর সৃষ্টিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে। এখন দেখে নাও, ওদের উভয়ের কী পরিণতি হয়েছে?

৪. অর্থাৎ ওদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে কঠিন ভূমিকম্পে, যা এক বিকট শব্দসহ সংঘটিত হয়েছিল এবং সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল।

৬. আর রইল আ'দ সম্প্রদায়, ওদের ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড শীতল, আয়ত্তবহির্ভূত প্রবল বাতাস দ্বারা[১]—

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

৭. যা আল্লাহ ওদের উপর আরোপ করে রেখেছিলেন সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত, বিরামহীনভাবে। তুমি (সেখানে থাকলে) সেই লোকদের দেখতে পেতে যে, ওরা সেখানে আছাড় খেয়ে পড়ে আছে, যেন অন্তঃসারশূন্য খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড[২]।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعٰى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

৮. এখন তুমি কি ওদের কাউকে জীবিত দেখতে পাও[৩]?

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۝

৯. ফেরাওন, ওর পূর্ববর্তীরা এবং উলটে যাওয়া জনপদগুলোও লিপ্ত হয়েছিল পাপাচারে।

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

১০. ওরা আপন রবের রাসূলকে অমান্য করল, ফলে তিনি ওদের পাকড়াও করলেন কঠোরভাবে[৪]।

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۝

---

১. অর্থাৎ সেই বাতাস এতই প্রচণ্ড ও প্রবল ছিল যে, তা কোন সৃষ্টির আয়ত্তে ছিল না, এমন কি বাতাসের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদেরও আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল।

২. অর্থাৎ যে সম্প্রদায় লেংটি কষে মল্লভূমিতে এই বলে অবতীর্ণ হত যে, مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?)– ওরা আমার বাতাসের মোকাবেলা করতে পারেনি এবং এ রকম শক্তিশালী পালোয়ানরা বাতাসের চপেটাঘাতে এমনভাবে আছড়ে পড়ল, যেন খেজুর গাছের নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য কাণ্ড– যেগুলোর মাথা উপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলোকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় যে, ওদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি।

৪. অর্থাৎ আদ ও ছামূদ জাতির পর ফেরাওন অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি-দাওয়া নিয়ে আবির্ভূত হল এবং ওর পূর্বে আরো কতক পাপাচারী জাতির আবির্ভাব হয়েছিল (যথা নূহের জাতি, শোআ'য়বের জাতি ও লূতের জাতি, যাদের বসতি উলটিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। ওরা সকলেই নিজ নিজ পয়গম্বরের নাফরমানী করেছিল এবং আল্লাহর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

১১. যখন পানি নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত হয়ে পড়েছিল (অর্থাৎ ভয়াবহ জলোচ্ছাস হয়েছিল), তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম,	إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾
১২. যাতে সেই ঘটনাকে তোমাদের জন্য বানাই স্মারক এবং যাতে সংরক্ষণকারী কান তা স্মরণ রাখে[১]।	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. যখন শিঙ্গায় একটিমাত্র ফুৎকার দেওয়া হবে,	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালাকে উত্তোলন করে এক আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে;	وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾
১৫. সেদিনই সংঘটিত হবে সেই ঘটনা (মহাপ্রলয়)[২]।	فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

পরিশেষে সকলকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেন। আল্লাহর সামনে ওদের কোনো কিছুই টেকেনি।

১. অর্থাৎ নূহের যামানায় যখন প্লাবন এল, তখন জাহেরী আসবাবের (উপায়-উপকরণের) দিক থেকে তোমরা মানবগোষ্ঠীর কারও বাঁচার কথা ছিল না। কিন্তু এ ছিল আমার কুদরত ও হেকমত এবং দয়া ও অনুগ্রহ যে, সকল কাফেরকে ডুবিয়ে দিয়ে নূহ (আ)- কে তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ রক্ষা করেছিলাম। আচ্ছা, এমন মহপ্লাবনের মধ্যে একটি নৌকার পক্ষে নিরাপদ থাকার কোন আশা করা যেত কি? কক্ষনো না। কিন্তু আমি আমার কুদরত ও হেকমতের চমক দেখালাম, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ এ ঘটনাকে স্মরণ রাখে এবং যেসব কান কোন সংগত কথা শোনে, বোঝে ও সংরক্ষণ করে, সেসব কান কখনো এ ঘটনা না ভোলে যে, আমাদের উপর এক কালে এমন অনুগ্রহ হয়েছিল এবং এ সত্য উপলব্ধি করে যে, দুনিয়ার ধর-পাকড়ের সময় যেমন নাফরমান পাপীদের থেকে আজ্ঞাবহ পুণ্যাত্মাদের পৃথক রাখা হয়, তদ্রূপ কিয়ামতের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও এরূপই হবে।

সামনে এ বিষয়েই আলোচনা করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত স্ব স্ব স্থান থেকে বিচ্যুত হবে, এবং এগুলোকে কুটে-পিষে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। ব্যস্, এ-ই হচ্ছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়।

১৬. আর আকাশ ফেটে যাবে এবং সেদিন তা হবে দুর্বল,

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. আর ফেরেশতারা থাকবে তার প্রান্তদেশ-সমূহে[১]। এবং সেদিন আটজন (ফেরেশতা) নিজেদের উপরে আপনার রবের আরশ উঠিয়ে রাখবে[২]।

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৮. সেদিন তোমাদের এ অবস্থায় হাযির করা হবে যে, তোমাদের কোন গোপন বিষয় গোপন থাকবে না[৩]।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৯. অতঃপর যাকে স্বীয় আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, '(হে লোক সকল) নাও, আমার আমলনামা পড়[৪]।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

২০. 'আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব[৫]।'

اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

---

১. অর্থাৎ আজ যে আসমান এত শক্ত ও পরিপক্ক যে, লাখো বছর অতীত হয়ে যাওয়ার পরও তার কোথাও কোনো ছিদ্র হয়নি বা ফাটল ধরেনি, সেদিন সেই আসমান ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। আর যখন তা মাঝখান থেকে ফাটতে আরম্ভ করবে, তখন ফেরেশতাগণ তার বিভিন্ন কিনারায় চলে যাবেন।

২. বর্তমানে মহান আরশ চারজন ফেরেশতা বহন করছেন, যাঁদের মান-মর্যাদা সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলাই অবগত। সেদিন এই চারজনের সঙ্গে আরো চারজন শরীক হবেন।

'তাফসীরে আযীযী'-তে এই সংখ্যার বিভিন্ন হেকমত এবং উক্ত ফেরেশতাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠকের জন্য তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ সেদিন আল্লাহর আদালতে তোমাদের হাযির করা হবে এবং কারো কোনো নেকী বা বদী (পাপ-পুণ্য) গোপন থাকবে না– সবই সর্বসমক্ষে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, যা নাজাতপ্রাপ্ত ও মকবুল হওয়ার আলামত- সে আনন্দের আতিশয্যে প্রত্যেককে তা দেখাতে থাকবে ও বলবে, 'এই যে নাও, আমার আমলনামা পড়।'

৫. অর্থাৎ আমি দুনিয়াতে বিশ্বাস রেখেছিলাম যে, একদিন অবশ্যই আমার হিসাব-কিতাব হবে। এই বিশ্বাসের কারণে আমি ভয় করে চলতাম এবং নিজের নফসের মুহাসাবা (অর্থাৎ নিজের

২১. অতএব সে থাকবে মনোমত জীবনে,

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

২২. সুউচ্চ উদ্যানে,

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

২৩. যার ফলমূল ঝুঁকে থাকবে[১]।

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

২৪. (তাদের বলা হবে,) ' তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর– তার বিনিময়ে, যা তোমরা অতীত দিনগুলিতে অগ্রিম পাঠিয়েছিলে[২]।'

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

২৫. আর যাকে স্বীয় আমলনামা বাঁ হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, 'হায়, কত ভাল হত যদি আমাকে আমার আমলনামা না দেওয়া হত!

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ

২৬. 'এবং আমি না জানতাম, কী আমার হিসাব?

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ

২৭. 'হায়, কত ভাল হত! যদি তা-ই (অর্থাৎ মৃত্যুই) সব শেষ করে দিত!

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

২৮. 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারেই এল না।

مَآ اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ

২৯. 'আমার ক্ষমতাও আমার থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল[৩]।'

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ

আমলাদির হিসাব-নিকাশ) করতাম। আজ তার (পরিণামে) সন্তোষজনক ফলাফল দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহর ফযলে আমার হিসাব অত্যন্ত পরিষ্কার।

১. ফলে সেগুলো দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় খুবই আসানীর সাথে হাসিল করা যাবে।

২. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের নফসের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সংযত করেছিলে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদির কষ্ট ভোগ করেছিলে। আজ কোনই বাধা-বিপত্তি নেই, খুব মজা করে তৃপ্তিসহ পানাহার কর। তাতে মন নিরানন্দ হবে না; বদ-হজমীও হবে না, অসুস্থতাও দেখা দেবে না এবং তা নিঃশেষ হওয়ারও আশঙ্কা হবে না।

৩. অর্থাৎ পিঠের দিক থেকে বাঁ হাতে যার আমলনামা দেওয়া হবে, সে বুঝে ফেলবে যে, দুর্ভাগ্য এসে গেছে। তখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! আমার হাতে যদি আমলনামা দেওয়া না হত এবং হিসাব-কিতাব কী জিনিস, তার কোন খবরই আমার না হত। আহ! মৃত্যু যদি আমার কাহিনী চিরতরে খতম করে দিত। মৃত্যুর পর আর জীবিত হওয়ার সুযোগ না হত, অথবা জীবিত হয়েছিলাম বটে, কিন্তু এখন আবার মৃত্যু এসে আমায় হজম করে ফেলত। আফসোস, আমার ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই

৩০. (ফেরেশতাদের বলা হবে,) 'ওকে ধর, তারপর ওর গলদেশে বেড়ি পরাও।	خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝
৩১. 'অতঃপর ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।	ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝
৩২. 'তারপর সত্তুর গজ দীর্ঘ এক শিকলে ওকে শৃঙ্খলিত কর[১]।'	ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝
৩৩. সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না,	اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝
৩৪. এবং অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতে উৎসাহিত করত না[২]।	وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝
৩৫. অতএব আজ এখানে তার কোনো বন্ধু নেই[৩],	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝
৩৬. এবং না আছে কোন খাদ্য– ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ছাড়া।	وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝
৩৭. তা পাপীদের ছাড়া আর কেউ খাবে না[৪]।	لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ۝

কাজে এল না। আজ সেসবের কোন কিছুরই পাত্তা নেই। আমার কোন দলীল-প্রমাণ কাজে আসছে না, কোন ওযর-আপত্তির অবকাশও দেখা যাচ্ছে না।

১. অর্থাৎ ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ হবে যে, ওকে ধর, গলায় বেড়ি পরাও, তারপর দোযখের আগুনে নিমজ্জিত (নিক্ষেপ) কর এবং সত্তর গজ দীর্ঘ শিকলে ওকে আবদ্ধ কর, যাতে সে আগুনে পোড়ার সময় একটুও নড়তে না পারে। কারণ, এদিক-সেদিক নড়তে পারলে জ্বলন্ত ব্যক্তি (আগুনের তীব্রতায়) কিছুটা হলেও কমি অনুভব করে।

বি. দ্র. গজ বলতে সেখানকার গজ উদ্দেশ্য, যার পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন।

২. অর্থাৎ সে দুনিয়াতে আল্লাহকেও চিনেনি, বান্দাদের হকও জানেনি। নিজে গরীব-অভাবীর কী খেদমত করবে, অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেনি। সুতরাং যখন আল্লাহর উপর যথাযথ ঈমান আনেনি, তখন নাজাত কী করে সম্ভব? আর যখন ছোট-বড় কোন কল্যাণকর কাজই তার দ্বারা হল না, তখন শাস্তি লাঘবেরও কোন উপায় নেই।

৩. অর্থাৎ যেহেতু সে আল্লাহকে বন্ধু বানায়নি, তাই আজ কেউ তার বন্ধু হতে পারে না যে, তাকে সাহায্য করে আযাব থেকে রক্ষা করবে, অথবা বিপদের সময় কিছুটা সান্ত্বনার কথা বলবে।

৪. খাবার খেয়েও মানুষ শক্তি লাভ করে, কিন্তু দোযখীদের ভাগ্যে এমন কোন সুস্বাদু খাদ্য জুটবে না, যা আরাম ও শক্তির কারণ হতে পারে। হাঁ, দোযখীদের ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ দেওয়া

[রুকূ - ২]

৩৮. আমি কসম করছি সেসব জিনিসের, যা তোমরা দেখতে পাও।

فَلَآ اُقۡسِمُ بِمَا تُبۡصِرُوۡنَ ﴿۳۸﴾

৩৯. এবং সেসবের, যা তোমরা দেখতে পাও না।

وَمَا لَا تُبۡصِرُوۡنَ ﴿۳۹﴾

৪০. নিশ্চয়ই এ (কুরআন) একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী[১]।

اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ كَرِيۡمٍ ﴿۴۰﴾

হবে, যা এই পাপীদের ছাড়া আর কেউই খেতে পারবে না এবং তাও ক্ষুধা-পিপাসার আতিশয্যে ভুল করে এই ভেবে খাবে যে, এতে কিছুটা উপকার হবে। অবশ্য পরে প্রকাশ পাবে যে, ক্ষুধার শাস্তি থেকে বড় শাস্তি হচ্ছে সেটাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা। أعاذنا الله (من سائر أنواع العذاب في الدنيا والآخرة)

১. অর্থাৎ জান্নাত, দোযখ প্রভৃতি সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা কোন কবিত্ব নয় অথবা গণকদের জল্পনা-কল্পনার ফসলও নয়; বরং এ হচ্ছে পবিত্র কুরআন, আল্লাহর কালাম, যা আসমান থেকে এক মর্যাদাশালী ফেরেশতা নিয়ে এসে এক মহামর্যাদাশালী পয়গম্বরকে পৌছিয়েছেন। যিনি আসমান থেকে নিয়ে এসেছেন তিনি এবং যিনি দুনিয়াবাসীকে পৌছিয়েছেন, উভয়ই رسول كريم (মহা মর্যাদাবান রাসূল)। উল্লিখিত দুজনের মধ্যে একজনের অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহামর্যাদা তোমরা বাহ্যিক চোখে দেখতে পাচ্ছ। আর দ্বিতীয়জন অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মর্যাদা প্রথমোক্ত মর্যাদাশালী ব্যক্তির বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত।

ইন্দ্রিয়ের ন্যায় আকল-বুদ্ধিরও সীমা আছে, যার বাইরে আকল কোন কাজ করে না। সেখানেই প্রয়োজন আসমানী ওহীর

বিশ্বজগতে দু'ধরনের জিনিস রয়েছে। এক, যেগুলি মানুষের চর্মচোখে দেখা যায়। দুই, যেগুলি চোখে দেখা যায় না, তবে আকল-বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা সেসব মেনে নিতে মানুষ বাধ্য হয়। যেমন: আমরা যতই প্রখর দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখি না কেন, একে চলমান বা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দেখতে পাই না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের দলীল-প্রমাণের কথা শুনে আমরা অক্ষম হয়ে নিজেদের চোখ ভুল করছে বলে মনে করি এবং নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা অথবা অন্য জ্ঞানী-বুদ্ধিমানদের জ্ঞান-বুদ্ধির মারফত ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তিসমূহ সংশোধন করে নিই। কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের মধ্যে কারো আকল তথা জ্ঞান-বুদ্ধিই ভ্রান্তি ও ত্রুটিমুক্ত নয়। এখন আকলের ভ্রান্তির সংশোধন ও ত্রুটির ক্ষতিপূরণ কীভাবে সম্ভব হবে?

এর উত্তর এই যে, সমস্ত বিশ্বজগতে একমাত্র আল্লাহর ওহীই এমন যে, তা নিজে ভ্রান্তির উর্ধ্বে থেকে জ্ঞান-বুদ্ধিসংক্রান্ত সকল ভ্রান্তির সংশোধন ও পূর্ণতা বিধান করতে পারে। দেখুন, ইন্দ্রিয়শক্তি যেখানে পৌছতে অক্ষম হয়, সেখানে জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে আসে। তদ্রূপ

৪১. এ কোন কবির কথা নয় —তোমরা স্বল্পই বিশ্বাস কর[১]—

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝

৪২. এবং নয় কোন গণকের কথা। তোমরা খুবই কম চিন্তা কর[২]।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

যেক্ষেত্রে নিছক জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে আসে না বা ভুল-ত্রুটি করে, সেক্ষেত্রে খোদায়ী ওহী আকলের সহায়তা করে এবং তাকে বহু উচ্চমানের বাস্তব বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে।

সম্ভবত এ জন্যই এস্থলে আল্লাহ তাআলা بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَالَا تُبْصِرُوْنَ এর কসম খেয়েছেন। উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে- জান্নাত, দোযখ প্রভৃতি সম্পর্কিত যেসব সত্য-সঠিক বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে, তা ইন্দ্রিয় ও জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত হওয়ার কারণে যদিও তোমাদের বুদ্ধির নাগালে আসে না, তবে পদার্থনিচয়ের মধ্যে দৃশ্য ও অদৃশ্য, অন্য কথায়- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত এই শ্রেণীভেদ রয়েছে। তো এ শ্রেণীভেদ থেকেই বুঝে নাও যে, এ হচ্ছে রাসূলে কারীম বা মহা মর্যাদাশালী প্রেরিত পুরুষের কালাম, যা খোদায়ী ওহী মারফত ইন্দ্রিয় ও আকল-বুদ্ধির সীমাবহির্ভূত তবে বাস্তবসম্মত সংবাদ পরিবেশন করে। আমরা যেহেতু বহু অতীন্দ্রিয়, বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের পরিপন্থী বিষয়কে নিজেদের আকল-বুদ্ধি অথবা অন্যদের অনুসরণে মেনে নেই, তখন অতি উচ্চমানের কিছু (সত্য-সঠিক) জিনিসকে রাসূলে করীমের কথায় মেনে নিতে অসুবিধা কী?

১. অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর বাণী, এ বিষয়ে বিশ্বাসের কিছুটা ঝলক কখনো কখনো তোমাদের অন্তরেও উদয় হয়, কিন্তু তা এতই অল্প যে, নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। শেষ পর্যন্ত কুরআনকে কবিত্ব ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দাও। সত্যিই কি তোমরা ইনসাফের সাথে বলতে পার যে, এ কোন কবির কথা হতে পারে? এবং এ কি কবিত্বের প্রকারের কোন জিনিস? কবিতার মধ্যে আবশ্যকীয় জিনিস হচ্ছে ছন্দ, পরিমাপ ইত্যাদি। কুরআনে এসবের পাত্তাও নেই। কবিদের কথা প্রায় ভিত্তিহীন হয় এবং কবিতার অধিকাংশ বিষয় নিতান্তই কাল্পনিক ও অনুমান-ভিত্তিক হয়ে থাকে। অথচ কুরআনে করীমে সকল সত্য-সঠিক বিষয় ও পরিপক্ক মৌলনীতিগুলো অকাট্য প্রমাণাদি ও মজবুত দলিলাদিসহ বর্ণনা করা হয়েছে। (সুতরাং কুরআনের সাথে কবিতার কী সম্পর্ক?)

২. অর্থাৎ যদি তোমরা পূর্ণরূপে চিন্তা-ভাবনা কর তবে বুঝতে পারবে, এ কোনো গণকের কথাও নয়। আরবের গণকেরা ভূত-প্রেত ও জিন-পেত্নীর সাথে সম্পর্ক রাখত। এরা গায়বের কতক খণ্ডকথা একটা ছন্দবদ্ধ শব্দাবলির মাধ্যমে গণকদের বাতলিয়ে যেত। কিন্তু জিনদের কালাম তো আর অলৌকিক হয় না যে, এমনটি অন্য কেউ বলতে পারবে না। বরং একটা জিন কোন গণককে যে কথা শেখায় অন্য জিনও সে রকম কথা অন্য গণককে শেখাতে পারে। অথচ এ কুরআন এমন অলৌকিক কালাম যে, সমগ্র জিন ও মানবগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবেও এর সদৃশ কালাম রচনা করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, গণকদের কথার মধ্যে শুধু মিল ও ছন্দের খাতিরে বহু শব্দ একেবারে অযথা ও অহেতুক হয়। তদুপরি, গণকদের কথা গোটা কয়েক খণ্ডিত, অস্পষ্ট ও মামুলি খবর-বিশিষ্ট

৪৩. (এ) সমগ্র জগতের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ[১]।

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٣

৪৪. তিনি যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতেন,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝٤٤

৪৫. তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝٤٥

৪৬. অতঃপর কেটে দিতাম তার ধমনী।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝٤٦

৪৭. আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে (তাঁকে) আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারে[২]।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝٤٧

হয়। কিন্তু ওদের দ্বারা কখনো সম্ভব হয় না– উলূম (সত্য জ্ঞানরাজি) ও বাস্তবসম্মত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং দীন-ধর্ম ও শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা ও বিধিবিধান এবং ইহ ও পরকালের উপকারী দস্তুর ও আইন জেনে নেওয়া এবং ফেরেশতা ও আসমানসমূহের গোপন রহস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। পক্ষান্তরে, কুরআন কারীম এ জাতীয় বিষয়াবলিতেই পরিপূর্ণ। (অতএব কোথায় কুরআন আর কোথায় সামান্য গণকের অর্থহীন কথা!)

১. বিশ্বপ্রভুর পক্ষ থেকে অবতারিত বলেই সমগ্র বিশ্বের তরবিয়ত বা সংশোধন-সংস্কারের উচ্চ ও পরিপক্ক মৌলিক নীতিমালা এতে বর্ণিত হয়েছে।

২. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লেখেন, 'তিনি যদি আল্লাহ সম্বন্ধে কোন মিথ্যা রচনা করতেন, তবে সর্বাগ্রে আল্লাহ তাঁর দুশমন হতেন এবং তাঁকে পাকড়াও করতেন। গর্দানে মরণাঘাত হানার নিয়ম হচ্ছে, জল্লাদ তার (অপরাধীর) ডান হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে রাখে, যাতে সে হটে যেতে না পারে।'

বর্তমান আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় শাহ আঃ আযীয (রহ) এর বক্তব্য

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, 'تقول ক্রিয়ার কর্তা হচ্ছে রাসূল। অর্থাৎ কোন রাসূল (অসম্ভব হলেও) ধরা যাক, যদি নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন কথা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয় বা তাঁর কালামে জুড়ে দেয়, যা তিনি বলেননি, তবে তখনি তাঁর প্রতি উল্লিখিত শাস্তি আসবে। কারণ, স্পষ্ট আয়াতসমূহ ও দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাঁর সমর্থন করা হয়েছে। এখন যদি এ ধরনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে আযাব ও শাস্তি প্রদান না করা হয়, তবে আল্লাহর ওহীর নিরাপত্তা থাকবে না এবং তা সম্পর্কে এমন দ্বিধা-সন্দেহের সৃষ্টি হবে, যার সংশোধন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর এটা শরী'য়ত প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির রাসূল হওয়া আয়াত ও দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি, বরং পরিষ্কার লক্ষণাদি ও প্রকাশ্য প্রমাণাদি দ্বারা তার রেসালাতের খণ্ডন হয়, তার রচিত কথাও অহেতুক ও অনর্থক। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই তার কথার গুরুত্ব দেবে না এবং

৪৮. তা (কুরআন) তো পরহেযগারদের জন্য উপদেশ।

وَاِنَّهٗ لَتَذۡكِرَةٌ لِّلۡمُتَّقِيۡنَ۝

৪৯. আর আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে কতক অস্বীকারকারী।

وَاِنَّا لَنَعۡلَمُ اَنَّ مِنۡكُمۡ مُّكَذِّبِيۡنَ۝

(আলহামদুলিল্লাহ) আল্লাহর দীন-ধর্মে কোন দ্বিধা-সন্দেহও প্রবেশ করবে না। (তাই এমন ব্যক্তির উপর তৎক্ষণাৎ শাস্তি আসা জরুরী নয়। হ্যাঁ,) অলৌকিক ঘটনাবলির দ্বারা এমন ব্যক্তির সমর্থন হওয়া একেবারে অসম্ভব। বরং এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনিবার্য যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য এমন সব ব্যবস্থা করবেন, যেগুলো দ্বারা তার রিসালাতের অসারতা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

উল্লিখিত বিষয়টির দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন বাদশাহ এক ব্যক্তিকে কোন দায়িত্ব প্রদান করল এবং সনদ, ফরমান ইত্যাদিসহ কোন দিকে পাঠাল। এখন যদি সেই ব্যক্তি অর্পিত দায়িত্বে কোন খেয়ানত করে অথবা তার দ্বারা বাদশাহর প্রতি কোন মনগড়া কথা সম্পৃক্ত করা প্রমাণিত হয়, তবে অনতিবিলম্বে বাদশাহ তার বিহিত ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যদি সড়ক তৈরির কোন মজুর বা রাস্তার ঝাড়ুদার, মেথর বলে বেড়ায় যে, সরকার আমার উপর এই বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অথবা আমার দ্বারা এই বিধান জারী করা হচ্ছে, তবে তার কথার দিকে কে কান দেবে এবং কে-ই বা তার দাবির প্রতিবাদ করতে যাবে? (হতে পারে, স্বয়ং বাদশাও কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না।)

আয়াতগুলোর মূল আলোচ্য বিষয়

যা হোক, আলোচ্য আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা হয়নি; বরং বলা হচ্ছে যে, কুরআন কারীম একমাত্র আল্লাহর কালাম (বাণী), যার মধ্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নিজের পক্ষ থেকে একটি হরফ বা যের-যবর অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না এবং পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শান এ হতে পারে না যে, তিনি আল্লাহর নামে এমন কথা বলবেন যা তিনি বলেননি।

তাওরাতে (দ্বিতীয় বিবরণ)-এর আঠারতম পরিচ্ছেদে বিশতম বাক্য এই যে, 'কিন্তু সেই নবী যদি আমার নামে এমন কথা বলার ধৃষ্টতা দেখায়, যা বলার জন্য তাকে আমি নির্দেশ দেইনি অথবা সে অন্যান্য উপাস্যদের বরাতে কিছু বলে, তবে সেই নবীকে কতল করা হবে।'

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি নবী হবে, তার পক্ষে এমনটা সম্ভবই নয়। সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলো এমন, যেমন সূরা বাকারায় (১২০) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (আর যদি আপনি ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, সেই জ্ঞানের পরও যা আপনার নিকট এসেছে- তবে আল্লাহর মোকাবেলায় আপনার কোন বন্ধু থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।)

৫০. আর তা কাফেরদের জন্য অনুতাপ[১]।	وَاِنَّهٗ لَحَسۡرَةٌ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ۞
৫১. এবং তা-ই (অর্থাৎ কুরআনই) বিশ্বাস করার যোগ্য*।	وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الۡيَقِيۡنِ ۞
৫২. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামে তাস্‌বীহ পাঠ করুন[২]।	فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِيۡمِ ۞

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, তারা তো তাঁর এই কালাম শুনে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর যাদের অন্তরে ভয় নেই, তারা একে মিথ্যা বলবে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, যখন ঠিকই এই কালাম এবং ওদের এই অবিশ্বাস চরম অনুশোচনা ও পরিতাপের কারণ হবে। তখন ওরা আক্ষেপ করে বলবে, হায়! কেন আমরা এই সত্য বাণীকে মিথ্যা বলেছিলাম, যে কারণে আজ এই বিপদের সম্মুখীন হতে হল?

* দ্বিতীয় তরজমা– 'পরিপূর্ণ অকাট্য সত্য।

২. অর্থাৎ এ কিতাব তো এমন জিনিস, যার প্রতি সর্বোচ্চ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। কারণ, এর বিষয়বস্তু আগাগোড়া সত্য ও সব রকমের দ্বিধা-সন্দেহেরও উর্ধ্বে। সুতরাং এর প্রতি ঈমান এনে আপন প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসাকীর্তন করা মানুষের পরম কর্তব্য।

সূরা মা'আরিজ

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭০ । ৪৪ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آياتها ٤٤ ، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝

১. এক প্রার্থনাকারী আযাবের প্রার্থনা করেছে, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে–

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۝

২. কাফেরদের জন্য। তার কোন প্রতিরোধকারী নেই[১]।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۝

৩. (সংঘটিত হবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি সোপানসমূহের মালিক[২]।

---

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ পয়গম্বর তোমাদের জন্য আযাব চেয়েছেন। তা কারো থেকে হটানো যাবে না।'

অথবা আযাব-প্রার্থনাকারী হচ্ছে স্বয়ং কাফেররা, যারা বলত- 'যে আযাবের ওয়াদা করা হয়েছে, তা তাড়াতাড়ি আসে না কেন? আয় আল্লাহ! যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর-বৃষ্টি নাযিল করুন।' এসব কথা ওরা অস্বীকৃতি ও পরিহাসস্বরূপ বলত।

তদুত্তরে আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, আযাব-প্রার্থনাকারীরা এমন এক আযাব প্রার্থনা করছে, যা নিশ্চিতরূপে ওদের উপর পতিত হবে। তা কেউ চাইলেও প্রতিহত করতে পারবে না। বস্তুত এটা কাফেরদের সীমাহীন মূর্খতা বা হঠকারিতা যে, ওরা নিজেরা এমন জিনিস প্রার্থনা করছে।

২. ফেরেশতাগণ ও মুমিনদের রূহ সমস্ত আকাশমণ্ডলি ধাপে ধাপে অতিক্রম করে আল্লাহর দরবার পর্যন্ত আরোহণ করে। তদ্রূপ তাঁর বান্দারা জানে-প্রাণে তাঁর হুকুম-আহকাম পালনে সচেষ্ট থাকে এবং সৎ গুণে গুণান্বিত হয়। আর এভাবে তারা নৈকট্য ও সান্নিধ্যের রূহানী মর্যাদা ও স্তরসমূহ অতিক্রম করে আল্লাহর পরম নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। (একেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ معارج (সোপানসমূহ) এর মালিক। অর্থাৎ যা অতিক্রম করে ফেরেশতা ও মুমিনরা তাঁর দরবারে পৌছে ও তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। —অনুবাদক)।

আর এ স্তরগুলি দূরত্বের হিসাবে বিভিন্ন রকম। কোনটি এমন যে, তার কারণে এক মুহূর্তে তরক্কী হতে পারে, যেমন মুখে ইসলামের কলেমা বলা। আর কতক এমন যে, একটি নির্ধারিত সময়ে সেগুলির দ্বারা উন্নতি হাসিল হয়– যেমনঃ নামায আদায় করা। আর কিছুর দ্বারা উন্নতি হয় পূর্ণ এক দিনে, যেমন রোযা। আর কতক দ্বারা এক মাসে, যেমন পূর্ণ

৪. ফেরেশতারা ও রূহ তাঁর দিকে এমন এক দিনে আরোহণ করবে[১], যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর[২]।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

৫. অতএব আপনি উত্তমরূপে ধৈর্য ধরুন[৩]।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ۝

৬. ওরা তাকে দূরবর্তী ভাবে।

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۝

৭. আর আমি দেখছি, তা অতি নিকটবর্তী[৪]।

وَنَرٰىهُ قَرِيْبًا ۝

৮. (তা সেদিন ঘটবে), যেদিন আকাশ গলিত তামার মত হয়ে যাবে।[৫]

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝

রমযানের রোযা; অথবা এক বছরে, যেমন হজ আদায় করা। তদ্রূপ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের তরক্কী ও উন্নতির অবস্থা। কেননা সেসব দায়িত্ব পালনের দ্বারা অর্জিত এই উন্নতির স্তরও বিভিন্ন রকম হয়। আর আল্লাহ পাকের তদবীর তথা ব্যবস্থাপনের উত্থান-পতনও অসংখ্য স্তরবিশিষ্ট। (যা হোক, আল্লাহ বিভিন্ন معارج-এর মালিক)।

১. অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানুষদের রূহসমূহ বিচারকার্যের জন্য (তাঁর দরবারে) হাযির হবে।

২. কিয়ামতের দিন পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অর্থাৎ প্রথমবার শিঙ্গা ফুঁকার সময় থেকে নিয়ে বেহেশতীরা বেহেশতে ও দোযখীরা দোযখে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করা পর্যন্ত সময়কাল– পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। সমস্ত ফেরেশতা ও সর্বপ্রকার মাখলুকের রূহ (শেষ বিচারের) এই মহা আয়োজনে কর্মীবাহিনী হিসাবে অংশগ্রহণ করবে এবং এই মহাকার্য সম্পাদনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তারা উর্ধ্বে আরোহণ করবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর কসম, ঈমানদার ব্যক্তির নিকট সেই লম্বা দিন এতটুকু ছোট মনে হবে, যতটুকু সময়ে এক ফরয নামায পড়তে পারে।' (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১১৭১৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ৭৩৩৪)

৩. অর্থাৎ এই কাফেররা যদি অস্বীকৃতি ও উপহাসস্বরূপ আযাবের জন্য ত্বরা করে, তবু আপনি তাড়াতাড়ি করবেন না; বরং ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে অবিচল থাকবেন। আপনি অস্থিরও হবেন না, মুখে অভিযোগের কথাও উচ্চারণ করবেন না। আপনার ধৈর্য আর ওদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অবশ্যই স্ব স্ব ফলাফল বয়ে আনবে।

৪. অর্থাৎ ওদের ধারণায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক, অথচ আমার নিকট তা এতই নিকটবর্তী, যেন এসেই গেছে।

৫. কোন কোন মুফাসসির مُهْل এর তরজমা করেছেন– 'তেলের গাদ (তলানি)'।

৯. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত[১]।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

১০. আর বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না।

وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۝

১১. ওরা সবাই পরস্পরের দৃষ্টিগোচর হবে[২]। অপরাধী সেদিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য চাইবে– মুক্তিপণরূপে নিজ পুত্রদের দিয়ে দিতে,

يُّبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍ بِبَنِيْهِ ۝

১২. এবং নিজের স্ত্রী ও ভাইকে,

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۝

১৩. এবং নিজের গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত,

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۝

১৪. এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকে, এরপর নিজেকে রক্ষা করতে।

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۝

১৫. কক্ষনো না[৩]। তা (জাহান্নাম) তো উত্তপ্ত আগুন।

كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى ۝

১৬. যা চামড়া খসিয়ে (কলিজা) বের করে দেবে[৪]।

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝

---

১. পশম বিভিন্ন রঙের হয় এবং পাহাড়-পর্বতের রঙও বিভিন্ন হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (আর পাহাড়-পর্বতের মধ্যেও রয়েছে সাদা ও লাল অংশ, যেগুলির বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং আছে নিকষ কালো অংশ। –ফাতির, আয়াত ২৭)— অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে كالعهن المنفوش (আল-ক্বারি'আ: ৫) অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত ধুনিত পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'সবাই দৃষ্টিগোচর হবে। অর্থাৎ প্রকাশ হয়ে পড়বে যে, ওদের বন্ধুত্ব বড় দুর্বল। একে অন্যের অবস্থা দেখবে, কিন্তু কোন সাহায্য করতে পারবে না। প্রত্যেকে নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে।'

৩. অর্থাৎ সে চাইবে, সম্ভব হলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বরং সমগ্র দুনিয়াটা মুক্তিপণরূপে দিয়ে নিজের জান বাঁচিয়ে নিতে। কিন্তু তা মোটেই সম্ভব হবে না।

৪. অর্থাৎ সেই আগুন অপরাধীকে ছাড়বে কেন? তা তো এত ভয়াবহ যে, গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে ভিতর থেকে কলিজা-হৃৎপিণ্ড বের করে আনবে।

১৭. তা ওই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	تَدۡعُوۡا مَنۡ اَدۡبَرَ وَتَوَلّٰی ﴿۱۷﴾
১৮. এবং (সম্পদ) সঞ্চয় করেছে, অতঃপর সংরক্ষণ করেছে[১]।	وَجَمَعَ فَاَوۡعٰی ﴿۱۸﴾
১৯. নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলচিত্তরূপে–	اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ﴿۱۹﴾
২০. তাকে যখন বিপদ স্পর্শ করে, সে অধৈর্য হয়ে পড়ে,	اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا ﴿۲۰﴾
২১. আর যখন তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য স্পর্শ করে, তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ[২];	وَّاِذَا مَسَّهُ الۡخَیۡرُ مَنُوۡعًا ﴿۲۱﴾
২২. তবে নামাযীরা ব্যতিক্রম—	اِلَّا الۡمُصَلِّیۡنَ ﴿۲۲﴾
২৩. যারা নিজেদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান[৩],	الَّذِیۡنَ هُمۡ عَلٰی صَلَاتِهِمۡ دَآئِمُوۡنَ ﴿۲۳﴾
২৪. এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে–	وَالَّذِیۡنَ فِیۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ مَّعۡلُوۡمٌ ﴿۲۴﴾

১. অর্থাৎ দোযখের দিক থেকে একটি আহ্বান জানানো হবে। ফলে, যত লোক দুনিয়ায় সত্যের দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং নেক আমলে মনোযোগ দেয়নি; বরং ধন-সম্পদ অর্জন ও তা সঞ্চিত করায় ব্যস্ত থেকেছিল— তারা সকলে দোযখে চলে আসবে। কোন কোন হাদীছে আছে, দোযখ প্রথমে মুখের ভাষায় এভাবে ডাকবে– اِلَيَّ يا كافر ، اِلَيَّ يا منافق، اِلَيَّ يا جَامع الْمَال 'ও কাফের! ও মুনাফিক! ও ধন-সম্পদ সঞ্চয়কারীরা! তোরা এদিকে আয়।' তখন লোকেরা এদিক-সেদিক পলায়ন করবে। তারপর অনেক লম্বা একটা গ্রীবা বের হবে, যা কাফেরদের বেছে বেছে এভাবে তুলে নেবে, যেভাবে পাখি যমীন থেকে খাদ্যকণা তুলে নেয়। (العياذ بالله) [তাফসীরে বাগাবী ৪/৩৯৮— মাওকূফ বর্ণনা]

২. অর্থাৎ সে কোন অবস্থায় পরিপক্কতা ও দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ ও বিপদ-আপদ এলে অধৈর্য হয়ে ঘাবড়ে যায়; বরং নিরাশ হয়ে যায়, যেন এখন আর বিপদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ নেই। আর ধন-সম্পদ, সুস্থতা ও সচ্ছলতা এলে নেক কাজের জন্য পা ওঠে না এবং প্রকৃত মালিকের রাস্তায় ব্যয় করার সামর্থ্য হয় না। –তবে সেই লোকেরা ব্যতিক্রম, যাদের কথা পরবর্তী আয়াতগুলিতে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ অনিয়মিত নয়, বরং সর্বদা ও নিয়মিতভাবে নামায পড়ে এবং নামাযের অবস্থায় অত্যন্ত স্থিরতার সাথে আগাগোড়া নিজেদের নামাযের দিকেই মনোযোগী থাকে।

২৫. ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের জন্য[১]।

لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾

২৬. এবং যারা বিচার-দিবসে বিশ্বাস রাখে[২]।

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং যারা আপন রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত[৩]।

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় হওয়া যায়[৪]।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৯. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে—

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া, কেননা (এদের ক্ষেত্রে) তারা অভিযুক্ত হবে না।

اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. আর যারা তাদের ছাড়া অন্য কোন পথ অন্বেষণ করবে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী[৫]।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা করে[৬]।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾

---

১. সূরা যারিয়াত-এ এর তাফসীর গত হয়েছে। (আয়াত নং ১৯ দ্রষ্টব্য।)

২. অর্থাৎ এই বিশ্বাসের কারণে ভাল ভাল কাজ করে, যেগুলি সেদিন কাজে আসবে।

৩. অর্থাৎ তারা তাঁর ভয়ে মন্দ কাজকাম থেকে বিরত থাকে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আযাব এমন জিনিস নয় যে, বান্দা তা থেকে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে।

৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করণার্থে তার স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য স্থান অনুসন্ধান করে, সে ভারসাম্য ও বৈধতার সীমার বাইরে পা ফেলে।

৬. এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ও বান্দাদের সব হক (দায় ও পাওনা) এসে গেছে। বস্তুত মানুষের কাছে যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য আছে, সবই আল্লাহর আমানত। সেগুলো তাঁরই বাতলানো স্থানে ব্যয় করা উচিত। আর সৃষ্টির আদিতে সে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছে, তা থেকে ফিরে যাওয়া উচিত নয়।

৩৩. এবং যারা সঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে[১]।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۝

৩৪. এবং যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে যত্নবান থাকে[২]।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৩৫. তারাই থাকবে জান্নাতসমূহে সসম্মানে[৩]।

اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

[রুকূ - ২]

৩৬. কাফেরদের কী হয়েছে যে, ওরা আপনার দিকে ছুটে আসছে–

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

৩৭. ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে, দলে দলে?

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

৩৮. ওদের প্রত্যেকই কি এই আশা রাখে যে, ওকে নে'য়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে[৪]?

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

---

১. অর্থাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে কম-বেশ ও পক্ষপাতিত্ব না করে যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে। সত্য গোপন করে না।

২. অর্থাৎ তারা নামাযের ওয়াক্ত, শর্ত ও আদব সম্পর্কে সতর্ক থাকে এবং নামাযের সূরত (বা কাঠামো) ও প্রাণ কোনটিই বিনষ্ট হতে দেয় না।

৩. জান্নাতীদের এখানে আটটি গুণ বর্ণিত হল, যেগুলির সূচনা হয়েছে নামায দিয়ে এবং সমাপ্তিও হয়েছে নামায দিয়ে। যাতে বোঝা যায় যে, নামায আল্লাহর নিকট কত গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে এ সকল গুণ থাকবে, সে هلوع (কাঁচা মনের) সাব্যস্ত হবে না, বরং হিম্মতওয়ালা সাব্যস্ত হবে।

৪. অর্থাৎ কুরআনের তেলাওয়াত ও জান্নাতের কথা শুনে কাফেররা সকল দিক থেকে দলে দলে আপনার দিকে ছুটে আসে। এর পর হাসি-ঠাট্টা ও পরিহাস করে। তা সত্ত্বেও ওরা কি এই আশা করে যে, ওদের সবাইকে জান্নাতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করানো হবে? যেমন ওরা বলত, 'যদি আমাদের আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হয়, তবে সেখানেও আমাদের জন্য কল্যাণই রয়েছে।'

কখনো এমন হওয়ার নয়। সেই ন্যায় বিচারক ও হেকমতওয়ালা আল্লাহ তাআলার দরবারে অবিচারের এমন অন্ধকার থাকতে পারে না।

৩৯. কক্ষনো নয়! আমি ওদের সেই বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি, যা ওরাও জানে[১]।

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪০. অতএব আমি কসম করছি মাশরিকসমূহ (উদয়াচল) ও মাগরিবসমূহ (অস্তাচল)-এর রবের[২]! নিশ্চয় আমার এ ক্ষমতা আছে–

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۝

৪১. যে, আমি ওদের পরিবর্তে ওদের চেয়ে উত্তম (মানবগোষ্ঠী) নিয়ে আসি। আর আমার আয়ত্তের বাইরে কেউ চলে যেতে পারে না[৩]।

عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝

বি. দ্র. প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাসীর (র) আলোচ্য আয়াতগুলির এ অর্থ করেছেন যে, আপনাকে অস্বীকারকারী এই কাফেরগুলোর কী হয়েছে যে, ওরা দলে দলে, দ্রুত গতিতে, ডানে বাঁয়ে দৌড়ে চলে যায়? অর্থাৎ কুরআন শুনে এভাবে কেন ভয় করে ও পালায়? আর এই ভয় ও ঘৃণা সত্ত্বেও এ আশাও রাখে যে, ওদের প্রত্যেকেই বিনা বাধায় জান্নাতে গিয়ে প্রবেশ করবে? কখনো নয়। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন– فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۔ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (ওদের কী হয়েছে যে, ওরা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে? যেন ওরা ভয়ে পলায়নকারী গাধা, যা পালিয়েছে সিংহের ভয়ে। –মুদ্দাচ্ছির, আয়াত : ৪৯-৫০)

১. অর্থাৎ মাটির মত তুচ্ছ বা বীর্যের ন্যায় হীন জিনিস থেকে যে সৃষ্টি হয়েছে, সে বেহেশতের যোগ্য কীভাবে হয়? তবে হাঁ, যখন ঈমানের বদৌলতে সে পাক-সাফ ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে, (তখন এই যোগ্যতা লাভ করে)।

আর হতে পারে, إنا خلقْنٰكم مِمّا يَعْلَمون এর মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ সুরারই ১৯ নং আয়াত : إِن الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا-এর প্রতি। এ ক্ষেত্রে বর্তমান আয়াতের মর্ম এই হবে যে, যে সৃষ্টি হয়েছে আয়াত ১৯- ২১ এ বর্ণিত দোষগুলো নিয়ে, অতঃপর সে আয়াত ২২-৩৫ এ বর্ণিত গুণগুলিও অর্জন করেনি— সে বেহেশতের যোগ্য হয় কী করে? এ ব্যাখ্যানুযায়ী, خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ এর মধ্যে من عجل -এর যে تركيب (অবস্থান), এই একই تركيب বর্তমান আয়াতে مما يعلمون -এরও।

২. সূর্য প্রতিদিন একটি নতুন স্থান থেকে উদিত হয় এবং নতুন স্থানে অস্ত যায়। এইগুলিকে যথাক্রমে مشارق ও مَغَارِب বলে।

৩. অর্থাৎ আমি যখন ওদের পরিবর্তে ওদের চেয়ে শ্রেয় মানুষ আনতে পারি, তখন স্বয়ং ওদেরকে দ্বিতীয়বার কেন সৃষ্টি করতে পারব না? ওরা কি আমার আয়ত্ব থেকে বের হয়ে কোথাও চলে যেতে পারবে?

৪২. অতএব আপনি ওদেরকে অসার গল্প-গুজব করতে ও খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকতে দিন যে পর্যন্ত না ওরা সেই দিনের সম্মুখীন হচ্ছে, যার ওয়াদা ওদের সাথে করা হচ্ছে[১]-

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

৪৩. যেদিন ওরা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হয়ে আসবে, যেন নিশানার দিকে ছুটে যাচ্ছে[২]।

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۝

৪৪. অবনমিত থাকবে ওদের চোখগুলো, ওদের আচ্ছন্ন করে রাখবে লাঞ্ছনা। এ-ই সেই দিন, যার ওয়াদা ওদের সাথে করা হত।[৩]

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

অথবা خَيْراً منهم দ্বারা উদ্দেশ্য– ওদেরকেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা। কারণ, আযাব বা ছওয়াব যাই হোক, পরজীবন ইহজীবনের চেয়ে বেশি পরিপূর্ণ হবে। —অথবা অর্থ এই যে, মক্কার এই কাফেরদের হাসি-ঠাট্টা করতে দিন। আমি ইসলামের খেদমতের জন্য এদের থেকে শ্রেয় সম্প্রদায় পয়দা করব। উদাহরণস্বরূপ, তিনি কুরায়শদের স্থানে মদীনার আনসারদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। এর পরও মক্কাবাসীরা আল্লাহর কজা থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে পারেনি; বরং শেষ পর্যন্ত স্বীয় দুষ্কৃতিসমূহের স্বাদ ওদের ভোগ করতে হয়েছে।

বি. দ্র. 'মাশরেক' ও 'মাগরেব' এর কসম সম্ভবত এজন্য করেছেন যে, তিনি প্রত্যেক মাশরেক ও মাগরেবকে পরিবর্তন করতে থাকেন। অতএব তাঁর জন্য তোমাদেরকে পরিবর্তন করা কোন কঠিন নয়।

১. অর্থাৎ অল্প কয়েক দিনের অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। তারপর শাস্তি হওয়া নিশ্চিত।

২. অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় যেমন কোন বিশেষ নিশান ও চিহ্নের দিকে দ্রুতগতিতে দৌড়ায় এবং একে অপরের আগে পৌছার চেষ্টা করে, তদ্রূপ কাফেররা কবর থেকে বের হয়ে দৌড়াবে।— অথবা نصب দ্বারা মূর্তি উদ্দেশ্য, যেগুলোকে কাবাগৃহের চার দিকে স্থাপন করে রাখা হয়েছিল। এগুলোর প্রতিও ওরা অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সাথে দ্রুতবেগে ধাবিত হত।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

সূরা নূহ

সূরা ৭১ । ২৮ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٢٨، ركوعاتها ٢

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট (এ নির্দেশ দিয়ে) পাঠিয়েছিলাম যে, 'তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর– তাদের উপর যাতনাদায়ক আযাব আসার পূর্বে[১]।'

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖٓ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ①

২. তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

৩. (এ মর্মে) যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার কথা মান্য কর[২]।

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ ③

৪. তাহলে তিনি তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবেন[৩]। আল্লাহর নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, নিশ্চয় তখন তা

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا

---

১. অর্থাৎ কুফর ও দুষ্কৃতির কারণে দুনিয়ায় মহাপ্লাবন এবং আখেরাতে দোযখের আযাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে সতর্ক করে দিন।

২. অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে কুফর ও অবাধ্যতা ছাড় এবং আনুগত্য ও ইবাদতের পথ অবলম্বন কর।

৩. অর্থাৎ যদি ঈমান আন, তবে ইতিপূর্বে আল্লাহর যেসব হক নষ্ট করেছ, তা মাফ করে দেবেন। আর কুফর ও দুষ্কৃতির জন্য যে আযাব নির্ধারিত, ঈমান আনলে তা আসবে না। বরং তোমাদের অবকাশ দেওয়া হবে, যাতে তোমরা স্বাভাবিক বয়স পর্যন্ত জীবিত থাক এবং প্রাণীজগতের জীবন-মৃত্যুর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে তোমাদের মৃত্যু আসে। স্মর্তব্য যে, মৃত্যু থেকে নেককার ও বদকার— কারোরই নিষ্কৃতি নেই।

বিলম্বিত হবে না[১], যদি তোমরা বোঝ[২]।'	جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
৫. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন আহ্বান করেছি।	قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۝
৬. 'কিন্তু আমার আহ্বান ওদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে[৩]।	فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا ۝
৭. 'আর আমি যখনই ওদের আহবান করেছি, যাতে আপনি ওদের ক্ষমা করেন— তখন ওরা নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে[৪],	وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ

১. অর্থাৎ ঈমান না আনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত আযাব যদি মাথার উপর এসে যায়, তবে তা আর কিছুতেই টলবে না এবং তখন এক মিনিটের অবকাশও দেওয়া হবে না। অথবা অর্থ এই যে, নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবেই। তাতে দেরি হতে পারে না। والظاهر هو الأوّل (অর্থাৎ প্রথম অর্থটিই বেশি সুস্পষ্ট)।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা অন্যভাবে করেছেন। তিনি লেখেন— বন্দেগী কর, যাতে মানবজাতি দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকে। আর কিয়ামত সংঘটিত হতে দেরি লাগবে না। যদি সকলে মিলে বন্দেগী ছেড়ে দাও, তবে সবাই এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

লক্ষ কর, এমন প্লাবনই এসেছিল যে, একজন মানুষও বাঁচত না। তবে হযরত নূহ (আ) এর বন্দেগীর ফলে মানবজাতি রক্ষা পেয়ে গেল।

২. অর্থাৎ যদি তোমাদের সমঝ-বুঝ (বুদ্ধি-শুদ্ধি) থাকে, তবে বুঝবে যে, এ কথাগুলি বোঝার ও আমল করার যোগ্য।

৩. নূহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয় শত বছর পর্যন্ত ওদের বুঝাতে থাকেন। যখন আশার কোন ঝলক অবশিষ্ট থাকেনি, তখন অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর দরবারে দো'য়া করলেন, 'হে মহান আল্লাহ! আমি আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে কোন ত্রুটি করিনি। রাতের আঁধারে ও দিনের আলোতে বরাবর আপনার দিকে ওদের ডাকতে থেকেছি। কিন্তু ফল এই হয়েছে যে, যতই আপনার দিকে আসতে বলা হয়েছে, এ হতভাগারা তত বেশি মুখ ঘুরিয়ে ভেগেছে। আর আমার পক্ষ থেকে যত বেশি স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, ওদের পক্ষ থেকে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি বাড়তে থেকেছে।

৪. কারণ, আমার কথা শোনা ওদের নিকট অসহনীয়। তাই ওরা চায়, এ আওয়াজ যেন ওদের কানে না ঢোকে।

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا

নিজেদের বস্ত্রাবৃত করেছে[১], জেদ করেছে ও অতিশয় অহংকার করেছে[২]।

ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا

৮. 'অতঃপর আমি ওদের আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে[৩]।

ثُمَّ اِنِّيْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا

৯. 'তারপর আমি ওদের প্রকাশ্যে বলেছি এবং চুপে চুপেও বলেছি[৪]।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا

১০. 'আমি বলেছি, 'তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল[৫]।

يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

১১. 'তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ

১২. 'এবং তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তানদের দ্বারা এবং তোমাদের জন্য

---

১. যাতে ওরা আমার এবং আমি ওদের আকৃতি না দেখি। তাছাড়া, কানে প্রবিষ্ট আঙ্গুল কোন সময় ঢিলা হয়ে গেলে কাপড় দিয়ে তা বন্ধ করে, যাতে কোন কথা কোন রকমে অন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

২. অর্থাৎ ওরা কোন রকমেই নিজ তরীকা থেকে হটতে চায় না এবং ওদের অহংকার ওদেরকে আমার কথার দিকে একটুও মনোযোগ দেওয়ার অনুমতি দেয় না।

৩. অর্থাৎ ওদের সমাবেশগুলোতে ওদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করেছি এবং মজলিসে গিয়ে বুঝিয়েছি।

৪. অর্থাৎ জনসমাগম ছাড়া ওদের সাথে নির্জনে কথা বলেছি— পরিষ্কারভাবে খুলেও বলেছি এবং আকার-ইঙ্গিতেও বলেছি, সজোরে ও চুপে চুপে বলেছি। মোদ্দাকথা, নসীহতের কোন বিষয় এবং কোন উপায় বাদ দেইনি।

৫. অর্থাৎ শত শত বছর ধরে বোঝানো সত্ত্বেও তোমরা আমার কথা শোনোনি। কিন্তু এখনো যদি আমার কথা মেনে নিজ মালিকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট নিজেদের গোনাহ-খাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। পিছনের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন।

لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ⑫

উদ্যানরাজি উৎপন্ন করবেন ও তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদ-নদী[১]।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ⑬

১৩. 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর বড়ত্বের কাছে কোন আশা রাখ না[২]?

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ⑭

১৪. 'অথচ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ধাপে ধাপে[৩]।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ⑮

১৫. 'তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে[৪]?

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ⑯

১৬. 'এবং তাতে চাঁদকে রেখেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে[৫]।

---

১. অর্থাৎ ঈমান ও এস্তেগফারের বরকতে দুর্ভিক্ষ ও খরা (যার মধ্যে ওরা বছর-বছর ধরে পতিত ছিল) দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ পাঠিয়ে দেবেন, যার ফলে জমি ও বাগান খুব সিঞ্চিত হবে এবং ফল, ফসল ও শস্যদানার প্রাচুর্য হবে। চতুষ্পদজন্তু, গবাদি পশু প্রভৃতি মোটাতাজা হয়ে যাবে। দুধ, ঘি বৃদ্ধি পাবে এবং কুফর ও পাপের কারণে যে সকল স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, তারা পুত্রসন্তান জন্ম দিতে শুরু করবে। মোটকথা, আখেরাতের নেয়ামত ছাড়াও দুনিয়াতেই আরাম আয়েশের যথেষ্ট উপকরণ দেওয়া হবে।

বি. দ্র. ইমাম আবু হানীফা (র) এই আয়াত থেকে বের করেছেন, এস্তেসকার (বৃষ্টিপ্রার্থনার) মূল ও রূহ হচ্ছে এস্তেগফার ও ইনাবত (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁর প্রতি ধাবিত হওয়া)। —আর এস্তেসকার নামায হচ্ছে এর (অর্থাৎ এস্তেগফার ও ইনাবতের) পূর্ণতম রূপ, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২. অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের নিকট তোমাদের আশা করা উচিত যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে তিনি তোমাদেরকে মর্যাদা, ইজ্জত ও মাহাত্ম্য দান করবেন। অথবা অর্থ এই যে, তোমরা আল্লাহর আজমত (শ্রেষ্ঠত্ব) ও জালালত (মাহাত্ম্য)-কে কেন ভয় কর না?

৩. অর্থাৎ মায়ের পেটে তোমরা নানা রকমের আকার-আকৃতি ধারণ করেছ। আর মূল ধাতু (বা বীর্য) থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কত আবর্তন-বিবর্তনের সম্মুখীন হয় এবং কত রকমের বিপরীতমুখী অবস্থা, আপদ-বিপদ ও উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে তাকে অতিক্রম করতে হয়।

৪. অর্থাৎ একটির উপর আরেকটি।

৫. সূর্যের আলো তীব্র ও উষ্ণ হয়, যার আগমন হওয়ামাত্র রাতের আঁধার অদৃশ্য হয়ে যায়। সম্ভবত এ জন্য সূর্যকে জ্বলন্ত প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর চাঁদের আলো

১৭. 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে ভূমি থেকে উদ্ভূত করেছেন বিশেষভাবে[১]।

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۟ۙ

১৮. 'অতঃপর তোমাদের তাতে ফিরিয়ে নেবেন এবং তোমাদের (পুনরায়) বাইরে বের করে আনবেন[২]।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۟

১৯. 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন—

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۟ۙ

২০. 'যাতে তোমরা তার প্রশস্ত পথসমূহে চলতে পার[৩]।'

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۟

[রুকূ - ২]

২১. নূহ বললেন, 'হে আমার রব! ওরা আমার কথা অমান্য করেছে এবং এমন ব্যক্তির আনুগত্য করেছে, যার সম্পদ ও সন্তানসন্ততি তার কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে[৪]।

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِیْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ یَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ۟ۚ

যেন এই প্রদীপেরই আলোর বা ঔজ্জ্বল্যের প্রসার, যা চাঁদের জড়-দেহের মাধ্যমে ঠাণ্ডা ও মৃদু হয়ে যায়। والله اعلم

১. অর্থাৎ মাটি থেকে খুব ঘনীভূত করে সৃষ্টি করেছেন। (من الأرض) —প্রথমে আমাদের (আদি) পিতা আদম (আ) মাটি থেকে পয়দা হয়েছেন। তারপর আদম সন্তান-সন্ততি যে বীর্য থেকে পয়দা হয়, তা মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্যেরই সারনির্যাস।

২. অর্থাৎ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, তারপর কিয়ামতের দিন মাটি থেকেই বের করা হবে।

৩. অর্থাৎ যাতে তার উপর শোও, বস, চল, ফের– সে জন্য সব দিকে প্রশস্ত পথ বের করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি চাইলে এবং তার কাছে সব ব্যবস্থা থাকলে সে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারে। রাস্তা-ঘাটের কোন সংকীর্ণতা নেই।

৪. অর্থাৎ ওরা নিজেদের সর্দার ও সম্পদশালীদের কথা মান্য করেছে, যাদের সন্তানসন্ততি ও ধন-সম্পদে কোনই কল্যাণ নেই; বরং ওগুলো ওদের ক্ষতি সাধন করেছে। সেগুলোরই কারণে ওরা দীন থেকে মাহরূম রয়েছে এবং চরম একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করে অন্যদেরও মাহরূম রেখেছে।

২২. 'আর ওরা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে[১] ।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾

২৩. 'এবং বলেছে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কিছুতেই ত্যাগ করো না[২] এবং ত্যাগ করো না 'ওয়াদ', 'সুয়া', 'ইয়াগুছ', 'ইয়া'উক' ও 'নসরকে'[৩] ।'

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾

২৪. এভাবে ওরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। আর (ইয়া আল্লাহ!) আপনি জালেমদের পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করবেন না[৪] ।

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾

---

১. অর্থাৎ সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, নূহ এর কথা মানতে নেই এবং তাঁকে নানা রকমে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টায় লেগে রয়েছে।

২. অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে নিজেদের উপাস্যদের সহযোগিতায় থাকবে, নূহের কথায় কিছুতেই বিভ্রান্ত হবে না। কথিত আছে, শত শত বছর পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আপন সন্তানকে এবং সেই সন্তান বংশানুক্রমে তার সন্তানকে ওসিয়ত করে যেত যে, কেউ যেন এই বুড়ো নূহের প্রতারণায় না পড়ে এবং নিজ পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ না করে।

৩. এগুলো ওদের বিভিন্ন মূর্তির নাম, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মূর্তি বানিয়ে রেখেছিল। এই সব মূর্তিই পরবর্তী সময়ে আরব দেশে আসে। আর ভারতেও এ ধরনেরই মূর্তি 'বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, হনুমান' প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়েছে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) তফসীরে আযীযীতে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, পূর্বকালে কিছু বুযুর্গ লোক ছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচনায় সম্প্রদায়ের লোকেরা স্মারক হিসেবে তাঁদের মূর্তি বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তাঁদের পূজা করতে শুরু করে। (আল্লাহর পানাহ!) [তাফসীরে তবারী ২৩/৩০৩; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪৫৫]

৪. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লেখেন, 'অর্থাৎ (ওরা বিভ্রান্ত হতে থাকুক)- কোন তদবীর (কলা-কৌশল) সফল না হোক।' আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন, 'ওদেরকে কিছুতেই আপনার মারেফত দানে ধন্য করবেন না, এমন কি অবকাশ প্রদানস্বরূপও না।'

কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আয় আল্লাহ! এই জালেমদের গোমরাহী আরো বাড়িয়ে দিন, যাতে তাড়াতাড়ি এদের দুর্ভাগ্যের পাল্লা ভারী হয়ে যায় এবং এরা আপনার আযাবের যোগ্য হয়ে ওঠে।

২৫. ওদের গোনাহর কারণেই ওদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল। তারপর ওদের দাখিল করা হয়েছে আগুনে[১]। আর ওরা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী পায়নি[২]।

مِمَّا خَطِيٓـَٔتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۝

২৬. আর নূহ বললেন, 'হে আমার রব! আপনি পৃথিবীর বুকে কাফেরদের একটা গৃহ-বাসীকেও ছেড়ে দেবেন না।

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ دَيَّارًا ۝

২৭. 'আপনি যদি ওদের ছেড়ে দেন, তবে ওরা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্টই করবে এবং জন্ম

إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ

চরম নৈরাশ্য এসে যাওয়ার পর এরূপ বদ দোয়া অস্বাভাবিক নয়

মুফাসসিরগণ লেখেন, নূহ (আ) এ বদ-দোয়া করেছিলেন ওদের হেদায়াত সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার পর। চাই এই নৈরাশ্য হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় হয়ে থাকুক, অথবা আল্লাহ তাআলার এই ইরশাদ শোনার কারণে যে— أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ (যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের আর কেউ ঈমান আনবে না—হুদ : ৩৬)

যা হোক, চরম নৈরাশ্যের অবস্থায় অতিষ্ঠ ও ক্রুদ্ধ হয়ে এমন দো'য়া করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন, 'যখন কোন ব্যক্তি বা জামাতের সৎপথে আসার ব্যাপারে অকাট্যরূপে নৈরাশ্য হয়ে যায় এবং নবী ওদের অবস্থা পূর্ণরূপে যাচাই করে বুঝে নেন যে, ওদের ভিতর কল্যাণ প্রবেশের আদৌ সম্ভাবনা নেই; বরং ওদের অস্তিত্ব গোটা সমাজ ও পরিবেশকে পঁচা ও বিষাক্ত করে ফেলবে– তখন ওদেরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে ফেলা ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কী উপায়? যদি যুদ্ধের হুকুম হয়, তবে যুদ্ধের মাধ্যমে ওদের ধ্বংস করে দিতে হবে, অথবা ওদের শক্তি খর্ব করতে হবে, যাতে ওদের খারাপ আছর সংক্রমিত হতে না পারে। নতুবা সর্বশেষ উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকট দো'য়া করা, যেন তিনি ওদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পাক-পবিত্র করে দেন এবং ওদের বিষাক্ত ঘা থেকে অন্যদের হেফাজত করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ

যা হোক, নূহ (আ)-এর দো'য়া, তদ্রূপ মূসা (আ)-এর দো'য়া, যা সূরা ইউনুসে (আয়াত ৮৮) গত হয়েছে, এ ধরনের দোয়ারই অন্তর্ভূক্ত ছিল।

১. অর্থাৎ প্লাবন এল এবং বাহ্যত ওরা পানিতে ডুবে মরল; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ওরা বরযখের আগুনে পৌছে গেল।

২. অর্থাৎ সেই প্রতিমাগুলো ('ওয়াদ', 'সুওয়া', 'ইয়াগুছ' প্রভৃতি) বিপদের সময় কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারেনি। তাই চূড়ান্ত অসহায় অবস্থায় মরে ওরা মাটিতে মিশে গেল।

وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

দিতে থাকবে শুধু পাপাচারী ও অস্বীকারকারী[১]।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

২৮. 'হে আমার রব! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করেছে তাকে এবং সকল ঈমানদার পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করুন; আর পাপিষ্ঠদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন[২]।'

---

১. অর্থাৎ একটা কাফেরকেও জীবিত রাখবেন না। ওদের মধ্যে কেউ এমন নয়, যাকে জীবিত রাখা যায়। যে কেউ জীবিত থাকবে, আমার অভিজ্ঞতা বলে, ওর বীর্য থেকেও নির্লজ্জ, সত্যের অস্বীকারকারী ও অকৃতজ্ঞ বান্দা পয়দা হবে। তাছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের কেউ বর্তমান থাকবে, নিজে সৎপথে আসা দূরে থাক, অপর ঈমানদারদেরও গোমরাহ করবে।

২. অর্থাৎ আমার মর্তবা দৃষ্টে আমার দ্বারা ত্রুটি হয়ে থাকলে আপনার ফযলে আমাকে ক্ষমা করুন। তদ্রূপ আমার মাতাপিতা এবং যারা আমার নৌযানে বা আমার ঘরে বা আমার মসজিদে ঈমানদার হয়ে এসেছে, তাদের সকলের গোনাহ-খাতা মাফ করুন। বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত নর ও নারী মুমিন হবে তাদের সকলের মাগফেরাত করুন।

আয় আল্লাহ! নূহ (আ)-এর দো'য়ার বরকতে এই পাপীতাপী বান্দাকেও নিজ মেহেরবানীতে মাফ করে দিয়ে পার্থিব ও পরকালীন শাস্তি ছাড়াই আপনার সন্তুষ্টি ও রহমতের স্থানে পৌঁছিয়ে দিন। إنك سميع قريب مجيب الدعوات (আয় আল্লাহ! এই গোনাহগার অনুবাদকের জন্যও হযরত মুফাসসিরের দো'য়া কবুল করুন। আমীন!)

সূরা জিন

সূরা ৭২ । ২৮ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٢٨، ركوعاتها ٢

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি বলুন, 'আমার প্রতি এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনের একটি দল মন দিয়ে (কুরআন) শুনেছে[১]। অতঃপর বলেছে, 'আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি—

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝

২. 'যা সৎপথ দেখায়। অতএব আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এবং আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না[২]।'

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝

---

১. জিনদের অস্তিত্ব ও হাকিকত (স্বরূপ ও প্রকৃতি) সম্বন্ধে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এ সূরার তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আর আরবী ভাষায় রচিত— أحكام المرجان في أحكام الجان এ বিষয়ে নেহাত পূর্ণাঙ্গ কিতাব। যার আগ্রহ (ও সামর্থ্য) আছে, তিনি পাঠ করবেন। এখানে এ ধরনের বিষয়ে আলোচনার অবকাশ নেই।

২. সূরা 'আহকাফ' এ (আয়াত ২৯) গিয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে কুরআন পড়ছিলেন। কতিপয় জিন সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল এবং কুরআনের আওয়াজ শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে খাঁটি অন্তরে ঈমান এনে ফেলল। এরপর নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলল, 'আমরা এমন এক কালাম শুনেছি, যা (নিজ 'ফাসাহাত' ও 'বালাগাত' বা সাহিত্যিক সৌন্দর্য, বাচনভঙ্গি, লালিত্য-মাধুর্য, আবেদন-শক্তি, মনোমুগ্ধকর বর্ণনা, নসীহতের ধরণ ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তুর দিক থেকে) বিরল ও বিস্ময়কর। এই কালাম মারেফতে রব্বানী (প্রভুর মারেফত) এবং হেদায়াত ও সফলতার পথনির্দেশ করে এবং কল্যাণ-অভিলাসীর হাত ধরে নেকী ও তাকওয়ার মনযিলে পৌছিয়ে দেয়। এ জন্য আমরা এ কালাম শোনামাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এ বিষয়ে আমাদের কোন দ্বিধা রয়নি যে, এমন কালাম আল্লাহ ছাড়া আর কারো হতে পারে না। এখন আমরা এর শিক্ষা ও হেদায়াত অনুযায়ী ওয়াদা করছি যে, ভবিষ্যতে কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করব না।

জিনদের এ পুরো বক্তব্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের প্রতি ওহী করলেন। এরপর অনেক বার জিনেরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সাক্ষাৎ করে, ঈমান আনে এবং কুরআন শিক্ষা করে।

৩. 'আর আমাদের রবের মর্যাদা সমুন্নত; তিনি না স্ত্রী গ্রহণ করেছেন আর না কোন সন্তান[১]।	وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ
৪. 'আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধ ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে সীমাবহির্ভূত কথা বলত[২]।	وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ
৫. 'এবং আমাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ ও জিন আল্লাহ সম্বন্ধে আদৌ মিথ্যা বলবে না[৩],	وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ
৬. 'আর কিছু মানুষ কতক জিনের আশ্রয় গ্রহণ করত, ফলে তারা সেই জিনদের দাম্ভিকতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে[৪]।	وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ

১. অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ করা তাঁর মহামর্যাদার পরিপন্থী। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'যেসব গোমরাহী মানুষের মধ্যে শিকড় গেড়েছিল, তা জিনদের মধ্যেও ছিল। তারা (খ্রিস্টানদের মত) আল্লাহর স্ত্রী ও পুত্র আছে বলে বিশ্বাস করত।'

২. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে উক্ত বেহুদা কথাবার্তা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলত। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নির্বোধ ইবলীস। সম্ভবত এখানে سفيه শব্দ দ্বারা ওকেই বোঝানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ আমাদের এ ধারণা ছিল যে, এত বিপুল সংখ্যক জিন ও মানুষ, যাদের মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানও রয়েছে, তারা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলার ধৃষ্টতা করবে না। বস্তুত এমন ধারণা করে আমরা নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। এখন কুরআন শুনে সত্য জানলাম এবং আমাদের পুরোহিতদের অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্তি পেলাম।

৪. আরবে এ মূর্খতা খুব বেশি প্রসার লাভ করেছিল। মানুষ জিনদের নিকট গায়বের (অদৃশ্যের) খবরাদি জিজ্ঞাসা করত। ওদের নামে নযর ও নিয়ায করত, (নৈবদ্য) উৎসর্গ করত। আর যখন কোন কাফেলা কোন ভয়ঙ্কর উপত্যকা অতিক্রম করত বা সেখানে অবস্থান করত, তখন বলত, এ অঞ্চলে জিনদের যে সর্দার আছে, আমরা তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যাতে তিনি তার অধীনস্ত জিনদের থেকে আমাদের হেফাজত করেন।

এসব কথায় জিনেরা আরো অহংকারী হয়ে উঠল এবং নানা রকম ফিতনা বিস্তার শুরু করল। অন্য দিকে এ ধরনের শিরেকী কর্মকাণ্ডের কারণে মানব সম্প্রদায়ের পাপাচার ও অবাধ্যতা বৃদ্ধি পেল। কারণ, যখন তারা নিজেদের উপর জিনদের আধিপত্য স্বীকার করে নিল, তখন জিনেরা প্ররোচনায় ত্রুটি করবে কেন? পরিশেষে কুরআন এসে এসব অনর্থের শিকড় কেটে দিল।

৭. 'এবং তাদের ধারণা ছিল যেমন তোমাদেরও ধারণা যে, আল্লাহ কাউকে কখনই পুনর্জীবিত করবেন না[১]।

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝

৮. 'আর আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি এবং তাকে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ পেয়েছি।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۝

৯. 'আমরা (আকাশের) বিভিন্ন স্থানে শোনার উদ্দেশ্যে বসতাম। এখন যে শুনতে চাইবে, সে পাবে এক উল্কাপিণ্ড, যা তার জন্য ওঁত পেতে আছে[২]।

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۭ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝

১০. 'আর আমরা জানি না, পৃথিবীবাসীদের জন্য অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের সৎপথে আনার ইচ্ছা করেছেন[৩]?

وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

---

১. মুসলমান অর্থাৎ ঈমানদার জিনেরা এসব কথা নিজ জাতির সাথে বলছিল। অর্থাৎ তোমাদের মত বহু মানুষেরও ধারণা, আল্লাহ তাআলা মৃতদের কখনই কবর থেকে উঠাবেন না। অথবা অর্থ এই যে, (বহু মানুষ ধারণা করেছে যে,) আল্লাহ ভবিষ্যতে কোন পয়গম্বর প্রেরণ করবেন না। পূর্বে যারা নবী হয়েছেন, ব্যস্ তারাই। তবে এখন কুরআনের দ্বারা জানা গেল যে, তিনি এক মহামর্যাদাশালী রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি লোকদের বলছেন —তোমরা সকলে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে এবং তোমাদের (সকল কর্মের) হিসাব কড়ায়-ক্রান্তিতে দিতে হবে।

২. অর্থাৎ আমরা যখন উড়ে গিয়ে আসমানের নিকট পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, কঠোর পাহারা বসানো হয়েছে, ফলে কোন শয়তান গায়বের সংবাদ শুনতে পাচ্ছে না। বরং যে শয়তান এ রকম ইচ্ছা করে, তার প্রতি আগুনের টুকরা বর্ষিত হয়। এর আগে এত কঠোরতা ও বাধা-বিপত্তি ছিল না। জিন ও শয়তানরা আসমানের নিকট ওঁৎ পেতে সেখানের কিছু সংবাদ শুনে আসত। কিন্তু এখন এত কঠোর প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, যে-ই শোনার ইচ্ছা করে, তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত আগুনের টুকরা তাকে ধাওয়া করে।

এ বিষয়ক আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা হিজ্‌র (আয়াত ১৮) ইত্যাদিতে গত হয়েছে। তা দ্রষ্টব্য।

৩. অর্থাৎ এসব নতুন ব্যবস্থাপনা ও কঠোর প্রতিবন্ধকতা কী উদ্দেশ্যে, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ কথা তো আমরা বুঝেছি যে, কুরআন করীমের অবতরণ ও পয়গম্বরে আরাবীর প্রেরণ এর কারণ হয়েছে। কিন্তু এর ফলাফল কী হবে? পৃথিবীর বাসিন্দারা কি কুরআন মেনে সুপথে আসবে এবং আল্লাহ তাদের প্রতি বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের সৌভাগ্যশালী করবেন? না কি আল্লাহর এই ইচ্ছাই স্থির হয়েছে যে, তারা কুরআনী

১১. 'এবং আমাদের মধ্যে কতক নেক্‌কার। আর আমাদের কতক এর ব্যতিক্রম- আমরা ছিলাম বিরোধপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পথে[১]।

وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١

১২. 'এবং আমরা (এখন) বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে (কোথাও লুকিয়ে) আল্লাহকে মোটেই ব্যর্থ করতে পারব না এবং তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না পালিয়ে গিয়েও[২]।

وَاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢

১৩. 'আর আমরা যখন হেদায়াত-বাণী শুনলাম, তার প্রতি ঈমান আনলাম[৩]। আর যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনবে, তার না কোন ক্ষতির ভয় থাকবে, না জুলুম-জবরদস্তির[৪]।

وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ۭ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣

১৪. 'এবং আমাদের মধ্যে কতক অনুগত, আর কতক জালেম। যারা অনুগত হয়েছে, বস্তুত তারাই সৎপথ খুঁজে নিয়েছে;

وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ۭ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤

হেদায়াতসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে? বস্তুত এ কথা আল্লাহই জানেন। আমরা কিছু বলতে পারি না।

১. অর্থাৎ কুরআন অবতরণের পূর্বেও সকল জিন এক পথের উপর ছিল না। কিছু সংখ্যক নেক ও ভদ্র ছিল আর বহু সংখ্যক বদকার ও উচ্ছৃংখল ছিল।— সম্ভবত ওদের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা ও নানা দল থেকে থাকবে; কেউ মুশরিক, কেউ খ্রিস্টান, কেউ ইহুদী প্রভৃতি। আর আমলের দিক থেকেও প্রত্যেকের পথ ভিন্ন হয়ে থাকবে। এখন কুরআন এসে সমস্ত বিরোধ ও দলাদলি নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু লোকেরা তো এমন নয় যে, সকলে সম্মিলিতভাবে সত্যকে গ্রহণ করে একই পথে চলতে শুরু করবে। অতএব এখনো বিরোধ থাকবে।

২. অর্থাৎ আমরা যদি কুরআন অমান্য করি, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাব না– যমীনে কোথাও লুকিয়ে থেকেও না, এদিক-সেদিক পলায়ন করেও না এবং বাতাসে উড়েও না।

৩. অর্থাৎ আমাদের জন্য গৌরবের বিষয় যে, জিনদের মধ্যে আমরা সর্বাগ্রে কুরআন শুনতে পেয়েছি এবং অবিলম্বে তা গ্রহণ করেছি। আমরা ঈমান আনতে এক মুহূর্তও দেরি করিনি।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সাচ্চা ঈমানদারের কোন ভয় নেই— না এই আশঙ্কা যে, তার কোন সৎকর্ম ও মেহনত এমনি নিষ্ফল হয়ে যাবে। আর না জুলুমের আশঙ্কা যে, জোর করে অন্য কারো গোনাহ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। মোটকথা, সে ক্ষতি, কষ্ট ও জুলুম— সব কিছু থেকে নিরাপদ থাকবে।

১৫. 'আর যারা জালেম, তারা হল দোযখের ইন্ধন[১]।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

১৬. 'এবং (আমার প্রতি এ ওহীও পাঠানো হয়েছে) যে, 'যদি তারা (জিন ও মানব) সৎপথে অবিচল থাকত, তবে আমি (আল্লাহ) প্রচুর (বৃষ্টির) পানি দ্বারা তাদের সিঞ্চিত করতাম—

وَاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا

১৭. 'যাতে এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করি[২]। আর যে কেউ আপন রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۗ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ

---

১. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের পর আমাদের মধ্যে দুই ধরনের লোক হয়েছে। এক, যারা আল্লাহর পয়গাম শুনে তা কবুল করেছে এবং তাঁর বিধানের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে। এরাই তারা, যারা সত্যের সন্ধানে কৃতকার্য হয়েছে এবং নিজেদের অনুসন্ধানকে কাজে লাগিয়ে নেকীর রাস্তায় পৌঁছে গেছে। দুই, অন্যায়কারীদের দল, যারা বক্রতা ও অন্যায়ের পথ ধরে নিজেদের পালনকর্তার বিধানকে অস্বীকার করে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে বিরত থাকে। এরা এমন লোক, যাদেরকে জাহান্নামের লাকড়ি ও দোযখের ইন্ধন বলা উচিত।

বি. দ্র. এ পর্যন্ত মুমিন জিনদের কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে, যা তারা নিজেদের জাতির সঙ্গে বলেছে। সামনে আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে কিছু নসীহত ইরশাদ করছেন। বলা যায়, বর্তমান আয়াত وأَنَّ لَوِ اسْتَقَامُوْا الخ এর عطف (বা সংযোগ) হয়েছে أنه اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ এর সাথে। বিজ্ঞ মুতারজিম (র) আয়াতের তরজমার শুরুতে 'اور یہ حکم آیا' যোগ করে এই ইঙ্গিত করেছেন যে, এখান থেকে (রুকূর) শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ এর অধীন।

২. অর্থাৎ যদি জিন ও মানব জাতি সত্য-সরল পথে চলত, তবে আমি ঈমান ও আনুগত্যের বদৌলতে তাদের জন্য জাহেরী ও বাতেনী বরকতের ধারা প্রবাহিত করে দিতাম। আর এর মাধ্যমেও পরীক্ষা নেওয়া হত যে, নে'য়ামতসমূহ লাভ করে তারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ও আনুগত্য আরো বাড়িয়ে দেয়, নাকি অকৃতজ্ঞতা করে আসল পুঁজিও হারিয়ে বসে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, নির্যাতন ও দুষ্কৃতির শাস্তিস্বরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দো'য়ার ফলে কয়েক বছর ধরে মক্কাবাসীরা দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। লোকেরা শুষ্কতা ও খড়ায় পড়ে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে এখানে ওদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে, যদি জুলুম ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর পথ অবলম্বন কর, যেমন মুসলমান জিনেরা তাই করেছে, তবে দুর্ভিক্ষ দূর হবে এবং রহমতের বারি বর্ষণে দেশ সতেজ ও সবুজ করে দেওয়া হবে। (তাফসীরে বাগাবী ৪/৪০৩)

يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

নেবে, তিনি তাকে শাস্তিতে দাখিল করবেন, যা তার উপর চড়াও হয়ে থাকবে*[১]।

وَأَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا ۝

১৮. 'এবং (এ ওহীও এসেছে যে,) মসজিদসমূহ আল্লাহর (স্মরণের) জন্য; অতএব তোমরা (সেখানে) আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না[২]।

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

১৯. 'এবং এ ওহীও যে, যখন আল্লাহর বান্দা[৩] তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ায়, তখন লোকেরা তাঁর নিকট জটলা পাকাতে থাকে[৪]।'

---

* দ্বিতীয় তরজমা–'ওকে দাখিল করবেন দুঃসহ শাস্তিতে'।

১. অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ শান্তি লাভ করতে পারে না। কারণ, সে তো এমন রাস্তার উপর চলছে, যেখানে অশান্তি ও শাস্তিই তার প্রাপ্য।

২. এমনি তো সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে এ উম্মতের জন্য মসজিদ (সেজদার জায়গা বা নামাযের স্থান) বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব স্থান বিশেষভাবে মসজিদের নামে খাস আল্লাহর ইবাদতের জন্য তৈরি করা হয়, সেগুলি অধিকতর বৈশিষ্ট্যধারী। সেখানে গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ডাকা বিরাট জুলুম (অন্যায়) ও শিরকের নিকৃষ্টতম পন্থা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, খালেস এক আল্লাহর দিকে আস এবং কাউকে কোথাও তাঁর শরীক বানিয়ে ডেকো না, বিশেষত মসজিদসমূহে, যেগুলো আল্লাহর নামে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য বানানো হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে 'মাসাজিদ' দ্বারা সেইসব অঙ্গ বোঝানো হয়েছে, যা সেজদার সময় মাটিতে রাখা হয়। তখন অর্থ এই হবে যে, এগুলি আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুতরাং এগুলিকে তাদের খালেক ও মালেক ছাড়া অন্য কারো সামনে ঝোঁকানো জায়েয নয়।

৩. অর্থাৎ কামেল বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৪. অর্থাৎ তিনি যখন দাঁড়িয়ে কুরআন পড়েন, তখন লোকেরা দলে দলে এসে তাঁর কাছে ভিড় জমায়। মুমিনরা তো কুরআন শোনার আগ্রহ ও আকর্ষণে, আর কাফেররা শত্রুতা ও অবাধ্যতাহেতু তাঁর কাছে আসে কোলাহল করার উদ্দেশ্যে।

[রুকূ - ২]

২০. আপনি বলুন, 'আমি তো কেবল আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না[১]।'	قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا۝
২১. আপনি বলুন, 'আমি তোমাদের ক্ষতি করার বা (তোমাদের) সুপথে আনার ইখতিয়ার রাখি না[২]।'	قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا۝
২২. আপনি বলুন, 'আমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে কেউ রক্ষা করবে না এবং আমি তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল পাব না[৩]।	قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا۝
২৩. 'কিন্তু (আমার এখতিয়ারে আছে) কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌছানো এবং তাঁর পয়গামসমূহ প্রচার করা[৪]। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, ওদের	اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

১. অর্থাৎ কাফেরদের বলে দিন, 'তোমরা বিরোধিতার উদ্দেশ্যে আমার কাছে ভিড় জমাও কেন? আমার কোন্ বিষয়টি এমন, যার কারণে তোমাদের এই ক্রোধ? আমি কোন মন্দ ও অসঙ্গত কথা তো বলছি না। শুধু নিজ প্রভুকে ডাকি এবং কাউকে তাঁর শরীক করি না। অতএব এতে ঝগড়া-ফাসাদের কী আছে? আর যদি তোমরা সকলে মিলে আমার উপর হামলে পড়ার ইচ্ছা করে থাক, তবে স্মরণ রেখো, আমার ভরসা একমাত্র সেই আল্লাহর উপর, যিনি সব রকমের অংশীদারিত্ব থেকে পবিত্র ও অমুখাপেক্ষী।

২. অর্থাৎ তোমাদেরকে পথে নিয়ে আসা আমার ইখতিয়ারে নয়। আর পথে না এলে তোমাদের কোন ক্ষতি করার ইখতিয়ারও আমার নেই। ভাল ও মন্দ এবং লাভ ও ক্ষতি— সবই এক আল্লাহর মুঠিতেই।

৩. অর্থাৎ তোমাদেরকে লাভ-লোকসান পৌছানো দূরের কথা; আমার লাভ-ক্ষতিও আমার হাতে নেই। ধরা যাক, আমি যদি নিজ দায়িত্বে ত্রুটি করি তবে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করবে। আর এমন কোন স্থানও নেই, যেখানে গিয়ে আমি আশ্রয় নিতে পারব।

৪. অর্থাৎ আল্লাহর তরফ থেকে পয়গাম আনা এবং তা তাঁর বান্দাদের কাছে পৌছে দেওয়া- এটাই তিনি আমার এখতিয়ারে দিয়েছেন এবং আমি এ দায়িত্ব পালন করলেই তাঁর সহায়তা ও আশ্রয়ে থাকতে পারব।

فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, যাতে ওরা চিরকাল থাকবে[১]।'

حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

২৪. (ওরা অবাধ্যই থাকবে,) অবশেষে যখন সেই জিনিস দেখতে পাবে যার ভয় ওদের দেখানো হচ্ছে, তখন জানতে পারবে— কার সাহায্যকারী দুর্বল ও কে সংখ্যায় কম[২]।

قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٥﴾

২৫. আপনি বলুন, 'আমি জানি না- যার ভয় তোমাদের দেখানো হচ্ছে, তা কি নিকটবর্তী, না তার জন্য আমার রব কোন (দীর্ঘ) মেয়াদ স্থির করবেন[৩]।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬. '(তিনি) গুপ্ত বিষয়ের পরিজ্ঞাতা। আর তিনি স্বীয় গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না—

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. 'ওই ব্যক্তি ছাড়া, যাকে তিনি পছন্দ করেছেন অর্থাৎ কোন রাসূল। আর আল্লাহ তাঁর আগে-পিছে প্রহরী নিয়োজিত করেন[৪]—

---

১. অর্থাৎ তোমাদের লাভ-লোকসানের মালিক আমি নই— এ কথা ঠিক। কিন্তু আল্লাহর ও আমার নাফরমানী করলে তোমাদের ক্ষতি অবশ্যই হবে।

২. অর্থাৎ তোমরা তো দল বেঁধে আমাদের কাছে হট্টগোল করছ এবং মনে করছ, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুষ্টিমেয় আর তারা দুর্বলও। তবে যখন সময় আসবে, তখন বোঝা যাবে, কার সঙ্গী-সাথী দুর্বল ও সংখ্যায় স্বল্প ছিল।

৩. অর্থাৎ ওয়াদাকৃত বস্তু কি তাড়াতাড়ি আসবে, না এক নির্ধারিত সময় পরে আসবে— এ জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়নি। কারণ, কিয়ামতের সময় নির্ধারিত করে আল্লাহ তাআলা কাউকে বলেননি। এ সেসব গায়বের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

৪. অর্থাৎ তাঁর গুপ্ত বিষয়াদির পূর্ণ খবর কাউকে দেননি। হাঁ, রাসূলদের মধ্যে যাঁর যে শান ও মর্যাদা, তা অনুপাতে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেন। আর এই ওহীর সাথে ফেরেশতাদের পাহারা ও বাহিনী রাখা হয়, যাতে কোন দিক থেকেই শয়তান তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রাসূলের নিজের নফসও ভুল না বোঝে। এ কারণেই পয়গম্বরদের ইলমসমূহ ও খবরাদি সম্পূর্ণ 'মা'সূম' অর্থাৎ ভ্রান্তিমুক্ত। অন্য কেউ এমন নয়। নবীদের معلومات (বা জ্ঞানরাজি) অকাট্য, তাতে দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যদের معلومات

২৮. 'যাতে তিনি জেনে নেন যে, তাঁরা তাঁদের রবের পয়গামসমূহ পৌঁছিয়েছে[১]। আর তিনি লোকদের নিকট যা রয়েছে, তা (নিজ জ্ঞান দ্বারা) পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সবকিছু পরিপূর্ণ হিসাব করে রেখেছেন[২]।'

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۟

—জানা-শোনার মধ্যে কয়েক রকমের দ্বিধা-সন্দেহের সম্ভাবনা থাকে। এ জন্যই বিজ্ঞ সূফিয়ায়ে কেরাম (র) বলেছেন যে, ওলী নিজের কাশ্‌ফকে কুরআন ও সুন্নতের সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন। যদি কুরআন-হাদীছের পরিপন্থী না হয়, তবে তাকে গনীমত মনে করবেন। নতুবা বিনা-দ্বিধায় তা অগ্রাহ্য করবেন।

বি. দ্র. এ আয়াতের মত আয়াত সূরা আলে-ইমরানেও আছে। তাতে ইরশাদ হয়েছে- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ (আর আল্লাহ এমনো নন যে, তিনি তোমাদেরকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন।) আরো কয়েকটি সূরায় ইলমে গায়বের উল্লেখ রয়েছে। আমরা সেখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

১. অর্থাৎ এমন শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা দেখে নিতে চান যে- ফেরেশতাগণ পয়গম্বরদের কাছে, অথবা পয়গম্বরগণ অন্য বান্দাদের কাছে তাঁর পয়গাম ঠিক ঠিক পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, কোন কমবেশি করেননি।

২. অর্থাৎ সকল বিষয় তাঁর নেগরানী ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আল্লাহর ওহীর মধ্যে কোন রদ-বদল বা কাট-ছাঁট করতে পারে— এমন শক্তি কারো নেই। আর এই যে পাহারাদারী ও চৌকিদারীর ব্যবস্থা, এরও উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুমতের শান প্রকাশ করা এবং 'আসবাব' তথা বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ধারা সংরক্ষণ করা। এ ছাড়া আরও হিকমত রয়েছে। নতুবা যাঁর ইলম প্রত্যেক জিনিসে ব্যাপ্ত এবং সবকিছু যাঁর কব্জায়, তাঁর জন্য এসবের কোনই প্রয়োজন নেই।

সূরা মুয্যাম্মিল

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭৩ । ২০ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آياتها ٢٠، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ

১. হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল)[১]!

১. **অবতরণের প্রেক্ষাপট**

এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের একটি। সহীহ বর্ণনায় (বুখারী : ৪৯৫৩) রয়েছে, শুরুতে যখন ওহীর ভয় ও চাপে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর কাঁপতে শুরু করল, তিনি পরিবারের লোকদের বললেন– زملوني زملوني (আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।) তাঁকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাআলা এ সূরায় এবং পরবর্তী সূরায় তাঁকে مزمل مدثر বলে সম্বোধন করেন।

অপর কোন কোন বর্ণনায় আছে, কুরায়শরা 'দারুন-নদওয়া'(সভাকক্ষ)-তে সমবেত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পরামর্শ করল, তাঁর জন্য তাঁর অবস্থার উপযোগী কোন উপাধি নির্ধারণ করা উচিত। তখন কেউ 'কাহেন' (গণক) বলল, কেউ 'যাদুকর', কেউ 'উন্মাদ' বলল। কিন্তু কোন উপাধির ব্যাপারে ওরা একমত হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত (অধিকাংশের) ঝোঁক হল ساحر (যাদুকর) উপাধির প্রতি। নবীজি (স) এ সংবাদ পেয়ে দুঃখিত ও বিষণ্ন হলেন এবং নিজেকে কাপড়ে ঢেকে নিলেন, যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তা-ফিকিরে পড়ে মানুষ এমন করে। এতে আল্লাহ তাআলা আদর ও সোহাগ করে তাঁকে মুয্যাম্মিল (কাপড়ে আবৃত) নামে ডাকলেন। (মুজামে আওসাত, হাদীস ২০৯৬ তবে এর সনদ অনির্ভরযোগ্য) যেমন: একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা)-কে (স্নেহভরে) বলেছিলেন- قُم أبا تراب (উঠ হে মাটিওয়ালা), যখন তিনি ঘর থেকে বিষণ্ন মনে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে মাটিতে শুয়েছিলেন।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন, 'এ সূরার মধ্যে দরবেশীর পোষাক ধারণ করার (তথা আত্মসংশোধন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্ত সুলূকের পথের পথিক হওয়ার –অনুবাদক) শর্তাবলি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। যেন এ সূরা সেই ব্যক্তির সূরা, যিনি দরবেশদের পোষাক পরিধান করতে এবং নিজেকে এই রঙে রঙিন করতে চান।

আরবী ভাষায় مُزَمِّل সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে বড় কাপড় দিয়ে নিজের শরীর ঢেকে নেয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ও কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য রাতে উঠতেন, তখন একটি প্রশস্ত কম্বল শরীরে জড়িয়ে নিতেন, যাতে শীত থেকে শরীরের হেফাজত হয় এবং ওযু ও নামাযের সময় (শীতের) কষ্ট না হয়।

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

২. রাতে (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকুন; তবে কোন কোন রাতে (না উঠলে ক্ষতি নেই)*[১]।

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝

৩. আধা রাত; অথবা তা থেকে কিছুটা কমান,

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

৪. কিংবা তার চেয়ে বাড়িয়ে নিন[২]। এবং কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে[৩]।

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝

৫. আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করব এক গুরুভার বাণী[৪]।

উল্লেখ্য, নবীজিকে উক্ত শব্দে সম্বোধন করে ওই লোকদের সতর্ক করাও উদ্দেশ্য, যারা কাঁথা-কম্বলে আচ্ছাদিত হয়ে রাতে আরাম করে। তাদের ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, তারা যেন রাতের একটা নির্ধারিত অংশ আল্লাহর ইবাদতে কাটায়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**–'রাতের কিয়দংশ ছাড়া অবশিষ্ট রাতে দণ্ডায়মান থাকুন'।

১. অর্থাৎ ঘটনাক্রমে কোন কোন রাতে যদি ওঠা না হয়, তবে তা মাফ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট إلا قليلا এর অর্থ এই যে, রাতে আল্লাহর ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকুন। তবে রাতের অল্প অংশে যদি আরাম করেন, তবে কোন ক্ষতি নেই।

সম্ভবত অল্প দ্বারা এখানে আধা রাত উদ্দেশ্য। কারণ, যে রাত হল আরামের জন্য, তার আধা যখন ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া হল, তখন অবশিষ্ট আধাকে অল্প বলাই সংগত।

২. অর্থাৎ আধা রাত থেকে কিছু কম, যা রাতের তিন ভাগের একভাগ পর্যন্ত হতে পারে অথবা আধা থেকে বেশি, যা দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হতে পারে। সামনে যে আয়াত আসছে, তার ইঙ্গিত থেকে এরূপই বোঝা যায়। আয়াতটি হল– إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ الخ

৩. অর্থাৎ তাহাজ্জুদে কুরআন থেমে থেমে পড়ুন, যাতে প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কার বুঝে আসে। এভাবে পড়লে কুরআন বুঝতে ও তাতে চিন্তা করতে সুবিধা হয়, দিলের উপর তাছীর বেশি হয় এবং যওক-শওক বৃদ্ধি পায়।

৪. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ রিয়াযত (মুজাহাদা) করুন, তাহলে ভারী বোঝা হালকা হয়ে যাবে।' আর সেই বোঝা এমন যে, তার সামনে রাত জাগাকে সহজ মনে করা উচিত।

قولا ثقيلا

উদ্দেশ্য এই যে, এখন আপনার প্রতি ধারাবাহিকভাবে কুরআন নাযিল করব, যা মহিমা ও মর্যাদার দিক থেকে বহু দামী ও মূল্যবান এবং আপন গুণ-গরিমা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির

৬. রাতে ওঠা (নফসকে) প্রবলভাবে দলিত করে এবং তা বাক্যের অধিকতর সঠিকভাবে উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যম*[১]।	اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيۡلِ هِىَ اَشَدُّ وَطۡاً وَّاَقۡوَمُ قِيۡلًا ؕ ۶
৭. দিনের বেলায় তো আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রয়েছে[২]।	اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبۡحًا طَوِيۡلًا ؕ ۷

দিক থেকে অত্যন্ত ভারী। হাদীছে আছে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন অবস্থা ও অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হতেন। শীতের দিনেও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তখন আরোহী অবস্থায় থাকলে পশু তাঁকে বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ত। একবার তাঁর মাথা মুবারক যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা)-এর উরুর উপর ছিল। তখন ওহী নাযিল হল। যায়েদ ইবনে ছাবেতের মনে হল, তাঁর উরু (ওহীর) গুরুভারে ফেটে যাবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২, ৪৫৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৩৩৩) এ ছাড়া সেই পরিবেশে কুরআনের দাওয়াত ও তাবলীগ, তার হকসমূহ পরিপূর্ণরূপে আদায় করা এবং এই পথে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট উদার মনে সহ্য করাও অত্যন্ত ভারী কাজ ছিল। আর এই কালাম একদিকে যেমন নবীজির জন্য গুরুভার ছিল, অন্যদিকে কাফের ও অস্বীকারকারীদের জন্য তা ছিল দুর্বিসহ।

মোটকথা, এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, যতখানি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, রাতের বেলায় তার তেলাওয়াতে মশগুল থাকুন এবং এই মহান ইবাদতের নূর দ্বারা কুরআনের মত শ্রেষ্ঠতম ফয়েয কবুল করার যোগ্যতা নিজের ভিতর পরিপক্ক করতে থাকুন।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'রাতে উঠে পড়া— নিশ্চয় এর দলন প্রবলতর এবং এতে উচ্চারিত বাক্য সঠিকতর'।

১. অর্থাৎ রাতে ওঠা কোন সহজ কাজ নয়, বরং খুবই ভারী রিয়াযত (মুজাহাদা) এবং কামনা-বাসনা দমনের বিরাট সাধনা। এতে নফস নিষ্পেষিত হয় এবং ঘুম, আরাম ইত্যাদি প্রবৃত্তি দলিত-মথিত হয়। তাছাড়া এ সময় দো'য়া ও যিক্‌র খাঁটি দিলে আদায় হয়, যবান ও দিল মিলিত হয়। যে কথা যবান থেকে বের হয়, দেমাগে তা উত্তমরূপে বসে যায়। কেননা, পরিবেশ সব রকমের হট্টগোল ও কোলাহলমুক্ত হওয়ার কারণে এবং (তখন) 'দুনিয়ার আকাশে আল্লাহ পাকের অবতরণের' ফলে অন্তরে এক আশ্চর্য প্রশান্তি, স্থিরতা, স্বাদ ও আগ্রহের অবস্থা পয়দা হয়।

২. অর্থাৎ দিনের বেলায় লোকদের বোঝানো এবং আরো অনেক ধরনের ব্যস্ততা থাকে। যদিও এসবও আপনার জন্য পরোক্ষভাবে ইবাদত, তবুও প্রতিপালকের প্রত্যক্ষ ইবাদত ও মুনাজাতের জন্য রাতের সময় নির্ধারিত রাখা উচিত। আর ইবাদতে মশগুল হয়ে যদি রাতের কোন কোন প্রয়োজন বাদ পড়ে যায়, তবে কোন সমস্যা নেই, দিনে তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে।

৮. অতএব আপনি আপন রবের নাম জপতে থাকুন এবং সকল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই অভিমুখী হয়ে থাকুন[১]।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

৯. (তিনি) মাশরিক (উদয়াচল) ও মাগরিব (অস্তাচল) এর মালিক[২]। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। অতএব তাঁকেই কর্মবিধায়ক-রূপে গ্রহণ করুন[৩]।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

১০. আর ওরা যা কিছু বলে, তাতে ধৈর্য ধরুন[৪] এবং ওদের পরিহার করে চলুন উত্তমভাবে[৫]।

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

---

১. অর্থাৎ রাতের কিয়াম বা তাহাজ্জুদ ছাড়া দিনের বেলাতেও প্রতিপালকের সঙ্গে দিলের সংযোগকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেবেন এবং চলাফেরায়, ওঠাবসায় তাঁরই স্মরণে মশগুল থাকবেন, যদিও দিনে মাখলুকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। গায়রুল্লাহর কোন সম্পর্ক এক মুহূর্তের জন্যও যেন আল্লাহ থেকে গাফেল হতে না দেয়, বরং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্তরে সেই একজনেরই সম্পর্ক বাকী রাখবেন। অন্য কথায়, সেই এক সম্পর্কের মধ্যে সকল সম্পর্ক যেন বিলীন হয়ে যায়। সূফীদের পরিভাষায় একে বলা হয়— بے ہمہ وباہمہ (সবকিছুর সঙ্গে থেকেও সবকিছু থেকে পৃথক) অথবা خلوت در انجمن (সমাবেশে থেকেও নির্জনতা)।

২. পূর্বদিক দিনের ও পশ্চিমদিক রাতের নিদর্শন। এতে যেন ইঙ্গিত করা হল যে, দিন ও রাত উভয়কে মাশরিক ও মাগরিবের মালিকের স্মরণে ও তাঁর সন্তুষ্টি-সন্ধানে নিয়োজিত রাখা দরকার।

৩. অর্থাৎ ইবাদত তাঁরই জন্য এবং ভরসাও তাঁরই উপর করা উচিত। যখন তিনিই কার্যসম্পাদনকারী, তখন অন্য সকল থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হওয়াতে ভয় কীসের?

৪. অর্থাৎ কাফেররা যে আপনাকে যাদুকর, গণক, উন্মাদ ও যাদুগ্রস্ত প্রভৃতি বলছে, এসব কথা আপনি ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে সইতে থাকুন।

৫. هَجْرًا جَمِيلًا -এর অর্থ হচ্ছে, বাহ্যত ওদের সংস্পর্শ বর্জন করুন, তবে ভিতরে ভিতরে ওদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকুন যে, ওরা কী করে ও কী বলে, আর আমাকে কেমন করে স্মরণ করে। দ্বিতীয়ত, কারো কাছে ওদের অসদাচরণের অভিযোগ করবেন না, প্রতিশোধ নেওয়ার পিছনেও পড়বেন না, ওদের সাথে কথাবার্তা ও বিতর্কের সময়ও বক্র-স্বভাবের পরিচয় দেবেন না। তৃতীয়ত, বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও ওদের নসীহত করায় ত্রুটি করবেন না; বরং যেভাবেই হোক ওদেরকে হেদায়াত করার ও পথপ্রদর্শনের চেষ্টা করতে থাকবেন।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে পৃথক হোন, কিন্তু লড়াই-ঝগড়া করে নয়,বরং সদাচরণের সাথে।'

১১. আর আরাম-আয়েশের অধিকারী অস্বীকারকারীদের ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দিন এবং ওদের কিছুটা অবকাশ দিন[১]।

وَذَرۡنِیۡ وَالۡمُکَذِّبِیۡنَ اُولِی النَّعۡمَۃِ وَمَهِّلۡهُمۡ قَلِیۡلًا ﴿۱۱﴾

১২. নিশ্চয় আমার নিকট আছে বেড়িসমূহ, লেলিহান আগুন-

اِنَّ لَدَیۡنَاۤ اَنۡکَالًا وَّجَحِیۡمًا ﴿۱۲﴾

১৩. এবং গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য ও যাতনাদায়ক শাস্তি[২]।

وَّطَعَامًا ذَا غُصَّۃٍ وَّعَذَابًا اَلِیۡمًا ﴿۱۳﴾

১৪. (এসব সেদিন আপতিত হবে), যেদিন পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়-পর্বত পরিণত হবে গড়িয়ে পড়া বালুকাস্তূপে[৩]।

یَوۡمَ تَرۡجُفُ الۡاَرۡضُ وَالۡجِبَالُ وَکَانَتِ الۡجِبَالُ کَثِیۡبًا مَّهِیۡلًا ﴿۱۴﴾

১৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানকারী[৪]; যেমন ফেরাওনের নিকট পাঠিয়েছিলাম এক রাসূল[৫]।

اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلَیۡکُمۡ رَسُوۡلًا ۬ۙ شَاهِدًا عَلَیۡکُمۡ کَمَاۤ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلٰی فِرۡعَوۡنَ رَسُوۡلًا ﴿ؕ۱۵﴾

তবে স্মরণ রাখতে হবে, এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। আর কেতাল বা জেহাদের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে মদীনায়।

১. অর্থাৎ সত্য ও সততাকে অস্বীকারকারীদের ব্যাপার, যারা দুনিয়াতে আরাম-আয়েশ ভোগ করছে, আমার কাছে সোপর্দ করে দিন। আমি নিজেই ওদের ব্যাপারটা দেখে নেব। তবে এ মুহূর্তে একটু ঢিল দেওয়া হচ্ছে।

২. عذابا اليما- অর্থাৎ বিষাক্ত সাঁপ ও বিচ্ছুর যন্ত্রণাদয়ক আযাব। আল্লাহই জানেন, আরও কী কী আযাব আছে। (আল্লাহই হেফাজতকারী!)

৩. অর্থাৎ ওই কঠিন আযাবের সূচনা তখন থেকে হবে, যখন পাহাড়-পর্বতের গোড়া ঢিলা হয়ে যাবে এবং সেগুলো প্রকম্পিত হয়ে হেলে পড়বে। তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এমন হয়ে যাবে যেমন বালুর স্তূপ, যার উপর পা স্থির হয় না।

৪. অর্থাৎ রাসূল আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন, কে তাঁর কথা মেনেছিল এবং কে মানেনি।

৫. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায় আপনাকেও স্বতন্ত্র দীন ও মহামর্যাদাশালী কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছি। সম্ভবত এখানে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তাওরাতে (পুস্তক: দ্বিতীয় বিবরণ) আছে- 'আমি বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্যেও (অর্থাৎ বনী ইসমাঈল এর মধ্যে) তোমার ন্যায় এক নবী পাঠাব।'

১৬. কিন্তু ফেরাওন রাসূলের কথা অমান্য করল। ফলে আমি ওকে পাকড়াও করলাম কঠোরভাবে[১]।	فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝
১৭. অতএব তোমরা যদি অস্বীকার কর, তবে সেই দিন থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে, যে দিন বালককে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে[২]?	فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَا ۝
১৮. সেদিন আকাশ ফেটে যাবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই হবে[৩]।	اِلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝
১৯. এ (কুরআন) তো উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে আপন রব পর্যন্ত পৌছার পথ অবলম্বন করুক[৪]।	اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝

[রুকূ - ২]

২০. নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি (কখনো) রাতের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, (কখনো) রাতের অর্ধেক ও (কখনো) রাতের	اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ

---

১. যখন মূসা (আ)-এর অস্বীকারকারীদের এমন শক্তভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকারকারীদের কেন পাকড়াও করা হবে না, যিনি সমস্ত আম্বিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম?

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় যদি বেঁচেও যাও, তবু সেদিন কী করে বাঁচবে, যেদিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ্য শিশুদের বুড়ো বানিয়ে দেবে। (অর্থাৎ) বাস্তবেই শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে না, তবে সেদিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ্য এমন, যা শিশুকে বুড়ো বানিয়ে দেওয়ার মত।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা অটল, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, তোমরা তাকে যতই অসম্ভব মনে কর না কেন।

৪. অর্থাৎ নসীহত করে দেওয়া হল। এখন যে নিজের কল্যাণ চায়, সে নসীহত মত আমল করে নিজ প্রভুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হোক। পরিষ্কার রাস্তা পড়ে আছে, কোন বাধা-বিপত্তি নেই। আল্লাহরও কোন স্বার্থ নেই। তোমরা নিজেদের কল্যাণ চাইলে সোজা এ পথে চলে আস।

বি. দ্র. সূরার শুরুতে রাতে জেগে ওঠার যে হুকুম ছিল, তা প্রায় এক বছর বলবৎ থাকে। অতঃপর সামনের আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়।

الَّذِيْنَ مَعَكَ ۭ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۭ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ڮ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

এক তৃতীয়াংশ দণ্ডায়মান থাকেন এবং আপনার সঙ্গীদের এক দলও[১]। আর আল্লাহই নির্ধারণ করেন রাত ও দিনের পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের পূর্ণ হিসাব রাখতে পারবে না। সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন। এখন কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয় ততটুকুই পড়[২]। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কতক অসুস্থ হবে, আর কিছু সংখ্যক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমীনে ভ্রমণ করবে, আর কিছু লোক আল্লাহর পথে যুদ্ধরত থাকবে। অতএব কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয়, তোমরা ততটুকুই পড়। আর নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর[৩]

১. অর্থাৎ আল্লাহর জানা আছে যে, আপনি ও আপনার সাথীরা তাঁর হুকুম পূর্ণরূপে পালন করেছেন। কখনো আধারাত, কখনো তিনভাগের একভাগ এবং কখনো তিনভাগের প্রায় দুইভাগ রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছেন। যেমন বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে, রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সাহাবীদের পা ফুলে যেত এবং ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা হত। বরং কেউ কেউ তো নিজেদের চুল দড়ির সাথে বেঁধে রাখতেন, যাতে ঘুম আসলে টান লাগে আর সেই কষ্টে চোখ খুলে যায়। (তাফসীরে তবারী ২৩/৩৬০-৩৬২)

২. অর্থাৎ রাত ও দিনের সঠিক পরিমাপ তো আল্লাহ তাআলা জানেন। তিনিই এক বিশেষ পরিমাপে কখনো রাতকে দিন থেকে ছোট করেন, কখনো বড় করেন। আর কখনো উভয়কে সমান করে দেন। বান্দাদের পক্ষে ঘুম ও উদাসিনতার সময় দৈনিক আধা, তিনভাগের একভাগ ও তিনভাগের দুইভাগ রাতের পূর্ণ হিসাব রাখা, বিশেষত যে যুগে ঘড়ি-ঘন্টা কোনও যন্ত্র ছিল না, সহজ ব্যাপার ছিল না। এ জন্যই কোন কোন সাহাবী রাতভর ঘুমাতেন না, পাছে ঘুমের কারণে এক তৃতীয়াংশ রাতও জাগার ভাগ্য না হয়।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে ক্ষমার ঘোষনা দিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, তোমরা সর্বদা এটা পরিপূর্ণভাবে ঠিক রাখতে পারবে না। এজন্য যার ওঠার তাওফীক হবে এবং যে পরিমাণ নামায পড়তে পারবে এবং তাতে যে পরিমাণ কুরআন পড়তে চাবে— পড়ে নেবে। এখন উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ নামাযও ফরয নয় এবং সময়ের ও তেলাওয়াতের পরিমাণেও কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানেন যে, তোমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ হবে এবং অনেকে হবে মুসাফির, যারা যমীনের বুকে জীবিকা বা ইলম ইত্যাদি তালাশ করে ফিরবে। তাছাড়া সেই

এবং আল্লাহকে দিতে থাক উত্তম ঋণ[১]। তোমরা যা কিছু সৎকর্ম নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম অবস্থায় এবং ছওয়াবে অধিক পাবে[২]। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান[৩]।

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বীর মুজাহিদরাও থাকবে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে। এসব অবস্থায় রাত-জাগরণের বিধানের উপর আমল করা অত্যন্ত কঠিন হবে। এ কারণে তোমাদের জন্য আমলাদির বোঝা কমানো হল। এখন নামাযের মধ্যে যে পরিমাণ কুরআন পড়া সহজ হয় তাই পড়। নিজেদের জানকে অতি কষ্টে ফেলার প্রয়োজন নেই। হাঁ, ফরয নামাযগুলি খুবই যত্নের সাথে যথা নিয়মে পড়তে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাক। এসব আমলের পাবন্দী দ্বারাই অনেক রূহানী ফায়দা ও উন্নতি হাসিল হতে পারে।

পূর্বোক্ত বিধানের তাৎপর্য

প্রথম প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের দ্বারা এই যে এক বছর পর্যন্ত অত্যন্ত তাকীদ ও গুরুত্বের সাথে রাতে উঠে পড়ার কঠিন রিয়াযত বা সাধনা করানো হলো— এর কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা ভবিষ্যতে সমস্ত উম্মতের হাদী ও মুআল্লিম হবেন। সুতরাং মুজাহাদার মাধ্যমে তাঁদের পরিশুদ্ধ হওয়া এবং রূহানিয়্যতের রঙে কামেল রঙিন হওয়া জরুরি ছিল, যেন সমস্ত দুনিয়ার সামনে তারা কামালাতে মুহাম্মদীর দর্পণ হয়ে উঠতে পারেন এবং তাদের পবিত্র দল সমগ্র উম্মতের ইসলাহের ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে সক্ষম হন।

১. পরিপূর্ণ এখলাসের সাথে আল্লাহর পথে তাঁর বিধান অনুযায়ী (সম্পদ) ব্যয় করাই হচ্ছে তাঁকে উত্তমরূপে ঋণ দেওয়া। আল্লাহর বান্দাদেরকে কর্জে হাসানা দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস দ্বারা এর ফজীলত প্রমাণিত।

২. অর্থাৎ যে নেকী এখানে করবে, আল্লাহর কাছে তা অতি উত্তম আকারে পাবে এবং তার বিনিময়ে অনেক বড় প্রতিদান পাবে। অতএব এমন মনে করো না যে, আমরা যে নেকী করি তা এখানেই খতম হয়ে যায়। না, না, তা তো তোমাদের আগে আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়, আর তা প্রয়োজনের সময় তোমাদের কাজে আসবে।

৩. অর্থাৎ সমস্ত বিধি-বিধান পালন করার পরও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, কোন ব্যক্তি যতই সতর্ক হোক, তার থেকেও কিছু না কিছু ত্রুটি হয়ে যায়। এমন কে আছে, যে দাবি করতে পারে, আমি আল্লাহর বন্দেগীর পরিপূর্ণ হক আদায় করে দিয়েছি? বরং বান্দা যত বড় হয়, সে তত বেশি নিজেকে অপরাধী মনে করে এবং নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আয় গফূর ও রহীম! আপনি নিজ ফযলে আমারও গোনাহ-খাতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন।

تم سورة المزمل ولله الحمد و المنة

সূরা মুদ্দাছ্ছির

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭৪ । ৫৬ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آياتها ٥٦، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝١

১. হে বস্ত্রাবৃত (রাসূল)[১]!

قُمْ فَاَنْذِرْ ۝٢

২. উঠুন ও সতর্ক করুন[২]।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝٣

৩. এবং আপনার রবেরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করুন[৩]।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

৪. এবং আপনার কাপড় পবিত্র রাখুন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝٥

৫. আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন[৪]।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦

৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে অনুগ্রহ করবেন না।

---

১. এর জন্য সূরা 'মুয্যাম্মিল' এর প্রথম ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ ওহীর ভার ও ফেরেশতার ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়। আপনার কাজ তো এই যে, আরাম-আয়েশ ছেড়ে মানুষদের আল্লাহর ভয়ে ভীত করবেন এবং কুফর ও অবাধ্যতার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন।

৩. কেননা, প্রভুর শ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং তাঁর মর্যাদা ও মহিমা বয়ান করার দ্বারাই দিলের মধ্যে তাঁর ভয় পয়দা হয়। আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাই সেই জিনিস, যার পরিচয় সকল আমল ও আখলাকের পূর্বে হাসিল করা উচিত। যা হোক, তাঁর কামালাত (গুণাবলি) ও নে'য়ামতসমূহের প্রেক্ষাপটে নামাযে এবং নামাযের বাইরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকারোক্তি ও তা ঘোষণা করাই আপনার কাজ।

৪. এই সূরা অবতীর্ণ করে নবীজিকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকুন। এরপর নামায ইত্যাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নামাযের জন্য কাপড় পাক হওয়া এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা জরুরি। এ কথাই এখানে বয়ান করা হল।

বলা বাহুল্য, যখন বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নাপাকি থেকে কাপড়-চোপড় পবিত্র রাখা জরুরী, তখন তা থেকে শরীরের পবিত্রতা তো অধিকতর জরুরী। এজন্য এ কথা আলাদাভাবে বয়ান করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

৭. এবং আপন রবের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরুন[১]।	وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝
৮. যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে[২]—	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝
৯. সেদিন হবে খুবই কঠিন দিন[৩],	فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝
১০. কাফেরদের জন্য সহজ নয়[৪]।	عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝
১১. আমার উপর ছেড়ে দিন ওই ব্যক্তির ব্যাপার, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি নিঃসঙ্গ অবস্থায়[৫]।	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝

কোন কোন মুফাসসির কাপড়-চোপড় পাক রাখার অর্থ করেছেন— নফসকে খারাপ স্বভাব-চরিত্র থেকে পবিত্র রাখা। আর নাজাসত (অপবিত্রতা) থেকে দূরে থাকার এই অর্থ করেছেন যে, আপনি (হে রাসূল) মূর্তি-প্রতিমার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকবেন, যেমন এখন পর্যন্ত দূরে আছেন।

যা হোক, আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার তাকীদ করা উদ্দেশ্য। কারণ, তা ছাড়া প্রভুর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব যথাযথভাবে অন্তরে প্রোথিত হয় না।

১. এখানে আল্লাহ তাআলা উচ্চ নৈতিকতা ও উন্নত আদর্শের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কাউকে কিছু দিলে (টাকা-পয়সা বা ইলম ও হেদায়াত ইত্যাদি) তার থেকে বিনিময় চাইবেন না। বরং স্বীয় রবের দানের উপর কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল থাকবেন। আর দাওয়াত ও তাবলীগের পথে যেসব কঠোরতা আসবে, তাও আল্লাহর ওয়াস্তে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে মেনে নেবেন এবং তাঁর হুকুমের অপেক্ষা করবেন। কারণ, এই মহান কাজ উচুঁ মন, উন্নত আদর্শ এবং ধৈর্য ও অবিচলতা ছাড়া সম্পন্ন হবে না।

এই আয়াতগুলোর তাফসীর আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে, কিন্তু অধমের খেয়ালে এ-ই সরল তাফসীর।

২. نقر في الناقور- অর্থাৎ শিঙ্গা ফুঁকা হবে।

৩. সেদিনের ঘটনাবলির মধ্যে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখযোগ্য। আর দিনটি আগাগোড়া এক বিভীষিকা ও দুর্বিসহ দুঃখ-কষ্টে ভরা দিন।

৪. অর্থাৎ কাফেরদের জন্য কোন রকমের আসানী হবে না; বরং সেদিনের ভয়াবহতা প্রতি মুহূর্তে ওদের ক্ষেত্রে বাড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে, মুমিনরা কাঠিন্যের সম্মুখীন হলেও কিছু সময় পর আবার আসান করে দেওয়া হবে।

৫. প্রত্যেক মানুষ মায়ের পেট থেকে একলা ও সঙ্গীহীন অবস্থায় আসে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সৈন্যসামন্ত, সামান-উপকরণাদি— কিছুই সাথে আনে না।

অথবা وحيد শব্দ দ্বারা এস্থলে ওলীদ ইবনে মুগীরা উদ্দেশ্য, যার সম্পর্কে এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে। সে ছিল পিতার একমাত্র ছেলে। পার্থিব প্রভাব, সামর্থ্য ও যোগ্যতার দিক থেকে তাকে আরবে অদ্বিতীয় মনে করা হত।

১২. আর ওকে দিয়েছি বিস্তৃত ধন-সম্পদ।

وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ﴿۱۲﴾

১৩. এবং সদা (চোখের সামনে) উপস্থিত পুত্রগণ[১]।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ﴿۱۳﴾

১৪. আর ওর জন্য খুব উত্তম আয়োজন করেছি[২]।

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿۱۴﴾

১৫. এরপরও সে লোভ করে যে, আমি (ওকে) আরো দেই[৩]।

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ﴿۱۵﴾

১৬. কখনো না! সে তো আমার আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচারী[৪]।

كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ؕ﴿۱۶﴾

আয়াতের মর্ম এই যে, এমন কাফেরদের ব্যাপারে ত্বরা করবেন না। ওদের অবকাশ দেওয়ার কারণে মনে কষ্ট নেবেন না। বরং ওদের বিষয় আমার নিকট সোপর্দ করুন। আমি সকলের শাস্তির ব্যবস্থা করে ছাড়ব। আপনার চিন্তিত ও পেরেশান হওয়ার দরকার হবে না।

১. অর্থাৎ ওর অনেক ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি রয়েছে। ওর দশটি ছেলে সর্বদা চোখের সামনে থাকত এবং মজলিস-বৈঠকে বাপের মর্যাদা বাড়াত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করত। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অপরাপর কাজকর্মের জন্য বহু চাকর-বাকরও ছিল। এরা থাকায় ছেলেদের বাপের চোখের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনই হত না।

২. অর্থাৎ দুনিয়ায় ওর খুব মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে দিলাম এবং নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের আসন উত্তমরূপে তৈরি করে দিলাম। সমস্ত কুরায়শ প্রত্যেক কঠিন কাজে ওরই দিকে রুজু করত এবং ওকে নিজেদের নেতা গণ্য করত।

৩. অর্থাৎ নে'য়ামত ও ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও কখনো কৃতজ্ঞতার একটি হরফ ওর যবান থেকে বের হয়নি; বরং সর্বদা মূর্তিপূজা এবং অধিকতর সম্পদ জমা করার লোভে থাকত। আর যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ওর সামনে বেহেশতের নে'য়ামতরাশির কথা বলতেন, তখন সে বলত, 'যদি এ ব্যক্তি নিজ কথায় সত্য হয়, তবে আমি নিশ্চিত, সেখানকার নে'য়ামতও আমার ভাগ্যে জুটবে।

ওর ব্যাপারেই বলা হচ্ছে যে, এমন অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও কিভাবে আশা রাখে যে, আল্লাহ তাআলা ওকে দুনিয়া ও আখেরাতের নে'য়ামতরাশি আরো অধিক দেবেন?

৪. অর্থাৎ যখন সে প্রকৃত অনুগ্রহকারী অর্থাৎ আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরোধী, তখন ওর কোন অধিকার নেই এমন আশা করার ও সুখ-স্বপ্নের জাল বুনার।

কথিত আছে, আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিলের পর ওর ধন-সম্পদে অব্যাহতভাবে লোকসান হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ফকীর হয়ে লাঞ্ছনার মৃত্যু বরণ করে।

১৭. শীঘ্রই আমি ওকে চড়াব কঠিন চড়াইতে[১]।
سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۝

১৮. সে চিন্তা-ভাবনা করল এবং (মনে মনে একটা কথা) স্থির করল।
اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝

১৯. সুতরাং ধ্বংস হোক সে! কেমন কথা সে স্থির করল!
فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

২০. পুনরায় ধ্বংস হোক সে! কেমন কথা সে স্থির করল[২]!
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

২১. তারপর সে দৃষ্টিপাত করল।
ثُمَّ نَظَرَ ۝

২২. অতঃপর ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল।
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

---

১. অর্থাৎ ওকে কঠিন চড়াইতে চড়তে হবে এবং মর্মন্তুদ মুসিবতে গ্রেফতার হতে হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, صعود দোযখের একটি পাহাড়, যার উপর কাফেরদের অব্যহতভাবে চড়ানো হবে এবং নীচে নিক্ষেপ করা হবে। বস্তুত এও আযাবের একটি ধরন। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১৭১২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৭৫৯– এর সনদ দুর্বল)

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

ওলীদ একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হল। তিনি কুরআন পাঠ করে শোনালেন, ফলে তার কিছুটা ভাবান্তর হল। কিন্তু আবু জাহল ওকে প্ররোচিত করল এবং কুরায়শদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল যে, ওলীদ মুসলমান হয়ে গেলে বড়ই বিপদ হবে। অতএব ওরা সবাই সমবেত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে আলোচনা করল। কেউ বলল, তিনি কবি। কেউ 'কাহেন' বলল। ওলীদ বলল, আমি নিজে কাব্যে খুব পারদর্শী এবং কাহেনদের কথাও সব শুনেছি। কুরআন কবিতাও নয়, গণকের কথাও নয়। লোকেরা বলল, তবে আপনার অভিমত কী? বলতে লাগল, একটু চিন্তা করে নিই। শেষ পর্যন্ত ভ্রূকুঞ্চন করে এবং মুখ ভেঙ্গিয়ে বলল, কিছু নয় স্রেফ যাদু, যা বাবেলবাসীদের থেকে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

অথচ সে ইতিপূর্বে কুরআন শুনে বলেছিল, এ যাদুও নয়, উন্মাদের প্রলাপও মনে হয় না; বরং আল্লাহর কালাম। কিন্তু শুধু আপন জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের খুশী করার জন্য এখন এ কথা বলল। সামনে এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। (তাফসীরে তবারী ২৩/৪২৯-৪৩০; মুসতাদরাকে হাকিম, বর্ণনা ৩৯১৪)

২. অর্থাৎ হতভাগা মনে মনে চিন্তা করে একটা কথা স্থির করল। তা এই যে, কুরআন যাদু। আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুক। কেমন বাজে কথা সে সাব্যস্ত করল। ফের আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুন। কারণ, সে নিজ সম্প্রদায়ের মনোভাব লক্ষ করে এমন কথা স্থির করল, যা শুনে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল (অথচ কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত)।

২৩. তারপর পিঠ ফেরাল ও অহংকার করল—	ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ﴿۲۳﴾
২৪. এবং বলল, 'এ তো যাদু ছাড়া আর কিছু নয়, যা (লোকপরম্পরায়) বর্ণিত হয়ে আসছে।	فَقَالَ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ یُّؤْثَرُ ۙ﴿۲۴﴾
২৫. 'এ মানুষের কথা বৈ কিছু নয়'[১]	اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ؕ﴿۲۵﴾
২৬. শীঘ্রই আমি ওকে আগুনে নিক্ষেপ করব[২]।	سَاُصْلِیْهِ سَقَرَ ﴿۲۶﴾
২৭. আপনি কি জানেন, সেই আগুন কেমন?	وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ؕ﴿۲۷﴾
২৮. তা অক্ষতও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না[৩]।	لَا تُبْقِیْ وَلَا تَذَرُ ۚ﴿۲۸﴾
২৯. (তা দোযখীদের) চামড়া পুড়ে ফেলবে[৪]।	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ﴿۲۹﴾
৩০. তাতে নিয়োজিত আছে উনিশজন (ফেরেশতা)[৫]।	عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ؕ﴿۳۰﴾

---

১. অর্থাৎ কুরায়শদের সমাবেশের দিকে দৃষ্টি দিল। এরপর মুখ ভেংচাল, যাতে দর্শকরা বোঝে, কুরআনের প্রতি ওর কঠিন ঘৃণা। তারপর সে পিঠ ফিরিয়ে নিল, যেন খুবই ঘৃণ্য বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা লাগবে! যদিও ইতিপূর্বে সে কুরআনের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু এখন বংশীয় লোকদের খুশী করার জন্য তা থেকে ফিরে গেল। পরিশেষে খুব গর্ব ও অহংকারের ভাব করে বলতে লাগল—'ব্যস্, আর কিছু নয়, এ যাদু, যা পূর্ববর্তীদের থেকে লোকমুখে বর্ণিত হয়ে এসেছে। আর এটা মানুষের কথা, যা যাদুর মত (প্রভাব সৃষ্টি করে) পিতাকে পুত্র থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে ও বন্ধুকে বন্ধু থেকে পৃথক করে দেয়।

২. অর্থাৎ শীঘ্রই ওকে আগুনে নিক্ষেপ করে অবাধ্যতা ও অহংকারের স্বাদ উপভোগ করাব।

৩. অর্থাৎ আগুন দোযখীদের শরীরের কোন অংশ অবশিষ্ট রাখবে না, যা পোড়া থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। তাছাড়া পোড়ানোর পর সেই অবস্থাতেই ছেড়ে দেবে না, বরং পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং আবার পোড়ানো হবে। এ ধারাবাহিকতা সর্বদা চলতে থাকবে।

বি. দ্র. অধিকাংশ সলফে সালেহীন থেকে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন কোন মুফাসসির অন্যভাবে তাফসীর করেছেন।

৪. অর্থাৎ শরীরের চামড়া পুড়িয়ে বিকৃত করে দেবে। হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জ্বলন্ত লোহা যেমন লাল দেখা যায়, মানুষের দেহের উপর তা লাল দেখা যাবে।'

৫. অর্থাৎ দোযখের ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতাদের যে বাহিনী থাকবে, তার অফিসার হবে ১৯, যাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্বশীল ফেরেশতার নাম 'মালেক।'

৩১. আমি দোযখের প্রহরী ফেরেশতাদেরই বানিয়েছি[১]। এবং তাঁদের এ সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কেবল কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্য[২]— যাতে কিতাবীরা দৃঢ় বিশ্বাস করে,	وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا

বি. দ্র. হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) (তাঁর তাফসীরে) বিস্তারিতভাবে এই উনিশ সংখ্যার হেকমত (তাৎপর্য) বয়ান করেছেন, যা সত্যিই পড়ার মত। সারকথা এই যে, জাহান্নামে পাপীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য উনিশ প্রকারের দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের দায়িত্ব এক এক ফেরেশতার নিকট সোপর্দ করা হবে।

অবশ্যই ফেরেশতার শক্তি অনেক বেশি এবং একেকজন ফেরেশতা সেই কাজ করতে পারে, যা লাখো মানুষ মিলেও করতে পারে না। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, প্রত্যেক ফেরেশতার এই শক্তি সেই চৌহদ্দিতে সীমিত, যেখানে কাজ করার জন্য তিনি নির্দেশিত। যেমন, 'মালাকুল মওত' ফেরেশতা এক মুহূর্তে লাখো মানুষের জান বের করতে পারেন; কিন্তু নারীর গর্ভস্থ শিশুর ভিতরে প্রান সঞ্চার করতে পারেন না। হযরত জিবরাঈল (আ) চোখের পলকে ওহী আনয়ন করতে পারেন, কিন্তু পানি বর্ষণ করা তাঁর কাজ নয়। দেখুন, কান দেখতে পারে না, চোখ শুনতে পারে না, যদিও নিজ নিজ গণ্ডির কাজ যত কঠিনই হোক তা করতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন কান হাজার হাজার শব্দ শুনে নেয়, তাতে একটুও ক্লান্ত হয় না। চোখ হাজার হাজার রং দেখে নেয়, তাতে অক্ষম হয় না। তদ্রূপ, যদি এক ফেরেশতা দোযখীদের আযাব দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হন, তবে তিনি দোযখীদের এক ধরনেরই আযাব দিতে পারবেন। অন্য ধরনের আযাব, যা তাঁর সামর্থ্য-সীমাবহির্ভূত, তিনি দিতে পারেন না। এ কারণে উনিশ প্রকার আযাবের জন্য (যার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে আযীযের মধ্যে রয়েছে) উনিশজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিয়োজিত হয়েছেন।

আলেমগণ ১৯ সংখ্যার হেকমত সম্পর্কে অনেক কিছুই বলেছেন। কিন্তু অধমের নিকট হযরত শাহ (আ. আযীয) সাহেব (র)-এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর। আল্লাহ তাআলাই উত্তম জানেন।

১. উনিশের সংখ্যা শুনে কাফেররা ঠাট্টা করে বলতে লাগল, আমরা সংখ্যায় হাজার হাজার। উনিশজন আমাদের কী করতে পারবে? প্রয়োজনে আমাদের মধ্য থেকে দশ দশ জন তাঁদের এক এক জনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাব। ওদের এক পালোয়ান বলে উঠল, সতের জনের বিরুদ্ধে আমি একলাই যথেষ্ট, আর দুজনকে তোমরা সকলে মিলে কাবু করে ফেলো। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪৭৩)

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ—তাঁরা উনিশ বটে; কিন্তু মানুষ নয়, ফেরেশতা। তাঁদের শক্তির অবস্থা এই যে, একজন ফেরেশতা লূত জাতির গোটা বসতিকে এক হাতে উপরে উঠিয়ে নিচে ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

২. অর্থাৎ কাফেরদেরকে আযাব দেওয়ার জন্য যে উনিশের সংখ্যা নির্ধারণ করা হল, এটা বিশেষ হেকমতের কারণে করা হয়েছে, যার প্রতি عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এর তাফসীরে ইঙ্গিত

ঈমানদারদের ঈমান আরো বাড়ে এবং কিতাবীরা ও মুমিনরা সন্দেহে পতিত না হয়[১]; আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা ও কাফেররা যাতে বলে[২], 'এ অভিনব সংখ্যা দ্বারা আল্লাহর কী উদ্দেশ্য[৩]?' এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান[৪]। আর আপনার রবের বাহিনীগুলিকে একমাত্র তিনিই জানেন[৫]। আর তা (অর্থাৎ দোযখের আলোচনা) তো কেবল উপদেশ মানুষের জন্য[৬]।

الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

করা হয়েছে। আর এই সংখ্যা বয়ান করার মধ্যে কাফেরদের জন্য এই পরীক্ষা রয়েছে যে—কে তা শুনে ভয় করে এবং কে হাসি-বিদ্রূপ করে।

১. সম্ভবত আহলে কিতাব (কিতাবধারীরা) পূর্ব থেকে এ সংখ্যা জানত, যেমন তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনা দ্বারা (৩৩২৭) বোঝা যায়। আর আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে কমপক্ষে এতটুকু তো জানত যে, ফেরেশতাদের মধ্যে কী পরিমাণ শক্তি রয়েছে। সুতরাং উনিশও কম নয়। তাছাড়া তারাও বুঝবে যে, আযাব বিভিন্ন ধরনের। তাই বহুবিধ আযাবের কারণে দোযখের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ফেরেশতা থাকা চাই। এ কাজ একা একজনের নয়।

যা হোক, উক্ত সংখ্যার আলোচনা শুনে আহলে কিতাবের অন্তরে কুরআনের সত্যতার ব্যাপারে ইয়াকীন পয়দা হবে, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কুরআনের বক্তব্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহ ও দ্বিধা থাকবে না, আর মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও পরিহাসের ফলে তারা কোন সংশয়ের শিকার হবে না।

২. اَلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ দ্বারা মুনাফিকরা বা দুর্বল ঈমানদাররা উদ্দেশ্য। আর الكافرون দ্বারা প্রকাশ্য অস্বীকারকারীরা উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ উনিশের সংখ্যা দ্বারা কী উদ্দেশ্য ছিল? এ তো অহেতুক ও অসংগত কথা। এমন কথা কে মানতে পারে? نعوذ بالله!

৪. অর্থাৎ একই বিষয় দ্বারা খারাপ যোগ্যতার মানুষ গোমরাহ হয়ে যায়, আর সুস্থ বুদ্ধির মানুষ পথ পেয়ে যায়। যে ব্যক্তির মানা উদ্দেশ্য না, সে কাজের কথাকেও হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয়। আর যার দিলে আল্লাহর ভয় ও তাওফীকের নূর থাকে, তার ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি হয়।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর অসংখ্য বাহিনীর পরিমাণ যে কত, তা তিনিই জানেন। উনিশ তো কেবল জাহান্নামে কর্মরত অফিসারদের সংখ্যা, (এর বাইরে আরও কত কত বাহিনী আছে!)।

৬. অর্থাৎ দোযখের আলোচনা করা হয় শুধু শিক্ষা ও নসীহত হাসিল করার উদ্দেশ্যে। যেন তার (ভয়াবহ) অবস্থা শুনে মানুষ আল্লাহর ক্রোধকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসে।

[রুকূ - ২]

৩২. সত্য বলছি! কসম চাঁদের,	كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝
৩৩. এবং রাতের, যখন তা প্রস্থান করে।	وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝
৩৪. এবং ভোরের, যখন তা পরিস্ফুটিত হয়—	وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝
৩৫. নিশ্চয় দোযখ গুরুতর বিষয়গুলোর একটি[১],	اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝
৩৬. মানুষকে সতর্ককারী—	نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝
৩৭. (অর্থাৎ) তাকে, তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চায় বা পিছিয়ে থাকতে চায়[২]।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ-	كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝
৩৯. ডানের লোকেরা ছাড়া।	اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝
৪০. (যারা থাকবে) জান্নাতসমূহে। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে-	فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ যেসব বড় বড় ভয়ঙ্কর ও গুরুতর জিনিস প্রকাশ পাবে, দোযখ সেগুলোর অন্যতম।

২. يتقدم (অগ্রসর হতে চায়)— অর্থাৎ নেককর্ম বা বেহেশতের দিকে। আর- يتأخر (পিছিয়ে থাকতে চায়)— অর্থাৎ: অসৎকর্মে ডুবে থেকে নেককর্ম থেকে পিছিয়ে থাকে, অথবা দোযখে পড়ে থেকে বেহেশত থেকে পিছিয়ে থাকে। যা হোক, উদ্দেশ্য এই যে, দোযখ সকল মানুষের জন্য বড়ই ভয়ের জিনিস (ও সতর্ককারী)।

আর যেহেতু এ ভয় প্রদর্শনের পরিণাম ও ফলাফল কিয়ামতে প্রকাশ পাবে, তাই এখানে এমন সব জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে, যা কিয়ামতের সঙ্গে খুব সামঞ্জস্যশীল। যেমন, চাঁদ প্রথমে বৃদ্ধি ও পরে হ্রাস পায়; এটা হচ্ছে এই দুনিয়ার প্রথমে বৃদ্ধি ও উন্নতি এবং পরে বিলুপ্তি ও ধ্বংসের নমুনা। অনুরূপ সত্য বিষয়াদির প্রকাশ ও অপ্রকাশের ক্ষেত্রে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার এমনি সম্পর্ক, যেমন দিনের সঙ্গে রাতের সম্পর্ক (অর্থাৎ আখেরাতে তা প্রকাশ পাবে, যা দুনিয়ায় প্রকাশ পায় না)। অতএব এ জগতের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া যেন রাতের বিদায় হয়ে যাওয়া এবং আখেরাতের প্রকাশ যেন ভোরের অভ্যুদয়।

৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে[1] ।
عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৪২. 'কোন্ জিনিস তোমাদের জাহান্নামে দাখিল করেছে[2]?'
مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝

৪৩. ওরা বলবে, 'আমরা নামায পড়তাম না ।
قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝

৪৪. 'এবং অভাবীদের খানা খাওয়াতাম না ।
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝

৪৫. 'অহেতুক বিতর্ককারীদের সাথে যোগ দিয়ে আমরাও বিতর্কে লিপ্ত হতাম,
وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۝

৪৬. 'এবং আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম,
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৪৭. 'অবশেষে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে অকাট্য বিষয়[3] ।'
حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۝

৪৮. অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ ওদের কোন উপকারে আসবে না[4] ।
فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۝

---

১. (اصحاب اليمين) অর্থাৎ (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى)— এর অঙ্গীকারের দিন যারা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশের ডান দিক থেকে বের হয়েছিল এবং দুনিয়াতেও সোজা পথে চলেছিল এবং হাশরের মাঠেও আরশের ডানদিকে অবস্থান করবে, যেদিকে বেহেশত থাকবে এবং সেদিকেই রওনা করবে এবং তাদের আমলনামাও ডান হাতে আসবে— এমন লোকেরা কিছুতেই বন্দী থাকবে না; বরং জান্নাতের বাগানসমূহে স্বাধীন থাকবে এবং নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে একে অপরকে অথবা ফেরেশতাদেরকে পাপীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, ওরা কোথায় গেল? ওদের যে দেখা যাচ্ছে না?

২. অর্থাৎ তারা জানতে পারবে যে, পাপীদের দোযখে দাখিল করা হয়েছে। তখন পাপীদের দিকে দৃষ্টি দেবে এবং তাদের প্রশ্ন করবে যে, আকল-বুদ্ধি সত্ত্বেও তোমরা দোযখের আগুনে কেমন করে এসে পড়লে?

৩. অর্থাৎ আল্লাহর হকসমূহ কী, তাও জানিনি। বান্দাদের হক সম্পর্কেও অবগতি লাভ করিনি। বরং অন্য লোকদের মত হকের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করেছিলাম এবং অসৎ সংসর্গে থেকে দ্বিধা-সন্দেহের আবর্তে পড়েছিলাম। সর্বোপরি আমাদের বিশ্বাস হয়নি যে, বিচারের দিনও আসবে। সর্বদা এ বিষয়কে অস্বীকার করেছি। অবশেষে মাথার উপর মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে গেছে এবং চোখ দিয়ে দেখে সেসব বিষয়ে বিশ্বাস হয়েছে, যেগুলিকে মিথ্যা বলতাম।

৪. কাফেরদের জন্য কেউ সুপারিশ করবেই না। আর করলেও তা কবুল হবে না।

৪৯. ওদের কী হয়েছে যে, ওরা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে[১]? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

৫০. যেন ওরা ভয়ে পলায়নকারী গাধা— كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ

৫১. যেগুলো সিংহের ভয়ে পালিয়েছে[২]। فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ

৫২. বরং ওদের প্রত্যেক ব্যক্তি চায়, ওকে উন্মুক্ত কিতাব দেওয়া হোক[৩]! بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً

৫৩. কখনো না।[৪] বস্তুত ওরা আখেরাতকে ভয় করে না[৫]। كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ

---

১. উক্ত বিপদসমূহ সামনেই রয়েছে। কিন্তু নসীহত শুনে ওরা একটুও মানে না; বরং শুনতেও চায় না।

২. অর্থাৎ সত্যের কোলাহল এবং আল্লাহর ব্যাঘ্রদের আওয়াজ শুনে ওরা জংলী গাধার মত পালাতে থাকে।

৩. অর্থাৎ পয়গম্বরের কথা মানতে চায় না; বরং ওদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা এই যে, স্বয়ং তার উপর আল্লাহর উন্মুক্ত সহীফা (লিখিত কিতাব) অবতীর্ণ হোক এবং তাকে পয়গম্বর বানানো হোক– حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ('আমরা কখনো ঈমান আনব না] যতক্ষণ না আমাদের সে রকম বস্তু দেওয়া হবে, যা আল্লাহর রাসূলদের দেওয়া হয়েছে।' –আন'আম, আয়াত ১২৪)

অথবা আয়াতের অর্থ এই যে, ওরা চায় —ওদের মধ্যে প্রত্যেকের নিকট সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত চিঠি আসুক, যার মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ থাকবে। যেমন অন্যত্র আছে — حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ (বনী ইসরাঈল, আয়াত ৯৩)

৪. অর্থাৎ এমন কখনো হতে পারে না। কেননা, না আছে ওদের এই যোগ্যতা, আর না আছে এর প্রয়োজন।

৫. অর্থাৎ উক্ত অযথা দরখাস্তের উদ্দেশ্যও এটা নয় যে, তা পূরণ করা হলে সত্যিই ওরা মেনে নেবে। বরং আসল কারণ এই যে, ওরা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে না। এজন্য (ওদের মধ্যে) সত্যের তলব নেই। এ দরখাস্তগুলো শুধু হঠকারিতাস্বরূপ। ধরা হোক, যদি এসব দরখাস্ত পূরণ করে দেওয়া হয়, তবে ওরা মানবে কি? কখনও না! যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (আমি যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করি, তারপর ওরা

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾	৫৪. কখনো না। তা (কুরআন) তো উপদেশ[১]।
فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿٥٥﴾	৫৫. অতএব যার ইচ্ছা, সে তা স্মরণ করুক[২]।
وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾	৫৬. আর ওরা তখনই স্মরণ করবে, যখন আল্লাহ চাইবেন[৩]। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমা করার অধিকারী[৪]।

নিজেদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করে, তবুও কাফেররা অবশ্যই বলবে, 'এ স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়'। –আন'আম, আয়াত ৭)

১. অর্থাৎ প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কিতাব দেওয়া— এটা হতে পারে না। এই এক কিতাব (কুরআন কারীম)-ই নসীহতের জন্য যথেষ্ট।

২. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ এ কিতাব একজনের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তো কী হল? এ তো সকলেরই কাজে আসে।'

৩. আর আল্লাহর চাওয়া না চাওয়া— সবই হেকমতসমূহের উপর নির্ভরশীল, যা কোন মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না। তিনিই প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা যথাযথরূপে জানেন এবং সেই মোতাবেক আচরণ করেন।

৪. অর্থাৎ মানুষ যতই গোনাহ করুক, তার পর যদি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তবে তিনি তার সব গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার তওবা কবুল করবেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াতের পর সতর্কতামূলক একটি টীকা সংযোজন করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন–

قال رَبّكم عزّ وجلّ : أنا أهلٌ أن اتقى فلا يشرك بِي شيءٌ، فإذا اتقانِي العبد فأنا أهل أن أغفر له.

('অর্থাৎ আমি এরই উপযুক্ত যে, বান্দা আমাকে ভয় করবে এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। তো যদি বান্দা আমাকে ভয় করে (এবং শিরক থেকে পবিত্র থাকে), তবে আমার শান এই যে, আমি তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেই (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২৪৪২; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৬১৭; আদ্ দুররুল মানসূর : ৮/৩৪০)।

(তো তিনি ان اتقى-এর সাথে لا يشرك بِي شيء সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ, ভয়ের সাথে সাথে শিরক থেকে পবিত্র থাকা জরুরী। তবেই ক্ষমা পাওয়া যাবে)

আল্লাহ তাআলা তাঁর ফযল ও রহমতে আমাদের সর্বদা তাওহীদ ও ঈমানের উপর অবিচল রাখুন এবং নিজ মেহেরবানীতে আমাদের গোনাহ মাফ করুন। আমীন।

تَمّ سورة الْمُدّثر ولله الحمد والمنة

সূরা কিয়ামাহ

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭৫ । ৪০ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٤٠، رُكُوعَاتُهَا ٢

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি শপথ করছি কিয়ামত-দিবসের[১]

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ①

১. অর্থাৎ যে কিয়ামত-দিবসের সম্ভাব্যতা আকল-বুদ্ধি দ্বারা প্রমাণিত এবং যা অবশ্যই ঘটবে বলে এমন সত্যবাদী সংবাদদাতার সংবাদে প্রমাণিত, যাঁর সততার স্বপক্ষে অকাট্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে— সেই কিয়ামতের দিনের শপথ করে বলছি, তোমরা মৃত্যুর পর উত্থিত হবে এবং অবশ্যই ভাল-মন্দের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

শপথ করার রীতি-নীতি

মানুষ বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে, যথা: নিজ মাবূদের, কোন মহান ও মর্যাদাবান সত্তার, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের, কোন প্রিয় বা দুর্লভ জিনিসের। আর শপথের উদ্দেশ্য হয় ওই বস্তুর সৌন্দর্য বা অভিনবত্য প্রকাশ করা, যেমন বলে, অমুকের ভাগ্যের শপথ কর। আর সাহিত্য বিশারদবর্গ এ কথাও বিবেচনায় রাখে যে, مقسم به (যার শপথ করা হয়), তা যেন مقسم عليه (অর্থাৎ যে বিষয়ে শপথ করা হয়) তার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়। তবে এটা জরুরী নয় যে, সর্বত্র مقسم به কে مقسم عليه এর সাক্ষী মানতে হবে। (প্রখ্যাত কবি) যাওক বলেছেন–

اتنا ہوں تری تیغ کا شرمندۂ احسان ÷ سر میرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

('প্রিয়তম: আমি তোমার তরবারির এতটা অনুগ্রহধন্য যে, তোমার মাথার শপথ! আমার মাথা উঠতে সক্ষম নয়।')

এস্থলে নিজের মাথাটি না ওঠাতে পারার বিষয়ে প্রিয়তমের মাথার শপথ করা খুবই সংগত হয়েছে।

আল্লাহ যে শপথ করেন, তার প্রকৃতি

পবিত্র শরী'য়ত বান্দার জন্য গায়রুল্লাহর শপথ করাকে হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার শান বান্দাদের থেকে ভিন্ন। তিনি গায়রুল্লাহর শপথ করেন এবং সাধারণত ঐসব জিনিসের, যেগুলি তাঁর নিকট প্রিয় বা উপকারী বা মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। অথবা এমন বস্তুর শপথ করেন, যা শপথ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সাক্ষী ও প্রমাণস্বরূপ। যেমন এস্থলে কিয়ামত দিবসের শপথ করা হয়েছে তা মহা গুরুতর বিষয় হওয়ার কারণে। আর যে বিষয়ের জন্য

২. এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী নফ্সের[১]।

وَلَآ اُقۡسِمُ بِالنَّفۡسِ اللَّوَّامَةِ ۟

শপথ করা হয়েছে, তার সঙ্গে কসমের সামঞ্জস্য অত্যন্ত পরিষ্কার। কারণ, পুনরুত্থান ও বিনিময়-প্রদানের স্থানই হল কিয়ামত দিবস।

১. **নফসের প্রকারভেদ এবং প্রত্যেক প্রকারের স্বরূপ**

মনীষীগণ লিখেছেন, মানুষের নফস একটিই, কিন্তু তিন অবস্থাভেদে তার তিন নাম। যদি নফস উর্ধ্বজগতের দিকে ধাবিত হয়, আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে তার আনন্দ হয় এবং শরী'য়তের অনুসরণের মধ্যে শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করে— তবে এমন নফসকে مطمئنة (মুতমায়িন্নাহ) বলে। যেমন: কুরআনে বলা হয়েছে- يا أَيَّتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (হে প্রশান্ত চিত্ত! ফিরে আস আপন রবের দিকে- এ অবস্থায় যে, তুমি [তাঁর প্রতি] সন্তুষ্ট, [তিনিও] তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। –আল-ফাজর, আয়াত ২৭-২৮)

আর যে নফস নিম্নজগতের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনায় ফেঁসে গিয়ে অসৎকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং শরী'য়তের আনুগত্য থেকে বিমুখ থাকে— তাকে নফসে 'আম্মারাহ' বলে। কেননা, এরূপ নফস মানুষকে মন্দকর্মের আদেশ দেয়। যেমন: কুরআনে আছে- وما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. ('আমি নিজ নফসকে পবিত্র বলে দাবি করি না। নিশ্চয় নফস মন্দকার্যের প্ররোচনা দেয়, কিন্তু যার প্রতি আমার রব দয়া করেছেন তার কথা ভিন্ন।' –ইউসুফ, আয়াত ৫৩)

আর যে নফস কখনো নিম্নজগতের দিকে ঝোঁকে এবং মন্দ কামনা-বাসনা ও আক্রোশ অনুসারে পরিচালিত হয়, আবার কখনো উর্ধ্ব জগতের দিকে ধাবিত হয়ে এসব বিষয়কে মন্দ জানে ও এসব থেকে দূরে থাকে এবং কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে লজ্জিত হয়ে নিজেকে ভর্ৎসনা করে— তাকে নফসে 'লাওওয়ামা' বলে।

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'মানুষের মন প্রথমে খেলা-ধুলায় ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়। নেকীর দিকে কখনো আকর্ষণ বোধ করে না। এমন মনকে أمارة بالسوء (মন্দের নির্দেশদানকারী) বলে। এর পর সতর্ক হয়ে ভালমন্দ বুঝতে পারে এবং ফিরে আসে। আগে গাফলতে পড়ে নিজের প্রবৃত্তির পিছনে পড়েছিল। এখন একটু বুঝ এসেছে। তাই নিজ কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ ও ভর্ৎসনা করতে শুরু করেছে, এমন নফসকে 'লাওওয়ামা' বলে। এর পর যখন সম্পূর্ণরূপে সংশোধন হয়ে যায়, দিল থেকে নেকীর দিকেই আকর্ষণ বোধ করে, অযথা কাজকাম থেকে নিজে নিজেই দূরে থাকতে শুরু করে এবং অসৎকর্ম করতে বরং তার চিন্তা করতেও কষ্ট বোধ করে, তখন এ নফস হয়ে যায় 'মুতমাইন্নাহ'।'

এখানে নফসে 'লাওওয়ামা'র শপথ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি স্বভাব সুস্থ-পরিচ্ছন্ন হয়, তবে স্বয়ং মানুষের নফস দুনিয়াতেই মন্দ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাকে ভর্ৎসনা করে। আর এই জিনিসই পরিপূর্ণরূপে কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো একত্র করতে পারব না[১]? أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۝

৪. অবশ্যই! আমি তো তার আঙুলের অগ্রভাগসমূহও (পুনরায়) দুরুস্ত করতে সক্ষম[২]। بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ۝

৫. বরং মানুষ চায় তার সামনের জীবনেও অপকর্মে লিপ্ত থাকতে। بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝

৬. সে জিজ্ঞাসা করে, 'কবে হবে কিয়ামত দিবস[৩]?' يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝

৭. যখন চোখ ঝলসে যাবে[☆ ৪], فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

---

১. অর্থাৎ মানুষের ধারণা হল, যখন হাড়গুলো পর্যন্ত চূর্ণ হয়ে যায় এবং এসবের গুঁড়া মাটি ইত্যাদির সাথে মিশে যায়— তখন কী করে হাড়গুলো একত্র করে জোড়া দেওয়া হবে? এ তো একেবারে অসম্ভব মনে হয়।

২. অর্থাৎ আমি তো আঙুলের ডগাও দুরুস্ত করতে পারি। বিশেষভাবে আঙুলের ডগার কথা সম্ভবত এ জন্য বলা হয়েছে যে, এগুলি শরীরের শেষ সীমা। আর প্রত্যেক বস্তুর নির্মান তার প্রান্তদেশে গিয়ে পূর্ণ হয়। সাধারণ কথাবার্তায়ও বলা হয়, 'আমার আংগুলের মাথায় মাথায় ব্যথা।' এর দ্বারা সমস্ত শরীর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, আঙুলের ডগা ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাতে সৃষ্টি-নৈপুণ্য অনেক বেশি এবং তা একত্র করা অধিকতর কঠিন ও সূক্ষ্ম কাজ। সুতরাং যিনি আঙুলের ডগাসমূহ আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি এর চেয়ে সহজ কাজসমূহ করতে আরো বেশি সক্ষম হবেন।

৩. অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করে, তাদের অস্বীকৃতির কারণ এটা নয় যে, এ বিষয়টি খুব কঠিন এবং আল্লাহ তাআলার যে এ বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা আছে তার দলীল-প্রমাণ অস্পষ্ট। বরং মানুষ চায়, কিয়ামত আসার পূর্বে নিজের অবশিষ্ট জীবনটায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পাপাচার ও দুষ্কৃতিতে রত থাকবে। এখন যদি কিয়ামতকে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং আমলাদির হিসাব-নিকাশের ভয় দিলের মধ্যে বসে যায়, তবে তো নির্ভয়ে ও নির্লজ্জভাবে পাপাচার ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত থাকতে পারবে না। এজন্য এমন ধারণা দিলে আসতেই দেয় না, যার কারণে আরাম-আয়েশ ব্যাহত হবে এবং ভোগ-বিলাস বাধাগ্রস্ত হবে। বরং বিদ্রূপ, উপহাস ও ঔদ্ধত্যের সাথে প্রশ্ন করে, জী, সাহেব! আপনার সেই কিয়ামত কবে আসবে? আর সত্যি যদি আসে, তবে সন ও মাসের উল্লেখসহ তার তারিখ বলুন তো!

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'বিস্ফারিত হয়ে যাবে'।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ক্রোধজনিত তাজাল্লীর কারণে চোখগুলো ঝলসে যেতে থাকবে এবং অতিশয় বিস্ময়ের ফলে দৃষ্টিগুলো বিস্ফারিত হয়ে যাবে, আর সূর্যও মাথার নিকট এসে যাবে।

৮. চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে[১],	وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝٨
৯. এবং সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত হবে[২]—	وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝٩
১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'পালানোর জায়গা কোথায়?'	يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۝١٠
১১. না না; কোন আশ্রয়স্থল নেই।	كَلَّا لَا وَزَرَ ۝١١
১২. সেদিন আপনার রবের নিকট গিয়েই অবস্থান নিতে হবে[৩]।	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ﹰالْمُسْتَقَرُّ ۝١٢
১৩. সেদিন মানুষকে সে যা অগ্রিম পাঠিয়েছে এবং যা পশ্চাতে রেখে গেছে, তা সম্পর্কে অবহিত করা হবে[৪]।	يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۝١٣
১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজের জন্য সাক্ষী-প্রমাণ*,	بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝١٤
১৫. যদিও সে নিজের পক্ষে নানা অজুহাত পেশ করুক না কেন[৫]।	وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝١٥

১. خَسِفَ الْقَمَرُ অর্থাৎ চাঁদ আলোহীন হয়ে যাবে। পৃথকভাবে চাঁদের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, আরবগণ চাঁদের হিসাব রাখার কারণে এর অবস্থা দেখার প্রতি বেশি যত্নবান থাকত।

২. অর্থাৎ আলোহীন হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই একরকম হবে।

৩. অর্থাৎ এখন তো বলে, সেই দিন কবে আসবে? আর সেদিন হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে বলবে, আজ কোথায় পালাব এবং কোথায় আশ্রয় নেব? তখন ইরশাদ হবে, 'আজ পালানোরও সুযোগ নেই, প্রশ্ন করারও উপায় নেই। আজ কোন শক্তিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না, আশ্রয়ও দিতে পারে না। আজকের দিনে সকলকে নিজেদের পালনকর্তার আদালতে হাযির হতে হবে এবং তাঁর সামনে অবনত হতে হবে। এরপর তিনি যার জন্য যা ইচ্ছা ফয়সালা করবেন।

৪. অর্থাৎ আগে-পরের সকল আমল, চাই ভাল হোক বা মন্দ, তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'নিজেই নিজের ব্যাপারে উত্তমরূপে অবহিত'।

৫. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ নিজের হাল-অবস্থার মধ্যে চিন্তা করলে প্রভুর একত্বের কথা বুঝতে পারবে এবং এও বুঝতে পারবে যে, সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। আর এ কথা বলা যে, আমার বুঝে আসে না, এটা শুধুই বাহানা।'

১৬. (হে রাসূল), আপনি কুরআনের (পাঠের) সাথে স্বীয় যবান নাড়াবেন না, যাতে তা তাড়াতাড়ি শিখে নিতে পারেন।	لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝
১৭. (আপনার বুকে) তা সংরক্ষণ করা এবং (আপনার মুখে) তা পাঠ করানো আমারই দায়িত্ব।	اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝
১৮. অতএব যখন আমি তা পাঠ করি (ফেরেশতার মুখে), তখন আপনি তার পাঠের অনুসরণ করুন।	فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝
১৯. অতঃপর তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করাও আমারই দায়িত্ব[১]।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক يُنَبَّؤُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ الخ এর সাথে। অর্থাৎ জানানোরও দরকার হবে না, মানুষ নিজে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত থাকবে, যদিও স্বীয় স্বভাবের কারণে সেখানেও হীলা-বাহানা পেশ করবে, যেমন কাফেররা বলবে– وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'আমাদের প্রভু আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না।'

বস্তুত যার অন্তর সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে যায়নি, সে দুনিয়াতেও নিজ হালত খুব ভাল করে বোঝে, যদিও অন্যদের সামনে হীলা-বাহানা বানিয়ে ভিন্ন কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

১. শুরুতে এমন হতো যে, যখন হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর তরফ থেকে কুরআন নিয়ে আসতেন ও তা পড়ে শোনাতেন, তখন তাঁর পড়ার সঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মনে মনে পড়তে থাকতেন, যাতে তাড়াতাড়ি তা মুখস্থ ও সংরক্ষণ করে ফেলতে পারেন এবং এমন না হয় যে, জিবরাঈল চলে গেলেন অথচ ওহী পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা গেল না।

কিন্তু এতে হুযূরের খুব কষ্ট হত। প্রথম শব্দ পড়ে না নেওয়ার আগে পরবর্তী শব্দ ভালভাবে শুনতে ও বুঝতে অসুবিধা হত। তাতে হুযূর (স) পেরেশান হতেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে, তখন (জিবরাঈল আ. এর পড়ার সময়) আপনার পড়ার ও যবান নাড়ানোর দরকার নেই, বরং একাগ্রচিত্তে শুধু শোনা উচিত। এ ফিকির করবেন না যে, মনে থাকবে না, পরে কেমন করে পড়ব এবং মানুষকে কীভাবে শোনাব? আপনার পবিত্র দিলে কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে বসিয়ে দেওয়া এবং আপনার যবানে তা পড়ানো— আমার দায়িত্ব। অতএব জিবরাঈল (আ) যখন আমার পক্ষ থেকে পড়েন, তখন আপনি চুপ করে শুনতে থাকবেন। ভবিষ্যতে তা সংরক্ষণ করা এবং তার উলূম ও মাআরেফ (জ্ঞানরাজি) আপনার দ্বারা প্রকাশ করানো এবং আপনার মাধ্যমে অন্যদের পর্যন্ত পৌছানো– এই সবকিছুর যিম্মাদার আমি।

২০. না, তোমরা বরং দুনিয়াকে ভালবাস;

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۝

২১. আর আখেরাতকে বর্জন করে চল[১]।

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

২২. সেদিন অনেক মুখ হবে সজীব।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝

২৩. তাকিয়ে থাকবে আপন রবের দিকে[২]।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۝

এর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে সঙ্গে পড়া বাদ দিলেন। এও একটি মুজেযা ছিল। কারণ, তিনি পূর্ণ ওহী শুনতে থাকতেন, তখন যবানের দ্বারা এক শব্দও উচ্চারণ করতেন না। কিন্তু ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর সম্পূর্ণ ওহী অক্ষরে অক্ষরে, পূর্ণ ধারাবাহিকতার সঙ্গে, একটি যের-যবর পরিবর্তন ব্যতিরেকে, তরতর করে মানুষদের শুনিয়ে দিতেন এবং বুঝিয়ে দিতেন।

এটা এই দুনিয়াতে يُنَبَّؤُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ— এর একটি ছোট নিদর্শন। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেমন ফেরেশতা চলে যাওয়ার পর নিজের ওহী পরিপূর্ণ ধারাবাহিকতার সঙ্গে, অক্ষরে অক্ষরে, সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তি ছাড়া, নিজ পয়গম্বরের সীনায় সংরক্ষিত করে দিতে সক্ষম— তেমনি তিনি বান্দাদের পূর্বাপর আমলাদি, যার কতক আমলকারী নিজেও ভুলে গিয়ে থাকবে, সংরক্ষিত করে একই সময়ে সকলের সম্মুখে পেশ করে দিতে সক্ষম। তদ্রূপ, হাড়সমূহের বিচ্ছিন্ন কণাগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্র করে মানুষকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে অস্তিত্ব দান করতেও তিনি সক্ষম। নিশ্চয় তিনি এসব করতে বরং এর চেয়েও বেশি করতে সক্ষম।

১. অর্থাৎ তোমরা যে কিয়ামত ইত্যাদিকে অস্বীকার কর, তা কোন সহীহ দলীলের উপর ভিত্তি করে নয়; বরং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকাই এর কারণ। দুনিয়া যেহেতু নগদ ও তাড়াতাড়ি পাওয়ার জিনিস, তাই তোমরা এটাই চাও এবং আখেরাতকে দূরবর্তী মনে করে ছেড়ে দাও। কারণ, তা পেতে এখনো দেরি। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে তাড়াহুড়া করা— خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (আম্বিয়া, আয়াত ৩৭) পার্থক্য এতটুকু যে, নেক লোকেরা উত্তম বস্তুসমূহ হাসিল করতে তাড়াহুড়া করে, যার একটি দৃষ্টান্ত একটু পূর্বে لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (আয়াত নং ১৬)-এর মধ্যে গত হয়েছে। আর অসৎ লোক ওই জিনিস পছন্দ করে, যা শীঘ্র পাওয়া যায়, চাই তার পরিণাম ধ্বংসই হোক না কেন।

২. এ হচ্ছে আখেরাতের বিবরণ। অর্থাৎ, মুমিনদের চেহারা সেদিন সতেজ ও হাসিখুশী হবে এবং তাদের চোখগুলো প্রকৃত মাহবুব আল্লাহর মুবারক দীদারের কারণে সমুজ্জ্বল হবে। কুরআন কারীম ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের আলোকে প্রমাণিত যে, আখেরাতে আল্লাহ তাআলা দীদার দান করবেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮১-১৮২) গোমরাহ লোকেরা তা অস্বীকার করে। কেননা, এ দৌলত ওদের ভাগ্যে নেই। اللّٰهُمَّ لا تحرمنا من هذه النعمة التي ليس فوقها نعمة

২৪. আর অনেক মুখ সেদিন উদাস থাকবে[১]। وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ۙ

২৫. ওদের বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, ওদের সাথে কোমর ভেঙ্গে দেয়– এমন আচরণ করা হবে[২]। تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۙ

২৬. কখনো না! যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে[৩] كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ

২৭. এবং বলা হবে, 'কে আছে ঝাঁড়-ফুঁক করার[৪]?' وَقِيْلَ مَنْ ٜ رَاقٍ ۙ

২৮. আর সে বুঝে নেবে, এটাই বিদায়- মুহূর্ত[৫]। وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ

২৯. এবং জড়িয়ে যাবে গোছার সাথে গোছা[৬]— وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ

---

১. অর্থাৎ ওদের চেহারা পেরেশান ও অনুজ্জ্বল হবে।

২. অর্থাৎ বিশ্বাস হবে যে, এখন সেই আচরণ করা হবে এবং সেই শাস্তি ভোগ করতে হবে, যা সম্পূর্ণরূপে কোমর ভেঙ্গে দেবে।

৩. অর্থাৎ আখেরাতকে কখনো দূরে ভেবো না। আখেরাতের সফরের প্রথম মনযিল হচ্ছে মৃত্যু ,যা অতি নিকটবর্তী। এখান থেকেই অবশিষ্ট মনযিলগুলি অতিক্রম করতে করতে শেষ ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছবে। বলতে গেলে, প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু তার জন্য বড় কিয়ামতের ছোট একটা নমুনা। যখন রোগীর রূহ কুঞ্চিত হয়ে কণ্ঠনালি পর্যন্ত পৌঁছল এবং শ্বাস গলায় আটকাতে শুরু করল, তখন মনে করবে, আখেরাতের সফর শুরু হয়ে গেছে।

৪. চরম নৈরাশ্যের সময় চিকিৎসক ও ডাক্তারদের কেউ ধার ধারে না। যখন জাহেরী চিকিৎসা ও তদবীর কোন কাজে আসে না, তখন ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-তুমারের চিন্তা করা হয়। লোকে তখন বলে, মিয়া, এমন কেউ আছে কি, যে ঝাড়-ফুঁক করে তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে?

আর কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী বলেছেন, من راق হচ্ছে ওই ফেরেশতাদের উক্তি, যাঁরা মালাকুল মওত এর সঙ্গে রূহ কবজ করার সময় আসেন। তাঁরা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কে এই মৃতের রূহ নিয়ে যাবে— রহমতের ফেরেশতা, না আযাবের ফেরেশতা? এ ব্যাখ্যা অনুসারে راق শব্দটি رَقِیَ থেকে উদগত হবে, যার অর্থ উপরে আরোহণ করা। رَقًا، رُقْيَةً থেকে নয়, যার অর্থ ঝাড়-ফুঁক করা।

৫. অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী বুঝে ফেলে যে, সকল প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয় বস্তু থেকে এখন তাকে বিদায় হতে হবে। অথবা এই অর্থ যে, রূহকে দেহ থেকে পৃথক হতে হবে।

৬. কোন কোন সময় মৃত্যুযাতনার কারণে এক পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যেতে থাকে। তাছাড়া শরীরের নীচের অংশ থেকে রূহের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর গোছাগুলি নাড়ানো এবং একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা রাখা মুমূর্ষ ব্যক্তির এখতিয়ারে থাকে না। ফলে এক গোছা অপরটির উপর আপনা-আপনিই পড়ে যায়।

৩০. সেদিন তোমার রবের দিকেই হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে[১]।	اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ࣙالْمَسَاقُ ؀

[রুকূ - ২]

৩১. সে বিশ্বাস করেনি এবং নামাযও পড়েনি।	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ؀
৩২. বরং অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؀
৩৩. অতঃপর সে আপন পরিবার-পরিজনের নিকট চলে গেছে দম্ভ করতে করতে[২]।	ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ؀
৩৪. তোর জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!	اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ؀
৩৫. অতঃপর তোর জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ[৩]।	ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ؀

আর কোন কোন সালাফ বলেছেন, আরবী বাগ্‌ধারা অনুসারে ساق দ্বারা কঠিন বিপদ বোঝানো হয়। তাই আয়াতের তরজমা করা হবে- 'এক কঠিন বিপদ এসে আরেক বিপদের সাথে মিলিত হবে।' কেননা, মুমূর্ষ ব্যক্তি দুটি কষ্টের সম্মুখীন হয়। প্রথম কষ্ট তো হচ্ছে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া। ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র, পরিবার-পরিজান, প্রভাব-প্রতিপত্তি —সবই পরিত্যাগ করা এবং দুশমনদের আনন্দ-খুশী ও বন্ধু-বান্ধবের কষ্ট খেয়াল আসা। দ্বিতীয় কষ্ট এর চেয়ে গুরুতর । আর তা হল কবর ও আখেরাতের চিন্তা, যার বিভীষিকা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

১. অর্থাৎ আখেরাতের সফরের সূচনা এখান থেকে হচ্ছে। এখন বান্দা আপন প্রভুর দিকে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু আফসোস, গাফলত ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সফরের কোন প্রস্তুতি পূর্ব থেকে গ্রহণ করেনি এবং এত বড় সফরের জন্য কোন পাথেয় সঙ্গে নেয়নি।

২. অর্থাৎ স্বীকার করা ও বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে পয়গম্বরদের অস্বীকার করেছে এবং নামায পড়া ও মালিকের দিকে রুজু হওয়ার পরিবর্তে সর্বদা সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। শুধু এতটুকুই নয়, বরং নিজের অবাধ্যতা ও দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও সদর্পে ও অহংকার করে নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যেত, যেন কোন বিরাট বাহাদুরী ও বুদ্ধিমত্তার কাজ করে এসেছে।

৩. অর্থাৎ ওরে বদ-বখত! এখন তোর দুর্ভাগ্য এসে গেছে —একবার নয়, কয়েকবার। এখন তোর জন্য দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ এবং ধ্বংসের উপর ধ্বংস। আল্লাহর নতুন নতুন শাস্তির মুখোমুখি তোর থেকে বেশি আর কে হবে?

৩৬. মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনি মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে[১]?

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۝

৩৭. আচ্ছা, সে কি বীর্যের একটা ফোঁটা ছিল না, যা স্খলিত করা হয়[২]?

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝

৩৮. অতঃপর সে ছিল জমাট রক্ত। ফের তিনি বানালেন ও যথাযথ অবয়ব দিলেন।

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝

৩৯. তারপর তার থেকে সৃষ্টি করলেন যুগল– নর ও নারী।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

৪০. এই (মহান) আল্লাহ কি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন[৩]?

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

বি. দ্র. সম্ভবত প্রথম দুর্ভোগ ঈমান না আনা এবং নামায না পড়ার কারণে, দ্বিতীয় দুর্ভোগ আরো আগে বেড়ে অস্বীকার করা ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে। তৃতীয় ও চতুর্থ দুর্ভোগ এই দুই বিষয়ের প্রত্যেকটাকে গৌরবের মনে করার কারণে, যার দিকে ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। والله أعلم بالصواب

১. অর্থাৎ মানুষ কি এমন মনে করে যে, তাকে এমনিই বেকার অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে? আর আদেশ ও নিষেধের কোনো বোঝা তার উপর থাকবে না? অথবা মৃত্যুর পর তাকে আবার ওঠানো হবে না? এবং সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব নেওয়া হবে না?

২. অর্থাৎ স্ত্রীলোকের গর্ভে।

৩. অর্থাৎ বীর্য থেকে জমাট রক্তের আকৃতি ধারণ করল। অতঃপর আল্লাহ সৃষ্টির সকল পর্যায় অতিক্রম করিয়ে মানুষ বানিয়ে দিলেন এবং সমস্ত জাহেরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাতেনী শক্তি-সামর্থ্য পূর্ণরূপে দিলেন। এক নির্জীব বীর্য থেকে বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে গেল। তারপর সেই বীর্য থেকেই নর ও নারী দুই শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করলেন, যার মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর জাহেরী ও বাতেনী বৈশিষ্ট্যসমূহ ভিন্ন ভিন্ন। আচ্ছা! যিনি প্রথমবার সকলকে এমন হেকমত ও পারঙ্গমতার সাথে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? سبحانك اللّٰهُمَّ بلى পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ! কেন নয়? তুমি নিশ্চয়ই সক্ষম।

تمّ سورة القيامة ولله الحمد والمنة

সূরা দাহ্‌র

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭৬ । ৩১ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

آياتها ٣١، ركوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ①

১. মানুষের উপর কি কালের এমন কোন মুহূর্ত এসেছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না[১]?

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ②

২. আমি মানুষকে দুই রঙবিশিষ্ট শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি[২]। আমি তাকে (মাতৃগর্ভে) ওলট-পালট করতে থেকেছি*। তার পর আমি তাকে বানিয়ে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন[৩]।

---

১. নিশ্চয় মানুষের উপর দিয়ে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন তার কোন নাম-নিশানা ছিল না। এরপর বহুকাল অতিক্রম করে সে বীর্যের আকারে এসেছে। তার বর্তমান মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ করলে তার আগের অবস্থাটা মুখে আনার মতও নয়।

২. অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রীর দুই রঙের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

বি. দ্র. أمشاج এর অর্থ মিশ্রিত। বীর্য যেসব খাদ্যদ্রব্যের সার-নির্যাস, তা বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রনে সৃষ্ট। এ জন্য স্ত্রীর পানির কথা বাদ দিলেও বীর্যকে 'আমশাজ' বলা যায়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা**-'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত পানি থেকে; এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে পরীক্ষা করব'।

৩. অর্থাৎ বীর্য থেকে জমাট রক্ত, তারপর তা থেকে মাংসপিণ্ড বানিয়েছেন। এইভাবে কয়েক পর্ব অতিক্রমের পর এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন যে, এখন সে কান দিয়ে শোনে, চোখ দিয়ে দেখে এবং এ শক্তিগুলি দিয়ে এমনসব কাজ করে, যা অন্য কোন জন্তু করতে পারে না। কেমন যেন, আর সব প্রাণী তার সামনে অন্ধ ও বধির।

বি. দ্র.

অধিকাংশ মুফাসসির نبتليه এর অর্থ করেছেন পরীক্ষা ও পরখ করা। অর্থাৎ মানুষকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, তাকে বিধানের দায়িত্বভার দিয়ে এবং আদেশ-নিষেধ পালনের হুকুম করে পরীক্ষা করা হবে এবং দেখা হবে যে, সে কতদূর মালিকের বিধান পালন করে। এ জন্য তাকে দেখার, শোনার ও বোঝার শক্তি দেওয়া হয়েছে, যা শরয়ী দায়ভার আরোপ করার জন্য জরুরি।

৩. আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি- (এখন) হয় সে কৃতজ্ঞ, না হয় অকৃতজ্ঞ[১]।

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

৪. আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত আগুন[২]।

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ۝

৫. নিশ্চয় পুণ্যবান লোকেরা এমন পানপাত্র থেকে পান করবে, যাতে 'কাফূর' মিশ্রিত থাকবে[৩]—

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝

৬. তা একটি ঝরনা, যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে। তারা তার নালাসমূহ প্রবাহিত করে নেবে[৪]।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

---

১. অর্থাৎ প্রথমে সুস্থ ফিত্‌রাত (প্রকৃতি) ও সৃষ্টিগত আকল-বুদ্ধি দিয়ে, তারপর আক্‌লী ও নকলী (অর্থাৎ যুক্তিগ্রাহ্য ও ধর্মীয়) দলীল-প্রমাণ দিয়ে সরল-সত্য পথ কোনটি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর দাবি ছিল, সকল মানুষ একই পথে চলবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা ও বাহ্যিক বাধা-বিপত্তির কারণে প্রভাবিত হয়ে সকলে এক পথের উপর থাকেনি। কেউ আল্লাহকে মানল এবং তাঁর হক জানল, আর কেউ অকৃতজ্ঞ হল এবং অন্যায় কাজে রত হল। সামনে উভয়ের পরিণাম উল্লেখ করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ যারা প্রচলিত রীতিনীতি, কুসংস্কার ও ধারণা-কল্পনার বেড়াজালে বেষ্টিত হয়ে থেকেছে এবং গায়রুল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের বেড়ি নিজেদের গলা থেকে খুলতে পারেনি; বরং সত্য ও সত্যের ধারকদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও যুদ্ধের আগুন জালিয়ে রেখেছে, কখনো ভুলেও আল্লাহর নে'য়ামতাদি স্মরণ করেনি, তাঁর সত্যিকারের আনুগত্য করার খেয়ালও দিলের মধ্যে আনেনি— ওদের জন্য আল্লাহ তাআলা আখেরাতে দোযখের বেড়ি, শিকল ও প্রজ্বলিত আগুন তৈরি করে রেখেছেন।

৩. অর্থাৎ তারা শরাবের পেয়ালা পান করবেন, যার মধ্যে কাফুর মিশ্রিত থাকবে। এটা দুনিয়ার কাফুর নয়; বরং জান্নাতের এক বিশেষ ঝরনা। আল্লাহর বিশিষ্ট ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণই বিশেষভাবে এ থেকে পান করার সৌভাগ্য লাভ করবেন। সম্ভবত ঠাণ্ডা, সুঘ্রাণবিশিষ্ট, আনন্দদায়ক ও সাদা রঙের হওয়ার কারণে তাকে কাফুর বলা হয়।

৪. অর্থাৎ ঝরনাটি নেক বান্দাদের এখতিয়ারে থাকবে। ফলে যেদিকে তারা ইঙ্গিত করবেন সেদিকেই তার নালা প্রবাহিত হবে। কেউ কেউ বলেন, এর আসল উৎস হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাসাদে হবে। সেখান থেকে সকল নবী ও মুমিনের বাসস্থান পর্যন্ত এর নালাসমূহ পৌঁছানো হবে। والله اعلم

৭. তারা মানত পূর্ণ করে[১] এবং সেই দিনকে ভয় করে, যার অনিষ্ট হবে ব্যাপক-বিস্তৃত[২];

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝

৮. এবং তারা আল্লাহর মহব্বতে অভাবী, এতীম ও বন্দীকে খানা খাওয়ায়[৩];

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝

৯. (আর বলে,) 'আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদের আহার করাই। আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদানও চাই না, কৃতজ্ঞতাও না[৪]।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝

১০. নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক কঠিন, ভয়ঙ্কর দিনের আশঙ্কা করি[৫]।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

সামনে নেক লোকদের স্বভাব-চরিত্রের কথা বর্ণিত হচ্ছে।

১. অর্থাৎ তারা যে মানত করেন, তা পূরন করেন। বলা বাহুল্য, যখন তারা নিজ ধার্যকৃত বিষয় পূর্ণ করেন, তখন আল্লাহর ধার্যকৃত বিষয় কী করে ছাড়তে পারেন?

২. অর্থাৎ সেদিনের ভয়াবহতা ও অকল্যাণ পর্যায়ক্রমে সকলকে বেষ্টন করে নেবে। কোনো ব্যক্তি তা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে না।

৩. অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ ও তার প্রয়োজন আছে। তবু নিজের খাদ্য আল্লাহর মহব্বতে আগ্রহ ও এখলাসের সাথে মিসকীন, এতীম ও বন্দীদের খাইয়ে দেয়।

বি. দ্র. বন্দী চাই মুসলমান হোক বা কাফের হোক। হাদীছে আছে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন, যে মুসলিমের কাছে কোনো বন্দী আছে সে যেন তার সাথে ভাল ব্যবহার করে। (মুজামে কাবীর তবারানী, হাদীস ৩৭৭; তাফসীরে ইবনে কাসীর) সে মত সাহাবীগণ এই আদেশ পালন করতে গিয়ে বন্দীদেরকে নিজেদের খাদ্যের চেয়ে ভাল খাদ্য খাওয়াতেন, অথচ সেই বন্দীরা মুসলমান ছিল না। মুসলমান ভাইয়ের হক তো আরো বেশি।

আর যদি اسير শব্দের অর্থ আরো ব্যাপক করা হয়, তবে এই আয়াতের মধ্যে গোলাম ও ঋণী ব্যক্তিও শামিল হতে পারে। কেননা, তারাও এক ধরনের বন্দীদশায় আছে।

৪. এ কথা তারা নিজ অবস্থার ভাষায় বলে। আর কোথাও কল্যাণকর মনে হলে মুখের ভাষায়ও বলে।

৫. অর্থাৎ খাওয়াব না কেন এবং খাওয়ানোর পর কী করে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশায় থাকব, যখন আমরা আমাদের পালনকর্তাকে ও সেই দিনকে ভয় করি, যে দিন অত্যন্ত কঠিন

১১. অতএব আল্লাহ সেদিনের অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের দান করবেন সজীবতা ও উৎফুল্লতা[১]।	فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١
১২. এবং ধৈর্য ধারণের প্রতিদানস্বরূপ তাদের দান করবেন উদ্যান ও রেশমী পোশাক[২]।	وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢
১৩. তারা সেখানে সুসজ্জিত পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে[৩]। সেখানে তারা না দেখতে পাবে রোদ আর না প্রচণ্ড শীত[৪]।	مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٣
১৪. আর তাদের উপর সেই উদ্যানের ছায়াসমূহ* ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলের গুচ্ছগুলো সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে[৫]।	وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤

দুঃখ-কষ্ট ও ক্রোধে ভরপুর হবে। বরং এখলাসের সাথে খাওয়ানোর পরও আমাদের চিন্তা থাকে, আমাদের আমল কবূল হয়েছে কি না! এখলাস ইত্যাদিতে ত্রুটি হয়নি তো? তাহলে আমল উলটা আমদের দিকে নিক্ষেপ করা হবে!

১. অর্থাৎ যে বিষয়কে তারা ভয় করত, তা থেকে আল্লাহ তাদের নিরাপদে রাখবেন এবং তাদের চেহারায় সজীবতা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন।

২. অর্থাৎ যেহেতু তারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করেছে, গোনাহসমূহ থেকে বেঁচেছে এবং ইবাদতে দৃঢ় থেকেছে, এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে আরাম-আয়েশে থাকার জন্য জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ দান করবেন।

৩. রাজা-বাদশাহদের মত পালঙ্কে বসে থাকবে।

৪. অর্থাৎ জান্নাতের আবহাওয়া অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও আরামদায়ক হবে– গরম ও শীত কোনটারই কষ্ট হবে না।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**– 'বৃক্ষ-শাখাগুলো'।

৫. অর্থাৎ বৃক্ষের শাখাগুলি ফল-মূলসহ তাদের প্রতি ঝুঁকে থাকবে এবং ফলের গুচ্ছগুলো এমনভাবে ঝুলে থাকবে, যাতে তা তাদের নাগালে থাকে এবং জান্নাতীরা দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে— সব অবস্থায় অতি সহজে তা পেতে পারে।

বি. দ্র. হতে পারে, গাছপালার শাখাগুলিকে এখানে "ظلال" শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে, অথবা প্রকৃতই ছায়া হবে। কেননা, সূর্যের আলো (অর্থাৎ রোদ) না থাকলেও অন্য

১৫. এবং তাদের কাছে (খাদেমরা) আসা-যাওয়া করবে রূপার পাত্র ও এমনসব পেয়ালা নিয়ে, যেগুলি কাচের—

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾

১৬. কাচও রূপার[১]। তারা (খাদেমরা) সেগুলো যথাযথ পরিমাণে ভরে রেখেছে[২]।

قَوَارِيرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾

১৭. এবং সেখানে তাদের এমন পেয়ালাও পান করানো হবে, যাতে মিশ্রিত থাকবে 'যানজাবীল' [৩]–

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾

১৮. তা সেই উদ্যানের একটি ঝরনা, যার নাম 'সালসাবীল'[৪]।

عَيْنًا فِيهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيلًا ﴿١٨﴾

কোনো আলো তো সেখানে অবশ্যই থাকবে। বেহেশতীরা বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ করার উদ্দেশ্যে কখনো তার ছায়ায় বসতে চাইবেন। والله اعلم

১. অর্থাৎ পানপাত্র বা পেয়ালাগুলি আসলে রূপার হবে— অত্যন্ত সাদা, নিখুঁত ও আনন্দদানকারী। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতার দিক থেকে কাঁচের মত মনে হবে, সেগুলির ভিতরকার জিনিস বাইর থেকে পরিষ্কার দেখা যাবে।

২. অর্থাৎ জান্নাতীরা যে পরিমাণ পান করতে চাবে, সেগুলি ঠিক সেই পরিমাণ ভরা হবে, কমও না, বেশিও না। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, বেহেশতীগণ মনে মনে যেমন আন্দাজ করে থাকবে, সেই পরিমাণই উপস্থিত করা হবে, কম-বেশি হবে না।

৩. অর্থাৎ এক শরাবে তো 'কাফূর' মিশ্রিত ছিল। জান্নাতীদের আরেকটি শরাব পান করানো হবে, যাতে মিশ্রিত থাকবে زنجبيل (যার আভিধানিক অর্থ আদা)। কিন্তু একে দুনিয়ার আদা মনে করা যাবে না। তা বরং জান্নাতের একটি ঝরনা, যাকে 'সালসাবীল' বলা হয়। আদার বৈশিষ্ট্য হল গরম এবং তা শরীরের মধ্যে উত্তাপ সৃষ্টি করে। আরবের মানুষ তা খুব পছন্দ করে।

যাই হোক, কোন বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সেই ঝরনাকে 'যানজাবীল'-এর ঝরনা বলা হয়। আবরার বা সাধারণ পুণ্যবানদের শরাবের মধ্যে তার স্বল্প মিশ্রণ দেওয়া হবে। আদতে সেই ঝরনা উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট পুণ্যাত্মাদের জন্য।

৪. سلسبيل- এর অর্থ হচ্ছে প্রবহমান স্বচ্ছ পানি।

১৯. আর তাদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে চিরজীবী কিশোরেরা[১]। তুমি যখন তাদের দেখবে, তাদের বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা মনে করবে[২]।

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

২০. এবং তুমি যখন সেথায় দৃষ্টিপাত করবে, নেয়ামত আর নেয়ামত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে[৩]।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২১. তাদের উপরস্থ পোশাক হবে সবুজ, পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড়ের[৪] এবং তাদের পরানো হবে রূপার বালা[৫]। আর তাদের রব তাদের পান করাবেন 'শরাবে তাহূর' (তথা এমন পানীয়, যা দেহ-মনকে পবিত্র করে দেবে)[৬]।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

---

১. مخلدون- অর্থাৎ তারা অনন্তকাল কিশোরই থাকবে। অথবা অর্থ হল, জান্নাতীদের থেকে তাদের কখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে না।

২. অর্থাৎ তারা আপন রূপ, সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরাফেরা করবে। এ দৃশ্য দেখে মনে হবে, যেন অসংখ্য সুন্দর মণিমুক্তা যমীনের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ জান্নাতের অবস্থা বর্ণনাতীত। কেউ যখন দেখবে,তখন বুঝবে — তা কত আজীমুশশান নে'য়ামত ও কত বিরাট সাম্রাজ্য, যা একজন সাধারণ জান্নাতীর ভাগ্যেও জুটবে। رزقنا الله منها بِمَنّه وفضله

৪. অর্থাৎ পাতলা ও মোটা উভয় শ্রেণীর রেশমের পোশাক জান্নাতীগণ পাবে।

৫. বর্তমান সূরার তিন স্থানে রূপার বর্তন, অলঙ্কার ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। অন্যত্র সোনার কথা বলা হয়েছে। সম্ভবত জান্নাতে রূপা ও সোনা উভয় প্রকারের বর্তন, অলঙ্কার ইতাদি থাকবে। কেউ এগুলি পাবে, কেউ সেগুলি। অথবা কখনো এগুলি (ব্যবহার করবে) এবং কখনো সেগুলি।

৬. অর্থাৎ সকল নে'য়ামতের পর মাহবূবে হাকীকী (প্রিয়তম আল্লাহ তাআলা)-এর পক্ষ থেকে 'শরাবে তাহুর' এর সুরা পাওয়া যাবে, যার মধ্যে থাকবে না অপবিত্রতা, মলিনতা, মাথাব্যাথা, দুর্গন্ধ। (বরং) তা পান করলে অন্তর পবিত্র ও পেট পরিষ্কার হবে। আর পান করার পর শরীর থেকে ঘাম বের হবে, যার সুরভি মেশকের ঘ্রাণের মত ছড়াতে থাকবে।

২২. এ-ই তোমাদের প্রতিদান, আর তোমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হয়েছে[১]।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

[রুকূ - ২]

২৩. আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৪. অতএব আপনি আপনার রবের ফয়সালার অপেক্ষায় থাকুন[২] এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ বা অকৃতজ্ঞের আনুগত্য করবেন না[৩]।

فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৫. আর আপনার রবের নাম জপতে থাকুন সকাল-সন্ধ্যায়[৪]।

وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

---

১. অর্থাৎ জান্নাতীদের সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা ও তাদেরকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তাদের বলা হবে, 'এসব তোমাদের আমলের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা কবুল হয়েছে এবং মেহনত ফলপ্রসু হয়েছে।' এ কথা শুনে জান্নাতীরা অধিকতর আনন্দিত হবে।

২. কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি, যাতে আপনার দিল মজবুত থাকে এবং লোকেরাও ক্রমান্বয়ে আপন ভাল-মন্দ বুঝে নিতে পারে এবং জেনে নেয় যে, জান্নাত কোন্‌সব আমলের বদৌলতে লাভ হয়। আর যদি বোঝানোর পরও ওরা না মানে এবং নিজেদের জেদ ও শক্রতার উপরই কায়েম থাকে, তবে আপনি আপনার পালনকর্তার হুকুমের উপর অবিচল থাকবেন এবং আখেরী ফয়সালার অপেক্ষা করবেন।

৩. উৎবা, ওলীদ প্রমুখ কুরায়শ কাফের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পার্থিব নানা প্রলোভন ও নানা ছলে-কৌশলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইত। তাই আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন যে, আপনি ওদের কোন কথাই মানবেন না। কারণ, কোন পাপী বা অকৃতজ্ঞ কাফেরের কথা মানলে ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ নেই। অতএব এহেন দুরাত্মা ও হতভাগাদের কথায় কান দেওয়া উচিত নয়।

৪. অর্থাৎ সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখুন, বিশেষত এ দু'সময়ে। আল্লাহর এমন যিকিরই সমস্ত বিবাদ-কলহ, পেরেশানীর এলাজ।

২৬. এবং রাতের কিছু সময় তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদা করুন[১] এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন দীর্ঘ রাত পর্যন্ত[২]।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৭. এরা তো ভালবাসে দুনিয়া আর নিজেদের পশ্চাতে ফেলে রেখেছে এক গুরুভার দিবস[৩]।

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৮. আমিই ওদের সৃষ্টি করেছি এবং ওদের গ্রন্থিসমূহের বাঁধন মজবুত করেছি। আর আমি যখন ইচ্ছা করব, ওদের স্থলে ওদের সদৃশ তৈরি করে নেব[৪]।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾

---

১. অর্থাৎ নামায পড়ুন। মনে হয় এখানে মাগরিব ও এশার নামায বোঝানো হয়েছে, অথবা তাহাজ্জুদ।

২. যদি وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য হয়, তবে এ আয়াতাংশে 'তাসবীহ' দ্বারা সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য হবে, অর্থাৎ রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ ছাড়াও অনেক বেশি তাসবীহ ও তাহ্‌লীলে রত থাকুন। আর যদি তা দ্বারা মাগরিব ও এশা বোঝানো হয়ে থাকে, তবে এখানে 'তাসবীহ' দ্বারা তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য হতে পারে।

৩. অর্থাৎ এই লোকগুলো যে আপনার নসীহত ও হেদায়াত গ্রহণ করছে না, এর একমাত্র কারণ দুনিয়ার মহব্বত। যেহেতু দুনিয়া তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়, তাই ওরা এটাই চায়। আর কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দিন থেকে ওরা গাফলতে আছে। এর কোন চিন্তা-ভাবনাই ওদের নেই; বরং এর আগমনে বিশ্বাসই নেই। মনে করে, যখন মরে গলে পঁচে যাব, তখন কে পুনরায় আমাদের আবার বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে? সামনে এর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে।

৪. অর্থাৎ প্রথমে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং সকল গ্রন্থির বাঁধন আমিই জুড়েছি। এখন আমার সেই শক্তি অকার্যকর হয়ে যায়নি। আমি যখন চাইব, ওদের বর্তমান অস্তিত্ব খতম করে দিয়ে পুনরায় নতুন অস্তিত্ব দাঁড় করিয়ে দেব। অথবা অর্থ এই যে, এ লোকগুলো না মানলে আমার যখন ইচ্ছা এদের স্থানে এদের মতই অন্য মানুষ নিয়ে আসব, যারা এদের মত অবাধ্য হবে না।

২৯. এ (কুরআন) তো উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে আপন রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক[১]।

إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর তোমরা তখনই ইচ্ছা করবে, যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়[২]।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করেন[৩]। আর যারা পাপী, ওদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন যাতনাদায়ক শাস্তি।

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ﴿٣١﴾

---

১. অর্থাৎ জোর-জবরদস্তি করে মানানো আপনার কাজ নয়, কুরআনের দ্বারা নসীহত করে দিন। অতঃপর সকলের ইখতিয়ার রয়েছে– যার ইচ্ছা, সে নিজ রবের সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছার পথ অবলম্বন করুক।

২. অর্থাৎ তোমাদের চাওয়াও আল্লাহর চাওয়া ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন, তিনি জানেন, কার যোগ্যতা কতটুকু। সে অনুযায়ীই তাঁর ইচ্ছা কাজ করে। অতএব তিনি যাকে নিজ ইচ্ছায় সৎপথে আনবেন এবং যাকে গোমরাহীতে পড়ে থাকতে দেবেন, উভয়ই সম্পূর্ণ সঠিক ও হেকমতপূর্ণ হবে।

৩. অর্থাৎ যাদের যোগ্যতা ভাল হবে, তাদের নেকীর উপর চলার তাওফীক দেবেন এবং নিজ রহমত ও অনুগ্রহের অধিকারী বানাবেন।

সূরা মুরসালাত

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭৭ । ৫০ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٥٠، رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম — بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝

১. কসম বাতাসসমূহের, যা কল্যানের জন্য প্রেরিত হয়।

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝

২. অতঃপর যা প্রবলবেগে ছুটে চলে[১]।

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝

৩. এবং কসম সেই বাতাসসমূহের, যা (মেঘমালাকে আকাশে) ছড়িয়ে দেয়।

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝

৪. অনন্তর (মেঘকে) টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করে দেয়[২]।

---

১. অর্থাৎ প্রথমে হালকা ও মনোরম বাতাস প্রবাহিত হয়, যার সঙ্গে সৃষ্টজীবের বহু আশা-ভরসা ও কল্যাণ জড়িত থাকে। কিছু সময় পর সেই বাতাসই প্রবল ঝড়-তুফানের রূপ ধারণ করে এমন ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে যে, লোকেরা ত্রাহি ত্রাহি করতে শুরু করে।

ঠিক এ দৃষ্টান্তই দুনিয়া ও আখেরাতের বেলায় প্রযোজ্য। কত আমল রয়েছে, যেগুলোকে লোকেরা বর্তমানে উপকারী ও লাভজনক মনে করে এবং সেগুলো নিয়ে বড় বড় আশা করতে থাকে। কিন্তু সেই আমলগুলোই যখন কিয়ামতের দিন আসল ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আকৃতিতে প্রকাশ পাবে (কারণ, তা ছিল নাফরমানীর কাজ), তখন লোকেরা তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকবে।

২. অর্থাৎ সেই বাতাসের কসম, যা বাষ্প প্রভৃতিকে উপরে নিয়ে যায় এবং মেঘকে উত্তোলন করত আকাশে ছড়িয়ে দেয়। তারপর যেখানে যেখানে পৌছানো দরকার, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাকে সেরূপ ভাগ ভাগ করে দেয়। আর বৃষ্টির পর (সাদা) মেঘমালাকে টুকরো টুকরো করে এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর শুধু মেঘমালার কথাই নয়; বরং এটা বাতাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, সে বিভিন্ন বস্তু যথা: সুগন্ধ, দুর্গন্ধ ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয়, বস্তুর সূক্ষ্ম অংশসমূহকে উড়িয়ে নিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং এক বস্তু উঠিয়ে নিয়ে অপর জিনিসের সাথে মিলিয়ে দেয়।

মোটকথা, এই একত্রীকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণ, যা বাতাসের বৈশিষ্ট্য— আখেরাতের একটি নমুনা। কারণ, সেখানে হাশর ও নশরের পর লোকদের পৃথক পৃথক করা হবে এবং এক স্থানে (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে) একত্র হওয়ার পর তাদের ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় পৌছিয়ে দেওয়া হবে– هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ

৫. অতঃপর কসম ফেরেশতাদের, যারা ওহী অবতীর্ণ করে[১]—	فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝
৬. ওজর-আপত্তি (বন্ধ) করার জন্য, অথবা সতর্ক করার জন্য[২]।	عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۝
৭. তোমাদের সঙ্গে যার ওয়াদা করা হচ্ছে*, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে[৩]।	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۝

১. হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا — দ্বারাও বাতাস উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ, ওহীর আওয়াজ মানুষের কান পর্যন্ত পৌছায় বাতাসের মাধ্যমে।

বি. দ্র. الْمُرسلٰت ، العٰصفت ، النّٰشِرٰتِ ، الفٰرقت ، الْمُلْقِيٰت এ পাঁচটি দ্বারা কারো নিকট বাতাস, কারো নিকট ফেরেশতা, কারো নিকট নবী-রাসূল উদ্দেশ্য। আর কোন কোন মুফাসসির প্রথম চারটির দ্বারা বাতাস এবং পঞ্চমটির দ্বারা ফেরেশতা উদ্দেশ্য করেছেন, যেমন তরজমা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। আরো কিছু উক্তি আছে, যেগুলির বিস্তারিত আলোচনা 'রূহুল মাআনী' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

২. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লেখেন, '(ওহীর দ্বারা) কাফেরদের ওজর-আপত্তি খণ্ডানো উদ্দেশ্য, যাতে (শাস্তির সময়) বলতে না পারে, আমরা তো জানতাম না। আর যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, ওহী দ্বারা তাদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য, যাতে (সতর্ক হয়ে) ঈমান আনয়ন করে।'

আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন, কুরআনের যে অংশ আদেশ-নিষেধ ও আকায়েদ-আহকাম সম্বলিত, তা কারণদর্শানোর জন্য (ও দলীলস্বরূপ) দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যখন আমল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তখন যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ আমলের কারণ ও দলীল হিসাবে বলতে পারে যে, আমি অমুক কাজ কুরআনে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসারে করেছি এবং অমুক কাজ তাঁর নিষেধ অনুযায়ী বর্জন করেছি। আর কুরআনের যে অংশ ঘটনা, সংবাদ ইত্যাদি সম্বলিত, সেগুলির মূল উদ্দেশ্য কাফেরদের সতর্কীকরণ ও ভয়প্রদর্শন। আর এ সূরায় যেহেতু আলোচনার রোখ্ প্রধানত অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীদের দিকে, সেহেতু (কুরআন নাযিলের কারণ হিসাবে) 'সুসংবাদ প্রদান' উল্লেখ করা হয়নি।

যা হোক, ওহী আনয়নকারী ফেরেশতাগণ এবং মেঘ সঞ্চালক বাতাসসমূহও এ কথার সাক্ষী যে, একটি সময় এমন আসা সমীচীন, যখন পাপীদের আপন কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হবে এবং আল্লাহভীরুদের সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত করে দেওয়া হবে।

* দ্বিতীয় তরজমা–' তোমাদের যার ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে'।

৩. অর্থাৎ কিয়ামতের ওয়াদা। তদ্রূপ আখেরাতের হিসাব-কিতাব ও পুরস্কার-শাস্তির ওয়াদা।

৮. (কিয়ামত তখন সংঘটিত হবে), যখন তারকারাজিকে আলোহীন করে দেওয়া হবে,	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝
৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে[১],	وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۝
১০. যখন পাহাড়-পর্বত উড়িয়ে দেওয়া হবে[২],	وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝
১১. এবং যখন রাসূলগণের জন্য সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হবে[৩]।	وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۝
১২. কোন্ দিনের জন্য (এসব) স্থগিত রাখা হয়েছে?	لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۝
১৩. বিচার-দিবসের জন্য[৪]।	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝
১৪. আপনি কি জানেন, বিচার-দিবস কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝
১৫. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[৫]।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝
১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দেইনি?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

---

১. অর্থাৎ তারকারাজি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে তাতে জানালা ও বাতায়নের মত দেখা যাবে।

২. অর্থাৎ তুলার মত বাতাসে উড়তে থাকবে।

৩. যাতে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী নিজ নিজ উম্মতের সঙ্গে তাঁরা মহাপ্রভুর মহান আদালতে হাযিরা দেন।

৪. অর্থাৎ তোমরা কি জান, উক্ত বিষয়গুলি কোন্ দিনের জন্য মুলতবী রাখা হয়েছে? সেই দিনের জন্য, যেদিন প্রত্যেক কাজের চূড়ান্ত ও অকাট্য ফয়সালা করে দেওয়া হবে। আল্লাহ চাইলে তো এখনি প্রত্যেক বিষয়ের ফয়সালা করে দিতে পারেন, কিন্তু এমনটি তাঁর হেকমতের দাবি নয়।

৫. অর্থাৎ আর জিজ্ঞাসা করো না, ফয়সালার দিন কী জিনিস? এতটুকু বুঝে নাও যে, অবিশ্বাসীদেরকে সেদিন ধ্বংস ও মুসিবতের সম্মুখীন হতে হবে। ওরা যে জিনিসের প্রত্যাশা করত না, তা যখন অকস্মাৎ ভয়ঙ্কররূপে এসে পড়বে, তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং বিস্ময় ও অনুশোচনায় বোধশূন্য, অচেতন হয়ে পড়বে।

১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদেরও ওদের অনুগামী করব। | ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৮. আমি অপরাধীদের সাথে এরূপই করে থাকি[১]। | كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾

১৯. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[২]। | وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. আমি কি তোমাদের এক তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? | اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾

২১. অতঃপর তা রেখেছি এক সংরক্ষিত স্থানে[৩]– | فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২. নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত[৪]। | اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾

---

১. কিয়ামতের অস্বীকারকারীরা মনে করে, 'এত বড় দুনিয়া কী করে খতম হবে? এ কথা কে বিশ্বাস করবে যে, সকল মানুষ একই সময়ে মরে যাবে এবং মানব-বংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে? দোযখ ও আযাবের এসব ভয় সবই কাল্পনিক ও বানোয়াট কথাবার্তা মনে হয়।'

এর জওয়াব এই যে, পূর্বে কত কত মানুষ মরেছে এবং কত কত জাতিকে নিজেদের গোনাহর কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। তারপর ওদের পরও মৃত্যু ও ধ্বংসের এই ধারাবাহিকতা সর্বদা জারী রয়েছে। পাপীদের সম্বন্ধে যখন আল্লাহর পুরাতন নীতি এই, তখন বুঝে নাও যে, বর্তমান কালের কাফেরদেরও তিনি সেই পূর্ববর্তীদেরই মত ধ্বংস করে দেবেন। যে সত্তা বিভিন্ন সময়ে বড় বড় মজবুত মানুষকে মারতে পারেন এবং শক্তিশালী অপরাধীদের পাকড়াও করে হালাক করতে পারেন, তিনি কেন সমস্ত সৃষ্টিকে একই সাথে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন না এবং সমস্ত অপরাধীকে একই সময়ে আযাবের স্বাদ ভোগ করাতে পারবেন না?

২. যারা কিয়ামতকে এজন্য অস্বীকার করত যে, গোটা মানবগোষ্ঠীকে অকস্মাৎ কী করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে এবং কীভাবে সকল অপরাধীকে একই সময়ে পাকড়াও করে শাস্তি দেওয়া হবে?

৩. অর্থাৎ একটি অবস্থান-স্থলে সংরক্ষণ করেছেন। এর দ্বারা মাতৃগর্ভ উদ্দেশ্য, যাকে উর্দূতে بچہ دان ('জরায়ু') বলা হয়।

৪. সাধারণত এই অবস্থান-কাল ৯ (নয়) মাস হয়ে থাকে।

২৩. অতঃপর আমি (তাকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে) সক্ষম হয়েছি। অতএব আমি কত বড় শক্তিধর[১]!

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ

২৪. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[২]।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ

২৫. আমি কি ভূমিকে বানাইনি ধারণকারী—

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ

২৬. জীবিতদের ও মৃতদেরও[৩]?

اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ

২৭. এবং তাতে উঁচু পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছি, আর তোমাদের সুপেয় পানি পান করিয়েছি[৪]।

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۙ

---

১. অর্থাৎ ওই পানির ফোঁটাকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌছিয়ে বুদ্ধিমান মানুষ বানিয়ে দেই। এ থেকে আমার কুদরত ও শক্তির স্বরূপ বুঝে নাও। তবে কি এ মানুষকে মৃত্যুর পর আমি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারব না?

বি. দ্র. কেউ কেউ قدرنا এর অর্থ করেছেন নিরূপণ করা। অর্থাৎ 'আমি নিরূপণ করেছি', আর আমি কত উত্তম নিরূপণকারী যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জরুরী জিনিস রয়ে যায় না এবং কোন বাড়তি ও নিরর্থক জিনিস পয়দা হয় না।

২. যারা এ কথা বলত যে, মাটিতে মিশে গিয়ে যখন আমাদের হাড়গুলো পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আমাদের কীভাবে জীবিত করা হবে? তো, সেদিন ওরা নিজেদের এই নিরর্থক সন্দেহের জন্য লজ্জিত হবে এবং অনুশোচনায় হাত কামড়াবে।

৩. অর্থাৎ জীবিত মানুষও এই যমীনের উপর জীবনযাপন করে এবং মৃতরাও এই মাটিরই ভিতরে চলে যায়। মানুষের জীবনও এই মাটি থেকে লাভ হয় এবং মৃত্যুর পরও এ-ই তার ঠিকানা। সুতরাং দ্বিতীয়বার এই মাটি থেকেই তাকে উত্তোলন করা কঠিন হবে কেন?

৪. অর্থাৎ এই যমীনেই পর্বতের ন্যায় ভারী ও বিশাল জিনিস পয়দা করেছেন, যা নিজ স্থান থেকে একটুও নড়ে না। এবং এই যমীনেই পানির ঝরনাসমূহ প্রবাহিত করে দিয়েছেন, যা কোমল ও তরল হওয়ার কারণে সদা প্রবাহিত হতে থাকে এবং বড় সহজে পানকারীদের তৃপ্তি দেয়।

অতএব যে মহান আল্লাহ এই তুচ্ছ যমীনে নিজ কুদরতের পরস্পর বিপরীতমুখী নিদর্শন দেখান এবং দেখান জীবন-মৃত্যু ও কঠোরতা-কোমলতার দৃশ্যাবলি— তিনি কি হাশরের ময়দানে নম্রতা ও কঠোরতা এবং মুক্তি ও শাস্তির বিভিন্ন নিদর্শন দেখাতে পারেন না? অনুরূপ, যার মুঠিতে রয়েছে সৃষ্টি করা, ধ্বংস করা এবং জীবন ও স্থায়িত্বের উপকরণ পয়দা করার ক্ষমতা– তাঁর কুদরত ও নে'য়ামতকে অস্বীকার করা কেমন করে বৈধ হবে?

২৮. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[১]।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. (ওদের বলা হবে), চল সেই জিনিসের দিকে, যা তোমরা অস্বীকার করতে[২]।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. চল তিন শাখাবিশিষ্ট একটি ছায়ার দিকে[৩],

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩১. যা ঘন ছায়া নয় এবং যা অগ্নিশিখা(-র উত্তাপ) থেকেও রক্ষা করতে পারবে না[৪]।

لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩২. নিশ্চয় দোযখের আগুন অট্টালিকাতুল্য (বড় বড়) স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে[৫]।

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩৩. যেন তা হলুদ বর্ণের উট[৬]।

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

---

১. যারা মনে করত, একই স্থানে ও একই সময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে ছওয়াব প্রদান ও আযাব প্রদানের মত বিপরীতমুখী কাজ কেমন করে সম্পাদিত হবে?

২. এ কথা কিয়ামতের দিন বলা হবে।

৩. কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, কাফেরদেরকে ছায়া দেওয়ার জন্য দোযখ থেকে একটি ধোঁয়া উঠবে, যা ফেটে কয়েক টুকরা হয়ে যাবে। (তাফসীরে তবারী ২৩/৬০০-৬০১) বলা হয়, এই ধোঁয়া ওদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন দিক থেকে ঘেরাও করবে– এক টুকরা মাথার উপর ছায়ার মত অবস্থান করবে, দ্বিতীয় টুকরা ডানে ও তৃতীয় টুকরা বাঁ দিকে থাকবে। হিসাব-কিতাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাফেররা এই ছায়ার নীচেই থাকবে। আর ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা মহান আরশের ছায়ার নীচে আরামে অবস্থান করবে।

৪. অর্থাৎ তা কেবল নামমাত্র ছায়া হবে, ঘনছায়া হবে না। ফলে তা দ্বারা সূর্যের তাপ বা আগুনের উষ্ণতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না, না ভিতরের উষ্ণতা ও পিপাসা হ্রাস পাবে।

৫. অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গগুলো উচ্চতায় উঁচু প্রাসাদতুল্য হবে। অথবা উদ্দেশ্য হল, তার অঙ্গারগুলো বিশালতায় প্রাসাদতুল্য হবে।

৬. পূর্বের আয়াতে যে প্রাসাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য যদি হয় উচ্চতায় প্রাসাদের সাথে তুলনা করা— তবে বর্তমান আয়াতের অর্থ হবে, স্ফুলিঙ্গগুলো বিশালতায় উটতুল্য হবে। আর যদি সেই তুলনা বিশালতায় হয়ে থাকে, তবে كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ এর অর্থ এই হবে যে, প্রথমত স্ফুলিঙ্গগুলো প্রাসাদের সমান হবে। এরপর তা ছোট হয়ে উটের সমান হয়ে যাবে। অথবা হতে পারে, উটের সাথে রঙের দিক থেকে তুলনা করা উদ্দেশ্য; অবশ্য তখন جِمٰلَتٌ صُفْر এর তরজমা যারা কালো উটসমূহ করেছেন, তা অধিকতর সংগত হবে। কেননা, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, জাহান্নামের আগুন কালো ও অন্ধকার হবে। (জামে তিরমিযী, ২৫৯১) আর আরববাসীরা কালো উটকে صفر বলে, কেননা তাতে সাধারণত হলুদের আভা থাকে।

৩৪. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[১]। وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৫. এ এমন দিন যে, ওরা কথা বলতে পারবে না[২]। هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝

৩৬. এবং ওদের অজুহাত পেশ করার অনুমতিও দেওয়া হবে না[৩]। وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝

৩৭. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[৪]। وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৮. এ ফয়সালার দিন। আমি তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের একত্র করেছি[৫]। هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۝

৩৯. এখন যদি তোমাদের কোন অপকৌশল থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে অপকৌশল চালাও[৬]। فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ۝

৪০. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[৭]। وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

---

১. যারা মনে করত, কিয়ামত আসবে না! আর যদি আসেই, তবে আমরা সেখানেও আরামেই থাকব।

২. হাশরের ময়দানের কোন কোন স্থানে ওরা একেবারেই কথা বলতে পারবে না। আর যেখানে যেখানে বলতে পারবে, তা লাভজনক হবে না। এই হিসাবে বলা না বলা সমান হবে।

৩. কেননা, ওযর ও তওবা কবুল হওয়ার সময় চলে গেছে।

৪. যারা দুনিয়ার আদালতসমূহ দেখে ভাবে, যদি আখেরাতেও আদালতের সম্মুখীন হয়েই যাই, তবে সেখানেও গলাবাজি করে এবং কিছুটা ওযর দেখিয়ে অব্যাহতি পেয়ে যাবে।

৫. যাতে সকলকে একত্র করে তাদের আবার পৃথক পৃথক করে দেন– (কেউ যাবে জান্নাতে, কেউ দোযখে) এবং আখেরী ফয়সালা শুনিয়ে দেন।

৬. আল্লাহ তোমাদের সকলকে এখানে একত্র করে দিয়েছেন। পরস্পরে মিলেমিশে ও পরামর্শ করে তাঁর পাকড়াও থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যা কলাকৌশল করতে পার, করে দেখ। দুনিয়ায় তো সত্যকে পরাজিত করার বহু কলাকৌশল করেছিলে, আজ স্মরণ করে দেখ তো, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটা কাজে লাগবে!!

৭. যারা অন্যদের উপর ভরসা করে এবং ভাবে, তারা কোন না কোনভাবে আমাদের ছাড়িয়ে নেবে। আর ওদের কতক বেয়াদব তো দোযখের ফেরেশতাদের সংখ্যা উনিশ- এ কথা শুনে এই পর্যন্ত বলে ফেলত যে, তাদের সতের জনের বিরুদ্ধে আমি একাই যথেষ্ট।

[রুকূ - ২]

৪১. নিশ্চয় আল্লাহভীরুরা থাকবে ছায়াসমূহ[১] ও ঝরনামালার মধ্যে,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾

৪২. এবং তাদের আকাঙ্ক্ষিত ফলমূলের মাঝে।

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. (তাদের বলা হবে), 'তৃপ্তির সাথে খাও ও পান কর— তোমরা যেসব আমল করতে তার বিনিময়ে[২]।'

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের বিনিময় দিয়ে থাকি।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৫. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[৩]।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. (হে কাফেররা!) অল্প কিছুদিন খাও ও ভোগ কর। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী[৪]।

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[৫]।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

---

১. অর্থাৎ প্রথমে আরশের ছায়ায় থাকবে, পরে জান্নাতের ছায়াসমূহে।

২. অবিশ্বাসীদের বিপরীতে এখানে মুত্তাকীদের হাল বয়ান করা হচ্ছে। কেননা الأشياء تعرف بأضدادها (জিনিসের পূর্ণ পরিচয় হয় তার বিপরীত জিনিসের দ্বারা)

৩. যারা দুনিয়ায় মুসলমানদের বলত, মৃত্যুর পর যদি দ্বিতীয় জীবন থেকে থাকে, তবে সেখানেও আমরা তোমাদের থেকে ভাল থাকব। কিন্তু এখন মুসলমানদের আরাম- আয়েশ আর নিজেদের কষ্ট দেখে অধিকতর জ্বালাতন ভোগ করবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

৪. এই সম্বোধন অবিশ্বাসীদের প্রতি। ওদের বলা হচ্ছে, আরো কিছুদিন দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করে নাও। অবশেষে এই পানাহারের পরিণাম খুবই মন্দ হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর আসামী, যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়। বলতে গেলে, كُلُوا وَتَمَتَّعُوا- এর ফরমান এমন, যেমন ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি দেওয়ার পূর্বে বলা হয়, কোন ইচ্ছা থাকলে বল! যাতে ফাঁসির পূর্বে তা পূরণ করা যায়।

৫. যারা দুনিয়াতে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিল। কিন্তু এ খবর ছিল না যে, ফুলের মালা মনে করে যে জিনিস গলায় পরছে, তা প্রকৃতপক্ষে বিষাক্ত সাঁপ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝

৪৮. আর যখন ওদের বলা হয়, 'তোমরা নত হও'[১] ওরা নত হয় না।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

৪৯. সেদিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের[২]।

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝

৫০. অতএব, তার পর আর কোন্ কথার প্রতি ওরা ঈমান আনবে[৩]?

---

১. অর্থাৎ নামাযে, অথবা আল্লাহর বিধানের সামনে।

২. সেদিন ওরা আফসোস করবে যে, দুনিয়ায় আল্লাহর বিধানের সামনে কেন নত হইনি। দুনিয়ায় মাথা নত করলে আজ এখানে (আখেরাতে) মাথা উঁচু থাকত।

৩. অর্থাৎ কুরআন থেকে অধিকতর কামেল ও আবেদন সৃষ্টিকারী বর্ণনা আর কী হতে পারে? যদি এই অবিশ্বাসীরা এর প্রতিই ঈমান না আনে, তবে আর কোন্ বাণীর প্রতি ঈমান আনবে?

تَمَّ سورة الْمُرْسلات ولله الحمد وبه التوفيق والنعمة

সূরা নাবা

সূরা ৭৮ । ৪০ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

آیاتها ۴۰، رکوعاتها ۲

পারা-৩০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ①

১. লোকেরা পরস্পর কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে[১]?

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ②

২. (তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে) মহাসংবাদ সম্বন্ধে,

الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ③

৩. যার ব্যাপারে তারা মতবিরোধে লিপ্ত[২]।

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ④

৪. কখনই না! শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

৫. পুনরায় (বলছি), কখনই না! শীঘ্রই তারা জানতে পারবে[৩]।

---

১. অর্থাৎ লোকেরা কীসের খোঁজে এবং কোন্ বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত? ওদের কি এই যোগ্যতা আছে যে, বারবার জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা বিষয়টি ওদের বোধগম্য হয়ে যাবে? কিছুতেই নয়। অথবা অর্থ এই যে, কাফেররা ঠাট্টা ও অবিশ্বাসের ছলে পরস্পর একে অপরকে, তদ্রূপ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের প্রশ্ন করত, আচ্ছা ভাই! সেই কিয়ামত কবে আসবে? এত দেরি হচ্ছে কেন? এখনই কেন আসছে না? (উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন)– তোমরা (মুসলিমগণ) কী জান, ওরা কোন্ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করছে? তা (অর্থাৎ কিয়ামত) অত্যন্ত কঠিন ও ভয়াবহ এক বাস্তবতা। শীঘ্রই ওরা তা উপলব্ধি করবে, যখন স্বচক্ষে কিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্যাবলি দেখতে পাবে।

২. অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করছে কিয়ামতের সংবাদ সম্পর্কে, যে বিষয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে– কেউ কিয়ামতের আগমনে বিশ্বাস করে, কেউ বিশ্বাস করে না, কেউ সন্দেহে পড়ে আছে (যে, হবে কি হবে না)। কেউ বলে, (কিয়ামতের দিন) শুধু আত্মা নয়, শরীরেরও পুনরুত্থান হবে। কেউ বলে, আযাব ও ছওয়াব সবই আত্মাকে ভুগতে হবে, শরীরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের নানা মতভেদ।

৩. অর্থাৎ পয়গম্বরগণ পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষকে অনেক কিছু বুঝিয়েছেন, কিন্তু মানুষ তো নিজেদের মতপার্থক্য ও জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বিরত হওয়ার পাত্র নয়। এখন সেই ভয়াবহ দৃশ্য ওদের সম্মুখে এসে পড়ার সময় খুবই নিকটবর্তী। তখন বুঝতে পারবে, কিয়ামত কী জিনিস এবং ওদের প্রশ্নাদি ও মতভেদেরই বা কী মূল্য ছিল।

৬. আমি কি পৃথিবীকে বিছানা বানাইনি[১]

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ

৭. এবং পাহাড়-পর্বতকে পেরেক[২]?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ

৮. আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়[৩]।

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ

৯. এবং তোমাদের নিদ্রাকে বানিয়েছি ক্লান্তি দূর করার উপায়[৪]।

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

১০. আর রাতকে করেছি আবরণ[৫]

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ

১১. এবং দিনকে বানিয়েছি জীবিকা উপার্জনের সময়[৬]।

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۪

---

১. যার উপর মানুষ স্থির ও প্রশান্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং পার্শ্ব-পরিবর্তন করে থাকে।

২. কোন বস্তুতে পেরেক লাগিয়ে দিলে তা যেমন স্বস্থান থেকে নড়ে না, তদ্রূপ সৃষ্টির সূচনাতে পৃথিবী যে কাঁপত ও নড়ত, তাতে আল্লাহ তাআলা পর্বত সৃষ্টি করে দিয়ে তার কম্পন ও দোলা বন্ধ করে দিলেন। যেন পাহাড়-পর্বতের দ্বারা পৃথিবীর এক রকম স্থিরতা লাভ হল।

৩. অর্থাৎ পুরুষের মনের প্রশান্তি ও সুখের জন্য নারীকে তার জোড়া বানালেন- وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا (তাঁর নিদর্শনাদির একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ কর। -রূম, আয়াত ২১)

অথবা 'জোড়া জোড়া' দ্বারা উদ্দেশ্য নানা রঙ ও বর্ণ এবং নানা আকৃতি প্রভৃতি।

৪. অর্থাৎ সারা দিনের দৌড়াদৌড়িতে ক্লান্ত হয়ে যখন মানুষ নিদ্রা গ্রহণ করে, তখন সমস্ত শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়ে যায়- যেন নিদ্রা শান্তি ও বিশ্রামেরই নাম। নিদ্রার প্রসঙ্গ আসায় সামনে রাতের উল্লেখ করা হচ্ছে।

৫. মানুষ যেমন কাপড় পরিধান করে নিজের শরীর ঢেকে নেয়, তদ্রূপ রাতের অন্ধকারও সৃষ্টি-জগতের জন্য আচ্ছাদনস্বরূপ। যেসব কাজ গোপনে করার, সেসব সাধারণত রাতের অন্ধকারেই করা হয়। আর এমনিতেও দিনের চেয়ে রাতের বেলায় কাপড়ে আচ্ছাদিত হওয়ার প্রয়োজন বেশি হয়ে থাকে। কেননা, তুলনামূলকভাবে রাতে ঠাণ্ডা ও শীত বেশি পড়ে।

৬. অর্থাৎ সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা অর্জনের কাজ দিনের বেলায় করা হয়ে থাকে। আর এসবের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে নিজের এবং নিজ পরিবার ও সন্তানাদির প্রয়োজন মিটিয়ে অন্তরে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করা।

১২. আর আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে নির্মাণ করেছি মজবুত সাতটি আকাশ[১]

وَّبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾

১৩. এবং সৃষ্টি করেছি একটি অত্যুজ্জ্বল প্রদীপ[২]।

وَّجَعَلۡنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿۱۳﴾

১৪. আর আমি জলপূর্ণ মেঘমালা থেকে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করি[৩],

وَّاَنۡزَلۡنَا مِنَ الۡمُعۡصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ﴿۱۴﴾

১৫. যাতে তার দ্বারা উৎপন্ন করি– শস্য, উদ্ভিদ

لِّنُخۡرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ﴿۱۵﴾

১৬. ও বৃক্ষ-লতাপূর্ণ ঘন উদ্যানরাজি[৪]।

وَّجَنّٰتٍ اَلۡفَافًا ﴿۱۶﴾

১৭. নিশ্চয় বিচার-দিবসের সময় সুনির্ধারিত[৫]—

اِنَّ يَوۡمَ الۡفَصۡلِ كَانَ مِيۡقَاتًا ۙ﴿۱۷﴾

পূর্বা-পর সম্পর্ক

রাতদিনের সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে সামনে আকাশমণ্ডলি ও সূর্যের উল্লেখ করা হচ্ছে। অথবা বলা যায়, পূর্বে যমীনের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তারই প্রাসঙ্গিকতায় এখন আকাশের কথা উল্লেখ হচ্ছে।

১. অর্থাৎ সাতটি আকাশ অত্যন্ত মজবুত করে বানিয়েছেন। এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাতে কোন ছিদ্র বা ফাটল হয়নি।

২. অর্থাৎ সূর্য সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে আলো ও তাপ দুটি গুণই রয়েছে।

৩. المعصرات– অর্থাৎ মেঘমালা, যা থেকে বৃষ্টি ঝরে। বা বায়ুসমূহ, যা মেঘ থেকে বৃষ্টি নিঃসারিত করে।

৪. অর্থাৎ অত্যন্ত ঘন ও নিবিড় বাগ-বাগিচা। অথবা অর্থ এই যে, একই মাটিতে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ ও বাগান সৃষ্টি করেছেন।

বি. দ্র. আল্লাহ তাআলার কুদরতের বড় বড় নিদর্শন বর্ণনা করে (যেন) বলে দেওয়া হল, যে আল্লাহ এরূপ শক্তিশালী ও হেকমতধারী, তাঁর পক্ষে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা এবং হিসাব-কিতাবের জন্য ওঠানো কি কঠিন হবে? আর এত বিরাট কারখানাকে (দুনিয়া) এভাবেই উদ্দেশ্যহীন ছেড়ে দেওয়া কি তাঁর হেকমতের পরিপন্থী হবে না? দুনিয়ার জীবনের এই যে দীর্ঘ ধারা, এর কোন সুস্পষ্ট ফলাফল ও পরিণতি নিশ্চয়ই হওয়া দরকার। তাকেই আমরা 'আখেরাত' বলে থাকি। ঘুমের পর যেমন জাগরণ এবং রাতের পর দিনের আগমন হয়, তদ্রূপ বুঝে নাও যে, দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর আখেরাতের আগমন নিশ্চিত।

৫. বিচার-দিবস হবে সেদিন, যেদিন বদকারদের থেকে নেককারদের সম্পূর্ণ পৃথক করে দেওয়া হবে। (দুই শ্রেণীর মধ্যে) কোন ধরনের সহাবস্থান এবং কোন ধরনের অংশিদারত্ব বাকি থাকবে না। প্রত্যেক সৎকর্ম ও অসৎকর্ম স্ব স্ব স্থান ও কেন্দ্রে গিয়ে উপনীত হবে। জানা

১৮. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। ফলে তোমরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে চলে আসবে[১]।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۟

১৯. আর আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হয়ে যাবে বহু দ্বার-(বিশিষ্ট)[২]।

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۟

২০. এবং পাহাড়-পর্বত সঞ্চালিত করা হবে, ফলে তা হয়ে যাবে মরীচিকা-(সদৃশ)[৩]।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۟

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁত পেতে আছে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۟

২২. তা অবাধ্যদের ঠিকানা[৪]—

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۟

২৩. যাতে ওরা যুগ-যুগ ধরে অবস্থান করবে[৫]।

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا ۟

২৪. ওরা সেখানে না কোন ঠান্ডা বস্তু আস্বাদন করবে এবং না কোন পানীয়।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۟

কথা, এমন পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য দুনিয়াতে হতে পারে না। কেননা, এখানকার জীবনে আকাশ-মাটি, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, শয়ন-জাগরণ, মেঘ-বৃষ্টি, বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার, বিবি-বাচ্চা— ইত্যাদি সবই সমভাবে নেককার ও বদকার উভয় দলেরই ভোগের বস্তু। বস্তুজগতের এসব কিছুর দ্বারা কাফের ও মুসলমান সমভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। এ জন্যই يوم الفصل বা বিচার-দিবসের আগমন বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার পরিসমাপ্তির পর হওয়া আবশ্যক। আর তার সময় আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত আছে।

১. অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বহু দলে বিভক্ত হয়ে তারা উপস্থিত হবে। তাদের এই বিভক্তি হবে আকীদা ও আমলের বিভিন্নতার ভিত্তিতে।

২. অর্থাৎ আকাশ ফেটে এমন হয়ে যাবে, যেন দরজাই আর দরজা। সম্ভবত এ দ্বারা সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অন্যত্র এভাবে ইরশাদ হয়েছে– يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ([স্মরণ কর], যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে মেঘের কারণে এবং ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হবে অনবরত। –সূরা ফোরকান, আয়াত ২৫)

৩. মরুভূমির বুকে চকচকে বালুরাশিকে দূর থেকে পানির ন্যায় মনে হয়। তদ্রূপ পর্বতমালাকে পাহাড়-পর্বত বলে মনে হলেও বাস্তবে থাকবে কেবল বালুরাশির স্তূপ।

৪. অর্থাৎ জাহান্নাম দুষ্কৃতিকারীদের অপেক্ষায় (ওঁৎ পেতে) রয়েছে এবং তা ওদেরই বাসস্থান।

৫. কত যুগ, তার কোন হিসাব নেই। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হতে থাকবে, কিন্তু ওদের শাস্তির পরিসমাপ্তি হবে না।

২৫. তবে (আস্বাদন করবে) কেবল গরম পানি ও প্রবাহিত পুঁজ[১]–	اِلَّا حَمِيۡمًا وَّغَسَّاقًا ۙ﴿۲۵﴾
২৬. (কৃতকর্মের) পরিপূর্ণ প্রতিফলস্বরূপ।	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿ؕ۲۶﴾
২৭. ওরা হিসাবের প্রত্যাশা করত না।	اِنَّهُمۡ كَانُوۡا لَا يَرۡجُوۡنَ حِسَابًا ۙ﴿۲۷﴾
২৮. এবং আমার আয়াতসমূহ দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করত[২]।	وَّ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿ؕ۲۸﴾
২৯. আমি প্রতিটি জিনিস সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে[৩]।	وَ كُلَّ شَیۡءٍ اَحۡصَيۡنٰهُ كِتٰبًا ﴿ۙ۲۹﴾
৩০. অতএব (আযাব) আস্বাদন করতে থাক। আমি তো তোমাদের কেবল শাস্তিই বাড়াতে থাকব[৪]।	فَذُوۡقُوۡا فَلَنۡ نَّزِيۡدَكُمۡ اِلَّا عَذَابًا ﴿۳۰﴾

১. অর্থাৎ ঠাণ্ডা বা শীতলতার যে একটা আরাম, তাও পাবে না এবং কোন সুস্বাদু জিনিসও পান করতে পাবে না। হাঁ, গরম পানি পাবে– যার উষ্ণতায় ওদের মুখ ঝলসে যাবে এবং নাড়িভুঁড়ি গলে পেটের বাইরে এসে পড়বে। আর একটি জিনিস অর্থাৎ পূঁজ পান করতে পাবে– তা দোযখীদের ক্ষত ও আঘাতের স্থান থেকে নির্গত হয়ে প্রবাহিত হবে। أعاذنا الله منها ومن سائر أنواع العذاب في الدنيا والآخرة (আল্লাহ তাআলা তা থেকে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সব রকমের আযাব থেকে আমাদের পানাহ দিন।)

২. অর্থাৎ যে জিনিস ওরা আশা করত না, তাই সমাগত হল এবং যে বিষয়কে মিথ্যা বলে অভিহিত করত তা চর্মচোখে দেখতে পেল। এখন দেখা যাবে, কী করে তা অস্বীকার করে।

৩. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং তাঁর সার্বিক জ্ঞান অনুযায়ী তা দফতরসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। কোন নেক বা বদ আমলই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়– পাই পাই করে ওদেরকে প্রতিফল ভোগ করানো হবে।

৪. অর্থাৎ তোমরা যেরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে যাচ্ছিলে ও প্রতিনিয়ত এতে বেড়েই চলছিলে এবং যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের মৃত্যু এসে না পড়ত তবে সর্বদা বেড়েই চলতে— তদ্রূপ এখন তোমরাও অনন্ত আযাবের স্বাদ ভোগ করতে থাক। আমি আযাব বাড়াতেই থাকব, কখনো তা লাঘব করা হবে না।

[রুকূ - ২]

৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য– إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩২. উদ্যানরাজি, আঙ্গুর, حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩৩. উদ্ভিন্ন-যৌবনা, সমবয়স্কা নারীগণ[১], وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং কানায় কানায় পরিপূর্ণ পানপাত্র[২]। وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৫. তারা সেখানে বাজে ও মিথ্যা কথা শুনবে না[৩]। لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ﴿٣٥﴾

৩৬. আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল, যথোচিত দানরূপে (তারা এসব পাবে)[৪]। جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৭. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, বড় দয়াময়[৫]। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাধ্য তাদের নেই[৬]। رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

---

১. (كواعب)-অর্থাৎ যুবতী, যাদের যৌবন পূর্ণরূপে বিকশিত হবে। এবং সকলে (اتراب অর্থাৎ) একই বয়সের হবে।

২. অর্থাৎ শারাবান তহুরার পরিপূর্ণ পেয়ালা (পান-পাত্র)।

৩. অর্থাৎ বেহেশতে নিরর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা বা প্রবঞ্চনা কিছুই হবে না। কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদও করবে না, যে কারণে মিথ্যা বলার কিংবা প্রতারণা করার প্রয়োজন হতে পারে।

৪. অর্থাৎ কণায় কণায় হিসাব করে প্রতিদান দেওয়া হবে এবং যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হবে।

৫. উক্ত প্রতিদানও নিছক পুরস্কার ও রহমত হিসাবেই দেওয়া হবে, নতুবা জানা কথা– আল্লাহর উপর কারও ঋণ বা জোর নেই। মানুষের পক্ষে স্বীয় আমলের বদৌলতে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়াই কঠিন। আর বেহেশত লাভ করা– সে তো নিতান্তই আল্লাহর দয়া ও রহমতের বদৌলতে। বেহেশতকে আমাদের আমলের প্রতিদান সাব্যস্ত করা– এ তো আল্লাহ তাআলার আরো বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের ছিটাফোঁটা আমলের কদর করেছেন এবং আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

৬. অর্থাৎ এ রকম দয়া-মায়া ও রহমত সত্ত্বেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রম এমনই যে, কেউই তাঁর সামনে ঠোঁটও নাড়াতে পারে না।

৩৮. যেদিন 'রূহ' ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে[১], সেদিন সে ছাড়া কেউ কথা বলবে না, যাকে দয়াময় অনুমতি দেবেন। আর সে সঠিক কথা বলবে[২]।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝

৩৯. তা সুনিশ্চিত দিন। অতএব যার ইচ্ছা, সে স্বীয় রবের নিকট (আপন) ঠিকানা বানিয়ে নিক[৩]।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝

৪০. আমি তোমাদের এক আসন্ন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম, (যা সেদিন সংঘটিত হবে)– যেদিন মানুষ তার দু'হাত যা অগ্রিম পাঠিয়েছে তা উপস্থিত দেখতে পাবে[৪] এবং কাফের বলবে, 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম[৫]!'

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

---

১. 'রূহ' বলতে সম্ভবত প্রাণীকুল বা 'রূহুল কুদ্স' (জিবরাঈল ফেরেশতা) বোঝানো হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাসসিরের মতে এ সেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ রূহ', যার থেকে অসংখ্য রূহের নির্গমন হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. অর্থাৎ তাঁর দরবারে যে ব্যক্তি কথা বলবে, তাঁর অনুমতিক্রমেই বলবে এবং কথাও বলবে তা-ই, যা সত্য ও সঙ্গত হবে। যেমন: কোন অযোগ্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে না। আর সুপারিশের যোগ্য তারাই, যারা দুনিয়াতে সকল কথার চেয়ে অধিক সত্য ও সঠিক কথা অর্থাৎ কলেমায়ে لا إله إلا الله বলেছিল।

৩. অর্থাৎ সে দিনের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করবে তার উচিত, সেই দিনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখা।

৪. অর্থাৎ ভাল-মন্দ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আমল সম্মুখে থাকবে।

৫. অর্থাৎ মাটিই থাকতাম, মানুষ না হতাম। কেননা, মানুষ হওয়ার কারণেই তো এই হিসাব-কিতাবের মুসীবতে পড়তে হয়েছে।

সূরা নাযিআ'ত

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৭৯ । ৪৬ আয়াত । ২ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٤٦، رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝

১. কসম ফেরেশতাদের, যারা কঠোরভাবে টেনে-হেঁচড়ে বের করে[১]!

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝

২. এবং তাদের, যারা (মুমিনদের প্রাণ) কোমলভাবে বের করে আনে[২]!

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝

৩. এবং তাদের, যারা দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে যায়,

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝

৪. তারপর তীব্রবেগে অগ্রসর হয়[৩],

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝

৫. অনন্তর নির্দেশ বাস্তবায়ন করে[৪]–

---

১. অর্থাৎ সেই সকল ফেরেশতার শপথ! যাঁরা কাফেরের রগসমূহে ঢুকে ওর আত্মাকে কঠোরভাবে টেনে-হেঁচড়ে বের করেন।

২. অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ মুমিনের শরীর থেকে আত্মার বন্ধন খুলে দেন। অতঃপর সেই পবিত্রাত্মা নিজ খুশিতে পবিত্র জগতের দিকে দৌড়ায়, যেমন কারও বন্ধন খুলে দিলে সে স্বাধীনভাবে ছুটতে থাকে।

কিন্তু স্মর্তব্য যে, এ কথা রূহ বা আত্মাসম্পর্কিত, শরীর সম্পর্কে নয়। পুণ্যাত্মা (শরীর থেকে বের হয়ে) পবিত্র জগতের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, আর পাপাত্মা (তা থেকে) পালিয়ে থাকতে চায়। ফলে তাকে টেনে বের করা হয়।

৩. অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা রূহ বা আত্মাকে নিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে আকাশের দিকে এমন দ্রুতবেগে ও সহজ-স্বাভাবিকভাবে ছোটেন, যেন পানির উপর অবাধে সাঁতার কাটছেন। অতঃপর সেই রূহগুলির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার যে হুকুম হয়, তা পালনার্থে তাঁরা দ্রুতবেগে দৌড়ে সম্মুখে অগ্রসর হন।

৪. অর্থাৎ সেই রূহগুলি সম্পর্কে ছওয়াব বা শাস্তির যে হুকুমই হোক, প্রত্যেকটিরই ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন তাঁরা করে থাকেন। অথবা এ দ্বারা ঐ সমস্ত ফেরেশতা উদ্দেশ্য, যাঁরা জড়জগতের ব্যবস্থাপনা ও তদবীরের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই অগ্রগণ্য।

النازعات ও الناشطات প্রভৃতি শব্দগুলো দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের বহু মত রয়েছে। আমরা এখানে বিজ্ঞ মুতারজিম (শাইখুল হিন্দ র.) এর অবলম্বনকৃত মতানুসারে ব্যাখ্যা করেছি।

৬. (কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে), যেদিন প্রকম্পনকারী প্রকম্পিত করবে[১]।	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦
৭. তার পশ্চাতে আসবে পিছনে আগমনকারী[২]।	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧
৮. সেদিন বহু হৃদয় কম্পমান হবে।	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨
৯. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত[৩]।	اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩
১০. কাফেররা বলে, আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই?	يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ۝١٠
১১. 'আমরা যখন জীর্ণ হাড়-গোড় হয়ে যাব (তখনও কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসব)?'	ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١
১২. ওরা বলে, 'তাহলে তো তা হবে সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন[৪]!'	قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢
১৩. তা তো এক মহা গর্জনমাত্র!	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

---

১. অর্থাৎ প্রথমবারের শিঙ্গার ফুঁকে পৃথিবীতে প্রকম্পন আসবে (অর্থাৎ পৃথিবী প্রকম্পিত হবে)।

২. হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ অনবরত (একের পর এক) ভূমিকম্প হতে থাকবে।' কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে رادفة দ্বারা শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার উদ্দেশ্য। والله أعلم

৩. অর্থাৎ ভয়-বিহ্বলতায় ঘাবড়ে যাওয়ার ফলে তাদের অন্তর কাঁপতে থাকবে এবং অপমান ও অনুশোচনায় তাদের চোখ অবনত হয়ে থাকবে।

৪. অর্থাৎ কবরের গর্তে পৌঁছে আমরা কি আবার পুনর্জীবনের দিকে ফিরে যাব? আমরা তো বুঝি না, কী করে শুকনা হাড়গুলির মধ্যে পুনর্বার প্রাণ সঞ্চার করা হবে। এমনটি হলে তো তা আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতি ও সর্বনাশের ব্যাপার হবে। কেননা, আমরা সেই জীবনের জন্য কোন প্রস্তুতি ও পাথেয় অবলম্বন করিনি।

এ কথা ওরা উপহাস করে বলত। অর্থাৎ ওরা ভাবত, মুসলমানরা আমাদের সম্বন্ধে এরূপ মনে করে, অথচ মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবন লাভ করার কোন বিষয়ই নেই– ক্ষতি ও লোকসান তো পরের কথা।

১৪. ফলে তৎক্ষণাৎ ওরা খোলা ময়দানে হাযির হবে[১]।	فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝
১৫. আপনার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে[২]?	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ۝
১৬. যখন তাঁর রব পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'য়[৩] তাঁকে ডেকে বলেছিলেন–	إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
১৭. 'তুমি ফেরাওনের নিকট যাও, সে তো চরম অবাধ্য হয়ে গেছে।'	اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى ۝
১৮. এবং বল, 'তোমার কি এই আগ্রহ আছে যে, তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে যাও–	فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰٓى أَنْ تَزَكّٰى ۝
১৯. 'এবং আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথপ্রদর্শন করি, ফলে তুমি (তাঁকে) ভয় কর[৪]?	وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝

১. অর্থাৎ এই লোকেরা পুনর্জীবনকে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার মনে করছে। অথচ আল্লাহ তাআলার নিকট এ সকল কাজ নিমেষের ব্যাপার। একটিমাত্র হুংকার বা শিঙ্গার ফুৎকার হলেই মুহূর্তের মধ্যে পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলকে হাশরের মাঠে দেখা যাবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

সামনে নমুনারূপে ছোট্ট একটি ধমক ও মামুলি হুংকারের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা দুনিয়াতে একজন অতি বড় অহংকারীকে দেওয়া হয়েছিল। অথবা বলা যায় যে, এই অস্বীকারকারীদের শোনানো হচ্ছে, এদের পূর্বে বড় বড় অমান্যকারীর কী পরিণতি হয়েছিল।

২. এ কাহিনী কয়েক স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ 'তূর' পাহাড়ের নিকট।

৪. অর্থাৎ তুমি যদি নিজেকে শোধরানোর ইচ্ছা কর, তবে আমি আল্লাহ তাআলার হুকুমে সংশোধন করতে পারি এবং এমন পথ দেখাতে পারি, যা অনুসরণ করলে তোমার অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সম্বন্ধে কামেল মারেফত পয়দা হবে। উল্লেখ্য, কামেল মারেফত ছাড়া আল্লাহ-ভীতি সম্ভব নয়।

এতে জানা গেল, হযরত মূসা (আ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য শুধু বনী ইসরাঈলকে দাসত্বমুক্ত করাই ছিল না; বরং ফেরাওনকে সংশোধন করার চেষ্টাও (বড়) উদ্দেশ্য ছিল।

২০. অতঃপর তিনি ওকে বিরাট নিদর্শন দেখালেন[১]।	فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. কিন্তু সে অস্বীকার করল ও অমান্য করল।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর চেষ্টা-তদবীর করার জন্য ফিরে গেল[২]।	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾
২৩. তারপর (সকলকে) একত্র করল এবং ঘোষণা দিল–	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾
২৪. বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোপরি রব[৩]।'	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾
২৫. অতএব আল্লাহ ওকে পাকড়াও করলেন আখেরাত ও দুনিয়ার শাস্তিতে[৪]।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾
২৬. নিশ্চয় এতে তার জন্য উপদেশ রয়েছে, যে (আল্লাহকে) ভয় করে[৫]।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

১. অর্থাৎ সেখানে পৌঁছে তিনি আল্লাহ তাআলার পয়গাম পৌঁছালেন এবং ফেরাওনের সম্মুখে 'আল্লাহর হুজ্জত' পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বড় মুজেযা হিসাবে তাঁর লাঠি অজগর হওয়ার ঘটনা প্রদর্শন করলেন।

২. অর্থাৎ সেই অভিশপ্ত লোকটা তো মানার ছিল না। তাই সে লোকদের একত্রিত করার ও যাদুকরদের তালাশ করে নিয়ে আসার ফিকিরে লেগে গেল, যাতে ওরা মূসা (আ)-এর মুজেযার মোকাবেলা করতে পারে।

৩. অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় প্রভু তো আমি। এই মূসা আবার কার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছে?

৪. অর্থাৎ এখানে (পৃথিবীতে) পানিতে ডুবেছে, আর সেখানে (আখেরাতে) আগুনে জ্বলবে।

৫. অর্থাৎ এ কাহিনীর মধ্যে চিন্তা করার ও শিক্ষা গ্রহণ করার বহু বিষয় রয়েছে। তবে শর্ত এই যে, মানুষের অন্তরে কিছু না কিছু আল্লাহ-ভীতি থাকতে হবে।

পূর্বা-পর সম্পর্ক

মূসা (আ) ও ফেরাওনের কাহিনী মাঝখানে প্রসঙ্গত এসে গিয়েছিল। সামনে পুনরায় আসল আলোচ্য বিষয় কিয়ামত সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

[রুকূ - ২]

২৭. তোমাদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আকাশ (সৃষ্টি করা)[১]? তা তিনি সৃষ্টি করেছেন।	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا ۝
২৮. তিনি তা সুউচ্চে স্থাপন করেছেন, অনন্তর তা বিন্যস্ত করেছেন।	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝
২৯. আর তার রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন তার সূর্যালোক[২]।	وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝
৩০. তার পর পৃথিবী বিছিয়ে দিয়েছেন[৩]।	وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝
৩১. তিনি পৃথিবী থেকে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন[৪]	اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۝
৩২. এবং পাহাড়-পর্বত মজবুতভাবে স্থাপন করেছেন[৫]–	وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۝

১. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করা (আর তাও একবার সৃষ্টি করার পর)–আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন তো নয়। যখন আল্লাহকে এত বড় বড় জিনিসের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার কর, তখন তিনি তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করবেন- এ ব্যাপারে দ্বিধা কেন?

২. অর্থাৎ আসমানের বিষয় চিন্তা করে দেখ: তা কত উঁচু, কত মজবুত, কীরূপ স্বচ্ছ ও সমতল এবং বিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল। কী বিরাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়মের অধীনে এই আকাশে সূর্যের উদয়-অস্তের দ্বারা রাত ও দিনের ধারা কায়েম করা হয়েছে। রাতের আঁধারে আকাশের দৃশ্য এক রকম, আবার দিনের উজ্জ্বল আলোতে আরেক রকম।

৩. আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন্‌টিকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে– এ সম্বন্ধে পূর্বে (সম্ভবত সূরা فصلت এর মধ্যে) আলোচনা করা হয়েছে।

বি. দ্র. دحی শব্দটির অর্থ ইমাম রাগেব (র) লিখেছেন- কোন বস্তুকে ওর (جائے قرار) বা অবস্থানস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়া। তা হলে পৃথিবী আসলে কোন বৃহৎ সৌরমণ্ডলের অংশ বিশেষ ছিল এবং পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে বর্তমান কালের যে ধারণা— সম্ভবত এ শব্দের মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। والله أعلَم

৪. অর্থাৎ সাগর-মহাসাগর ও নদী-নালা প্রবাহিত করেছেন। অতঃপর পানি দ্বারা তৃণলতা (উদ্ভিদজগত) পয়দা করেছেন (অর্থাৎ পৃথিবীকে সুজলা-সুফলা, শস্যশ্যামলা করেছেন)।

৫. যা স্বস্থান থেকে নড়ে-চড়ে না এবং পৃথিবীকে (কিছু) বিশেষ ধরনের ঝাঁকুনি ও কম্পন থেকে রক্ষা করে থাকে।

৩৩. তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর উপকারের জন্য[১]।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

৩৪. তো, যখন আসবে সেই মহাপ্রলয়!

فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۝

৩৫. যেদিন মানুষ স্মরণ করবে- সে যা কিছু কামাই করেছে।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۝

৩৬. এবং দোযখকে (প্রত্যেক) দর্শকের সামনে প্রকাশ করে দেওয়া হবে[২]–

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۝

৩৭. তখন, যে অবাধ্যতা করেছে

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۝

৩৮. এবং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে[৩],

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৩৯. দোযখই হবে ওর ঠিকানা।

فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

৪০. আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে,

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۝

৪১. জান্নাতই হবে তার ঠিকানা[৪]।

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ۝

---

১. অর্থাৎ এসব ব্যবস্থাপন না হলে তোমাদের ও তোমাদের পশুপালের কী করে চলত? তোমাদের প্রয়োজন পূরণ ও আরামের উদ্দেশ্যেই এসব জিনিসের সৃষ্টি। তোমাদের উচিত ছিল, সেই প্রকৃত অনুগ্রহকারী ও দাতার শোকর আদায় করে চলা। সেই সাথে এও উপলব্ধি করা উচিত যে, সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী ও প্রকৃতই প্রজ্ঞাবান যে সত্তা এরূপ বিরাট বিরাট ব্যবস্থা করেছেন, তিনি কি তোমাদের পঁচে-গলে যাওয়া হাড়গুলোর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেন না? (অবশ্যই), সুতরাং মানুষের জন্য জরুরী, তাঁর কুদরতের কথা স্বীকার করা এবং তাঁর নেয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতায় রত হওয়া। নতুবা যখন সেই মহাঘটনা 'কিয়ামত' সমাগত হবে এবং সকল কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, তখন দারুণ অনুশোচনা করতে হবে।

২. অর্থাৎ দোযখকে সর্বসমক্ষে এভাবে আনা হবে যে, প্রত্যেক দর্শক তা দেখতে পারবে– মাঝখানে কোন দেয়াল বা পাহাড় প্রতিবন্ধকরূপে থাকবে না।

৩. অর্থাৎ দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে, শ্রেয় মনে করে তাকে অবলম্বন করেছে এবং আখেরাতকে ভুলে থেকেছে।

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ কথা চিন্তা করে ভয় করেছে যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে এবং এই ভয়েই নিজ নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলেনি,

৪২. ওরা আপনার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, 'তা কখন সংঘটিত হবে?'[1]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا

৪৩. তার (সময়ের) আলোচনার সাথে আপনার কী সম্পর্ক?

فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا

৪৪. তার চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার রবের কাছেই[2]।

اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا

৪৫. আপনি তো কেবল তার জন্য সতর্ককারী, যে তার ভয় রাখে[3]।

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا

৪৬. যেদিন ওরা তা দেখবে, ওদের মনে হবে– ওরা যেন দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করেছে[4]।

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا

বরং তাকে সংযত করে নিজের বশে রেখেছে এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত রয়েছে– তার বাসস্থান বেহেশত ছাড়া আর কোথাও নয়।

১. অর্থাৎ সেই মুহূর্তটি কখন আসবে এবং কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

২. অর্থাৎ কিয়ামতের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করে বলা আপনার কাজ নয়। যতই প্রশ্ন-উত্তর করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই উপর ন্যস্ত করতে হবে। হযরত শাহ (আ: কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'জিজ্ঞাসা করতে করতে তাঁরই শরণাপন্ন হতে হবে, তিনি ব্যতিরেকে সবাই এ সম্পর্কে বেখবর।'

৩. অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে কিয়ামতের (সত্যতার) খবর শুনিয়ে লোকদের সতর্ক করে দেওয়া। এখন যার অন্তরে নিজের পরিণাম সম্পর্কে কিছু ভয় থাকবে অথবা আখেরাতের ভয় থাকবে, সে শুনে ভীত হবে এবং ভীত হয়ে প্রস্তুতি নেবে।

সুতরাং ফলাফলের দিক থেকে আপনার সতর্কীকরণ কেবল তাদের জন্যই, যারা এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। নতুবা অযোগ্য ব্যক্তিরা তো পরিণাম সম্পর্কে গাফেল থেকে এসব বাজে তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই পড়ে রয়েছে যে, কিয়ামত কোন্ তারিখে, কোন্ দিনে, কোন্ বছরে আসবে।

৪. অর্থাৎ এখন তো ওরা চিল্লাচিল্লি করছে যে, কিয়ামতের আগমনে দেরি কেন, তাড়াতাড়ি এসে পড়ে না কেন? কিন্তু তখন বুঝতে পারবে যে, খুব তাড়াতাড়িই এসেছে, মাঝখানে কোনই দেরি হয়নি।

সূরা আবাসা

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮০ । ৪২ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٤٢، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. [১]তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন–

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝١

২. কারণ, তাঁর নিকট অন্ধ লোকটি এসেছে[২]।

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢

১. শানে নুযূল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় কুরায়শ সর্দারকে ইসলাম সম্বন্ধে কিছু বুঝাচ্ছিলেন। তখন ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযি.) নামে এক অন্ধ মুসলিম হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক আয়াতটি বুঝলাম না; আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা শিখিয়েছেন তা থেকে কিছু শেখান।' এ অসময়ে তাঁর এ প্রশ্ন হযরতের নিকট বিরক্তিকর মনে হল। তিনি সম্ভবত ধারণা করে থাকবেন যে, তিনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন। কুরায়শ বংশীয় বড় বড় সর্দার যদি সঠিকভাবে বুঝে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে, তবে অনেক লোকের মুসলমান হয়ে যাওয়ার আশা। ইবনে উম্মে মাকতূম তো, যা হোক, মুসলমান। তার পক্ষে বোঝার ও তালীম হাসিল করার হাজারো সুযোগ রয়েছে। সে দেখছে না যে, আমার নিকট এমন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা বসে আছে যে, তাদের যদি হেদায়াত হয়ে যায় তবে হাজারো মানুষ হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে। আমি তাদের বোঝাচ্ছি আর সে তার নিজের কথাই বলছে– এতটুকু বুঝছে না যে, যদি তাদের দিক থেকে দৃষ্টি হটিয়ে তার প্রতি মনোযোগী হই, তবে তাদের নিকট কী রকম অসহনীয় হবে? এর পর হয়ত তারা আমার কথা শুনতেও পছন্দ করবে না।

মোটকথা, (এ রকম চিন্তা) করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরক্ত হলেন এবং তাঁর চেহারায় বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পেতে লাগল। এতে এই আয়াতগুলি নাযিল হল। (তাফসীরে তবারী ২৪/১০৩) রেওয়ায়াতে আছে, এরপর থেকে যখনই সেই অন্ধ ব্যক্তি হুযূরের দরবারে আসতেন, তিনি তাকে খুবই সম্মান ও সমাদর করতেন এবং বলতেন– مَرْحبا بمن عاتبني فيه ربّي (স্বাগতম তাঁকে, যাঁর জন্য আমার রব আমাকে ভর্ৎসনা করেছেন)। (তাফসীরে বাগাবী ৪/৪৪৬)

২. অর্থাৎ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন অন্ধ ব্যক্তির আগমনে ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অথচ তার অন্ধত্বের অপারগতা, অসহায় অবস্থা ও আন্তরিক পিপাসার কথা বিবেচনা করে তার প্রতি আরো বেশি মনোনিবেশ করা উচিত ছিল। হযরত

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىۙ

৩. আপনি কী জানেন, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হয়ে যেত?

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىؕ

৪. অথবা সে চিন্তা-ভাবনা করত, ফলে (আপনার) উপদেশ তার উপকারে আসত[১]।

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰىۙ

৫. আর যে ব্যক্তি পরোয়া করে না,

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰىؕ

৬. আপনি ওর চিন্তায় আছেন।

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰىؕ

৭. অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই[২]।

শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এ কালাম যেন অন্যদের সামনে রাসূলের ব্যাপারে অভিযোগ, (তাই তৃতীয় পুরুষ পদবাচ্যে আল্লাহ তাআলা তা উল্লেখ করেছেন)। সামনে স্বয়ং রাসূলকে সম্বোধন করেছেন।'

আর মুহাক্কিক মনীষীগণ বলেন, বক্তার চরম ভদ্রতা ও পরম শালীনতা এবং শ্রোতার অশেষ মর্যাদাহেতুই ভর্ৎসনার সময়েও আলোচ্য বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়নি। আর পরের আয়াতে সম্বোধনের রোখ হুযূরের দিকে ফেরানো হয়েছে। তার কারণ হল, যেন তাঁর প্রতি বিমুখতার সন্দেহ না হয়। তাছাড়া এতে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রথম বিষয় থেকে হালকা। والله أعلم

১. অর্থাৎ সেই অন্ধ ব্যক্তি খাঁটি সত্যসন্ধানী ছিল। আপনার তো জানা নেই, হয়তো আপনার সুদৃষ্টির বরকতে তার অবস্থার সংশোধন হয়ে যেত এবং তার নফস পরিশোধিত হত। অথবা আপনার কোন কথা কানে পড়ত, আর সে এখলাসের সাথে চিন্তা-ভাবনা করত এবং শেষ পর্যন্ত সেই কথা কোন সময় তার কাজে আসত।

২. অর্থাৎ যে সকল লোক নিজেদের বড়াই ও গৌরবের কারণে সত্যের পরোয়া করে না এবং ওদের অহংবোধ আল্লাহ ও রাসূলের সম্মুখে ওদের নত হতে অনুমতি দেয় না, আপনি ওদের পিছনে পড়ে আছেন, যাতে কোন রকমে ওরা মুসলমান হয়ে যায়। তাহলে ওদের ইসলাম গ্রহণের প্রভাব অন্যদের উপর পড়বে। অথচ এই দাম্ভিক অহংকারীরা আপনার হেদায়াত দ্বারা কেন সংশোধিত হল না, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আপনার উপর এমন কোনই অভিযোগ নেই। আপনার দায়িত্ব ছিল দাওয়াত দেওয়া ও পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। আপনি তা পালন করেছেন ও করছেন। ভবিষ্যতে এই উদ্ধত অহংকারীদের চিন্তায় আপনার এতটা মগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই, যার কারণে সত্যিকার পিপাসু ও খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তি আপনার সুদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, কিংবা আপনার ব্যবহারের বাহ্যিক দিক লক্ষ করত নির্বোধ লোকদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, পয়গম্বর সাহেবের দৃষ্টি ধনী ও বড়লোকদের

৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপনার নিকট ছুটে আসল,	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝
৯. আর সে ভয় করে[১]–	وَهُوَ يَخْشٰى ۝
১০. আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন[২]।	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝
১১. কখনই (তা সমীচীন) নয়। এ (কুরআন) তো উপদেশবাণী।	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝
১২. অতএব যার ইচ্ছা, সে তা পড়ুক*[৩]।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝
১৩. (তা লিপিবদ্ধ) এমন পত্রসমূহে, যা অত্যন্ত সম্মানিত,	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

প্রতিই বেশি, গরীব ও অসহায় লোকদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই। এমন নিরর্থক ধারণা প্রসার লাভ করলে ইসলামী দাওয়াতের কাজে যে ক্ষতির আশংকা, তা কতিপয় অহংকারী ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার ফলে অর্জিত লাভের তুলনায় অনেক বেশি।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। অথবা অর্থ হল, তার এই ভয় যে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কি না। তদুপরি সে অন্ধ, কেউ হাত ধরে নেওয়ার নেই। পথে কোথাও হোচট লাগার কিংবা কোন কিছুতে ধাক্কা খেয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা। অথবা এ চিন্তা করে সে ভীত যে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে চলেছে বলে শত্রুরা কষ্ট দিতে পারে।

২. অথচ এমন লোকদের থেকেই আশা করা যায় যে, হেদায়াতের দ্বারা উপকৃত হবে এবং ইসলামের কাজে আসবে। কথিত আছে যে, এই অন্ধ বুযুর্গ যুদ্ধের পোশাক পরে এবং হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। رضي الله تعالى عنه (তবাকাতে ইবনে সা'আদ ৪/৪২৬)

✯ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'স্মরণ রাখুক'।

৩. অর্থাৎ অহংকারী ধনীরা যদি কুরআন না পড়ে এবং এই নসীহতের প্রতি মনোযোগী না হয়, তবে ওরা নিজেদেরই অকল্যাণ করবে, ওদের এহেন আচরণে কুরআনের কোনই ক্ষতি নেই। আর ওদের পিছনে আপনারও এত বেশি লেগে থাকার দরকার নেই। পবিত্র কুরআন সকলের জন্য নসীহত। এখন যে ব্যক্তি নিজের ভালো চায়, সে তা পড়বে ও বোঝার চেষ্টা করবে।

১৪. উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট, অতি পবিত্র[১]। | مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ

১৫. এমন লিপিকারদের হাতে, | بِأَيْدِى سَفَرَةٍ

১৬. যারা অত্যন্ত মর্যাদাশালী, পুণ্যবান[২]। | كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ

১৭. ধ্বংস হোক মানুষ! সে কত অকৃতজ্ঞ[৩]! | قُتِلَ الْإِنسَٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ

১৮. কোন্ বস্তু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন? | مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ

১৯. একটি শুক্রবিন্দু থেকে[৪]। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে পরিমাপমত আকৃতি দান করেছেন[৫]। | مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ

---

১. অর্থাৎ এই অহংকারী গর্বিত লোকেরা মানলেই কি কুরআনের মূল্য ও মর্যাদা বেড়ে যাবে? (অর্থাৎ এদের মানা-না মানা দিয়ে কুরআনের কিছু যায় আসে না)। কুরআন তো সেই পবিত্র গ্রন্থ, যার আয়াতগুলি আকাশের উপর অত্যন্ত সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট, পাক-পবিত্র পত্রসমূহে লিখিত রয়েছে। আর পৃথিবীর বুকে খাঁটি ঈমানদাররাও তার পাতাগুলি অশেষ মান-মর্যাদা ও পাক-পবিত্রতার সঙ্গে উঁচু স্থানে রেখে থাকে।

২. অর্থাৎ সেখানে (উর্ধ্বজগতে) ফেরেশতাগণ তা লেখেন এবং সেই অনুসারেই ওহী অবতীর্ণ হয়। আর এখানেও (দুনিয়াতে) পত্রাবলিতে লিখন ও সংকলনের জন্য দুনিয়ার অনেক বুযুর্গ, পুণ্যাত্মা, নেককার ও ফেরেশতা চরিত্রের অধিকারী বান্দারা রয়েছেন, যারা (আল্লাহর তাওফীকে) সর্বপ্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে তাকে পবিত্র রেখেছেন।

৩. অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ন্যায় মহা নে'য়ামতের কোন কদর করল না এবং আল্লাহ তাআলার হক কিছুই বুঝল না।

৪. অর্থাৎ নিজের সৃষ্টি-উপাদান সম্পর্কে যদি একটু চিন্তা করে দেখত যে, সে কী বস্তু থেকে পয়দা হয়েছে, (তবে সে বুঝতে পারত), একটি নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য শুক্রবিন্দু থেকে পয়দা হয়েছে, যার মধ্যে অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি, রূপ ও সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও বিবেক কিছুই ছিল না। সব কিছুই আল্লাহ তাআলা নিজ মেহেরবানীতে দান করেছেন। যার উৎস বা মূল ছিল এরূপ, তার জন্য কি এই বাগাড়ম্বর শোভা পায় যে, স্রষ্টা ও প্রকৃত দাতা এরূপ মহা মর্যাদার উপদেশবাণী (কুরআন) অবতরণ করবেন, আর এই নির্লজ্জ নিজের উৎস এবং মালিকের সকল নে'য়ামত ভুলে গিয়ে তার কোনই পরোয়া করবে না? ওহে অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম! তোর একটুখানি লজ্জা করা উচিত ছিল।

৫. অর্থাৎ হাত, পা, প্রভৃতি সকল অঙ্গ ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি-সামর্থ্য এক বিশেষ পরিমাপে ও সমন্বয়ে গঠন করেছেন– কোন কিছুই সামঞ্জস্যহীন ও হেকমতবিহীনভাবে রেখে দেননি।

২০. অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন[১]। ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

২১. তারপর তার মৃত্যু ঘটিয়েছেন এবং তাকে কবরস্থ করেছেন[২]। ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

২২. অতঃপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনর্জীবিত করবেন[৩]। ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

২৩. কখনই না! তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, তা সে পূর্ণ করেনি[৪]। كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক[৫]– فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝

---

১. অর্থাৎ ঈমান ও কুফর এবং ভাল ও মন্দের জ্ঞান দান করেছেন। অথবা (অর্থ এই যে,) মায়ের গর্ভ থেকে আসানীর সাথে বের করেছেন।

২. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তার লাশকে কবরস্থ করার হেদায়াত দান করেছেন, যাতে জীবিতদের সামনে তার অসম্মান না হয়।

৩. অর্থাৎ যিনি একবার প্রাণ দান করলেন ও মৃত্যু দিলেন, তাঁরই এ ক্ষমতা রয়েছে যে, যখন ইচ্ছা দ্বিতীয়বার জীবিত করে কবর থেকে উত্থিত করবেন। কেননা, আল্লাহ ক্ষমা করুন, তাঁর ক্ষমতা তো কেউ কেড়ে নিয়ে যায়নি। (সুতরাং তিনি যখন ইচ্ছা পুনর্বার জীবন দান করবেন)।

যাহোক, পয়দা করে দুনিয়ায় আনয়ন করা, অতঃপর মৃত্যু দান করত আলমে বরযখে নিয়ে যাওয়া, আবার জীবিত করে হাশরের ময়দানে খাড়া করে দেওয়া– এসব কাজ যাঁর হাতে, তাঁর নসীহত (উপদেশবাণী) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও তা অমান্য করা এবং তাঁর নে'য়ামতাদি অবজ্ঞা করা কি কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায়?

৪. অর্থাৎ মানুষ কিছুতেই নিজ মালিকের হক চিনতে পারেনি এবং তার প্রতি যা কিছুর নির্দেশ হয়েছিল, সে এখন পর্যন্ত তা পালন করেনি।

বি. দ্র. ইমাম ইবনে কাছীর (র) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ অংশটি পূর্ববর্তী ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ এর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। সে অনুযায়ী মর্ম হবে, আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা তখন জীবিত করে ওঠাবেন। এখনই তা করা যাচ্ছে না। কারণ, দুনিয়ার জীবন সম্বন্ধে তাঁর যে সৃষ্টিগত ও তকদীরগত ফয়সালা রয়েছে, তা তিনি এখন পর্যন্ত সমাপ্ত করেননি।

৫. ইতিপূর্বে মানুষকে সৃষ্টিকরণ ও মৃত্যুদান সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। এখন তার পার্থিব জীবন ও জীবনধারণের উপায়-উপকরণের কথা স্মরণ করাচ্ছেন।

২৫. যে, আমি উপর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছি।	اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾
২৬. অতঃপর সুচারুরূপে ভূমি বিদীর্ণ করেছি[১]।	ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾
২৭. তারপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,	فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾
২৮. আঙ্গুর, তরি-তরকারি,	وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿۲۸﴾
২৯. যয়তুন, খেজুর,	وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿۲۹﴾
৩০. ঘন উদ্যানরাজি,	وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾
৩১. এবং ফল ও ঘাস–	وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿۳۱﴾
৩২. তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর উপকারের জন্য[২]।	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾
৩৩. তো, যখন এসে পড়বে সেই বিদীর্ণকারী গর্জন[৩],	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾
৩৪. যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে,	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾
৩৫. তার মাতা, তার পিতা থেকে,	وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾
৩৬. তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে–	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾

১. অর্থাৎ একটি ঘাসের পাতার কী শক্তি ছিল যে, তা মাটিকে বিদীর্ণ করে বাইরে নির্গত হবে? এ একমাত্র আল্লাহর কুদরত, যা মাটিকে বিদীর্ণ করে তা থেকে নানা রকম শস্য, ফল, সবজি, তরকারী ইত্যাদি উৎপন্ন করে থাকেন।

২. অর্থাৎ কতক জিনিস তোমাদের কাজে আসে, আর কতক তোমাদের জীব-জন্তুর উপকারে আসে।

৩. অর্থাৎ এমন বিকট শব্দ, যাতে কান ফেটে যাবে। এর দ্বারা শিঙ্গার ফুৎকার উদ্দেশ্য।

৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন অবস্থা হবে, যা তাকে (সবকিছু থেকে) বে-খেয়াল করে দেবে[১]।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝
৩৮. সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল,	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝
৩৯. হাস্যরত ও প্রফুল্ল[২]।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝
৪০. আর অনেক চেহারা সেদিন ধূলিধূসরিত হবে–	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝
৪১. সেগুলিকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা[৩]।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝
৪২. এরাই অস্বীকারকারী, পাপিষ্ঠ[৪]।	أُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

১. অর্থাৎ তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন একে অন্যের খবর নিবে না। বরং কেউ কারও নেকীসমূহ থেকে কিছু দিতে বলে কিনা, অথবা নিজের পাওনাসমূহের দাবি করে কিনা– এই আশঙ্কায় একে অপর থেকে পলায়ন করবে।

২. অর্থাৎ মুমিনদের চেহারা ঈমানের নূরে উজ্জ্বল এবং অতিশয় আনন্দে হাস্যপূর্ণ ও উৎফুল্ল থাকবে।

৩. অর্থাৎ কাফেরদের চেহারা কুফরের মলিনতায় আচ্ছন্ন থাকবে এবং চেহারার উপর ভেসে থাকা পাপাচারের ছাপ ও অন্ধকার চেহারাকে আরও মলিন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে।

৪. এই কাফের নির্লজ্জদের যতই বোঝানো হোক, ওরা একটুও মনোযোগ দেবে না। আল্লাহকেও ভয় করবে না, সৃষ্টির সম্মুখেও লজ্জিত হবে না।

সূরা তাকবীর

سُورَةُ التَّكْوِيرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮১ । ২৯ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٢٩، رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

১. যখন সূর্য(-রশ্মি) গুটিয়ে নেওয়া হবে[১],

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

২. যখন তারকারাজি আলোহীন হয়ে যাবে[২],

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

৩. যখন পাহাড়-পর্বত সঞ্চালিত করা হবে[৩],

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

৪. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলিকেও ছেড়ে দেওয়া হবে[৪],

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

৫. যখন বন্যপশুদের একত্র করা হবে[৫],

---

১. অর্থাৎ তার দীর্ঘ কিরণমালা, যা থেকে রোদ ছড়িয়ে পড়ে, গুটিয়ে ফেলা হবে এবং সূর্য আলোবিহীন হয়ে পনিরের গোলাকার চাকতির মত হয়ে যাবে। অথবা (মর্ম হল), সূর্যের অস্তিত্বই থাকবে না।

২. অর্থাৎ তারকারাজি ভেঙ্গে খসে পড়বে এবং তাদের আলো দূরীভূত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ বাতাসে উড়তে থাকবে।

৪. উট আরববাসীদের সর্বোত্তম সম্পদ, বিশেষত বাচ্চা দেওয়ার নিকটবর্তী দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দুধ ও বাচ্চা দেবে বলে খুবই প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু কিয়ামতের ভয়ঙ্কর প্রকম্পনের সময় এরূপ মূল্যবান ও প্রিয় সম্পদের কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। মালিকেরও হুঁশ থাকবে না এমন মূল্যবান সম্পদের খবর নেওয়ার।

তবে (আয়াতের তাফসীরে) এ কথা বলা যে, রেলগাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে উটনীরা অকেজো হয়ে যাবে– এ রসিকতা বৈ কিছু নয়।

৫. অর্থাৎ যে বন্যপশুগুলো মানুষের ছায়া দেখলেই পলায়ন করে থাকে, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে লোকালয়ে এসে ঢুকবে এবং গৃহপালিত জীব-জন্তুর সঙ্গে মিশে যাবে– অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীতিকর সময়ে যেমনটি দেখা যায়। কয়েক বছর আগের ঘটনা– গঙ্গা ও যমুনায় ভীষণ প্লাবন হয়েছিল। তখন লোকেরা দেখে কী– একটি খড়ের চাল ভেসে যাচ্ছে, আর তার উপর মানুষও রয়েছে এবং সাঁপ প্রভৃতি জীবও জড়িয়ে রয়েছে। একে অন্যকে আক্রমণ করছে না, সকলেরই 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' অবস্থা। নিজের চিন্তায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত। বরং (কখনো কখনো) তীব্র শীতের সময়ও কোন কোন হিংস্র জন্তু জঙ্গল থেকে বের হয়ে এসে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

৬. যখন সাগরসমূহ উত্তপ্ত করা হবে[১], — وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦

৭. যখন (একই প্রকৃতির) লোকদের পরস্পরের সাথে যুক্ত করা হবে[২], — وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧

৮. যখন জীবন্ত-প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে– — وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝٨

৯. কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল[৩]? — بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝٩

১০. এবং যখন আমলনামাগুলি খোলা হবে, — وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠

১১. যখন আকাশের ছাল খসানো হবে*[৪], — وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝١١

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসির حُشِرَتْ এর অর্থ করেছেন, 'মৃত্যু দান করা'; আর কেউ কেউ অর্থ করেছেন, মৃত্যু দানের পর পুনরুত্থান করা। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. অর্থাৎ সাগর-মহাসাগরের পানি গরম হয়ে ধোঁয়া ও আগুনে পরিণত হবে, যা তীব্র গরম হয়ে হাশরের মাঠে কাফেরদের শায়েস্তা করবে এবং ফুৎকার দিলে চুলার আগুনের ন্যায় দাউ দাউ করে লাফিয়ে উঠবে।

২. অর্থাৎ কাফেরকে কাফেরের সাথে এবং মুসলিমকে মুসলিমের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। তদ্রূপ প্রত্যেক ধরনের নেককার ও বদকারকে স্ব-স্ব প্রকৃতির নেককার ও বদকারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং আকীদা, আমল, চরিত্র প্রভৃতির ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। অথবা অর্থ এই যে, আত্মাগুলিকে নিজ নিজ শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে।

৩. আরবে প্রথা ছিল, পিতা নিজ কন্যাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে জীবন্ত-প্রোথিত করে ফেলত। কেউ কেউ দারিদ্র্য ও বিয়ে-শাদীর খরচাদির ভয়ে এ কাজ করত। আর কতক এ বিষয়টিকে লজ্জাস্কর মনে করত যে, কারো কাছে মেয়ে বিয়ে দিলে তাকে আমার জামাই বলা হবে! পবিত্র কুরআন অবহিত করল যে, সেই মজলুম শিশু-কন্যাদের সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হবে– কোন্ অপরাধে তাদের হত্যা করেছিল। আমাদের সন্তানাদি বলে আমাদের যা ইচ্ছা, তাই করব– এই মনে করলে চলবে না। বরং আপন সন্তান হওয়ার কারণে অপরাধ আরো বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

* **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যখন আকাশ সরিয়ে ফেলা হবে'।

৪. কোন জন্তু যবেহ করার পর চামড়া ছাড়িয়ে নিলে যেমন ভিতরকার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রগ-রেশা দেখা যায়, তদ্রূপ আকাশ খুলে গেলে তার উপরস্থিত জিনিসপত্রও দেখা যাবে এবং তখন মেঘমালার অবতরণ হবে, যার উল্লেখ রয়েছে ১৯তম পারার আয়াতে– يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ (যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে মেঘের কারণে –সূরা ফুরকান, ২৫)।

১২. যখন দোযখকে খুব করে প্রজ্বলিত করা হবে, | وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

১৩. এবং যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে[১]– | وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে, সে কী নিয়ে এসেছে[২]। | عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

১৫. আমি কসম করছি সেসব গ্রহের, যেগুলি (কখনো) পশ্চাদপসরণ করে, | فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

১৬. (কখনো) সোজা চলতে থাকে, (আবার কখনো) অদৃশ্য হয়ে যায়[৩], | الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

১৭. এবং রাতের, যখন তা ছড়িয়ে পড়ে*[৪], | وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

১৮. এবং প্রভাতের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে**[৫], | وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

১. অর্থাৎ দোযখকে অত্যন্ত জোরেশোরে প্রজ্বলিত করা হবে। আর বেহেশতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে, যার সৌন্দর্য ও মনোরম দৃশ্য দেখে অবর্ণনীয় খুশী ও আনন্দ লাভ হবে।

২. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কী পুঁজি ও পাথেয় (নেক কাজ বা বদ কাজ) নিয়ে হাযির হয়েছে।

৩. কয়েকটি গ্রহ যথাঃ যুহাল [শনিগ্রহ], মুশতারি [বৃহস্পতিগ্রহ], মিররিখ [মঙ্গলগ্রহ], যোহরা [শুক্রগ্রহ], উতারেদ [বুধগ্রহ] এমনও রয়েছে, যেগুলি কখনো কখনো পশ্চিম থেকে পূর্বে গমন করে। এ হল গ্রহের সোজা গতিপথ। কখনো তারা চলতে চলতে থেমে গিয়ে পিছনে ফিরে, আবার কখনো সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে কয়েক দিন অদৃশ্য হয়ে থাকে।

✯ দ্বিতীয় তরজমা– 'যখন তার অবসান ঘটে'।

৪. অথবা অর্থ হল, যখন তার অবসান হয়। এ শব্দটির উভয় অর্থ হয়– ছড়িয়ে পড়া, অবসান হওয়া।

✯✯ দ্বিতীয় তরজমা– 'যখন তার আবির্ভাব হয়।'

৫. হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন, 'এস্থলে যেন সূর্যকে সমুদ্রে সাঁতারু মাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এর আলোর বিচ্ছুরণকে মাছের নিঃশ্বাসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মাছ যেমন পানির নীচে দৃষ্টির অন্তরালে বিচরণ করে এবং তার নিঃশ্বাস নেওয়ার কারণে পানি বিচ্ছুরিত হয় ও তাতে বুদবুদ ওঠে, উদয় ও আলো বিচ্ছুরণের পূর্বে

১৯. নিশ্চয় এ কুরআন একজন মর্যাদাবান প্রেরিতর (অর্থাৎ ফেরেশতার আনীত) বাণী,

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

সূর্যেরও তদ্রূপ অবস্থা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ভোরের নিঃশ্বাস বলতে রূপক অর্থে ওই মৃদুমন্দ বায়ুকে বোঝানো হয়েছে, যা বসন্তকালে ভোরের নিকটবর্তী সময়ে প্রবাহিত হয়।

বি. দ্র.

পরবর্তী বিষয়ের সাথে উক্ত শপথসমূহের যোগসূত্র এই যে, এ নক্ষত্রগুলির গতি, স্থিতি, প্রত্যাবর্তন করা ও অদৃশ্য হয়ে যাওয়া– এসব হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি বারবার ওহীর আগমন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার নিদর্শন বিদ্যমান থাকা, অতঃপর ওহী আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে এক সময় তার নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি নমুনা। আর রাতের আগমন হচ্ছে সেই অন্ধকার সময়কালের নমুনা, যা সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভজন্মের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিল– যখন কোন মানুষের সামনে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না এবং ওহীর আলো ও সুফল-প্রভাব একেবারে মুছে গিয়েছিল। অতঃপর সুবহে সাদেকের নিঃশ্বাস ফেলা বা আগমনের নমুনা হল, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আবির্ভাব ও পবিত্র কুরআনের অবতরণ– যা আপন হেদায়াতের নূর ও আলোতে সবকিছুকে দিবালোকের মত উজ্জ্বল করে দিয়েছে। যেন পূর্ববর্তী নবীদের নূর বা আলো ছিল নক্ষত্রসমূহের ন্যায়, আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ও কুরআন অবতরণের এই মহানূর হচ্ছে উজ্জ্বল দীপ্তিমান সূর্য। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন–

فإنه شمسُ فضلٍ هُم كواكبها ÷ يظهرن أنوارها للناس في الظلم

حتّى إذا طلعتْ في الكون عم هداها ÷ للعالَمين واحييت سائر الأُمم

('তিনি হলেন মহা মর্যাদাশালী সূর্য, আর তাঁরা হলেন সেই সূর্যের তারকারাজি– যে তারকারাজি মানবজাতিকে অন্ধকারে তাদের আলো দান করে। পরে যখন জগতে সূর্য উদয় হল, তখন সমগ্র জগতে তার আলো ছড়িয়ে পড়ল এবং সমগ্র মানবজাতি জীবিত হয়ে উঠল।')

আর কোন কোন আলেম বলেছেন, নক্ষত্রগুলির সোজাসুজি চলন, প্রত্যাবর্তন ও অস্তগমন হচ্ছে ফেরেশতাদের আগমন, প্রত্যাবর্তন এবং ফেরেশতা-জগতে গিয়ে তাঁদের গুপ্ত হয়ে যাওয়ার উদাহরণ। আর রাতের গমন ও প্রভাতের আগমন হচ্ছে কুরআনের বদৌলতে কুফরের অন্ধকার বিদূরিত হওয়া এবং হেদায়াতের নূরের পূর্ণরূপে প্রকাশ পাওয়ারই দৃষ্টান্ত। এ ব্যাখ্যা অনুসারে যার শপথ করা হয়েছে তার সাথে শপথের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য অধিকতর স্পষ্ট মনে হয়। والله أعلم

২০. যিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ

২১. (সকলের) মান্যবর, সেখানে (উর্ধ্বজগতে) বিশ্বাসভাজন[১]। مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ؕ

২২. আর তোমাদের সঙ্গী মোটেই উন্মাদ নন[২]। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۚ

---

১. **জীবরাঈল (আ)-এর গুণাবলি**

এটি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর গুণাবলির বর্ণনা। অর্থাৎ যে পবিত্র কুরআন আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে, তাতে দুটি মাধ্যম রয়েছে– একজন ওহীবাহক ফেরেশতা (জিবরাঈল আলাইহিস সালাম), আর দ্বিতীয়জন পয়গম্বরে আরবী (হযরত মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উভয়েরই গুণাবলি এমন, যেগুলি অবগত হওয়ার পর কুরআনের সত্যতা এবং তা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এ সম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা-সন্দেহ থাকে না। কোন বর্ণনার বিশুদ্ধতা স্বীকার করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের বর্ণনাকারী তিনিই, যিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ, সংরক্ষণকারী, স্মৃতিধর এবং আমানতদার। এবং যার নিকট থেকে তিনি বর্ণনা করেন, তাঁর দৃষ্টিতে তিনি সম্মানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। তদুপুরি বড় বড় বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাঁর বিশ্বস্ততা প্রভৃতির উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখেন এবং সেই জন্যই তাঁর কথা প্রশ্নাতীতভাবে মেনে থাকেন।

এ সমস্ত গুণাবলিই জিবরাঈলের মধ্যে বর্তমান। তিনি 'কারীম' (মর্যাদাবান), আর এর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী ও পবিত্র হওয়া জরুরী– (কারণ, কুরআন মাজীদে আছে)– إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী।)। আর হাদীছে (তিরমিযী : ৩৫৫৫) রয়েছে– الكرم التقوى (তাকওয়াই মর্যাদা)

তিনি 'অত্যন্ত শক্তিশালী'– এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, স্মৃতিশক্তি, সংরক্ষণ শক্তি ও বর্ণনার শক্তিও পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। (عند ذي العرش...) আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর বিরাট মর্যাদা রয়েছে। প্রভুর দরবারে সকল ফেরেশতার চেয়ে তাঁর বেশি নৈকট্য ও সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। (مطاع...) আকাশসমূহের ফেরেশতারা তাঁর কথা মানেন এবং তাঁর হুকুম পালন করেন। কেননা, তাঁর 'আমীন' তথা বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কারও সন্দেহ নেই।

এ তো হল 'ফেরেশতা দূত' (رسول ملكي) এর অবস্থা, সামনে 'মানুষ দূত' (رسول بشري) এর অবস্থা শুনুন।

২. নবুওয়াতের পূর্বে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি তোমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তোমরা তাঁর সঙ্গে ছিলে। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা সম্বন্ধে তোমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে, প্রবঞ্চনা বা পাগলামি করতে দেখনি। বরং

২৩. তিনি তো ঐ ফেরেশতাকে আকাশের প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন[১]।	وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ﴿٢٣﴾
২৪. এবং তিনি গায়বের বিষয়ে কৃপণ নন[২]।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ﴿٢٤﴾
২৫. আর তা (অর্থাৎ কুরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়[৩]।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ﴿٢٥﴾
২৬. অতএব তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ[৪]?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ؕ﴿٢٦﴾

সর্বদা তোমরা তাঁর সততা ও আমানতদারী, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কথা স্বীকার করে এসেছ। এখন বিনা কারণে তাঁকে মিথ্যাবাদী বা পাগল কী করে বলতে পার? তিনি কি তোমাদের সেই সহচর নন, তিল তিল করে যাঁর সকল অবস্থার অভিজ্ঞতা তোমাদের পূর্ব থেকে রয়েছে? এখন তাঁকে পাগল বলা (তোমাদের) পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

১. অর্থাৎ পূর্ব দিগন্তে তাঁর আসল আকৃতিতে পরিষ্কার দেখেছেন। এজন্য এ কথাও বলতে পার না যে, হতে পারে- দেখায় বা চেনায় কিছুটা সংশয় বা অস্পষ্টতা হয়ে থাকবে। যাকে ফেরেশতা মনে করেছেন, আসলে হয়তো তিনি ফেরেশতা ছিলেন না। ইতিপূর্বে সূরা নাজমে এসেছে– فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ([একদা] তিনি [স্বীয় আসনে] সমাসীন হলেন, আর তখন তিনি ছিলেন উর্ধ্বদিগন্তে।)

২. অর্থাৎ এই পয়গম্বর সব ধরনের গায়বের (অদৃশ্য বিষয়ের) খবর দিয়ে থাকেন। তা অতীত সম্পর্কে হোক বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, আল্লাহর আসমায়ে হুসনা ও গুণাবলি সম্পর্কে হোক, অথবা শরী'য়তের আহকাম সম্পর্কে, বিভিন্ন ধর্মের হাকীকত-তত্ত্ব বা অসারতা সম্পর্কে হোক অথবা বেহেশত ও দোযখের অবস্থাদি সম্পর্কে, অথবা মৃত্যুপরবর্তী ঘটনাবলি সম্পর্কে । আর এসব বিষয় বলতে তিনি কিছুমাত্র কৃপণতা করেন না, পারিশ্রমিকও চান না– নযরানাও না, বখশিশও না। তাহলে তাঁকে গণক উপাধি দেওয়া কেমন করে শোভন হতে পারে? গণক তো গায়বের খণ্ডিত ও অপূর্ণ একটি কথাকে শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে বলে থাকে। আর তা বলার ক্ষেত্রেও এত কৃপণ যে, মিঠাই বা নযরানা ইত্যাদি আদায় করা ছাড়া একটি হরফও মুখ থেকে বের করে না। নবী-রাসূলগণের সুমহান চরিত্রের সঙ্গে গণকদের অবস্থার কী সম্পর্ক?

৩. আচ্ছা, শয়তান এমন নেককাজ ও পরহেজগারীর বিষয়াদি কেন শিক্ষা দিতে যাবে, যাতে আছে আদম সন্তানের কল্যাণ এবং খোদ অভিশপ্ত শয়তানের দোষ ও নিন্দার উল্লেখ?

৪. অর্থাৎ যখন মিথ্যা, পাগলামি, কল্পনা-জল্পনা, গণক-ঠাকুরি প্রভৃতি সকল সম্ভাবনা রহিত হয়ে গেল, তখন সত্য ও সততা ছাড়া আর কী থাকল? অতঃপর এই উজ্জ্বল ও পরিষ্কার রাস্তা ত্যাগ করে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলেছ কোথায়?

২৭. তা তো কেবল উপদেশ বিশ্ববাসীর জন্য[১]–	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۟
২৮. (বিশেষত) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য[২]।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۟
২৯. আর তোমরা তখনই চাইবে, যখন সমগ্র বিশ্বের মালিক আল্লাহ চাইবেন[৩]।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۟

---

১. কুরআন সম্বন্ধে তোমরা যেসব দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টি করে থাক, সেগুলো সবই ভ্রান্ত। যদি এর বিষয়াবলি ও উপদেশমালায় গভীরভাবে চিন্তা কর, তবে বিলক্ষণ বুঝতে পারবে যে, তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটি সত্য ও সঠিক নসীহতনামা এবং পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি ও জীবনাদর্শ। তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা এর সাথেই যুক্ত-জড়িত।

২. অর্থাৎ কুরআন বিশেষ করে তাদের জন্য হিতোপদেশ, যারা সঠিক ও সোজা পথে চলতে চায়, যারা হঠকারিতা ও বক্রতা অবলম্বন করে না। কেননা, এ ধরনের মানুষই উপদেশবাণীর দ্বারা উপকৃত হবে।

৩. অর্থাৎ পবিত্র কুরআন নিজে তো সকলের জন্যই হিতোপদেশ। তবে তার কার্যকারিতা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল– কতক মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা হয় এবং কতকের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন হেকমতের কারণে তাদের অযোগ্যতাবশত ইচ্ছা হয় না।

সূরা ইনফিতার

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮২ । ১৯ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ﴿۱﴾

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে,

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ﴿۲﴾

২. যখন তারকারাজি ঝরে পড়বে,

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ﴿۳﴾

৩. যখন সমুদ্রগুলিকে উদ্বেলিত করা হবে[১],

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ﴿۴﴾

৪. এবং যখন কবরসমূহ উলট-পালট করা হবে[২]–

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ؕ﴿۵﴾

৫. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে এসেছে[৩]।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ﴿۶﴾

৬. হে মানুষ! তোমাকে কোন্ জিনিস ধোঁকায় ফেলল তোমার দয়ালু রব সম্বন্ধে[৪]?

---

১. অর্থাৎ সমুদ্রের পানি স্থলভাগের উপরে এসে উঠবে। পরিশেষে মিঠা ও নোনা পানি সব একাকার হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ যে জিনিস মাটির তলে ছিল, তা উপরে এসে যাবে এবং মৃতরা কবর থেকে উত্থিত হবে।

৩. অর্থাৎ ভাল-মন্দ যেসব কাজ করেছিল, প্রথম জীবনে করেছিল বা শেষ জীবনে, সেই সবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পশ্চাতে রেখেছিল বা রাখেনি– সবই তখন সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ সেই দয়ালু রবের হক (প্রাপ্য) কি এই ছিল যে, তুমি নিজের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাহেতু তাঁর সহনশীলতায় বিভ্রান্ত হয়ে নাফরমানী করতে থাকবে? আর তাঁর দয়া ও মায়ার বিপরীতে অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করতে থাকবে? তাঁর দয়া দেখে তো আরও বেশি লজ্জিত হওয়া এবং সহনশীল খোদার ক্রোধ সম্বন্ধে অধিকতর ভীত হওয়া উচিত ছিল। সন্দেহ নেই তিনি দয়ালু, কিন্তু (সেই সাথে) তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়ও। সুতরাং তাঁর একটি গুণের প্রতি লক্ষ করে অন্যান্য গুণের ব্যাপারে চক্ষু বন্ধ করে থাকা প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা নয় তো আর কী?

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে যথোচিত অবয়ব দান করেছেন এবং তোমাকে করেছেন সুসম[১]।	الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۟
৮. যেই আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন, তোমাকে গঠন করেছেন[২]।	فِیْۤ اَیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۟
৯. আর কিছু নয়। আসলে তোমরা 'বিচার'কে অস্বীকার কর[৩]।	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّیْنِ ۟
১০. অথচ তোমাদের জন্য নিযুক্ত আছে তত্ত্বাবধায়কগণ–	وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۟
১১. যারা মর্যাদাশালী, (তোমাদের আমল) লিপিবদ্ধকারী।	كِرَامًا كَاتِبِیْنَ ۟
১২. তারা জানে যা কিছু তোমরা কর[৪]।	یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۟

---

১. হযরত শাহ (আঃকাদের) সাহেব (র) লেখেন– 'সঠিক অবয়ব দিয়েছেন শরীরে, আর ভারসাম্য দান করেছেন চরিত্রে।' অথবা অর্থ এই যে, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থি-বন্ধনসমূহ দুরুস্ত করেছেন এবং তাঁর হেকমত অনুযায়ী এদের মধ্যে পরিমিতি রক্ষা করেছেন। তদুপরি স্বভাব-প্রকৃতিতে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন।

২. অর্থাৎ সকলের আকার-আকৃতির মধ্যে কম-বেশি পার্থক্য রেখেছেন। প্রত্যেককে ভিন্ন আকার-আকৃতি ও রং-রূপ দান করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের আকৃতিকে সমগ্র প্রাণীকুলের আকৃতির চেয়ে উত্তম বানিয়েছেন।— আর পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী এই অর্থ করেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে গাধা, কুকুর বা শূকরের আকার-আকৃতি দিয়ে পয়দা করতে পারতেন। কিন্তু এ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কেবলই নিজ দয়াগুণে ও নিজ ইচ্ছায় মানুষের আকৃতি দান করেছেন।

যা হোক, যে খোদার ক্ষমতা এরূপ এবং যার এত অনুগ্রহ, তাঁর সঙ্গে কি মানুষের আচরণ অবাধ্যতাপূর্ণ হওয়া উচিত?

৩. অর্থাৎ বিভ্রান্ত হওয়ার ও ধোঁকায় পড়ার আর কোন কারণ নেই– আসল কথা হচ্ছে, তোমরা বিচার-দিবসেই বিশ্বাস রাখ না। তাই যা ইচ্ছা তাই করছ। (মনে করছ)– সামনে কোন হিসাব ও জওয়াবদিহিতা নেই। এখানে যা কিছু আমরা করছি, তা আবার কে লিখে রাখবে ও সংরক্ষণ করবে? ব্যস্, মরে গেলাম, তো সব কেচ্ছা খতম!

৪. তারা খেয়ানতও করে না। কোন আমল না লিখেও ছাড়ে না। তোমাদের কোন আমলও তাদের থেকে গোপন থাকতে পারে না। যখন সকল আমল এক এক করে এত যত্নসহ লেখা হচ্ছে, তখন এসব খাতা-পত্র এমনিই অযথা রেখে দেওয়া হবে? কখনই না। নিশ্চয়ই

১৩. নিশ্চয় পুণ্যবানেরা থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে[১]।	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ⑬
১৪. আর পাপীরা দোযখে।	وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ⑭
১৫. ওরা তাতে প্রবেশ করবে বিচার-দিবসে।	يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ⑮
১৬. অতঃপর ওরা সেখান থেকে অন্তর্হিত হতে পারবে না[২]।	وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ⑯
১৭. আর আপনি কি জানেন, বিচার-দিবস কী?	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ⑰
১৮. পুনরায় (বলছি), আপনি কি জানেন, বিচার-দিবস কী?	ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ⑱
১৯. যেদিন কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না[৩] এবং সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব হবে আল্লাহরই[৪]।	يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ⑲

প্রত্যেক ব্যক্তির আমল তার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে তার ভাল বা মন্দ আমলের ফল ভোগ করতে হবে। এর বিশদ বিবরণ সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

১. যেখানে অনন্তকাল সব রকমের নে'য়ামত ও আরাম-আয়েশের মধ্যে থাকবে। (জান্নাত থেকে কখনো) বহিষ্কৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে আরাম ও শান্তি কিসের?

২. অর্থাৎ পালিয়ে গিয়ে তা থেকে দূরে থাকতে পারবে না এবং প্রবেশ করার পর তা থেকে কখনো বেরও হতে পারবে না। চিরকাল সেখানেই থাকতে হবে।

৩. অর্থাৎ যত চিন্তা ও গবেষণা কর না কেন, সেই ভয়ঙ্কর দিনের পূর্ণরূপ বুঝে আসতে পারে না। তবে সংক্ষেপে এতটুকুই বুঝে নাও যে, সেদিন সব আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত বন্ধু-বান্ধব সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে– সকলে 'নাফসী, 'নাফসী' করতে থাকবে। কোন ব্যক্তি বিশ্বজগতের মালিকের অনুমতি ছাড়া কারও জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। বিনয়, ওযর-আপত্তি, তোষামোদ এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা কোনই কাজে আসবে না– إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (কিন্তু যার প্রতি আমার রব দয়া করেন।)

৪. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো প্রজাদের উপর বাদশাহর হুকুম, সন্তানসন্ততির উপর পিতামাতার হুকুম এবং চাকর-বাকরের উপর কর্তার হুকুম চলে, কিন্তু সেদিন এসব কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং একমাত্র সেই রাজাধিরাজ ছাড়া আর কারও কর্তৃত্বের অবকাশ থাকবে না– প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল দিক দিয়ে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহরই হুকুম ও কর্তৃত্ব চলবে এবং সকল বিষয় বাহ্যত ও কার্যত একমাত্র তাঁরই মুঠিতে থাকবে।

সূরা তাত্‌ফীফ

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮৩ । ৩৬ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٣٦، رُكُوْعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বড় দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝

২. যারা লোকদের থেকে মেপে নেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় নেয়।

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝

৩. আর যখন লোকদের মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়[১]।

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

৪. ওরা কি এ কথা চিন্তা করে না যে, ওদের পুনর্জীবিত করা হবে[২]—

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝

---

১. অন্য লোকদের থেকে নিজের পাওনা পূর্ণমাত্রায় নেওয়া নিন্দনীয় কিছু নয়। আর এখানে পূর্ণমাত্রায় নেওয়া নিন্দনীয়– এমনটি বলাও উদ্দেশ্য নয়– বরং উদ্দেশ্য হল, লোকদের কম দেওয়া যে নিন্দনীয় তা জোরদারভাবে উপস্থাপন করা– অর্থাৎ কম দেওয়া তো এমনিতেই নিন্দনীয়; সেই সাথে যদি নেওয়ার সময়ও অন্যদের বিবেচনা মোটেই না করা হয়, তবে আরও বেশি দূষণীয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মাপে কম দেয়, কিন্তু অন্যের কাছ থেকে নেওয়ার সময় অন্তত তার প্রতি বিবেচনা রাখে– তো তার মধ্যে একটি দোষ আছে, তবে তার মাঝে একটি গুণও অন্তত আছে– فتلك بتلك (দোষের বিপরীতে গুণ)। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তির মাঝে তো তা-ও নেই। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তির দোষই অধিক গুরুতর।

দ্বিতীয় আয়াতে শুধু اكتالوا- এর উল্লেখ কেন?

এখানে যেহেতু কম দেওয়ার দোষ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই 'কম দেওয়ার' নিন্দাবাদ করতে গিয়ে মাপ ও ওজন উভয়টির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, উভয়টির উল্লেখ হলে খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, (পাত্র ইত্যাদির দ্বারা) মেপে দিতেও কম মাপে এবং (পাল্লা-পাথর দিয়ে) ওজন করে দিতেও কম ওজন করে। এর বিপরীতে পুরাপুরি নেওয়াটা মোটেই দূষণীয় নয়, এজন্য সেক্ষেত্রে একটির অর্থাৎ 'মেপে নেওয়া'র কথা উল্লেখকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আর (ওজনের পরিবর্তে) মাপের কথা সম্ভবত এজন্য বলা হয়েছে যে, আরবে বিশেষত মদীনায় ওজনের তুলনায় মাপের প্রচলনই বেশি ছিল। এ ছাড়া অন্য আরও কারণ থাকতে পারে, যে জন্য শুধু মাপের কথা বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ ওদের যদি এই চিন্তা থাকত যে, মৃত্যুর পর একদিন পুনর্বার উঠতে হবে এবং আল্লাহর সামনে সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও দেনা-পাওনার হিসাব দিতে হবে, তবে কখনই এ আচরণ করত না।

৫. এক গুরুতর দিবসে,	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥
৬. যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের রবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে*[১]?	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦
৭. কখনই নয়[২]! নিশ্চয় পাপীদের আমলনামা আছে সিজ্জীনে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧
৮. আপনি কি জানেন, সিজ্জীন কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨
৯. এক লিখিত কিতাব[৩]।	كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩
১০. সেদিন বড় দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের,	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠
১১. যারা বিচার-দিবসকে অস্বীকার করে।	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** '... রবের সামনে দণ্ডায়মান হবে'।

১. (অর্থাৎ এই অপেক্ষায় থাকবে) যে, কখন তিনি তাজাল্লী ফরমাবেন এবং আমাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা শোনাবেন।

২. অর্থাৎ কিছুতেই যেন এ ধারণা না করা হয় যে, এমন দিন আসবে না। তা অবশ্যই আসবে এবং তার জন্য সকল নেককার ও বদকারের আমলনামা নিজ নিজ দফতরে সুশৃঙ্খলভাবে রাখা আছে।

৩. অর্থাৎ সিজ্জীন একটি দফতর, যার মধ্যে প্রত্যেক দোযখীর নাম লিখিত আছে। আর বান্দাদের আমল-লেখক ফেরেশতাগণ, পূর্ববর্তী সূরায় যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই বদকারদের মৃত্যুর ও আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তির আমল পৃথক পৃথক ফর্দের মধ্যে লিখে উক্ত দফতরে দাখিল করেন এবং উক্ত ফর্দের উপর অথবা প্রত্যেক দোযখীর নামের উপর একটি চিহ্ন তৈরি করে দেন– যা দেখামাত্রই জানা যাবে যে, এ ব্যক্তি দোযখী। আর কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় যে, কাফেরদের আত্মাসমূহও এ স্থানেই রাখা হয়। (তাফসীরে তবারী ২৪/১৯৩-১৯৪)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন– 'অর্থাৎ ওদের নাম যেখানে দাখিল হয়, মরে গিয়ে তারা সেখানেই পৌঁছবে।' পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এ স্থান সাত যমীনের নীচে অবস্থিত। والله تعالى أعلم

১২. বস্তুত তা সে-ই অস্বীকার করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপাচারী[১]।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ اَثِيۡمٍ ۙ﴿۱۲﴾

১৩. যখন ওর সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, সে বলে, 'এগুলি পূর্ববর্তীদের মনগড়া কথাবার্তা[২]।'

اِذَا تُتۡلٰى عَلَيۡهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيۡرُ الۡاَوَّلِيۡنَ ﴿ؕ۱۳﴾

১৪. কখনই না! বরং ওদের কৃতকর্মই ওদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে[৩]।

كَلَّا بَلۡ ٜ رَانَ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ مَّا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৫. (বিচার-দিবসকে অস্বীকার করা) কখনই (সঠিক) নয়। সেদিন ওরা আপন রব(-র দর্শন) থেকে বঞ্চিত হবে[৪]।

كَلَّاۤ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ ﴿ؕ۱۵﴾

---

১. যে ব্যক্তি কর্মফলের দিনকে অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রভুত্ব, তাঁর কুদরত এবং তাঁর ন্যায়বিচার ও হেকমত— সব কিছুই অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের অস্বীকারকারী হবে, সে পাপাচারে যতই দুঃসাহসী হোক না কেন– তা উক্ত কুফরের তুলনায় স্বল্পই।

২. অর্থাৎ কুরআন ও নসীহতের কথা শুনে বলে, এ ধরনের কথাবার্তা লোকেরা পূর্ব থেকে বলে আসছে। সেসব পুরাতন কাহিনী ও বিস্মৃত গল্প-উপাখ্যানই এরা নকল করছে। সুতরাং আমরা এ সকল বর্ণনা ও কাহিনীতে কী করে ভীত হতে পারি?

৩. অর্থাৎ আমার আয়াতসমূহে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আসল বিষয় এই যে, অবিরাম অতিশয় পাপাচারের ফলে ওদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। এ জন্য প্রকৃত সত্য ও তথ্য ওদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হয় না। হাদীছে (তিরমিযী : ৩৬২৪) আছে, যখন বান্দা কোন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তওবা করে নিল, তবে (দাগটি) মুছে গেল। নতুবা যতই গোনাহ করতে থাকবে, ততই সেই দাগটি বাড়তে ও ছড়াতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত হৃদয়-পটটি এমন কালো ও অন্ধকার হয়ে যায় যে, হক ও বাতিলের পার্থক্য তার বোধগম্য হয় না।

(সত্যকে) মিথ্যা জ্ঞানকারীদের অবস্থাও অনুরূপ– দুষ্কর্ম করতে করতে ওদের অন্তর একেবারে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এ জন্যই ওরা আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিদ্রূপ করে থাকে।

৪. অর্থাৎ এই অস্বীকৃতি ও মিথ্যা জ্ঞান করার পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তামুক্ত হয়ো না। সে সময় অবশ্যই আসবে, যখন মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন) লাভে সৌভাগ্যশালী হবে আর এই হতভাগা অস্বীকারকারীদের বঞ্চিত রাখা হবে।

১৬. অতঃপর ওরা অবশ্যই দোযখে প্রবেশ করবে।	ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِیۡمِ ؕ﴿۱۶﴾
১৭. তারপর বলা হবে, 'এ তা-ই, যা তোমরা অস্বীকার করতে।'	ثُمَّ یُقَالُ هٰذَا الَّذِیۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ﴿ؕ۱۷﴾
১৮. কখনই না[১]! নিশ্চয় পুণ্যবানদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে।	كَلَّاۤ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِیۡ عِلِّیِّیۡنَ ﴿ؕ۱۸﴾
১৯. আপনি কি জানেন, ইল্লিয়্যীন কী?	وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا عِلِّیُّوۡنَ ﴿ؕ۱۹﴾
২০. এক লিখিত কিতাব[২]–	كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ ﴿ۙ۲۰﴾
২১. যা অবলোকন করে* নৈকট্যপ্রাপ্তরা[৩]।	یَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿ؕ۲۱﴾
২২. নিশ্চয় পুণ্যবানেরা থাকবে নেয়ামতের মধ্যে।	اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِیۡ نَعِیۡمٍ ﴿ۙ۲۲﴾
২৩. তারা সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে দেখতে থাকবে[৪]।	عَلَی الۡاَرَآئِكِ یَنۡظُرُوۡنَ ﴿ۙ۲۳﴾
২৪. তুমি তাদের চেহারায় দেখতে পাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা[৫]।	تَعۡرِفُ فِیۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِیۡمِ ﴿ۚ۲۴﴾

১. অর্থাৎ এসব বদমাশ আর সৎকর্মশীলদের পরিণতি কস্মিনকালেও একরকম হতে পারে না।

২. যাতে বেহেশতীদের নাম লিখিত আছে এবং তাদের আমলের রেকর্ডপত্র সুশৃঙ্খলভাবে রাখা আছে। তাদের রূহগুলিকে প্রথমে সেখানে নিয়ে গিয়ে পুনরায় নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছানো হয়। আর কবরের সঙ্গেও রূহগুলির এক ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকে। বলা হয় যে, সেই স্থানটি সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। আর নৈকট্যপ্রাপ্তদের রূহগুলি সেই স্থানেই অবস্থান করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'যার কাছে উপস্থিত থাকে'।

৩. নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা আনন্দিত হয়ে মুমিনদের আমলনামা দেখেন এবং সেখানে উপস্থিত থাকেন।

৪. অর্থাৎ তারা পালঙ্কের উপর বসে থেকে বেহেশত পরিভ্রমন করতে থাকবেন এবং আল্লাহ তাআলার দীদারের দ্বারা চোখ শীতল করবেন।

৫. অর্থাৎ বেহেশতের আরাম-আয়েশের কারণে তাদের চেহারাগুলি উজ্জ্বল ও সজীব থাকবে। ফলে যে কোন দর্শক দেখামাত্র চিনতে পারবে যে, লোকগুলি অত্যন্ত আরাম-আয়েশ ও নেয়ামতের মধ্যে রয়েছে।

২৫. তাদের পান করানো হবে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়[১]—	يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝
২৬. যার মোহর মিস্‌কের[২]। আর এরই জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক[৩]।	خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۭ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝
২৭. আর তাতে মিশ্রিত থাকবে তাসনীমের (শরাব)।	وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝
২৮. তা একটি ঝরনা, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করে[৪]।	عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝
২৯. যারা অপরাধী, তারা ঈমানদারদের নিয়ে হাসা-হাসি করত[৫]।	اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝
৩০. আর যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত, তখন একে অপরকে চোখ টিপে ইশারা করত[৬]।	وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝

১. হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন– 'প্রত্যেকের ঘরে সুরার প্রস্রবন থাকবে; কিন্তু এই সুরা অতি দুর্লভ, যার মুখ মোহরযুক্ত হবে।'

২. দুনিয়াতে গালা বা মাটির দ্বারা মোহর করা হয়। জান্নাতের মাটি হল মেশ্‌ক (কস্তুরি)। তারই দ্বারা মোহর মারা হবে। ফলে পানপাত্র হাতে নেওয়ামাত্র মস্তিষ্ক সুগন্ধে মোহিত হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ দুনিয়ার নাপাক সুরার প্রতি ভাল মানুষের আকর্ষণ হতে পারে না। কিন্তু এ হচ্ছে পবিত্র সুরা, যার উপর মানুষের হুমড়ি খেয়ে পড়া উচিত এবং প্রতিযোগিতা করত একে অপর থেকে আগে বাড়ায় সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪. অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্তরা এই প্রস্রবনেরই খাঁটি শরাব পান করবেন, আর নেককারদের এই শরাবের মিশ্রন দেওয়া হবে, যা গোলাব ইত্যাদির মত তাদের শরাবের মধ্যে মেশানো হবে।

৫. (এই ভেবে) যে, এই বেকুবদের উপর বড় অসার ধারণা চেপে বসেছে। এরা বেহেশতের কল্পিত স্বাদ ও সুখের আশায় বাস্তব ও বর্তমান সুখভোগকে পরিত্যাগ করছে।

৬. এ ইশারা করত যে, দেখ– এই নির্বোধ ও আহমক লোকগুলিই বেহেশতের বাকী ও অনিশ্চিত নেয়ামতের আশায় দুনিয়ার নগদ পাওনা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছে।

৩১. যখন স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যেত, তখন ফিরত হাস্য-রস করতে করতে[১]।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝٣١

৩২. এবং যখন তাদের দেখত, তখন বলত, 'নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট[২]।'

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝٣٢

৩৩. অথচ ওদেরকে ঈমানদারদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে পাঠানো হয়নি[৩]।

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝٣٣

৩৪. অতএব আজ ঈমানদাররা কাফেরদের নিয়ে হাসবে[৪]।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝٣٤

৩৫. সুসজ্জিত পালঙ্কে বসে দেখতে থাকবে[৫]।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝٣٥

৩৬. কাফেররা স্বীয় কৃতকর্মের ফল পেয়েছে তো[৬]?

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٣٦

---

১. অর্থাৎ কৌতুক করত এবং মুসলমানদের পরিহাস করত। আর নিজেরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের ধোঁকা খেয়ে মনে করত, আমাদের ধারণা-বিশ্বাসই সঠিক, নতুবা এত সব নে'য়ামত আমরা কেন পাচ্ছি।

২. কেননা, অযথা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে ও আধ্যাত্মিক সাধনা করে নিজেদের দেহ-জানকে কষ্ট দিচ্ছে এবং জান্নাতের কল্পিত সুখকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান বাস্তব সুখ থেকে বঞ্চিত থাকছে এবং নিরর্থক কষ্ট-সাধনাকে প্রকৃত কামালাত (Perfections) আখ্যায়িত করছে। এ কি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি নয় যে, ঘর-বাড়ী ও আরাম-আয়েশ সমস্ত কিছু ছেড়ে একটি লোকের পিছনে পড়েছে এবং নিজদের পৈত্রিক ধর্মকেও বর্জন করে বসেছে?

৩. এটি আল্লাহর কথা। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, মুসলমানদের উপর এই কাফেরদের তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত করা হয়নি যে, নির্বোধের দল নিজেদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকে না তাকিয়ে মুসলমানদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করবে, নিজেদের সংশোধনের ফিকির না করে সরলপথের পথিকদের ভ্রান্ত ও নির্বোধ সাব্যস্ত করবে।

৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুসলমানরা উক্ত কাফেরদের প্রতি হাসি-ঠাট্টা করবে যে, এ লোকগুলো কী রকম নির্বোধ ও অপরিনামদর্শী ছিল যে, নিকৃষ্ট ও নশ্বর জিনিসকে উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর নে'য়ামতরাশির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছিল। পরিণামে আজ দোযখের মধ্যে চিরকালীন আযাবের স্বাদ ভোগ করছে।

৫. অর্থাৎ নিজেদের আনন্দকর অবস্থা এবং কাফেরদের দুরবস্থার দৃশ্য দেখতে থাকবে।

৬. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে মুসলমানদের উপহাস করত, আজ ওদের অবস্থা বিদ্রূপাত্মক ও উপহাসযোগ্য দেখা যাচ্ছে এবং মুসলমানরা ওদের বিগত নির্বুদ্ধিতার কথা চিন্তা করে হাসছে।

সূরা ইনশিকাক

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮৪ । ২৫ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٢٥ ، رُكُوعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে,

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ

২. এবং তার রবের আদেশ পালন করবে– আর আকাশ এরই উপযুক্ত[১]–

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

৩. এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে[২],

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

৪. এবং সে তার অভ্যন্তরে যা রয়েছে, তা (বাইরে) নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে[৩],

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ

৫. এবং তার রবের আদেশ পালন করবে– আর সে এরই উপযুক্ত[৪]— (তখন মানুষ তার রবের মুখোমুখি হবে।)

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে যখন ফেটে যাওয়ার নির্দেশ হবে, তখন আকাশ তা পালন করবে। আর শাসিত ও বশিভূত হওয়ায় সে এরই যোগ্য যে, সে স্বীয় উচ্চতা ও বিশালতা সত্ত্বেও নিজ খালেক ও মালেকের সামনে মাথা নত করে দেবে এবং তাঁর নির্দেশ পালনে কিছুমাত্র ওযর-আপত্তি করবে না।

২. হাশরের মাঠের জন্য পৃথিবীকে রবারের ন্যায় টেনে বিস্তৃত করা হবে এবং বাড়ি-ঘর, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি সবকিছু সমান করে দেওয়া হবে, যাতে একই সমতল ভূপৃষ্ঠের উপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে একই সময়ে সমবেত হতে পারে এবং কোন পর্দা ও আড়াল অবশিষ্ট না থাকে।

৩. পৃথিবী সেদিন নিজের ভাণ্ডারসমূহ এবং মৃতদের শরীরের অংশগুলি বাইরে নিক্ষেপ করে দেবে। আর যে সমস্ত জিনিসের সম্পর্ক বান্দাদের আমলের প্রতিদানের সাথে, তা থেকে পৃথিবী মুক্ত হয়ে যাবে।

৪. আকাশ ও পৃথিবী যেই মহান আল্লাহর 'তাকবীনী' তথা সৃষ্টিগত নির্দেশের অধীন ও অনুগত, মানুষের কি এ অধিকার আছে যে, সে তাঁর 'তাশরীয়ী' অর্থাৎ বিধানগত নির্দেশের অবাধ্যতা করবে?

৬. হে মানুষ! তুমি স্বীয় রবের নিকট (পৌঁছা পর্যন্ত) অবিরাম সাধনা করে যাবে, অবশেষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে[১]।	يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ﴿٦﴾
৭. যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে–	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ﴿٧﴾
৮. তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে[২]।	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ﴿٨﴾
৯. এবং সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাবে আনন্দিত হয়ে[৩]।	وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۙ﴿٩﴾
১০. আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে[৪]–	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ﴿١٠﴾
১১. সে মৃত্যুকে ডাকবে[৫]।	فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ﴿١١﴾
১২. এবং প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।	وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۗ﴿١٢﴾

১. অর্থাৎ রব পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে প্রত্যেক মানুষ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের চেষ্টা-সাধনা করে থাকে। কেউ তাঁর আনুগত্যে মেহনত ও কষ্ট-ক্লেশ করে, কেউ বা অসৎকর্ম ও নাফরমানীতে জান-প্রাণ লাগিয়ে দেয়। অতঃপর ভালোর পক্ষে হোক বা মন্দের পক্ষে, নানা রকম কষ্ট সয়ে সয়ে শেষপর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয় এবং নিজ কর্মফলের সম্মুখীন হয়।

২. সহজ হিসাব এ-ই যে, তাকে চুলচেরা নিরীক্ষণ করা হবে না– শুধু আমলনামা পেশ করা হবে এবং জেরা না করে সহজে ছেড়ে দেওয়া হবে।

৩. শাস্তির ভয় থাকবে না, ক্রোধেরও আশঙ্কা হবে না। তাই নিতান্তই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিজের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইদের নিকট আনন্দ-খুশী করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে।

৪. অর্থাৎ পিঠের পিছন দিক থেকে বাম হাতে আমলনামা ধরানো হবে, ফেরেশতারা সম্মুখ থেকে ওর আকৃতি দেখতে পছন্দ করবেন না। এভাবে যেন ওর প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করা হবে। আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, পিছন দিকে পিঠ মোড়া দিয়ে হাত বাঁধার কারণে আমলনামা পিঠের দিক দিয়ে দেওয়া হবে।

৫. অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে মৃত্যু চাইবে।

১৩. সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দে ছিল[১]।	اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۟ؕ
১৪. সে মনে করেছিল, কখনো (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না[২]।	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۟ۛ
১৫. কেন যাবে না? ওর রব তো ওকে ভালো করেই দেখতেন[৩]।	بَلٰۤى ۛۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۟ؕ
১৬. অতএব আমি কসম করছি সন্ধ্যাকালের লাল আভার!	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۟ۙ
১৭. এবং রাতের ও তা যা-কিছু জড় করে তার[৪]!	وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۟ۙ
১৮. এবং চাঁদের, যখন তা পূর্ণ হয়[৫]–	وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۟ۙ
১৯. তোমরা অবশ্যই এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করতে থাকবে[৬]।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۟ؕ

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে আখেরাত সম্বন্ধে বে-ফিকির ছিল, তারই পরিণামে আজ কঠিন দুশ্চিন্তায় পতিত হতে হল। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ায় আখেরাতের চিন্তায় মশগুল থাকত, আজ তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে, নিরাপদে ও শান্তিতে থাকবে। কাফের এখানে আনন্দে ছিল, মুমিন সেখানে আনন্দে থাকবে।

২. অর্থাৎ ওর তো এ ধারণাই ছিল না যে, একদিন আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং পাই পাই করে হিসাব দিতে হবে। সে জন্যই সে গোনাহ ও দুষ্কৃতির ব্যাপারে অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিল।

৩. অর্থাৎ ওর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা দেখছিলেন– ওর রূহ কোথা থেকে এসেছে, দেহ কোন কোন উপাদানে গঠিত হয়েছে। অতঃপর কী আকীদা-বিশ্বাস সে পোষণ করত, কী আমল করেছে, অন্তরে কী বিষয় ছিল, মুখ থেকে কী বের হয়েছে; হাত-পায়ে কী অর্জন করেছে এবং মৃত্যুর পর ওর রূহ কোথায় গিয়েছে ও শরীরের অংশসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় কোথায় পৌঁছেছে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে আল্লাহ তাআলা মানুষের অবস্থাদি সম্বন্ধে এত অবহিত থাকেন এবং প্রত্যেক ছোট-বড় অবস্থা দৃষ্টির মধ্যে রাখেন, তাঁর সম্বন্ধে এ ধারণা করা যায় কি যে, তিনি ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন? (কখনই না)। তিনি ওর আমলাদি অনুযায়ী ফলাফল অবশ্য অবশ্যই প্রদান করবেন।

৪. যে সকল মানুষ ও প্রাণী দিনের বেলায় জীবিকার অন্বেষণে ঘরবাড়ি থেকে বের হয়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তারা রাতের বেলায় চারদিক থেকে নিজ নিজ স্থানে ফিরে আসে।

৫. অর্থাৎ চতুর্দশ রাতের চাঁদ, যা ষোলকলায় পূর্ণ হয় (অর্থাৎ পূর্ণিমার চাঁদ।)

৬. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধাপ (স্তর) অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর ধাপে উপনীত হতে হয়। অতঃপর আলমে বরযখের ধাপ। তারপর কিয়ামতে যে কত সব অবস্থা ও

২০. ওদের কী হয়েছে যে, ওরা ঈমান আনে না[১]? فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٢٠

২১. এবং যখন ওদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না[২]? وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۝٢١

২২. বস্তুত কাফেররা অস্বীকার করে। بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۝٢٢

২৩. আর ওরা (নিজেদের অন্তরে) যা কিছু ভরে, আল্লাহ তা ভাল করে জানেন[৩]। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۝٢٣

২৪. অতএব ওদের যাতনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিন[৪]। فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝٢٤

২৫. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন ছওয়াব[৫]। اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٢٥

স্তর একের পর এক পার হতে হবে, তা আল্লাহই জানেন। যেমন: রাতের শুরুতে শাফাক' (সন্ধ্যাকালের লাল রং) থাকা পর্যন্ত এক ধরনের আলো থাকে, যা প্রকৃতপক্ষে সূর্যেরই অবশিষ্ট চিহ্ন। অতঃপর 'শাফাক' গায়েব হয়ে গেলে অন্ধকারের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়, যা সকল বস্তুকে নিজের ভিতর গ্রাস করে নেয়। পরে চাঁদ উদিত হয় এবং ধাপে ধাপে তার আলো বাড়তে থাকে। শেষপর্যন্ত চতুর্দশ রাত্রিতে পূর্ণিমার আলো সেই অন্ধকার পরিবেশকে আলোকিত করে রাখে। যেন মানবীয় অবস্থাসমূহের বিভিন্ন স্তর রাতের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. অর্থাৎ এ বিষয়ে ঈমান আনে না যে, মৃত্যুর পরও ওদেরকে কোন দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং একটি অতি কঠিন সফর সম্মুখে রয়েছে, যার জন্য যথেষ্ট পাথেয় সঙ্গে থাকা উচিত।

২. অর্থাৎ ওদের জ্ঞান-বুদ্ধি যদি নিজে নিজে ওই সব সত্যের উদ্ঘাটন করতে না পারে, তবে ওদের উচিত ছিল কুরআনের বর্ণনা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু ওদের অবস্থা এই যে, অলৌকিক কুরআনের বর্ণনা শুনেও কিছুমাত্র বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করেনি। এমন কি, মুসলিমগণ যখন আল্লাহর আয়াতগুলি শুনে সেজদা করে, তখনও ওদের সেজদার তাওফীক হয় না।

৩. অর্থাৎ কেবল এতটুকু নয় যে, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ শুনে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে, বরং মুখের দ্বারা আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর ওদের অন্তর যেসব মিথ্যাচার ও অস্বীকৃতি, ঘৃণা ও হঠকারিতা এবং সত্যের প্রতি বৈরিতায় পরিপূর্ণ রয়েছে, তা আল্লাহ তাআলাই উত্তমরূপে জানেন।

৪. অর্থাৎ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, যা কিছু ওরা অর্জন করেছে তার ফল অবশ্যই পাবে। ওদের এসব অপপ্রয়াস কিছুতেই বিফলে যাবে না!

৫. যা কখনো শেষ হবে না।

সূরা বুরূজ

সূরা ৮৫ । ২২ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٢، رُكُوْعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ বুরূজবিশিষ্ট আকাশের[১],

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝

২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের[২],

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝

৩. এবং সেই দিনের, যা উপস্থিত হয় এবং সেই দিনের, যেদিনে (লোকজন) উপস্থিত হয়[৩]—

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝

৪. অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা!

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝

৫. প্রচুর ইন্ধনপূর্ণ আগুন(-ওয়ালারা)* [৪]।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝

---

১. বুরূজসমূহ বলতে হয় সেই বারটি কক্ষ উদ্দেশ্য, যা সূর্য এক বছর সময়কালে পরিক্রমণ করে; অথবা এর অর্থ আসমানী দুর্গের সেই সকল অংশ, যেখানে ফেরেশতাগণ পাহারায় রত আছেন। কিংবা উদ্দেশ্য হল বড় বড় নক্ষত্র, যা দেখতে আকাশের উপর বলে মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

৩. সকল শহর ও লোকালয়ে জুমার দিন (স্বয়ং) উপস্থিত হয়। আর বিপুল সংখ্যক মানুষ এক স্থানে (অর্থাৎ আরাফার ময়দানে) আরাফার দিনে হজ সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হয়। এ জন্যই রেওয়ায়েতে এসেছে, 'شاهد' বলতে জুমার দিন এবং 'مشهود' বলতে আরাফার দিন উদ্দেশ্য। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৩৬৩১; তাফসীরে তাবারী : ২৪/২৬৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৫৫০৮) شاهد ও مشهود শব্দদুটির তাফসীরে আরো বহু উক্তি রয়েছে। তবে রেওয়ায়েতের সঙ্গে উল্লিখিত উক্তিটিই অধিক সামঞ্জস্যশীল। والله أعلم

বি. দ্র. কুরআনের কসমসমূহের ব্যাপারে আমরা সূরা কিয়ামার (আয়াত ১) শুরুতে যা লিখেছি, তা সর্বত্র স্মরণ রাখা উচিত। আর কসমের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এসব কসমের সামঞ্জস্য এই যে, এর দ্বারা স্পষ্ট হয়– আল্লাহ তাআলা সব স্থান ও কালের মালিক। আর এমন একচ্ছত্র মালিকের অবাধ্যতা যে করে, সে যে অভিশাপ ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তা তো স্পষ্ট।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** ' যে গর্তগুলো ইন্ধনপূর্ণ আগুনে ভর্তি ছিল।'

৪. অর্থাৎ অভিশপ্ত ও গযবের পাত্র হল তারা, যারা বিরাট বিরাট পরিখা খনন করে আগুন দিয়ে ভরল এবং সেগুলোতে বহু ইন্ধন ঢেলে প্রজ্বলিত করল।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা :

উক্ত أَصْحَابُ الأُخْدُوْدِ বলতে কারা উদ্দেশ্য– এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, মুসনাদে আহমদ (মুসলিম : ৩০০৫; তিরমিযী : ৩৬৩৩; মুসনাদে আহমদ-২৩৯৩১) প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে যে ঘটনার উল্লেখ রয়েছে তার সারকথা এই যে— পূর্বকালে এক কাফের রাজা ছিল। ওর কাছে এক যাদুকর থাকত। যাদুকরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে রাজাকে অনুরোধ করে বলল, 'আমাকে একটি বুদ্ধিমান ও মেধাবী যুবক ছেলে প্রদান করা হোক। আমি তাকে আমার যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাব, যাতে আমার পর এ বিদ্যা বিলুপ্ত না হয়ে যায়।' সে মত একটি ছেলে নির্বাচিত হল। সে প্রত্যহ যাদুকরের নিকট গিয়ে ওর বিদ্যা শিখত। পথিমধ্যে এক খ্রিস্টান 'রাহেব' (সন্যাসী) বাস করত। তখনকার হিসাবে সে সত্য ধর্মের উপর ছিল। ছেলেটি তার নিকটও যাতায়াত করতে লাগল এবং গোপনভাবে 'রাহেব'-এর হাতে মুসলমান হয়ে গেল। তার সুহবতের ফয়য ও বরকতে ছেলেটি আল্লাহর ওলী হয়ে যায় এবং তার দ্বারা কারামত প্রকাশ পেতে শুরু করে।

একদিন ছেলেটি দেখতে পেল, কী একটা বিরাট জন্তু (বাঘ বা অন্য কিছু) রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে। ফলে লোকজন পেরেশান হয়ে পড়েছে। ছেলেটি এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দো'য়া করল, 'আয় আল্লাহ! যদি রাহেবের ধর্ম সত্য হয়, তবে আমার পাথরে যেন জন্তুটি মারা যায়।' এ বলে পাথর নিক্ষেপ করতেই জন্তুটি মরে গেল। জনসাধারণের মধ্যে প্রচার হতে লাগল যে, ছেলেটি অলৌকিক জ্ঞানের অধিকারী। জনৈক অন্ধ ব্যক্তি শুনে ছেলেটিকে অনুরোধ করল, তার চোখ ভাল করে দিতে। ছেলে বলল, 'আরোগ্যকারী আমি নই, বরং আরোগ্যের মালিক এক আল্লাহ, যাঁর কোন শরীক নেই। তুমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলে আমি দো'য়া করব। আশা করি, তিনি তোমায় দৃষ্টিশক্তি দান করবেন।' সে মত তাই হল।

ক্রমান্বয়ে এসব সংবাদ রাজার কানে পৌছল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে 'রাহেব' ও অন্ধ ব্যক্তিসহ বালককে ডাকল এবং কিছু বিতর্ক ও কথাবার্তার পর রাহেব ও অন্ধকে হত্যা করে ফেলল। আর ছেলেটিকে উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে হত্যা করতে আদেশ দিল। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে যারা ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল, ওরাই পাহাড় থেকে পড়ে ধ্বংস হল এবং ছেলেটি নিরাপদে ফিরে এল। অতঃপর রাজা নির্দেশ দিল, ছেলেটিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারতে। সেখানেও একই ঘটনা ঘটল– ছেলেটি দিব্যি বেঁচে রইল আর যারা সমুদ্রে নিয়ে গিয়েছিল ওরা সকলে ডুবে মরল। অবশেষে ছেলে রাজাকে বলল, 'আমি নিজে আমার মৃত্যুর উপায় বলে দিচ্ছি। আপনি সকল মানুষকে একটি ময়দানে একত্র করুন। তাদের সামনে আমাকে শূলিতে ওঠান এবং এই বলে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করুন যে, بسم الله رب الغلام আল্লাহ তাআলার নামে, যিনি এ ছেলের প্রভু।' রাজা তাই করল এবং ছেলেটি স্বীয় প্রভুর নামে কুরবান হয়ে গেল।

এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে লোকদের মুখ থেকে সমস্বরে ধ্বনি উচ্চারিত হল– آمنّا برب الغلام (আমরা সকলে এই ছেলের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম)। এবার ভক্তরা রাজাকে বলল,

৬. যখন ওরা তার সামনে উপবিষ্ট ছিল।	اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝
৭. এবং মুমিনদের সঙ্গে ওরা যা কিছু করছিল, তা স্বচক্ষে দেখছিল[১]।	وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝
৮. আর ওরা মুমিনদের কেবল এজন্য শাস্তি দিয়েছিল যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি পরাক্রমশালী, সকল প্রশংসার অধিকারী,	وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝
৯. একমাত্র যাঁর– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব। আর আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষকারী[২]।	الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

'নিন, যে বিষয়ের প্রতিরোধ করছিলেন, তাই ঘটল। আগে তো এক-আধ জন মুসলমান হত, এখন বিস্তর লোক ঈমান এনে ফেলল।'

রাজা ক্রোধে ফেটে পড়ল। তারপর মুমিনদের শাস্তিদানের জন্য বড় বড় খন্দক খনন করাল এবং সেগুলি আগুনে পরিপূর্ণ করে ঘোষণা করল– যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করবে না, তাকে খন্দকের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। সে মতে লোকেরা আগুনে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। কিন্তু ইসলাম থেকে বিচ্যুত হচ্ছিল না। একজন মুসলিম মহিলাকে আনা হল, যার কোলে দুধের শিশু ছিল। সম্ভবত শিশুর কারণে আগুনে পড়তে মা ঘাবড়াল। কিন্তু খোদার হুকুমে শিশু বলে উঠল, أُماه اصبري فإنكِ على الحق (আম্মাজান! সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন।)

১. অর্থাৎ রাজা এবং তার উযীর ও পরামর্শদাতারা খন্দকগুলির আশেপাশে বসে অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ে মুসলমানদের অগ্নিকুণ্ডে জ্বলার দৃশ্য দেখছিল। হতভাগাদের অন্তরে একটুও দয়া-মায়ার উদ্রেক হয়নি।

২. অর্থাৎ সেই মুসলমানদের এ ছাড়া আর কোন অপরাধ ছিল না যে, তারা কুফরের অন্ধকার থেকে বের হয়ে এক মহাশক্তিশালী ও সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, আকাশ ও পৃথিবীর কোন অংশ যাঁর রাজত্বের বহির্ভূত নয় এবং যিনি প্রত্যেক জিনিসের ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত। যখন এমন আল্লাহর ইবাদতকারীদের শুধু এই অপরাধে আগুনে জ্বালানো হচ্ছে যে, তারা কেন এক আল্লাহর ইবাদত করে— তখন কি এ ধারণা করা যায় যে, এহেন জুলুম ও নির্যাতন প্রতিক্রিয়াবিহীন থেকে যাবে এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা জালেমদের কঠোরতম শাস্তি দেবেন না?

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব লেখেন, 'যখন আল্লাহর গযব এল, তখন সেই আগুনই ছড়িয়ে পড়ল এবং রাজা ও দলীয় লোকেরা গোষ্ঠীসহ আগুনে পুড়ে মরল।' তবে সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে এর উল্লেখ নেই। والله سبحانه وتعالى أعلم

১০. যারা ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের (দীন থেকে) বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে*, অতঃপর তওবা করেনি, নিশ্চয় ওদের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি[১]।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝١٠

১১. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানরাজি, যার তলদেশে নহরমালা প্রবাহিত। এ-ই বিরাট সাফল্য[২]।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝١١

১২. নিশ্চয়ই আপনার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর[৩]।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝١٢

১৩. নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার করেন ও পুনর্বার করবেন**[৪]।

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۝١٣

---

* দ্বিতীয় তরজমা– 'নির্যাতন করেছে'।

১. অর্থাৎ শুধু খন্দক খননকারীরাই নয়, বরং যারাই ঈমানদারদের সত্য দীন থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে (যেমন মক্কার কাফেররা করেছিল), অতঃপর এহেন অপকর্ম থেকে তওবা করবে না– তাদের সকলের জন্য দোযখের আযাব তৈরি রয়েছে, যার মধ্যে অসংখ্য রকমের কষ্ট-যাতনা দেওয়া হবে এবং সবচেয়ে বড় কষ্ট হবে আগুনে পোড়ার। আর এ আগুনে দোযখবাসীদের শরীর ও অন্তর সবই পুড়বে।

২. অর্থাৎ এখানকার দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নির্যাতনে বিচলিত হতে নেই। মুমিনদের জন্য রয়েছে বিরাট ও সর্বশেষ সাফল্য, যার মোকাবেলায় এখানকার আরাম-আয়েশ বা দুঃখ-কষ্ট সবই তুচ্ছ।

৩. এ জন্যই তিনি জালেম ও অপরাধীদের পাকড়াও করে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে থাকেন।

** দ্বিতীয় তরজমা–'প্রথমে (সৃষ্টি) করেন এবং পুনর্বার (তা) করবেন'।

৪. অর্থাৎ তিনি প্রথমবারে দুনিয়ার আযাব এবং দ্বিতীয়বারে আখেরাতের আযাব দিয়ে থাকেন। (মুযেহুল কুরআন) — অথবা অর্থ এই যে, প্রথমবারে মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় মৃত্যুর পর তিনিই সৃষ্টি করবেন। সুতরাং অপরাধী যেন এই ধোঁকায় না থাকে যে, মৃত্যু যখন আমাদের নাম ও নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেবে, তখন আর আমাদের নাগাল পাওয়া যাবে কী করে?

১৪. আর তিনিই অতি ক্ষমাশীল, বড় মহব্বতকারী[১], وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ⑭

১৫. আরশের অধিপতি, মহামর্যাদাশালী, ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ⑮

১৬. যা ইচ্ছা করেন, তাই করে ফেলেন[২]। فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ⑯

১৭. আপনার নিকট কি পৌঁছেছে (এ) বাহিনীগুলির সংবাদ– هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ⑰

১৮. ফেরাওন ও ছামূদ সম্প্রদায়ের সংবাদ[৩]? فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ⑱

১৯. বস্তুত যারা কাফের তারা অস্বীকার করায় লিপ্ত[৪]। بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ⑲

২০. অথচ আল্লাহ ওদের পিছন থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন[৫]। وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ⑳

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এমন ক্রোধ-গুণ ও কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁর ক্ষমাগুণ ও মায়া-মমতারও কোন সীমা নেই। তিনি নিজের আজ্ঞাবহ বান্দাদের গোনাহ-খাতা মাফ করেন, তাদের দোষ-ক্রটি গোপন করেন এবং নানা রকম দয়া-মায়া ও স্নেহ-মমতার দ্বারা তাদের ধন্য করেন।

২. অর্থাৎ স্বীয় ইলম ও হেকমত অনুযায়ী তাঁর যা ইচ্ছা তা করতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না, কেউ তাতে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখে না। সুতরাং তাঁর নে'য়ামত-অনুগ্রহ লাভ করে বান্দার ধোঁকায় পড়া উচিত নয়; আর তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ থেকেও নির্ভয় থাকা উচিত নয়– বরং সর্বদা তাঁর ক্রোধ ও মমতা– (جلال وجَمَال) উভয় গুণের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং শাস্তির ভয়ের সাথে রহমতের আশাও রাখবে, এই আশার সাথে তাঁকে ভয়ও করবে।

৩. সংবাদ এই যে, এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত ওদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের দ্বার খোলা ছিল এবং সর্বদিক থেকে নানা রকম নে'য়ামত আসছিল। অতঃপর কুফর ও অবাধ্যতার কারণে শেষপর্যন্ত অতি কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল!

৪. অর্থৎ কাফেররা এসব কাহিনী থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর আযাব সম্বন্ধেও অন্তরে কোন ভয় রাখে না, বরং এসব কাহিনী ও কুরআনকে মিথ্যা বলায় লিপ্ত রয়েছে।

৫. অর্থাৎ অস্বীকার করায় কোন ফায়দা নেই, বরং এ অস্বীকারের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আল্লাহর কুদরতের মুঠি থেকে ওরা বের হয়েও যেতে পারবে না এবং শাস্তি থেকেও বাঁচতে পারবে না।

২১. না, বরং তা বড় মর্যাদাশালী কুরআন[১], بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝

২২. (যা লিপিবদ্ধ) লওহে মাহফূজে[২]। فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

---

১. অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা বলা ওদের বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন এমন বস্তু নয় যে, তাকে মিথ্যা বলা হবে এবং এমনও নয় যে, কতিপয় বোকা মিথ্যা বললেই কুরআনের শান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে।

২. সেখানে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অবকাশ নেই। তদুপরি সেখান থেকে অতি যত্ন ও হেফাজতের সাথে ছাহেবে-ওহী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছানো হয়, যেমন: অন্যত্র বলা হয়েছে– فَإِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا (আর তিনি তাঁর আগে-পিছে প্রহরী নিয়োগ করেন। –সূরা জিন, আয়াত ২৭)

আর এখানেও (অর্থাৎ দুনিয়াতে) আল্লাহর তরফ থেকে তার সংরক্ষণের এমন উপায়-উপকরণ রয়েছে, যার উপস্থিতিতে কোন শক্তি কোন কিছুই করতে পারে না।

সূরা তারিক

সূরা ৮৬ । ১৭ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٧، رُكُوعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আকাশের ও রাতে আগমনকারীর!

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝

২. আপনি কি জানেন, রাতে আগমনকারী কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝

৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

৪. এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নেই।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

৫. অতএব মানুষ ভেবে দেখুক, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে[১]।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে[২]–

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝

---

১. اِنَّ كُلّ نفس ... حافظ – অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ফেরেশতা থাকেন, যাঁরা তাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন, অথবা তার আমলাদি লিখে থাকেন (موضح القرآن)।

আর বর্তমান কসমের মধ্যে হয়ত এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আকাশে তারকারাজির সংরক্ষণের জন্য এমন ব্যবস্থাপনা করেছেন, তাঁর পক্ষে পৃথিবীর বুকে তোমাদের বা তোমাদের আমল সংরক্ষণ করা কেন কঠিন হবে? তদ্রূপ, আকাশের বুকে তারকারাজি সর্বক্ষণ সংরক্ষিত আছে, কিন্তু তাদের প্রকাশ রাতের বেলায় হয়ে থাকে। তেমনই সকল আমল আমলনামায় এখনও সংরক্ষিত আছে, কিন্তু তার প্রকাশ একমাত্র কিয়ামতের দিন হবে। বিষয়টি যখন এমন, তখন মানুষের উচিত- কিয়ামতের সত্যতা উপলব্ধি করা ও তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আর তার কাছে যদি কিয়ামত সুদূর মনে হয়, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত, তাকে কী বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

২. অর্থাৎ মনি (বীর্য) থেকে, যা তীব্রবেগে বের হয়।

৭. যা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্যস্থল থেকে*১।

يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝

৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম২–

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝

৯. যেদিন সকল গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেওয়া হবে৩।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝

১০. তখন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং হবে না কোন সাহায্যকারী৪।

فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

১১. এবং শপথ আকাশের, যা পরিভ্রমণ করে৫!

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে'।

১. বলা হয় যে, পুরুষের বীর্য পৃষ্ঠদেশ থেকে এবং স্ত্রীর বীর্য বক্ষদেশ থেকে স্খলিত হয়। আর কোন কোন আলেম বলেছেন, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ বলে ইঙ্গিতে সমস্ত দেহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ বীর্য পুরুষের হোক বা স্ত্রীর– সমগ্র শরীরে পয়দা হয়ে পরে স্খলিত হয়।

আর বিশেষভাবে বক্ষদেশ ও পৃষ্ঠদেশকে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বীর্যের উপাদান সংগ্রহে প্রধান অঙ্গসমূহ (হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃত)-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে হৃৎপিন্ড ও যকৃতের সম্পর্ক ও বন্ধন রয়েছে বক্ষদেশের সাথে। আর মস্তিষ্কের সম্পর্ক মগজের মাধ্যমে পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে। এ কারণেই বিশেষভাবে পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় আনয়ন করবেন (পুনর্জীবিত করবেন) (موضح القرآن)।

সারকথা এই যে, বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করাটা পুনর্বার সৃষ্টি করার তুলনায় অধিক বিস্ময়কর। যখন এই বিস্ময়কর বিষয়টি তাঁর কুদরতে সংঘটিত হচ্ছে, তখন এর চেয়ে কম বিস্ময়কর বিষয়ের সংঘটনকে অযথা অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

৩. অর্থাৎ সকলের গোপন ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে। অন্তরে যেসব কথা গোপন রেখেছিল বা যেসব কাজ গোপনে করেছিল, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং কোন অপরাধই লুকানো সম্ভব হবে না।

৪. সেই সময় অপরাধী না নিজের জোর ও শক্তি খাটিয়ে (আযাব) প্রতিরোধ করতে পারবে, আর না শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে।

৫. অথবা ذات الرجع- এর অর্থ হল, বৃষ্টি আনয়নকারী আকাশের কসম।

১২. এবং ভূমির, যা ফেটে যায়[১]– وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

১৩. নিশ্চয় তা (কুরআন) এক ফয়সালাকারী বাণী। إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

১৪. তা নিরর্থক কথা নয়[২]। وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

১৫. ওরা তো গভীর চক্রান্ত করছে। إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

১৬. আর আমিও সূক্ষ্ম কৌশল করছি। وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝

১৭. অতএব অস্বীকারকারীদের অবকাশ দিন। ওদের অবকাশ দিন কিছুদিনের জন্য[৩]। فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

---

১. যমীনের বক্ষ বিদীর্ণ করে শস্য ও উদ্ভিদ বের হয়ে আসে।

২. অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এবং কুরআনে বর্ণিত পরকাল সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি কোন হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। বরং এ কিতাব হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী এবং নিঃসন্দেহে এ সত্য বাণী এমন একটি ধ্রুব সত্য বিষয়ের সংবাদ পরিবেশনকারী, যা নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হবে।

বি. দ্র. আলোচ্য বিষয়ের সাথে উক্ত কসমের সামঞ্জস্য এই যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যেমন উত্তম মাটিকে সঞ্জীবিত করে, তদ্রূপ কুরআন আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যোগ্য মানুষকে ধন্য করে। অধিকন্তু কিয়ামতের দিন একটি গায়বী বৃষ্টি বর্ষনের ফলে মৃত মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে– যেমন এখানে (দুনিয়ায়) বৃষ্টির পানি পতিত হওয়ার কারণে মৃত ও প্রাণহীন যমীন সজীব-সতেজ হয়ে শস্য-শ্যামল রূপ ধারণ করে।

৩. অর্থাৎ অস্বীকারকারীরা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, যাতে (মানুষের অন্তরে) দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টি অথবা অন্য কোন তদবীর দ্বারা সত্যের প্রচার ও প্রসারকে ব্যাহত করতে পারে। আর আমার সূক্ষ্ম তদবীরও (যার উপলব্ধি ওদের নেই) অভ্যন্তরীণভাবে কাজ করছে, যাতে ওদের সমস্ত প্রতারণা ও চক্রান্তের জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়া হয় এবং ওদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ওদেরই দিকে নিক্ষিপ্ত হয়। এখন নিজেরাই বুঝে নাও যে, আল্লাহর তদবীরের মোকাবেলায় কারো চালাকি ও কৌশল কী কাজে আসতে পারে? (কোন কাজেই না।) অতএব নিশ্চিতরূপে ওরা অকৃতকার্য, মাহরূম ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ জন্য এ-ই সমীচীন যে, আপনি ওদের অশোভন আচরণে ঘাবড়ে গিয়ে বদ-দো'য়া করবেন না– বরং কিছুকাল অবকাশ দিন, তারপর দেখুন– ফলাফল কী হয়।

সূরা আ'লা

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮৭ । ১৯ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ١٩، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ①

১. আপনি তাস্‌বীহ পাঠ করুন আপনার মহামহিম রবের নামের[১]–

الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ②

২. যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন এবং নিখুঁতভাবে বানিয়েছেন[২]।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ③

৩. এবং যিনি নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন[৩]।

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ④

৪. এবং যিনি তৃণ উৎপন্ন করেছেন,

---

১. হাদীছে আছে, যখন এ আয়াতটি নাযিল হল, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– اجعلوها في سجودكم (আয়াতটিকে তোমাদের সেজদায় স্থান দাও) (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৮৬৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস : ১৮৯৮)। এ জন্যই সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়া হয়।

২. অর্থাৎ যা-কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা সম্পূর্ণ হেকমত অনুযায়ী, খুবই যথার্থভাবে ও যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং জিনিসটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি এবং তার দ্বারা যেসব উপকারিতা উদ্দেশ্য, এসবকে বিবেচনায় রেখে তার সৃষ্টিকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং তাকে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও উপযুক্ত প্রকৃতি দিয়েছেন, যার ফলে তার দ্বারা সেসব কল্যাণ ও ফায়দা হাসিল হতে পারে।

৩. হযরত শাহ আবদুল কাদের সাহেব (র) লেখেন– 'অর্থাৎ প্রথমে তিনি তকদীর লিখেছেন। তারপর সে অনুসারে দুনিয়াতে এনেছেন'– যেন তিনি দুনিয়ায় আসার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন– 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিপূর্ণতার একটি মাত্রা নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর তাকে সেই পরিপূর্ণতা হাসিলের পথ বাতলে দিয়েছেন।'

এ সম্পর্কে আরও অনেক অভিমত আছে, সেসব উল্লেখ করে আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

৫. অতঃপর তাকে পরিণত করেছেন কালো খরকুটায়[১]।

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰی ۵

৬. নিশ্চয় আমি আপনাকে পড়িয়ে দেব। অতএব আপনি ভুলবেন না–

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤی ۶

৭. তবে আল্লাহই যা (ভুলিয়ে দেওয়ার) ইচ্ছা করবেন[২]। নিশ্চয় তিনি প্রকাশ্য ও গোপন (সব) বিষয় জানেন[৩]।

اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ مَا یَخْفٰی ۷

৮. আর আমি আপনাকে সহজে পৌঁছে দেব আসানী পর্যন্ত[৪]।

وَ نُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرٰی ۸

৯. অতএব আপনি উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়[৫]।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰی ۹

---

১. অর্থাৎ মাটি থেকে প্রথমে অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল ও মনোরম ঘাস-তৃণলতা উৎপন্ন করেছেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে তাকে শুষ্ক ও কালোবর্ণে পরিণত করে দিয়েছেন, যাতে শুষ্ক হওয়ায় তাকে এক বিশেষ কাল পর্যন্ত জীবজন্তুর খাদ্য হিসাবে পুঞ্জীভূত করে রাখা যায় এবং শুষ্ক শস্য কেটে কাজে লাগানো যায়।

২. অর্থাৎ আমি যেমন প্রত্যেক বস্তুকে ধাপে ধাপে তার কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছি, তদ্রূপ আপনাকে আমি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ কুরআন পড়িয়ে দেব এবং এমন ইয়াদ করিয়ে দেব, যাতে তার কোন অংশই ভুলে না যান। তবে যেসব আয়াত সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য, সেগুলির ব্যাপার ভিন্ন। আর এও এক ধরনের নস্‌খ (অর্থাৎ রহিত বা বিলুপ্তিকরণ।)

৩. অর্থাৎ তিনি তোমাদের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা এবং প্রকাশ্য আমল ও অবস্থা জানেন, সে অনুযায়ীই তিনি তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করবেন। অনুরূপ, এ সন্দেহ করা উচিত নয় যে, যে সকল আয়াত একবার নাযিল করা হয়েছে, সেগুলি নস্‌খ (বা রহিত) করা এবং ভুলিয়ে দেওয়ার কী অর্থ? তাঁর হেকমতসমূহের সীমা উপলব্ধি করা তাঁরই পক্ষে সম্ভব, যিনি সমগ্র প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে অবগত আছেন। তিনিই জানেন, কোন্ বিষয়টি সর্বদা স্থায়ী থাকা উচিত এবং কোন্‌টিকে এক বিশেষ সময়ের পর তুলে নেওয়া দরকার– কেননা, তা স্থায়ী রাখার কোন প্রয়োজন এখন নেই।

৪. অর্থাৎ ওহী ইয়াদ রাখা সহজ হয়ে যাবে। এবং আল্লাহর মারেফত ও ইবাদত এবং দেশ ও জাতির পরিচালনার পন্থা— সবই সহজ করে দেওয়া হবে, আর সফলতার রাস্তা থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি হটিয়ে দেওয়া হবে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ যখন আপনাকে এরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তখন আপনিও অন্যদের পর্যন্ত ফয়েয (বা অনুগ্রহ) পৌছান এবং নিজের পূর্ণতার দ্বারা অন্যদের পূর্ণতা সাধন করুন।

১০. যে (আল্লাহকে) ভয় করে, সে অবশ্যই উপদেশ গ্রহণ করবে[১]।

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠

১১. আর তা থেকে দূরে থাকবে চরম হতভাগা–

وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١

১২. যে প্রবেশ করবে মহাঅগ্নিতে[২]।

الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢

১৩. অতঃপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না[৩]।

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣

১৪. নিশ্চয় সে সফল হয়েছে, যে পরিশুদ্ধ হয়েছে[৪]।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤

বি. দ্র. إن نفعت الذكرى 'যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়'– এ শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে যে, নসীহত ও ওয়াজ করা তখন জরুরী, যখন শ্রোতার পক্ষ থেকে তা গ্রহণের আশা করা যায়। আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওয়াজ-নসীহত করা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব নয়। হাঁ, তাবলীগ ও সতর্কীকরণ (অর্থাৎ আল্লাহর বিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা)– এতটুকু প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারেই জরুরী, যাতে বান্দাদের উপর হুজ্জত কায়েম হয় এবং তাদের পক্ষে মূর্খতা ও অজ্ঞতার ওযর-আপত্তি করার অবকাশ না থাকে। সামাজিক বা প্রচলিত নিয়মে একে ওয়াজ-নসীহত বলা হয় না, বরং দাওয়াত ও তাবলীগ বলা হয়। সম্ভবত এ জন্যই কোন কোন মুফাসসির আরো বেশি স্পষ্ট শব্দাবলিতে আয়াতের অর্থ এই করেছেন যে, বার-বার নসীহত করুন (যদি একবারের নসীহতে উপকার না হয়ে থাকে।)

ان نفعت الذكرى বলার আরেকটি তাৎপর্য

আর এও হতে পারে যে, إن نفعت الذكرى এই শর্ত উপদেশ দানের বিষয়টিকে তাকিদপূর্ণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে– অর্থাৎ যদি উপদেশে কারো লাভ হয়, তবে আপনার উপদেশ দেওয়া উচিত। আর এ তো সুনিশ্চিত যে, দুনিয়াতে নসীহতের দ্বারা প্রত্যেকের না হলেও কারো না কারো উপকার অবশ্যই হবে- যেমন আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন– وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (আর আপনি নসীহত করতে থাকুন। কারণ, নসীহত ঈমানদারদের উপকারে আসে। –সূরা যারিয়াত, ৫৫)। সুতরাং একটি বিষয়কে এমন জিনিসের সাথে শর্তযুক্ত করা, যে জিনিস সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী– এর দ্বারা সেই বিষয়টি আরো তাকিদপূর্ণ হয়।

১. উপদেশ দিলে সে ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে এবং উপদেশ থেকে সে-ই উপকার লাভ করে, যার অন্তরে কমবেশী আল্লাহর ভয় এবং নিজের পরিণামের চিন্তা থাকে।

২. অর্থাৎ যে হতভাগার কপালে দোযখের আগুন লেখা আছে, সে কী করে নসীহত গ্রহণ করবে? তার অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং নিজের পরিণামের ভয়ই নেই যে, সে নসীহতের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং সঠিক-সত্য কথা বুঝবার চেষ্টা করবে।

৩. অর্থাৎ মৃত্যু আসবে না, যাতে সকল কষ্টের অবসান ঘটে। আর শান্তির জীবনও ভাগ্যে জুটবে না। হাঁ, এমন জীবন হবে, যার স্থলে সে মৃত্যুই কামনা করবে। (আল্লাহর পানাহ!)

৪. অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী, শারীরিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়েছে এবং নিজের অন্তর ও শরীরকে সহী আকীদা-বিশ্বাস, উত্তম গুণাবলি ও নেক আমলাদি দ্বারা সজ্জিত করেছে।

১৫. এবং স্বীয় রবের নাম জপেছে, অতঃপর নামায পড়েছে[১]। وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝

১৬. না, বরং তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ দুনিয়ার জীবনকে! بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا ۝

১৭. অথচ আখেরাতের জীবনই উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী[২]। وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝

১৮. নিশ্চয়ই এ কথা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে– اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝

১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থগুলোতে[৩]। صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

---

১. অর্থাৎ পাক-সাফ হয়ে তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে নিজের রবের নাম নিয়েছে, তারপর নামায পড়েছে। আর কোন কোন পূর্ববর্তী মনীষী বলেছেন যে, تزكى ক্রিয়াটি زكاة শব্দ থেকে উৎসারিত– যদ্বারা এখানে সদকাতুল ফিতর (ফেতরা) এবং ذكر اسم ربه দ্বারা ঈদের তাকবীরসমূহ উদ্দেশ্য। আর فصلى এর মধ্যে ঈদের নামাযের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ ঈদের দিন প্রথমে সদকাতুল ফিতর, তারপর তাকবীরসমূহ, তারপর নামায আদায় করতে হবে। তবে প্রথম অর্থই স্পষ্ট।

বি. দ্র. হানাফী মাযহাবের ইমামগণ প্রথমোক্ত তাফসীর অনুসারে এ আয়াত থেকে দুটি মাসআলা বের করেছেন। প্রথম– তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে একান্ত الله أكبر শব্দ বলা ফরয নয়, বরং রবের নামের এমন কোন যিকিরই যথেষ্ট, যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশক এবং যা নামাযীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট না। হাঁ, সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনানুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত বা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা শর্ত বটে, রুকন নয়। কেননা, ذكر اسم ربه এর উপর فصلى কে عطف করাটাই معطوف عليه ও معطوف-এর ভিন্নতার প্রমাণ (আর ভিন্নতা তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন ذكر اسم الرب-কে শর্ত গণ্য করা হবে, রুকন নয়)।

২. অর্থাৎ উক্ত সফলতা তোমাদের কী করে হাসিল হবে যখন তোমাদের আখেরাতের চিন্তাই নেই, বরং দুনিয়ার জীবন এবং এখানকার আরাম-আয়েশকে মূলত বা কার্যত আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ? অথচ দুনিয়া নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, আর আখেরাত তার চেয়ে কত উত্তম ও স্থায়ী। অতএব আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা পরিমাণে ও গুণে সর্বদিক দিয়ে উৎকৃষ্ট– তাকে ছেড়ে নিকৃষ্ট জিনিসকে অবলম্বন করা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ قد أفلح مَن تَزَكَّى থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়টি পূর্ববর্তী কিতাসমূহেও উল্লেখিত আছে– যা কখনও রহিত বা পরিবর্তিত হয়নি। এ হিসাবে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হল।

বি. দ্র. দুর্বল সনদে বর্ণিত কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর দশটি সহীফা (কিতাব) এবং মূসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত বাদেও দশটি সহীফা নাযিল হয়েছিল। তবে এটি কতদূর সহীহ তা আল্লাহ তাআলাই জানেন। (ইবনে হিব্বান, বর্ণনা ৩৬১ –এর সনদ একদম অনির্ভরযোগ্য।)

সূরা গাশিয়াহ

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৮৮ । ২৬ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٢٦، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ①

১. আপনার নিকট কি আচ্ছন্নকারীর সংবাদ পৌঁছেছে[১]?

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ②

২. সেদিন বহু চেহারা হবে অবনত,

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ③

৩. পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত[২]।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ④

৪. সেগুলি উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করবে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ⑤

৫. ওদের পানি পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরনা থেকে[৩]।

---

১. অর্থাৎ এই সংবাদটি শোনার মত।

বি. দ্র. غَاشِيَة (আচ্ছন্নকারী) দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য, যা সমস্ত সৃষ্টলোককে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং যার প্রভাব সমগ্র বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টন করে নেবে।

২. অর্থাৎ আখেরাতে বিপদাপদের যাতনা সইবে এবং তা সইতে সইতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, عاملة ناصبة দ্বারা দুনিয়ার অবস্থা উদ্দেশ্য- অর্থাৎ কত মানুষ আছে, যারা দুনিয়াতে পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ওদের পরিশ্রম সত্যের পথে হয় না বলে সবই ব্যর্থ হয়। এখানেও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করল, সেখানেও মুসীবতে থাকবে। একেই বলে- خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ (সে হারাল দুনিয়া ও আখেরাত [উভয়ই]। -সূরা হজ, ১১)

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন- 'কাফেররা যে দুনিয়াতে (বড় বড়) রিয়াযত বা সাধনা করে, তা (আল্লাহর দরবারে) কিছুই কবুল হয় না'।

৩. অর্থাৎ যখন দোযখের উত্তাপ ওদের ভিতরে দারুণ পিপাসার সৃষ্টি করবে, তখন ওরা 'পিপাসা' 'পিপাসা' বলে চিৎকার করবে এই মনে করে যে, পানি পান করলে এই পিপাসা দূর হয়ে যাবে। তখন ওদের একটি উষ্ণ টগবগে ঝরনার পানি দেওয়া হবে, যা পান করা মাত্র ঠোঁট পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে এবং আঁতগুলো গলে বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে এসে পড়বে। পুনরায় সঙ্গে সঙ্গে তা ঠিক করে দেওয়া হবে এবং এভাবে চিরকাল আযাবে বন্দী থাকবে। (আল্লাহর পানাহ!)

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝٦

৬. ওদের জন্য কন্টকপূর্ণ ঝাড় ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না[১]।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۝٧

৭. যা হৃষ্ট-পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না[২]।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨

৮. সেদিন বহু চেহারা হবে সতেজ-সজীব,

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩

৯. নিজেদের উপার্জনে সন্তুষ্ট[৩]।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠

১০. (থাকবে) সুউচ্চ বাগানে।

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝١١

১১. সেখানে শুনবে না কোন বাজে কথা[৪]।

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝١٢

১২. সেখানে থাকবে প্রবাহিত ঝরনা[৫]।

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝١٣

১৩. (এবং) সেখানে থাকবে-সুউচ্চ পালঙ্কসমূহ,

---

১. ضريع- দোযখের মধ্যে একটা কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ, যা তিক্ততায় 'ঈলবা'-এর চেয়ে বেশি তিতা এবং দুর্গন্ধে মৃত জন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং উষ্ণতায় আগুনের চেয়ে গরম। যখন দোযখীরা ক্ষুধার কষ্টে চিৎকার করবে, তখন তা খাওয়ার জন্য দেওয়া হবে।

২. খাওয়ার উদ্দেশ্য হয়— শুধু স্বাদ উপভোগ করা, বা শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট করা, কিংবা ক্ষুধা নিবারণ করা। ضريع খাওয়ার দ্বারা এগুলির কোনটিই হাসিল হবে না। ওর নাম থেকেই প্রকাশ পায় যে, ওতে স্বাদ ও মিঠার নামগন্ধও নেই। অবশিষ্ট দুটি উদ্দেশ্যও যে হাসিল হবে না, তা বর্তমান আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হল। মোটকথা, কোন সুস্বাদু ও আনন্দদায়ক খাদ্য ওদের ভাগ্যে জুটবে না।

এ পর্যন্ত দোযখীদের অবস্থা বর্ণিত হল। সম্মুখে এর বিপরীতে বেহেশতীদের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে।

৩. অর্থাৎ তারা এজন্য আনন্দিত হবে যে, নিজেদের চেষ্টা-সাধনা কাজে লেগেছে এবং পরিশ্রমের সুফল প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা কোন নিরর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না– গালমন্দ ও অপমানকর কথার তো প্রশ্নই আসে না।

৫. অর্থাৎ একটি বিস্ময়কর ঝরনা। আর কেউ কেউ বলেন, বিশেষ ধরণের ঝরনা উদ্দেশ্য নয়। সেখানে বহু ধরণের ঝরনা প্রবাহিত হবে।

১৪. (তাদের সম্মুখে) রাখা পানপাত্রসমূহ[১], وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾

১৫. সারিবদ্ধভাবে রাখা বালিশসমূহ[২], وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾

১৬. এবং স্থানে স্থানে বিছিয়ে রাখা মখমলের বিছানাসমূহ[৩]। وَّزَرَابِیُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾

১৭. আচ্ছা, ওরা কি উটের দিকে লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে[৪]? اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

১৮. এবং আসমানের দিকে যে, কীভাবে তা উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে[৫]? وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

১৯. এবং পাহাড়-পর্বতের দিকে যে, কীভাবে তা দাঁড় করানো হয়েছে[৬]? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

২০. এবং যমীনের দিকে যে, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে[৭]? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

---

১. যাতে পান করতে মন চাইলে কিছুমাত্র দেরি না হয়।

২. অর্থাৎ সুন্দরভাবে পরিপাটি অবস্থায় গালিচা বিছানো থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসার জন্য লম্বা ও বড় বালিশ পাতা থাকবে।

৩. যাতে যখন যেখানে ইচ্ছা আরাম করতে পারে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার কষ্ট করতে না হয়।

৪. কারণ, এর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য উভয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে আজীব ধরনের। তফসীরে আযীযীতে এ বিষয়ের চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে, তা দেখার মত।

৫. বাহ্যিক কোন স্তম্ভ বা থাম ছাড়া উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে।

৬. এমনভাবে খাড়া রাখা হয়েছে যে, নিজ স্থান থেকে একটুও নড়েচড়ে না।

৭. নিজ বিশালত্বের কারণে গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীকে সমতল মনে হয় এবং এ জন্যই পৃথিবীর বুকে বসবাস করা সহজ হয়েছে।

এসব আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। আশ্চর্য এই যে, এসব জিনিস দেখে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাগুলিকে ওরা উপলব্ধি করছে না। যদি চিন্তা করে দেখত, তবে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে যে আল্লাহ তাআলা সক্ষম এবং পরজগতের আজীব ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনাগুলি যে সম্ভব, তা সহজেই বুঝতে পারত।

২১. অতএব আপনি উপদেশ দিতে থাকুন। আপনি তো কেবলই উপদেশদাতা।

فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

২২. আপনি ওদের উপর জোর-জবরদস্তিকারী নন[১]।

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে-

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

২৪. আল্লাহ ওকে গুরুতর শাস্তি দেবেন।

فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৫. নিশ্চয় আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন।

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৬. অতঃপর আমারই দায়িত্ব ওদের হিসাব-কিতাব গ্রহণ[২]।

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

উক্ত নিদের্শনগুলোর বিশেষত্ব

তাফসীরকার ইবনে কাছীরের মতে উপরের জিনিসগুলি বিশেষ করে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, বাইরে চলাফেরা করার সময় তখনকার দিনে অধিকাংশ সময় এ চারটি বস্তুই আরব লোকদের সামনে পড়ত- যানবাহনের উট, উপরে আকাশ, নীচে পৃথিবীপৃষ্ঠ, আশেপাশে পাহাড়-পর্বত। এজন্যই এ নিদর্শনগুলির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে।

১. অর্থাৎ এ লোকেরা যখন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও ওদের চিন্তায় অস্থির হবেন না, বরং শুধু উপদেশ দিতে থাকুন। কারণ, আপনি উপদেশ দিতে ও বোঝাবার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। ওরা যদি না বোঝে, তবে আপনি মোটেই আইন-প্রয়োগকারী নিয়ুক্ত হননি যে, জবরদস্তিমূলকভাবে মানিয়ে ছাড়বেন এবং ওদের অন্তরকে বদলিয়ে দেবেন। এ তো একমাত্র অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ তাআলারই কাজ।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফেরাল এবং তাঁর আয়াতগুলি অস্বীকার করল, সে আখেরাতের বিরাট আযাব ও আল্লাহর কঠোরতম শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। আর নিশ্চয়ই এমন লোকদের একদিন আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করতেই হবে এবং আমাকে ওদের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে। মোটকথা, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করে যান এবং ওদের ভবিষ্যৎ আমার কাছে সোপর্দ করে দিন।

সূরা ফাজ্‌র

সূরা ৮৯ । ৩০ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٣٠، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম ফজরের, وَالْفَجْرِ ۝١

২. দশ রাতের, وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

৩. জোড় ও বেজোড়ের, وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣

৪. এবং রাতের, যখন তিনি সেই রাতে চললেন*১– وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤

★ দ্বিতীয় তরজমা– 'রাতের, যখন তার অবসান হতে থাকে'।

১. **কসমগুলোর ব্যাখ্যা**

হযরত শাহ (আ. কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ফজর বলতে উদ্দেশ্য কুরবানীর ঈদের দিনের ফজর, যখন বড় হজ আদায় হয়ে থাকে। আর 'দশ রাত্রি' বলতে উক্ত ফজরের পূর্ববর্তী দশটি রাত এবং 'জোড় ও বেজোড়' রয়েছে রমযান মাসের শেষ দশকের মধ্যে। আর 'যখন তিনি রাতে চললেন' বলতে পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মেরাজের রাতের চলা উদ্দেশ্য।' এ সময়গুলি বরকতময় ছিল বলে এসবের কসম বা শপথ করা হয়েছে।

বি. দ্র. وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ এর অর্থ সাধারণত তাফসীরকারগণ করেছেন– রাত অতিক্রান্ত হওয়া অথবা রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া। ভোরের কসমের মোকাবেলায় যেন রাতের আগমন-নির্গমনের কসম খাওয়া হল– যেমনটি হয়েছে জোড় সংখ্যকের বিপরীতে বেজোড়ের কসমে। আর لَيَالٍ عَشْرٍ বলতেও যে কোন দশ রাত উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যেসব রাতের উপর এ শব্দের প্রয়োগ হয়, তাতেও বৈপরিত্য পাওয়া যায়– (চান্দ্র) মাসের শুরুর দশ রাতে প্রথম দিকে আলোকিত থাকে, শেষের দিকে অন্ধকার হয়। আর শেষের দশ রাত প্রথম ভাগে অন্ধকার থাকে, শেষ ভাগে আলোকিত হয়। মধ্যবর্তী দশটি রাতের অবস্থা এই উভয় থেকে ভিন্ন।

কসমগুলোর তাৎপর্য

উল্লিখিত বিভিন্নতা ও বৈপরিত্য দ্বারা যেন এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের জীবনে আরাম-আয়েশ বা বিপদাপদ, সচ্ছলতা বা দারিদ্র্য যে কোন অবস্থাই আসুক, তাতে

৫. এসব কসম বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য (গুরুত্বপূর্ণ) কসম নয় কি[১]?

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ۝

৬. আপনি কি লক্ষ করেননি যে, আপনার রব কেমন আচরণ করেছিলেন 'আদ সম্প্রদায়ের সাথে–

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

৭. তথা ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে[২]? যারা ছিল বড় বড় স্তম্ভবিশিষ্ট[৩],

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

নিঃশঙ্ক হয়ে যাওয়া এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এর বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না। তাদের বরং স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা বিপরীত বস্তুনিচয়ের স্রষ্টা। সৃষ্টজগতে তিনি যেমন একটি জিনিসের মোকাবেলায় আরেকটি বিপরীত জিনিসের সমাবেশ ঘটান, তদ্রূপ তিনি তোমাদের হাল-অবস্থার মধ্যেও স্বীয় হেকমত ও বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে থাকেন। সে মতই পরের আয়াতগুলিতে যেসব ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, তাতে এই মূলনীতির দিকেই সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

বি. দ্র. এই আয়াতের তাফসীরে দুটি মরফূ হাদীস রয়েছে– একটি হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, অপরটি ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। হাফেজ ইবনে কাছীর (র) প্রথম হাদীসখানি সম্পর্কে লেখেন– وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن الْمَتْن في رفعه نكارة ('এ এমন একটি সনদ, যার বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তেমন কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার মতে হাদীছের মতন [মূল পাঠ ও বক্তব্য] মরফূ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা আপত্তি রয়েছে।') আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলেন- وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشبه والله أعلم ('আমার নিকট বর্ণনাটি ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা)-এর বক্তব্য হওয়াই অধিক সংগত।')

১. অর্থাৎ এ কসমগুলি মামুলি নয়; বরং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর জ্ঞানীগুণী লোকেরা বুঝতে পারেন যে, এর মধ্যে এক বিশেষ মাহাত্ম্য ও ওযন রয়েছে, যার দ্বারা বক্তব্য জোরদার হয়ে ওঠে।

২. 'আদ' এক ব্যক্তির নাম। তার নামানুসারে গোটা জাতির নামকরণ করা হয়েছে। তারই পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'ইরাম'। তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার মধ্যে সম্ভবত এই ইঙ্গিত আছে যে, 'আদ' বলতে 'প্রথম আদ' উদ্দেশ্য, 'দ্বিতীয় আদ' নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'আদ জাতি'-র মধ্যে যে রাজবংশ ছিল, তাদেরই 'ইরাম' বলা হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. অর্থাৎ স্তম্ভসমূহ খাড়া করে বড় বড় উঁচু দালান নির্মাণ করত। অথবা অর্থ এই যে, অধিকাংশ সময় ওরা সফর ও ভ্রমনে থাকত এবং সুউচ্চ স্তম্ভসমূহের উপর তাঁবু টানাত। আর কারো মতে ذات الْعِمَاد বলে ওদের লম্বা ও বিরাট দৈহিক আকৃতিকে স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। والله أعلم

৮. যাদের সমতুল্য কোন সম্প্রদায় শহরে-নগরে সৃষ্টি করা হয়নি[১],

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

৯. এবং (কেমন আচরণ করেছিলেন) ছামূদ সম্প্রদায়ের সাথে? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে (বাড়িঘর) নির্মাণ করেছিল[২]।

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

১০. এবং (কেমন আচরণ করেছিলেন) কিলক-ওয়ালা (বা : বিপুল শক্তিশালী) ফেরাওনের সাথে[৩]?

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝

১১. যাদের সবাই দেশে-দেশে চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১২. এবং তাতে খুব বেশি বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

১৩. ফলে ওদের উপর আপনার রব শাস্তির চাবুক চালালেন[৪]।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

---

১. অর্থাৎ তখনকার দিনে দুনিয়ায় আদ জাতির ন্যায় অন্য কোন জাতি এত শক্ত-সামর্থ ও শক্তিশালী ছিল না। অথবা অর্থ এই যে, ওদের দালান-কোঠা (সুদৃঢ় হওয়ার দিক থেকে) অদ্বিতীয় ছিল।

২. وادي القرى ওদের আবাসস্থলের নাম, যেখানে পাহাড়ী পাথর কেটে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত বাসস্থান তৈরি করত।

৩. ذي الاوتاد- অর্থাৎ বিরাট সৈন্যবাহিনীর অধিপতি, যাকে সামরিক প্রয়োজনেই প্রচুর পরিমাণে কীলক বা পেরেক রাখতে হত। অথবা অর্থ এই যে, লোকদের সে পেরেক ঠুকে শাস্তি দিত।

৪. অর্থাৎ উল্লিখিত জাতিগুলি ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ ও জোর-শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে দুনিয়ার বুকে দারুণ অশান্তি ও ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। বড় বড় দুষ্কৃতি-দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল এবং এরূপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, যেন ওদের মাথার উপর কোন শাসকই নেই। সর্বদা এ অবস্থাতে থাকবে, কখনও এসব জুলুম-অত্যাচার ও দুষ্কৃতির কুফল ভোগ করতে হবে না। অবশেষে যখন ওদের কুফর, বড়াই, শক্তি ও দাপট, জুলুম ও অত্যাচারের

১৪. নিশ্চয় আপনার রব ওঁত পেতে রয়েছেন[১]।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۝

১৫. তো এই যে মানুষ– যখন তাকে তার রব পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও নেয়া'মত দান করেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন[২]।'

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۝

১৬. আর যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন এবং তার প্রতি তার জীবিকা সংকুচিত করে দেন, তখন বলে, 'আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন[৩]।'

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۝

পেয়ালা ভরে উঠল এবং অবকাশ ও ক্ষমার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইল না, তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ অকস্মাৎ ওদের উপর স্বীয় আযাবের চাবুক চালালেন। ফলে ওদের সকল শক্তি ও বড়াই মাটিতে মিশে গেল এবং সেই সব ধন-সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম কোন কাজেই আসল না।

১. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেমন লুকিয়ে থেকে যাতায়াতকারীদের গতিবিধি লক্ষ করে এবং দেখে যে, অমুক ব্যক্তি কীভাবে গেল এবং কী করতে করতে গেল, অমুক ব্যক্তি কী আনল এবং কী নিয়ে গেল– তারপর যথাসময়ে নিজের এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনুসারে তাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করে।

এভাবেই বুঝে নাও যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থেকে সকল বান্দার ছোট বড় সকল অবস্থা ও আমল লক্ষ করে থাকেন। কোন আচরণ ও গতিবিধিই তাঁর নিকট গোপন নয়। তবে শাস্তি প্রদানে তিনি তাড়াতাড়ি করেন না। এতে গাফেল বান্দা ভুল করে এবং ভাবে যে, আমাকে দেখার ও প্রশ্ন করার কেউ নেই, সুতরাং যা ইচ্ছা অনায়াসে করে যাও। অথচ সময় এলে আল্লাহ যখন তাদের সব ক্রিয়াকাণ্ড ও ঠিক ঠিক অবস্থা প্রকাশ করে দেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে পূর্ব থেকে দেখা তার কৃত আমল অনুযায়ীই ব্যবহার করেন, তখন বুঝে আসে, এ সবই বান্দাদের জন্য অবকাশ ছিল এবং এ পরীক্ষা ছিল যে, দেখা যাক– তারা কোন্ কোন্ অবস্থায় কী কী করে? এবং একটি সাময়িক অবস্থার প্রতি লক্ষ করে শেষ পরিণতিকে ভুলে যাচ্ছে না তো?

২. অর্থাৎ আমি এরই যোগ্য ছিলাম। তাই তো তিনি আমাকে ইজ্জত দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ তিনি আমার মর্যাদা দেননি।

মোদ্দা কথা এই যে, তার দৃষ্টি নিতান্তই দুনিয়ার জীবন ও বর্তমান অবস্থাদির উপর নিবদ্ধ। দুনিয়ার বর্তমান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্টকেই ইজ্জত ও জিল্লতের মাপকাঠি মনে করে। সে

১৭. কখনই না! বরং তোমরা এতীমকে সম্মান দাও না[১],	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾
১৮. এবং অভাবীকে খাওয়াতে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না[২],	وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. আর মিরাছের সম্পত্তি একত্র করে সবটা খেয়ে ফেল[৩],	وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
২০. এবং ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস[৪]।	وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
২১. কখনই (এ সঠিক) নয়। যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ন করে সমান করে ফেলা হবে[৫],	كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

জানে না যে, উভয় অবস্থাতেই তার পরীক্ষা– নে'য়ামত দান করে কৃতজ্ঞতার এবং বিপদাপদ প্রেরণ করে তার ধৈর্য ও সন্তুষ্টির পরীক্ষা হচ্ছে। এখানকার সাময়িক আরাম-আয়েশ আল্লাহর নিকট মকবুল ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণ নয়। তেমনই নিছক দুরাবস্থা ও দুঃখ-কষ্টও বিতাড়িত হওয়ার আলামত নয়। কিন্তু মানুষ নিজের কাজকর্ম ও আমলাদির প্রতি দৃষ্টি দেয় না, বরং নিজের নির্বুদ্ধিতা কিংবা নির্লজ্জতার কারণে রবকে অভিযুক্ত করে।

১. অর্থাৎ যেখানে তোমরা অসহায়-এতীমদেরকে তাদের প্রাপ্য মানবীয় সম্মান দাও না এবং তাদের খোঁজখবর ও সমাদর কর না, সেখানে আল্লাহর নিকট তোমাদের মর্যাদা কেন হবে?

২. অর্থাৎ স্বীয় ধন ব্যয় করে এতীমদের খোঁজ-খবর নেওয়া তো দূরের কথা, তোমরা ক্ষুধার্ত অভাবীদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার প্রতি অন্যদেরও উৎসাহিত কর না।

৩. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি নেওয়ার ব্যাপারে হালাল-হারাম ও হক-নাহকের কোন তোয়াক্কা নেই– যা হস্তগত হল, গ্রাস করে নিল, এতীম ও অভাবীদের স্বত্ব নষ্ট হয়, হোক।

৪. অর্থাৎ মূল কথা এই যে, তোমাদের অন্তর ধন-সম্পদের লোভ ও মহব্বতে ভরা। একমাত্র ভাবনা এই যে, কোন উপায়ে ধন-সম্পদ হস্তগত হোক এবং এক পয়সাও কোন নেক কাজে ব্যয় হয়ে না যাক– ভবিষ্যৎ পরিণাম যাই হোক না কেন। ধন-সম্পদের প্রতি এতই মহব্বত ও লোভ যে, মানুষ একেই পরম ও চরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নেয়। এ একমাত্র কাফেরেরই রীতি হতে পারে।

৫. অর্থাৎ সকল টিলা-টালা ও পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে এবং পৃথিবীকে পরিষ্কার সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে।

২২. এবং আপনার রব আগমন করবেন[১] ও ফেরেশতারা আগমন করবে সারিবদ্ধ-ভাবে[২],	وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. আর সেদিন দোযখকে (সামনে) আনা হবে[৩]— সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে। কিন্তু তার জন্য (তখন) উপলব্ধির সুযোগ কোথায়☆[৪]?	وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۢ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. সে বলবে, 'কত ভাল হত, যদি আমি নিজের (এই) জীবনের জন্য (কিছু) অগ্রিম পাঠাতাম[৫]।'	يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
২৫. সেদিন আল্লাহর শাস্তির ন্যায় কেউ শাস্তি দিতে পারবে না।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত কেউ বাঁধতেও পারবে না[৬]।	وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾

১. অর্থাৎ আপন শানের উপযোগী ও পরাক্রমপূর্ণ তাজাল্লীর সাথে তিনি আগমন করবেন।

২. অর্থাৎ সেখানকার ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁরা হাশরের ময়দানে সমুপস্থিত হবেন।

৩. অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা দোযখকে স্বস্থান থেকে টেনে হাশরবাসীদের সামনে উপস্থিত করবেন।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'কিন্তু সেই উপলব্ধি তার উপকার করবে কীভাবে?'

৪. অর্থাৎ তখন সে বুঝবে যে, আমি দারুণ ভুলে ও গাফলতে ছিলাম। কিন্তু তখনকার উপলব্ধি কোন কাজে আসবে না, যেহেতু চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। 'দারুল আমল' তথা আমল করার স্থান দুনিয়া। যা করণীয় ছিল, সেখানেই করা উচিত ছিল। 'দারুল জাযা' তথা প্রতিফলের স্থান পরকালে তা করা সম্ভব না।

৫. অর্থাৎ আফসোস! দুনিয়ার জীবনে কিছু সৎকর্ম করে আগে পাঠাইনি, যা আজ এ জীবনের কাজে আসত। একদম শূন্য হাতে এখানে চলে এসেছি। হায়! সৎকর্মের কোন পুঁজি যদি আগে পাঠাতাম, যা এখানকার জন্য পাথেয় হত!

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সেদিন পাপীদের এমন কঠোর শাস্তি দেবেন এবং এমন কঠিন বাধনে বাঁধবেন যে, অন্য কারো পক্ষ থেকে কোন অপরাধীর জন্য এরূপ কঠোরতা চিন্তাই করা যায় না।

হযরত শাহ আবদুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি লেখেন, সেদিন আল্লাহর মারের মত মার আর কেউ মারতে পারবে না– আগুনও না, দোযখের ফেরেশতাও না, দোযখের সাঁপ-বিচ্ছুও না। কারণ, এসব কিছুর মার-পিটে ও আঘাতে দৈহিক শাস্তিই হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার শাস্তি এমন হবে যে, তাতে পাপীর অন্তর অনুতাপ ও অনুশোচনায় ভরে উঠবে, যা হবে আত্মিক শাস্তি। আর এ অতি স্পষ্ট কথা যে, আত্মিক শাস্তির সাথে দৈহিক শাস্তির কোন তুলনা হতে পারে না।

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত!

ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

২৮. আপন রবের দিকে এভাবে ফিরে আস যে, তুমি (তাঁর প্রতি) সন্তুষ্ট, (তিনিও) তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং প্রবেশ কর আমার বেহেশতে[১]।

অনুরূপ, আল্লাহ তাআলার বাঁধনের ন্যায় আর কেউ বাঁধতে পারবে না। কেননা, যদিও দোযখের পেয়াদারা দোযখীদের গলায় বেড়ি পরাবে এবং শিকল দিয়ে বাঁধবে এবং দোযখের দ্বার বন্ধ করে উপর থেকে মাথা ঢেকে দেবে, কিন্তু ওদের চিন্তা-বুদ্ধিকে আবদ্ধ করতে পারবে না। আর চিন্তা-বুদ্ধির প্রকৃতিই এই যে, তা নানা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে এবং সেগুলির মধ্য থেকে কোন কোনটা অন্যগুলির জন্য অন্তরায় হয়ে যায়। এ জন্যই কারারুদ্ধ অবস্থায়ও মানুষের চিন্তা-বুদ্ধির স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু তার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যার চিন্তা-কল্পনাকে আল্লাহ তাআলা এদিক-সেদিক ধাবিত হতে বাধা দেন এবং সম্পূর্ণরূপে তার দৈহিক দুঃখ-কষ্টের প্রতিই নিবদ্ধ করে রাখেন। বলা বাহুল্য, এরূপ কারাদণ্ড দৈহিক কারাদণ্ড অপেক্ষা হাজারগুণ বেশি কঠোর হয়। এ জন্যই উন্মাদ ব্যক্তিকে উদ্যানে বা খোলা মাঠে ভ্রমন করানোর সময়ও উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনার কারণে তার মধ্যে এমন অস্বস্তি ও পেরেশানী দেখা যায় যে, সেই বাগান ও প্রশস্ত মাঠও তার নিকট সংকীর্ণ মনে হয়।

১. অপরাধী ও জালেমদের অবস্থা বর্ণিত হওয়ার পর তার বিপরীতে এখন সেইসব লোকের পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকর ও ইবাদত-বন্দেগীতে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। হাশরের মাঠে তাদের বলা হবে, 'হে নিবেদিত প্রাণ! যে পরম প্রিয়তমের সঙ্গে তুমি প্রেমের সম্পর্ক পেতে রেখেছিলে, এখন সব রকমের চিন্তা-ভাবনা ও কলহ-বিবাদ থেকে মুক্ত হয়ে খুশী মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সান্নিধ্যের দিকে চল এবং তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের দলে শামিল হও, তাঁর সুউচ্চ জান্নাতে অবস্থান কর।'

কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায়, মুমিন ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময়ও এ সুসংবাদ শোনানো হয়। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৭৬৯)এমন কি আরেফীনদের অভিজ্ঞতা বলে যে, এই দুনিয়ার জীবনেও এরূপ প্রশান্তচিত্ত, শান্তিপ্রাপ্ত আত্মারা মোটামুটিভাবে এ ধরনের সুসংবাদের স্বাদ উপভোগ করে থাকে।

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ نفسًا بك مطمئنة ، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك ، وتقنع بعطائك

('আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন আত্মা কামনা করি, যা আপনাকে নিয়ে প্রশান্ত, যা আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে বিশ্বাসী, যা আপনার ফয়সালায় সন্তুষ্ট এবং যা আপনার দানে তুষ্ট।')

বি. দ্র. সূরা কিয়ামাহ-র শুরুতে (আয়াত, ২) 'নফসে মুতমাইন্নাহ' 'নফসে আম্মারাহ' ও 'নফসে লাউওয়ামাহ'-এর তাহকীক (বিশদ ব্যাখ্যা) দ্রষ্টব্য।

সূরা বালাদ

সূরা ৯০ । ২০ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٠، رُكُوعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি কসম করছি এ শহরের[১]!

لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

২. –আর আপনি এ শহরে অবারিত[২]–

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

৩. এবং (কসম করছি) পিতার ও তার সন্তানের[৩]!

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ

১. অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মর্যাদার শহর মক্কা শরীফের শপথ।

২. মক্কা শরীফে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য শুধু মক্কা বিজয়ের দিন উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেদিন যে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে, যদিও তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কতিপয় মারাত্মক অপরাধীকে কাবা ঘরেরই দেওয়ালের নিকট হত্যা করা হয়। সেই দিনের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সেই নিষেধাজ্ঞা পুনরায় বলবৎ থাকবে।

এই আয়াতের তাৎপর্য

বর্তমান আয়াতগুলোতে যেহেতু মক্কার শপথ করে সেইসব প্রতিকূল পরিস্থিতি ও কষ্ট-ক্লেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলোর ভিতর দিয়ে মানুষকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, আর সে সময় দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালী ব্যক্তিত্ব সেই শহরেই শত্রুদের পক্ষ থেকে কঠিনতম দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করেছিলেন– সে জন্য মাঝখানে বিচ্ছিন্নভাবে وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ বলে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, যদিও আজ এ শহরের জাহেলদের মধ্যে আপনার মর্যাদা বিঘ্নিত হচ্ছে, কিন্তু এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যখন এ শহরেই বিজয়বেশে আপনার প্রবেশ হবে এবং এ পবিত্র শহরকে চিরস্থায়ীভাবে মর্যাদাশালী ও পবিত্র করার উদ্দেশ্যে অপরাধীদের শাস্তি প্রদানেরও অনুমতি আপনাকে দেওয়া হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহর ফযলে ৮ম হিজরীতে বাস্তবায়িত হয়।

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসির وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ এই আয়াতকে وأَنْتَ نَازِلٌ এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ আমি এ শহরের কসম খাচ্ছি এমতাবস্থায় যে, আপনি এ শহরে জন্ম গ্রহণ করেছেন ও অবস্থান করেছেন।

৩. আদম (আ) ও বনী আদম উদ্দেশ্য। এ ছাড়া অন্য তাফসীরও রয়েছে।

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের মধ্যে[১]।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝
৫. সে কি মনে করে, তার উপরে কারো ক্ষমতা চলবে না[২]?	أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি[৩]।'	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝
৭. সে কি মনে করে, তাকে কেউ দেখেনি[৪]?	أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝

১. অর্থাৎ মানুষ জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত থাকে। তাকে নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। কখনো রোগে আক্রান্ত, কখনও কষ্টে পতিত, কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সম্ভবত সারা জীবনে এমন একটি প্রহরও আসে না, যখন কোন মানুষ সকল ধরনের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট, দুঃখ-দুর্দশা ও পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করতে পারে। বস্তুত মানব সৃষ্টির প্রকৃতিই এমন যে, মানুষ এসব দুঃখ-কষ্ট ও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেতে পারে না। আদম ও বনী আদমের হাল-অবস্থা সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতাই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর মক্কার মত মরু ও পাহাড়ী ভূখণ্ডে মানুষের জীবন, বিশেষত সেই যুগে, যখন সেখানে সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরতম জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার-আক্রমণের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছিলেন– অত্যধিক কঠিন ছিল। এক কথায় তা ছিল لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ এরই উজ্জ্বল সাক্ষী ও বাস্তব চিত্র।

২. অর্থাৎ মানুষকে যেসব দুঃখ-কষ্ট ও শ্রম-সাধনার পথ অতিক্রম করতে হয়, তার দাবি তো এই ছিল যে, তার মধ্যে বিনয়-নম্রতার মনোভাব পয়দা হোক এবং সে নিজেকে আল্লাহর হুকুম ও তাকদীরের সাথে বাঁধা মনে করে তাঁর আজ্ঞাবহ ও তাকদীরের অনুগত হোক এবং সর্বদা নিজের মুখাপেক্ষিতা, দুর্বলতা ও হীনতার ব্যাপারে সচেতন থাকুক। কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, সে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তবে কি সে মনে করে যে, কোনো সত্তা এমন নেই যার ক্ষমতা তার উপর চলতে পারে এবং যিনি তার অবাধ্যতার শাস্তি প্রদান করতে পারেন?

৩. অর্থাৎ রাসূলের সঙ্গে শত্রুতা, ইসলামের বিরোধিতা ও পাপের জায়গা ইত্যাদি অজায়গায়, বিচার-বিবেচনাহীন অর্থ ব্যয়কে সে বুদ্ধিমত্তা মনে কর। তারপর একে বাড়িয়ে-চড়িয়ে সগৌরবে বলে যে, আমি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে ফেলেছি, এর পরও কি আমার মোকাবেলায় কেউ কৃতকার্য হতে পারে? কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সে বুঝতে পারবে, এসব ব্যয় করা ধন-সম্পদ অযথাই বরবাদ হয়েছে, বরং উলটা নিজ প্রাণের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ সব দেখছেন– কোথায় কী পরিমাণ অর্থ কী নিয়তে ব্যয় করেছে। মিথ্যা আস্ফালনে কোন ফায়দা নেই।

৮. আমি কি তাকে দেইনি- দুটি চোখ[১], أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ⑧

৯. এবং একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট[২]? وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨

১০. আর আমি তাকে উভয় পথ (কল্যাণ ও অকল্যাণের) দেখিয়ে দিয়েছি[৩]। وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ⑩

১১. তবু সে গিরিপথে প্রবেশ করেনি[৪]। فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ⑪

১২. আপনি কি জানেন, গিরিপথ কী? وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ⑫

১৩. (তা হচ্ছে) গর্দান মুক্ত করা[৫], فَكُّ رَقَبَةٍ ⑬

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাওয়ানো[৬]— أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ⑭

---

১. অর্থাৎ যিনি দেখার জন্য চোখ দান করেছেন, তিনি কি নিজে দেখেন না? যিনি সকলকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, নিশ্চিতরূপে তিনি সর্বাধিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

২. যদ্বারা কথা বলতে ও পানাহারে সাহায্য নিয়ে থাকে।

৩. অর্থাৎ ভাল ও মন্দ উভয় পথ বলে দিয়েছেন, যেন মন্দ পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং ভাল পথ অনুসরণ করে। এই যে বলে দেওয়া এবং পথপ্রদর্শন করা– এটি সংক্ষিপ্তভাবে স্বভাব-প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি প্রদানের দ্বারা হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রদত্ত হেদায়েতবাণী দ্বারা হয়েছে। (অর্থাৎ মানুষ নিজ স্বভাব-প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারে যে, কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ। আর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সকল ভালো-মন্দ বিষয় বিস্তারিতভাবে অবহিত করে দেন। –অনু.)

বি. দ্র. কোন কোন মুফাসসির نَجْدَيْنِ দ্বারা মায়ের স্তন উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ শিশুকে দুধ পান করার ও খাদ্য হাসিল করার পথ বলে দিয়েছেন।

৪. অর্থাৎ এতসব নে'য়ামত পেয়েও এবং হেদায়াতের উপায়-উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে দীনের গিরিপথে প্রবেশের এবং চারিত্রিক গুণাবলি ও উৎকর্ষের পথ অতিক্রম করে সফলতার শীর্ষদেশে পৌঁছার তাওফীক হল না।

বি. দ্র. দীনের কাজকামকে পাহাড়ী রাস্তা (বা গিরিপথ) এজন্য বলা হয়েছে যে, তার জন্য প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে হয়, যা নফসের পক্ষে অসহনীয় ও কষ্টকর লাগে, (ঠিক যেমন গিরিপথে প্রবেশ ও তা অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন)।

৫. অর্থাৎ দাস-দাসীকে মুক্ত করা, অথবা ঋণী ব্যক্তিকে ঋণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা।

৬. অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধার্তদের খোঁজ-খবর নেওয়া।

১৫. এমন এতীমকে, যে আত্মীয়ও[১],

يَّتِيۡمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ ﴿۱۵﴾

১৬. অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে[২]।

اَوۡ مِسۡكِيۡنًا ذَا مَتۡرَبَةٍ ﴿۱۶﴾

১৭. অতঃপর তাকে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে তাদের, যারা ঈমান এনেছে[৩] এবং যারা পরস্পরকে সহনশীলতার তাগিদ করে এবং তাগিদ করে দয়া প্রদর্শনের[৪]।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡمَرۡحَمَةِ ﴿۱۷﴾

১৮. তারাই পরম ভাগ্যবান☆[৫]।

اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ ﴿۱۸﴾

১৯. আর যারা আমার আয়াতগুলি অস্বীকার করেছে, তারা হতভাগা☆☆[৬]।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَةِ ﴿۱۹﴾

২০. ওদের বেষ্টন করবে আবদ্ধ আগুন[৭]।

عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ ﴿۲۰﴾

---

১. এতীমের সাহায্য করা ছওয়াবের কাজ এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাতেও ছওয়াব। অতএব যেখানে উভয়ের সমন্বয় হবে, সেক্ষেত্রে দ্বিগুণ ছওয়াব হবে।

২. অর্থাৎ অভাব-অনটনে ও দারিদ্র্য-ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে মাটির সাথে মিশে আছে। এসব হল ধন-সম্পদ ব্যয় করার সঠিক ক্ষেত্র।

বিবাহ-শাদী, শোকানুষ্ঠানের অহেতুক রসম-রেওয়াজে এবং আল্লাহর নাফরমানীর কাজে টাকা-পয়সা বরবাদ করে দুনিয়ার অপমান ও আখেরাতের শাস্তির বোঝা ঘাড়ে নেওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

৩. অর্থাৎ এসব আমল গৃহীত হওয়ার সর্বাপেক্ষা বড় শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান না থাকলে সমস্ত আমলই ব্যর্থ-অসার।

৪. অর্থাৎ তারা একে অন্যকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সব রকমের দুঃখ-কষ্ট সইতে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন করতে তাগিদ দিতে থাকে, যাতে নিজেরা আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয়।

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তারাই ডানদিকওয়ালা'।

৫. অর্থাৎ এই লোকেরা বড়ই সৌভাগ্যশালী এবং কল্যাণ ও বরকতধারী, যারা 'মহান আরশের' ডানদিকে স্থান লাভ করবে এবং তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

☆☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'তারাই বাম দিকওয়ালা'।

৬. অর্থাৎ হতভাগ্য ও কপালপোড়া ওরা, যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে এবং যাদের আরশের বাঁ দিকে দাঁড় করানো হবে।

৭. অর্থাৎ দোযখে নিক্ষেপ করার পর তা থেকে বের হওয়ার সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সূরা শাম্স

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৯১ । ১৫ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ١٥، رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝

১. কসম সূর্যের ও তার উজ্জ্বল রোদের,

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝

২. এবং চাঁদের, যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে[১]।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝

৩. এবং দিনের, যখন তা সূর্যকে দীপ্তিমান করে[২]।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝

৪. এবং রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে ফেলে[৩]।

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝

৫. এবং আকাশের ও এমনভাবে তা বিনির্মাণ করার☆[৪],

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

৬. এবং পৃথিবীর ও এমনভাবে তাকে বিস্তৃত করার☆☆[৫],

---

১. অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর যখন চাঁদের আলো বিস্তার লাভ করে।

২. অর্থাৎ দিনের বেলায় যখন সূর্য পরিপূর্ণ দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যসহ উদ্ভাসিত হয়।

৩. অর্থাৎ রাতের অন্ধকার যখন খুব ঘনীভূত হয়ে যায় এবং সূর্যের আলোর কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'আকাশের ও তাঁর, যিনি তা নির্মাণ করেছেন'।

৪. অর্থাৎ (আল্লাহ) বিরাট ও বিশাল করে একে নির্মাণ করেছেন।

আর কোন কোন মুফাসসিরের নিকট ما بنٰها দ্বারা তার নির্মাণকারী উদ্দেশ্য।

☆☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'যমীনের ও তাঁর, যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন'।

৫. অর্থাৎ বড় হেকমতের (বা প্রজ্ঞার) সাথে তাকে সম্প্রসারিত করে সৃষ্টিকুলের বসবাসের যোগ্য করেছেন।

৭. এবং মানুষের ও এমন নিখুঁতভাবে তাকে বানানোর*১, وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ۝٧

৮. অতঃপর তাকে নাফরমানি ও পরহেজগারির (নেকী-বদীর) বুঝ দান করেছেন২। فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ۝٨

৯. অবশ্যই সে সফল হয়েছে, যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে৩। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۙ۝٩

এখানেও কারও কারও মতে ما طحها দ্বারা তার সম্প্রসারণকারী উদ্দেশ্য।

★ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'মানুষের ও তাঁর, যিনি তাকে নিখুঁতভাবে বানিয়েছেন'।

১. অর্থাৎ স্বভাব-প্রকৃতির ভারসাম্য, জাহেরী ও বাতেনী অনুভূতি শক্তি, প্রাকৃতিক, জৈবিক ও মানসিক শক্তি– সবই তাকে প্রদান করেছেন। সেই সাথে নেকী ও বদীর (বা পাপ-পুণ্যের) পথে চলার যোগ্যতা দান করেছেন।

২. অর্থাৎ প্রথমে মোটামুটিভাবে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও সঠিক স্বভাব দানের মাধ্যমে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার বোধশক্তি দিলেন। তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নবী-রাসূলের মুখে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, এ পথ পাপের এবং এ পথ পরহেজগারীর। তদুপরি অন্তরে নেকীর প্রতি যে অনুরাগ অথবা পাপের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়– এ উভয়ের স্রষ্টাও আল্লাহ তাআলাই, যদিও অন্তরে প্রথমটির অবতরণের মাধ্যম হন ফেরেশতা এবং দ্বিতীয়টার মাধ্যম হয় শয়তান।

পুণ্যের প্রতি এই অনুরাগ এবং পাপের প্রতি উক্ত আকর্ষণ কখনো বান্দার নিজ ইচ্ছা ও এখতিয়ারে সংকল্পের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে এবং বাস্তবে কাজে-কর্মে প্রকাশ পায়। এই কর্মের সৃষ্টিকারী ও অস্তিত্বদানকারী আল্লাহ, আর কর্ম সম্পাদনকারী ও অর্জনকারী বান্দা। ভালো কিংবা মন্দ কাজ যেহেতু বান্দার ইচ্ছা ও এখতিয়ারেই সম্পাদিত হয়, তাই কর্ম সম্পাদন ও অর্জনের 'কারণ' হল বান্দা। এ জন্যই তাকে ভালো-মন্দ কাজের প্রতিদান দেওয়া হয়। বান্দা কর্মের 'কারণ' হওয়ার ফলেই এ উভয়ের প্রতিফলের ধারা চালু রয়েছে। وهذه المسئلة من معضلات المسائل وتفصيلها يطلب من مظانها ونريد أن نفرد لها جزءا إن ساعدنا التوفيق والله الموفق والمعين. ('অর্থাৎ বিষয়টি জটিল বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। এর বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে সন্ধান করা যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করার ও স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনার ইচ্ছা আছে, যদি আল্লাহর তাওফীক আমাদের সহায়ক হয়। আর আল্লাহই তাওফীকদাতা ও সাহায্যকারী।')

৩. আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার অর্থ হল, রিপুশক্তি ও ক্রোধশক্তিকে আকলের (বা বিবেক-বুদ্ধির) অনুগত করা এবং আকলকে শরী'য়তে ইলাহীর (অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের)

১০. আর সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা বিনষ্ট করেছে[১]।	وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا ؕ﴿۱۰﴾
১১. ছামূদ সম্প্রদায় স্বীয় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল[২]–	كَذَّبَتۡ ثَمُوۡدُ بِطَغۡوٰىهَاۤ ﴿۱۱﴾
১২. যখন ওদের সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তিটা উঠে দাঁড়াল[৩]।	اِذِ انۡۢبَعَثَ اَشۡقٰىهَا ﴿۱۲﴾
১৩. তখন আল্লাহর রাসূল ওদের বললেন, 'আল্লাহর উটনী ও তার পানি পানের ব্যাপারে সতর্ক হও[৪]।'	فَقَالَ لَهُمۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقۡیٰهَا ﴿۱۳﴾

অনুগত বানানো, যাতে রূহ (আত্মা) ও অন্তর উভয়ই আল্লাহর তাজাল্লীর আলোতে আলোকিত হয়ে যায়।

১. ধ্বংস বা বিনষ্ট করার অর্থ হচ্ছে আত্মার রশি বা লাগামকে সম্পূর্ণরূপে রিপু ও ক্রোধের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এবং বিবেক-বুদ্ধি ও শরী'য়তের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক না রাখা– বলতে গেলে প্রবৃত্তি ও রিপুর দাস হয়ে যাওয়া। এরূপ মানুষ পশুর চেয়েও হীন ও নিকৃষ্ট।

বি. দ্র. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا হচ্ছে 'জওয়াবে কসম' বা শপথের উত্তর (বিষয়বস্তু)। আর (বিষয়-বস্তুর) সাথে শপথগুলির সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ তাআলা যেমন স্বীয় হেকমতের দ্বারা সূর্যের কিরণ ও চন্দ্রের আলো, দিনের ঔজ্জ্বল্য ও রাতের অন্ধকার, আকাশের উচ্চতা ও মাটির নিম্নতা— এসবের একটিকে অপরটির বিপরীত করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানবাত্মার মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় বিপরীতমুখী শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন এবং উভয়কে উপলব্ধি করার ও উভয় পথে চলার ক্ষমতা মানবকে দান করেছেন– ঠিক তদ্রূপ বিপরীতমুখী ও বিভিন্নমুখী আমল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফল ও ফলাফল আরোপ করাও সেই পরিপূর্ণ হেকমতওয়ালারই কাজ। আর দুনিয়াতে ভাল ও মন্দের উপস্থিতি এবং এ উভয়ের বিভিন্ন প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলের অস্তিত্ব সৃষ্টিগত বিবেচনা ও হেকমতের দিক থেকে তেমনই সংগত ও যুক্তিযুক্ত, যেমন সংগত ও যুক্তিযুক্ত আলো ও আঁধারের অস্তিত্ব।

২. অর্থাৎ ওরা হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এ আয়াতে قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا আয়াতেরই একটি দৃষ্টান্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আরাফ (আয়াত, ৭৩-৭৫) প্রভৃতিতে এ কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এই হতভাগা ছিল কুদার ইবনে সালেফ।

৪. অর্থাৎ খবরদার! একে হত্যা করো না, এর পানিও বন্ধ করো না। পানির উল্লেখ এজন্য করলেন যে, বাহ্যত পানির কারণেই একে হত্যা করতে ওরা উদ্যত হয়েছিল। আর 'আল্লাহর উটনী' এ হিসাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ একে হযরত সালেহ (আ)-এর

১৪. কিন্তু ওরা তাঁকে অস্বীকার করল এবং উটনীর পা কেটে ফেলল। ফলে ওদের পাপের কারণে ওদের রব ওদের সমূলে ধ্বংস করে (মাটির সাথে) মিশিয়ে দিলেন[১]।

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۙ

১৫. আর আল্লাহ তার বিরূপ পরিণতির আশঙ্কা করেন না[২]।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۟

নবুওয়াতের একটি নিদর্শনস্বরূপ সৃষ্টি করেছিলেন এবং এর প্রতি মর্যাদাদান ওয়াজেব করেছিলেন। এ কাহিনী ইতিপূর্বে সূরা আরাফ (আয়াত, ৭৩) প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

১. হযরত সালেহ (আ) বলেছিলেন– وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (এই উটনীকে স্পর্শ করো না মন্দভাবে, তাহলে তোমরা কঠোর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে ফেঁসে যাবে। –আ'রাফ : ৭৩) সেই লোকেরা এ কথাকে মিথ্যা মনে করে পয়গম্বরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং উটনীকে হত্যা করে ফেলল। পরিশেষে তাই হল, যা হযরত সালেহ (আ) বলেছিলেন। আল্লাহ সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

২. অর্থাৎ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের পক্ষ থেকে কোন বড় সম্প্রদায় বা দলকে শাস্তি প্রদানের পর দেশে আন্দোলন হওয়ার অথবা রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে। এসব কিছুর আশঙ্কা আল্লাহর ক্ষেত্রে মোটেই হতে পারে না। এমন কোন্ শক্তি আছে, যে শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর পেছনে পড়তে পারে?

সূরা লাইল

سُوْرَةُ اللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৯২ । ২১ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٢١، رُكُوعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
১. কসম রাতের, যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে ফেলে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝
২. এবং দিনের, যখন তা আলোকিত হয়।	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝
৩. এবং তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী–	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝
৪. নিশ্চয় তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের[১]।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝
৫. তো, যে ব্যক্তি দান করেছে, ভয় করে চলেছে,	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝
৬. এবং উত্তম কথাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে–	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝
৭. আমি তাকে সহজে পৌঁছিয়ে দেব শান্তিময় স্থানে[২]।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝
৮. আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করেছে, বেপরোয়া থেকেছে,	وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝
৯. এবং উত্তম কথাকে অস্বীকার করেছে–	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝
১০. আমি তাকে সহজে পৌঁছিয়ে দেব যাতনাময় স্থানে[৩]।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন রাত ও দিন, নর ও নারী প্রভৃতি বিপরীতমুখী বস্তুসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তদ্রূপ তোমাদের ক্রিয়া-কর্ম ও চেষ্টা-সাধনাও বিভিন্ন রকম ও বিপরীতমুখী। বলা বাহুল্য, এই বিভিন্ন শ্রেণীর আমল ও সাধনার ফলাফল ও পরিণামও ভিন্ন ভিন্ন হবে। সম্মুখে এরই আলোচনা রয়েছে।

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎপথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে চলে, ইসলামের সুন্দর সুন্দর কথাকে সত্য বলে জানে এবং আল্লাহপ্রদত্ত সুসংবাদসমূহকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে– তার জন্য আমি আমার নীতি অনুযায়ী পুণ্যের পথ সুগম করে দিই, আর তাকে পরিণামে অশেষ শান্তি ও আরামের স্থানে পৌঁছিয়ে দেব, যার নাম বেহেশত।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করেনি, তাঁর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের প্রতিফলের পরোয়া করেনি এবং ইসলামের কথাগুলিকে ও আল্লাহর ওয়াদাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে– তার অন্তর

১১. আর ওর ধন-সম্পদ ওর কোন উপকারে আসবে না, যখন ও পতিত হবে (জাহান্নামের গর্তে)[১]। وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ⑪

১২. নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব পথ দেখিয়ে দেওয়া। اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ⑫

১৩. এবং আমারই কব্জায় আখেরাত ও দুনিয়া[২]। وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ⑬

১৪. আর আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন সম্পর্কে[৩]। فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ⑭

১৫. তাতে পতিত হবে কেবল নিতান্ত হতভাগা, لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ⑮

১৬. যে অস্বীকার করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে[৪]। الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ⑯

ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ ও কঠিন হতে থাকবে, সৎকর্মের তাওফীক রহিত হতে থাকবে এবং পরিশেষে সে ধীরে ধীরে আল্লাহর আযাবের কঠিনতম স্থানে (দোযখে) গিয়ে পৌঁছবে।

আল্লাহর শ্বাশত নীতি এ-ই যে, ভাগ্যবানেরা যখন নেক আমল অবলম্বন করে এবং হতভাগারা যখন বদ আমলের দিকে ধাবিত হয়, তখন উভয়ের জন্য সেই পথই সহজ করে দেওয়া হয়, যা তারা খোদায়ী তাকদীর অনুযায়ী, (তবে) নিজেদের ইচ্ছা ও এখতিয়ারে পছন্দ করে নিয়েছে– كُلًّا نُّمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (আমি আপনার রবের দান থেকে সকলকে দিয়ে থাকি– এদেরকেও, ওদেরকেও। আর আপনার রবের দান অবরুদ্ধ নয়। –ইসরা, আয়াত ২০)

১. অর্থাৎ সে যে ধন-সম্পদের কারণে বড়াই করে আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ছিল, তা আল্লাহর আযাব থেকে ওকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না।

২. অর্থাৎ কোন মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক নেক বা বদ বানিয়ে দেওয়া আমার হেকমতের অনুকূল নয়। তবে সকলকে পাপ-পুণ্যের পথ বুঝিয়ে দেওয়ার এবং ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণকে খুব সুন্দর করে বর্ণনা করে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। এখন যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আমি তার সঙ্গে সেরূপ ব্যবহারই করব।

৩. এর দ্বারা সম্ভবত দোযখের সেই স্তর উদ্দেশ্য, যা গুরুতর অপরাধী ও হতভাগাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

৪. অর্থাৎ এমন ব্যক্তিই তাতে চিরকালের জন্য পতিত হবে। তারপর আর কখনো বের হয়ে আসার ভাগ্য হবে না। (বাকি রইল গোনাহগার মুসলমান, সে দোযখে প্রবেশে করলেও এক সময় না এক সময় তা থেকে মুক্তি পাবে–অনু.) كما تدل عليها النصوص (কুরআন, হাদীস দ্বারা তা-ই প্রমাণিত)।

১৭. আর তা থেকে অবশ্যই রক্ষা করা হবে পরম মুত্তাকীকে[১],

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

১৮. যে স্বীয় ধন-সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য[২]।

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

১৯. আর তার উপর কারো অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে।

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى

২০. কিন্তু (সে দান করে) কেবল স্বীয় মহামহিম রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

২১. এবং অচিরেই সে পরিতৃপ্ত হবে[৩]।

وَلَسَوْفَ يَرْضَى

---

১. অর্থাৎ এমন ব্যক্তিদের গায়ে ওই আগুনের ভাপও লাগবে না। তাদের কোনই ক্ষতি হবে না, তাদের সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে রাখা হবে।

২. অর্থাৎ নফসকে কৃপণতা, লোভ, প্রভৃতি দোষ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্য ধন ব্যয় করে, কোন রকমের রিয়া ও লোক দেখানো অথবা পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়।

৩. অর্থাৎ ব্যয় করার কারণ কোন মানুষের অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া নয়, বরং একমাত্র মাওলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং আল্লাহর দীদারের বাসনায় ধন-সম্পদ বিসর্জন দিচ্ছে। সুতরাং তার নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে, তাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে। এবং তার এই বাসনা নিশ্চিতরূপে পূর্ণ হবেই হবে إِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। –সূরা তাওবা, ১২০)

বি. দ্র. যদিও আলোচ্য আয়াতগুলির বিষয়বস্তু সর্বজনীন, কিন্তু সর্বশেষ আয়াতগুলি সাইয়েদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শানে অবতীর্ণ হয়েছে বলে অনেক হাদীসে আছে (তাফসীরে তবারী ২৪/৪৭৯; মুসতাদরাকে হাকিম, বর্ণনা ৩৯৮৬)। বলা বাহুল্য, এ তাঁর ফযীলত ও মহামার্যাদার এক বিরাট দলীল। কতই না সৌভাগ্য সেই বান্দার, যার সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাকী হওয়ার সমর্থন ও সত্যায়ন আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী।) এবং যাকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ولسوف يرضى বলে সুসংবাদ শোনানো হয়।

বস্তুত হযরত আবু বকর (রা.)- কে শেষ আয়াতে যে সুসংবাদ দান করা হল, তা ওই মহা সুসংবাদের একটি প্রতিবিম্ব, যা সামনের সূরায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয়েছে এ আয়াতে– وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

সূরা দুহা

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা ৯৩ । ১১ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ١١، رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالضُّحٰى ۝

১. কসম উজ্জ্বল রোদের।

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝

২. এবং রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে–

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝

৩. আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং (আপনার প্রতি) অসন্তুষ্টও হননি[১]।

---

১. **শানে নুযূল**

সহীহ হাদীছে আছে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কিছুদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেননি। (অর্থাৎ কুরআনের অবতরণ বন্ধ থাকে) এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করল, '(এই তো!) মুহাম্মদকে তার রব বিদায় করে দিয়েছেন। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৯৭)

উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ

আমার ধারণা এই যে, এ সময়টা ছিল ওহী বন্ধ থাকার (فترة الوحي-এর) সময়। সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলি নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘদিন ওহীর অবতরণ বন্ধ থাকে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী বন্ধ থাকার এই সময়ে অত্যন্ত বিষণ্ন ও বিচলিত থাকতেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ফেরেশতা তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ-এর সম্বোধন শোনান (অর্থাৎ সূরা মুদ্দাছছির নাযিল হয়)।

খুব সম্ভব তখন বিরুদ্ধবাদীরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটু কথাবার্তা বলে থাকবে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ থেকে ইবনে কাছীর (র) যেসব বর্ণনা নকল করেছেন, তাতে এ সম্ভাবনারই সমর্থন মেলে। আর হতে পারে এ সময়েই সেই ঘটনাটিও ঘটেছে, যা বিভিন্ন সহী হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা অসুস্থতার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই-তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। এতে এক খবীছ মেয়েলোক বলতে শুরু করল, 'হে মুহাম্মদ! মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।' (আল্লাহর পানাহ!) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৯৫০) মোটকথা, এসব অমূলক কথাবার্তার উত্তর সূরা দুহার মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের অর্থ-মর্ম এবং যে বিষয়ে কসম করা হয়েছে তার সাথে কসমদ্বয়ের সামঞ্জস্য

প্রথমেই উদীয়মান সূর্যালোকের সময় অর্থাৎ পূর্বাহ্নের ও অন্ধকার রাতের কসম খেয়ে আল্লাহ তাআলা বলছেন, (শত্রুদের সকল ধারণা ভ্রান্ত), আপনার প্রভু আপনার প্রতি নারায ও

৪. আর নিশ্চয় আপনার জন্য পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে অনেক ভাল*১।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾

৫. এবং নিশ্চয় আপনার রব আপনাকে অচিরেই এত দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন২।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾

৬. তিনি কি আপনাকে এতীম পাননি, অতঃপর (আপনাকে) আশ্রয় দিয়েছেন৩?

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾

অসন্তুষ্টও হননি এবং আপনাকে বিদায়ও করে দেননি। বরং তিনি যেমন বস্তুজগতে স্বীয় ক্ষমতা ও হেকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করে থাকেন এবং দিনের পিছনে রাত এবং রাতের পিছনে দিনকে আনয়ন করেন, তদ্রূপ আত্মিক জগতের অবস্থাদিও বুঝে নিন। সুতরাং সূর্যের আলোর পর রাতের অন্ধকারের আগমন যেমন আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির প্রমাণ নয় এবং তা এরও প্রমাণ নয় যে, এ অন্ধকারের পর দিনের আলোর আগমন কখনো হবে না– তদ্রূপ ওহীর আলোর আগমন কয়েক দিন বন্ধ থাকায় কী করে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা এখন তাঁর নির্বাচিত পয়গম্বরের প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন এবং সর্বদার জন্য ওহীর দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন? এমন কথা বলার অর্থ তো বরং আল্লাহর সর্বব্যাপী ইলম ও পরিপূর্ণ হেকমতের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করা– যেন তাঁর এ কথা জানা ছিল না যে, যাকে তিনি নবী নির্বাচন করছেন, তিনি ভবিষ্যতে এর অযোগ্য প্রমাণিত হবেন। (আল্লাহর পানাহ!)

☆ **দ্বিতীয় তরজমা–** 'আখেরাত দুনিয়া থেকে শ্রেয়'।

১. অর্থাৎ আপনার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে বহু গুণে উচ্চ ও উন্নত। এই কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকাটা আপনার পতন ও অবনতির কারণ নয়, বরং অধিক থেকে অধিকতর উন্নতি ও উত্থানের উপায়। আর যদি 'পরবর্তী অবস্থা' থেকে আরও পরবর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করা হয়, অর্থাৎ আখেরাতের মর্যাদা ও শান-শওকতের অবস্থা, যখন আদম আ. ও গোটা বনী আদম আপনার (অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হবেন, তাহলে তো কথাই নেই! সেখানকার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তো এখানকার মান-মর্যাদার চেয়ে বহু বহু গুণে বেশি হবে।

২. অর্থাৎ নারায ও অসন্তুষ্ট হয়ে পরিত্যাগ করা তো দূরের কথা, অচিরেই আপনার রব আপনাকে (দুনিয়া ও আখেরাতে) এতসব দৌলত ও নেয়ামত দান করবেন যে, আপনি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুহাম্মদ সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উম্মতের একজন মানুষও দোযখে থাকবে।' (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন) (শুআবুল ঈমান, হাদীস : ১৩৭৪; তালখীসুল মুতাশাবিহ : ১/১৭৩ –এর সনদ দুর্বল)

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান। অতঃপর ছয় বছর বয়সে তাঁর মায়েরও মৃত্যু ঘটে। তারপর আট বছর বয়স পর্যন্ত নিজের দাদা

৭. এবং আপনাকে পেয়েছেন (পথ সম্পর্কে) অনবহিত, অতঃপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন[১]। | وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۞

(আবদুল মুত্তালেব) এর প্রতিপালনে থাকেন। অবশেষে এ সম্বলহীন এতীম-রত্নের বাহ্যিক শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের সৌভাগ্য তাঁর স্নেহময় চাচা আবু তালেবের কাছে আসে। তিনি আজীবন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থেকেছেন। হিজরতের কিছু পূর্বে তিনিও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলার এ আমানত তাঁরই হুকুমে মদীনাবাসী আনসারদের কাছে পৌছে। ফলে সেখানকার 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয়ের সৌভাগ্য-তারকা জ্বলে ওঠে। তাঁরা এমনভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন যে, সম্ভবত ইতিহাসে এর কোনও নজীর নেই।

আয়াতে যে 'আশ্রয় দানের' কথা বলা হয়েছ, তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে এ সবই অন্তর্ভুক্ত, যেমন ইশারা করেছেন তাফসীরকার ইবনে কাছীর (র.)।

১. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যৌবনে পদার্পন করেন, তখন জাতির শিরেকী কর্মকাণ্ড ও অর্থহীন কুসংস্কারসমূহের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁর অন্তরে একক আল্লাহর ইবাদতের জযবা পূর্ণোদ্যমে আলোড়িত ছিল। প্রভু-প্রেমের আগুন বরকতময় সিনার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। প্রভু পর্যন্ত পৌছানোর এবং মানবকে হেদায়াত দানের পূর্ণাঙ্গতম যে গুণ সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে গচ্ছিত রাখা ছিল, তা ভিতরে ভিতরে আন্দোলিত হচ্ছিল। কিন্তু বাহ্যত কোন পরিষ্কার, উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ এবং কর্মপন্থা পাওয়া যাচ্ছিল না, যা পেয়ে ওই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত অন্তর (নবীর অন্তর) শান্তি লাভ করতে পারত। সত্য সন্ধানের এহেন প্রেরণা এবং সত্যের প্রতি অতিশয় ভালবাসার কারণে তিনি অত্যন্ত পেরেশান ও অস্থির হয়ে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে প্রভুকে স্মরণ করতেন ও প্রকৃত প্রেমাস্পদকে ডাকতেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা 'হেরা' পর্বতে ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে ওহী দিয়ে পাঠালেন এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ও বিশ্বজগতের সংস্কারের পূর্ণাঙ্গ পথ ও পন্থা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে অবারিত করে দিলেন– অর্থাৎ সত্য দীন নাযিল করলেন। এ বিষয়টি আল্লাহ তাআলা অন্যত্র এইভাবে ব্যক্ত করেছেন– مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا (আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী! কিন্তু আমি একে [অর্থাৎ কুরআনকে] করেছি এক নূর। এর দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। –সূরা শূরা, ৫২)

বি. দ্র. এস্থলে ضالا এর অনুবাদ করার সময় সূরা ইউসুফের আয়াত– قَالُوْا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৫) সামনে রাখা উচিত।

৮. আর আপনাকে পেয়েছেন অভাবী, অতঃপর অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন[১]।	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ۝
৯. অতএব যে এতীম, তার উপর জোর-জবরদস্তি করবেন না[২],	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝
১০. এবং যে সাহায্যপ্রার্থী, তাকে ধমকাবেন না[৩]।	وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

১. এভাবে যে, হযরত খাদিজা (রা)-এর ব্যবসায়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশীদার হলেন এবং তাতে লাভবান হলেন। অতঃপর খাদিজা (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন এবং নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর খেদমতে পেশ করে দিলেন। এ তো ছিল বাহ্যিক ধনাঢ্যতা। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী ও বাতেনী ধনাঢ্যতার অবস্থা তো একমাত্র আল্লাহই জানতেন, কোন মানুষের পক্ষে তার অনুমান করা মোটেই সম্ভব নয়।

সারকথা, নবীজি (সা) প্রথম থেকেই আল্লাহ তাআলার সমূহ নে'য়ামত ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন। যে প্রভু-পরওয়ারদেগার এরূপ মর্যাদার সাথে আপনার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন, তিনি কি রাগান্বিত হয়ে (আল্লাহ মাফ করুন) মাঝপথে আপনাকে পরিত্যাগ করতে পারেন?

২. বরং তার খোঁজ-খবর নিবেন এবং আদর-যত্ন করবেন। এতীম থাকা অবস্থায় আপনাকে আল্লাহ তাআলা আশ্রয় দিয়েছিলেন, তেমনি আপনি অন্য এতীমদের আশ্রয় দিবেন। এরূপ উত্তম চরিত্র অবলম্বন করলে বান্দা আল্লাহর রঙে রঙীন হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে অপর এক জায়গায় (বাকারা, ১৩৮) আছে- صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً [আমরা গ্রহণ করেছি] আল্লাহর রঙ। আর আল্লাহর [রঙের] চেয়ে কার রঙ উত্তম?)— এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى ('আমি ও এতীমের তত্ত্বাবধানকারী এ দু'টির মত' - এ কথা বলে তিনি [তাঁর] মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করলেন।) (মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮২০; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৩০৪)

৩. অর্থাৎ আপনি সম্পদহীন ছিলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ঐশ্বর্য দান করেছেন। সুতরাং কৃতজ্ঞ বান্দার উচিত, ভিখারীদের প্রতি কৃপণতা না করা এবং অভাবীদের সওয়ালে বিব্রত হয়ে ধমকাতে শুরু না করা। বরং উদারচিত্ত ও সদয় হওয়া এবং কোমল ব্যবহার করা। বিভিন্ন হাদীসে ভিখারীদের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদারচিত্ততা ও কোমল ব্যবহারের যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা বড় থেকে বড় শত্রুকেও তাঁর কোমল চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে বাধ্য করে।

১১. আর আপনার রবের যে অনুগ্রহ, তা বর্ণনা করুন[১]।

وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ۝١١

বি. দ্র. তাফসীরের বিখ্যাত কিতাব 'রূহুল মাআনী' এর লেখক লেখেন, ভিখারীকে ধমকানো তখন নিষিদ্ধ, যখন তাকে নম্রতার সাথে কথা বললে মেনে নেয়। নতুবা সে যদি জিদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোন ক্রমেই না মানে, তখন ধমকানো জায়েয আছে।

১. গৌরব করা ও বড়াই করার জন্য নয়, বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়তে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের আলোচনা করা শরী'য়তের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়। সুতরাং যেসব নে'য়ামতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আপনাকে ধন্য করেছেন, তা বর্ণনা করুন। বিশেষ করে وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى – এই আয়াতে হেদায়াত-রূপ যে নে'য়ামতটির কথা বলা হয়েছে, এর প্রচার-প্রসার করা এবং খুলে খুলে হেদায়েতের কথা বর্ণনা করা তো আপনার মহান দায়িত্ব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, কর্ম প্রভৃতিকে যে 'হাদীছ' বলা হয়, সম্ভবত তা এই 'فَحَدِّثۡ' শব্দটি থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সূরা ইনশিরাহ

سُوْرَةُ الانشراح مَكِّيَّةٌ

সূরা ৯৪ । ৮ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٨، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

১. আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি[১]?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

২. আর আপনার উপর থেকে নামিয়ে দিয়েছি আপনার বোঝা–

الَّذِيْٓ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

৩. যা আপনার পিঠকে নুইয়ে দিয়েছিল[২]।

---

১. এভাবে যে, আপনার বক্ষে ইলম ও মারেফতের সমুদ্র বইয়ে দিয়েছি এবং নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব ও রেসালাতের মহান কর্তব্য পালনের উপযোগী মহাশক্তি ও সাহস দান করেছি, যেন অসংখ্য শত্রুর শত্রুতায় ও বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধাচরণে বিচলিত না হন।

বি. দ্র. বিভিন্ন হাদীস ও সীরাতগ্রন্থ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দৈহিকভাবেও ফেরেশতাগণ কয়েক বার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদারণ করেছেন। তবে বাহ্যত এই আয়াতের বিষয়বস্তু তা মনে হয় না। والله أعلم

২. ওহীর অবতরণ প্রথম দিকে নবীজীর জন্য খুব কষ্টকর ছিল, পরে তা সহজ হয়ে যায়। অথবা হয়তো মহান রিসালাতের গুরুদায়িত্বের চিন্তা-ভারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরে চাপ অনুভূত হত, সেই ভার বা বোঝা অপসারিত করা হয়।

অথবা وزر বলতে সেই সব মুবাহ কাজ উদ্দেশ্য, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেকমতপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে কখনো কখনো করে ফেলতেন। কিন্তু পরে হেকমতের খেলাফ বা অনুত্তম বলে প্রকাশ পাওয়ার ফলে তিনি নিজের উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর পরম নৈকট্যধারী হওয়ার কারণে এমনই দুঃখিত হতেন, যেমনটি কেউ কোন গোনাহর কারণে হয়ে থাকে। বর্তমান আয়াতে এ ধরনের কাজের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ না করার সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীদের কারো কারো থেকে এ তাফসীর বর্ণিত রয়েছে।

আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লেখেন, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ সাহসিকতা ও সৃষ্টিগত যোগ্যতা যেসব মহৎ গুণ ও মাকাম অর্জনের অভিলাষী হত, কিন্তু দৈহিক গঠন ও বিন্যাস বা মানসিক চিন্তাক্লিষ্টতার কারণে সেথায় পৌঁছতে অন্তর মুবারকের কাছে হয়তো কঠিন মনে হত- আল্লাহ তাআলা সীনা খুলে দেওয়ায় এবং সাহস বৃদ্ধি করার পর সেই সব কঠিন অবস্থার অবসান ঘটে এবং সমস্ত বোঝা হালকা হয়ে যায়।'

৪. এবং আপনার জন্য আপনার স্মরণকে করেছি সমুন্নত[১]। وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞

৫. নিশ্চয় কাঠিন্যের সাথে আসানী আছে। فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

৬. নিশ্চয় কাঠিন্যের সাথে আছে আসানী[২]। إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

---

১. অর্থাৎ পয়গম্বর ও ফেরেশতাদের মধ্যে আপনার নাম সর্বোচ্চে রয়েছে। দুনিয়াতে সকল জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মহামর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে আপনার আলোচনা করে। আযান, ইকামত, খুত্বা, কালেমা তায়্যেবা ও আত্তাহিয়্যাতু প্রভৃতির মধ্যে আল্লাহর নামের পরেই আপনার নাম নেওয়া হয় এবং আল্লাহ তাআলা যেখানেই বান্দাদেরকে নিজ আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন সেখানে সাথে সাথে আপনার আনুগত্যেরও তাকীদ করেছেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আপনি যে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, সাধনা ও পরিশ্রম করেছেন, সেসবের মধ্যে প্রত্যেকটি কষ্টের সাথে একাধিক আসানী রয়েছে। যথা: সাহস বৃদ্ধি করে দেওয়া, যার ফলে সেইসব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা (আপনার জন্য) সহজ হয়ে গিয়েছিল। এবং '(আপনার) স্মরণ বুলন্দ করে দেওয়া'– এ বিষয়টি মনে থাকলেও বড় বড় বিপদ সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

অথবা অর্থ এই যে, যেহেতু আমি আপনাকে রূহানী প্রশান্তি দান করেছি এবং রূহানী কষ্ট দূর করে দিয়েছি– যেমনটি أَلَمْ نشرح থেকে জানা গেল– সুতরাং পার্থিব কষ্ট ও পরিশ্রমের ক্ষেত্রেও আমার দয়া ও অনুগ্রহ লাভের আশা রাখা উচিত। আমি ওয়াদা করছি যে, নিশ্চয় বর্তমান দুঃখ-কষ্টের পর আসানী হবে এবং অধিকতর তাকীদস্বরূপ পুনরায় বলছি যে, বর্তমান কষ্টের পর অবশ্যই আসানী হবেই হবে। সে মত হাদীস ও সীরাতের কিতাবাদি থেকে জানা যায় যে, সেসব কষ্ট ও দুর্দশা এক এক করে দূর করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটি কষ্ট বা জটিলতার পরে একাধিক আসানী সমুপস্থিত হয়।

আল্লাহর একটি রীতি

এখনও আল্লাহর নিয়ম ও রীতি এ-ই যে, যে ব্যক্তি কষ্টে ধৈর্যধারণ করে এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, সকল দিক থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে আর তাঁরই দয়া ও রহমতের আশাবাদী হয়, দেরি দেখে পেরেশান হয়ে আশা পরিত্যাগ না করে—আল্লাহ নিশ্চয়ই তার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দেন– একভাবে নয়, বরং বিভিন্নভাবে। হাদীসে আছে- لن يغلب عسر يسرين ('একটা কষ্ট দু'টি স্বস্তিকে ছাপিয়ে যেতে পারে না।) আরো আছে– ولو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخلَ عليه ('যদি কষ্ট এসে গর্তে আশ্রয় নেয়, তবে অবশ্যই স্বস্তির বিষয় এসে তার উপর দাখিল হবে।' অর্থাৎ স্বস্তির বিষয় অস্বস্তির বিষয়কে সর্বাবস্থায় ছাপিয়ে যাবে)। (তাফসীরে তবারী ২৪/৪৯৬; কাশফুল আসতার, বর্ণনা ২২৮৮; তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম, বর্ণনা ১৯৩৯৫)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞

৭. তো, আপনি যখন অবসর হন তখন সাধনা করুন,

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۞

৮. এবং স্বীয় রবেরই প্রতি মনোনিবেশ করুন[১]।

---

১. অর্থাৎ সৃষ্টিজীবকে দীনের কথা বোঝানোর পর যখন অবসর হবেন, তখন নির্জনে বসে সাধনা করবেন, যাতে তা অধিকতর আসানীর কারণ হয় এবং (মাধ্যম ছাড়া সরাসরি) নিজ রবের অভিমুখী হবেন।

বি. দ্র. সৃষ্টিজীবকে বুঝানো ও নসীহত করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ (উৎকৃষ্ট) ইবাদত ছিল বটে, কিন্তু তাতেও মোটামুটি মাখলূকের একটা মধ্যস্থতা ছিল। কাম্য এই যে, তিনি এই মধ্যস্ততা থেকে সরে গিয়ে মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হোন।

আয়াতের তাফসীর আরও কয়েকভাবে করা হয়েছে, তবে এ-ই অধিকতর নিকটবর্তী মনে হয়।

সূরা তীন

সূরা ৯৫ । ৮ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨، رُكُوْعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম আঞ্জীর ও যয়তুনের[১],

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝

২. 'তূরে সীনীন'-এর,

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝

৩. এবং এই নিরাপদ শহরের[২]!

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۝

৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে[৩]।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝

---

১. আঞ্জীর ও যয়তুন– এ ফল দু'টি অনেক বেশি উপকারী ও অতীব গুণাগুণসম্পন্ন হওয়ার কারণে মানুষের সামগ্রিক প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্য রাখে। এ জন্যই لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ আয়াতের বিষয়বস্তুকে আল্লাহ এ ফল দু'টির কসমের দ্বারা শুরু করেছেন। আর কোন কোন বিজ্ঞ মুফাসসির বলেন, এখানে التين ও الزيتون দ্বারা দুটি পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলির সন্নিকটে 'বায়তুল মুকাদ্দাস' অবস্থিত। অর্থাৎ এস্থলে আঞ্জীর ও যয়তুন বৃক্ষের শপথ উদ্দেশ্য নয়, বরং সেই পবিত্র স্থানের শপথ করা উদ্দেশ্য, যেখানে এ গাছ দুটি অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। আর সেটিই ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমি ও নবুওয়াতপ্রাপ্তির স্থান।

২. 'তূরে সীনীন' বা 'তূরে সাইনা' সেই পর্বতকে বলা হয়, যার উপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সঙ্গে 'হাম-কালাম' হওয়ার বা কথা বলার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর 'নিরাপদ শহর' বলতে মক্কা শরীফ উদ্দেশ্য, যেখানে সমগ্র বিশ্বের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এবং আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আমানত (কুরআন কারীম) প্রথমত এ শহরেই অবতীর্ণ হয়। তাওরাতের শেষের দিকে আছে– 'আল্লাহ তূরে সাইনা থেকে আগমন করেন, (ساعير) 'সাঈর' থেকে চমকান (যা বাইতুল মুকাদ্দাসের পর্বতবিশেষ) এবং 'ফারান' থেকে উর্ধ্বে উঠে বিস্তৃত হন (ফারান মক্কার পর্বতবিশেষ)'।

৩. অর্থাৎ উক্ত সব মুবারক স্থান, যেগুলিতে এমন এমন মহামর্যাদাশালী পয়গম্বরগণ আবির্ভূত হয়েছেন, এই বিষয়ের সাক্ষী যে, আমি মানুষকে কতই না সুন্দর ছাঁচে গঠন করেছি এবং

৫. অতঃপর আমি তাকে হীনদের হীনতমে পরিণত করি[১]।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝
৬. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত ছওয়াব[২]।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝
৭. এরপরও কী কারণে তুমি (হে মানুষ!) বিচারকে অস্বীকার করছ[৩]?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝

কত রকম শক্তি-সামর্থ্য এবং জাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যের সমাবেশ তার অস্তিত্বের মধ্যে ঘটিয়েছি। তার মধ্যে সৃষ্টির যেসব উপাদান রাখা হয়েছে, যদি সে তার সঠিক প্রয়োগ করে সম্মুখে অগ্রসর হয়, তবে ফেরেশতাদেরও ছাড়িয়ে যেতে পারে, বরং ফেরেশতাদের مسجود (ভক্তিভাজন) হতে পারে।

১. হযরত শাহ (আঃকাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'ফেরেশতাদের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর যখন সে সত্যের অস্বীকারকারী হল, তখন সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।'

২. যা কখনো কমবে না বা খতম হবে না।

৩. অর্থাৎ হে মানুষ! এসব দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কী কারণে প্রতিদান ও শাস্তির কথাকে অস্বীকার কর? অথবা এস্থলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে যে, এরূপ সুস্পষ্ট বিবরণাদি থাকার পরও কোন্ জিনিস অস্বীকারকারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে- কর্মফলের ব্যাপারে আপনার বাণী ও বক্তব্যকে অবিশ্বাস করতে?

চিন্তা করা উচিত, মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর তার প্রকৃতি এমন বানিয়েছেন যে, সে ইচ্ছা করলে নেকী ও সৎকর্মে উন্নতি করে ফেরেশতাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে- কোন সৃষ্টিই তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে না। লক্ষ করুন— শাম, বাইতুল মুকাদ্দাস, তূর পর্বত ও মক্কা মুআজ্জমায় স্ব স্ব সময়ে এরূপ মহা মানুষগণের নমুনা দুনিয়া অবলোকন করেছে। মানুষ যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, তবে সে মানবীয় গুণাবলি ও ইহ-পরকালের কামিয়াবীর শীর্ষদেশে পৌঁছতে পারে। কিন্তু স্বয়ং মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি ও অসৎকর্মের কারণে অপমান ও ধ্বংসের অতল গর্তে পতিত হয় এবং নিজের সৃষ্টিগত মর্যাদাকে বিনষ্ট করে দেয়। কোন ঈমানদার ও নেককার মানুষকে আল্লাহ তাআলা অযথাই অধঃপতিত করেন না, বরং তার স্বল্প আমলের অনেক প্রতিফল দান করেন।

এসব অবস্থা শোনার পরও কি কারো পক্ষে এই স্বভাব ধর্মের মুলনীতিগুলিকে এবং প্রতিদান ও শাস্তির এরূপ যুক্তিযুক্ত নিয়ম-নীতিকে মিথ্যা বলতে পারা সম্ভব? হাঁ, তাকে মিথ্যা

৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন[১]?

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকার করা তখনই সম্ভব যদি বিশ্বজগতকে এমনই একটি মালিকহীন কারখানা মেনে নেওয়া হয়, যার উপর কারো কর্তৃত্ব নেই, যার মধ্যে কোন আইন-কানুনও জারি নেই এবং ভাল-মন্দ যাই করা হোক তার জন্য ধরপাকড়েরও কেউ নেই। তো, এর জওয়াব সম্মুখে আসছে– أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ (আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন)।

১. অর্থাৎ তাঁর মহা রাজত্বের সম্মুখে দুনিয়ার রাজত্বসমূহের তো কোন মূল্যই নেই। যেখানে দুনিয়ার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিও আজ্ঞাবহদের প্রতিদান এবং অবাধ্যদের শাস্তি প্রদান করে থাকে, তাহলে সেই 'আহকামুল হাকেমীন' এর নিকট এরূপ আশা কেন করা হবে না? (এ সুনিশ্চিত যে, তিনি অবশ্যই এরূপ করবেন– মুমিনদের অফুরন্ত ছওয়াব দান করবেন আর কাফেরদের চরম শাস্তি দিবেন)।

সূরা আলাক

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৯৬ । ১৯ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ١٩ ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَۚ

১. পড়ুন আপনার রবের নামে[১], যিনি সৃষ্টি করেছেন[২]।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ

২. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে[৩]।

---

১. اقرأ থেকে مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত পাঁচটি আয়াত পবিত্র কুরআনের সকল আয়াত ও সূরার মধ্যে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় এক আল্লাহর ইবাদত করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ জিবরাঈল (আ) (প্রথম) ওহী নিয়ে আগমন করলেন এবং বললেন- اقرأ (পড়ুন)। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ما أنا بقارئ (আমি পড়তে জানি না)- জিবরাঈল (আ) কয়েকবার হুযূরকে বুকে জড়িয়ে ধরে জোরে চাপ দিলেন এবং প্রত্যেকবার সেই একই শব্দ اقرأ বললেন, আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ما انا بقارئ বলে একই উত্তর দিতে থাকেন। তৃতীয়বারে জিবরাঈল (আ) সজোরে আলিঙ্গন করে বললেন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... الخ অর্থাৎ নিজ রবের নামের বরকতে ও সাহায্যে পড়ুন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৯৫৩) — উদ্দেশ্য এই যে, যে প্রভু জন্মলগ্ন থেকে এই পর্যন্ত আপনাকে এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর উপায়ে প্রতিপালন করলেন, যদ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার দ্বারা কোন মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করা হবে—তিনি কি আপনাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবেন? কখনই না। যাঁর মেহেরবানীতে আপনার লালন-পালন হয়েছে, তাঁরই নামে আপনার তালীমও হবে।

২. অর্থাৎ যিনি সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি আপনার মধ্যে পড়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেন না?

৩. জমাট রক্তে না আছে অনুভূতি, না আছে বোধশক্তি এবং না আছে জ্ঞান ও বুদ্ধি, বরং বুদ্ধিহীন একটি জড়পদার্থ। সুতরাং যে আল্লাহ বুদ্ধিহীন জড়পদার্থকে আকল-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত করেন, তিনি কি একজন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে এবং একজন পাঠ-অক্ষমকে পাঠ-সক্ষম ও আলেমরূপে তৈরি করতে পারেন না?

এ পর্যন্ত, পড়ার যোগ্যতা পয়দা করে দেওয়া যে সম্ভব, তা প্রমাণ করা হল। যার সার কথা এই যে, আপনি পাঠ-অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষে আপনাকে পাঠ-সক্ষম বানিয়ে

৩. পাঠ করুন, আর আপনার রব মহাদয়ালু[১],	اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ
৪. যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন[২]।	الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ
৫. তিনি মানুষকে সেসব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না[৩]।	عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْؕ
৬. কখনই না! মানুষ তো অবাধ্য হয়ে যায়,	كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰۤیۙ
৭. কারণ, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে[৪]।	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰیؕ

দেওয়া মোটেই কঠিন নয়। সম্মুখে বলা হচ্ছে যে- উক্ত যোগ্যতা পয়দা করা সম্ভব, শুধু এতটুকুই না, বরং তা বাস্তবে কার্যকর ও সংঘটিতও হয়েছে।

১. অর্থাৎ আপনার প্রতিপালন অসাধারণভাবে করা হয়েছে, ফলে আপনার পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা ও দক্ষতা সুস্পষ্ট। যেহেতু এদিক থেকে যোগ্যতার ত্রুটি নেই এবং সেদিক থেকে (অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে) কৃপণতা নেই, বরং তিনি সকল দাতার চেয়ে বড় দাতা– সুতরাং তাঁর কাছ থেকে ফয়েয ও বরকত লাভে কোন বাধাই থাকতে পারে না। তাঁর দান ও করুনার ধারা অবশ্যই জারী থাকবে।

২. **আয়াতের সুক্ষ্ম ইশারা**

হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'হযরত কখনো লেখাপড়া করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কলমের দ্বারাও ইলম তিনিই দিয়ে থাকেন, কলম ছাড়াও তিনিই দেবেন'।

এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, (ইলম) ও ফয়েয প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মাঝে কলম যেমন একটি মাধ্যম, তেমনি আল্লাহ তাআলা ও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝেও জিবরাঈল (আ.) নিছক মাধ্যম। মাধ্যম হওয়ার কারণে যেমন এটি জরুরী নয় যে, কলম ফয়েয গ্রহণকারী থেকে উত্তম হবে– তেমনি জিবরাঈল (আ.)-এর মূল্য ও মর্যাদা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে বেশি হওয়াও জরুরী নয়।

৩. অর্থাৎ মানবশিশু যখন মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম লাভ করে, তখন সে কিছুই জানে না। অতঃপর তাকে ক্রমান্বয়ে কে শিক্ষা দান করে? (আল্লাহ)। সুতরাং যে মহাশক্তিশালী রব মানুষকে মূর্খ থেকে জ্ঞানী বানিয়ে দেন, তিনিই নিজের প্রেমাষ্পদ উম্মীকে (নবীজীকে) কামেল আরেফ, বরং সকল আরেফদের সর্দার বানিয়ে দেবেন।

৪. অর্থাৎ মানুষের মূল তো এতটুকু যে, জমাট রক্ত থেকে তার সৃষ্টি এবং সে ছিল নিতান্ত অজ্ঞ, আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু সে নিজের মূলকে একটুও স্মরণ করে না। বরং দুনিয়ার ধন-দৌলতের কারণে অহংকারী হয়ে অবাধ্যতা অবলম্বন করে এবং মনে করে যে, সে কারো মুখাপেক্ষী নয়।

৮. নিশ্চয় তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে[১]।
إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

৯. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয়-
أَرَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝

১০. এক বান্দাকে, যখন তিনি নামায পড়েন[২]?
عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝

১১. আচ্ছা বল তো! যদি সে (বাধাদানকারী) সৎপথে থাকত,
أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۝

১২. অথবা তাক্ওয়ার শিক্ষা দিত- (তবে কি ভাল হত না?)
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝

১৩. আচ্ছা, বল তো! যদি সে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, (তবে আমার কী ক্ষতি?)[৩]
أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন[৪]?
أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝

১৫. কখনই না! যদি সে নিবৃত্ত না হয়, তবে আমি অবশ্যই মাথার সামনের কেশগুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব[৫]-
كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

---

১. অর্থাৎ প্রথমেও তিনি পয়দা করেছেন এবং পরিশেষেও তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন এই অহংকার ও আত্মবিস্মৃতির বাস্তব পরিণতি প্রকাশ পাবে।

২. অর্থাৎ ওর অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের অবস্থা দেখ, ওর নিজের তো স্বীয় রবের সামনে ঝোঁকার তাওফীক নেই, অন্য এক বান্দা আল্লাহর সামনে সেজদাবনত হলে তাকেও সহ্য করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতগুলিতে অভিশপ্ত আবু জাহলের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যখন সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নামায পড়তে দেখত, তখন কষ্ট দিত, ধমকাত এবং নানাভাবে নির্যাতন করার চেষ্টা করত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৯৭)

৩. অর্থাৎ যদি সে সৎপথে আসত, সৎকাজের শিক্ষা (বা আদেশ) দিত, তবে কতই না ভাল মানুষ হত। এখন যে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, তাতে আমার কী ক্ষতি হল? (মুযিহুল কুরআন)

এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকারগণের আরো কিছু উক্তি রয়েছে। সেসব জানতে চাইলে তাফসীরে রূহুল মাআনী দেখা যেতে পারে।

৪. অর্থাৎ এই অভিশপ্ত লোকটার কুকর্ম এবং সেই নেক বান্দার খুশূ'-খুযূ (আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা) তিনি দেখছেন।

৫. অর্থাৎ ওকে স্ব অবস্থায় থাকতে দাও! সে সব জেনেও নিজের দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকে না। আচ্ছা, এখন কান খুলে শুনে নিক- যদি সে নিজ দুষ্কৃতি থেকে বিরত না হয়, তবে আমি ওকে পশুর মত ও হীন বন্দীর মত মাথার চুল ধরে টেনে-হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব।

১৬. এমন কেশগুচ্ছ, যা মিথ্যাচারী, পাপে কলুষিত[১]।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. এখন সে নিজ সভাসদ্‌দের ডেকে আনুক!	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾
১৮. আমিও ডেকে আনছি (আমার) সিপাহীদের[২]।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. কখনই না! আপনি ওর কথা মানবেন না। বরং আপনি সেজদা করুন ও নিকটবর্তী হোন[৩]।	كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩ ﴿١٩﴾

১. অর্থাৎ যে মাথার উপর উক্ত ঝুঁটি রয়েছে, তা মিথ্যা ও পাপরাশিতে ভরপুর- ওর প্রত্যেকটি লোমকূপে যেন পাপ ও অসত্য অনুপ্রবেশ করেছে।

২. আবু জাহল একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে বাধা দিতে চাইলে তিনি কঠোরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন। এতে সে বলতে লাগল– তুমি জান না, মক্কায় আমার দলবলই সর্বশ্রেষ্ঠ। তদুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এখন সে নিজের সভাসদবর্গকে ডেকে আনুক, আমি ওর শাস্তির উদ্দেশ্যে নিজ সিপাহীদের ডাকছি– দেখি, কে বিজয়ী হয়।

কিছুদিন পরে সে বদরের ময়দানে দেখতে পেয়েছে, ইসলামের সেনারা কীভাবে হেঁচড়িয়ে ওকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিল। অবশ্য টেনে-হেঁচড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আসল সময় তো হচ্ছে পরকাল– যখন দোযখের ফেরেশতাগণ ওকে অত্যন্ত অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

একটি ঘটনা

রেওয়ায়েতে আছে, একদা আবু জাহল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নামাযরত দেখে তাঁর সঙ্গে বেআদবী করতে অগ্রসর হল। কিন্তু নিকটে পৌঁছতেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে পিছিয়ে আসে এবং মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে– 'আমার ও মুহাম্মদের মাঝখানে একটি আগুনের পরিখা দেখতে পেলাম, যার মধ্যে পাখাবিশিষ্ট কিছু সৃষ্টজীব ছিল। আমি ঘাবড়িয়ে ফিরে এসেছি।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'যদি ঐ অভিশপ্ত আর একটু আগে বাড়ত, তবে ফেরেশতারা ওকে ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলতেন।' (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭৯৭) বলা বাহুল্য, আখেরাতের পূর্বেই দুনিয়াতে ওকে سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ - এর একটি ছোট নমুনা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বি. দ্র. অধিকাংশ মুফাসসিরগণ زبانية দ্বারা দোযখের ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করেছেন।

৩. অর্থাৎ আপনি ওর মোটেই পরোয়া করবেন না। আপনি যেখানে মন চায়, আগ্রহের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করুন এবং তাঁর দরবারে সেজদা করত বেশি বেশি নৈকট্য হাসিল করতে থাকুন। হাদীসে এসেছে, বান্দা সকল হালত অপেক্ষা সেজদার অবস্থায় আল্লাহ তাআলার বেশি নিকটবর্তী হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪৮২)

সূরা কদর

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ৯৭ । ৫ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٥، رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝

১. নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি শবে-কদরে[১]।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۝

২. আপনি কি জানেন, শবে-কদর কী?

لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

৩. শবে-কদর হাজার মাস থেকে উত্তম[২]।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝

৪. তাতে ফেরেশতারা ও রূহ আপন রবের হুকুমে অবতীর্ণ হয়[৩] প্রত্যেক কাজে☆[৪]।

---

১. অর্থাৎ কুরআন শরীফ লওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আকাশে কদরের রাত বা শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়। আর সম্ভবত এ রাতেই দুনিয়ার আকাশ থেকে পয়গম্বর আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এ বিষয়ে সূরা 'দুখান'-এ (আয়াত ৩-৫) কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে, তা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ এই রাতে নেককাজ করা এরূপ, যেমন হাজার মাস যাবৎ নেককাজ করতে থাকল, বরং তার চেয়েও বেশি।

৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমে রূহুল কুদ্স (হযরত জিবরাঈল আ.) অসংখ্য ফেরেশতার সঙ্গে নিম্নে অবতরণ করেন, যাতে অপরিমিত খায়র ও বরকত দ্বারা জগদ্বাসীদের উপকৃত করতে পারেন।

'রূহ' বলতে ফেরেশতা ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিও উদ্দেশ্য হতে পারে। যা হোক, এ মুবারক রাতে বাতেনী হায়াত এবং রূহানী খায়র ও বরকত অশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

☆ দ্বিতীয় তরজমা– 'সর্বপ্রকার (কল্যাণকর) বিষয় নিয়ে'।

৪. অর্থাৎ বিশ্বব্যবস্থাপনা বিষয়ক যেসব কাজ এ বছরের জন্য নির্ধারিত, তার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্য ফেরেশতাগণ আগমন করেন, যেমনঃ সূরা দুখানে এর আলোচনা গত হয়েছে। অথবা من كل أمر দ্বারা أمر خير (কল্যাণকর বিষয়) উদ্দেশ্য– অর্থাৎ সব রকমের কল্যাণকর বিষয় নিয়ে তাঁরা আকাশ থেকে অবতরণ করেন। والله أعلم

৫. শান্তিই শান্তি সেই রাত[১]– ফজরের উদয় পর্যন্ত[২]।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

১. অর্থাৎ এই রাত শান্তি, নিরাপত্তা ও অন্তরের একাগ্রতার রাত। এতে আল্লাহওয়ালা লোকেরা নিজেদের ইবাদতের ভিতর দুর্লভ ও বিস্ময়কর প্রশান্তি এবং মিষ্টতা ও স্বাদ অনুভব করে থাকেন। এটি হয় রহমত ও বরকত অবতরণের ফলে, যা রূহ ও ফেরেশতাদের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কোন কোন হাদীছে আছে, এ রাতে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ ইবাদতকারী ও যিকিরকারীদের উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন– অর্থাৎ তাদের জন্য রহমত ও নিরাপত্তার দো'য়া করেন। (শুআবুল ঈমান, বর্ণনা ৩৭১৭ –এর সনদ দুর্বল)

২. অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে সুব্‌হে সাদিক পর্যন্ত সমস্ত রাতে উক্ত ধারা জারী থাকে– এভাবে সমগ্র রাতটিই বরকতময় হয়।

বি. দ্র. পবিত্র কুরআন থেকে জানা গিয়েছে যে, এই রাতটি রমযান শরীফে রয়েছে– شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (সূরা বাকারা, ১৮৫)

আর সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রমযানের শেষ দশকে, বিশেষত এই দশ দিনের বেজোড় রাতগুলিতে শবে-কদর তালাশ করা উচিত। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ২০১৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৬৯)। বেজোড় রাতগুলির মধ্যেও আবার ২৭ তারিখের সম্ভাবনা অধিক। والله أعلم

অনেক আলেম বলেছেন যে, শবে-কদর সর্বকালের জন্য কোনও এক রাতে সীমাবদ্ধ নয়– এক রমযানে কোনও এক রাতে, অন্য রমযানে আর এক রাতে হতে পারে।

সূরা বায়্যেনাহ

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৯৮ । ৮ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

اٰيَاتُهَا ٨، رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

১. যারা কাফের— হোক আহলে কিতাব, হোক মুশরিক[১]— ওরা নিবৃত্ত হওয়ার ছিল না যতক্ষণ না ওদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে-

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢

২. (অর্থাৎ) আল্লাহর একজন রাসূল, যিনি পাঠ করবেন এমন পবিত্র কিতাব[২],

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣

৩. যাতে রয়েছে পরিপক্ব কিতাবসমূহ[*৩]।

---

১. আহলে কিতাব হচ্ছে ইহুদী ও খ্রিস্টান, আর মুশরিক হচ্ছে সেই সম্প্রদায়সমূহ, যারা মূর্তিপূজা বা অগ্নিপূজা প্রভৃতিতে লিপ্ত ছিল এবং যাদের নিকট কোন আসমানী কিতাব ছিল না।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে সকল ধর্মাবলম্বী বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ ভ্রান্তির বিষয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার ছিল। এ অবস্থায় প্রয়োজন ছিল, কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বা ওলী বা ন্যায়পরায়ণ শাসকের বোঝানোর দ্বারা সঠিক পথে চলে আসা। কিন্তু তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ছিল না যতক্ষণ না এমন একজন মহা মর্যাদাশালী রাসূলের আগমন হয়, যাঁর সঙ্গে শক্তিশালী সাহায্যরূপে আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ থাকবে। তিনি কয়েক বছরের মধ্যে এক একটি দেশকে ঈমানের আলোতে ভরে দেবেন এবং নিজের মহান শিক্ষা আর সাহস ও দৃঢ়তার বলে দুনিয়ার চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন। অতঃপর সেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর কিতাব পড়তে পড়তে আগমন করলেন, যে কিতাব পবিত্র পাতাসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

✯ **দ্বিতীয় তরজমা**– যাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে সত্য-সঠিক বিষয়াবলি।

৩. অর্থাৎ কুরআনের প্রত্যেকটি সূরা যেন একটি স্বতন্ত্র কিতাব। অথবা অর্থ এই যে, পূর্বে যতগুলি শ্রেষ্ঠ কিতাব এসেছে, তাদের সবগুলির জরুরী সারাংশ এ কিতাবে সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়েছে। অথবা كُتُبٌ قَيِّمَةٌ দ্বারা সত্য-সঠিক উলূম (জ্ঞানরাজি) ও নানাবিধ বিষয় উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এ কিতাবের উলূম সম্পূর্ণরূপে সত্য ও সঠিক এবং বিষয়বস্তুসমূহ অত্যন্ত পরিপক্ব ও ভারসাম্যপূর্ণ।

৪. আর কিতাবীরা বিভক্ত হয়েছে ওদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই[১]।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤

৫. অথচ ওদের এ আদেশই করা হয়েছিল যে, ওরা আল্লাহর ইবাদত করবে ইবাদতকে তাঁরই জন্য খাঁটি করে*, তাঁরই অভিমুখী হয়ে[২]; এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। আর এ-ই সুপ্রতিষ্ঠিত উম্মতের পথ[৩]।

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

---

১. অর্থাৎ এই রাসূল ও এই কিতাবের আগমনের পর কোন সন্দেহ থাকেনি। তবু এখন আহলে কিতাব বিরোধিতায় রয়েছে– সন্দেহের কারণে নয়, বরং জিদের বশবর্তী হয়ে। সে জন্য ওরা দুই দলে বিভক্ত হয়েছে– যারা জিদের বশবর্তী হয়েছে, ওরা অস্বীকারকারী রয়ে গেছে; পক্ষান্তরে যারা ইনসাফের পরিচয় দিয়েছে, তারা ঈমান আনয়ন করেছে। কিতাবীরা সর্বশেষ নবীর অপেক্ষা করছিল। তাই তাঁর আগমনের পর সমস্ত মতপার্থক্য খতম করে তাদের উচিত ছিল, সকলে একই পথ অবলম্বন করা। কিন্তু তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য ও জিদহেতু ঐক্য ও একতার কারণকে (রাসূল ও কুরআন) বিভক্তি ও বিরোধিতার মাধ্যম বানিয়ে নিল। যখন আহলে কিতাবের এ অবস্থা, তখন অজ্ঞ মুশরিকদের অবস্থা আর কেমন হবে?

বি. দ্র. হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এস্থলে 'الْبَيِّنَة' শব্দের পাত্র (বা উদ্দিষ্ট) হিসাবে হযরত মাসীহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সাব্যস্ত করেছেন– অর্থাৎ হযরত মাসীহ যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আসলেন, তখন ইহুদীরা শত্রু হয়ে গেল। আর খ্রিস্টানরাও পার্থিব স্বার্থের মোহে পড়ে বিভিন্ন দল ও পার্টি গড়ে নিল।

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলার তাওফীক না হলে পয়গম্বরের আগমন ও কিতাবের অবতরণও যথেষ্ট হয় না। হেদায়াতের উপায়-উপকরণ যতই একত্র হোক না কেন, যাদের তাওফীক হয় না, তারা এরূপেই ক্ষতির মধ্যে পড়ে থাকে।

* **দ্বিতীয় তরজমা**–'তাঁরই ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে'।

২. অর্থাৎ সব রকমের বাতিল ও মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে একমাত্র একক আল্লাহর বন্দেগী কর এবং ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় –যিনি ছিলেন নিষ্ঠার প্রতীক– সর্বদিক থেকে নির্লিপ্ত হয়ে সেই এক মালিকের দাস হয়ে যাও। আর দ্বীন ও শরীয়তের বিধি-বিধান প্রদান কিংবা জগত পরিচালনা করা– এ উভয়ের কোন বিভাগেই অন্য কাউকে একচ্ছত্র ক্ষমতাধর মনে করবে না।

৩. অর্থাৎ এসব বিষয় প্রত্যেক দীনেই পছন্দনীয় ছিল– এ পয়গম্বর এই বিষয়গুলিরই বিশদ ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ জানেন, তবুও ওরা এরূপ পবিত্র শিক্ষাকে কেন গ্রহণ করে না।

৬. যারা কাফের —হোক আহলে কিতাব, হোক মুশরিক— নিশ্চয় ওরা (যাবে) দোযখের আগুনে, যাতে চিরকাল থাকবে[১]। ওরাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব[২]।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

৭. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয় তারাই সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট[৩]।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

৮. তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান হচ্ছে– সর্বদা বসবাসের উদ্যানরাজি, যার নিম্নদেশে নহরমালা প্রবাহিত, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট[৪] এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ তার জন্য, যে নিজ রবকে ভয় করেছে[৫]।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

---

১. অর্থাৎ ইলমের দাবিদার আহলে কিতাব হোক বা জাহেল মুশরিক হোক, সত্যকে অস্বীকার করার পরিণাম সকলেরই ক্ষেত্রে এক, অর্থাৎ সেই দোযখ, যা থেকে কখনো নিষ্কৃতি লাভ হবে না।

২. অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট, যেমন সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে– إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبِيْلًا ওরা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং আরো বেশি পথভ্রষ্ট। (আয়াত ৪৪)

৩. অর্থাৎ যারা সকল রাসূল ও সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ভাল কাজকর্মে রত রয়েছে, তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টিজীব। এমন কি, তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করেন।

৪. অর্থাৎ বেহেশতের বাগ-বাগিচা ও ঝরনামালার চেয়েও উত্তম দৌলত হচ্ছে মাওলার সন্তুষ্টি, বরং বেহেশতের সমস্ত নে'য়ামতরাশির আসল প্রাণ এ-ই।

৫. অর্থাৎ এ উচ্চ মাকাম সকলের ভাগ্যে জোটে না– এ কেবল সেই বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, যারা নিজদের প্রভুর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে চলে এবং তাঁর নাফরমানীর ধারে কাছেও যায় না।

সূরা যিলযাল

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ৯৯ । ৮ আয়াত । ১ রুকূ । মাদানী

آياتها ٨، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন পৃথিবীকে নিজ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে[১]।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

২. এবং ভূমি তার (গর্ভস্থ) সমস্ত ভার বের করে দেবে[২]।

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

৩. আর মানুষ বলবে, 'তার কী হল[৩]?'

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝

৪. সেদিন সে (পৃথিবী) নিজের যাবতীয় সংবাদ বলে দেবে।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

৫. কারণ, আপনার রব তাকে আদেশ করবেন[৪]।

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সমগ্র পৃথিবীকে অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ঙ্কর কম্পনের দ্বারা প্রকম্পিত করবেন। যার ধাক্কায় কোন অট্টালিকা, কোন পর্বত বা বৃক্ষ পৃথিবীর বুকে কায়েম থাকতে পারবে না। উঁচু নীচু সব সমান হয়ে যাবে, যাতে হাশরের মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। আর এ অবস্থা কিয়ামতে শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় হবে।

২. অর্থাৎ তখন পৃথিবী নিজ পেটের ভিতর যা কিছু আছে, যথা : মৃত জীবজন্তু বা সোনা-রূপা ইত্যাদি সবই বের করে দেবে। কিন্তু ধন-সম্পদ নেওয়ার কেউ থাকবে না। সকলে দেখতে পাবে, যে সম্পদ নিয়ে মানুষ সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ করত, তা আজ কতই না মূল্যহীন।

৩. অর্থাৎ মানুষ জীবিত হওয়া এবং সেই কম্পনের নিদর্শনাদি দেখার পর বলবে অথবা কম্পনের সময়ই তাদের আত্মাগুলি সবিস্ময়ে বলে উঠবে, 'এ পৃথিবীর কী হল যে, এত জোরে আন্দোলিত হচ্ছে এবং তার গর্ভস্থ সবকিছু একেবারে বের করে ফেলছে?'

৪. অর্থাৎ আদম-সন্তান পৃথিবীর বুকে সৎ বা অসৎ কর্ম যা কিছু করেছিল, তা সবই সে প্রকাশ করে দেবে। যেমন সে বলবে– অমুক ব্যক্তি আমার বুকে নামায পড়েছিল, অমুকে চুরি করেছিল, অমুক না-হক খুন করেছিল ইত্যাদি। বর্তমান ভাষায় বলতে গেলে, পৃথিবীর বুকে

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝

৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে[১], যাতে তাদের স্বীয় আমল দেখানো হয়[২]।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

৭. অতএব যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র সৎকর্ম করেছে, সে তা দেখতে পাবে;

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

৮. আর যে ব্যক্তি বিন্দুমাত্র অসৎকর্ম করেছে, সেও তা দেখতে পাবে[৩]।

যত কাজকর্ম করা হয়, পৃথিবীতে সেসবের রেকর্ড থাকে। কিয়ামতের দিন রবের নির্দেশে সেসব প্রকাশ করে দেওয়া হবে।

১. অর্থাৎ সেদিন মানুষ নিজ নিজ কবর থেকে হাশরের মাঠে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উপস্থিত হবে– এক দল মদ্যপানকারীদের, এক দল ব্যভিচারীদের, এক দল জালিমদের, আর এক দল চোরদের, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথবা অর্থ এই যে, লোকেরা হিসাব-কিতাব থেকে ফারেগ হয়ে যখন প্রত্যাবর্তন করবে, তখন কতক দল বেহেশতী আর কতক দোযখীরূপে বেহেশত ও দোযখের দিকে যেতে থাকবে।

২. অর্থাৎ হাশরের মাঠে তাদের আমলগুলি দেখিয়ে দেওয়া হবে, যাতে পাপীদের এক ধরনের অপমান এবং নেককারদের এক রকমের সম্মান হাসিল হয়। অথবা হতে পারে, আমলাদি দেখানোর দ্বারা সেগুলির ফলাফল দেখানো উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ ভাল হোক বা মন্দ, প্রত্যেকের অণুপরিমাণ আমলও তার সম্মুখে পেশ করা হবে এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের আমলের সাথে যে আচরণ করবেন, তাও চোখে দেখতে পাবে।

সূরা আদিয়াত

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০০ । ১১ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ١١، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١

১. কসম অশ্বরাজির, যারা উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়!

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢

২. অতঃপর যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ করে[১]।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣

৩. তারপর যারা আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে[২]

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤

৪. এবং তখন ধূলি ওড়ায়[৩]।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥

৫. অতঃপর সে সময় ঢুকে পড়ে (শত্রু)-দলের ভিতরে[৪]।

---

১. অর্থাৎ যারা পাথরে বা পাথুরে মাটিতে ক্ষুরের আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের করে।

২. আরব দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোর বেলায়ই আক্রমণ করার নিয়ম ছিল, যাতে রাতের বেলা যাওয়ার ফলে শত্রুরা অবগত না হয় এবং প্রত্যুষে অতর্কিতে আক্রমণ করা যায়। আর রাতে আক্রমণ না করাকেই বীরত্বের পরিচায়ক মনে করা হত।

৩. অর্থাৎ ওরা এমন দ্রুতবেগে ও শক্তিমত্তার সাথে দৌড়ায় যে, ভোরবেলায় যদিও রাতের শীতল আবহাওয়ার কারণে শিশির-ভিজা ধুলাবালি জমাট থাকে, কিন্তু ওদের খুরের আঘাতে অনেক ধুলাবালি উড়তে থাকে।

৪. অর্থাৎ তখন ওরা নির্ভয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যদলে গিয়ে ঢুকে পড়ে।

বি. দ্র. এখানে শপথ ঘোড়ারও হতে পারে, (যেমন বাহ্যত বোঝা যায়। আর) অশ্বারোহী মুজাহিদদেরও হতে পারে। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'এতে অশ্বারোহী মুজাহিদদেরই শপথ করা হয়েছে। আল্লাহর পথে স্বীয় জান বিসর্জন দেওয়ার জন্য হাযির হওয়া– এর চেয়ে উত্তম আমল আর কী হতে পারে?'

৬. নিশ্চয়ই মানুষ স্বীয় রবের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ[১]।	إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾
৭. আর সে সেসবের প্রত্যক্ষকারী[*২]।	وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾
৮. এবং নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের মহব্বতে খুব পরিপক্ক[৩]।	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

১. অর্থাৎ আল্লাহর পথে অশ্বারোহী মুজাহিদদের বীরত্ব প্রদর্শন ও প্রাণ বিসর্জন এ কথাই বলে যে, প্রভুভক্ত ও কৃতজ্ঞ বান্দারা এরূপই হয়ে থাকে। অপরদিকে যে মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিসামর্থ্যকে তাঁর পথে ব্যয় করে না, সে সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান, বরং চিন্তা করলে বুঝে আসে যে, ঘোড়ার নির্বাক অবস্থা এ সাক্ষ্য বহন করে যে, যারা প্রকৃত মালিকের দেওয়া খাদ্য খায় এবং তাঁর অসংখ্য নেয়ামত দিনরাত ভোগ করে, কিন্তু একদণ্ডেও তাঁর আনুগত্য করে না– ওরা প্রাণীর চেয়েও ইতর ও নিকৃষ্ট। একটি শিষ্ট ঘোড়াকে তার প্রভু শুষ্ক ঘাস ও কিছু দানাপানি খাওয়ায়। সে এতটুকুর বিনিময়ে নিজ মালিকের সেবায় মরতে প্রস্তুত হয়ে যায়– আরোহী যেদিকে ইঙ্গিত করে সেদিকেই ধাবিত হয়। দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপাতে থাকে, খুরের আঘাত হেনে এবং ধুলাবালি উড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে। তরবারী ও বন্দুকের সামনে পড়েও বুক ফিরায় না। বরং অনেক সময় প্রভুভক্ত ঘোড়া আরোহীকে বাঁচানোর জন্য নিজের প্রাণকে বিপন্ন করে। এসব ঘোড়া থেকে মানুষ কি এই শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে, তারও কোন পালনকর্তা ও মালিক রয়েছে, যার আনুগত্যে নিজ জান-প্রাণ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান– সে একটি ঘোড়া বরং কুকুরের সমানও প্রভুভক্তি প্রদর্শন করতে পারল না।

* দ্বিতীয় তরজমা– 'আর নিঃসন্দেহে সে নিজেই তার (অর্থাৎ আপন অকৃতজ্ঞতার) সাক্ষী'।

২. অর্থাৎ বীর মুজাহিদগণের এবং তাদের ঘোড়াগুলির প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতাবোধ তার (মানুষের) চোখের সামনে রয়েছে। তবুও নির্লজ্জ মানুষ একটুও নম্র হয় না– এ থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করে না।

বি. দ্র. বিজ্ঞ মুতারজিম (হযরত মাহমুদ হাসান র.)-এর তরজমা অনুযায়ী আমরা এই ব্যাখ্যা লিখেছি। অন্যথায় অধিকাংশ তাফসীরকার এই বাক্যের এ অর্থ করেন যে, স্বয়ং মানুষই তার না-শোকরীর সাক্ষী। যদি সে একান্ত মনে নিজেকে নিয়ে ভাবে, তাহলে সে দেখবে যে, তার ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে– 'তুমি বড় অকৃতজ্ঞ'। —আর পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী إنه-এর যমীর (সর্বনাম)-কে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ তার রব তার না-শোকরী ও অকৃতজ্ঞতা দেখতে পাচ্ছেন।

৩. অর্থাৎ লোভ ও কৃপণতা তাকে অন্ধ করে ফেলেছে। দুনিয়ার ধন-দৌলতের মহব্বতে সে এমনই নিমজ্জিত যে, প্রকৃত দাতা (আল্লাহ তাআলা)-কেও ভুলে গেছে। এ কথা চিন্তা করে না যে, ভবিষ্যতে তার কী পরিণাম হবে।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝٩

৯. সে কি জানে না যে, কবরগুলিতে যা-কিছু আছে যখন তা বের করা হবে;

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝١٠

১০. এবং অন্তরসমূহে যা-কিছু রয়েছে তা প্রকাশ করা হবে- (তখন সম্পদ কোন কাজে আসবে না)[১]?

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝١١

১১. নিশ্চয়ই তাদের রব সেদিন তাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত[২]।

---

১. অর্থাৎ সেই সময় অবশ্যই আসবে, যখন লাশগুলিকে কবর থেকে উঠিয়ে জীবিত করা হবে এবং অন্তরের মধ্যে যা কিছু গোপন আছে তা সবই প্রকাশ করে দেওয়া হবে। তখন দেখা যাবে, ধন-সম্পদ কতটুকু কাজে আসে এবং নালায়েক অকৃতজ্ঞ লোকেরা কোথায় ছুটে যেতে পারে? যদি এই নির্লজ্জ লোকেরা এ বিষয়টিও বোঝার চেষ্টা করত, তবে কখনই ধনের ভালবাসায় মত্ত হয়ে এরূপ আচরণ করত না।

২. অর্থাৎ আল্লাহর ইলম তো সর্বদা বান্দাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছুকে বেষ্টন করে রয়েছে, তবে সেদিন তাঁর ইলম সকলের উপর পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তখন কারো অস্বীকার করার অবকাশ থাকবে না।

সূরা কারিয়াহ

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০১ । ১১ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ١١ ، رُكُوعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সেই প্রচণ্ড আঘাতকারী!

اَلْقَارِعَةُ ۝

২. সেই প্রচণ্ড আঘাতকারী কী?

مَا الْقَارِعَةُ ۝

৩. আপনি কি জানেন, সেই প্রচণ্ড আঘাতকারী কী[১]?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

৪. (তা সেদিন সংঘটিত হবে–) যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হবে[২]।

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝

৫. এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত[৩]।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝

---

১. এর দ্বারা কিয়ামত উদ্দেশ্য, যা অন্তরাত্মাকে দারুণ ভীতি ও ত্রাসের দ্বারা এবং কানকে বিকট বজ্রনিনাদে আঘাত করবে। অর্থাৎ, কিয়ামতের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের বর্ণনা কি পরিপূর্ণভাবে দেওয়া যাবে? সামনে মাত্র এতটুকু অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, যার দ্বারা তার ভয়ঙ্করতা ও কঠোরতা কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

২. কারণ, প্রত্যেককে এক একদিকে ব্যাকুলভাবে ছোটাছুটি করতে দেখা যাবে। মনে হয়, পতঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে দুর্বলতা ও কঠিণ অস্থিরতা এবং দিকবিদিক ছুটাছুটির কারণে।

৩. অর্থাৎ ধুনরী যেমন পশম বা তুলা ধুনে এক একটি ছোট তুলাখণ্ড উড়িয়ে দেয়, তদ্রূপ পাহাড়-পর্বত বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়তে থাকবে। আর রঙিন পশমের সাথে তুলনা সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, তা খুবই হালকা-পাতলা হয়ে থাকে। তাছাড়া কুরআন শরীফের অন্যত্র পাহাড়-পর্বতের রংও বিভিন্ন প্রকারের বলা হয়েছে– وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ (আর পাহাড়-পর্বতের মধ্যেও রয়েছে সাদা ও লাল অংশ, যেগুলির বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং আছে নিকষ কালো অংশ। –সূরা ফাতের, আয়াত ২৭)

৬. তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ ۙ﴿۶﴾

৭. সে থাকবে মনের মত জীবনে[১]। فَهُوَ فِيۡ عِيۡشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, وَاَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ ۙ﴿۸﴾

৯. ওর ঠিকানা হবে 'হাবিয়া'। فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾

১০. আপনি কি জানেন, তা কী? وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا هِيَهۡ ؕ﴿۱۰﴾

১১. উত্তপ্ত আগুন[২]। نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۱﴾

---

১. অর্থাৎ যার আমলগুলি ভারী হবে, সে সেদিন মনের সুখে আরাম-আয়েশে থাকবে। আর আমলাদির ওজন ঈমান ও ইখলাস অনুপাতে হবে। বাহ্যত যত বড় আমলই হোক না কেন, ইখলাসের রূহ না হলে আল্লাহর দরবারে সেই আমলের কোন ওজনই থাকে না– فَلَا نُقِيۡمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَزۡنًا (সুতরাং আমি কিয়ামতের দিন ওদের জন্য কায়েম করব না কোনো তুলাদণ্ড। –সূরা কাহফ, আয়াত ১০৫)

২. অর্থাৎ দোযখের 'হাবিয়া' নামক স্তরে যে আযাব রয়েছে, তা মানুষের চিন্তারও ঊর্ধ্বে। তবে এতটুকু বুঝতে পার যে, তা অত্যন্ত উত্তপ্ত ও দাউ দাউ করে জ্বলা আগুন, যার বিপরীতে অন্য আগুনকে যেন উত্তপ্তই বলা যায় না।

সূরা তাকাছুর

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০২ । ৮ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٨ ، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. প্রাচুর্যের লোভ তোমাদের গাফেল করে রাখে–

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছ[১]।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

৩. কখনই না! শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য এবং দুনিয়ার উপায়-উপকরণের লোভ মানুষকে গাফলতের জালে ফাঁসিয়ে রাখে, মহান মালিকের ধ্যান ও আখেরাতের ফিকির কোনটাই আসতে দেয় না। রাতদিন একই চিন্তা– যেভাবেই হোক ধন-দৌলতের আধিক্য হতে হবে এবং আমার বংশ ও দল সকল বংশ ও দলের উপর প্রবল থাকতে হবে।

উদাসীনতার এই মোহ কাটে না, যত দিন না মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। তখন কবরে পৌঁছে বুঝতে পারে যে, সে মারাত্মক গাফলতিতে ও ভুলের মাঝে ছিল। মাত্র কয়েক দিনের আনন্দ-উৎসব ছিল। মৃত্যুর পর সেসব সাজ-সরঞ্জাম অসার বরং প্রকৃত জীবনের জন্য বিপদ প্রমাণিত হল।

বি. দ্র. কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে (তবে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন), একদা দুই গোত্র নিজ নিজ দলের আধিক্যের বড়াই করছিল। জনসংখ্যার তুলনা করতে গিয়ে এক পক্ষের সংখ্যা কম হলে বলা হল, তাদের অনেক মানুষ যুদ্ধে মারা গেছে, বিশ্বাস না হলে কবরস্থানে গিয়ে কবর গণনা করে দেখুক। তবেই বোঝা যাবে, তাদের লোকসংখ্যা অপর পক্ষের তুলনায় কত বেশি এবং তাদের মধ্যে কত কত খ্যাতনামা মানুষ অতিবাহিত হয়েছে। এই বলে কবর গুনতে লাগল। এহেন মূর্খতা ও উদাসীনতা সম্বন্ধে সতর্ক করণার্থেই এই সূরার অবতরণ (তাফসীরে বাগাবী ৪/৫২০–এ মারফূ বর্ণনা নয়। কালবী ও মুকাতিল এর কওল)।

আয়াতের অনুবাদ দু'ভাবেই হতে পারে–(১.'[পার্থিব উপায়-উপকরণের] আধিক্য নিয়ে পরস্পরের গর্ব তোমাদের গাফেল করে রাখে। ২. [পার্থিব ভোগসামগ্রীর] আধিক্য তোমাদের গাফেল করে রাখে- অনু.)।

৪. পুনরায় (বলছি,) কখনই না! শীঘ্রই জানতে পারবে[১]।	ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤
৫. কখনই না! যদি তোমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতে, (তবে গাফেল হতে না)[২]।	كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥
৬. তোমরা অবশ্যই 'দোযখ' দেখবে!	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝٦
৭. আবারও (বলছি,) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে প্রত্যয়ের চোখ দিয়ে[৩]!	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧
৮. অতঃপর সেদিন নেয়ামত সম্বন্ধে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে[৪]।	ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝٨

১. অর্থাৎ বারংবার তাকীদের সাথে বলা হচ্ছে– ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি প্রভৃতির আধিক্যই কাজে আসবে বলে তোমাদের যে ধারণা, তা ঠিক নয়। অচিরেই জানতে পারবে, নশ্বর ও অস্থায়ী জিনিস কখনই অহংকার ও গৌরবের বিষয় ছিল না। দ্বিতীয়ত- এ কথাও মনে রাখো যে, আখেরাত এমন বিষয় নয়, যা অস্বীকার করা যায় কিংবা যা থেকে গাফেল থাকা যায়। ভবিষ্যতে অতি শীঘ্রই তোমাদের সম্মুখে এ সত্য প্রকাশ পাবে যে, আসল জীবন ও আরাম-আয়েশ তো পরকালেরই এবং পরকালীন জীবনের মোকাবেলায় পার্থিব জীবন একটি স্বপ্নমাত্র– তা এর অধিক কোন মূল্য বা তাৎপর্য রাখে না। আর এই সত্য ও বাস্তবতা দুনিয়াতে কোন কোন মানুষের নিকট প্রকাশ পেয়ে যায় বটে, তবে কবরে পৌছে এবং তারপর হাশরের মাঠে সকলের সামনে তা পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে।

২. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মোটেই সত্য নয়। তোমরা যদি সঠিক প্রমাণাদির আলোকে এই সত্য জানতে পারতে যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার সকল সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নয়, তবে কিছুতেই এই গাফলতে পড়ে থাকতে না।

৩. অর্থাৎ এই গাফলত ও অস্বীকৃতির ফল হচ্ছে দোযখ, যা তোমাদের দেখতেই হবে। তার কিছুটা নমুনা তো বরযখী জীবনে দেখতে পাবে, তারপর আখেরাতে পুরাপুরি দেখে عين اليقين বা চাক্ষুস-দর্শন লাভ করবে।

৪. অর্থাৎ তখন বলা হবে, 'এখন বল, দুনিয়ার আরাম-আয়েশের কী হাকীকত ও স্বরূপ? অথবা তখন প্রশ্ন করা হবে, যেসব নে'য়ামত (জাহেরী ও বাতেনী, দৈহিক ও আত্মিক, পার্থিব ও রূহানী) দুনিয়াতে তোমাদের দান করা হয়েছিল, সেসবের হক তোমরা কতটুকু আদায় করেছিলে এবং প্রকৃত নে'য়ামতদাতাকে সন্তুষ্ট রাখার কতটুকু চেষ্টা করেছিলে?

সূরা আস্‌র

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০৩ । ৩ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آيَاتُهَا ٣، رُكُوْعُهَا ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম আসরের[১]!

وَالْعَصْرِ ۝

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে[২]।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝

১. 'আস্‌র' বলে যমানা বা কালকে, অর্থাৎ কালের কসম। আর মানুষের জীবনকালও এই 'কালে'র অন্তর্ভুক্ত। সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য অর্জনে এই জীবনকালকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা উচিত। অথবা অর্থ হল– আসরের নামাযের সময়ের কসম, যে সময়টা কাজ-কারবারের বিচারে দুনিয়াতে বিশেষ ব্যস্ততার সময় এবং শরী'য়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও অত্যন্ত ফযীলতের সময়। (এমন কি, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছে (বুখারী : ৫৫২) ইরশাদ করেন, যার আসরের নামায কাযা হল, তার যেন সমস্ত বাড়ীঘর লুট হয়ে গেল।)

অথবা অর্থ হল, কসম আমাদের পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মুবারক যমানার, যে যমানায় সর্বশ্রেষ্ঠ রেসালাত ও সর্বোত্তম খেলাফতের নূর পূর্ণ গৌরবে বিকশিত হয়েছিল।

২. **সময় ও জীবন-মুহূর্তগুলোর মূল্য**

এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে যে, বরফবিক্রেতার পুঁজির (বরফের) মত মানুষের আসল পুঁজি অর্থাৎ তার বয়স বা প্রিয় জীবনকাল প্রতি মুহূর্তে বরফের মত ক্ষয় হয়ে চলেছে। এই চলমান ও ক্ষয়িষ্ণু সময়ের মধ্যে যদি এমন কিছু কাজ করা না হয়, যাতে এই জীবনকাল কাজে লাগতে পারে বরং এক চিরন্তন ও অবিনশ্বর সম্পদ হয়ে চিরকালের জন্য উপকারী সাব্যস্ত যদি না হয়, তাহলে ক্ষতির কোন সীমা থাকবে না।

কালের ইতিহাস পাঠে এবং নিজ জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে চিন্তা করে দেখুন; সামান্য চিন্তা-ভাবনাতেই প্রমাণিত হবে যে, যারা পরিণামদর্শিতার সাথে কাজ করে না এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেপরোয়া হয়ে কেবল ভোগ-বিলাসে সময় অতিবাহিত করে, তারা পরিণামে কীভাবে অকৃতকার্য ও হতভাগ্য বরং ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের উচিত সময়ের মূল্য বোঝা এবং প্রিয় জীবনের মুহূর্তগুলিকে শুধু অবহেলা ও দুষ্কর্ম বা খেলাধূলায় অতিবাহিত না করা। জীবনের মর্যাদা ও উৎকর্ষ এবং সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের এই উৎকৃষ্ট সময়গুলিকে, বিশেষ করে সেই মহামূল্যবান সময় যখন রেসালাতের সূর্য স্বীয় পরম ও চরম আলোতে দুনিয়াকে আলোকিত করে রেখেছে– এসব সময়কে যদি নিতান্ত গাফলত ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া হয়, তবে জেনে রাখা উচিত যে, মানুষের জন্য এর চেয়ে বেশি ক্ষতির বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

৩. তবে (তারা নয়), যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যারা পরস্পরকে সত্যের তাকীদ করতে থেকেছে ও ধৈর্যের তাকীদ করতে থেকেছে[১]।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

অতএব সফল ও সৌভাগ্যবান মানুষ সে-ই, যে এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনকে অক্ষয় এবং অকেজো যিন্দেগীকে কর্মমুখর বানানোর চেষ্টা-সাধনা করে এবং উৎকৃষ্ট সময় ও উত্তম সুযোগকে গনীমত মনে করে সৌভাগ্য অর্জনের ও পূর্ণতা হাসিলের চেষ্টায় রত থাকে। আর এমন লোক তারা, যাদের উল্লেখ পরবর্তী আয়াত (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) এর মধ্যে রয়েছে।

১. **চারটি সৎকর্ম : মহাসৌভাগ্য অর্জনের সোপান**

অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে হলে মানুষের জন্য চারটি বিষয় সম্পাদন করা অত্যন্ত জরুরী। প্রথম, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং দুনিয়া ও আখেরাতসম্পর্কিত তাঁদের সকল হেদায়েত ও ওয়াদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। দ্বিতীয়, এই বিশ্বাসের কার্যকারিতা শুধু দিল ও দেমাগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকা, বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তা প্রকাশ পাওয়া এবং মানবের আমলী যিন্দেগী তার অন্তরের ঈমানের আয়নাস্বরূপ হওয়া।

তৃতীয়, শুধু ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণ ও সফলতা নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকা, বরং জাতি ও মিল্লাতের সামগ্রিক মঙ্গল ও উন্নতির প্রতি লক্ষ রাখা। যখন দুজন মুসলমান একত্র হবে, তখন একে অন্যকে নিজ কথা ও কাজের দ্বারা সত্য দীন ও প্রত্যেক ব্যাপারে সততা অবলম্বনের তাকীদ করতে থাকবে। চতুর্থ, প্রত্যেকের অন্যের প্রতি এই নসীহত ও ওসীয়ত থাকা যে, সত্যের ব্যাপারে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কারের পথে যতই দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ আসুক না কেন অথবা মনবিরোধী বিষয়ের সম্মুখীন হতে হোক না কেন, সবকিছু পূর্ণ ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে সহ্য করবে এবং নেকীর পথ থেকে মোটেই বিচ্যুত হবে না।

যে সকল সৌভাগ্যবান মানুষ উক্ত চারটি গুণের উপর যথাযথ আমলকারী হবে এবং নিজেরা পূর্ণতা লাভ করে অন্যদের মধ্যেও পূর্ণতা আনয়নের ব্যবস্থা করবে, তাদের নাম কালের বুকে (ইতিহাসের পাতায়) অমর হয়ে থাকবে এবং তারা যে আদর্শ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে তা 'বাকিয়াতে সালিহাত' তথা স্থায়ী সৎকর্মরূপে সর্বদা তাদের প্রতিফলকে বাড়াতে থাকবে এবং তাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে।

সূরাটির মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য

বস্তুত এই ছোট্ট সূরাটি সমগ্র দীন ও হেকমতের সারাংশ। ইমাম শাফেয়ী (র) সত্যই বলেছেন, 'যদি কুরআনের মধ্য থেকে এই একটি মাত্র সূরাই নাযিল করা হত, তবে (বুদ্ধিমান বান্দাদের) হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট হত। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মধ্যে যখন দুজন পরস্পর মিলিত হতেন, তখন বিদায় হওয়ার পূর্বে একে অন্যকে এই সূরাটি পড়ে শোনাতেন।

সূরা হুমাযাহ

সূরা ১০৪ । ৯ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٩، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বড় দুর্ভোগ প্রত্যেক ওই ব্যক্তির, যে নিন্দা করে, দোষ খুঁজে বেড়ায়[১]–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ

২. যে সম্পদ সঞ্চয় করে ও বার বার তা গণনা করে[২]!

الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ

৩. সে ধারণা করে, তার ধন তাকে চিরজীবী করে রাখবে[৩]।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ

৪. কখনই না! নিশ্চয়ই ওকে নিক্ষেপ করা হবে সেই পিষ্টকারীর মধ্যে[৪]।

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ

৫. আপনি কি জানেন, সেই পিষ্টকারী কী?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ

---

১. অর্থাৎ যে নিজের ত্রুটি দেখে না, অন্যদের ক্ষুদ্র মনে করে বিদ্রূপ করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি বাস্তব হোক বা অবাস্তব, অন্বেষণ করতে থাকে।

২. অর্থাৎ ওর উক্ত বিদ্রূপ ও দোষান্বেষণের কারণ হচ্ছে অহংকার। আর অহংকারের কারণ হচ্ছে ধন-সম্পদ। এই ধন-সম্পদ সে লোভের বশবর্তী হয়ে নানা দিক থেকে জমা করে এবং কৃপণতাবশত গুণে গুণে রাখে, যেন কোন পয়সা কোথাও ব্যয় হয়ে না যায় অথবা বের হয়ে চলে না যায়। অধিকাংশ বখিল ধনীদের দেখা যায়, বারবার টাকা-পয়সা গণনা করে এবং হিসাব করে দেখে। এতেই ওদের আনন্দ।

৩. অর্থাৎ ওর আচরণে মনে হয়, এই ধন যেন কখনো ওর কাছ থেকে পৃথক হবে না, বরং সর্বদা ওকে আসমানী ও পার্থিব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে থাকবে।

৪. অর্থাৎ এ ধারণা নিছক ভ্রান্ত, ধন-সম্পদ তো কবর পর্যন্তও সঙ্গে যাবে না। পরবর্তী জীবনে উপকারে আসা তো দূরে থাক! সমস্ত ধন-দৌলত এমনিই পড়ে থাকবে। আর এই হতভাগাকে তুলে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

৬. আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন-	نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۝
৭. যা উঁকি দিয়ে অন্তরসমূহ দেখে নেয়*[১]।	الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۝
৮. তা ওদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে[২]-	اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝
৯. দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে[৩]।	فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

---

* দ্বিতীয় তরজমা-"যা পৌছে যাবে অন্তরসমূহ পর্যন্ত'।

১. অর্থাৎ স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আগুন মানুষের তৈরি নয়- আল্লাহর জ্বালানো আগুন। এর অবস্থা কিছু জিজ্ঞাসা করো না। বড় বুদ্ধিমান এ আগুন। অন্তরের দিকে উঁকি মেরে দেখে। যে অন্তরে ঈমান আছে তাকে জ্বালায় না। যে অন্তরে কুফর রয়েছে তাকে পুড়িয়ে দেয়। তা শরীরে লাগামাত্র অন্তর পর্যন্ত পৌছে যাবে; বরং একইভাবে অন্তর থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। আর শরীরের মত অন্তর ও আত্মাগুলি আগুনে জ্বলা সত্ত্বেও পাপাচারীরা মরবে না। দোযখী আকাঙ্ক্ষা করবে- হায়রে! মৃত্যু এসে যদি এই আযাবের সমাপ্তি করে দিত! কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না।

আল্লাহ এই আযাব থেকে এবং সব ধরনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

২. অর্থাৎ কাফেরদের দোযখে নিক্ষেপ করে তার দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হবে- বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না। অনন্তকাল তাতে পড়ে জ্বলতে থাকবে।

৩. অর্থাৎ আগুনের শিখাগুলো লম্বা লম্বা স্তম্ভের ন্যায় উঁচু হবে। অথবা দোযখীদেরকে লম্বা স্তম্ভসমূহের সঙ্গে বেঁধে খুব কষ্ট দেওয়া হবে, যাতে জ্বলার সময় একটু নড়তেও না পারে। কারণ, এদিকে সেদিকে নড়তে পারলেও আযাবের মধ্যে কিছুটা হলেও হ্রাসবোধ হতে পারে। আর কেউ কেউ বলেছেন, দোযখের মুখকে লম্বা লম্বা স্তম্ভ ফেলে উপর থেকে আবৃত করে দেওয়া হবে। والله أعلم

সূরা ফীল

সূরা ১০৫ । ৫ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥ ، رُكُوعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①

১. আপনি কি দেখেননি– আপনার রব হস্তি বাহিনীর সাথে কীরূপ আচরণ করেছিলেন[১]?

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ②

২. তিনি কি ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি[২]?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③

৩. এবং তিনি ওদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন!

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④

৪. যারা ওদের উপর নিক্ষেপ করছিল শক্ত মাটির পাথর[৩]।

---

১. অর্থাৎ হাতীওয়ালাদের সাথে আপনার রব যে আচরণ করেছিলেন, তা নিশ্চয় আপনার জানা আছে। কারণ, এ (ঐতিহাসিক) ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্মের কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হওয়ায় শিশুরা পর্যন্ত তা বলাবলি করত। সময়ের এই নিকটবর্তিতা ও অতি প্রসিদ্ধির কারণে ঘটনাটি জানাকে (رُؤْيَة) তথা চোখে 'দেখা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে (অর্থাৎ اَلَمْ تَعْلَمْ 'আপনি কি জানেননি' না বলে اَلَمْ تَرَ- বলা হয়েছে)।

২. অর্থাৎ ওরা আল্লাহর কাবাগৃহ ধ্বংস করে নিজেদের তৈরী কাবা তথা গীর্জাকে আবাদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। আল্লাহ তাআলা ওদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ এবং সকল কলা-কৌশল পণ্ড করে দেন। পবিত্র কাবার ধ্বংস চিন্তায় ওরা নিজেরাই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়।

৩. **হস্তী-বাহিনীর ঘটনা**

'আসহাবে ফীল' বা হস্তী-বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে, হাবশার বাদশাহর অধীনে ইয়ামান প্রদেশে আব্রাহা নামে এক শাসক ছিল। সে দেখল– সারা আরবের লোকেরা কাবা ঘরে হজ করতে যায়। তার আকাঙ্ক্ষা হল– তারা তার (আব্রাহার) নিকট সমবেত হোক। সে মত সে চিন্তা করল যে, নিজ খ্রিস্টধর্মের নামে একটি বিরাট গির্জা নির্মাণ করবে, যার মধ্যে থাকবে সব রকম আড়ম্বর, সাজসজ্জা, আনন্দ-আরাম ও চিত্তাকর্ষণের আয়োজন। ফলে

৫. এভাবে তিনি ওদের ভক্ষিত ভুসির মত করে দিলেন[১]।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

মানুষ অনাড়ম্বর ও জাঁক-জমকহীন আসল কাবাকে ছেড়ে এই জৌলুশভরা কাবার প্রতি আকৃষ্ট হবে, ফলে মক্কার হজ বন্ধ হয়ে যাবে।

সে তখন ইয়ামানের সর্ববৃহৎ শহর 'সানআ'-এ নিজ কৃত্রিম কাবার ভিত্তি স্থাপন করল এবং অতি উদারচিত্তে নির্মাণ কাজে বিপুল অর্থ ব্যয় করল। কিন্তু তাতেও লোকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হল না। আরববাসী বিশেষত কুরায়শ বংশের লোকেরা এর কথা জানতে পেরে খুবই ক্রুদ্ধ হয়। অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাদের একজন গিয়ে ওদের গির্জায় পায়খানা করে আসে। আর কেউ কেউ বলে, আরববাসীদের কেউ আগুন জ্বালিয়েছিল, বাতাসে উড়ে গিয়ে তা সেই অট্টালিকায় লেগে যায়।

এতে আব্রাহা ক্রোধান্বিত হয়ে কাবা শরীফের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে বিরাট সৈন্যবাহিনী ও হাতীর দলসহ অভিযান চালায়। পথিমধ্যে আরবের যে গোত্রই বাধা দান করে, তাদের মেরে পরাজিত করে। সে সময় নবীজি (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব কুরায়শদের সর্দার এবং কাবা শরীফের প্রধান মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি জানতে পেরে ঘোষণা দিলেন– লোকেরা! তোমরা নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর; কাবা যার ঘর, তিনিই স্বয়ং তা রক্ষা করবেন। আব্রাহা পথ নিষ্কণ্টক দেখতে পেয়ে নিশ্চিত হল– কাবার ধ্বংস সাধন এখন কোন কঠিন কাজ নয়, কারণ প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

এই ভেবে আব্রাহা সদলবলে মক্কার নিকটবর্তী 'মুহাস্সর' প্রান্তরে পৌছলে সমুদ্রের দিক থেকে সবুজ ও পীতবর্ণের ছোট ছোট পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসতে থাকে। এদের প্রত্যেকের ঠোঁটে ও পাঞ্জায় ছোট ছোট কঙ্কর ছিল। এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর পাখির ঝাঁক সৈন্যদলের উপর বৃষ্টিধারার মত কঙ্কর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। আল্লাহর কুদরতে সেই পাথর-কঙ্করগুলি বন্দুকের গুলির চেয়েও কার্যকর হয়ে ছিল– যার গায়েই লাগত, এক দিক থেকে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যেত এবং (শরীরে) এক আশ্চর্যকর বিষাক্ত উপাদান রেখে যেত। আব্রাহার সৈন্যদের অনেকে সেখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যারা পলায়ন করে, তারা অধিকতর কষ্ট ভোগ করে মারা যায়।

এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জন্মের মাত্র পঞ্চাশ দিন আগের, বরং কেউ কেউ বলেন যে, ঠিক সেই দিনই তাঁর পবিত্র জন্ম হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনা যেন তাঁরই আবির্ভাবের একটি আসমানী নিদর্শন ছিল এবং একটি গায়বী ইঙ্গিত ছিল যে, আল্লাহ তাআলা যে অলৌকিকভাবে নিজ ঘরের হেফাজত করলেন, ঠিক সেভাবেই এই ঘরের পবিত্রতম মুতাওয়াল্লী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরেরও হেফাজত করবেন এবং খ্রিস্ট বা অন্য কোন ধর্মের লোকদেরকে কাবাগৃহ বা কাবার সত্যিকার খাদেমদের ধ্বংস করার সুযোগ দেবেন না।

১. যে ভুসি গরু, ঘোড়া ইত্যাদি জন্তু খেয়ে রোমন্থন বা চর্বিত চর্বন করে পরিত্যাগ করে। উদ্দেশ্য হল ওরা হয়ে গেল এমনই পঁচা, বিক্ষিপ্ত, বিশ্রী, নিকৃষ্ট ও চূর্ণ-বিচূর্ণ।

সূরা কুরায়শ

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০৬ । ৪ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٤ ، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝

১. যেহেতু (আল্লাহ) কুরায়শের লোকদের অভ্যস্ত করে দিয়েছেন;

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝

২. তাদের অভ্যস্ত করেছেন শীত ও গ্রীষ্মের সফরে–

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝

৩. অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের রবের।

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার অবস্থায় আহার দিয়েছেন, এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন[১]।

---

১. মক্কায় খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হত না। তাই কুরায়শদের অভ্যাস ছিল বছরে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দুটি সফর করা– শীতকালে ইয়ামানের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের দিকে। কারণ, ইয়ামান উষ্ণ দেশ এবং শাম শীত ও সবুজ দেশ। তারা হরম শরীফের অধিবাসী ও বাইতুল্লাহর খাদেম বলে লোকেরা তাদের অতি ভক্তি ও মর্যাদার চোখে দেখত, তাদের সম্মান করত এবং তাদের জান-মালের ক্ষতি হতে দিত না। এভাবে তাদের মর্জি মত লাভালাভ হত। অতঃপর তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ঘরে বসে খেত ও খাওয়াত। হরম শরীফের চতুর্দিকে লুটপাট ও চুরি-ডাকাতির বাজার গরম থাকলেও কাবাঘরের সম্মানার্থে কোন চোর-ডাকাত কুরায়শদের উপর আক্রমণ করত না।

এসব অনুগ্রহের কথাই এখানে আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে বলেছেন যে, এ ঘরের বদৌলতে তিনি তোমাদের জীবিকা দান করেছেন, শান্তি-নিরাপত্তা দান করেছেন, আসহাবে ফীলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছেন। এতদসত্ত্বেও এ ঘরের মালিকের ইবাদত কেন কর না এবং তাঁর রাসূলকে কেন কষ্ট দাও– এ কি চরম অকৃতজ্ঞতা নয়? অন্যান্য বিষয় না বুঝতে পারলেও এরূপ স্পষ্ট বিষয় বোঝাও কি কঠিন?

সূরা মাউ'ন

سُوۡرَةُ الۡمَاعُوۡنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০৭ । ৭ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٧، ركوعها ١

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ يُكَذِّبُ بِالدِّيۡنِ ۞

১. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচারকে অস্বীকার করে[১]?

فَذٰلِكَ الَّذِىۡ يَدُعُّ الۡيَتِيۡمَ ۞

২. এবং সে-ই তো ওই ব্যক্তি, যে এতীমকে ধাক্কা দেয়[২]।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الۡمِسۡكِيۡنِ ۞

৩. এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না[৩]।

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۞

৪. অতএব দুর্ভোগ সেই নামাযীদের–

الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۞

৫. যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন[৪]।

---

১. অর্থাৎ সে মনে করে যে, বিচার অনুষ্ঠিত হবে না এবং আল্লাহর তরফ থেকে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের প্রতিফল কখনো পাওয়া যাবে না।

আবার কেউ কেউ دين শব্দটির অর্থ ধর্ম নিয়েছেন– অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ও সত্য দীনকে মিথ্যা বলে। বলতে গেলে, দীন-ধর্ম ওর নিকট কোন বিষয়ই নয়।

২. অর্থাৎ এতীমের জন্য মায়ামমতা ও সহানুভূতি দূরের কথা, তার প্রতি সে অত্যন্ত কঠোরতা ও অসদাচরণ করে থাকে।

৩. অর্থাৎ গরীব ও অভাবগ্রস্তদের খবর সে নিজেও নেয় না, অপরকেও নিতে উৎসাহিত করে না। বলা বাহুল্য, এতীম ও অভাবীদের খবর নেওয়া এবং তাদের অবস্থার প্রতি দয়াদ্র হওয়া দুনিয়ার সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং সেই সব মহৎগুণের অন্যতম, যার সৌন্দর্য সম্বন্ধে সকল গুণী ও বুদ্ধিমান একমত। অতএব যে মানুষ এসব প্রাথমিক গুণ থেকেও বঞ্চিত, সে মানুষ নয়– বরং পশু। এহেন পশুর আবার দীন-ধর্মের সঙ্গে কী সম্পর্ক এবং আল্লাহর সঙ্গেই বা ওর কী সম্পর্ক থাকবে?

৪. অর্থাৎ ওদের এ অনুভূতি নেই যে, নামাযের মধ্যে কার উদ্দেশ্যে মুনাজাত (আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা) করা হয় এবং নামাযের উদ্দেশ্যই বা কী এবং তা কত গুরুত্বপূর্ণ? এ কি কোন নামায হল যে, ইচ্ছা হলে পড়ল, নতুবা পড়ল না, সময়ে বা অসময়ে দাঁড়িয়ে

৬. যারা (মানুষকে) দেখায়[১]।	الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ
৭. এবং (মানুষদের) নিত্যব্যবহার্য জিনিসও দেয় না[২]।	وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۟

গেল। আলাপে বা দুনিয়ার কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে জেনে-শুনে ওয়াক্ত নষ্ট করে দিল। তারপর পড়লেও চার ঠোকর মারল– কোন খবর নেই যে, কার সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা বড় বিচারকের দরবারে কী অবস্থায় হাযিরা দিচ্ছে? আল্লাহ কি আমাদের শুধু ওঠা-বসা, ঝুঁকে পড়া ও সোজা হওয়াকেই দেখেন? আমাদের দিলের দিকে কি দৃষ্টি রাখেন না যে, তাতে কতটুকু ইখলাস ও খুশূ-খুযূ রয়েছে?

স্মরণ রাখা উচিত যে, উল্লিখিত সব কিছু স্তরভেদে عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী এমনই বলেছেন।

১. অর্থাৎ শুধু নামায কেন, ওদের অন্যান্য আমলও লোক দেখানো ও প্রদর্শনীর জন্য। বলতে গেলে, ওদের উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে একমাত্র মানুষকে সন্তুষ্ট করা।

২. অর্থাৎ যাকাত প্রদান, দান-খয়রাত করা তো দূরের কথা, মামূলী ব্যবহারিক দ্রব্যাদি পর্যন্ত (যথা– বালতি, দড়ি, হাঁড়ি, পাতিল, ডেগচি, কুঠার, সুঁই-সুতা ইত্যাদি) কেউ ধার চাইলে দেয় না। অথচ এসব নিত্য ব্যবহৃত সাধারণ দ্রব্যাদি (সমাজ জীবনে) একে অপরকে দিয়ে থাকে। যখন ওদের বখিলী ও ফাসেকীর অবস্থা এরূপ, তখন লোক দেখানো নামায দ্বারাই বা কী ফায়দা হবে? একজন মানুষ যদি নিজেকে মুসলমান নামাযী বলে এবং (অন্যদের দিয়ে) বলায়, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে ইখলাস ও মানুষের সঙ্গে সহানুভূতি না রাখে– তবে তার ক্ষেত্রে ইসলাম শব্দটি অর্থহীন এবং তার নামায যথার্থতা থেকে অনেক দূরবর্তী। এহেন রিয়া ও দুশ্চরিত্রতা সেসব দুর্ভাগাদের স্বভাব হওয়া উচিত, যারা আল্লাহর দীন-ধর্ম ও বিচার-দিবসের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাস রাখে না।

সূরা কাওছার

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১০৮ । ৩ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٣، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١

১. নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি কাওছার[১]।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

২. অতএব আপনি নিজ রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন ও কুরবানী করুন[২]।

---

১. 'কাওছার' এর অর্থ প্রচুর কল্যাণ– অর্থাৎ অনেক বেশি কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। এস্থলে এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য, সে সম্বন্ধে البحر المحيط কিতাবে ২৬টি উক্তির উল্লেখ রয়েছে। সর্বশেষে তাতে যে উক্তিটির প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা এই যে, সব ধরনের দীনী ও পার্থিব দৌলত এবং বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নে'য়ামত, যেগুলি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা তাঁর মাধ্যমে তাঁর ভাগ্যবান উম্মত লাভ করবেন বলে নির্ধারিত ছিল, তা সবই এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এই নেয়ামতসমূহের মাঝে 'হাওযে কাওছার'ও একটি বিরাট নে'য়ামত, যা মুসলমানদের মধ্যে এ নামেই খ্যাত এবং যার পানির দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাশরের মাঠে নিজ উম্মতকে পরিতৃপ্ত করবেন।(আয় আরহামুর রাহিমীন! এই গোনাহগার পাপীকেও তা থেকে পান করিয়ে তৃপ্ত করবেন)। [অধম অনুবাদকেরও এই-ই প্রার্থনা।}

হাওযে কাওছার সম্পর্কে দু'টি কথা

কোন কোন মুহাদ্দিছের মতে 'হাওযে কাওছার' এর বিষয়টি মুতাওয়াতির পর্যায়ে অসংখ্য-অগণিত শরয়ী দলীল-প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিভাবে প্রমাণিত। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এর সত্যতায় বিশ্বাস রাখা জরুরী। হাদীসসমূহে এ হাওযের বিরল ও বিস্ময়কর সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বর্ণনা রয়েছে। এর অবস্থান কতক বর্ণনা মতে হাশরের মাঠে। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনা মতে বেহেশতের মধ্যে থাকা প্রমাণিত হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৫৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০০) অধিকাংশ মনীষী এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলেছেন, আসল ঝরনাটি বেহেশতের মধ্যেই থাকবে এবং তারই পানি হাশরের মাঠে একটি হাওযে এনে জমা করা হবে। আর এ উভয়টি কাওছার নামেই আখ্যায়িত হয়ে থাকবে। والله اعلم بالصواب

২. অর্থাৎ এত বিরাট নে'য়ামত ও অনুগ্রহের শোকর ও কৃতজ্ঞতাও বিরাট হওয়া উচিত। সুতরাং আপনার কর্তব্য, নিজের রূহ, দেহ ও অর্থের দ্বারা আজীবন নিজ প্রভুর ইবাদতে রত থাকা। দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইবাদত হচ্ছে নামায, আর আর্থিক ইবাদতগুলির মধ্যে কুরবানী এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা, কুরবানীর মূল ছিল জানের কুরবানী। তবে কতিপয় হেকমত ও মঙ্গল বিবেচনায় পশু কুরবানীকে তার স্থলাভিষিক্ত

৩. যে আপনার শত্রু, নিশ্চয় সে-ই লেজ-কাটা (নির্বংশ)[১]। إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

করা হয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ঘটনার দ্বারাই এ কথা প্রতীয়মান হয়। এ জন্যই পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও নামায ও কুরবানীর উল্লেখ একসঙ্গে করা হয়েছে– قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (আপনি বলুন, 'আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহরই জন্য, যিনি গোটা বিশ্বের প্রতিপালক। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এ আদেশই করা হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যকারী।' –সূরা আন'আম, আয়াত ১৬৩)

বি. দ্র. কোন কোন রেওয়ায়াতে انحر এর অর্থ এসেছে– বুকের উপর হাত বাঁধা। কিন্তু ইবনে কাছীর (র) এসব বর্ণনার শাস্ত্রীয় সমালোচনা করে انحر এর অর্থের বিষয়ে কুরবানী করার উক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বলতে গেলে, দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে মুশরিকদের পূজা ও বলীর প্রতিবাদে মুসলমানদের আদেশ করা হয়েছে, এ কাজ একমাত্র একক আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৫৯৭)

১. কোন কোন কাফের হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবী করে বলত, এই ব্যক্তির কোন পুত্রসন্তান নেই। সুতরাং যতদিন জীবিত আছে ততদিনই তার নাম, মৃত্যুর পর কে নাম নেবে? ওদের পরিভাষায় এরূপ ব্যক্তিকে ابتر বলা হয়। আসলে লেজকাটা জন্তুকে أبتر বলা হয়। যার মৃত্যুর পর নাম নেওয়ার কেউ নেই, তার যেন লেজ কেটে গেল। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে– যে ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন এবং চিরকাল ধরে যার নাম সমুজ্জ্বল রাখবেন, তাঁকে 'আব্‌তার' বলা চরম বোকামী। প্রকৃত প্রস্তাবে 'আব্‌তার' সে-ই, যে এই প্রিয় ও পবিত্র সত্তার সঙ্গে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং নিজের পিছনে কোন সুনাম-সুখ্যাতি ও শুভ ফলাফল রেখে যায় না।

কুরআনী ঘোষণার যথার্থতা

আজ চৌদ্দশত বছর পর মাশাআল্লাহ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী সন্তানদের দ্বারা দুনিয়া সমুজ্জ্বল রয়েছে, আর দৈহিকভাবে কন্যাজাত আওলাদও দেশে দেশে ছড়িয়ে আছেন। হুযূরের দীন-ধর্ম, তাঁর কল্যাণময় আদর্শ জগতের বুকে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। সুখ্যাতি, ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধার সাথে তাঁর স্মৃতি কোটি কোটি মানুষের অন্তরকে উষ্ণ-তেজোদীপ্ত করে রেখেছে। শত্রু-মিত্র সকলে তাঁর ইসলাহী কার্যধারাকে আন্তরিকতার সাথে স্বীকৃতি দিচ্ছে। অতঃপর পার্থিব জীবন শেষে পরকালে যে মহা মর্যাদাশালী স্থান অর্থাৎ 'মাকামে মাহমূদে' তিনি অধিষ্ঠিত হবেন এবং সমবেত বিশ্বমানবের সম্মুখে যে সর্বজনীন সর্দারী ও সমাদৃতি তাঁর হাসিল হবে– তার তো কথাই নেই। এরূপ শাশ্বত বরকত ও চির কল্যাণের অধিকারী ব্যক্তিসত্তাকে أبتر 'আব্‌তার' বলা যেতে পারে কি?

পক্ষান্তরে সেই উদ্ধত, ধৃষ্টের কথা চিন্তা করুন, যার মুখ থেকে এহেন শব্দ উচ্চারিত হয়েছিল। দুনিয়ার বুকে কোথাও ওর নাম নিশানা নেই– আজ ওকে শুভভাবে স্মরণ করার কেউ নেই। ঠিক একই অবস্থা সেই ধৃষ্টদের ভাগ্যেও জুটেছে, যারা কোন কালে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা করতে সচেষ্ট হয়েছে এবং তাঁর মর্যাদার প্রতি ধৃষ্টতা করেছে। ভবিষ্যতেও এমনই হতে থাকবে।

সূরা কাফিরূন

সূরা ১০৯ । ৬ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

آياتها ٦، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আপনি বলুন, 'হে কাফেররা'[১]!

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

২. তোমরা যার ইবাদত কর আমি তার ইবাদত করি না।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

---

১. **শানে নুযূল**

একবার কতিপয় কুরায়শ সর্দার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল– হে মুহাম্মদ! আসুন আমরা এই মর্মে সন্ধি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করবেন, পরবর্তী বছর আমরা আপনার মা'বুদের ইবাদত করব। এভাবে উভয় পক্ষই অপর পক্ষের ধর্মের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে নিই। উত্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আল্লাহর পানাহ! আমি তাঁর সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্যও কাউকে শরীক সাব্যস্ত করতে পারি না। এতে ওরা বলল– তবে আপনি আমাদের কতক উপাস্যকে মেনে নিন, (তাদের মন্দচারি বলবেন না), আমরা আপনাকে সত্য বলে মেনে নেব এবং আপনার মা'বুদের ইবাদত করব। ওদের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করত এ সূরা নাযিল হয় এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের মাঝে তা পাঠ করে শুনালেন।

সূরাটির সারমর্ম ও উদ্দেশ্য

মুশরিকদের রীতি-নীতির প্রতি সম্পূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ এবং ওদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাই সূরাটির মর্মকথা। শিরকের মূলোচ্ছেদ করাই যাদের প্রথম কর্তব্য, সেই নবীগণ এহেন নাপাক ও গান্দা সন্ধিতে কী করে রাযী হতে পারেন? প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহর উপাস্যতায় কোন ধর্মাবলম্বীরই দ্বিমত নেই, স্বয়ং মুশরিকরাও স্বীকার করত যে,– আমরা এসব দেব-দেবীর উপাসনা এ জন্যই করি যে, এরা আল্লাহর দরবারে আমাদেরকে নৈকট্য লাভ করিয়ে দেবে : مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ([ওরা বলে] আমরা তো তাদের উপাসনা কেবল এ জন্য করি, যেন তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। –সূরা যুমার, আয়াত ৩) দ্বিমত যা কিছু আছে, তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো (গায়রুল্লাহর) উপাসনার ব্যাপারে। সুতরাং কুরায়শরা যে ধরনের সন্ধির প্রস্তাব করেছে, তার পরিষ্কার অর্থ এই ছিল যে, ওরা তো পূর্বের মতই নিজেদের মতবাদের উপর অটল থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ ও গায়রুল্লাহ উভয়ের উপাসনা করবে। আর আপনি নিজের মতবাদ তাওহীদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। অতএব এহেন সন্ধি সম্পর্কে আলোচনার পরিসমাপ্তির জন্য সূরাটি অবতীর্ণ করা হয়।

৩. এবং তোমরাও আমি যাঁর ইবাদত করি তাঁর ইবাদতকারী নও[১]।	وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ
৪. আর (ভবিষ্যতেও) আমি তার ইবাদত করব না, তোমরা যার ইবাদত করছ।	وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ
৫. এবং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে না, আমি যাঁর ইবাদত করি[২]।	وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ

১. অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত যে সকল উপাস্য তোমরা নির্ধারণ করে রেখেছ, আমি বর্তমানেও তাদের উপাসনা করি না এবং তোমরাও শরীকহীনভাবে সেই একক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহর উপাসনা কর না, যাঁর উপাসনা আমি করি।

২. অর্থাৎ (বর্তমানের ন্যায়) ভবিষ্যতেও আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা কখনো করবো না এবং তোমরাও শরীকহীনভাবে আমার একক মা'বূদের উপাসনা করবে না। মোট কথা, আমি তাওহীদবাদী হয়ে শিরক করতে পারি না– বর্তমানেও না, ভবিষ্যতেও না। আর তোমরা মুশরিক থেকে একেশ্বরবাদী আখ্যায়িত হতে পার না– এখনো না, ভবিষ্যতেও না। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতগুলিতে পুনরাবৃত্তি (تكرار) থাকে না।

অন্যান্য মতামত

কোন কোন তাফসীরকার এখানে আয়াতের পুনরাবৃত্তিকে তাকীদ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর কেউ কেউ প্রথম দুই বাক্যে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে উপসনা না করা এবং পরবর্তী দুই বাক্যে অতীতে তা না করার অর্থ নিয়েছেন, যেমনঃ আল্লামা যমখশরী (র)। আবার কোন কোন তাফসীরকার প্রথম দুই বাক্যে বর্তমানের এবং শেষের বাক্যগুলিতে ভবিষ্যতের অর্থ ধরেছেন। যেমনঃ আয়াতের তরজমা থেকে তা-ই প্রকাশ পায়।

কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী প্রথম বাক্য দুটির মধ্যে ما কে موصولة এবং দ্বিতীয় উভয় বাক্যে ما কে مصدرية ধরে এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমার ও তোমাদের মধ্যে মা'বূদের ব্যাপারেও ঐক্য নেই, ইবাদতের তরীকার মধ্যেও মিল নেই। তোমরা মূর্তিপূজা কর– ওরা আমার মা'বূদ নয়। আমি তো সেই আল্লাহর ইবাদত করি, যাঁর মর্যাদা ও গুণাবলিতে কোন শরীক হতে পারে না। আর এমন আল্লাহ তোমাদের উপাস্য নয়। তদ্রূপ, তোমরা যে পন্থায় ইবাদত কর– যেমনঃ কাবার চতুর্দিকে উলঙ্গ হয়ে নাচতে শুরু কর, অথবা আল্লাহর যিকিরের স্থলে সিটি ও তালি বাজাতে শুরু কর– আমি এভাবে ইবাদত করি না। আর আমি যে ভক্তিভরে আল্লাহর ইবাদত করে থাকি, তোমাদের সেই তাওফীক নেই। অতএব আমার ও তোমাদের পথ সম্পূর্ণ পৃথক।

(আল্লামা উসমানীর অভিমত)

তবে অধমের মনে হয়– প্রথম বাক্যটিকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অস্বীকৃতির জন্য ধরলে ভাল হয়, অর্থাৎ– আমি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তোমাদের মা'বূদের উপাসনা করতে পারি না,

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আর আমার জন্য আমার দীন[১]।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

যেমনটি তোমরা আমার দ্বারা করাতে চাচ্ছ। আর وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ–এর অর্থ (হাফেজ ইবনে তায়মিয়ার কথানুযায়ী) এভাবে করলে ভাল হয় যে, (যখন আমি আল্লাহর রাসূল, সুতরাং) আমার শান এই নয় এবং আমার দ্বারা এ কখনো সম্ভব নয় যে, (শরী'য়তপ্রাপ্তির পর) আমি শিরক অবলম্বন করি। এমন কি, অতীতকালে ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেও যখন তোমরা সকলে পাথর ও বৃক্ষ পূজা করছিলে, আমি তখনও কোন গায়রুল্লাহর পূজা করিনি। অতএব এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর আলো, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, হেদায়াত ইত্যাদি আগমনের পর কী করে সম্ভব যে, আমি শিরকের কাজকর্মে তোমাদের সহযোগী হয়ে যাব? সম্ভবত এ জন্যই এস্থলে ولا أنا عابد এর মধ্যে جملة اسمية এবং مَاعَبَدتُّم এর মধ্যে অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর কাফেরদের অবস্থা দু'বারই একই শব্দাবলি দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে– وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ অর্থাৎ তোমরা নিজেদের অযোগ্যতা ও অশেষ দুর্ভাগ্যের কারণে কখনো কোনও অবস্থায় শরীকহীনভাবে একক আল্লাহর ইবাদতকারী হওয়ার উপযুক্তই নও। এমন কি, ঠিক সন্ধির আলোচনাকালেও তোমরা শিরকের মনোভাব বর্জন করতে পার না।

আর এক স্থানে ماتعبدون অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কালের শব্দ, দ্বিতীয় স্থানে ماعبدتم অর্থাৎ অতীতকালের শব্দ ব্যবহারের মধ্যে সম্ভবত এই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওদের মা'বূদ প্রত্যহ পরিবর্তিত হয়ে থাকে– যেমন : কোনো বিস্ময়কর বস্তু দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোনও সৌন্দর্যমণ্ডিত পাথর দেখতে পেলে তাকেই উঠিয়ে মা'বূদ বানিয়ে নেয় এবং পূর্ববর্তী মা'বূদকে বিদায় করে দেয়। আবার প্রত্যেক মৌসুমের ও প্রত্যেক কাজের পৃথক মা'বূদ রয়েছে– সফরে একজন, বাড়ীতে একজন, ভাত-রুটি দানকারী একজন, সন্তান দানকারী একজন ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাফেজ শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম (র) بدائع الفوائد –এ আলোচ্য সূরার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে খুবই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের উলূম ও মাআরেফের (জ্ঞানরাজি ও তত্ত্বমালার) প্রতি উৎসাহ থাকলে তা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

১. হযরত শাহ (আঃকাদের) সাহেব (র) লেখেন, 'অর্থাৎ তোমরা যে জিদ ধরেছ, তাতে আল্লাহ মীমাংসা না করা পর্যন্ত তোমাদের বুঝিয়ে কী লাভ।' এখন আমরা তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট হয়ে সেই মীমাংসারই অপেক্ষায় আছি। এবং আল্লাহ আমাদের যে পরিপক্ব দীন-ধর্ম দান করেছেন, তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি, আর তোমরা নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যবশত যে গতিধারা অবলম্বন করেছ,তা নিয়েই থাক। প্রত্যেক দলকেই নিজ নিজ পথের জন্য ফল ভোগ করতেই হবে।

সূরা নাস্‌র

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ১১০। ৩ আয়াত। ১ রুকূ। মক্কী

آياتها ٣، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও মীমাংসা* আসবে[১]

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝

২. এবং লোকদের দেখবেন– তারা দলে দলে দীনে প্রবেশ করছে–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

৩. তখন আপনি স্বীয় রবের সপ্রশংস তাস্‌বীহ পাঠ করতে থাকবেন[২] এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল[৩]।

---

* **দ্বিতীয় তরজমা–** (বড়)‘বিজয়’।

১. বড় মীমাংসা ছিল মক্কা শরীফ (যা বলতে গেলে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর রাজধানীস্বরূপ) বিজয় হয়ে যাওয়া। অধিকাংশ আরব গোত্রের দৃষ্টি এ দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এর পূর্বে এক দুজন করে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল। মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করতে শুরু করে। এমন কি সমগ্র আরব ভূখণ্ড ইসলামের কলেমা পড়তে আরম্ভ করে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হয়।

২. অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে, আপনার আবির্ভাব ও দুনিয়াতে থাকার উদ্দেশ্য (অর্থাৎ দীন-ধর্মের পূর্ণতা এবং খেলাফতে কুব্‌রার সূচনা) সাধিত হয়েছে; এখন পরকালের সফর নিকটবর্তী। সুতরাং দুনিয়ার দিক থেকে ফারেগ হয়ে এদিকেই লেগে যান এবং পূর্বের চেয়েও অধিক পরিমাণে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করতে থাকুন এবং এই সব বিজয় ও সাফল্যের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকুন।

৩. অতএব নিজের জন্য ও উম্মতের জন্য ইসতেগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করতে থাকুন।

বি. দ্র. নবী করীম (সা)-এর নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ে পূর্বে একাধিক স্থানে (সূরা ফাতহ, আয়াত ২, সূরা মু'মিন, আয়াত ৫৫) আলোচনা হয়েছে– তা দ্রষ্টব্য।

হযরত শাহ (আঃকাদের) সাহেব (র) লেখেন– ‘অর্থাৎ কুরআনের বহু স্থানে ফয়সালার ওয়াদা রয়েছে, আর কাফেররা তা তাড়াতাড়ি চাইত। নবীজির শেষ বয়সে মক্কা বিজয় হল, আরব গোত্রগুলি দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করল। ফলে ওয়াদা সত্য হল। এখন উম্মতের গোনাহ মাফ করিয়ে নিন, যাতে শাফাআতের সৌভাগ্যও লাভ হয়। এ সূরা তাঁর শেষ বয়সে অবতীর্ণ হয়। নবীজি (সা) বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে তাঁর যে কর্তব্য ছিল তা সম্পাদন করেছেন, এখন পরকালের সফরের পালা।’

সূরা লাহাব

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১১১ । ৫ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٥ ، ركوعها ١

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আবু লাহাবের হাত দুটা ভেঙ্গে গেছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে[১]।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ①

১. **আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর দুরাচার-পাপাচার**

'আবু লাহাব' ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা, (যার আসল নাম ছিল আবদুল উয্‌যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব)। কিন্তু সে নিজের কুফরী ও দুর্ভাগ্যের কারণে নবীজির বড় শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। যখন তিনি কোন মাহফিলে সত্য বাণী শোনাতেন, তখন সে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করত। এমনকি, প্রস্তরাঘাতে তাঁর পা মুবারক রক্তাক্ত হয়ে যেত। আর এই জালেম লোকদের বলে বেড়াত, তোমরা তাঁর কথা শোনো না– এ লোকটা (আল্লাহর পানাহ!) মিথ্যাবাদী, বেদীন। কখনো সে বলত, মুহাম্মদ আমাদের নিকট এমন সব জিনিসের ওয়াদা করে, যেসব মৃত্যুর পর মিলবে। আমরা সেসবের বাস্তবায়ন দেখছি না।' অতঃপর সে দু'হাত জড়ো করে বলত– تبّا لكما ما أرى فيكما شيئا مِمّا يقول محمد (صلى الله عليه وسلم) ('তোমরা উভয়ে ভেঙ্গে যাও, মুহাম্মদ যা বলে তার কোন কিছু তো দেখি না, হাতে তো কিছুই নেই।') [দালাইলুন নুবওয়াহ্, আবু নুআইম, বর্ণনা ২০৬– ওয়াকেদী সুত্রে বর্ণিত)

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ে আরোহন করে সকলকে ডাকলেন। তাঁর ডাকে সবাই সমবেত হল। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সেখানে আবু লাহাবও উপস্থিত ছিল। (কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে– হাত নেড়ে) সে বলতে লাগল, تَبًّا لك سائر اليوم ألهذا جمعتَنا ('তুমি ধ্বংস হও, এ কথার জন্যই কি আমাদের একত্র করলে?) (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪৭৭০; তাফসীরে ইবনে কাছীর)। আর তফসীরে 'রূহুল মাআনী'-তে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিক্ষেপের জন্য হাতে পাথর তুলে নিয়েছিল। মোট কথা, ওর দুষ্কৃতি ও সত্যের প্রতি দুশমনী চরমে পৌঁছেছিল। ওকে আল্লাহর আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করা হলে সে বলত, যদি এ কথা সত্যই হয়, তবে আমার নিকট ধনবল ও জনবল অনেক আছে, এসব মুক্তিপণ দিয়ে আযাব থেকে বেঁচে যাব।

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীলও পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম শত্রু ছিল। শত্রুতার যে আগুন আবু লাহাব জ্বালাচ্ছিল, উক্ত মহিলা যেন তাতে লাকড়ি ঢেলে আরো বেশি তীব্র করত।

২. ওর কাজে আসেনি ওর সম্পদ এবং ও যা কামাই করেছে[১]। مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

৩. শীঘ্রই ও লেলিহান আগুনে পতিত হবে[২]। سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

৪. এবং ওর স্ত্রীও, যে (মাথায়) লাকড়ি বহন করে বেড়ায়[৩]। وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

সূরার সারমর্ম

বর্তমান সূরার মধ্যে উভয়ের পরিণাম বর্ণনার পর সতর্ক করা হয়েছে, যে নর বা নারী, স্বজন বা পর, বড় বা ছোট– যে-ই সত্যের বিরোধিতায় সচেষ্ট হবে, সে শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই হবে। পয়গম্বরের নিকটাত্মীয়তাও ওকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এই আবু লাহাব হাত নেড়ে কত বড় কথা বলত এবং নিজ জনবলের ভরসায় অহংকারী হয়ে আল্লাহর পবিত্র ও নিষ্পাপ রাসূলের প্রতি হস্ত প্রসারিত করত! কিন্তু দেখ, ওর হাতই এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। সত্যকে পরাজিত করার ওর সব চেষ্টা বরবাদ হয়েছে, ওর নেতৃত্ব চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওর ক্রিয়াকর্ম নিষ্ফল হয়েছে, ওর শক্তি নিঃশেষ হয়েছে এবং সে নিজে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হয়েছে।

আবু লাহাবের পরিণতি

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। কথিত আছে, বদর যুদ্ধের সাত দিন পর ওর দেহে বিষাক্ত ধরনের একটি ফোড়া নির্গত হয় এবং তা সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে পরিবারের সকলে ওকে বাইরে ফেলে আসে। সে সেখানেই মরে যায় এবং তিন দিন পর্যন্ত লাশ এভাবেই পড়ে থাকে। কেউ উঠাতে যায়নি। লাশ পচতে আরম্ভ করলে হাবশী মজুরদের দিয়ে তা উঠিয়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়। ওরা গর্ত খুঁড়ে একটি কাষ্ঠের সাহায্যে লাশটিকে গর্তে ফেলে উপর থেকে পাথরভর্তি করে দেয়। এ তো ছিল দুনিয়ার অপমান ও ধ্বংস। وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (আর নিশ্চয় আখেরাতের আযাব সবচেয়ে গুরুতর, যদি ওরা বুঝত। সূরা যুমার, আয়াত ২৬)

১. অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সন্তানসন্ততি, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কিছুই ওকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না।

২. অর্থাৎ মৃত্যুর পর সে কঠিন শিখাযুক্ত আগুনে পতিত হবে। সম্ভবত এই সূত্রেই পবিত্র কুরআন ওর ডাকনাম 'আবু লাহাব' (অগ্নিশিখার বাপ) বহাল রেখেছে। ওর চেহারা অগ্নিশিখার ন্যায় চকমক করত বলে দুনিয়াবাসী ওকে 'আবু লাহাব' নামে ডাকত, কিন্তু কুরআন ঘোষণা করে দিল, শেষ পরিণতির হিসাবেও সে 'আবু লাহাব' নামে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত ।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল ধনী হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত হীনতা ও কৃপণতাহেতু নিজে জঙ্গল থেকে কাঁটাযুক্ত লাকড়ি কুড়িয়ে আনত এবং নবীজিকে ও (তাঁর নিকট) যাতায়াত-কারীদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। বলা হচ্ছে যে, সে যেরূপে

৫. ওর গলদেশে আছে খেজুর বাকলের মজবুত পাকানো রশি[১]।

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ۟

দুনিয়াতে সত্যের দুশমনী ও আল্লাহর নবীকে কষ্ট দেওয়ার কাজে নিজ স্বামীর সাহায্যকারী ছিল, দোযখেও এই অবস্থায় স্বামীর অনুগামী থাকবে। সম্ভবত সেখানে সে জাহান্নামের কাঁটাদার 'যাক্কুম ও যারী (ضریع)' বৃক্ষের লাকড়ি বহন করে বেড়াবে এবং তার দ্বারা নিজ স্বামীর শাস্তির আগুনকে তীব্রতর করতে থাকবে, যেমনঃ ইবনে কাছীর (র) বলেছেন।

বি. দ্র. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আরবী ভাষায় চোগলখোর অর্থে ব্যবহৃত হয় বলে কেউ কেউ এস্থলে এই অর্থই ধরেছেন। (যেমন ফার্সী ভাষায়ও এমন ব্যক্তিকে هیزم کش [হিযামকাশ] বলা হয়।)

১. অর্থাৎ খুব শক্ত, পাকানো ও দাগ কাটে– এমন দড়ি। এ দ্বারা অধিকাংশ তাফসীরকারদের নিকট দোযখের বেড়ি (গলাবন্ধ) ও শিকল উদ্দেশ্য এবং উপমাটি দেওয়া হয়েছে কাষ্ঠ বহনকারিণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায়। কেননা, লাকড়ির বোঝা বহন করতে দড়ির প্রয়োজন হয়।

কথিত আছে, উক্ত মহিলার গলায় বহু মূল্যের হার ছিল। সে 'লাত' ও 'উয্যা' দেবীর শপথ করে বলত, এ হার মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরোধিতায় ব্যয় করে দেব। পরিণামে দোযখের মধ্যেও ওর গলা হার বা বেড়িযুক্ত থাকাই শোভনীয়। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ হতভাগিনীর মৃত্যুও এভাবেই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ একদা লাকড়ির বোঝার দড়ি ওর গলায় ফেঁসে যায়। ফলে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শোচনীয় মৃত্যু বরণ করে।

সূরা ইখলাস

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ১১২ । ৪ আয়াত । ১ রুকূ । মক্কী

آياتها ٤، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

১. আপনি বলুন, সেই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়[১]।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী[২]।

---

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি কেমন? তাদের বলে দিন, তিনি এক। তাঁর সত্তার মধ্যে কোন প্রকার সংখ্যা ও আধিক্য এবং একাধিক্যের অবকাশ নেই। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমকক্ষ নেই। এতে অগ্নিপূজকদের আকীদার খণ্ডন হয়ে গেল। কারণ, ওরা বলে, 'স্রষ্টা দুজন; কল্যাণের স্রষ্টা 'ইয়াযদাঁ এবং অকল্যাণের স্রষ্টা আহরামান'। অনুরূপ, যে হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীকে আল্লাহর অংশীদার বলে মনে করে, ওদের বিশ্বাসও খণ্ডিত হল।

২. صمد এর ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা হয়েছে। ইমাম তবারী সেই সবের উল্লেখপূর্বক বলেন-

وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا عزّ وجلّ. هو الذي يصمد إليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لاجوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه (ابن كثير)

(এ সকল অর্থই সঠিক এবং সবই আমাদের রবের গুণাবলি। তিনিই হচ্ছেন সেই সত্তা, যাঁর প্রতি সকল প্রয়োজনে রুজু (বা প্রত্যাবর্তন) করা হয়– অর্থাৎ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনিই সেই সত্তা, যাঁর গুণাবলি পূর্ণতা ও উত্তমতায় চরম শীর্ষে স্থাপিত এবং যিনি পানাহারের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে পবিত্র এবং তিনিই সকল সৃষ্টি ফানা হয়ে যাওয়ার পরও সর্বতোভাবে ও সর্বমহিমায় অবিনশ্বর থাকবেন।)

আল্লাহ তাআলার উল্লিখিত অমুখাপেক্ষিতার গুণটির দ্বারা সেই সব জাহেলের বিশ্বাসের খণ্ডন হয়ে গেল, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোন না কোন পর্যায়ে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। এর দ্বারা আর্য সমাজের مادہ وروح 'মাদ্দা ও রূহ' (পদার্থ ও প্রাণ) সম্পর্কিত আকীদারও খণ্ডন হল। কেননা, ওদের নীতি অনুযায়ী আল্লাহ বিশ্বজগতের সৃষ্টির জন্যে এ দুটি বস্তুর মুখাপেক্ষী, তবে এ বস্তু দুটি নিজ ব্যাপারে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। (এ ধরনের বাতিল বিষয় থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)

৩. তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি[১]।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝
৪. আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়[২]।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

---

১. অর্থাৎ কেউ-ই তাঁর সন্তান নয়, তিনিও কারো সন্তান নন। এতে ওদের ধারণার ভ্রান্তি প্রমাণিত হল, যারা হযরত মাসীহ (আ)-কে বা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলে থাকে। তদ্রূপ যারা মাসীহকে বা কোন মানুষকে আল্লাহ বলে মানে, لم يولد দ্বারা ওদের ধারণারও খণ্ডন করা হল– অর্থাৎ আল্লাহর শান এই যে, তিনি কারো দ্বারা জন্মপ্রাপ্ত হতে পারেন না। আর জানা কথা, হযরত মাসীহ (আ) এক সতী-সাধ্বী নারীর গর্ভ থেকে জন্ম লাভ করেছেন। এরপর তিনি কী করে আল্লাহ হবেন?

২. তাঁর সমকক্ষ যখন কেউ নেই, তখন তাঁর স্ত্রী বা পুত্র কেমন করে হয়? এই বাক্যের মধ্যে সেই সব সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি প্রমাণিত হল, যারা আল্লাহর কোন গুণের মধ্যে কোন সৃষ্টিজীবকে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। এমনকি, কোন কোন উদ্ধত লোক আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অন্যদের মধ্যে (তাঁর) গুণাবলি প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে। ইহুদীদের কিতাবাদি খুললে দেখা যায়, কুস্তিগিরদের এক কুস্তিস্থলে হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর কুস্তি হচ্ছে। আর হযরত ইয়াকূব আল্লাহকে আছাড় দিচ্ছেন। (আল্লাহর পানাহ!)

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُوْلُوْنَ إِلَّا كَذِبًا -

(কী সাংঘাতিক কথা, যা ওদের মুখ থেকে বের হয়! ওরা আর কিছু নয়, কেবল মিথ্যাই বলছে।)

إني أسئلك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم -

('আয় আল্লাহ! আপনি এক, একক; আপনি অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি– আপনি আমার গোনাহ মাফ করুন। নিশ্চয়ই আপনি বড় ক্ষমাশীল, মহা দয়ালু।')

সূরা ফালাক

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ১১৩ । ৫ আয়াত । ১ রুকূ । মাদানী

آياتها ٥ ، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

১. আপনি বলুন, 'আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের রবের[১]–

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

২. 'তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে[২]।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝

৩. 'এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তার অন্ধকার ছেয়ে যায়[৩]।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝

৪. 'এবং সেই নারীদের অনিষ্ট থেকে, যারা গ্রন্থিসমূহে ফুঁক দেয়[৪]।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

৫. 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে[৫]।'

---

১. অর্থাৎ যিনি রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভোরের আলো প্রকাশ করেন।

২. অর্থাৎ প্রত্যেক এমন সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় ভিক্ষা করছি, যার মধ্যে কোন অনিষ্ট রয়েছে। সম্মুখে প্রসঙ্গত (এমন) কয়েকটি বিশেষ বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে। কারণ, এতে অধিকাংশ অকল্যাণ, বিশেষত যাদুমন্ত্র প্রভৃতি খুব বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। অথবা অন্ধকারের দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যাস্ত উদ্দেশ্য। হযরত শাহ (আঃ কাদের) সাহেব (র) লেখেন– 'এতে জাহের ও বাতেন এবং দারিদ্র্য, পেরেশানী ও গোমরাহীর অন্ধকার সবই অন্তর্ভুক্ত।

৪. نفاثات في العقد (অর্থাৎ গ্রন্থিসমূহে ফুৎকারকারিণী) বলতে সেই সকল নারী বা দল বা আত্মা উদ্দেশ্য, যারা যাদু-টোনা করার সময় কোন সূতা, চুল, রশি প্রভৃতিতে কিছু পড়ে এবং ফুঁক দিয়ে গিরা দিয়ে থাকে। لبيد بن أعصم লবীদ ইবনে আছম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে যাদু করেছিল, তাতে কতিপয় বালিকাও শরীক ছিল বলে বর্ণিত আছে। والله أعلم

৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, '(কারো প্রতি নজর লাগালে অহিতকামীর) নজর লেগে যায়। নিঃসন্দেহে চোখ বা নজর লেগে যাওয়া একটি বাস্তব সত্য।

তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট من شر حاسد إذا حسد এর অর্থ এই যে, হিংসাকারী যখন নিজ অন্তরের অবস্থাকে দমন করতে না পেরে কার্যকরভাবে হিংসা প্রকাশ করতে শুরু করে, তখন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। অবশ্য কারো অন্তরে অনিচ্ছায় হিংসার উদ্রেক হলে সে যদি নিজকে হিংসা প্রকাশ থেকে দমন করতে পারে এবং যার প্রতি হিংসা, তার সঙ্গে সে রকম কোনো আচরণ না করে– তবে সে এর বহির্ভূত।

স্মরণ রাখা উচিত যে, অন্যের প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নে'য়ামতের অবলুপ্তি কামনা করাকেই 'হাসাদ' বলে। হ্যাঁ, যে নে'য়ামত অন্যকে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ নে'য়ামত বা তার চেয়ে বেশি আমাকেও দেওয়া হোক– কেবল এ কামনা করা হাসাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। একে বরং গিবতা (غبطة) বলা হয়। বুখারী শরীফের হাদীস (৫০২৬) لاحسد إلا في اثنتين (দু'টি জিনিসের মধ্যেই হাসাদ বৈধ) এর মধ্যে حسد শব্দের দ্বারা এই গিবতাই উদ্দেশ্য।

সূরা নাস

سُوْرَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ১১৪ । ৬ আয়াত । ১ রুকূ । মাদানী

آيَاتها ٦، ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরু আল্লাহর নামে, যিনি সীমাহীন মেহেরবান, পরম দয়ালু।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

১. আপনি বলুন, 'আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের[১],

مَلِكِ النَّاسِ ۝

২. 'মানুষের অধিপতির,

اِلٰهِ النَّاسِ ۝

৩. 'মানুষের মা'বুদের–

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝

৪. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে[২];

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

৫. 'যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়–

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

৬. 'সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে[৩]।'

---

১. যদিও আল্লাহ তাআলার প্রভুত্ব ও রাজত্ব সমগ্র সৃষ্টিকুলকে বেষ্টন করে রেখেছে, তবুও তাঁর উল্লিখিত গুণগুলির যেরূপ পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ মানবজাতির মধ্যে হয়েছে, অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে সেরূপ হয়নি। এই জন্য رب، ملك প্রভৃতির সম্পর্ক কেবল মানুষের সঙ্গে করা হয়েছে। অনুরূপ ওয়াসওয়াসার মধ্যে লিপ্ত হওয়া– এটা মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে পাওয়া যায় না।

২. শয়তান অদৃশ্য থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, প্ররোচিত করে। যতক্ষণ মানুষ গাফলতে থাকে, ওর প্রভাবও বাড়তে থাকে। যখন সজাগ, সচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে, তৎক্ষণাৎ সে পিছনে হটে যায়।

৩. শয়তানের দল জিনদের মধ্যেও রয়েছে, মানুষের মধ্যেও আছে :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

(এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু বানিয়েছি দুষ্ট মানুষ ও জিনদের, যারা একে অন্যকে সাজানো কথাবার্তা শেখায়– [লোকদের] ধোঁকা দেওয়ার জন্য। –আন'আম, আয়াত ১২)

আল্লাহ তাআলা উভয় থেকে আমাদেরকে তাঁর আশ্রয়ে রাখুন।

পরিশিষ্ট

সর্বশেষ দু'টি সূরার তাফসীরে বিজ্ঞ আলেম ও পণ্ডিত মনীষীগণ বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম (র), ইমাম রাযী (র), ইবনে সীনা, হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলভী (র)-এর বয়ান এখানে লেখার অবকাশ নেই। শুধু উস্তাদগণের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী (র)-এর বক্তব্যের সারনির্যাস এখানে উদ্ধৃত করছি, যাতে তা 'ফাওয়ায়েদে কুরআন' (অর্থাৎ 'তাফসীরে উছমানী')-এর শুভসমাপ্তির জন্য একটি বরকতময় নিদর্শন হয়।

তিনি বলেন, 'এ একটি স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়ম যে, বাগানে যখন বীজ থেকে কোন নতুন চারা মাটি ভেদ করে উদ্গাত হয়, তখন বাগানের মালী তার সংরক্ষণে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করে থাকে এবং যতদিন পর্যন্ত না তা সমস্ত যমীনী ও আসমানী প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সংরক্ষিত হয়ে পূর্ণতায় পৌঁছে, ততদিন মালীকে খুব বেশি সতর্ক থাকতে হয় এবং পরিপূর্ণ মেহনত করতে হয়। এখন গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, চারাটির জীবন নাশের জন্য অথবা তার ফলমূল উপভোগ থেকে মালীকে বঞ্চিত করার জন্য কী বিপদাপদ রয়েছে, যেগুলোর ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য মালীকে চেষ্টা-প্রয়াস করতে হয় এবং এতে কামিয়াব হওয়ার জন্য সর্বদা মনোযোগী থাকতে হয়। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এ ধরনের বিপদ প্রায়ই চার রকমে প্রকাশ পায়, যার দ্বার বন্ধ করার জন্য চারটি বিষয়ের অতি প্রয়োজন হয়।

এক. এমন উদ্ভিদভোজী জীবজন্তুকে সেই চারাগাছ পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দান করা, যারা সৃষ্টিগতভাবেই উদ্ভিদভোজী হয়ে থাকে।

দুই. কূপ, নদী বা বৃষ্টির পানি এবং বায়ু ও সূর্য-তাপ (মোটকথা জীবন প্রবাহের উন্নতির সমস্ত উপকরণ) তাকে পৌছানোর পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করা।

তিন. উপর থেকে শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি, যা তার দেহের সৃষ্টিগত তাপকে বিপর্যস্ত করার কারণ হতে পারে, তা তার উপর পতিত হতে না দেওয়া। কেননা, এ তার উন্নতি ও ক্রমবিকাশকে ব্যাহত করবে।

চার. বাগানের মালিকের দুশমন বা অন্য কোন হিংসুক এই চারাগাছের শাখা ও পাতাপল্লব ইত্যাদি যাতে কাটতে না পারে অথবা তার মূলোৎপাটন করতে না পারে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা।

যদি এই চারটি বিষয়ের ব্যাপারে মালী সাধ্যমত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ তাআলার নিকট আশা রাখা যায় যে, সেই চারাগাছটি বড় হবে, ফুলে-ফলে সজ্জিত হবে এবং সৃষ্টজীব তার ফলমূল খেয়ে উপকৃত হবে।

অনুরূপ, যিনি পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা-(প্রভাতের রব এবং فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى বীজ ও শস্যের উদগাতা এবং বিশ্ববাগানের প্রকৃত মালিক ও প্রতিপালক), তাঁর নিকট আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব-বৃক্ষ ও ঈমান-বৃক্ষ রক্ষার্থে উল্লিখিত চার ধরনের আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত।

অতএব জানা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত উদ্ভিদভোজী জীবজন্তু কর্তৃক অনিষ্ট-সাধন যেমন কেবল ওদের স্বভাবগত চাহিদার কারণে ছিল, তদ্রূপ ماخلق -এর সাথে شر-এর সংযোগ এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এই شر বা অনিষ্ট মাখলুকের মাঝে কেবল মাখলুক হওয়ার কারণেই নিহিত আছে এবং এর বিকাশে তার/তাদের স্বভাব ও সৃষ্টিগত চাহিদা ছাড়া আর কোন কার্যকারণের ভূমিকা নেই, যেমনটা দেখা যায় সাঁপ, বিচ্ছু ও সকল হিংস্র প্রাণীর মধ্যে।

কবির ভাষায় :

نیش عقرب نہ از پے کین است ÷ مقتضائے طبیعتش ایں است

বিচ্ছুর দংশন কোনো কারণ নয়; বরং নিতান্ত তার স্বভাবই এমন।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে غاسق إذا وقب থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মুফাসসিরদের নিকট এর উদ্দেশ্য রাত, যখন তার অন্ধকার ঘনীভূত হয়। অথবা এর উদ্দেশ্য সূর্য, যখন তা অস্তমিত হয়। কিংবা এর উদ্দেশ্য চাঁদ, যখন তার গ্রহণ হয়– এসব থেকে যে কোন অর্থ নেওয়া যেতে পারে। এ তো নিশ্চিয় করে বলা যায় যে, غاسق (অন্ধকার) থেকে অনিষ্ট তখনই পয়দা হয়, যখন وقوب হওয়ায় (বা বস্তুটি কোন কিছুর নীচে তলিয়ে যাওয়ায়) গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। আর জানা কথা যে, কোন কিছুর আড়ালে তলিয়ে যাওয়ার অর্থ এ ছাড়া আর কী যে, একটি জিনিসের সম্পর্ক আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তা প্রকাশিত থাকার সময় যেসব উপকার আমরা তার থেকে পেতাম, এখন আর সেগুলি আমাদের নাগালে রইল না। কিন্তু যখন অবস্থা এ-ই, তখন এই উদাহরণের প্রয়োগ কার্যকারণ ও ফলাফল থেকে বেশি আর কোন বিষয়ের উপর হয় না। কেননা, ফলাফলের অস্তিত্ব কারণাদির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কারণাদির সম্পর্ক ফলাফলের সাথে কায়েম না হবে, ততক্ষণ কোন ফলই নিজ অস্তিত্বে নিশ্চিতভাবে কামিয়াব হতে পারে না। আর এ সেই বিষয়, যাকে আমরা বিপদাপদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রেখেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, পানি, বায়ু ও সূর্যের তাপ (মোদ্দাকথা, জিন্দেগী ও তরক্কীর সকল কারণ)-এর যদি ঠিক মত ব্যবস্থা না হয়, তবে সেই চারা ম্লান হয়ে শুষ্ক হয়ে যাবে।

এখন তৃতীয় আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে نفاثات في العقد থেকে, যার দ্বারা (আমি বলেছি যে,) যাদুকরী আমলাদি উদ্দেশ্য। যারা যাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, তারা এ বিষয় মানে যে, যাদুর তাছীরে যাদুকৃত ব্যক্তি এমন অবস্থাদির সম্মুখীন হয়, যেগুলোর দ্বারা তার তবীয়ত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। অতএব যাদুর এই আপদ সেই আপদের খুবই সদৃশ হল, যা চারাগাছের উপর শীলাবৃষ্টি ইত্যাদি পতিত হওয়ায় এবং দৈহিক কুদরতী তাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে পয়দা হয়, যার কারণে তার ক্রমবিকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

লাবীদ ইবনে আ'সামের কাহিনীতে যে শব্দাবলি এসেছে- فقال عليه الصلاة والسلام كأنما أنشط من عقال এই শব্দাবলি থেকে পরিষ্কার বুঝে আসে, কোন কিছু দখলকারী (অনুপ্রবেশকারী) হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবের প্রকৃতি, চাহিদা বা প্রয়োজনকে গোপন করে ফেলেছিল। জিবরাঈল আলাইহিস সালামের تعوذ (আশ্রয় চাওয়া) দ্বারা তা আল্লাহর হুকুমে অপসারিত হয়ে যায়।

পূর্বে যেসব আপদ থেকে সতর্ক থাকাকে জরুরী বলা হয়েছিল, তন্মধ্যে এখন কেবল শেষ পর্যায়টি বাকী রয়েছে। অর্থাৎ মালীর কোন দুশমন শত্রুতা ও হিংসার কারণে চারাগাছটিকে মূল থেকে উপড়িয়ে ফেলতে পারে, অথবা তার শাখা ও পাতাপল্লব কেটে ফেলতে পারে। ক্ষতি ও অনিষ্টের এই স্তরকে من شر حاسد إذا حسد আয়াতখানিতে অত্যন্ত স্পষ্টতার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যায় যদি কোন কমতি থেকে থাকে, তবে তা শুধু এতটুকু যে, কোন কোন সময় (চারাগাছের) বীজকে উক্ত চার আপদের কোন একটিরও সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু দৃশ্যমান হওয়ার আগেই হয় কতক পিপীলিকা উক্ত বীজের অভ্যন্তর থেকে সেই বিশেষ মূলবস্তু (جوهر)-কে চুষে নেয়, যার দ্বারা বীজটি অঙ্কুরিত হয় এবং যাকে قلب الحبوب বা 'বীজের সারবত্তা' বলা যায়। অথবা (বীজের) অভ্যন্তরেই ঘুন লেগে তা অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায় এবং ক্রমবিকাশের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সম্ভবত এই মামুলি কমতি পূরণের জন্য দ্বিতীয় সূরার মধ্যে الوسواس الخناس -এর ক্ষতি (বা অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেননা وسواس সেই সকল ফাসেদ খতরা বা মন্দ খেয়ালেরই নাম, যেগুলো প্রকাশ্যভাবে নয়, বরং অভ্যন্তরীনভাবেই ঈমানের শক্তিকে ছিদ্র করে (ঘুন ধরিয়ে) দেয়। আর এগুলোর এলাজও এক অন্তর্যামী আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো হাতে নেই। কিন্তু যখন ওয়াসওয়াসার মোকাবেলা ঈমানের দ্বারা করাই সম্ভব, তখন ওয়াসওয়াসা দূরীকরণের জন্য সেই সব গুণকেই আঁকড়িয়ে ধরা জরুরী হবে, যা ঈমানের আসল উৎস ও উৎপত্তিস্থল এবং যেগুলির দ্বারা ঈমানের সাহায্য হয়।

অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে, সর্বপ্রথমে ঈমান (আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ)-এর ক্রমবিকাশ হয় আল্লাহ তাআলার অশেষ তরবিয়ত ও অসীম নেঁয়ামত দেখে। অতঃপর যখন আমরা তাঁর নিরঙ্কুশ রুবুবিয়্যতের প্রতি লক্ষ করি, তখন আমাদের যেহেন এই দিকে ধাবিত হয় যে, তিনি রাব্বুল ইজ্জত (বা মহামর্যাদাশালী প্রভু), সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী রাজাধিরাজ এবং বাদশাহর বাদশাহও। কেননা, নিরঙ্কুশ তরবিয়তের অর্থ হচ্ছে সর্বপ্রকার দৈহিক, আত্মিক প্রয়োজনাদি একই সাথে পৌছানো। আর এ কাজ সমস্ত কামালাত বা গুণাবলির এমন ধারক ও বাহক ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না, যিনি সব রকমের প্রয়োজনের মালিক হবেন এবং দুনিয়ার কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত থাকতে পারে না। এমন সত্তাকেই আমরা مالك الملك (সর্বোচ্চ রাজাধিরাজ ও শাহানশাহ) বলতে পারি। আর নিঃসন্দেহে তাঁরই জন্য এই শান হওয়া উচিত।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজকার রাজত্ব কার? এক আল্লাহর, যিনি দুর্দন্ত প্রভাবশালী।) বলতে গেলে ملكيت বা مالكيت এমন এক শক্তির নাম, যাঁর কর্তৃত্বের মর্যাদা ربوبيت-এর দ্বারা সুরক্ষিত হয়। কেননা ربوبيت-এর সামগ্রিক সারাসার হল- কল্যাণ করা ও ক্ষতি দূরীভূত করা। আর এই উভয় বিষয়ে নিরঙ্কুশভাবে সমর্থ হওয়া مَلِكٌ عَلَى الإطلاق একমাত্র বিশ্বপ্রভুর দ্বারাই সম্ভব। অতঃপর আর একটু আগে অগ্রসর হলেই مَلِكٌ عَلَى الإِطْلَاقِ হওয়াতেই তাঁর মাবুদিয়্যতের (মাবূদ হওয়ার গুণ) হদিস পাই। কেননা, মাবূদ তাকেই বলে, যাঁর হুকুমের সামনে মাথা অবনত করে দিতে হয় এবং তাঁর হুকুমের মোকাবেলায় আর

কারো হুকুমের কোন গুণগত (নীতিগত) অস্তিত্ব নেই। অতএব এ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এ আনুগত্য ও বন্দেগী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও আধিপত্যের অধিকারী ছাড়া আর কেউ দাবি করতে পারে না। আর এই উভয় জিনিসের প্রকৃত অধিকারী আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ জন্য মাবূদ হওয়ার ও এলাহ হওয়ার গুণও এককভাবে সেই 'ওয়াহ্দাহু লা-শরীকা লাহু'-এর জন্য প্রমাণিত হয়ে গেল। পড়–

أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا.

মোট কথা, সর্বাগ্রে যে সিফত বা গুণ ঈমানের উৎস, তা হচ্ছে 'রুবুবিয়ত'। তার পরবর্তী গুণ مَلكِية এবং সর্বশেষে ألوهيت-এর স্তর। অতএব যে ব্যক্তি নিজের ঈমানকে শয়তানী ওয়াসওয়াসার ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করবে, তাকে সেইভাবে পর্যায়ক্রমে নীচের আদালত থেকে উপরের আদালতে (ফরিয়াদ নিয়ে) যাওয়া সংগত হবে, যেভাবে স্বয়ং তিনি ক্রমান্বয়ে নিজের 'সিফাত' বা গুণাগুণকে (১- رب الناس ، ২- ملك الناس ، ৩- إله الناس) সূরা নাস-এর মধ্যে বয়ান করে দিয়েছেন।

আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তাঁর জন্য এস্থলে তিনটি সিফত বা গুণ واو عطف ছাড়া এবং باء جارّة এর পুনরাবৃত্তি ছাড়া উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে যে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তারও তিনটি দোষ পরপর বর্ণনা করা হয়েছে। তা এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, وسواس শব্দটি ألوهيت গুণের মোকাবেলায় রাখতে হবে। কেননা, যেভাবে প্রকৃত প্রার্থনাস্থল (مستعاذ به) হচ্ছে إله الناس আর ملك ও رب-কে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছানোর সোপান বা শিরোনাম সাব্যস্ত করা হয়েছে– ঠিক তদ্রূপ যার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (مستعاذ منه), তার মৌল হাকীকত হল এই وسواس-ই, যার দোষ সামনে গিয়ে خناس বলা হয়েছে। خناس-এর অর্থ এই যে, শয়তান গাফ্লতের অবস্থায় মানুষের দিলে ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে এবং যখন কেউ জাগ্রত হয়ে যায়, তখন সে চোরের মত চুপিচুপি দূরে সরে যায়। এমন চোরদের ও বদমাশদের বিধি-ব্যবস্থা করা এবং ওদের সীমালঙ্ঘনের হাতথেকে প্রজাদের সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখা সমকালীন বাদশাহর বিশেষ কর্তব্য হয়ে থাকে। এই জন্য সংগত হবে, এই خناس এর মোকাবেলায় ملك الناس-কে রাখা; এবং الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ যা خناس-এর কর্মকাণ্ড এবং যাকে আমরা চোরের মত চুপিচুপি দেয়ালে সিঁধ কাটার সাথে তুলনা করতে পারি, একে رب الناس-এর মোকাবেলায় (যা পূর্ববর্তী আলোচনা হিসাবে ملك الناس-এর কাজের স্তর) গণ্য করা। এবার দেখুন- مستعاذ به ও مستعاذ منه-এর মধ্যে কেমন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য প্রকাশ পেল। والله تعالى أعلم بأسرار كلامه

(আল্লাহ তাআলাই তাঁর কালামের রহস্যাদি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।)

বি. দ্র.

(১) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) প্রমুখ সাহাবীদের থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতিপয় ইহুদী যাদু করেছিল, যার ফলে তাঁর শরীর মুবারক এক ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এ অসুস্থতার কালে কখনো এমনও হয়েছে যে, তিনি কোন একটি পার্থিব কাজ করেও মনে হয়েছে, তিনি তা করেননি। অথবা কোন কাজ না করেও খেয়াল হয়েছে যে, তা করেছেন। এর এলাজস্বরূপ

আল্লাহ তাআলা আলোচ্য সূরা দুটি নাযিল করেন এবং এদের প্রভাবে আল্লাহর হুকুমে যাদুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৭৬৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৯২৬৭; তবাকাতে ইবনে সাআদ : ২/১৫৩)

যাদুর প্রভাব পড়া নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়

স্মরণ রাখতে হবে যে, উক্ত ঘটনা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিছ এর সমালোচনা করেননি। আর এ ধরনের অবস্থা নবুওয়াতের মোটেই পরিপন্থী নয়। উদাহরণস্বরূপ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো অসুস্থ হয়েছেন, কোন কোন সময় সংজ্ঞাহীনও হয়েছেন, অথবা কখনো নামাযের মধ্যে ভুলও হয়েছে এবং তিনি বলেছেন- إنّما أنا بشر انسى كما تنسون فإذا نسيتُ فذكروني (আমিও মানুষ, তোমরা যেরূপ ভুলে যাও আমিও ভুলে যাই, আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।) [বুখারী, হাদীস ৪০১] এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থা এবং ভুল ও বিস্মৃতির কথা অবগত হয়ে কোন ব্যক্তি কি বলতে পারে যে, তাহলে ওহীর প্রতি এবং তাঁর কথার প্রতি কি করে বিশ্বাস স্থাপন করি? (বলতে পারে না) যদি ভুল ও বিস্মৃতি সত্ত্বেও আসমানী ওহী, ধর্মীয় বিধান ও খোদায়ী আহকামে দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ না হয়, তবে মাত্র এতটুকু কারণে যে, কখনো নবীজির কয়েকটি কাজ করার পরে মনে হল, তিনি তা করেননি- এতে কি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও নবুওয়াতের মাকাম থেকে আস্থা উঠে যেতে পারে? অবশ্যই না।

স্মরণ রাখা উচিত যে, ভুল ও বিস্মৃতি, অসুস্থতা ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি বিপত্তিসমূহ নিতান্তই মানব-ধর্মী। নবীরাও মানুষ, এ হিসাবে মানব-ধর্মী উক্ত বৈশিষ্ট্যাদি তাঁদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে না। তবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন অকাট্য প্রমাণাদি ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর সত্য নবী, তখন অবশ্যই মানতে হবে যে, আল্লাহ তাঁর নিষ্পাপতার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং তাঁকে স্বীয় ওহী ইয়াদ করানোর, বোঝানোর ও পৌছানোর ব্যাপারে তিনিই যিম্মাদার। এ হতেই পারে না যে, দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর পথে কোন শক্তি কার্যকর বাধা সৃষ্টি করবে। নফস বা শয়তান, রোগ বা যাদু, কোন কিছুই নবুওয়াতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে অন্তরায় হতে পারে না।

কাফেররা যে নবীদের যাদুগ্রস্ত বলত, তাতে ওদের উদ্দেশ্য ছিল নবুওয়াতকে বাতিল বলা এবং এ কথা প্রকাশ করা যে, যাদুর ফলে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল- অর্থাৎ مَسْحُوْر (যাদুগ্রস্ত) এর অর্থ যেন مجنون বা পাগল মনে করত এবং খোদায়ী ওহীকে পাগলামীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করত। (আল্লাহর পানাহ!) এ জন্য কুরআনে ওদের কথার প্রতিবাদ করা ও তাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করা জরুরী ছিল। কিন্তু এ দাবি কোথাও করা হয়নি যে, নবীগণ মানবীয় অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজনাদির উর্ধ্বে ছিলেন এবং কোন নবী কোন সময় এক মুহূর্তের জন্যও যাদুর এমন মামুলি প্রতিক্রিয়ারও শিকার হতে পারেন না, যা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে মোটেই অন্তরায় নয়।

(২) আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনার এ সূরা দুটি (معوذتين) পবিত্র কুরআনের অংশ হওয়ার বিষয়ে সকল সাহাবীর ঐক্যমত রয়েছে এবং তাঁদের যুগ থেকে অদ্যাবধি এ সত্য

ধারাবাহিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র সাহাবী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি সূরা দুটিকে তাঁর নিজ মুসহাফে (কুরআন-কপিতে) লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সূরা দুটির আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে তাঁরও সন্দেহ ছিল না। তিনি স্বীকার করতেন যে, এ আল্লাহর কালাম এবং নিঃসন্দেহে আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে, তা নাযিল করার উদ্দেশ্য ছিল ঝার-ফুঁক ও চিকিৎসা, তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছিল কি না, তা জানা নেই। এ জন্য সূরা দুটিকে তাঁর কপিতে লিপিবদ্ধ করা এবং সেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করা, যার তেলাওয়াত নামায প্রভৃতিতে করণীয়– তিনি একে সতর্কতার পরিপন্থী মনে করতেন। বিখ্যাত তাফসীর 'রূহুল মাআনী'-তে রয়েছে–

إنه كان لا يعدّ المعوذتين من القرآن وكان لا يكتبهما في مصحفه ، يقول إنهما منزلتان من السماء ، وهما من كلام رب الْعَالَمِين ، ولكن النبي عليه الصلوة والسلام كان يرقي ويعوذ بهما ، فاشتبه عليه أنهما من القرآن أو ليسا منه ، فلم يكتبهما في المصحف . (روح المعاني ج٤، صـ٧٢٣)

(তিনি সূরা ফালাক ও নাসকে [উল্লিখিত অর্থে] কুরআনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতেন না এবং তাঁর মুসহাফে (কুরআন-কপিতে) সূরা দু'টি লিখতেন না। তিনি বলতেন, সূরা দু'টি আসমান থেকে নাযিলকৃত এবং আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু নবী আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম সূরা দু'টি দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। সুতরাং তাঁর মনে দ্বিধা হয় যে, সূরা দু'টি [ওই অর্থে] কুরআনের অন্তর্ভুক্ত কি না, তাই তিনি তাঁর মুসহাফে সূরা দু'টি লিখেননি।)

কাজী আবু বকর বাকেল্লানী লেখেন–

لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن ، وإنّما أنكر إثباتهما في المصحف ، فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في كتابته فيه ، وكأنه لم يبلغه الإذن . (فتح الباري ج٨، صـ٥٧١)

(সূরা দু'টি যে মূলত কুরআনের অন্তর্ভুক্ত, ইবনে মাসউদ তা অস্বীকার করতেন না। তিনি কেবল অস্বীকার করেছেন [তাঁর] মুসহাফে তা অন্তর্ভুক্ত করতে। কেননা, তিনি মুসহাফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া কিছু লেখা সংগত মনে করতেন না। আর এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি যে আছে, তা তাঁর নিকট পৌঁছেনি বলে মনে হয়।)

হাফেজ ইবনে হাজার র. আর একজন আলেম থেকে নিম্ন শব্দাবলি নকল করেছেন–

لم يَكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما ، وإنّما كان في صفة من صفاتهما . (فتح الباري ج٥، صـ ٥٧١)

(সূরা দু'টি যে কুরআনেরই অংশ, এ বিষয়ে অন্যদের সঙ্গে ইবনে মাসউদ রা.-এর কোন মতভেদ ছিল না, মতভেদ ছিল শুধু সূরা দু'টির একটি গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে।)

যা হোক, ইবনে মাসউদ (রা)-এর এই অভিমত নিতান্তই ব্যক্তিগত ও একক ছিল। ইমাম বায্যার র. যথার্থই বলেছেন, 'কোন একজন সাহাবীও তাঁর সঙ্গে একমত হননি। আর এরও

প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, যখন মুতাওয়াতির বর্ণনাসূত্রে তাঁর নিকট প্রমাণিত হল যে, এও قرآن متلو (নামাযে তেলাওয়াত যোগ্য)- তখন তিনি স্বীয় অভিমত পরিবর্তন করে থাকবেন। তদুপরি তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিমত নিতান্তই خبر واحد (বা একক সংবাদদাতার) সূত্রে জানা গেছে, যা تواتر قرآن (কুরআনের মুতাওয়াতির হওয়া)-এর মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 'শরহে মাওয়াকেফ' নামক কিতাবে রয়েছে-

إن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالأحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته ، فتلك الأحاد مما لايلتفت إليه ، ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر ، قلنا إنهم لم يختلفوا في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز ، بل في مجرد كونه من القرآن ، وذلك لايضر فيما نحن بصدده . اه

(কুরআনের কতক সূরার ক্ষেত্রে সাহাবীদের মতভেদ বর্ণিত হয়েছে بالآحاد বা খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে, যা প্রবল ধারণা অর্জনে সহায়ক। আর গোটা কুরআন বর্ণিত হয়েছে تواتر বা যুগ পরম্পরায় বিপুল সংখ্যক লোকের অবিচ্ছিন্ন ও অকাট্য ধারার মাধ্যমে, যা দ্বারা ইয়াকীন বা অকাট্য জ্ঞান অর্জিত হয়। আর ইয়াকীনের বিপরীতে ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব সেসব খবরে ওয়াহিদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবুও যদি আমরা উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাঁদের মতভেদ স্বীকার করে নিই, তা হলেও বলব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে তা নাযিল হয়েছে এবং সাহিত্য-অলংকারের ক্ষেত্রে তা অলৌকিক অর্থাৎ এমন উচ্চমানের যে, এমনটি রচনায় মানুষ অপারগ— এ সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না। হাঁ, মতপার্থক্য ছিল শুধু [উল্লিখিত অর্থে] কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়ে।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন-

وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر ابن مسعود ولكن لم يتواتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى الخ.

(উক্ত জটিলতার একটি উত্তর এই যে, ইবনে মাসউদ রা.-এর যুগেও সূরা দুটি মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত ছিল; কিন্তু ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছেনি। আল্লাহর রহমতে এভাবে এ জটিলতার নিরসন হয়।)

এবং তাফসীরে 'রূহুল মাআনী'-র লেখক বলেন- ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك . اه (ইবনে মাসউদ রা. এ মত প্রত্যাহার করে থাকবেন।)

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) কর্তৃক তাফসীরের সমাপ্তি-পর্বে লিখিত দো'য়া–

দয়াময় রবের শুকরিয়া আদায় করার ভাষা আমার নেই। তাঁরই দেওয়া খালেস তাওফীক ও আসানীর ফলে আজ (৯ জিলহজ্জ ১৩৫০ হি) এই মহান খেদমত সমাপ্তি-পর্বে পৌঁছেছে। এলাহী! আজ আরাফার মুবারক দিনে ও ওকূফে আরাফার সময় তোমার কালামে পাকের একখানি সংক্ষিপ্ত খেদমত তোমারই দয়া ও সাহায্যে সমাপ্ত হল। হাজারো বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে তা তোমার পাক দরবারে পেশ করছি। তুমি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে তা কবুল কর ও মাকবূল বানিয়ে দাও।

ইয়া আল্লাহ! এই খেদমতে আমার দ্বারা পরিপূর্ণ ইখলাস আদায় হয়নি। কিন্তু তোমার রহমত ও মেহেরবানী যেখানে সাইয়্যেআতকে হাসানাতে (অর্থাৎ মন্দকে ভালতে) পরিবর্তন করে দেয়, সেখানে "বাহ্যত একটি হাসানাকে প্রকৃত হাসানাতে" পরিবর্তন করে দেওয়া তোমার পক্ষে কঠিন নয়। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস এ-ই যে, তুমি যেহেতু অতি ক্ষুদ্র বিষয়েরও মূল্যায়ন কর, অতএব তোমার এ গুণের বদৌলতে তুমি এ সামান্য আমলকে চিরস্থায়ী করে দেবে এবং এর শুভ ফলাফলের দ্বারা আমাকে উভয় জাহানে উপকৃত করবে।

ইয়া আল্লাহ! তুমি তোমার কুরআনে পাকের বরকতে আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আমার শাইখ ও উস্তাদদের, আমার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে এবং যাঁরা এ মহান কাজের আহবায়ক ও উৎসাহদাতা হয়েছেন, অথবা যাঁরা এ সৎকাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে ক্ষমা কর এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা কর ও নিরাপদ রাখ। আর আমাদের সকলকে হযরত মুতারজিম (শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান র) এর সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাওসে মিলিত কর।

[ইয়া রাহমান! তোমার রহমতে এ মহৎ কাজের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা, নিরীক্ষণ ও সাহায্য-সহযোগিতায় আমরাযারা অংশগ্রহণ করতে পেরেছি, তাদেরও এই মহৎজনদের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাওসে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। আমীন! –অনুবাদক]

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللّٰهُمَّ آنس وحشتي في قبري، اللّٰهُمَّ ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة، اللّٰهُمَّ ذكرني منه مانسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.

'হে আমার রব! তুমি আমাদের থেকে এটি কবুল কর। নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ইয়া আল্লাহ! কবরে আমার ভয়কে দূর করে দিয়ো। ইয়া আল্লাহ! মহান কুরআনের বরকতে আমার উপর থেকে আমি যা ভুলে গিয়েছি, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও, এর যা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ রয়েছি, আমাকে তা শিখিয়ে দাও, আমাকে সব সময় তার তেলাওয়াত নসীব কর এবং তাকে আমার জন্য হুজ্জত (দলীল) বানিয়ে দাও– হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক!,

কবি কত সুন্দরই না বলেছেন,

اول وآخر قرآن زچه باآمد وسین ☆ یعنی اندر دو جہاں رہبر ما قرآن بس

'কুরআনের সূচনা بسم الله এর ب দিয়ে ও সমাপ্তি সুরা ناس এর س দিয়ে, অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের জন্য পথনির্দেশ হিসাবে কুরআনই بس (ব্যস) বা যথেষ্ট।'

ফকীর বান্দা,
ফযলুল্লাহ ওরফে শাব্বীর আহমদ ইবনে ফযলুর রহমান উসমানী
৯ যিলহজ্জ, ১৩৫০ হিজরী,
দেওবন্দ।

আমার পিতা আমার নাম রেখেছেন ফযলুল্লাহ (فضل الله) এবং এর প্রাসঙ্গিকতায় তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করতেন–

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء -- ولوكره الأعداء من كل حاسد

আলহামদুলিল্লাহ
তাফসীরে উসমানী সমাপ্ত

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী





রাহনুমা
প্রকাশনী™

CamScanner

'তরজমায়ে শাইখুল হিন্দ'-এর
আলোকে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ ও

তাফসীরে উসমানী



تفسير عثمانی

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।